নব্যভারত।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৺দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত।



[আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত]

অষ্টাত্রিংশ খণ্ড—১৩২৭।

কলিকাতা

২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত
প্রতিষ্ঠাতা ও তদন্তে শ্রীপ্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

WATER DAMAGED.

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অকৃত্রিম দেশ-নায়ক	বাল গঙ্গাধর তিলক। ৺ সম্পাদক	২১।
২।	অত্যাচারীর প্রতি—(কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ	১৪০
৩।	অনাদর—(কবিতা)	শ্রীঅনাথবন্ধু সেন	৫১৬
৪।	অবিশ্বাসী বন্ধু—(কবিতা)	শ্রীদরবেশ	৩৫৭
৫।	অভিনব ধৃতি	ধর্ম্ম বিশ্বজনীন—৺ সম্পাদক	১
৬।	আত্মীয়ের পরিচয়—(কবিতা)	শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা	৪৬৯
৭।	আত্মোৎসর্গ	শ্রীবেণীমাধব দাস, এম-এ	১৪৫
৮।	আবাহন	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, বি-এল	৪৯
৯।	আমাদের শিক্ষা ও সংগ্রাম	শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী	৮৯
১০।	আশৈশব সহচরের স্মৃতি	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী, বি-এল	৩৭০
১১।	আড়ি	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এ, বি-এল	৪৪১
১২।	ইউরোপীয় মহাসমরে অদৃশ্য হস্ত	শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার, বি-এল	৬৩
১৩।	উদ্বাহ-তত্ত্ব	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ	৪৪৪
১৪।	উদ্ভিদের চেতনাশক্তি	শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার, বি-এ, বি-এল	৩১২
১৫।	উদ্বোধন (কবিতা)	শ্রীভুবনমোহন ঘোষ	৩১৬
১৬।	উত্তরচরিত সমালোচনা	শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	১১০ ; ২০০
১৭।	ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৫০৪
১৮।	কবি গোবিন্দ-সখা (কবিতা)	শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত	৩০২
১৯।	কর্ম্মবীর দেবী প্রসন্ন	শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ	৪০৩
২০।	কলেরায় কালীপূজা (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাট্টাদার	৩০৪
২১।	কেশবচন্দ্র	শ্রীবামনদাস মজুমদার	৪৬৪
২২।	গান (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৬১
২৩।	গান (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ	৫১০
২৪।	গুটি দুই কথা	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ	৪১৬
২৫।	ঘণ্টাধ্বনি (কবিতা)	শ্রীসুনীতিবালা দেবী, বি-এ	৫৬১
২৬।	চক্‌চকে আন্দোলন	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এ, বি-এল	৫২৩
২৭।	চট্টলগৌরব যাত্রামোহন	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ও শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত	৩৩৯
২৮।	চাঁদসীর চিকিৎসা	শ্রীকেশবচন্দ্র দাস	৩২৬
২৯।	চুপ কর	৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫৭৩
৩০।	জগত চেত্য কি চিন্ময় ?	শ্রীরজলাল দেবশর্ম্মা	৩০৫
৩১।	জাগরণ (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ	২২
৩২।	তর্পণ (কবিতা)	শ্রীঅনাথবন্ধু সেন	৩৮০
৩৩।	তাজমহল	শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল্-এম-এস	২৯৯
৩৪।	তিলকের তিরোধানে (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৩৩
৩৫।	তিলোত্তমা ও আয়েষা	শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	২৬৫
৩৬।	দক্ষিণ-ভ্রমণ	শ্রীরতিকান্ত মজুমদার	৯৭ ; ২২৭
৩৭।	দর্শন (কবিতা)	শ্রীহিরণ্যবালা সেনগুপ্তা	৯৪
৩৮।	দেও-উম্‌গা	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, বি, এল, M. R. A. S.	৪৮১
৩৯।	দেব-প্রয়াণ (কবিতা)	শ্রীবীরকুমার-বধ'-রচয়িত্রী	৩৬৯
৪০।	দেবলোকে দেবীপ্রসন্ন (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৭৬
৪১।	দেবীপ্রসন্ন ও 'নব্যভারত'	শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী	৩৮৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

৪২।	দেবী-প্রসন্ন স্মৃতি	বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এ, বি-এল	৩৭৭
৪৩।	দেব বাবু	শ্রীঅমিয়কুমার সেন	৩৯১
৪৪।	দেব-বিয়োগে (বিতা)	শ্রীপ্রফুল্লশেখর মিত্র	৪১৫
৪৫।	দেহ-খাঁচাতে	শ্রীব্রজচন্দ্র বসু	৪২৪
৪৬।	নারী তুমি দেবীনিশ্চয় (কবিতা)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৪৫৩
৪৭।	নারীর অধিকা প্রাচীন ও নবীন	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ	১৫৩
৪৮।	পবিত্রতার সাধ দেবীপ্রসন্ন	শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, এম-এ	৪০৫
৪৯।	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র দ্যাসাগর	শ্রীবেণীমাধব দাস, এম, এ	৪৪ ; ১৭০
৫০।	পণ্ডিত সুরেন্দ্র মাজপাত	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেঠ, বি-এল	৪৫১
৫১।	পরলোক ও মানবাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব	শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার, বি-এল	৪৬৭
৫২।	পরলোকগত স্বামী শিবচন্দ্র দেব	শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র	২৭৮
৫৩।	পরলোকে দেবপ্রসন্ন	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ	৪০৯
৫৪।	পরাজয়-গাথা একক (অমুদিত কবিতা)	শ্রীসুনীতি দেবী, বি-এ	৪৭৬
৫৫।	পাটের কথা রায়	শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর, বি-এ	৫৬২
৫৬।	পুণ্যাত্মার প্রয়াণ	শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু, কাব্যরত্নাকর	৫৯৬
৫৭।	পূর্ব্ববঙ্গে দ প্রথা	শ্রীমোহিনীমোহন বসু	১৮১
৫৮।	পূর্ব্বতন প স বিলের শিক্ষা	শ্রীঅকিঞ্চন দাস	৩২৯
৫৯।	পূর্ব্ব স্মৃতি	বামনদাস মজুমদার	৪৩৩
৬০।	পোলাও ম ও ৮ম উচ্ছ্বাস)	শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী	১ ; ১৮৩
৬১।	প্রণতি (বিতা)	শ্রীগিরিজাভূষণ রায়	২৪৪
৬২।	প্রাচীন আর্য্যসমাজে অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি ও প্রসার	শ্রীললিতমোহন রায়	৫১০
৬৩।	প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগের উৎপত্তি	শ্রীললিতমোহন রায়	১৫৫ ; ৩১০
৬৪।	প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা		২৩ ; ১৪৪
৬৫।	প্রেরণা (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	৪৪৯
৬৬।	পূর্ণিমা (কবিতা)	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরত্ন	৪৯৯
৬৭।	বন্ধুর অ মৃত্যুতে (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৩৩৭
৬৮।	বন্ধুর স্ম	শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস	৪২০
৬৯।	বঙ্গ-সম (কবিতা)	শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা	৩৬৮
৭০।	বঙ্গে ব্র	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এল	২০৭
৭১।	বাসনা বিতা)	শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ	৫২৩
৭২।	বিধির (কবিতা)	শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-বি	৫৪৪
৭৩।	বিমলা ালোচনা)	শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	৫০৪
৭৪।	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের প্রতি কয়েকটী কথা	শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম-এ	৪৮৯ ; ৫৫৭
৭৫।	বিষ্ণুপ	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, বি-এল, M. R. A. S.	২৫ ; ২৪১
৭৬।	বৌদ্ধদ	৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ	৩৪
৭৭।	ব্রণ-বি	শ্রীকেশবচন্দ্র দাস	১২১ ; ৩২১
৭৮।	ব্রাহ্ম ভব	শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস	২৬১
৭৯।	ভগবদ্	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল	৩৯ ; ৫৩ ; ১৯৩ ; ২৫৭
৮০।	ভাত বড়র শনি	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এ, বি-এল	৫৫০
৮১।	ভারত উপনিবেশ	শ্রীশীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি, এম-এ	২৮১
৮২।	ভারতীয় ধন-প্রণালীর প্রাচীনতা	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ	৪৩
৮৩।	ভ্রমর বিতা)	শ্রীদরবেশ	৩২৮
৮৪।	মধুৎ বিতা)	শ্রীরসময় লাহা	৪৮

TORN PAGE(S).

৮৫। মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন—শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী ... ৫১৬
৮৬। মহাত্মা দেবীপ্রসন্ন—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ-বর্ম্মা ... ৪৩৪
৮৭। মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১৮৮
৮৮। মহাপুরুষ মহাপুরুষকে চেনেন—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার ... ৩১৮
৮৯। মহাভারতমঞ্জরী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল ৩১২ ; ৪৮৩ ; ৫২৯ ; ৫৭৬
৯০। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে (কবিতা)—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ... ১৯
৯১। ময়ূরভঞ্জ রাজবংশ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু ... ২৮৯
৯২। ময়ূরভঞ্জে ত্রিপুরা—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু ... ৩০৩
৯৩। মাতৃ-পূজা—শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস ... ২৯৩
৯৪। মানের 'আড়' না প্রাণের দায়—শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, এম-এ ... ৫৩৭
৯৫। "মায়ে পোয়ে" (সমালোচনা)—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবি ... ৩২০
৯৬। যুগল-চিত্র (কবিতা)—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ... ৪৪৩
৯৭। রাজপুতানার পথে—শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ ... ৪৫৪
৯৮। রামতনু—শ্রীবামনদাস মজুমদার ... ৫০৩
৯৯। রামমোহন স্মৃতি-মন্দির—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সরকারাধিকারী ... ১০৭
১০০। রায় নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ দত্ত ... ১২৯
১০১। রুচি (কবিতা)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন ... ৪৬৭
১০২। শিশু—(কবিতা) শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত ... ২৭৮
১০৩। শোকাশ্রু—(কবিতা) শ্রীরাখাল দাস কবিরত্ন ... ৪১৯
১০৪। শ্রদ্ধাঞ্জলি—(কবিতা) শ্রীনগেন্দ্রবালা ঘোষ ... ৩৮৭
১০৫। শ্রদ্ধার স্মৃতি—শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, বি-এ ... ৩৩৮
১০৬। শ্রাদ্ধবাসরে—শ্রীফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী ... ৩৮০
১০৭। সঙ্গীতকা—সম্পাদক ২০ ; ১৪০ ; ২৩৪ ; ২৪ ; ৫৩৩ ; ৫৮২
১০৮। সখা-প্রবর্ত্তক প্রমদাচরণ সেন—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন ... ১৭৮
১০৯। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—৺ সম্পাদক, প্রভৃতি ... ১৪
১১০। সদ্দৃষ্টান্তের স্মারক—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম-এ ... ২
১১১। সমাজ ও ধর্ম্ম—রেঃ শ্রীবিনোদবিহারী রায় ...
১১২। সহযোগিতা বর্জ্জন—(কবিতা) শ্রীসঞ্জয় উবাচ ...
১১৩। সাধক জীবনে খৃষ্টের স্থান রেঃ শ্রীবিনোদ বিহারী রায় ...
১১৪। সাহিত্য-সেবক ভক্ত দেবীপ্রসন্ন—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার ...
১১৫। সিনেট সভায় সার আশুতোষের সভাজন—শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, ...
১১৬। সূর্য্যকুণ্ড লিপি—শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার, বি-এল, M.R.A.S. ...
১১৭। স্বর্গত দেবীপ্রসন্নের তিরোধানে—(কবিতা) শ্রীরাজকিশোর রায় ...
১১৮। স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন—(কবিতা) শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন ...
১১৯। স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী ...
১২০। স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী—শ্রীবিজয় চন্দ্র কর্ম্মকার ...
১২১। স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু ...
১২২। স্বর্গীয় রামকানাই দত্ত—শ্রীরমণীমোহন দত্ত, এম-এ, বি-এল ...
১২৩। স্বর্গীয় সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি (কবিতা) শ্রীজগদীশচন্দ্র ...
১২৪। স্মরণ—রায় শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর, বি-এ ...
১২৫। স্মৃতি-পত্র—(কবিতা) শ্রীসুরেন্দ্র মোহন বসু ...
১২৬। স্রোতের শৈবাল—(কবিতা) শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস ...
১২৭। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা—শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু সেন ও শ্রীরাজকি ...

যে কখনও সন্দেশ খায় নাই, সে যদি "সন্দেশ মিষ্ট, সন্দেশ মিষ্ট" বারম্বার বলে, তাহাতেই যেমন তাহার সন্দেশের মিষ্টত্বের ধারণা হয় না, যে কখনও সাগর দেখে নাই, তাহার যেমন সাগরের ধারণা হয় না, তেমনি, যে কখনও বিধাতার "দয়া" সম্ভোগ করে নাই, সে যদি আজীবন "দয়াময় দয়াময় বলে", "তবু তাহার কোন লাভ হইবে না, দয়ার ধারণা হইবে না। নাম সাধনের পূর্ব্বে সাধনার-ক্রম ধরিতে হইবে। বিধাতার যে স্বরূপের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে এবং তৎ সহ কর্ম্ম ও সংযমকে সম্বল করিতে হইবে। কর্ম্ম ও সংযমের কোন স্বরূপের সহিতই যদি সাক্ষাৎ না হইয়া থাকে, সরলভাবে প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তোতা বুলি বলায় বা তুষ-ভক্ষণে কোনই লাভ নাই।

বিধাতার ধৃতি বিধাতার কৃপা-প্রসূত। বিধাতা দেখা না দিলে কেহই সাধনার বলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। সাধনায় তাঁহাকে ধারণ করিবার পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার আগমন তাঁহার কৃপাপ্রসূত। আমি পৃথিবীতে প্রচলিত বহু নীতির পথ ধরিয়া কর্ম্ম ও সংযমপূত হইয়া বসিয়া থাকিব, তিনি আসিলে তবে তাঁহাকে সেই আসনে বসাইব। রাধা ফুলশয্যা রচনা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতেছেন, কখন শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন। শ্রীকৃষ্ণ না আসিলে রাধা কি আসনে বসাইতে পারেন? তাঁহার নয়ন-জলই তখন সার হয়। কিন্তু তাঁহার কৃপা, শ্রাবণের ধারার ন্যায়, সকলের উপর প্রতি-নিয়ত বর্ষিত হইতেছে। আমরা তাহা ধরি না, তাহাতেই অশেষ কষ্ট পাই। বিবেকই বল, সহজাত জ্ঞানই বল, বা ঈশ্বরবাণীই বল—প্রতিনিয়ত প্রেমের ভিতর দিয়া তাহা প্রতিজনের নিকট প্রকাশিত হইতেছে। তুমি কি তাহা কখনও শুন নাই? শুনিয়া থাক যদি, তবে যে বাণী শুনিয়াছ, তাহা ধরিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হও। আর যদি না শুনিয়া থাক, কর্ম্মের পথ ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া কর্ণ পাতিয়া বসিয়া থাক, নিশ্চয় এক সময়ে তাহা শুনিতে পাইবে। যখন শুনিবে, তখন তাহা লইয়া ধর্ম্মজগতের ঘরকন্না আরম্ভ করিও। তিনি আমার প্রতি দয়া করেন, তোমার প্রতি তাঁহার দয়া নাই? তাহা হইতেই পারে না। তিনি সকলেরই প্রতি সমান দয়াবান্। কর্ম্ম বা ঘটনার অন্তরাল দিয়া, শোক দুঃখের ভিতর দিয়া, দারিদ্র্য ও দৈন্যের ভিতর দিয়া, বিপদ এবং অশান্তির মধ্য দিয়া ঐ দেখ তিনি আসিতেছেন। ঐ দেখ আকাশের বায়ু ও মেঘ ভেদ করিয়া, সূর্য্যের উষ্ণতা ও চন্দ্রের স্নিগ্ধতা ভেদ করিয়া, ফুলের কমনীয়তা ও সৌরভ, পাখীর মধুর স্বর, নারীর মাতৃভাব, বালকবালিকার পবিত্রতার ভিতর দিয়া তিনি আসিতেছেন। সৃষ্টির অন্তরালে যে সূক্ষ্ম সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সহজ সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ দেখ, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি আসিতেছেন। ঐ দেখ, মানব মানবের জন্য অম্লানচিত্তে যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি নামিয়া আসিতেছেন। ঐ দেখ, মাতা যে সন্তানের জন্য অম্লানচিত্তে জীবন ঢালিয়া দিতেছেন, তাহার ভিতর দিয়া নামিয়া আসিতেছেন। ঐ দেখ, দেশের জন্য যে সকল মহাজন জীবন ঢালিতেছেন, তাহাদের মধ্য দিয়া তিনি নামিয়া আসিতেছেন। দেখ,—দেখ—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ঐ যে সংসারবিরাগী শাক্যসিংহ নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন, তাহার ভিতর দিয়া তিনি

TORN PAGE(S). PAGE(S) MISSING.

নামিয়া আসিতেছেন,—ঐ দেখ গোপার দয়ার ভিতর দিয়া আসিতেছেন। ঐ দেখ, নিমাই পণ্ডিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কেশব-ভারতীর নিকট ঐযে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আসিবার অনন্ত পথ, অনন্ত ক্রম, অনন্ত প্রক্রিয়া। তিনি তোমার বিবেক বা আদেশের ভিতর দিয়া বা শ্রেয়ের ভিতর দিয়া আসিতেছেন। যে ক্রম, যে প্রক্রিয়া ধরিয়া তিনি আসিতেছেন, তাহা দেখ, তাহা ধর, তাহাতে ডুবিয়া যাও। তাহাতে যদি পৌত্তলিকতা হয়, তাহা হউক; তাহাতে যদি নিরাকারের ধ্যান হয়, তাহা হইতে দেও। তাহা ধরিয়া চলাই তোমার কাজ। তিনি যে স্বরূপ বা নাম তোমার নিকট প্রকাশ করিবেন, তাহাই জপ করিবে। তাহার পরিণাম ভাবার তোমার অধিকার নাই। পরিণামে যাহা করিবার, বিশ্বগুরু তাহা করিবেন। কেশবচন্দ্র বলিতেন, সব ধর্ম্মই সত্য। আমরাও বলি, সব পথ, সব ক্রম, সব প্রক্রিয়াই সত্য। সত্য ধরিয়া সত্যের পথেই যাওয়া যায়। সত্য ধরিয়া সাধনা কর, সত্যেই তোমায় লইয়া যাইবে। তবে জানিও, কল্পনাকে যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া থাক, তবে সত্যের সহিত তোমার সাক্ষাৎ কখনও হইবে না, কখনও হইবে না; তুষভক্ষণের ন্যায় হইবে। সাধনার অনন্ত পথ, অনন্ত ক্রম, অনন্ত প্রক্রিয়া—যিনি যে পথে, যে ক্রমে, যে প্রক্রিয়ায় পারেন, অগ্রসর হউন। যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, দল, গণ্ডী, সম্প্রদায় তখন উঠিয়া যাইবে। জগন্নাথ দর্শনের অনন্ত পথ, অনন্ত ক্রম, অনন্ত প্রক্রিয়া। অনন্ত মানবের অনন্ত পথ, অনন্ত প্রক্রিয়া। তাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যতদিন পথে, ততদিন আমার কথা তুমি বুঝিবে না, তোমার কথা আমি বুঝিব না। পথকেই আমরা যদি লক্ষ্য করিয়া লই, তবেই বিপদ; তখন ভেদবোধ, মারামারি, কাটাকাটি, মত-সংঘর্ষণ। নচেৎ চলিতে চলিতে যখন লক্ষ্যে পৌঁছিবে, তখন কৈবল্য ধামে সব একাকার হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, যাঁহারা বিধাতাকে স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলেই একদলভুক্ত, এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দে তখন হৃদয় মন পূর্ণ হইবে,—তখন দীপ্ত শিবার অভিষেক হইবে, সকল জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হইবে,—তখন সকলকে ভাই বলিয়া চিনিবে এবং সর্ব্ব ঘটে তাঁহার লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তখন জাতীয় একতা এই ভারতে অবতরণ করিবে। তখন এক-জ্ঞান, এক-ধ্যান এবং সুধা-রস-পানে সকলে বিভোর হইবে। তখন আর গণ্ডী নাই, সম্প্রদায় নাই, দলাদলি নাই—চিদানন্দের-লহরী তখন প্রাণকে সরস করিয়াছে। তখন মহাকৈবল্যে সকলে নিমগ্ন। হায়, সে বিশ্বজনীন ভাব এ ভারতে কবে আসিবে? কবে জাতি-কুলের বা দলগণ্ডীর বন্ধন ছিন্ন হইবে, কুল তেজে সকলে অকূলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ধন্য হইবে? বিধাতার বিধানে ভবিষ্যতে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য নব্যভারত অপেক্ষা করিতেছেন। বিধাতার মহা ইচ্ছাই পূর্ণ হউক

পোলাও—সপ্তম উচ্ছ্বাস।

যে দেশে স্বাধীন বায়ু শিথিল গমনে
দোলাইয়া সুকোমল আইভি লতায়
বহে ধীরে, গোঠে গোঠে সৌন্দর্য্য আলয়
ফোটে ডেজি, মুগ্ধ করি ফোটে ম্যাগনোলিয়া,
যেথা মধুমাসে পিক মধুকুহরণে
জীবনের জড়তায় দেয় সরাইয়া
সে দেশ হ'তে কি প্রভো এসেছিলে তুমি?

যেই দেশে সেক্ষপীর হৃদয়ের কবি,
মানবেরে শিখায়েছে অমরার গাথা,
যেথা কবি শিরোমণি সুকোবিদ শেলি,
কল্পনায় ইন্দ্রধনু-বর্ণ-সুশোভিত,
তুরগ উপরে চাপি ছুটি মেঘ পথে,
চাতকের মধুকণ্ঠে শিখাইল গান;
যেথা প্রকৃতির কবি উদার পরাণ
ওড্ সুওয়ার্থ গিরিশৃঙ্গে বিজনকাননে,
প্রকৃতির কলকণ্ঠ করিয়া শ্রবণ
ভাবের সমাধি মাঝে থাকিতেন ডুবি,
সে দেশ হ'তে কি প্রভো এসেছিলে তুমি?

যে দেশের শিক্ষা গড়ে মানুষে দেবতা
মনুষ্যত্ব যে দেশের সুগন্ধি মণ্ডন,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রসারি হৃদয়
যেই দেশে ছুটিতেছে বিচূর্ণ করিয়া
ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্রমত পুরাতন ভাবে
যে দেশ হ'তে কি প্রভো এসেছিলে তুমি?

একদিন Iis Osiris তরে
কেঁদেছিল সেই অশ্রু পরশ করিয়া
উদ্বেলিত হ'য়েছিল Nileএর নীর।
পঞ্চসখী সহ সিন্ধু আছ তুমি জাগি
সহস্র Isis ওই দারুণ ব্যথায়
অগ্নিমুখী যাতনার, নির্দ্দয় পেষণে
অভিভূত হ'য়ে করে অশ্রু বরিষণ
সেই তপ্ত অশ্রুস্পর্শি তুমি ত উদ্বেলি
উঠিলে না একবারও করিয়া গর্জ্জন?

অনাবিল সিন্ধুস্নাত কেশরী পঞ্জাব!
গুরুগোবিন্দের শুভ্র বিভূতি পাবন
সৎসাহসের খনি সদ্গুণ নিলয়!
বান্দা যার লভি কৃপা অভয়ে অক্ষোভে
বসাইল তীক্ষ্ণ ছুরী আত্মজের বুকে
সেই তুমি পূতভূমি ভারতের রোম।
সেই তুমি সর্পবেণু আলাপনকারী
Poppaea Sabina প্রেমে মুগ্ধ প্রণয়ীর
বীণার প্রলয়ঙ্কর বিকট ঝঙ্কারে
হ'য়ে আছ মুহ্যমান; এট্না তাহার
অগ্ন্যুচ্ছ্বাস, সংযমের দারুণ উদ্যমে
করিয়া রাখিল রোধ, নিখিল বিশ্বের
প্রতি লোমকূপ দিয়া উঠিছে যন্ত্রণা।

ভারতের শিবরূপী ওই চেমস্ফোর্ড!
Quite an Fait in his business
Indemnity indemnity মুক্তি চারিধারে
নৈষ্ঠুর্য্যে রাখিল চাপি অমিত বিক্রম।
জিত্লে বটে জিত্লে বটে
কালি দিয়ে কুলে,
Humanityর মাথা কেটে
চড়িয়ে দিলে শূলে।

এমনি ক'রে জিত্‌লে পরে
জিতেই হ'বে কাত,
হারতে হারতে দিন আসবে
করবো বাজি মাত।
Sydenhamএর বংশ যেন
গজিয়ে গজিয়ে ওঠে
পূর্ব্ব কীর্ত্তি লোপ কর্ত্তে
এরাই যেন ছোটে।
নিক্তি করা বিচার বিধান
তোমার জাতির ছিল গো
ভারত ভরা মলয় পবন
তারে হরে নিল গো।
যেমনি ছু'লে ভারত মাটি
অমনি হ'লে নবাব,
অমনি পেলে তড়ি ঘড়ী
নাদির শাহের স্বভাব গো।
দুর্ব্বল বলে পেষণ করে
থেঁৎলে দিয়ে মন।
স্বাধীনতার মটরকারে
ছুট্‌ছে জয়ীজন।
আগুন খাগী নির্দ্দয়তা
পরের রক্ত পিয়ে,
বীরত্বের পোষাক প'রে
ফুল্ল করে হিয়ে।
আমরা সরল আমরা সরল
Duplicityর ধার না ধারি,
বাঁকা পথে চল্‌তে গিয়ে
আপন পদে কুঠার মারি।
Dodoর মত আমরা হব
রইব না আর ভবে
কঙ্কাল গুলি দাঁত কিড়মিড়ি
সইতে হয় সবে।
সমাজ গেছে ভগ্ন হ'য়ে
মন হ'য়েছে খাট
মেটে ভাঁড়টী তাও ভেঙ্গেছে
সার করেছি ঘাট।
অর্কবাগীশ অনড়ন,
করি শাস্ত্র আবর্ত্তন
অনুষ্ঠুভের শ্রাদ্ধ করেন
বোকার কাণের কাছে।
হৃদয়ভরা নিষ্ঠীবন
প্রাণের মাঝে দুঃস্বপন
বিস্তাডঙ্ক বেড়ান সদা
স্বার্থ করি পাছে।
Innovation Innovation
Renovatian চাই,
সবাই মিলে ভেঙ্গে চুরে
নূতন-কর ভাই।
নূতন কর নূতন গড়
পুরাতনের দিন গিয়েছে।
ওই দেখ না শক্তি এসে
দুর্ব্বলেরে কোল দিয়েছে।
বৈশ্য এস বৈদ্য এস
এস সবাই কোলে
মায়ের পেটের ভাই তোমরা
এস দাদা বোলে।

যজ্ঞোপবীতের শক্তি ব্রাহ্মণের নাই
চণ্ডালের প্রকৃতি সে করিয়ে হরণ
এখনর গৌরব করে ব্রাহ্মণ বলিয়া।
কল্পনার পক্ষ তার মৈনাকের মত
ছিন্ন করিয়াছে ওই স্বার্থপরতায়।
ঢলঢলমূলে বসি সুস্নিগ্ধ ছায়ায়
কোথা সে বরেণ্যত্রয়ী শঙ্কর গৌতম,
নির্ম্মল জাহ্নবীপূত ধবল হৃদয়?
যাঁর প্রাণপদ্মমাঝে বৈকুণ্ঠবিলাসী
ত্যজি কমলার পার্শ্ব, রাজিতেন সদা।
ত্যাগ ছিল ভোগস্পৃহা ভোগের মাঝারে
অচ্যুতের ভূমানন্দ, তুলিয়া উচ্ছাস

করিত সতত কেলি হৃদয়ের সাথে।
সমগ্র সরল স্বচ্ছ 'সত্যকাম' সবে,
ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবারে শান্তি-বিমণ্ডিত
পুলকের বাসভূমি তপোবনমাঝে
প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াইল, মুখপানে চাহি,
বালকের সুরভিত সিক্ত কঞ্জ সম
হৃদয়টী নিরখিয়া, আচার্য্যঅগ্রণী
সত্যকামে কোল দিয়া করিল ব্রাহ্মণ।
কোথা সে বশিষ্ঠদেব মধ্যাহ্ন তপন
প্রতিভার দিব্যালোকে বিশ্বপূজনীয়?
তপোগর্ব্বে, মহাগর্ব্বী বিশ্বামিত্র শূরে,
আত্মত্যাগে, গর্ব্ব তার করিয়া বিলয়,
ব্রাহ্মণ-সম্মানে তাঁরে করিল ভূষিত,
মাধ্যাকরষণ সম সেই জ্যোতিষ্মাণ
কোথা আছে এই বিশ্বে আদর্শ পুমান্?
সেই দিন আর এই দিন ভাই
সেই দিন আর এই দিন।
বামুন কি আর বামুন আছে
সে যে ছিন্ন ভিন্ন ভগ্ন হীন।
কোথায় তাহার ব্রহ্মতেজ
সত্যগত প্রাণ?
অন্ন সে যে, কেনে বেচে
করে নাত অন্নদান!
যোগ জানে না যাগ জানে না
নহেক সে উদ্গাতা *
উদাত্ত স্বর উচ্চারিতে
স্বরিৎ স্বরের খায় মাথা।
বেদের গরব করেন তিনি
জানেন নাক বেদটা কি,
মৎস্য মাংস বাসেন ভাল
বাসেন ভাল গব্য ঘি।
পাণ্ডা সেজে ষণ্ডাদের
মনের সুখে দেন গালি,
গণ্ডমূর্খ স্তাবকগুলো
উল্লাসে দেয় হাততালি।
কুল্লুক ভট্টের নামটা জানা
উল্লূক ভট্টের পড়া নাই,
চাণক্যের বচনগুলা,
আওড়ান কেবল ঠাঁই অঠাঁই।
Soda খাচ্ছেন খাচ্ছেন কখন,
সাহেব বাড়ীর আস্তো Roll,
সন্ধ্যাকালে মালা খট্‌খট্
মুখে বল্‌ছেন হরিবোল।
চরিত্রবল নাইক কার
প্রাণের মাঝে শক্তি নাই,
মনের মাঝে মলিনতা
Hypocrisy সর্ব্ব ঠাঁই।
গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে এঁরা
মিথ্যা বলতে ভয় না পান,
সকল কাজই এঁরা কর্ত্তে রাজি
খাঁই মত যদি লভেন দান।
এঁরাই আবার পরকালের
দেখান বোকায় রাস্তা,
রূপার সাজে সবাই থাকেন
মচ্ছে ধরা দস্তা।
ঢের সয়েছি আর সহেনা
ভেঙ্গে ফেল পুরাণ,
নূতন ভাবে জাগিয়ে ওঠ
মাতিয়ে তোল পরাণ।
জাগিয়ে তোল মাতিয়ে তোল
নাচিয়ে তোল অপরে,
ছুটিয়ে চল গিরির'পর
কেন জ্বালা সহ রে।
জাপান তুলিছে ইথর ভেদিয়া
আপন শির,
অর্জ্জুন সম সমরাইগণ,
মহান্ বীর।

* সামবেদ-পাঠক।

WHOLE VOLUME. BLEED THROUGH.

বর্ণভেদের খনিটী খুঁড়িয়া
স্বর্ণ চূর্ণ বাহির কর,
জীর্ণ আচার ছিন্ন করিয়া
অভিনব একমূর্ত্তি গড়।
(তখন) শিরায় শিরায় ছুটিবে বিজলি
ধরণী ধরিবে নূতন বেশ,
মলয় অনিলে আনিবে বহিয়া
আর্য্যগণের গানের রেশ।
বাল বিধবার রোদনে যাদের
হৃদয়ে লাগে না ব্যথা।
কাপুরুষ সেই নিলাজ গণের
এখনও শুনিছ কথা ?
হৃদয় হৃদয় নাহি কি হৃদয়
সৎসাহসের নাহি অভিনয় ?
ঢাল ঢাল ঢাল, প্রাণ দেও ঢালি,
শিরার মাঝারে, দেও অগ্নি জ্বালি,
পুলকে মানুষ উঠুক নাচিয়া
মেরু হ'তে মেরু বেড়াক ছুটিয়া।
কোথা সে মানুষ ইঙ্গিতে যাহার
মাতিয়া উঠিবে ভারত আবার ?
আসিবার কথা বুঝি সে মানুষ
এখনও হেথায় আসেনি,
সে যদি আসিত, সবাই জাগিত,
ছুৎ-কারাগারে বোসে না থাকিত
তাইতে মানুষ জাগেনি।
(ওরে) পুরাতন কবে যাবে ছারখারে
নূতন উঠিবে জাগি,
পরাণের মাঝে উঠিবে বাসনা
বিশ্ব পূজার লাগি।
গাহিল সাধক গাহিল আবার
তেমনি গভীর আকুল রবে।
সমাজের হেন হীন ব্যভিচার
এখনও তোমরা নীরবে যবে ?
সমাজের পতি আজি কে কাহারা ?
অর্থ যাদের নিকটে রয়,
শূদ্র অনাচার অবিচার তারা
করুক, কথাটী কেহ না কয়,
ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণ যারা
ধনীর চরণ লেহন করে,
কণ্ঠসূতার গরবে মাতিয়া
স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরে।
পূজার মন্ত্র ভুলিয়াছে দ্বিজ
যজন যাজন ব্যবসা আজ,
শত ছলনা, বাক্যের ফাঁদে
দক্ষিণা চুরি কেবলই কাজ ;
শিষ্য গৃহের বিধবা রমণী,
ভণ্ড গুরুর লক্ষ্য স্থান,
তার পূতমধু করিছে হরণ,
দীক্ষাদানের করিয়া ভান,
এক চক্ষু এ হিন্দু সমাজ
অন্ধ সদা সে পুরুষ লাগি,
অবলার প্রতি শৌর্য্য দেখাতে
কুটিল দৃষ্টি রহেছে জাগি।
পতিতার তরে কাঁদেনা পরাণ,
কে তারে ফেলেছে পাপের কূপে ?
কে তার যৌবন লুটিবার তরে
ধরেছিল তারে বিষাক্ত বুকে।
কোথায় সংযম কোথা উদারতা,
কোথা নয়নের জল,
কোথা সে সাধক দেবোপম ছবি
জগতের সুমঙ্গল,
সাধারণী প্রেমে মজিছে যুবক
পিতেছে তীব্র মদিরা রাশি,
তবু তার সনে করি মিশামিশি
তবুও তারে মনে ভালও বাসি,
পতিবুক হ'তে দুরাচার যদি
সতীরে কখন ছিনায়ে লয়,
পতি গৃহে তার নাহি ঠাঁই আর,

এমন বিধান এদেশে রয়।
ভ্রষ্ট পুরুষ গড়িছে সমাজ
বিধান তাহার সুবিধা মত ;
পাপের বোঝাটী নারী শিরে দিয়ে
আপনি কুকাজে নিয়ত রত।
কেহ বিষ পিয়ে মিটায় যাতনা
কেহ ইস্‌লামের স্মরণ লয়,
সমাজ পণ্যে কেহ পরিণতা,
সমাজ পাতকী এতে কি নয় ?
পুরুষের হীন হেয় ব্যভিচারে
সমাজ রহিবে হইয়ে মূক,
পুরুষ যেথায় স্বেচ্ছা আচারী
বোঝে সে কেবল আত্ম-সুখ !!
সমাজ ভিতরে মানব কোথায়
নাচিছে পিশাচ দানব ভূত,
পলে পলে পলে গভীর পতনে
বরণ করিছে মরণ দূত।
আজি কি সাগরে নাহিক সলিল
আকাশে বুঝিবা অশনি নাই,
রুদ্র রোষের ক্রুর কটাক্ষে
এখনও সমাজ জীবিত তাই।
আয়রে চাঁড়াল আয়রে কামার
আয়রে কুমার বাঁধিয়া দল,
নূতন করিয়া গঠিতে সমাজ
প্রয়োগ কররে আপন বল।
তোরা যে সরল অপাপ নিমল,
পরাণে নাহিক কলঙ্ক দাগ ;
পুণ্যের নামেতে কলুষ কিনিয়া
লইতে চা'স না তাহার ভাগ।
পাপের পঙ্কিল, সরসীর মাঝে
(ওরা) সাঁতার দিতেছে বাঁধিয়া দল,
রূপ রূপ করি তৃষিত হইয়া
বাসনা-মরুতে খুজিছে জল।
দ্বাদশ বর্ষের বালিকা বধূটী
কোলেতে তাহার শোভিছে সুত।
পিতায় কামের জাল বিথারিয়া
করিছে আপন গোত্র পূত।
হৃদয়-বেদীতে বসিয়াছে কাম
প্রেম গেছে কোন দূর দেশে,
ব্যভিচারের ঢল নেমেছে
প্রেমিক প্রবর যায় ভেসে।
মরুর মাঝে খুঁজছে এঁরা
শীতল বারি,
দিবা নিশি বধ্‌ছে এঁরা
কুলের নারী।
নারীরে সম্মান করা এ জাতি কি শিখিয়াছে,
নারী সমাজের বাঁধ এ জাতি কি ভাবিয়াছে,
প্রতি গৃহে হাহাকার অশান্তির পরকাশ,
মনঃকষ্টে শত নারী আলিঙ্গিছে সর্ব্বনাশ॥
ওই জমিদার আচারে চণ্ডাল
পশু ব্যবহার করে রে ;
(তার) নখিতে নখিতে জুলুম তাড়না,
আঁখি দুটী শুধু ঝরে রে,
মুখে বাক্য নাহিক সরে রে।
ঘরেতে কৃষাণী আময় কাতর,
জ্বর-কম্পনে কাঁপে থরথর,
জল্লাদ যত নিধুর আকার
ধরে পা'ক এসে খাটিতে ব্যাগার,
করুণ ক্রন্দন না শোনে কাণে।
স্নেহ মমতার দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
কোমলতা প্রাণ করিছে হরণ,
হৃদয় ফাটিয়া নয়ন জীবন
এ দুর্দ্দিনে নাহি দেয় দরশন
শুষ্কতা জাগে সবার প্রাণে।

Brutas বলেন :—

আমরা হইনি এখনও যোগ্য
আত্ম-শাসনে,
তবে ঐ নিধি তবে ও রতন
মিলবে কেমনে।

পূত নির্ম্মল গঙ্গার জল
নরম পন্থীর দল গো,
Let Daily News বলুন যা হয়,
জানে না ইহারা ছল গো।
গা তোল গা তোল,
উঠ শিশু ধোও মুখ গো,
এবার Moderate গণে,
ভুঞ্জিবে রাজ-সুখ গো।
ক্রম্‌ওয়েলের লীলায়
খোঁচা লেগেছিল পীলায়,
কেঁদে যেচেছিল ষণ্ড নিকর,
এস কোথা আছ রাজ রাজেশ্বর,
এত উত্তাপ নহে—দুঃখ গো।
কোথা জনমত কোথা জনগণ
জানি না বুঝি না জনেন্দ্র কেমন ?
হাহাকারে ঘেরা কুটীরেতে বাস
অনাহারে নাহি বদনেতে ভাষ।
লাজের সম্মান করিতে রক্ষণ
মরণে রমণী করে আলিঙ্গন,
রোগে জীর্ণ দেহ নাহিক জীবন,
নাহিক কেহই আপনার জন,
এ জগতীতলে ব্যথায় তাহার,
দিতে প্রলেপন নাহি মিত্র আর।
সকল ব্যথার সেরা ঐ ব্যথা
ঘরে নাহি কারও ভাত ;
দেশের আইন ন্যায়েতে সিক্ত
প্রতি আখরেতে তাপ।
রাজার ঘরের দুলালী ছাওয়াল
Penal Codeটী ঘাঁটী,
বেগুন চোরের নীল-দাঁড়া জেঁতে
ঘোড়ায় মারেন লাঠি।
আস্‌ছে দেশে মণ্টেগু-দান,
এবার হইব ধন্য,
ক্ষমতা এবার করিয়া জাহির
ধরণীতে হ'ব গণ্য।
লুটিয়া ভোট্ হইয়া সভ্য
ধরিব গগন চাঁদা।
সিংহ চর্ম্মে সাজি বাহিরিব
কেহ ভাবিবেনা গাধা।
Sinha সাহেব Baron হ'লেন
Earl হ'বেন বোস্,
গর্ব্বে জাতি উঠ্‌বে ফেপে
হাঁস্‌বে মতি ঘোষ।
বধ করিয়া শত পাঠা
কাল কাল মোষ,
এই সমাজের নেতা এমন
Attorneyদের বোস্।
দারিদ ঘরের পাখাল টাকা
উড়ে চলে যায়।
বোসের ঘরের পঙ্গু টাকা
করে হায় হায়॥
হাড়ী কাঁদে অন্ন বিনা,
উদর কাঁদে ক্ষুধায়,
পেটের জ্বালায় মর্‌লে পরে
কে বল আর শুধায় ?
Pitt ছিলেন Burke ছিলেন,
ছিলেন সেরিডান,
মোদের নেতা খোজেন শুধু
নির্জ্জলা সম্মান !
(এরা) নাম কিন্‌তে বাসেন ভাল
দেশের পূজা জানে কে,
গরীব থাকে কুঁড়ের মাঝে
তাদের বল মানে কে।
ঘরে কারও অন্ন নাই
নাহিক দেহে বল ;
অনাহারে মর্‌ছে কত
কোথা—অশ্রুজল !
মিঞা সাহেব ঠিক বলেছেন,
নেতার আবার অভাব কি,

(ও ভোলা মন) নেতার আবার অভাব কি,
একতারাটী নিয়ে এস
তাড়াতাড়ি ঠাকুরঝি,
নেতার কথা বলে দি।
গ্রামের মধ্যে Tout নেতা
আউর নেতা কে,
মুখুয্যেদের বিধবাবালার
যৌবন হরে যে।
Subdivisionয়ে Deputy নেতা,
আউর নেতা কে,
তোষামদের তেল কিনিয়ে
শিংটী মলেন যে।
সহরে হচ্ছেন তিনি নেতা,
যিনি পহেলা নম্বর Gascado,
প্রতিযোগীর মানের তরী
মার্‌তে চালান Torpedo.
হাম্ বড় আর দুনিয়া ছোট
বল্‌বার যার আছে tact,
তিনিই হচ্ছেন সহুরে নেতা
যাই বল এইআদত fact.
শিবু চাট্‌ছেন সুরুর অঙ্গ,
সুরু কেষ্ট ভজেন,
আবার ইচ্ছা হ'লে অম্বিকাতে
শুদ্ধভাবে মজেন।
কেশব নগেন সাধু শিবনাথ
পেলেন নাক কল্‌কে,
ভাঁড়ের মধ্যে সজল দুগ্ধ,
উঠ্‌ছে কেমন চল্‌কে।
দেশটারে যদি উদ্ধারিবে
নীতির বাঁধন ক'স,
স্বভাবটারে ধোপ দিয়ে নিয়ে
ঐ সরেতে রস।
য়্যাডাম্মিথ চুলোয় গেল,
উঠ্‌ল রে জেগে ম্যাটসিনি,
রবির রাধার নূপুর বাজে;
ঢিমিকি ঢিমিকি রিণিকি ঝিনি।
কাঙ্গাল আমরা দারিদ আমরা,
দেহেতে নাহিক রক্ত,
রুধির ব্যতীত কাউন ভখিয়া
(এজাতি) কেমনে হইবে শক্ত।
বিলাস জোঁকে পিতেছে রুধির,
রুধির যেটুকু আছে,
কত শত লোক অনাহারে মরে,
আধা ভোজী তবু নাচে।
মাথার উপর ঢেউ তুলেছে
চিকণ চুল।
জমার চেয়ে খরচ দ্বিগুণ
গোড়ায় ভুল।
সুতোবাচ—
শুন বৎস একবার কর অবধান,
কি কি গুণে নেতা হয় করিছি ব্যাখ্যান।
স্বার্থপর হ'বে বটে স্বার্থপরতায়
লুকায়ে রাখিবে যত্নে মনের গুহায়।
পরদুঃখে অশ্রুজল করিবে বর্ষণ
করিবে না, কভু অর্থ পরে বিতরণ।
প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড যদি হ'তে পার,
উতরিবে Politics-ভীম পারাবার,
ভাষা মধ্যে সারবত্তা থাক্ বা না থাক্,
Choice word গুলির বসাইবে থাক্।
ম্যাটসিনির ইতিবৃত্ত আগ্নেয় ভাষায়,
হাত নেড়ে মুখ নেড়ে বলিবে সভায়।
বক্তৃতায় সভা যেন উঠে বিকম্পিয়ে,
পরের ছেলেরে দিবে-বিপদে ঠেলিয়ে।
Agitation, cogitation and
oppression বুলি,
জিহ্বারূপ rifleর মারাত্মকগুলি,
Affectation কিছু নহে কেবল অভ্যাস
রাজনীতি মোক্ষযোগ প্রজ্জ্বলিত হ্যাস্।

শুভকর্ম্মে তবে চাঁদা করিবে চয়ন,
আত্ম তরে "সিংহ অংশ" করিবে রক্ষণ,
দৈনিকে আপন কীর্ত্তি করিবে বাহির,
স্তাবক রাখিবে গুণ করিতে জাহির।
অশান্তিকে ঠেলে দিল শান্তি নিকেতনে,
রবির চোখে জল এসেছে গোপন বেদনে।
মানীর মানটা কেড়ে নিয়ে
যারা রবিরে বড় কর্ত্তে চায়,
তাদের মত ইতর কি আর
কোথায় মেলে বসুধায়।
রবি তুমি যাই কর ভাই,
আর পুষনা Bow-wow,
তেড়ে লোকে কামড় দিতে
করে এরা ঘাউ ঘাউ।
তোমার fascination গুলো
যার সরেতে ঝাপ দেয়,
সত্যি বল্‌ছি দু-ইঞ্চি ভাই
তাদের মাংস তুলে নেয়।

"Doddiman doddiman
Put out your horn,
Here comes a thief
To steal Robi's corn.

ক্ষুদ্র বাংলা মুল্লুকেতে
চামচিকে আর উল্লুকেতে,
সাহিত্যের বাগান খানি
নষ্ট করে দিল।
দত্তবাড়ীর উমাপতি
সেজে থাকেন পুরুষ সতী,
এখন তাঁহার হৈনান্য গো,
জগত জেনে নিল।
যাদবেশ্বর স্নিগ্ধ রবি,
যাদবেশ্বর স্বভাবকবি
চড়চড়ি তিনি রাধেন না গো,
পাকান তিনি রাবড়ী,
রঙ্গিন ভাবের নেশায় ভোর
ছোকড়া কবি ক্ষিপ্র চোর,
Shelly Kittsর ভার চুরিয়া
মাথায় বাগেন পাগড়ী।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১৭৯২ শকাব্দের ১৫ই শ্রাবণ শনিবার সরযূপারী গ্রহবিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণের বাস নবদ্বীপে ছিল। তাঁহার পিতামহ শেষ জীবনে ন্যূনাধিক ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে কোন আত্মীয়ের অনুরোধে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মহাটী গ্রামে এবং তাহার পর স্বচ্ছতোয়া চন্দনা নদীর তীরে খালকুলা গ্রামে বাসভবন প্রতিষ্ঠা করেন। এখন পুনর্ব্বার ইঁহারা খালকুলা পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপেই বাস করিতেছেন। সতীশচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রম কালে গ্রাম্যবিদ্যালয় হইতে মধ্য-ইংরাজী ও মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। উহার তিন বৎসর পরে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহার পর যথা সময়ে এফ-এ, বি-এ, ও এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-

এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটী সুবর্ণ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী-সভা হইতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধীতে ভূষিত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃঅব্দে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় চারি বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ঐ সময়ের ইনি নবদ্বীপের প্রধান কবি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকটে যথাক্রমে সংস্কৃত কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ইহাকে সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি-আই-ই মহোদয়ের সহিত তিব্বতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। অভিধান প্রণয়ন কার্য্য উপলক্ষে ইহাকে দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতে হয়। ঐ সময়ে তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীয় সুশিক্ষিত বিখ্যাত লামা যুন্‌ছোগ ওয়াব্‌ডান দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতেন। সতীশচন্দ্র এই লামাকে নিয়মিত বেতন প্রদান পূর্ব্বক দেড় বৎসর কাল ইহাঁর নিকটে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে "কাবাব দুলদেন" এবং "সেরা বতং য়ু" সমধিক উল্লেখযোগ্য। অভিধান প্রণয়ন শেষ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় অবস্থান কালে ইনি সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় শ্রমণগণের নিকট পালি ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইনি ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে পালি ভাষায় এম-এ, পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া একটী সুবর্ণ পদক ও একশত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সিংহল কিম্বা ব্রহ্মদেশ হইতে কেহ এই পরীক্ষা প্রদান করেন নাই। ভারতবর্ষে পরীক্ষক না পাওয়ায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিয়ান মিঃ টনি ও ক্যাম্ব্রিজের অধ্যাপক কাউয়েল সাহেবকে পরীক্ষক নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারা লণ্ডন-ইউনিভার্সিটীর পালি ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপক সুবিখ্যাত রিজ্ ডেভিডস্‌কে পালি ভাষায় এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। পরীক্ষান্তে ডাক্তার রিজ ডেভিডস্ নম্বর প্রেরণপূর্ব্বক ইহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে পৃথক পত্র লেখেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে তথা হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে বদলি হন।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিব্বতের তাসিলামা বৌদ্ধ তীর্থ সকল সন্দর্শনের নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করেন। ঐ সময়ে ভারত-গভর্ণমেণ্টের আদেশে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র তাঁহার সহিত থাকিয়া বুদ্ধগয়া, বারাণসী, সারনাথ, আগ্রা, রাওলপিণ্ডি, তক্ষশিলা প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সমূহের ইতিবৃত্ত ও তত্রত্য অনুষ্ঠানাদির বিবরণ তিব্বতীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং বরাবর দোভাষীর কার্য্য করেন। ইহাতে

তাসিলামা পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে,তাঁহার হৃদয়ের পরিতোষ ভারত-গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, এবং পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণকে বহু বহু ধন্যবাদসহ মহাসম্মানের উপহার "খাতাগ" (একপ্রকার রেশমের উত্তরীয়) প্রদান করেন। সকলেই জানেন, পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কি অধ্যাপনা, কি বিদ্যাচর্চ্চা, কি প্রবন্ধ প্রণয়ন ও কি পুস্তক রচনা, সকল বিষয়েই খ্যাতি অসাধারণ। তজ্জন্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার সাহেব ইহাঁকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদানের জন্য পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ইহাকে "মহা-মহোপাধ্যায়" উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসরেই বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জয়েণ্ট ফাইলোলজিক্যাল সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রদান করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে উহার ফল বাহির হইলে ইনি "ডক্টর অফ ফিলসফি" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইউনির্ভাসিটির নূতন বিধি অনুসারে ইনিই প্রথমে পরীক্ষা দিয়া এই উপাধি লাভ করেন। এবং ঐ সময় গ্রীফিথ্ প্রাইজও লাভ করেন।

১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি বিশেষভাবে পালিভাষা ও বৌদ্ধ দর্শন শিক্ষার জন্য সিংহলে, বেদ ও হিন্দু দর্শন শিক্ষার জন্য বারাণসী ধামে ও ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার জন্য একজন ভাষাতত্ত্ববিদের নিকটে ডেপুটেসনে যাইতে আদিষ্ট হন। তাহার পর পণ্ডিত সতীশচন্দ্র ঐ বৎসরের জুন মাসে সিংহলে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক সুমঙ্গল মহাস্থবিরের (সুমঙ্গল মহাবেরোর) নিকট অধ্যয়ন করেন। অনুরোধপুর, ক্যাণ্ডি, গল, কলম্বো (রাজধানী) প্রভৃতি স্থানে তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্যক্তির দ্বারা আহূত হইয়া পণ্ডিত সতীশচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে সকলেই অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক সভায় আশাতিরিক্ত জনতা হইত। সিংহলের শিক্ষিত নর নারীগণ পণ্ডিত সতীশচন্দ্রকে আপনার লোক মনে করিতেন।

সিংহল হইতে প্রত্যাগত হইয়াই ইনি বারাণসী ধামে গমন করেন। তত্রত্য কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ছয় মাস কাল বারাণসীধামে অবস্থান করেন। সেখানে মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট শ্রুতি ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতাচার্য্যের নিকটে রামানুজ দর্শনের মত, পণ্ডিত জীবনাথ ঝাঁ ও পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের নিকটে ন্যায় দর্শনের আলোচনা করেন এবং মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকটে সকল বিষয়েই দুরূহ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতেন।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া থিবো সাহেবের নিকট জার্ম্মান ভাষা ও ইউরোপীয় দর্শনের চর্চ্চা করেন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও সংস্কৃত বোর্ডের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষায়

লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ইনি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নবপ্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে তিব্বতীয় ভাষায় পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং পাঁচশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বৎসরেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিশনের অন্যতম মেম্বর নিযুক্ত হইয়া উহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন। ৯১২ খ্রীঃ অব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র অল-ইণ্ডিয়া-দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বারাণসী ধামে সমাহূত বিরাট সভার সভাপতির পদে বৃত হন ও "সিদ্ধান্ত মহোদধি" উপাধি লাভ করেন। ঐ সভায় জার্ম্মাণ পণ্ডিত প্রোফেসর জ্যাকবি উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি অল্‌ইণ্ডিয়া-শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজপুতনার যোধপুর নগরে সমাহূত বিরাট সভার সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯১৪ খ্রী অব্দের জুন মাসে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি-এইচ-ডি, আর্য্যাবর্ত্তের হরিদ্বার মহাতীর্থে যাবতীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সমাহূত নিখিল সংস্কৃত সমিতি (All India Sanskrit Conference) নামক মহাসভার সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা বাদে তিনি যশোহর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহার প্রণীত কতকগুলি গ্রন্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল !—বাঙ্গালা গ্রন্থ— (১) আত্মতত্ত্ব প্রকাশ (২) ভবভূতি, (৩) বুদ্ধদেব। সম্পাদিত সংস্কৃতগ্রন্থ।—(১) লঙ্কাবতার সূত্র, (২) শ্রদ্ধরা স্তোত্র (৩) ন্যায় প্রবেশ, (৪) পরীক্ষা মুখসূত্র, (৫) অবদান কল্পলতা। পালি গ্রন্থ !— (৬) কাচ্চায়নের পালি ব্যাকরণ। তিব্বতীয় গ্রন্থ ঃ—(৭) থাছোই। (৮) সো—সোর—থোর পা। (৯) সিতুই তুম—তাগ (১০) অমর কোষ (তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত) (১১) অমর টীকা, কামধেনু। ইংরাজী গ্রন্থঃ—(১২) গ্রীম্‌স্-ল। (১৩) মিডিভ্যাল লজিক,(১৪) বাৎস্যায়ন ভাষ্যানুসারে গোতম সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ। (১৫) সংস্কৃত রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ। এতদ্ভিন্ন ইনি ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি,বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি, বুদ্ধিষ্ট টেকস্‌ট্-বুক সোসাইটি প্রভৃতির জার্ণালে ও অধিকাংশ বাঙ্গালা মাসিক পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিগত তিন বৎসর ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার পত্রিকাধ্যক্ষ ও ১৮ বৎসর বুদ্ধিষ্ট টেকস্‌ট্ সোসাইটীর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। *

---

* তিনি নব্যভারতের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন, তিনি নিম্নলিখিত গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ নব্যভারতে লিখিয়াছিলেন, ১৩০১—অগ্রহায়ণ, আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহতত্ত্ব, ১৩০২—শ্রাবণ, সংসার দুঃখ ও মুক্তি, ১৩০২ আশ্বিন এবং কার্ত্তিক, জন্মান্তর সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের মত ১৩০৪—চৈত্র, পঞ্চস্কন্ধ ও প্রপঞ্চস্কন্ধ, ১৩০৫—আশ্বিন, নির্ব্বাণ, ১৩০৬—পালিভাষা, শ্রাবণ, ধম্মপদ ; আশ্বিন—কালিদাসের সমসাময়িক দিঙ্‌নাগ ; ১৩০৭ আশ্বিন, বুদ্ধ, দেবের জন্মকথা, ফাল্গুন,দেবদূত, ১৩০৮—বৌদ্ধধর্ম্ম সমালোচনা, ১৩১০—জ্যৈষ্ঠ, মৌর্য্য বংশের উৎপত্তি, ১৩১২—মাঘ একখানি তিব্বতীয় বৌদ্ধফলক। তিনি কেবল যে নব্যভারতের বন্ধু ছিলেন, তাহা নহে ; আমাদের পরম সহায় ছিলেন। তাঁহার নিকট সে সদ্ভাব ও ভালবাসা পাইয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিব না। আশ্বিন মাসে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে আমাদের পুরীর "কামিনী কুটীর" তাঁহাকে দিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমরাও পুরীতে ছিলাম। দেশোন্নতি সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা

এইরূপে বিদ্যানুশীলনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে, ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হন। তাহার বন্ধু বান্ধব ও ডাক্তারের পরামর্শানুসারে তিনি বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে তিন মাসের ছুটী গ্রহণ করেন। তিনি এতদূর কর্ম্মপ্রিয় ছিলেন যে, ছুটির তিন মাস কাল কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে অতিশয় কষ্ট বোধ করায় ৬ই এপ্রিল তারিখে তিনি পুনরায় স্বকার্য্যে যোগদান করেন। অতিরিক্ত কর্ম্ম হেতু তিনি ২৫শে এপ্রিল (১৯২০) রবিবার বেলা ২টার সময় হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগকর্ত্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। কলিকাতার চিকিৎসকগণের এবং তাঁহার বন্ধুগণের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি ঐ দিবস রাত্রি ৯টার সময় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে—তাঁহার বন্ধুবর্গ সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ হর্ণেল, সিংহলের বৌদ্ধ হাইপ্রিষ্ট্-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার শোকগ্রস্ত পরিবারের নিকটে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু বাঙ্গালা কেন, সমগ্র শিক্ষিত-জগতের একটী মহা ক্ষতি হইল।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বহু পরিশ্রম ও বহু গবেষণা করিয়া 'History of Indian logic, নামক একখানি বিশাল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে পুস্তকখানি যদিও সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইল না, ইহা অতীব দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু তাঁহার এই শেষ পুস্তকখানি এমন অনুশীলন ও গবেষণার ফল যে, শিক্ষিত সমাজে ইহা নিশ্চয়ই আদৃত হইবে এবং তাঁহার শেষ জীবনকে উজ্জল করিয়া রাখিবে।

ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জীবনের সম্বল হইয়া রহিয়াছে। যেমন তাঁহার অগ্রজ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন, তেমনি তিনিও ছিলেন যেন মাটীর মানুষ। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে অহঙ্কার ছিল না, সদ্ভাবে কৃত্রিমতা ছিল না, দেশানুরাগে কপটতা ছিল না, ভালবাসার আধিলতা ছিল না। তাঁহারা এই সকল চরিত্রগুণে সকলের হৃদয়ে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ই অজাত-শত্রু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষাকে এমন ভালবাসিতেন যে,তাহাতে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেন। এ দেশের এমন কোন সদনুষ্ঠান ছিল না, তাহাতে তাঁহাদের প্রাণের যোগ ছিল না। ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার দুই জনই আজীবন-সভ্য ছিলেন। এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় দুই জনই মৃত্যু পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। দুই জনই প্রাণ দিয়া, অর্থ দিয়া, পুস্তক, গায়ের রক্ত দিয়া সভার সেবা করিতেন। যেমন উদারতা তেমনি সচ্চরিত্রতা, যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি পবিত্রতা—উভয়ে যেন ছিলেন, সোণা সোহাগা। ফরিদপুর এরূপ লোকের অভ্যুদয়ের কারণ হইয়া ধন্য হইয়াছে। ফরিদপুরের দুর্ভাগ্য যে, দুই জনই অল্প বয়সে একই সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সতীশচন্দ্র জীবনের শেষ দিন কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া উগ্র ঔষধ সেবনে যে বমন করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেই শিরা চিড়িয়া যায় এবং অজ্ঞান হইয়া পড়েন। কবিরাজী চিকিৎসার কলঙ্ক ঘোষণা করিবার জন্য এই ঘটনা যেন ঘটিয়াছিল। সতীশচন্দ্রের অসাময়িক তিরোধানে বাঙ্গালার যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে কি না সন্দেহ। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা সকলেই হাহাকার করিতেছি। এই দারুণ শোকে বিধতার শান্তিধারা বর্ষিত হউক।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে।

১

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার!
বিধির দারুণ বিধি
একে একে স্নেহ-নিধি
চলে যায় বক্ষ তব করি অন্ধকার!
একটী প্রাণের ক্ষত
না শুকাতে বজ্র শত
অলক্ষিতে মহাকাল হানে দুর্নিবার!
না ফুরাতে অশ্রুরাশি,
অশ্রুর প্লাবন আসি'
ভাসাইয়া আশা-শান্তি তুলে হাহাকার!
একি অভিশাপ কার,
বুঝি না যে মা আমার!
সোণার সংসার তব হল ছারখার!
কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার!

২

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার!
বিদ্যা আর বিনয়ের
বিগ্রহ যে জগতের,
ঔদার্য্য ও সারল্যের পূর্ণ-অবতার,
সদাচারী, ধর্ম্মপ্রাণ,
কর্ম্মপ্রিয় সুসন্তান,
আচার্য্য সতীশচন্দ্র নাহি আজি আর!
প্রন্নস আননখানি,
গম্ভীর প্রশান্ত বাণী,
দুর্লভ যে হ'ল আজি দগ্ধ বসুধার!
জীবনের অর্দ্ধপথে,
অসমাপ্ত পুণ্য-ব্রতে,
অস্তমিত দীপ্ত রবি মূর্ত্ত-প্রতিভার!
কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার!

৩

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার!
তব বাণী-তপোবনে
তোমার অশ্রুর সনে
মিশাব আমরা আজ অশ্রু-পারাবার!
সজ্জন-স্বজন-হারা
মর্ত্ত্যভূমি অন্ধকারা,
শোকার্ত্তের আর্ত্তি বুঝি নহে ঘুচিবার!
গৌরবের জয়-কেতু
সৃষ্ট শ্মশানের হেতু!—
এসেছি তা' উৎসর্গিয়া—একি ভুলিবার!
শান্তি-সান্ত্বনার কথা
কহিবে কে আজি বৃথা—
অন্তরে গৈরিক-স্রাব গর্জ্জে অনিবার!
কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার॥

৪

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার!
কাঁদ রবি-শশী-তারা,
কাঁদ বায়ু ক্ষিপ্ত পারা,
কাঁদ কাঁদ স্রোতস্বিনী প্লাবি' উভ ধার!
বিহঙ্গের গীত-স্বরে
পড়ুক রে অশ্রু ঝরে,
বহুক প্রসূন-হাসি শোক-সমাচার!
অমর সতীশ নাই!
তমাচ্ছন্ন চারি ঠাঁই!
বিশুষ্ক নির্ঝর বিশ্বে প্রীতি-মমতার।
কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা,
অশ্রুর তর্পণ-গাথা
রচে আজি দীন কবি দীনা চট্টলার
মিশাইয়ে মর্ম্মভেদী অশ্রু আপনার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সম্বণিকা।

—*—

(১)

এতদিন পর, হণ্টার-কমিসনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এ দেশের প্রবাদ এই, "যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।" এ রিপোর্টেরও সেই দশা হইয়াছে। ডেইলি নিউস বলেন—"রিপোর্ট "White-washy" ধরণের হইয়াছে।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এইরূপই হইবে। ইংলণ্ড এখন কোন্ পথে চলিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বার্ক, পীটের রাজত্ব আর নাই,—এখন সব শেয়ালের এক ডাক। ভাল যে, এখন সকলেই ধরা পড়িয়াছেন। পাচাটাচাটি ইহাতে যদি কিছু কমে। দেশীয় কমিশনারগণ স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারাও সত্যগ্রহের দোষ দিয়াছেন। ইংরাজেরা বলেন, তেমন অন্যায় হয় নাই, দেশীয়েরা বলেন, খুব অন্যায় হইয়াছে। আর মণ্টেগু বলিতেছেন—"বেশী অন্যায় হয় নাই, এখন চুপ চাপ থাকাই ভাল।" তথাস্তু!! চুপ চাপ না থাকিয়া আমরা করিবই কি? ভারতের অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে, কোন্‌টা আমরা হজম করি নাই? কোন্ সমস্যার সদুত্তর মিলিয়াছে? ন্যায় ও অন্যায়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ—এ সকলের বিচার ভুলিয়া গিয়া আমরা ভ্যাবাগঙ্গারাম সাজিয়াছি। হায় জালিয়ানওয়ালা-বাগ—তুমি এখন স্মৃতি-চিহ্ন-অঙ্কে ধারণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়! গান্ধি ঘুমান, তিলক প্রায়শ্চিত্ত করুন, সুরেন্দ্রনাথ ঝগড়ার পুটুলি বাঁধুন, সিংহ লাটগিরির স্বপ্নে মাতুন, আর আমরা সুখ দুঃখ ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়ি!! যাহা হওয়ার হইয়া দিয়াছে, আর কি বাকী আছে! অশ্রু, দয়া মায়া ভুলিয়া তুমিও এখন অক্ষি-কোটরে লুকাইয়া থাক বা শুকাইয়া যাও!

(২)

সাহেবের গা-চাটাপাটি আর ভাল লাগে না। আমাদের কোন ক্ষমতা নাই যখন, তখন নীরব হইয়া যাওয়াই ভাল নয় কি? তুর্কীর ভাগ্যে যাহা ঘটিকা তাহা ঘটিয়াছে, এখন নিজাম বলেন, আর গোলমালের প্রয়োজন নাই, আবার পাচাটাচাটি আরম্ভ কর। পরন্তু গোমালকারীদিগকে শাস্তি দিতেছেন! পাচাটাচাটিকে এ দেশে যে যত সিদ্ধ, তাহার মান গৌরব তত অধিক। পাচাটাচাটি দিন আরো ঘনাইয়া আসিতেছে, কেন না ফিররম স্কিমের নূতন নির্ব্বাচন সন্নিকট এখন যাহার যত ক্ষমতা—তাহা লইয়া আসরে নামিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আর পাচাটাচাটি ভাল লাগিতেছে না মডারেট-দল তাহাতে দিন দিন সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। তুর্কীর কথা এখন ধামা চাপা দিয়া, নব তেজে, নব গৌরবে সকলে সাজিবার জন্য আহ্বান আসিতেছে। এই সঙ্কটে তুমি কি করিবে?

(৩)

গ্রামে গ্রামে সভা বসিতেছে, আর তুমি উল্লাসে প্রমত্ত হইতেছ? সংবাদ

কি কত পরস্ত্রী-হরণ হইতেছে, কত ব্যভিচারীর বুক ফুলিতেছে, কত অত্যাচার দিক্‌দিগন্তে ছুটিতেছে,—কত অত্যাচার, লুণ্ঠন, ও লাঞ্ছনা অস্ত্র শানাইতেছেন। নিরীহ লোকদের আর গ্রামে বাসের স্থান নাই, সদা অত্যাচারের ভয়ে তাঁহারা ম্রিয়মাণ। রায়ত-সভার কথা শুনিতে ভাল, বলিতে ভাল, প্রচার করিতে ভাল; কিন্তু রায়তদের নীতি হীন চরিত্রের জাগরণ দেখিতেছ কি? ক্রমেই এ দেশে জাগিতেছে অবাধ ডাকাতি, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, দুষ্কার্য্য,—আরো কত কি? এখন যাইতে পারিলেই ভাল হইত, আর সহ্য হয় না! ভেদাভেদ-যজ্ঞে কে জীবনাহুতি দিবে? যে জাগে, সে জাগুক। নব নির্ব্বাচন যুদ্ধের সময় আজ দল বেদল সাজ, সাজ, সাজ!

(৪)

সে কালে ছিল, আমি না, তুমি; একালে ধ্বনি উঠিয়াছে, তুমি না, আমি। এদেশের ঋষি যুগের লোকেরা আত্ম-বিলোপের জন্যই চেষ্টা করিতেন; এ বাহ্যাড়ম্বর-যুগে আত্মা-পোষণেরই সর্ব্বত্র চেষ্টা! প্রাচীন কত ঋক, কত গাথা, কত কথা, কত উপদেশ, কত সূত্র এদেশে প্রবর্ত্তকের বা প্রতিষ্ঠাতার নামহীন হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, আর এযুগে "উহারা কিছুই নয়, আমরাই সকল করিয়াছি"—এইরূপ আত্ম-বাণীই ঘোষিত হইতেছে। গান্ধী বড়, না তিলক বড়? সুরেন্দ্রনাথ বড়, বা সি-আর্-দাস বড়? এসব কথার বাকচাতুর্য্য আর ভাল লাগে কি? হণ্টার রিপোর্ট দেশকে মসীসম কাল করিয়াছে, তুর্কীর নির্দ্ধারণ এদেশকে একেবারে মাটীতে মিশাইয়াছে, এখন "আমি বড়, আমি বড়"—একথা আর শুনিতে চাহি না। বড় তোমরা সকলেই, কিন্তু কেহই ত দেশকে রাখিতে পারিলে না, এই যা দুঃখ! সিংহ, বসু, ঐ যে, সদর্পে আজ দলে মিশিয়াছেন! আর কিসে বড়াই করিবে? কাহার গুণ গাইবে?

(৫)

কথা এই—পাপকে তুমিও না, আমিও না, কেহই দমন করিতে পারি নাই, পারিতেছি না, পারিব না; এমন কাপুরুষ মুখে সকলকে এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে। আস্ফালন ছাড়িয়া এখন নীরবতা অভ্যাস করে। কিসের কিফরম স্কিম, কিসের জয়োল্লাস! সে কেবল পাপেরই কারণ, অসুরদের দুর্জ্জয় প্রতাপ ঘোষণারই সংকল্প। জানিয়া রাখ, বেসেণ্টও নয়, চেমস্‌ফোর্ডও নয়, মণ্টেগুও নয়—কেহই তোমাদের বন্ধু নয়। ফণীর ফণা বিস্তারিত হইয়াছে, এমন তুমি, আমি ও সে—সকলকে বিষে জর্জ্জরিত হইতে হইবে। প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও। নিজের পাপকে নিজে দমন করিতে শেখ, নচেৎ আর কিছুতেই আশা নাই। শক্তি-শেল বাণে সকলের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, হায়, এ হেন দুর্দ্দিনে সংযম-পূত লক্ষ্মণেরা কোথায়?

(৬)

যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহারা বেশ করিতেছেন! এত যন্ত্রণা সহ্য করা সহজ কি? দিন দিনই বঙ্গের মহারথীগণ চলিয়া যাইতেছেন, জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইতেছেন, আর আমরা পড়িয়া রহিলাম কেন? রহিলাম শুধু কেবল ভারতের দুর্দ্দিন দেখিতে!! এই যে উৎকলের একাঙ্গ পুরীর দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতেছি, আর প্রাণ অস্থির হইতেছে, কিছুই ত করিতে পারিতেছি না!

TIGHT BINDING

বার্দ্ধক্যে শরীর অবসন্ন, অর্থহীন, সামর্থ্যহীন, সহৃদয়তা-হীন, পড়িয়া পড়িয়া কেবল চক্ষের জলে ভাসিতেছি। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু সিংহ, শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস, শ্রীযুক্ত পুরীর পুলিশ সুপারিনটেডেণ্ট মহোদয় প্রভৃতি ব্যক্তি কত চেষ্টা করিতেছেন, আমরা নিষ্ঠ হইয়া আছি! ইচ্ছা, ছুটিয়া সেখানে তাদের সাহার্য্যার্থে যাই, কিন্তু শক্তিতে কুলায় না! বিধাতা পুরীর দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদিগের সহায় হউন।

(৭)

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭, বৃহস্পতিবার, ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দিন গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শান্তিকুটীরে উপাসনা ও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় তদীয় জীবনের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। এতদিন পর, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিতেছেন, তাহাতে আমরা বড়ই আনন্দিত। কিন্তু লোক এত অল্প কেন হইল, তাহাই ভাবিতেছি। শুনিয়াছি, ৺উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দও মহাযাত্রার পূর্ব্বে প্রতাপবাবুর প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া অনুশোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তবুও এই মহাত্মা উপেক্ষিত কেন? কেশবচন্দ্রের পর প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও এমেরিকায় তাঁহাকে বহু বহু পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে এরূপ কেন হইল? এক দ'লো ভাবই ইহার কারণ। প্রতাপচন্দ্রের প্রতি যে অবিচার হইয়া গিয়াছে, এ দেশে একালে তেমন আর কোথাও হয় নাই। এরূপ উপেক্ষিত, অপমানিত, নির্যিত এদেশে এ যুগে আর কেহই হন নাই। ব্রাহ্মসমাজের এ কলঙ্ক কখনও ঘুচিবে না। কামাখ্যানাথ ও জগন্মোহনের প্রতি প্রতাপ-মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য অত্যাচার না হইলে হয়!

জাগরণ।

শত যুগ পরে মধ্যপথে
ভারতের মহাপ্রাণ হতে
মহাগান এক উঠেছে জাগিয়া।
প্রভাতের প্রথম আলোকে
নিদ্রালস্য ভাঙ্গিয়া কুহকে
জাগরণ-গীত উঠেছে বাজিয়া॥ ১
'জেগে ওঠ কুমায়ো না আর—
দীক্ষা লও আগুন খাবার,
মিলনের মহামন্ত্রে স্নান করি'।
মিলে জুলে করে যাও কাজ—
হার জেত—হবে নাকো লাজ—
মহামন্ত্র এই প্রাণে লও ভরি'॥ ২
জমীদার প্রজা কেবা কোথা—
বুঝি' লয়ে কিসে কার ব্যথা—
প্রেমের বাঁধনে বাঁধগো সবারে।
শুনোনা শুনোনা কারো কথা—
বাস্তভিটাহীন যারা সদা—
প্রাণের বাঁধন চাহে টুটিবারে॥ ৩

আর না—আর না—বহায়ো না
রুধিরের স্রোত; আনিও না
বিবাদ বিচ্ছেদ যতেক অপ্রেম।
তাহে শুধু জানিও নিশ্চয়
হবে ঘোর শক্তি-অপচয়;
হবে না কল্যাণ; দূরে যাবে ক্ষেম॥ ৪
জমীদার প্রজা শুধু কেন—
কতবিধ লোক আছে জেনো
সকলেরি প্রাণে দেখি জাগরণ।
এধারে ওধারে চারিধারে,
ক্ষেত্রধারে নদীর কিনারে,
ঢেলে দেয় প্রাণ যুগের নূতন,
কল-কারখানা শত শত—
মজুর খাটিছে তাহে কত—
দেখিতে পাওনা তাহে কি গো তুমি
শ্রমজীবী কৃষকের মাঝে
স্বরগের আশা ধরে আছে—
মহা জাগরণ মিলনের ভূমি? ৫,৬
আমি তাহে পাই শুনিবারে
ধ্বনি পরে ধ্বনি আসিবারে
মহাজাগরণ মিলনের গীত।
ছুতার কামার কিবা রাজ,
যেখানে যে করে যত কাজ,
সকলেতে গাঁথা জাগরণ-ভিত॥ ৭
দাঁড়ি যবে এক মনে গেয়ে
তালে তালে নৌকা চলে বে'য়ে,
দাঁড় ফেলে অবিশ্রাম ঝপাঝপ,
সবল পেশল মুটে যত
এক মনে ফেলে অবিরত
ধান্যবস্তা পরে পরে ধপাধপ,
তাদের সেই তালের মাঝে
তাদের সেই কর্ম্মের মাঝে
জাগরণ শুনি ঝঙ্কারিছে সদা।
ঘুচে যায় সেই জাগরণে
মুছে যায় মহান্ মিলনে
ছোটখাটো ভেদ মনের পরদা॥ ৮,৯
গাও তবে গাও প্রাণ খুলে,
ভেদাভেদ ভেঙ্গে দিয়ে মূলে,
আমার বুকের বুকচেরা ধন!
অনন্ত জাগরণের গান
মিলনের উন্নতির প্রাণ
প্রাণ মন খুলে গাও অনুখন॥ ১০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **প্রধীককর্ম্মকার বা কর্ম্মার-ক্ষত্রিয়** রায় বর্ম্মণ প্রকাশক, মূল্য ১৲। বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্ম্মকারদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। জাতীয় ইতিহাসের ইহা এক অধ্যায়। এই সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি হউক।

২। A. Short History and Ethnology of the Cultivating Pods. Populer Edition, Ans. 10 only. By Mahendranath Karan. জাতীয়ত্ব বিষয়ক পুস্তক। এপুস্তকে গভীর গবেষণার পরিচয় পাইয়া উপকৃত হইলাম।

৩। **কবিকথা**।—দ্বিতীয় খণ্ড—ভাস। শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ২৲। ৫১৬ পৃষ্ঠায় পুস্তক, মূল্য ২৲। দুর্ম্মূল্য কাগজ ও ছাপার দিনে ইহা কত সস্তা!

ভাসের নাটকাবলী বহু প্রাচীন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিস্তারের পর যে সময়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিকধর্ম্মের প্রাধান্য একেবারে নষ্ট হয় নাই, সেই সময়ে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁহাকে চাণক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন।

ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট ভাসের গ্রন্থাবলীর উদ্ধার সাধন করেন। এখন নিখিলনাথ এই অমূল্য গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়া ধন্য হইলেন। এই সব গ্রন্থের অনুবাদ ইহাতে আছে—

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসব দত্ত, অবিমারক, চারুদত্ত, প্রতিমা, অভিষেক, বাল-চরিত, মধ্যম, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য, দূত-ঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ! এই গ্রন্থে এই সব চিত্র আছে—স্বপ্নালাপ, প্রিয়তমাদর্শনে, অলঙ্কারন্যাস, প্রতিমাদর্শন, রাসলীলা কেবচদান।

নিখিলনাথ রায় বঙ্গদেশের একজন প্রধান ঐতিহাসিক। তাঁহার গবেষণায় বহু পরিচয় আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থ-সকলের উদ্ধার-সাধন করিয়া গ্রন্থ-কার বাঙ্গালা ভাষার মুখ উজ্জ্বল করিলেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাক্ বিক্রয় করিয়া মহা ধনী হইলেন, নিখিলনাথ তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা হেয় নহেন, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে এহেন ব্যক্তির আদর নাই। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রভূত অধিকারের পরিচয় পাইয়া আমরা তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় গ্রন্থকার বাঙ্গালার গৌরব। গল্প-প্রধান-যুগে তাঁহার গ্রন্থের আদর না হইলে আমরা মর্ম্মে মরিয়া যাইব। বাঙ্গালার অধিকাংশ মাসিকে প্রতি মাসে ৫।৬টী করিয়া গল্প প্রকাশিত হইতেছে, এবং তাহা বাজারে খুব কাটিতেছে। এই কবিকথা এ হেন বাঙ্গালায় আদৃত না হইলে বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

৪। **সত্যানুসরণ**। প্রকাশক, শ্রীঅতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথায় অতি সুন্দর উপদেশ। এরূপ উপদেশপূর্ণ বিবৃতি সচরাচর দেখা যায় না, যেন রাম-কৃষ্ণ-কথামৃত। যে মহাত্মা হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাকে শত প্রণাম।

৫। **শিশুপালন**। ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম-বি, মূল্য ॥০ আনা! স্বাস্থ্য সমাচার পুস্তিকা নং ৩। এই পুস্তকখানি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। এদেশে শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশু-পালনে অজ্ঞতা বশতঃই এরূপ হইতেছে। এই একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া শিশু রক্ষা কল্পে জননীগণ চেষ্টা করিলে অনেক সুফল পাইবেন। ঘরে ঘরে পঞ্জিকার ন্যায় এই পুস্তক প্রচলিত হউক।

৬। **জাতিভেদ**। শ্রীদিগিন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১॥০। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। দেখিয়া সুখী হইলাম যে, অল্প দিন মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। দিগিন্দ্র নারায়ণের ন্যায় মহনুভব ব্যক্তির মহা সাধনার ফল এদেশে ফলুক।

বিষ্ণুপদ।

(১৩২৬ চৈত্র মাসের নব্যভারতের ৫৫২ পৃষ্ঠার পর)

দেব দেবীকে সুবিধা বুঝিয়া আপনাদের ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া নিজদের ধর্ম্মের যে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিঃ থিওডোর ব্লক্, মিঃ ফারগুসান প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ এইমতের পোষকতা করেন। বিষ্ণুপদের মন্দিরের নিম্নে "শ্মশান ঘাটের" উপরে গোয়ালিয়ার মহারাজের ধর্ম্মশালা বা ছত্র। বিষ্ণুপদের মন্দির, ষোল বেদীর মণ্ডপ, এবং অহল্যাবাইর মন্দির ১৭৯৫ সালে মহারাষ্ট্রকুলগৌরব প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাই নির্ম্মাণ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বিষ্ণুমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ চত্বরে কয়েকটী প্রাচীন শীলালিপি আছে। আমার বাটীর সম্মুখস্থ শীতলা দেবীর মন্দিরের কথা, যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাহার মধ্যেও শীলালিপি দেওয়ালে গ্রথিত আছে; এইসকল গুলি যথা স্থানে পরে বিবৃত করিতেছি। বিষ্ণু-পদ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে নরসিংহ দেবের মন্দিরগাত্রে অর্থাৎ "ষোলবেদী" তীর্থের সন্নিকটেই দেওয়ালে একটী বৃহৎ প্রস্তরলিপি আছে। ইহা ষোল পংক্তিতে লিখিত। এই শীলালিপিতে "শ্রীনারায়ণ পাল" দেবের নাম দৃষ্ট হয়। ইহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ যুগেও যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। ডাঃ কানিংহ্যাম তাঁহার তৃতীয় ভাগ আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভেরিপোর্ট পুস্তকের ১২০ পৃষ্ঠায় ইহার বিষয় সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার—"বঙ্গের পালরাজগণ পর্য্যায়ে" বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটির মেমোয়ার পুস্তকের পঞ্চম ভাগের ৬০ পৃষ্ঠায় ইহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এইরূপ—নারায়ণ পাল দেবের বিষ্ণুপদ-লিপিঃ—

১। ওঁ নমো পুরুষত্তমায় নমঃ॥ ওঁ জয়তি জগতিনাথঃ প্রস্ফুরচ্চারুমূর্ত্তি রজগদরি বিনিহন্তা শ্রীমদেকো মুরারিঃ, তদনু মুনিজ-নোহয় (ম্) স্থির সংক্লেশ রাশিঃস্ফূর

২। দ্ অমল গুণায়ম্ ধ্যানাবৃত্তো স্থিরাত্মা॥ প্রোদ্ভূ-তাতিদর্প প্রবল মনসন্ত্রাস হেতুস্বভাবম্ কৃত্বৈতন্নারসিংহংস্ফুট বিকট সটং রূপ মত্যুগ্র রৌদ্রং।

৩। নো দীর্ণঃপৃথিব্যাম্ খরনখর করৈর্ভে-দিতোদৈত্যরাজঃ শ্রীমন্লোকৈকনাথো ভুবন হিত বিধাতা পাতুযুষ্মান্স বিষ্ণুঃ, শ্রীমানশেষ শুভসম্ভূত চারুম্।

৪। স্তিঃভদ্রঃ সুনির্ম্মলধিয়াম্ প্রবরো শ্রীগ্রহ (?) প্রাপ্তো দয়াদিতকুলে সুকৃতি বভূবযো বামদেব ইতি সর্ব্বজগৎ প্রতীতঃ, তস্যাত্মজঃ প্রিয়তমো বিদুষাম্সমা।

৫। সীৎযম্সিংহদেবম্ ইতি বন্ধু জনো যুহাব [1] তস্যা—ভবৎ সুতবরোবরধর্ম্মবৃত্তিঃ সম্মানিতো গুরুজনৈরপি বপ্পদেবঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধি করাণে কনিধানভূতাসৌ,—

৬। সৌন্দর্য্যগর্ভ রুচিরামলরূপসম্পৎ। পত্নীচতস্য কমলেব সদা প্রশস্তা, খ্যাতাভবজ্জ-গতি বল্লভদেব্যতীষ্টা॥ ভাভ্যাং অজন্য ম্যজায় তস্যুতোঽমল।

৭। ধর্ম্মবৃত্তি—

র্বাক্যায়চিত্ত কৃতসংযমনোভিমানী—। ব্রহ্মো-
৮
পবীত চরিতে ব্রতসঙ্গতে শ্রী—র্যোভাগুদেব
ইতি পূর্ব্বে মিহ প্রতীতঃ ॥ বিদ্যাল্লোলাংক্ষণ
পরিণতিম্।

৮। সংস্কৃতানাম্ বিদিত্বা, যন্মো শ্রীসাদ
মলভুবন প্রাপ্তমভ্যুদ্গতেন, যেনাত্যর্থম্
সুকৃত মতিভিঃ সেবিতে ধ্যানমার্গে চেতোন্যস্তং
৬
সুবিমল মলং জ্ঞানমাস্বাদনায় ॥

৯। তেনানেক দ্বিজজনভুমি প্রেমবৃত্ত্যা
গয়ায়াং শ্রীমাদেষোযতিষু বিহিতঃ সদ্গুনাবাস
বাসঃ। জ্ঞাতং শ্রেয়ো যদমলগুণং ব্রহ্ম-
চর্য্যাশ্রমেণ, স্তেনা।

১০। স্তত্জগমলিনং ক্ষীণসংক্লেশরাশিঃ ॥
চাতুর্ব্বিদ্যং সমস্তং প্রশমিতকলুষং ব্রহ্মসংন্যস্ত
বৃত্তিং শ্রীমন্তং সৎক্রিয়াত্মা প্রথিত পৃথুগুণং
প্রার্থয়র্ত্তেষমৌনী।

১১। ভূয়াল্লোকোহমিতশ্রীঃ পরকৃত
সুকৃতৈঃ পালনে রক্ষণে চ তৎকর্ত্তব্যং ভবদ্ভিঃ
৭
স্থির বিমল গুণঃ স্যান্নিবায় যথায়ম্।

১২। সদ্বৃত্যামল বৃত্তিভিঃ স্ফুটতরং জাতা-
৮
দরৈঃ সর্ব্বতঃ। (এইখানে তিন চরণ নাই,
তাহা পতন হইয়াছে।) সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ
পার্থিবেন্দ্রান্, ভূয়ো ভূয়ো যাচতে এষ মৌনী।
সামান্যোহয়ং ধর্ম্মসেতু নৃপানাং কালে কালে
৯
পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ ॥ * ।

ব্যঙ্গানার্য্য বহিস্তপোধন জনৈঃ স্থাতব্যমত্রা
শ্রমে। ইত্যেতৎ ব্রতধারিভিনিয়মিতং ভূয়া-
দ্যথানান্যথা কর্ত্তব্যন্তদিহামলং প্রিয়তমৈর্বি-
১০
প্রৈর্গয়াবাসিভিঃ ॥ স্ফুরতুকীর্ত্তিরিয়ং গুণ
শালিনী সকলসত্ত্বহিতোদয়হেতবে। তপতি
যাবদয়ং ভুবিভাস্করো হিমকরেণ সহামল
১১
দীধিতিঃ ॥

শ্রীনারায়ণ পাল দেব ইতি সম্প্রাপ্তোদয়ো
ভূপতির্ভূতংভূমিভুজাং শিরোভিরমলং যস্যোচিত
শাসনং। রাজ্ঞস্তস্য গুণামলস্য মহতঃ সং-
বৎসরে সপ্তমে বৈশাখ্যাং শুভসং ভূতেন বিধিনা
লব্ধ প্রতিষ্ঠো মঠঃ ॥ ।

* এই সুন্দর লিপি বম্বাই হইতে প্রকাশিত প্রাচীন লেখমালায় পরিদৃষ্ট হয়। এই লেখা বিজয়-পুর রাজোর "রামচন্দ্র" নামক কোন প্রাচীন রাজার গুণকীর্ত্তন করিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ভাণ্ডদেব তাহা নিজ মঠে পাঠ বিকৃত ও ছন্দ পতন করিয়া তদনুকরণে সংযোজিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্র.চ-স—

† মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—এই লিপির ভাষা অতিশয় অশুদ্ধ ও ভ্রমপূর্ণ সংস্কৃত হইতেছে। বৌদ্ধযুগের নেপালি পুঁথী ও শিলোল্লেখে এইরূপ প্রমাদপূর্ণ ভুল সংস্কৃত লিখিত বহু হস্তলিপি দৃষ্ট হয়। রাজা নারায়ণ পাল দেবের রাজ্যকালের সপ্তম বর্ষে বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীগণের হিতার্থে ভাণ্ডদেব নামক যতিদ্বারা নির্ম্মিত একমঠের বিবরণ এই লিপিতে পরিদৃষ্ট হয়। ইহা এখন বিষ্ণুপদ মন্দিরের অন্তর্গত তৎসন্মুখবর্ত্তী নরসিংহ দেবের মন্দিরের গাত্রে আঁটা আছে, পরিদৃষ্ট হয়। এই নরসিংহদেবের মন্দির মহারাজ নয়পাল দেবের রাজত্বকাল মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে অনুসরণ করিয়া ডাঃ কানিঙ্গহ্যাম ও মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, ভাণ্ডদেব কৃত মঠের সন্নিকট বা সান্নিধ্যে এই নরসিংহ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা কালে অসংস্কৃত হইলে মহারাজ নয়পাল দেব তাহা পুনর্গঠন বা পুনঃসংস্কৃত করেন। এই মন্দিরনির্ম্মাতার পূর্ব্বপুরুষ বামদেব ছিলেন; তাঁহার পুত্র "সিংহদেব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু মূল লিপিখানির "২" (০) "খানি কালের শাসনে লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া রাখাল বাবু তাঁহার "পালস্ অব বেঙ্গল" নামক পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় "সিংহ-দেবের স্থলে "সিহদেব" লিখিয়াছেন। আমি খুব যত্ন সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ এই লিপির সকল অংশ পরিদর্শন করিয়াছি। ইহা আমার গয়ার বাটীর সন্নিকট। লিপীটী দেখিয়াই তাঁহার ২ (০) টি কালের শাসনে লুপ্ত হই-য়াছে, বলিয়াছি। মদ্বন্ধু পরলোকগত পর-মেশ্বর দয়ালকে এই অংশটী দেখাইয়াছিলাম। তিনিও এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রশস্তি বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তির আরাধনার সহিত আরম্ভ হইয়াছে। মন্দির-নির্ম্মাতা ভাণ্ডদেবের পিতা বপ্পদেব বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা সিংহদেব সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেই সবিশেষ বলিয়াছি।

আমার মনে হয় যে, এই লিপির ভাষা সাধারণতঃ শুদ্ধ, কেবল যেখানে যেখানে পাঠোদ্ধার করা যাইতে পারে নাই, সেই সেই খানে উদ্ধার-কর্ত্তার ভুল ও প্রমাদ দোষে লিপির পাঠোদ্ধারে ভুল হইয়াছে। এই লিপিতে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ আছে, তাহা পাঠ করিলেই সহজে অবগত হওয়া যায়। যে যে ছন্দ এই লিপিতে সমিবদ্ধ আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। মালিনী। ২। স্রগ্ধরা। ৩। বসন্ত তিলক। ৪। বসন্ত তিলক। ৫। মন্দাক্রান্ত। ৬। স্রাগ্ধরা। ৭। শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। ৮। শালিনী। ৯। শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। ১০। দ্রুত বিলম্বিত।

উপরোক্ত নারায়ণ পাল দেবের রাজ্য কালের সপ্তম বৎসরে উৎকীর্ণ বিষ্ণুপদলিপি ভিন্ন আর একটী লিপি কলিকাতা মিউজিয়ামে পাটনার"ব্রড্লি সংগ্রহ"হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা বুদ্ধগয়ায়, কোন মূর্ত্তির পাদদেশে খোদিত ছিল বলিয়া আমার অনুমান হয়। এই লিপি এখন পঞ্চদশ ভাগ বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ্ পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই লিপির অনুরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। ওঁ সম্বৎ ৯ই বৈশাখ সুদি ৫ পর-মেশ্বর শ্রীনারায়ণ পাল দেব রাজ্যে অঙ্গ বৈষ-য়িক শাক্য ভিক্ষু স্থবির ধর্ম্মমিত্রস্য।

২। যদএপুণ্যম্ তত্তবত্বাচার্য্যোপাধ্যায় মাতা পিতৃ পূর্ব্বঙ্গমম্ কৃত্বা সকল সত্বরাশের নুত্তরজ্ঞানপ্রাপ্তয় ইতি।

ইঁহার রাজত্বের প্রথম লিপি গয়ার গদাধর মন্দিরের নদীর অপর পারে একটী শিবের মন্দিরের দেওয়ালের গাত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ডাঃ কানিংহ্যাম ইহার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। ওঁ সম্বৎ ৮। শ্রীমহেন্দ্র পাল রাজ্যাভিষে।

২। ক সৌদি ঋষি পুত্র সহদেবস্য।

এই লিপি দেখিলে বোধ হয় যে,ইহা নবম বা দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ, এবং তাহা হইলেই মনে হয় যে, প্রতিহার সম্রাট্ প্রথম ভোজ-রাজের পুত্র মহেন্দ্র পাল দেব রাজের রাজত্ব

কালে ইহা উৎকীর্ণ হয়; কিন্তু ইহার কোন স্থিরতা নাই।

সহরঘাটী গ্রামের সন্নিকট শ্রীগুণচরিত বা গুণেরি মঠের সন্নিকটে একটী মূর্ত্তির পাদদেশে নিম্নলিখিত লিপি খানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই মূর্ত্তি এখন কলিকাতা মিউজিয়ামে নীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই লিপি এইরূপ ঃ—

"সম্বৎ ১৯শে বৈশাখ সুদি৫ শ্রীগুণচরিত শ্রীমহেন্দ্র পাল দেব রাজ্যোদ ধর্ম্মোঽয়ং, ইত্যাদি রূপে বৌদ্ধ দান গাথাসহ শেষ হইয়াছে। এ লিপির বিষয় কাপ্তেন কীটো বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ১৬ ভাগে ২৭৮ পৃষ্ঠায় সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রডলি সংগ্রহের মধ্যে প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর-বিহার বা বর্ত্তমান বিহার নগরের ভগ্নাবশেষ গুলির মধ্য হইতে সংগৃহীত এক স্ত্রীমূর্ত্তির পাদ দেশে নিম্নলিখিত পাওয়া গিয়াছিল। তাহা এইরূপে ঃ—"* * রাজ্যে শ্রীরাম পাল দেব, সম্বৎ ২ বৈশাখ দিনে ২৮।" ইহার সন্নিকট বিহার পর্ব্বতের উপর প্রাপ্ত ষষ্ঠী দেবীর মূর্ত্তির নিম্নদেশে এইস্তুপ দুই পংক্তিযুক্ত লিপি পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্ মদন পাল দেব। ২ (বিজয়) রাজ্যে সম্বৎ ৩, বৈশাখ দিনে ২৪॥

গয়ার গদাধরের মন্দিরাভ্যন্তরে একটী চতুর্ম্মুখ স্ত্রীমূর্ত্তির উপরে এই লিপি খোদিত আছে। ইহা ১৫ পংক্তিতে শেষ হইয়াছে এবং "স্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায় রূপে আরম্ভ হইয়া "সম্বৎ ১২৩২ বিকারি সম্বৎসরে শ্রীগোবিন্দ পাল দেব, গতরাজ্যে চতুর্দ্দশ সম্বৎসরে গয়ায়াম্" রূপে শেষ হইয়াছে। বিক্রম সম্বৎ ১২৩২ খ্রীষ্টীয় ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সমান হয়। তাহা হইলে এই লিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দ পাল দেব রাজ্যাধিরোহণ করিয়াছিলেন। "এই লিপির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। মদ্বন্ধু বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Palas of Bengal নামক পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—১। ওঁ ওঁ স্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্দ্ধে—২। বারাহ কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিমে যুগে কলৌ পূর্ব্বে সন্ধ্যায়াং সম্বৎ ১২৩২ বিকারি সম্বৎসরে শ্রীগোবিন্দ পাল দে—৪ বে গতরাজ্যে চতুর্দ্দশ সম্বৎসরে গয়ায়াং॥ বশিষ্ঠ গোত্রোহ ৫। তিপ্তনো দ্বিবেদঃ শ্রীহল্লনোদ [J] সুতসুতংমহান্তং। বিদ্যাধরম্ গুণগ্ গুলিনাং গদাভৃন্মঠ অনাকারিধনা দ্বিজানাম্। ভোক্ষাথমব্দম্ প্র ৭। তিষোড়শৈব কার্ষপন বৃদ্ধিতৈব লব্ধ মূলাঞ্চ পঞ্চাসদ্ ইহাস্তি সাক্ষী পদ্মাভি ধানোঽচ বিশ্বরূপঃ॥ নৃপসিংহ শ্রীধরো দেব ৮। ধরো শ্রীদণ্ড নায়কো বিষ্ণু সেবাকরো চইতৈতপোবন নিবাসিনঃ॥ রাঘবঃ ১০। শ্রীকরোঽসুকো দামোদরকঃ হিধরো ভিখোদেব নিধিধর্ম্মী—

চইতে পাল ১১শ কারিণঃ॥ আচন্দ্রার্কমিমং ধর্ম্মং পালয়িষ্যন্তি যে সুখং। প্রত্যবদন্তে ১২ হশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নুস্তি মানবাঃ॥ আশ্বিনে শুক্ল পঞ্চম্যাং ভোজ্যং যো। ১৩ বার য়েদিদং। লভতে সা বসন্দিগ্ধং মহাপাতক— পঞ্চকং॥৩ প্রশস্তিরিয়ং ১৪। কৃতা শ্রীযুক্তে— ন্দ্রেণ লিখিতাচেয়ং কাজসীয়ী জয়কুমারাভ্যাং॥ ১৫। ওঁ সোমেশ্বরোঽত্রসাক্ষ্যস্তি পদ্মনাভো গয়াদ্বিজ দেবরূপস্য পুরতো দত্তাচৈতে কপর্দ্দকাঃ॥ * গোবিন্দপাল দেবের রাজ্যকালের মধ্যে উৎকীর্ণ আরও কয়েকটী লিপি

* Epi. Ind. Vol. v App. P 24 No. 166. J. R. AS. (N. S.) Vol. Viii P. 3. ৩ অনুষ্টুভ্।

দৃষ্ট হয়। সেই গুলির নিদর্শন রাখালবাবুর "পালরাজগণ" নামক পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বেন্দালের (Catalogue of Buddhist Sanscrit Mss in the University Library, Cambridge) পুস্তক পাঠ করিলে অনেক বিষয় এই সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যাইবে। গয়াসহরের "রামনা" একটী প্রাচীন মঠ (ইহা প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের "রমনক" বা "মৃগদাব" সতীঘাটের সন্নিকট ছিল; তাহা সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই সকল স্থানে এখন ভদ্র লোকদের বসত বাড়া হইয়াছে। আমার বাটী "উমেশলজের" পার্শ্বেই সতীঘাট অবস্থিত ছিল। আমাদের বাটী নির্ম্মাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদের বাটীর স্থানে একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাহার নিম্নে তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের রাজ্য কালের এক লিপি উৎকীর্ণ থাকে। ডাঃ কানিংহ্যাম ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সম্বন্ধে তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে উল্লেখ করেন। আমার পিতা গয়ার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট উকিল ৺উমেশচন্দ্র সরকার গয়ার কালেক্টার মিঃড্রামণ্ড সাহেবকে, তাহা দেন; তিনি তাহা ব্রডলি মিউজিয়ামে পাটনায় পাঠাইয়া দিলে তাহা ১৮৭৫ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্টের হুকুমে কলিকাতার জগৎবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামভুক্ত হইয়াছে। এই লিপি দুই পংক্তিতে নিম্নরূপ ভাবে উৎকীর্ণ আছে ঃ—

১। শ্রীমদ্ বিগ্রহপাল দেব রাজ্যে সম্বৎ ১৩ মার্গ দিনে ১৪

২। দেয় ধর্ম্মোঽয়ং সুবর্ণাকার দেহকস্য সাহে সুতস্য॥

"গয়া কাহিনী" নামক পুস্তকে মদ্বন্ধু অতুলবাবু বলেন যে, বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখস্থ "লাট-মন্দির" কলিকাতায় রাজা ৺রাধাকান্ত দেব প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহা প্রকৃত নহে। ইহার কোন প্রমাণ নাই; বরং রাণী অহল্যা বাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া আমরা প্রমাণ পাইয়া থাকি। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রায় ১৩×৬ ফিট বিস্তৃত একখানি প্রস্তর-ফলকের উপর রৌপ্য-নির্ম্মিত ষোলটী কোণবিশিষ্ট কুণ্ড মধ্যে কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ-শিলার উপর বিষ্ণুপাদ-পদ্ম চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই শিলার অতি প্রাচীন উপাখ্যান হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে; অতুল বাবু ইহার বিষয় বেশ সরল ভাষায় তাঁহার পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। এই শিলাটী অভিশাপে প্রস্তরীভূত মরিচি ঋষির স্ত্রী ধর্ম্মরাজ পুত্রী ধর্ম্মব্রতা। বিষ্ণুর বরে ইহার উপর বিষ্ণু ভগবান পাদ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ইহাকে অত্যন্ত পবিত্র স্থান করিয়া দিয়াছেন। মরিচি ধর্ম্মব্রতাকে কোপে অভিশাপ দেন যে শিলা হও। ধর্ম্মব্রতাও মরিচি ঋষিকে শাপ দিলেন যে, আপনিও মহেশ্বর দ্বারা অভিশপ্ত হইবেন। ধর্ম্মব্রতা কঠোর তপস্যা করিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর লইতে বলিলে, ধর্ম্মব্রতা বলিলেন যে, আমি যে শিলা হইব, তাহা যেন সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, পবিত্র এবং শুভ হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব পদচিহ্ন যেন ঐ শিলাতে অঙ্কিত থাকে, যে কেহ এই পবিত্র শিলায় পিণ্ড দান করিবে, সেই যেন পিতৃগণ সহ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।" বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মব্রতা শিলারূপিণী হইলেন। এই শিলার উপর পিণ্ড দান করায়, যমালয়ে আর কেহ যায় না বলিয়া যমপুরী শূন্য হইলে যমরাজ ব্রহ্মার নিকট গিয়া অধিকার খর্ব্বের জন্য অনুযোগ করিলেন। ব্রহ্মা শিলাখণ্ডটীকে যমপুরীতে লইয়া যাইয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু কল্প পরে প্রজাপতি গয়াসুরের

মস্তক ও পবিত্র শিলা দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে বিষ্ণু আদি দেবগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে শিলা বলিল, "ঠাকুর, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আত্মার মুক্তির জন্য আমার এই দেহরূপ শিলায় আপনি অন্যান্য দেবতাগণের সহিত অবস্থান করিবেন। ভগবন্ আপনার সেই বাক্য এখন পালন করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া বিষ্ণ্বাদি দেবতাগণ তথায় রহিলেন। এই শিলায় সর্ব্বতীর্থ বিরাজ করিতেছে। ইহার পাদদেশে প্রভাস গিরি দ্বারা ঢাকা। এই গিরি ভেদ করিয়া যেখানে শিলায় অঙ্গুষ্ঠ দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রের দেবতা প্রভাসেশ্বর নামে কথিত হইয়া থাকেন। শিলাঙ্গুষ্ঠের এক অংশের নাম প্রেতশীলা। "প্রেতশীলা" বেদী রামশীলার মধ্যে অবস্থিত। যাহাকে চলিত ভাষায় "প্রেতশীলা" বলিয়া থাকে, তাহা "প্রেত পর্ব্বত।" প্রেতশিলায় পিণ্ড দান ও তর্পণ করিলে প্রেতত্ব দূর হয়। প্রভাস গিরি হইতে একটী নদী নির্গত হইয়া গঙ্গাসম পূতসলিলা ফল্গুনদীর সহিত মিশিয়াছে। ইহার সঙ্গম স্থলে প্রাচীনকালে ত্রেতাযুগে মহারাজ রামচন্দ্র সীতাদেবীসহ স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে "রামগয়া" তীর্থ বলা হয়। এই তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিলে প্রেতাত্মার মুক্তি হয়। এইখানে ভরত আসিয়া রাম সীতা ও লক্ষণের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে "ভরতাশ্রমও" বলিয়া থাকে। গয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই শিলার কটিদেশ বিস্তৃত। গয়াসুরকে নিশ্চল রাখিবার জন্য ধর্ম্মরাজ এইস্থানে সদাই বিরাজ করিয়া থাকেন। শিলার দক্ষিণ হস্ত পদে কুণ্ড পর্ব্বত এবং বাম পদে অভ্যুদ্যন্তক পর্ব্বত বিরাজমান আছে!! সীতাদ্রির দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতে দণ্ডীরাজা পুরাকালে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

ভস্মকূট:—মঙ্গলা দেবীর পর্ব্বতে ৺জনার্দ্দন আছেন। তাঁহার হস্তে দধিমিশ্রিত পিণ্ডদান করিতে হয়। "গদ সুরের" হাড়ে আদি গদাস্ত্র বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্মার আদেশে নির্ম্মিত হয়। হেতী রাক্ষসকে এই গদার দ্বারা বিষ্ণু মারিয়া দেবতাগণকে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। যে স্থানে বিষ্ণু গদা ধৌত করিয়াছিলেন, সেই স্থানটীকে "গদালোল" বলে। থাপর গয়ার অন্তর্গত এক বেদীপিণ্ড এইখানে দিতে হয়। ইহা বিষ্ণুপাদ মন্দির হইতে প্রায় একমাইল দক্ষিণ দিকে বর্ত্তমান মাড়নপুর গ্রামে অবস্থিত। সীতাদ্রির সম্মুখে "রুক্মিনীকুণ্ড" এবং পশ্চিমে "কপিলানদী।" এই নদীরধারে ৺কপীলেশ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন; ইহার উত্তর দিকের পর্ব্বতটী গৃধ্রকূট নামে পরিচিত, তাহার পার্শ্বে ৺লাঙ্গা বাবার আশ্রম। বিষ্ণু গয়াসুরকে নিশ্চল রাখিবার জন্য আদি গদা হস্তে লইয়া ধর্ম্মশিলাতে দৈত্যের মস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্যতম নাম "আদি গদাধর।" ইহা করশলী মহল্লায় অবস্থিত। ইহার নিকট "আদিগয়া।"

ঋক্‌বেদের ৩ মণ্ডল ৫৩ সূক্ত ৪১ শ্লোকে, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত ১০৭ সর্গের ১১—১৩ শ্লোকে, মহাভারতের বন পর্ব্বের অন্তর্গত তীর্থ যাত্রা পর্ব্বের ৮৪ অধ্যায়ে, এবং ৯৫ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় ১ম অধ্যায়ে, অত্রি সংহিতায়, বিষ্ণু সংহিতার ৮৫ অধ্যায়ে, উশনাসংহিতার ও অধ্যায়ে কাত্যায়ণ সংহিতার ৩ অধ্যায়ে, শঙ্খ সংহিতার ১৪ অধ্যায়ে, বশিষ্ঠ সংহিতার ১১ অধ্যায়ে এবং লিখিত সংহিতায় গয়াতীর্থের বিশেষ উল্লেখ থাকায়, গয়ার সৃষ্টি যে বৌদ্ধ যুগের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির এ সম্বন্ধে "বৌদ্ধধর্ম্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের নব গঠন" রূপ থিওরিটি আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। গয়ার প্রধান নদী ফল্গু। গঙ্গার ন্যায় ফল্গুধারা পবিত্র। পূর্ব্বে এই নদীর ভিতর দিয়া জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধস্রোত প্রবাহিত হইত। কালের গতিতে এই নদীতে এখন বালুকণার নিম্নে সহজে এক ফোঁটা জল মিলাও সুকঠিন!! ফল্গুতে স্নান করিলে মহাপুণ্য হয়। ইহার জল খুব শৈত্য গুণ বিশিষ্ট বলিয়া স্থানীয় লোকে বড় ইহার জল ব্যবহার করে না। ইহার জল ব্যবহারে সর্দ্দী, গলগণ্ড, শোথ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ জন্মে!!! ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান হরি ফল্গুরূপে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া আইসেন। বিষ্ণুর চরণোদক হইতে গঙ্গা এবং "আদি গদাধর" স্বয়ং দ্রব হইয়া ফল্গুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাগকূট হইতে গৃধ্রকূট, আর ব্রহ্মযোগী (পাতাল গঙ্গাস্থ পর্ব্বত অর্থাৎ মুড়লী পাহাড়) হইতে উত্তর মানস পর্য্যন্ত স্থানের নাম গয়াশির। ইহাকেই ফল্গু তীর্থ বলে। উত্তর মানসের উপরেই আমার কুটীর "উমেশ লজ।"

অহল্যা দেবীর মন্দিরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে গদাধরের মন্দির। এই মন্দির অতি প্রাচীন। ইহার নিম্নে গদাধর ঘাট। এই মন্দির তক্ষক নৃপতির পুত্রবধূ কোহ্লাদেবী ১৩৫১ বা ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুপদের উপর প্রাচীন মন্দির এই আদর্শে নির্ম্মিত ছিল, অহল্যা বাই প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করিলে সে আদর্শ নষ্ট হইয়াছে; কেবল মাত্র ৺গদাধরের মন্দির সেই প্রাচীন আদর্শ ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য দিবার জন্য অদ্যাবধি দণ্ডায়মান আছে।

হেতী দানবকে হনন করিবার জন্য ভগবান নব অস্ত্র গদা ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি "গদাধর" হইয়াছেন। যেস্থানে তিনি হেতিকে সংহার করিয়া গদাধৌত করিয়াছিলেন তাহা "গদালোল।" এই নব অস্ত্র গদা অপূর্ব্ব ব্যবহৃত, ইহা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দধিচির অস্থিতে নির্ম্মিত!!!

গৃহে পিণ্ড দিয়া গয়া পিণ্ডদান করিবে, এই শাস্ত্রের অনুশাসন।" পিণ্ডং দত্বা গয়াং ব্রজেৎ।" পূর্ব্বাহ্ণে উপবাসী বা হবিষ্য ভোজন করিয়া, প্রাতে শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া, ফল্গুতে স্নান করিয়া, ফল্গুতে তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান করিয়া, পরে বিষ্ণু মন্দিরে পিণ্ডদান করিবে। পর পর ক্রমশ যাবতীয় বেদীতে পিণ্ড দিয়া শেষে অক্ষয় বটে পিণ্ড দিয়া, তীর্থব্রাহ্মণ গয়ালীর নিকট সুফল লইতে হইবে। তাহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া যাত্রী স্বদেশ যাত্রা করিবে। গয়া ক্রিয়া সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় গয়া-মাহাত্ম্যে লিখা আছে। ইহা বায়ুপুরাণের অংশ বিশেষ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্পূর্ণ গয়া শ্রাদ্ধ করিতে প্রায় দেড় মাস কাল সময় অতিবাহিত হয়, এই কাজে ১০৫ বেদীতে পৃথক পৃথক পিণ্ডদান করিতে হয়; কিন্তু ব্যয় সংক্ষেপ হেতু অনেক লোক ৯, ৪৫, বা ৫৬ বেদীতে অবস্থা ও সাধ্যমত ব্যয় করিয়া পিণ্ড দান করিয়া থাকে। এই সকল বিষয় আমি বুদ্ধ গয়া এবং মধু গয়া শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধে ১২৯৮ সালের "ভারতী" পত্রিকায় বিবৃত করিয়াছি, তাহা ছাড়া সাহিত্য-সংবাদ-পত্রিকার প্রথম ও ও দ্বিতীয় ভাগে "বিহারে বৌদ্ধ প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে গয়া জেলা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা

করিয়াছি। তাহা অনুসিন্ধুৎসু পাঠকের বিশেষরূপে পাঠ করা প্রয়োজন। গয়া পিণ্ড দানে হিন্দুশাস্ত্র মতে অক্ষয় পুণ্য ও কীর্ত্তি সঞ্চিত হয় এবং পিতৃলোক চিরস্বর্গবাস করেন বলিয়া বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ পিতৃপক্ষে এবং চৈত্রমাসে গয়ায় সমগ্র হিন্দুজগৎ হইতে পিণ্ডদানোপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী সমবেত হইয়া থাকেন। এই সময় রেল কোম্পানিকে বহু অতিরিক্ত স্পেশাল রেল গাড়ী যোগাইতে হয়, সহরে লোক বাড়ে, খাদ্যাদি দুর্ম্মূল্য হয় এবং সহর অপরিষ্কার হইয়া সংক্রামক রোগের আকর হইয়া থাকে। অক্ষয়বট মাড়নপুর নামক গ্রামে; গয়া সহরের দক্ষিণ সীমায় ৺মঙ্গলা গৌরী পীটের নিম্নে; এবং ৺পিতামহেশ্বর আমার নাদ্রাগঞ্জ পল্লীর বাটীর সম্মুখে রামনা পল্লীর মধ্যস্থ ৺শীতলা দেবীর মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত। ৺প্রপিতামহেশ্বর ৺অক্ষয় বটের পার্শ্বেই বিরাজমান। বৃদ্ধ পিতামহেশ্বর শিবলিঙ্গ ৺শঙ্কটা দেবীর সন্নিকট লক্ষণপুরা গ্রামে অবস্থিত।

৺প্রপিতামহেশ্বর শিব মন্দিরের পশ্চিম দিকে "রুক্মিণী কুণ্ড" এবং তাহার দক্ষিণ দিকে "অক্ষয়বট" তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। কপিলেশ্বর, সোমধারা, কপিলধারা, অগ্নিধারা গন্ধর্ব্ব পর্ব্বত প্রভৃতি তীর্থ রুক্মিণী কুণ্ডের পশ্চিম দিগস্থ পর্ব্বত মধ্যে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে ৩৬০ বেদীতে পিণ্ডদান করিতে হইত, এখন ৪৫টী মাত্র বেদীতে পিণ্ড দত্ত হইয়া থাকে, এই পিণ্ডদান বিধির নাম "খাপর" গয়া অপর পিণ্ড দিবার স্থানগুলি লুপ্ত হইয়াছে। ইহা সমাধা করিতে ১৫ দিন সময় লাগে। চরণ পূজার স্থান বিষ্ণু মন্দির। তাহার পার্শ্বেই দক্ষিণ দিকে "শ্মশান ঘাট।" তাহার পার্শ্বেই "গয়া কূপ।" ইহার পাণ্ডা সুরতওয়ালাগণ। ইহারা গয়ালীগণের ঔরসজাত অন্য জাতীয় ভোগ্যা স্ত্রীর বা উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান বংশ। রামচন্দ্র সুরতওয়ালা, রামাপাহাড়ী সুরতওয়ালা প্রভৃতি সুরতওয়ালা সমাজে বিশেষ ধনী এবং প্রখ্যাত। শ্মশান ঘাটের উপরই "গয়াশীর" বেদী অবস্থিত; শ্মশান ঘাটের পার্শ্বে "মধুশ্রবা" তীর্থ। তাহার পার্শ্বে "মুণ্ড পৃষ্ঠা" তাহার অল্প দূরে "আদি গয়া।" ইহাই প্রাচীন গদাধরের পীঠ; বিষ্ণুর মন্দিরের উত্তর দিকে যে ৺গদাধরের মূর্ত্তি ও মন্দির প্রদর্শিত হয়, তাহা স্থাপিত। তাহার পার্শ্বে "ধৌতপদ।" এই ধৌতপদ লইয়া মকর্দ্দামা পাটনা হাইকোর্টে কিশুন লাল মেহরওয়ারের সহিত ৺শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তের পুত্র শ্যামলাল গুপ্তের সহিত দায়ের আছে। ইহার কিঞ্চিদ্দূরে ৺মঙ্গলা পীঠ। গয়ায় ৺মঙ্গলা দেবীর পিঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। দেবী ভাগবতে "গয়ায়াং মঙ্গলাচৈব" রূপ বচন আমরা দেখিতে পাই। গয়ায় ৺মঙ্গলাগৌরীতে ভগবতীর "স্তন যুগ" পীঠ বর্ত্তমান। পর্ব্বতের উপরে ৺মঙ্গলা পীঠ শোভিত। তাহার নিম্নে "গো প্রচার" এবং "ভীম গয়া"। গোপ্রচারে ব্রহ্মা গো দান করিয়াছিলেন এবং ভীম গয়ায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন পিতৃকার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার হাঁটুর বিশাল গহ্বর প্রস্তরে খোদিত হইয়া অতীতের ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহাকে "ভীম ঘুটা" বেদীনামেও অভিহিত করা হয়। ইহার সন্নিকট "গদালোল"। লক্ষণপুরা গ্রামে ৺শঙ্কট দেবীর স্থান। এইখানেও এক বেদী পিণ্ডদান হয়। তাহার পার্শ্বেই ফল্গুতে "দুগ্ধ তর্পণ" পিণ্ড হয়। তাহার পর "বৈতরণীতে" গোদান এবং সন্ধ্যায় দীপ দান কার্য্য হয়। অক্ষয় বটে শেষ পিণ্ড দিয়া গয়ালীর কাছ

হতে সুফল গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর গায়ত্রী-ঘাটে পিণ্ডদান করিয়া আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ লইয়া খাপর অন্তর্গত গয়া কার্য্য শেষ হয়। গয়ালীগণ যাত্রীদের এবং যমের দান গ্রহণ করায় পতিত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মাদত্ত তাঁহাদের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে। গয়ালীগণ ব্রহ্মার অভিশাপে মর্ম্মাহত হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে যাত্রীদত্ত দক্ষিণায় জীবন-ধারণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহা প্রায় দুই কোটি অর্ব্বুদ বৎসর পূর্ব্বের কথা। গণনা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে, ঐ সময়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মা এইখানে পিণ্ডদান করিতে আসিয়াছিলেন। বিষ্ণুপদই গয়ার প্রধান পবিত্র বস্তু। এই পুণ্য-পদাঙ্ক পূজা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু গয়া-তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। এই সম্মুখস্থ নাটমন্দির ও ধর্ম্মশালা গয়া তীর্থের কেন্দ্র স্বরূপ। প্রাতঃস্মরণীয়া ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই বিষ্ণুপদ-মন্দিরটী অষ্টাদশ শতাব্দীতে (খ্রীঃ ১৭৯৫) বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুদৃঢ় গ্রেণাইট (কষ্টি) প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত। মূল মন্দির দ্বিতল এবং ইহার পরিমাণ ৫৮ বর্গ ফিট্। অষ্ট সারি স্তম্ভের উপর স্থাপিত, প্রত্যেকটী স্তম্ভ চারিটী স্তম্ভের সমষ্টি। মন্দিরের উপরিভাগ গুম্বজাকার, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। মন্দিরের যে অংশে বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তাহার উপর সু-উচ্চ পিরামিডের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট অষ্ট-কোণযুক্ত টাওয়ার পরিদৃষ্ট হয়। ইহা এক শত ফিটের উপর উচ্চ হইবে। ইহার চূড়ায় স্বর্ণনির্ম্মিত "কলস" এবং গয়ালী বালগোবিন্দ সেন-প্রদত্ত স্বর্ণ-ধ্বজা বিরাজ করিতেছে। মন্দির-দ্বার রৌপ্য নির্ম্মিত। এই প্রধান দ্বার দেশে দুইটী ঘণ্টা নাটমন্দিরের ছাত হইতে ঝুলিতেছে। প্রথম ঘণ্টা নেপালের রাজমন্ত্রী শ্রীমৎরণজাৎ পাঁড়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; দ্বিতীয় ঘণ্টাটী যাত্রী কর আদায়ের কালেক্টার গিলেণ্ডার সাহেব (M. Francis Gillander) ১৫ই জানুয়ারী ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দান করিয়াছিলেন। রামলীলা পর্ব্বতের নিম্ন দেশের গোর স্থানে তাঁহার সমাধি আজও বিদ্যমান আছে। বাবু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "গয়া কাহিনী" পুস্তকে অনেক অশাস্ত্রীয় অনৈতিহাসিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। সেইগুলি অসত্য!! ৺বিষ্ণুপদ-মন্দিরের অব্যবহিত পরে সংলগ্ন অপর প্রাঙ্গণে "গদাধরের মন্দির" অবস্থিত। এই মন্দিরের সিংহ দ্বারে ইন্দ্রের এক অতি সুন্দর মূর্ত্তি আছে; দেবরাজ দুইটী হস্তীর উপর এক খানি সিংহাসনে বসিয়া আছেন। এই মন্দিরের উত্তর পশ্চিমাংশে ৺গয়েশ্বরী দেবী বা মহিষাসুর-ঘাতিনী অষ্টভুজার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দির ১৫১৬ সম্বতে ক্ষেত্রী বংশীয় দেবীদাস চৌধুরার পুত্রের দ্বারায় নির্ম্মিত হয় এবং ১৮৪৩ বা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাবাসী শ্রীনারায়ণ ঘোষাল ইহার সংস্কার করিয়া দেন। বর্ত্তমান গভীর গবেষণা আমাদের সমক্ষে দৃঢ়রূপে প্রমাণিত করিয়াছে যে, পাল বংশীয় নরপতিগণ, যাঁহারা ভারতের রাজদণ্ড কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন মাহিষ্য ছিলেন। তাহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "রাম-চরিত্র" পাঠে আমরা সবিশেষ অবগত হই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পালবংশীয় নরপতিগণের সময়ে বিষ্ণুপদ-মন্দিরের বিভিন্নাংশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিষ্ণু-পদ-মন্দির

প্রবেশের পথে ক্ষুদ্র একটী মন্দিরে একটী হস্তী বৃক্ষ হইতে ফল ও পুষ্প ছিঁড়িতেছে, এই ধরণের প্রস্তরমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, দৃষ্ট হয়। পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে এই মূর্ত্তিটী প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাই গদাধরের মন্দির। ইহার অল্প উত্তরে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে সূর্য্য দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই চিত্রে সারথি অরুণ সাতটী ঘোড়ার রশ্মি ধরিয়া আছেন। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত চত্বরে একটী কুণ্ড আছে। ইহার নাম "সূর্য্যকুণ্ড"। বহু যাত্রী এইখানে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন।

একটী সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া বিষ্ণুপদ মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। এই গলি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই খানে ৺গয়েশ্বরী দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ এই যে, গয়া নগরী স্থাপনের সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা ৺গয়েশ্বরী দেবীর এই মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। ইহাঁর অপর নাম ৺জগদম্বা; ইনি সিংহবাহিনী অষ্টভুজা দুর্গা। মন্দিরের শিরোভাগে একখানি শিলালিপি বৌদ্ধ যুগের অতীত কাহিনী জ্ঞাপন করিতেছে!!

৺মঙ্গলা পীঠের নিম্নে "গোপ্রচার," তাহার নিম্নে দক্ষিণে "অক্ষয় বট"। এই খানে গয়া কার্য্য শেষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তেঁওতার জমীদার রায় পার্ব্বতী শঙ্কর রায় মহাশয় এইখানে বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার স্বর্গত পূজনীয়া মাতার আদেশ অনুসারে বঙ্গীয় যাত্রীগণের জন্য একটী বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য আমার খুল্লতাত গয়ার উকীল পূজনীয় ৺ঈশানচন্দ্র সরকার মহাশয় ও আমাকে বিশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া এই সর্ব্বজন-হিতকর কার্য্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল। তেঁওতাবংশের মাননীয় বাবু হরশঙ্কর রায় এবং মাননীয় পার্ব্বতীশঙ্কর বাবুর পুত্র মদ্বন্ধু সদাশয়-প্রকৃতি বাবু কুমারশঙ্কর রায় কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বৌদ্ধদর্শন।

আত্মা ও ঈশ্বর, সাধারণতঃ এই দুইটী লইয়া ধর্ম্ম। বর্ত্তমান বৌদ্ধদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী এই দুইটীই বিশ্বাস করেন—অপর শ্রেণী এ দুয়ের কোনটী বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অল্প। এ দুটীর কোনটীতে বিশ্বাস নাই, এমন লোক কেমন করিয়া কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে, বলা কষ্ট। শিষ্যেরা যাহাই বিশ্বাস করুন, বুদ্ধদেব স্বয়ং কি বিশ্বাস করিতেন? বুদ্ধদেব আত্মা ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক ধর্ম্ম। অথচ পণ্ডিত ও মূর্খ সহস্র লোকে বৌদ্ধধর্ম্ম আদরে গ্রহণ করিয়াছে এবং দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস ও রক্ষা করিয়াছে।

মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে একটী আখ্যায়িকা আছে। কুশীনগরে শালমূলে বুদ্ধদেব মৃত্যু-

শয্যায় শয়ান। এই সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌতম, আত্মা কি আছে?" বুদ্ধদেব বলিলেন "আমি কি বলিয়াছি, আত্মা আছে?" আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন. "আত্মা কি নাই?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি কি বলিয়াছি আত্মা নাই?" এইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে আনন্দ প্রশ্ন করিলেন, বুদ্ধদেব সে সম্বন্ধেও এই রূপই উত্তর দিলেন। আনন্দ বুঝিতে পারিলেন না, আত্মা ও ঈশ্বর আছে কিনা। তখন বুদ্ধদেব আনন্দকে নিকটস্থ শালবৃক্ষ হইতে কয়েকটী পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। আনন্দ তাহা করিলে, বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ, তোমার হাতে বেশী পাতা, না গাছে?" আনন্দ বলিলেন "গাছে।" তখন বুদ্ধদেব বলিলেন "আনন্দ, আমি তোমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছি, তাহার তুলনায় যাহা শিখাই নাই, তাহার পরিমাণ অনেক অধিক।"

বুদ্ধদেব আর একটী কথা তাঁহার শিষ্যগণকে অনেকবার বলিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে 'ভিতরের কথা' ও 'বাহিরের কথা' নাই। তিনি সাধারণ শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিতেন, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের ন্যায় উন্নত শিষ্যকেও তাহাই বলিতেন। উচ্চ নীচ অধিকার ভেদে উপদেশ ভিন্ন করিতেন না। এবং যাহা বলিতেন, তাহার প্রকাশ্য অর্থ ভিন্ন কোন গুপ্ত অর্থ থাকিত না, "I have preached the truth without making any distinction between exoteric and esoteric doctrine, for in respect of truch, Ananda, the Tathagata has no such thing as the closed fist of a teacher who keeps something back."

বৌদ্ধদর্শন বুঝিতে হইলে সেই সময়ে বা তৎ পূর্ব্বে ভারতে ধর্ম্ম ও দর্শনের অবস্থা কি ছিল, একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বৌদ্ধ দর্শন, সাংখ্যদর্শন কি বেদান্তদর্শনে প্রভাবিত, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে আচার্য্য মোক্ষমূলর বেদ ও উপনিষদের রচনা কাল যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এই ত্রিশ বৎসর মানব প্রকৃতির ক্রমবিকাশের পর্য্যালোচনায় প্রমাণ হইয়াছে, আর্য্যসভ্যতার আরম্ভ মোক্ষমূলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে। বৈদিক যুগ ও উপনিষদ যুগের মধ্যে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগের আর্য্য প্রকৃতি প্রফুল্লতালয়, উপনিষদে বিষাদের কালিমার নিদর্শন পাওয়া যায়। তখন আর্য্য প্রকৃতির পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণ হইয়াছে। নচিকেতা-সংবাদ এই প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের ইতিহাস। এখন ধন ধান্য, গো অশ্ব শতায়ুষ ও বীরসন্তান আর্য্যপুত্রের প্রার্থনীয় নহে; তাহাতে কি হইবে—'যেনাহং নামৃতঃস্যাম্'। বৈদিক জীবন আনন্দময়; সাংখ্য ও পাতঞ্জল জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নহেন। তাঁহার সময়ে এক একজন গুরুর অধীনে অনেক সন্ন্যাসীদল ভারতবর্ষে বিচরণ করিত। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিখ্যাত ছিলেন। আপন মতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া ক্রমে এই সকল দলকে তথাগত আপন দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় ভারতবর্ষে বাষট্টিটী দলস্থিত মত প্রচলিত ছিল। ইহাদের সকলেরই মধ্যে অল্পাধিক অনৈক্য ছিল। এই সকল মতকে সাধারণ ভাবে সাংখ্য, বেদান্ত, পঞ্চরাত্র, লোকায়ত ও জৈন, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধদর্শনের প্রভেদ সামান্য এবং পঞ্চরাত্রগণ স্বাধীনভাবে বৈদান্তিকদিগের

ন্যায় অদ্বৈতবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সাংখ্য ও বেদান্ত বৌদ্ধদর্শনের পূর্ব্বতন মানিয়া হইয়া ইহারা কে কি প্রকারে বৌদ্ধ-দর্শন প্রভাবিত করিয়াছিল, অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

'কেন,' 'কঠ' প্রভৃতি কয়েক খানি উপনিষদ বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বতন। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পর, খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে, কয়েক শত বৎসর ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে বেদান্ত হীনপ্রভ হইয়াছিল। প্রেতবিশ্বাস হইতে কিরূপে প্রকৃতি পূজায় এবং প্রকৃতি পূজা হইতে কিরূপে দেব পূজায়, এবং ক্রমে আর্য্য সন্তান কিরূপ অদৈতবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এখানে তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের ক্রমবিকাশে আর্য্যসন্তান বৈদিক প্রকৃতি-পূজা এবং তাহার শত শত বৎসর পরে উপনিষদের অদ্বৈতবাদ আবিষ্কার করে। প্রাচীন উপনিষদে দ্বৈতবাদ নাই, বা ঋগ্বেদ অদ্বৈতবাদ নাই, এমন নহে। তথাপি উপনিষদের দর্শনকে অদ্বৈতবাদ বা বেদান্তদর্শন বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে সাংখ্যদর্শনের শ্রীবৃদ্ধি বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বতন হইলেও সাংখ্যদর্শনের আরম্ভ বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বতন। অথর্ব্ব বেদের একটী সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভিগুণেনভিরাবৃতং—ইহা সাংখ্য মত না হইলেও কঠোপনিষদে সাংখ্যদর্শনের আভাষ পাওয়া যায়। আচার্য্য বেবর সাংখ্যদর্শনকে বেদান্তের পূর্ব্বতন বলিয়াছিলেন। একথা ঠিক নহে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদ নিরাকরণ মানসে কপিল সাংখ্যদর্শন প্রচার করেন। অদ্বৈতবাদে এক ব্রহ্ম পরমাত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই—সাংখ্য দর্শন পরমাত্মা অস্বীকার করিয়া প্রকৃতি ও আত্মার—অসংখ্য আত্মার সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদর্শনে আত্মা ও পরমাত্মা কিছুই স্বীকার করা হয় নাই। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি ও আত্মাকে অনাদি,সুতরাং অনন্ত বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধদর্শনে প্রকৃতিকে অস্থির প্রপঞ্চময় মায়া বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বেদান্ত প্রকৃতির সত্তা স্বীকার করেন না। সুতরাং প্রকৃতির অবিশ্বাসে বেদান্ত ও বৌদ্ধ একমত, পরমাত্মার অবিশ্বাসে সাংখ্য ও বৌদ্ধ একমত এবং আত্মার অবিশ্বাসে বৌদ্ধ স্বতন্ত্র ও একাকী।

সাংখ্যদর্শন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বেদান্তের ন্যায় আর্য্য সাধারণের আদরণীয় ছিল না। অনার্য্য প্রদেশে এবং বিশিষ্ট আর্য্য-সম্প্রদায়ে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তু। এই নামটী হইতে অনুমান করা যায়, শুদ্ধোদনের রাজ্যে সাংখ্য-প্রণেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শাক্যসিংহ জন্মভূমিতে সাংখ্যতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পুনর্জ্জন্ম, অদৃষ্টবাদ এবং কর্ম্মফলে বিশ্বাস উপনিষদ, বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে সমানভাবে দেখা যায়। সুতরাং এটী আর্য্যসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন, আর্য্যদিগের নিকট আর্য্যসন্তান এই মতটী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য নহে। অনার্য্য বিশ্বাস এই যে, কেহ মরিলে, তাহার আত্মা বৃক্ষ লতায় বা পশুজীব দেহে আশ্রয় লয়। কিন্তু বৃক্ষ হইতে অন্য জীবে আত্মার পর্য্যায় ক্রমে উন্নতি বা অবনতিতে অনার্য্যের বিশ্বাস নাই। জন্মান্তরবাদ আর্য্যদিগের নিজস্ব ধন—ভারতবর্ষে অভ্যুদিত হইয়া এমত ক্রমে গ্রীস ও মিসরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের আত্মায় বিশ্বাস নাই, কিন্তু

পুনর্জন্মে বিশ্বাস আছে। পুনর্জন্ম কাহার? বেদান্তের মতে আত্মার দুইরূপ—স্বরূপ এবং প্রবাহরূপ। বৌদ্ধেরা জীবের প্রবাহরূপ বিশ্বাস করে। এক একটী ফুল ভিন্ন হইলেও যেমন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটী মালা হয়, তেমনি, জন্মে জন্মে জীবের নামরূপ বিভিন্ন হইলেও এক কর্ম্মসূত্রে সহস্র জন্মেও সে সেই একই জীব। মানুষ মরিলে তাহার কর্ম্মফল রহিয়া যায়।—সেই কর্ম্মফলে, অবিদ্যা হইতে বাসনা, বাসনা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা মৃত্যু।

সাংখ্যদর্শনে জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। যাহা সুখ বলিয়া কল্পনা করা হয়, বিজ্ঞের নিকট তাহারও দুঃখময়ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির নাম মুক্তি। মুক্ত আত্মার সুখ দুঃখ অনুভূতি থাকে না। বৌদ্ধেরাও জীবনকে দুঃখময় বলেন। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির নাম নির্ব্বাণ। অনুভূতিশূন্য আত্মার অস্তিত্ব নির্ব্বাণ হইতে বেশী দূর নহে। যে সময় বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব মহৎ হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারিতেন না। এমন দুর্ব্বল ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে তথাগত স্বীকার করেন নাই এবং যে আত্মার সুখ সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা সুখ দুঃখানুভূতি-শূন্যতা—যে আত্মা লইয়াই বা তিনি তৃপ্ত হইবেন কেন?

যজ্ঞ ফলের অকিঞ্চিৎকারিতায় সাংখ্য ও বৌদ্ধের একই মত। তথাপি সাংখ্যকার যজ্ঞের প্রতি যেন একটু স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। যে যজ্ঞে বলিদান হয়, তাহাই ক্ষতিকারক; সে যজ্ঞে বলিদান হয় না—জীবহত্যা হয় না, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তবে উপকারও বিশেষ নাই। জ্ঞানই মুক্তির সোপান। তথাগত যাগযজ্ঞের অপকারিতা বিশেষভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। সকল বিষয়েই দেখা যায়, সাংখ্য বুদ্ধের ন্যায় উচ্ছেদ সাধনে কোমল-হৃদয়—বৌদ্ধ যুবার ন্যায় উচ্ছেদে অগ্রহস্ত। সাংখ্যকার একটু চক্ষু-লজ্জা করিয়াছেন। তথাগতের চক্ষুলজ্জা লেশ মাত্র ছিল না।

মুক্তি বা নির্ব্বাণ যজ্ঞ সঞ্চয়ে কৃচ্ছসাধনের আবশ্যকতা নাই, একথা সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয় দর্শনের অনুমত। "স্থির সুখমাসনং" ইহাতে উভয়ের মতভেদ নাই। অবিদ্যা হইতে বাসনা—বাসনা হইতে জন্ম জরামৃত্যু, এই উৎপত্তিবাদ বোধ হয় সাংখ্যকারের নিকট হইতে বৌদ্ধদর্শন গ্রহণ করিয়াছে।

বৌদ্ধদর্শনে কাহারই নিত্যতা স্বীকার করা হয় না। জগতে সকলই হইতেছে, কিছুই হয় না। সকলই ভাব মাত্র, সৎ কিছুই নাই। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো ন ভাবো বিদ্যতে সতঃ" একথা বৌদ্ধ বলিবেন না। পরমাণু হইতে পরমদেবতা পর্য্যন্ত সকলই পরিবর্ত্তনশীল। জন্মের সঙ্গে মরণ, সত্তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন। হ্রাস ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। নিমেষ পরে কাহাকেও পূর্ব্বাবস্থায় দেখা যায় না। সুতরাং সকলই হইতেছে, কিন্তু কিছুই হয় না। কেহ এক মুহূর্ত্ত থাকে, দেবতারা লক্ষ বৎসর বাঁচিতে পারেন, কিন্তু জরা, মরণ, ক্ষয় হইতে নিষ্কৃতি কাহারও নাই।

নিম্নশ্রেণীর পদার্থে আকার ও জড়ধর্ম্ম আছে। উচ্চশ্রেণীতে আকার, জড়ধর্ম্ম ও মানস ধর্ম্ম আছে। এই গুণের সমুচ্চয়ে পদার্থের উৎপত্তি। দুই, তিন বা ততোঽধিক গুণের সমাবেশ না হইলে কিছুরই উৎপত্তি হয় না। সুতরাং জড়মাত্র মিশ্রিত পদার্থ। এই জন্য,

বৌদ্ধদর্শনে পদার্থ মাত্রকে 'সংখার' বলা হইয়াছে। বোধ হয়, সাংখ্য দর্শনের সংস্কার শব্দ হইতে 'সংখার' শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। সমবেত গুণের প্রত্যেকটীর নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং কোন সংখার দুই মুহূর্ত্তে একরূপ থাকে না। সংখারের উৎপত্তির সহিত অসমতার পরিবর্ত্তন ও মৃত্যুর উৎপত্তি হয়। সুতরাং বিভিন্নতার সহিত বিভিন্নতার জন্ম—নিত্যত্ব নাই—এখনই বা চিরদিনে সকলকেই লয় পাইতে হয়। বৌদ্ধদর্শনের এ কথায় কাহারও ভিন্নমত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সংখারের অতীত অপরিবর্ত্তনশীল নির্ব্বিকার এক আত্মা সংখারের অন্তরালে বিদ্যমান আছে। অথবা এক অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বিকার জরামরণের অতীত পরমাত্মা এ জগতের অন্তরালে বিদ্যমান আছেন, একথা সাংখ্যকার বা বেদন্তকার স্বীকার করেন। বৌদ্ধ এরূপ কথা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধমতে জরামরণের অতীত নিত্যত্ব কিছুরই নাই।

সংখারের উৎপত্তির সহিত দুঃখের সূচনা। ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে বহির্জগৎ সংসারকে প্রভাবিত করে। তাহাতে সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইলে কোন পদার্থের প্রতি অভিলাষ, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। যাহার প্রতি অভিলাষ, তাহা পাইবার বাসনা হয়। যাহার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, তাহা দূর করিবার অভিলাষ হয়। বাসনা হইলে বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা জন্মে। একটী বাসনা পূর্ণ করিবার শক্তি থাকিলে শতটী পূর্ণ করিবার শক্তি থাকে না। বাসনার অপূরণে শোক জন্মে। সুতরাং জীবন মাত্রেই দুঃখ-সম্বলিত। বাসনা পূরণের অনিয়মিত চেষ্টায় পীড়া জন্মে। পীড়া হইতে ক্ষয় ও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং **সংসার মাত্রই জরামরণশীল।**

জীব আপন বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পায়। আপন মহত্ত্বের অভিমান তাহার এত হয়, সে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝে, মনে করে, জগতে আর কাহারও সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। ইহলোক ও পরলোক তাহারই জন্য। ইহলোকে ও পরলোকে চিরদিন আপন স্বতন্ত্রতা রক্ষা করার জন্য তাহার উদ্যম ও উৎসাহ। সমুদ্রের ফেন-বুদ্‌বুদের ধারণা যে, সে সমুদ্র হইতে ভিন্ন—জীবের ধারণা যে, সে সব হইতে স্বতন্ত্র। এই মায়া, এই মোহ, এই অবিদ্যা তাহার প্রয়াসের নিদান, এই প্রয়াসের ফলে তাহার কর্ম্ম। পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইলে দেখা যায়, কেহ রথে অশ্বযোজনা করিয়া চলিয়াছে, রথী ভাবিতেছে সে বড় দ্রুত যাইতেছে, অশ্ব ভাবিতেছে, সে পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া সদর্পে পদক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবী, রথ বা সারথী কাহারও সহিত সম্বন্ধ তাহার নাই। কিন্তু পর্ব্বতবাসী দেখিতেছে, তাহারা শুক্তির ন্যায় বিলম্বিতগতি, অশ্বের কেশর যেমন অশ্বের অংশ, তাহারা তেমনি পৃথিবীর অংশ। শিশুর শ্রীবৃদ্ধির সহিত দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় জগত শিশুর সামনে প্রতিবিম্বিত হয়, অজ্ঞাতসারে শিশুর হৃদয়ে অভিমান জন্মে সে এই সংসারচক্রের কেন্দ্র, তাহারই জন্য সংসার, সে সংসারে প্রভু, সে সংসার হইতে স্বতন্ত্র। এই অভিমান হইতে জীব সহজে নিষ্কৃতি পায় না। এই অভিমান হইতে বাসনা, বাসনা হইতে নূতন বাসনা। কেহ মোক্ষের লোভে কর্ম্ম করে। মূলে সকলের অভিমান, অভিমান বাসনার মূল, বাসনা কর্ম্মের মূল, কর্ম্ম সুখ, দুঃখ, জন্ম, ও জরা মরণের মূল। এই অহঙ্কার, আত্মাভিমান, আত্মার স্বতন্ত্রতা ও সত্তার বিশ্বাস যাবতীয় দুঃখের মূল।

এজন্য বৌদ্ধদর্শনে নিরাত্মবাদের এত প্রশংসা।

মনুষ্য কর্ম্মের ফল। কোটি কোটি জন্মের কর্ম্মফল, পিতৃ পিতামহের কর্ম্মফল, অনন্ত জগতের কর্ম্মফল সকলের সমবেত ফলে মনুষ্য-জন্ম। কীটাণু হইতে প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, দেব দানবের সকলের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ। কাহাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিবার সাধ্য মানুষের নাই। যে কুকুরকে লাঠি মারিতে উদ্যত হইয়াছে, স্মরণ কর সে তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা হইতে পারে। আর হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ কোথায় থাকিবে, তোমার সহিত সম্বন্ধ অতীত ও ভবিষ্যতের অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের। বিশ্বচক্রের ধূলিকণা, বিশাল বারিধির ফেন বুদ্‌বুদ্ তুমি। আপন অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে পারিলে, অভিমানের লয় হইবে, বিশ্বপ্রেমে হৃদয় প্লাবিত হইবে। কারণের কার্য্য তুমি, কারণ বিশ্বসংসার-শৃঙ্খলের এক গ্রন্থি তুমি, কাহা হইতে তোমার স্বতন্ত্রতা নাই—শৃঙ্খলের এক এক গ্রন্থি, অতীত কোটি বৎসরের কোটি জীবের কর্ম্মফল—আবার এই এক গ্রন্থি হইতে ভবিষ্যতের কোটি বৎসর প্রবাহিত হইবে। তোমার কর্ম্মফলে তুমি, তোমার সন্তান সন্ততি অনন্ত বিশ্বসংসার কোটি কোটি বৎসর প্রভাবিত হইবে। তুমি কার্য্য ও কারণরূপে অতীতে ছিলে, ভবিষ্যতে থাকিবে। এই কারণ ক্রমানুসারে জীব কোটি কোটি বৎসর থাকে। আত্মার সত্তায় বিশ্বাস রাখিবার আবশ্যক হয় না। দুই মাসের বালকের সহিত অশীতিপর বৃদ্ধের আকৃতি কি প্রকৃতি কিছুরই সমতা নাই, দেহের সে পরমাণু রক্ত, মেদ, মাংস ও অস্থির চিহ্ন নাই—তথাপি সেই দুই মাসের শিশুই যে এই অশিতিপর বৃদ্ধ, সে বিষয় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না! তবে জন্মান্তরে, রূপান্তরে, নামন্তরে জীবের ক্রম-পর্য্যায়ের অবসান কেন হইবে? বস্তুতঃ জরামরণের ক্রমবিকাশ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তথাগত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুখ দুঃখের এমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখা আর কোন দেশে কেহ দিতে পারে নাই।

"অনিত্যং দুঃখং আত্মাং" তথাগত আত্মার সত্তা, কোন পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করিতেন না এবং জীবমাত্র দুঃখময় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তবে নির্ব্বাণ কি—কিসের নির্ব্বাণ?

(৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী)

(প্রকাশক···শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী)

ভগবদ্‌গীতার সূচনা।

আমরা মহাভারতের মনোহর পথে চলিতে চলিতে এখন এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আর শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই যে, তাহাতে প্রবেশ করি। তাহার উচ্চস্তর বিশেষজ্ঞকে—যোগীজনকে মুগ্ধ করিতেছে। আর নিম্নস্তর জন-

সাধারণকে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা এই স্তরের যাহা দেখিতেছি, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

গীতার উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে উপদেশ *। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম, না করাই অধর্ম্ম, ইহাই গীতায় উক্ত হইয়াছে। এই এক কথায় ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, আর কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব? যদি বলা যায় যে শাস্ত্রের আদেশ পালনই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম, তাহা হইলেও পথ পরিষ্কার হইল না। কারণ কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বহু পণ্ডিত 'বেদ হইতে ধর্ম্ম' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বেদ-নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ধর্ম্মই বিহিত হয় না †।" মহাভারতের আর এক স্থলে আছে, "শাস্ত্র চতুর্ব্বিধ।" সংস্কৃত মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম নাই, এই এক শাস্ত্র, দ্বিতীয় শাক্যসিংহাদি-প্রবর্ত্তিত চৈত্য-বন্দনাদি রূপ ধর্ম্মশাস্ত্র (ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র)। তৃতীয় বেদোক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। চতুর্থ, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত বস্তু মাত্র আছে, আর কিছুই নাই, এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র ‡। মহাভারতে আরও আছে, "শাস্ত্রও বহু বিভিন্ন, মতও বহু বিভিন্ন। বেদ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ-অর্থ-প্রকাশক। এমন একজন ঋষি নাই, যাঁহার মতকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথে গমন করাই কর্ত্তব্য" § কিন্তু ভারতে মহাজনের অভাব নাই। তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধি-বলে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করিয়া, বিভিন্ন পথে গিয়াছেন। এই জন্যই ভারতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম!

আর শুধু শাস্ত্রই কি প্রামাণ্য? কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ, যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। একমাত্র শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কিছুই নির্ণয় করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়! ইহা বৃহস্পতির বচন ¶।

আবার শাস্ত্রই বা কি? মহাভারতে আছে, "যাহাতে মনুষ্য সমাজের উন্নতি হয়, এইজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে। ন্যায়সঙ্গত যে কোন আচার, তাহাই শাস্ত্র এবং যাহা অন্যায় আচার, তাহাই অশাস্ত্র" ॥। ইহা-দ্বারাও ন্যায় বা কর্ত্তব্য কি, তাহা স্থির হইল না।

তাহা হইলে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের উপায় কি? ভারত-গৌরব বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "কোন প্রাচীন পুস্তকে কোন বিষয় লিখিত আছে

* আচার্য্য নীলকণ্ঠ মজুমদার M. A. কৃত গীতারহস্য পৃ ২০৩।৮। এবং লোকমান্য তিলকের গীতা রহস্য হিন্দি অনুবাদ।

† সংস্কৃত মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব ৬৯—৫৬। ইহাও বেদনিন্দা।

‡ শান্তিপর্ব্ব ২৮৭—১২। তাহা হইলে পণ্ডিতপ্রবর নীলকণ্ঠের মতে এই শ্লোকেও বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে।

§ শান্তিপর্ব্বে ১৮৭—১০। বনপর্ব্ব ৩১৩—১১৭। ষড়দর্শনের মতও পরস্পর বিভিন্ন। আবার গীতার সহিত সকল বিষয়ে তাহাদের একমত নাই।

¶ মনু-সংহিতার ১২—১১৩ শ্লোকের টীকায় কুল্লুক ভট্টধৃত বৃহস্পতি বচন।

॥ শান্তিপর্ব্ব ১০৯—১০॥ ২৬৮—৫৮।

বলিয়া, অথবা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া, অথবা তোমার বাল্যাবস্থা হইতেই তুমি কোন বিশ্বাসে গঠিত হইয়াছ বলিয়া, কোন বিষয় বিশ্বাস করিও না। বিচার করিয়া দেখ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ, যদি উহা সকলের পক্ষে হিতকারী হয়, তবেই উহাতে বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশ মত জীবন যাপন কর এবং অপরকেও ঐ উশদেশ অনুসারে জীবন যাপন করিতে সাহায্য কর"। *

মহাভারতের বহুস্থানে আছে, "যাহা মনুষ্য সমাজের উন্নতি-সাধক, তাহাই ধর্ম্ম, ইহাস্থির নিশ্চয়। যে ধর্ম্ম উন্নতির অন্তরায়, তাহা কুধর্ম্ম। যাহাতে সকলের হিত হয়, তাহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। যাহা সকলের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য, তাহাই ধর্ম্ম। সকলের হিতসাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। যিনি সকলের সুহৃদ্ ও সকলের হিতসাধনে সতত রত, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ। বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা সকলের হিত সাধন করিবে। যাহা অপরের হিতকর নহে এবং যে জন্য লজ্জিত হইতে হইবে, এমন কর্ম্ম কদাচ করিও না †। কৃষ্ণও বলিয়াছেন" "যাহা সকলকে ধারণ করে, অর্থাৎ রক্ষা করে, তাহাই ধর্ম্ম ‡। তিনি গীতায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "সকলের হিত সাধন করিবে। লোকহিতার্থে সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। সকলের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ কর্ত্তব্যকর্ম্ম। আমি কর্ম্ম না করিলে মনুষ্য-সমাজ উৎসন্ন হইবে। তাহা না হয়, এই জন্যই আমি কর্ম্ম করি" §।

মহাভারতে একাধিক স্থানে আছে "যদি বংশের একজনকে ত্যাগ করিলে সমুদয় বংশ রক্ষা হয়, তবে তাহাও করিবে। যদি সমুদয় গ্রাম ত্যাগ করিলে দেশ রক্ষা হয়, তবে তাহাও করিবে।" ইহাই শুক্রাচার্য্যের নীতি।

এই সকল দ্বারা দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন লক্ষ্য নহে, কিন্তু সকলের—সমুদয় দেশের হিত-সাধনই লক্ষ্য। এইজন্য গীতায় মনুষ্য সমাজের হিত সাধন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বলিয়া পুনঃপুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥।

ইহাই হিতবাদের মূল মন্ত্র। হিতবাদ

* স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ পৃঃ ১৬৪।

† বনপর্ব্ব ৩৩—২১। ২০৮—৪। ১১২—৩১। শান্তিপর্ব্ব ১০৯—১০৯—১০।১১। ১২।৩২৯—১২। ১৩।২৬৪—৬।২৬১—৯।১২৪—৬৬।৬৭।৬৮।২৬১ অধ্যায়।

‡ কর্ণপর্ব্ব ৬৯—৫৭।৫৮।৫৯।

§ গীতা ৩—২৪॥৩—২০। টীকাকারেরা লোকসংগ্রহের অর্থ স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তন লিখিয়াছেন। কিন্তু লোক-হিতই প্রকৃত অর্থ। ৮—৩। মূলে যে বিসর্গ শব্দ আছে, তাহার অর্থ টীকাকারেরা ত্যাগ অর্থাৎ যজ্ঞ লিখিয়াছেন। ত্যাগ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ত্যাগ, স্বার্থ ত্যাগ প্রকৃত অর্থ, যজ্ঞ নহে। আর কর্ম্মের অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গীতার বহুস্থলে সর্ব্বভূত অর্থে মনুষ্য সমাজ সূচিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এতবড় উচ্চ আদর্শ জীবনে পরিণত করা অসম্ভব বিবেচনায়, আমরা তাহার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে দেশ-হিত লিখিয়াছি।

‖ গীতা ৫—২৫॥১১—৫৫॥১২—৪।১৩॥১৬—২। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণ-কথিত সত্যতত্ত্ব এই রূপ + +। যাহাতে লোকহিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। + + আমরা যদি + + এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্ম্মের মূল স্বরূপ গ্রহণ পারি, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। + + তাহা হইলে ভণ্ডামি ও জাতমারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্ট চেষ্টা থাকে না।" কৃষ্ণচরিত ৬খণ্ড ৬ পরিচ্ছেদ। পুনশ্চ, "যিনি (কৃষ্ণ) সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, 'বেদ ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি, "ধর্ম্মতত্ত্ব ১ ভাগ ৪ অধ্যায়।

কি? যাহাতে অধিকাংশ মনুষ্যের অত্যধিক হিত সাধিত হয়, তাহাই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য, কর্ত্তব্য কার্য্য। কৌরবেরা অতি অন্যায় উপায় দ্বারা পাণ্ডবদ্রের পৈত্রিক ও স্বরাজ্য অধিকার করিয়াছিল। যদি পাণ্ডবেরা তাহা উদ্ধার করিতে যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে অন্যায়েরই প্রশ্রয় প্রদান করিতেন, অন্যায় প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইলে কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না, কোন দেশই উন্নত হইতে পারে না, এইজন্য কৃষ্ণ—পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এইরূপ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া মত প্রদান করিয়াছিলেন। আত্মোন্নতি সাধনই মানব জীবনের লক্ষ্য। তাহা আবার দেশোন্নতির উপর নির্ভর করে। দেশোন্নতিও আবার আত্মোন্নতির উপর নির্ভর করে। এই জন্য আত্মোন্নতিও দেশ-প্রেমের দুইটী বিমলধারা, গঙ্গা যমুনার মত মিলিত হইয়া, গীতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা যদি দেশ-প্রেমের সঙ্গীত না হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শিখাইতেন না, দেশোদ্ধারে নিযুক্ত করিতেন না, সর্ব্বসাধারণের প্রতি সমদর্শী হইতে,- সর্ব্বসাধারণকে সমভাবে ভালবাসিতে এবং সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন করিতে উপদেশ দিতেন না।

যে সকল উপদেশ মহাভারতের নানাস্থানে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে, তাহাই গীতায় একত্রিত রহিয়াছে,দেখিতে পাই। * মনু-সংহিতা ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক শ্লোক গীতায় আছে। আবার উপনিষদের অনেক শ্লোক ও গীতার শ্লোক প্রায়ই এক †। তাহাবাদে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ সমূহের সুন্দর সুন্দর অংশ গীতার পত্রে পত্রে রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম নীতি-প্রধান। রিপু সংযমই বৌদ্ধধর্ম্মের সার। তাহা গীতায় গৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বভূতের হিতসাধন বা কর্ম্মযোগ, সাংখ্যও বেদান্তের জ্ঞানযোগ, ভাগবতের ভক্তিযোগ ও পাতঞ্জলের বিশেষ যোগ, এই সকলেরই সুন্দর সামঞ্জস্য গীতায় রহিয়াছে ‡। বেদ-নিন্দাও গীতার বহুস্থানে ও মহাভারতের নানাস্থানে আছে §। ফলত বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে যেমন পাশ্চাত্য প্রভাব দৃষ্ট হয়, মহাভারত ও গীতায়ও তেমনি বৌদ্ধ-প্রভাব দৃষ্ট হয়। নতুবা কোন্ হিন্দুর সাধ্য যে সেই বেদপ্রবল সময়ে, বেদপ্রবল ভারতে বেদের নিন্দা করে, আর বলে, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে!"

গীতার অনেক শ্লোক পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ-বাচক ¶। মহাভারতে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, ইহা সর্ব্বসঙ্গত। গীতায়ও প্রক্ষিপ্ত আছে ‖। অনাচার, অভক্ষ্য ভক্ষণ, সকলের অন্ন ভোজন, অস্পৃশ্যস্পর্শন, ইন্দ্রিয়জনিত পাপ প্রভৃতি সকলই গীতাপাঠে নষ্ট হয় *। গীতা জগতের এই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে যে,গ্রীক, লাটীন, জর্ম্মন, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

গীতার ন্যায় সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন; বিশ্বশ্রেমের ধর্ম্ম আর নাই, চরিত্র গঠনের সহায় নাই, মুক্তির আর পথ নাই। †

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

* বঙ্কিম বাবুও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণ-চরিত ৫ খণ্ড ২ অধ্যায়।

† রামদয়াল মজুমদার M. A. র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পৃঃ ৬৪৪ ৬৪৫।৬৫০।৬৮২।৬৯০।

‡ নীলকণ্ঠ মজুমদার M. A. র গীতা-রহস্যের মুখবন্ধ ও পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকা।

§ বঙ্কিমবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব ১ ভাগ ৪ অধ্যায় এবং ১৪ অধ্যায়।

¶ শঙ্কর ভাষ্যের উপক্রমিকায় শঙ্করাচার্য্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভূমিকা এবং Krishna and Gita by Sitanath Tathwabhusan, Lecture X.

‖ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত M. A. B. L. র ঈশ্বরবাদ পৃঃ ২০৫। জাভা ও বলীদ্বীপে যে গীতা আছে, তাহাতে শ্লোক অতি অল্প আছে। Modern Review, July, 1914. আবার মান্দ্রাজের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রকাশিত গীতায় ২৬ অধ্যায় আছে।

ভারতীয় লিখন-প্রণালীর প্রাচীনতা।

অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ভারতীয় লিপি বিষয়ে নূতন করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ‡ তিনি এই আলোচনায় চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেন নাই, স্বীয় মৌলিক গবেষণার ফলে মীমাংসার পথও সুগম করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই গবেষণার ফল বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

ভারতীয় প্রাচীন লিপি দুই প্রকার—ব্রাহ্মী ও খেরস্তী। ব্রাহ্মী লিপির গতি বাম হইতে দক্ষিণে, যেমন হিন্দুদিগের লেখা বর্ত্তমানে প্রচলিত। খেরস্তী আরবি বা ফার্সীর ন্যায় বামাবর্ত্ত। খেরস্তী কেবল উত্তর পশ্চিম প্রদেশেই প্রচলিত ছিল এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মী উত্তর পশ্চিম সমেত সকল ভারতেই প্রচলিত ছিল এবং কেবল ভারতের নয়, তিব্বত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশেও যে সকল লিপি প্রচলিত, সকলেরই জনয়িত্রী বলিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে স্বীকৃত। খেরস্তী যে বিদেশাগত, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মী সম্বন্ধে বিরোধ আছে। সংস্কৃত ও সংস্কৃতোৎপন্ন ভাষা সকলের উচ্চারণানুরূপ করিয়াই ব্রাহ্মী বর্ণমালা গঠিত হইয়াছিল, সুতরাং উহাই যে এ দেশের প্রাচীন বর্ণমালা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বর্ণমালা কতদিন হইল দেশে প্রচলিত, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা সম্বন্ধে মোক্ষমূলার বলিয়াছেন যে, পাণিনির সময়েও দেশে নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতবর

* গীতামাহাত্ম্য ৩৩।৩৪।৩৫।৩৬ তবে আর সুশিক্ষিত ও দেশের অলঙ্কার বিলাত-প্রত্যাগতদিগকে এক করিয়া বলিয়া লাভ? গীতা পড়াইয়া লইলেই এ সব শুদ্ধ হয়।

† Dr. Larinser লিখিয়াছেন যে, গীতা ও বাইবেল প্রায় একশত ভাবের সৌসাদৃশ্য আছে। কেনেডী সাহেব গীতার সহিত বাইবেলের New Testamentর তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, খুব সম্ভবত বাইবেলের ঐ অংশের লেখকগণ ভগবদ্গীতা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। The Satakas by J. M. Kennedy p 33. ফরাসী পণ্ডিত জেকেলিয়ট সাহেব একমাত্র মনুসংহিতার সহিত বাইবেলের Old Testament র তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাইবল নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল। The Bible in India, Hindu origin. আবার বহু ইংরাজ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাইবলের বহু অংশই,এমন কি, বাইবলের বহু গল্পই বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

See The Gospel of Budha, published by Regan Paul and Co, The creed of Budha by Edmund Holmes, published by the Bodley Head and Co, Arthur Lille's Buddh and Buddhism এবং মৎপ্রণীত সম্রাট আকবর ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

‡ The Indian Alphabet: The Calcutta Review. January, 1920.

লক্ষ্যই করেন নাই যে, 'লেখক' অর্থে লিপিকর' কথাটা পাণিনির মধ্যে আছে। তাহাতে কি হয়? গোল্ডষ্টুকার ইহার প্রতিবাদ করিলেও, মোক্ষমূলরের অনুবর্ত্তন করিয়া পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়া বসিলেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতে লিখন প্রচলিত হয় নাই। পরে জর্জ্জ বুহ্লার ও রিস্ ডেভিস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণায় এই মতের ভ্রান্তি ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্য বিশেষভাবে জাতক গ্রন্থাবলীর অনেক স্থল আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে সময়ে ঐ গুলি প্রচলিত ছিল, তখন লিখন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজকীয় বিজ্ঞাপনাদিতে লেখা ব্যবহৃত হইত। সাধারণের মধ্যে চিঠি লেখারও ব্যবহার ছিল। লিখনপটুতা সম্মানজনক ও উপার্জ্জনের উপায়-স্বরূপ ছিল। লিখন কোন সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। সর্ব্বসাধারণে এবং স্ত্রীলোকেরাও লিখিতে পারিতেন। সে সময়ে লিখন-প্রণালী এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, তাহা শিশুদিগের ক্রীড়ার মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে হইলে যে বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই নিখন প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যখন খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখন সাধারণের অধিগম্য হইয়াছে, তখন সপ্তম শতাব্দীতে যে তাহা আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু অধ্যাপক ভাণ্ডারকার বলেন যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদিগকে যেখানে ছাড়িয়া দিলেন, আমরা কি সেইখানেই থাকিতে বাধ্য? তিনি আমাদিগকে আরও বহুদূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। পাঠকগণ তাঁহার শক্তির পরিমাণ করুন।

এক দুই হইতে আরম্ভ করিয়া পরার্দ্ধ (১,০০০,০০০,০০০,০০০) পর্য্যন্ত গণনা বৈদিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অন্যান্য সাহিত্যের কথা না বলাই ভাল। কেন না, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে। ঋগ্বেদেই লক্ষ পর্য্যন্ত গণনার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণাদিতে বারর দ্বিগুণ চব্বিশ, চব্বিশের দ্বিগুণ আটচল্লিশ—এইরূপ করিয়া ৩৯৩২১৬ অঙ্কে পৌঁছিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অন্যদিকে ভগ্নাংশে এক দিনকে ৭৫৯৩৭৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। এক হাজারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কথা আছে। গ্রীক্ বা রোমাণেরা যখন লিখিতে জানিতেন, তখনও যখন ১০০০ বা ১০০০০এর বেশী গুণিতে পারিতেন না, তখন কি করিয়া ভাবিতে পারা যায় যে, কোনও রকম লিখন-প্রণালী ছাড়াই আর্য্যেরা ভগ্নাংশের এমন জটিল প্রদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! অন্যদিকে, কেবল অঙ্কের লিখন নয়, বর্ণমালার লিখনও যে বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা 'অক্ষর' শব্দটীর দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বর্ণমালা প্রথমে প্রস্তরে খোদিত হইত। খোদিত হইলে বর্ণ যে অপেক্ষাকৃত অক্ষয় হয়, সে বিষয়ে কোনরূই সন্দেহ নাই। সেই জন্য বর্ণের নাম অক্ষর! এই অর্থে অক্ষর শব্দ ঋগ্বেদেই যখন পাওয়া যায় এবং ঋগ্বেদের বয়স যখন অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী, তখন ভারতীয় লিপির বয়সও যে অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ বঙ্গাব্দ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু ভারতে বর্ণমালার প্রচলন কেন আরও বহু প্রাচীন কালেই হইয়াছিল, এখন সেই তত্ত্ব নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইব।

ভারতে কিরূপে কোথা হইতে বর্ণমালার আবির্ভাব হইল, সে সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সেগুলিকে তিন প্রধান

ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, গ্রীক্ বর্ণমালার সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির বিশেষ সাদৃশ্য আছে দেখিয়া অনুমান করা হইয়াছিল যে, অশোকের শিলালিপির বর্ণমালা গ্রীক্ অক্ষরের অনুকরণ। কিন্তু ঐতিহাসিক পৌর্ব্ব পর্য্যায়ের হিসাবে এই মত টিকিতে পারে নাই। এ কথা এখন কেহই বিশ্বাস করে না যে, ব্রাহ্মী লিপির আদি অশোকের সময়ে। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতীয় বর্ণমালা ভারতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বিদেশে হইতে আইসে নাই। ভারতের আর্য্য পূর্ব্ব অধিবাসী দ্রাবিড়গণ ইহার আবিষ্কর্ত্তা। কেহ কেহ ভারতীয় প্রাচীন চিত্রাক্ষর (Picture writing) হইতে বর্ণমালার বিবর্ত্তন প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় দল বলেন যে, উহা সেমিতিকদিগের নিকট হইতে গৃহীত —হয় দক্ষিণ আরব, না হয় ফিনিসিয়ানগণ আমাদের উত্তমর্ণ। এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি ছিল, ভারতীয় লিপির গতি বাম হইতে দক্ষিণে, সেমিতিক লিপি বিপরীত মার্গগামী। সুতরাং একটা আর একটার অনুকরণ হইতে পারে না। কিন্তু এই আপত্তির খণ্ডন মিলিয়াছে। অতি প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিও যে বামাবর্ত্ত, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পণ্ডিতেরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি, অশোকের লিপিতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোথায়ও কোথায়ও ধ, ট, ও উল্টাভাবে (৮ 'এ্ 'ঙ) লেখা আছে। যুক্তাক্ষরের বেলায় সাধারণতঃ ট্প, ষ্ট, ব্য না লিখিয়া প্ট, ট্ষ, য্ব এইরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামদিকে লেখার গতি হইলে যাহা হইত, তাহারই স্মৃতি-চিহ্ন এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। (আমাদের হন হ্ল এর অর্থ কি?) কেবল অশোকের শিলালিপি কেন, সিংহলে বহু লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যাহার অনেকগুলি দক্ষিণ হইতেই পাঠ আরম্ভ করিতে হয়। ইহা কেবল অতি প্রাচীন লিপিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক লিপিতে এই বৈশাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বহুপূর্ব্বে ব্রাহ্মীলিপিও বামাবর্ত্ত ছিল, অশোকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণাগতি আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বামাগতির ধাক্কা তখনও চলিতেছিল। গ্রীশেও ঠিক্ এইরূপেই ঘটিয়াছিল। আধুনিক লেখা যদিও দক্ষিণাবর্ত্ত, কিন্তু প্রাচীন লেখার উত্তমর্ণ ফিনিসীয়দের বামাবর্ত্ত ধারাই বিদ্যমান। ব্রাহ্মীলিপির বেলায়ও এই রূপই ঘটিয়া থাকিবে, ইহা ধরিয়া লওয়াতে উক্ত লিপি যে বিদেশাগত, এই যুক্তির বিপক্ষে যাহা প্রধান বাধা ছিল, পণ্ডিতেরা তাহা অপসারিত করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশ হইতে যদি আসিয়া থাকে, তবে কোথা হইতে আসিল, তাহা যতক্ষণ না প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ প্রশ্নের পূর্ণ মীমাংসা হইল না। দক্ষিণ আরবের অক্ষরের সঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালার সাদৃশ্যটা অত্যন্ত মনগড়া। বিশেষতঃ আমাদের উচ্চারণ প্রণালীর হিসাবে এ দাবী টিকিবেই না। অন্যদিকে, উত্তর সেমেটিক অক্ষরের দাবীর বিরুদ্ধে এক প্রবল আপত্তি আছে। বরং তর্কের খাতিরে এ কথা স্বীকার করা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ আরবের সঙ্গে ভারতের আদান প্রদান ছিল, কিন্তু প্যালেষ্টাইনের সীমানার খবর যে সে সময়ে ভারতের ছিল, তার তো কোন প্রমাণই কেহ দিতে পারেন নাই। এই যুক্তি দিয়া পণ্ডিতবর রিস্ ডেভিস্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ও সেমিটিক বর্ণমালা কেহ কাহারও নিকট ধার করে নাই, উভয়েই

ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী এক অতি প্রাচীন বর্ণমালা হইতে গৃহীত। কিন্তু এই অতি প্রাচীন বর্ণমালাটা যে কি, তিনি তাহা নির্দ্দেশ করিতে না পারায় আর আর পণ্ডিতেরা তাঁর কথাকে আমলই দেন নাই। সুতরাং সকলে 'নাই মামার চাইতে কাণা মামা ভাল' এই ন্যায়ানুসারেই বোধ হয় উত্তর সেমেটিক জাতির উত্তমর্ণত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াই ঘুমাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি এমন কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে তাঁহাদের নিদ্রার বা কিছু ব্যাঘাত ঘটে। তিন বৎসর হইল, নিজাম রাজ্যের কোন এক প্রাগৈতিহাসিক কবর-খানা হইতে কয়েকটী ঘট উত্তোলিত হয়। ইহার একটী ঘটের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তা ইয়াজদানি সাহেব ব্রাহ্মী বর্ণমালার অক্ষরের অনুরূপ একটা দাগ দেখিতে পান। তখন তিনি সবগুলি ঘট ধুইয়া দেখিতে পাইলেন, সব গুলির মধ্যেই দাগ রহিয়াছে। মাদ্রাজ মিউজিয়ামে সে সকল প্রাগৈতিহাসিক ঘট সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই ঐরূপ দাগ ধরা পড়িয়াছিল। সুতরাং ইয়াজদানিসাহেব উক্ত মিউজিয়ামে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও মান্দ্রাজের চতুর্দ্দশ জিলা হইতে এতাবৎকাল সংগৃহীত ঘট ও ঘটাংশ সমূহ নিজে পরীক্ষা করিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে তিনি নানা প্রকারে ১৩১ টী দাগ দেখিতে পাইলেন। আরও অন্য প্রকারের দাগ বা আঁচড় যে আবিষ্কৃত হইবে, এরূপও আশা করা যায়। এখন কথা এই, হায়দরাবাদের এই সকল হাঁড়ি কলসী যে প্রস্তর ইরামতের সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে, তাহার বয়স খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কম নহে এবং মান্দ্রাজ মিউজিয়ামের কোন কোনটা নব প্রস্তর (Neolithic Age) যুগের। সুতরাং অন্ততঃ পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তরই হউক আর দক্ষিণই হউক, কোন সিমিটিক অক্ষরের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এত বৃদ্ধ কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ! সুতরাং যাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতীয় লিপির নিদান ভারতেই খুঁজিতে হইবে, তাঁহাদেরই কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে চলিল। রিস্ ডেভিস্ যে বলিয়াছেন, ভারতীয় ও সেমিটিক লিপির পূর্ব্বপুরুষ এক, সে মতকে সত্য করিতে হইলে, ইউফ্রেটিস্ নদীর তীর না খুজিয়া গোদাবরী ও কাবেরীর মধ্যখানে অন্বেষণ করিতে যে হইবে না, তাহার কোন অর্থ নাই। কেন না, ইয়াজদানী সাহেবের আবিষ্কৃত পাঁচটী দাগ অতি প্রাচীন ব্রাহ্মীবর্ণমালার পাঁচটী অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। এইরূপ প্রাগৈতিহাসিকের সঙ্গে ইতিহাস যুগের বর্ণমালার সাদৃশ্য আরও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইয়োরোপে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন প্রস্তরযুগের মধ্যবর্ত্তী স্তরে এমন সব প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে, যাহার দাগ বহুসহস্র বৎসর পরবর্ত্তী বর্ণমালার আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যদিকে কেবলমাত্র পাঁচটী অক্ষরের সাদৃশ্য আছে বলিয়া নিরাশ হইবারও কোন কারণ নাই। পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। বিশেষতঃ দুইটী বর্ণমালার মধ্যে যখন সহস্র সহস্র বৎসরের দূরত্ব, তখন ইহার বেশী আশাই করা যায় না। বরং কেহ কেহ এই কথাই বলিতে পারেন যে, এত দিনের যখন পার্থক্য, তখন সাদৃশ্য থাকাই সন্দেহের কথা। কিন্তু মিসরের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চাশ শতাব্দীর দাগের সঙ্গে খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীর ফিনিসীয় অক্ষরের সাদৃশ্যে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। আমাদের দেশেও খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পিপ্রাহ্ব স্তূপের গ অক্ষর বর্ত্তমান ক্যানারী বা অক্ষরের

সঙ্গে হুবহু এক। যাহা হউক, এই সব দাগের মধ্যে কোন কোনটায় যে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরের যোগ, তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। এই সকল কারণে মনে হয় যে, উহা কেবল দাগ বা চিহ্ন নয়, অক্ষরই বটে। একমাত্র আপত্তি এই, যদি অক্ষরই হইবে, তবে একটা একটা অক্ষত কেন? এ গুলি অক্ষর না হইয়া স্বামিত্ব নির্দ্ধারণের চিহ্ন মাত্র হওয়াই স্বাভাবিক। উত্তর এই যে, যখন এই দাগ গুলির অক্ষরত্ব সম্বন্ধে অনেক যুক্তি রহিয়াছে, তখন স্বামিত্বের চিহ্ন মাত্র না হইয়া স্বামীর নামের আদ্যক্ষর হওয়ায় আপত্তি কি? কেন না, ইহার সপক্ষে প্রমাণ রহিয়াছে। ভারতের বাহিরে, যথা—মিসর ও ইউরোপের কোন কোন স্থানে প্রাপ্ত ইতিহাস-পূর্ব্ব বা আদি ঐতিহাসিক যুগের অনেক দাগের সঙ্গে এই সকল দাগের একত্ব আছে এবং অন্যত্র প্রাপ্ত ঐ সকল দাগ পণ্ডিতেরা অক্ষর বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ একটী অক্ষর খোদাই করার রেওয়াজ ভারতেও রহিয়াছে। ৩ নম্বরের সাঞ্চী স্তূপে দুইটী স্মারক (কৌটা) ঝাঁপি (Relic casket) পাওয়া যায়, যার একটার উপরে ম ও অন্যটার উপরে স লেখা রহিয়াছে। ইহা সহজেই স্বামিত্বের চিহ্ন বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারিত, কিন্তু দেখা গেল যে, দুইটী বড় বাক্সে ঐ ঝাঁপি দুইটী ছিল, তাহাদের গায়ে সরীপুত্ত ও মুগ্গলন এই দুই ব্যক্তির বিষয়ে কিছু লেখা রহিয়াছে। সুতরাং ঐ স ও ম যে দুই ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ রহিল না। কিন্তু বড় দুইটী বাক্স নষ্ট হইয়া গেলে, এই সহজ সিদ্ধান্ত সুদূরপরাহত হইত। যখন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ঘট পট লইয়া বিচার, তখন আমরা যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ঐ দাগ গুলিকে এই দৃষ্টান্তানুসারে নামের আদ্যক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সংশয়ছেদী প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বাবু পঞ্চানন মিত্র মিউজিয়মে রক্ষিত নানা রকমের প্রস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দুই খানির মধ্যে কিছু লেখা আছে বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি তাহা অধ্যাপক ভাণ্ডারকারকে দেখান। এক খানি আসাম প্রদেশে প্রাপ্ত নব প্রস্তর যুগের একটী অস্ত্র। ইহার মধ্যে চারিটী অক্ষর আছে—এক লাইনে—মটোর মত করিয়া লেখা। তিনটী অক্ষর মিসরের প্রায় ইতিহাসিক অক্ষরের মত। অন্যটীও নবপ্রস্তর যুগের—ডানহাতের পাতার আকৃতি—রাঁচিতে প্রাপ্ত। ইহাতে তিনটী অক্ষর। অধ্যাপক ভাণ্ডারকার ঠিক করিয়াছেন যে, উহা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে পাঠ করিতে হইবে এবং ঐরূপে পাঠ করিলে দাঁড়াইবে—মা-অ-ত। ইহা ব্রাহ্মীবর্ণমালার অনুরূপ। ছোটনাগপুরে মাহত (হ এর উচ্চারণ অনুচ্চ) অর্থ (আদিম অধিবাসী-মধ্যে) 'প্রধান'। (মহৎ নয় তো—?) সে যাহাই হউক, এই অক্ষরগুলিকে আর স্বামিত্বের চিহ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। ইহারা ৩ ও ৪ অক্ষরের লেখা ছাড়া আর কিছুই নয়; কেন না, যে সব চিহ্ন অক্ষর বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এই সকল দাগের পারিবারিক সম্বন্ধ নিঃসন্দেহ। ইহাদের বয়স ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার বৎসরের মধ্যে। সুতরাং খ্রীঃ পূ সপ্তম শতাব্দীর সেমিটিক বর্ণমালা হইতে ব্রাহ্মীলিপির আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিলে হয়তো পিতার সঙ্গে পুত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া পুত্র হইতে পিতার উৎপত্তি নির্ণয় করার মত একটা ছোট খাট রহস্যের উদ্ভবও হইতে পারে। সেমিটিক উৎপত্তির প্রধান

যুক্তি যে আদি ব্রাহ্মীলিপির বামাবর্ত্ত-গতি, তাহা তো নব প্রস্তর যুগের রাঁচির 'মহৎ' দক্ষিণ হস্তে অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, ব্রাহ্মীলিপির নিদান খুঁজিতে আমাদিগকে ইতিহাস পশ্চাতে ফেলিয়া ভারতের সেই প্রাগৈতিহাসিক আদি মানবের শরণাগত হইতে হইবে, যাঁহার নিকট হইতে ভারতে নবাগত আর্য্যগণের ও অন্যান্য জাতি সকলের অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল। কে জানে, গ্রীক্, ফিনিসীয়, এমন কি, মিসরীয়-গণও তাঁহারই নিকট ঋণ গ্রহণ করেন নাই, যে ঋণ আর কখনও শোধ হইবে না। বর্ণ-মালার উদ্ভব যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে, সে বিষয়ে প্রায় কাহারও সন্দেহ নাই। তবে মিসর ও ভারতের কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, তাহা জোর করিয়া বলিবার অধিকার ভারতবাসীর নাই। মিসরের প্রত্নতত্ত্ব বয়োবৃদ্ধ। সুতরাং পণ্ডিতগণের টান্ সেই দিকেই। ভারতে প্রত্নতত্ত্বের শৈশব মাত্র। এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার খন্তা কোদালের উপর—মানবের অতি প্রাচীন দুই বন্ধু। কেবল গোড়ামিতে কোন লাভ হইবে না। এ বিষয়ে গোড়ামি আমাদিগকে কেবল হাস্যাস্পদই করিবে। খন্তা কোদালের সাহায্য না পাইলে এ ক্ষেত্রে কলমেরও জোর বড় কম। ভারতবাসী পুরাণ ছাড়িয়া খন্তা কোদাল ধরুন। ভারতমাতা বক্ষ চিরিয়া রত্ন উপহার দিবেন, তাহা দ্বারাই জগতে তাঁহার মাতৃত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে—আমাদের গোড়ামির দ্বারা নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মধূৎসব।

হিমান্তে মধু পূর্ণিমা নিশা
স্বচ্ছ স্বর্গতল ;
বিলাসে চিত্রা চন্দ্রমাপাশে
উল্লাসে বিহ্বল !
দিব্য সুধায় প্লাবিত বসুধা—
উন্মাদনায় মাতি—
রতি অনঙ্গে এল কি রঙ্গে
উজলি বিজলী ভাতি ? (১)

অশোক-পদ্ম-রক্তোৎপল
চূত-মঞ্জরী সনে
নবমল্লিকা—পঞ্চশায়ক—
ব্যাপৃত সম্মোহনে।
হেরি ঋতুবরে বরিলা প্রকৃতি,
—স্বর্গ ধরার বুকে,—
দিগ্বধূ রসে ঘোষে উলুধ্বনি
কোকিল কণ্ঠে সুখে। (২)

দক্ষিণ গিরি তেয়াগি অরুণ
উত্তরে আনে রথ,
লুপ্ত তুষারে ঊষার দীপ্তি,
হাসে সরে কোকনদ।
আননে পরাগ শোভে মধুবধূ
ভুজলতা বঁধু গলে ;—
নিতম্বে বাজে মরাল-মেখলা
কমল-শয়ন তলে। (৩)

মদনোৎসবে দুলি' হিন্দোলে
বসন্ত-বিলাসিনী—
ঝাঁপায়ে পড়িছে বল্লভ বুকে
কৌতুকে সোহাগিনী।
তিলক-মুক্তা অলি-কুন্তলে
শ্রবণে যবের শীষ ;
সরিৎ-মুকুরে সে মধু মিলন
ফলিত অহর্নিশ। (৪)

শ্রীরসময় লাহা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আবাহন।

পৃথিবী-ব্যাপী কি এক বিরাট জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। মানব-সমাজে এমন কোন স্তর নাই, যেখানে এই জাগরণের সজীব লক্ষণ প্রকাশ হয় নাই বা হইতেছে না। কি বিশাল আয়োজন, কি বিরাট বন্দোবস্ত! এই জাগরণের শেষ পরিণতি কি, তাহা কে বলিতে পারে? আর কোন্ অজ্ঞাত দেশে কোন্ মহা-মহিমান্বিত শক্তিশালী ঋত্বিক এই প্রজ্বলিত হোমানলে আহুতি প্রদান করিতেছেন, তারই বা কে সন্ধান রাখে?

এই জাগরণের লক্ষণ পাশ্চাত্যদেশেই অধিকতর সজীব। কারণ সেখানেই ইহার গতি ও শক্তি অপ্রতিহত। যে নিষ্পেষিত, নির্য্যাতিত শ্রমজীবিগণ সমাজের মেরুদণ্ড, তাহা-রাই সেখানে এই জাগরণের সূত্র ধরিয়াছে। ধনীদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষণের ফলে এই পাশ্চাত্য শ্রমজীবিগণ বা শূদ্রজাতি আজ মোহনিদ্রা দূর করিয়া নিজ উন্নয়নের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহারা পরমুখপেক্ষী নয়। তাহারা নিজ লক্ষ্য চিনিয়াছে, নিজের শক্তি বুঝিয়াছে, তাই প্রমত্ত ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন উৎপাটিত করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠান করিতেছে। এই ভীষণ শূদ্রশক্তির অপ্রতিহত গতির সম্মুখে শুধু ধনী সম্প্রদায় নহে; শক্তিশালী রাজ-শক্তি পর্য্যন্ত ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং বাড়বানলের মত ইহা প্রলয় ভীষণ হুহুঙ্কার করিয়া বিদ্যুৎগতিতে পৃথিবীকে আলোড়িত করিয়া চলিয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতের এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া স্বভাবের নিয়মে এই দুর্ভিক্ষ-মহামারি-প্রপীড়িত ভারতবর্ষেও আরম্ভ হইয়াছে। এখানেও এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার উত্তেজনা আবাল বৃদ্ধ সকলকেই স্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়াছে। প্রকৃতির কি বিধান, ক্ষুধিত হও, ব্যথিত হও, জন্মভূমির প্রতি প্রীতির যে তোমার তন্ত্রী, তাহা ধনীর সহিত, সুস্থকায়ের সহিত এক সুরে বাঁধা, তাহা একই সুরে ঝঙ্কারিয়া উঠিবেই, তাই শুষ্ককণ্ঠ, ক্ষুধিত, পীড়িত ভারতবর্ষ এই নবজাগরণের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। নিদ্রিত সিংহ প্রথম জাগরণেই এই যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহে জীবন পণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কা হয়, মুমূর্ষু রোগী যেমন অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই জাগরণের স্পন্দনে অস্থিচর্ম্মসার ভারত-বাসীও বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য জগতে যাহাই হউক, ভারতের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র! ভারত নাগপাশের শত বন্ধনে আবদ্ধ। সকল বিষয়ে সে পর-প্রত্যাশী। হৃদয়ে দারুণ জ্বালা, কিন্তু শক্তি-শেলে নিপতিত। এই দুর্দ্দিনে ভারতের বৈদ্য-সঙ্কট উপস্থিত। বিদেশী বণিক রাজা এই জাগরণে নিজে স্বার্থহানি বুঝিয়া প্রতি-পদেই বাধা দিতে সদা জাগ্রত। কিন্তু রাজশক্তিই একমাত্র বাধা হইলে চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ দুরবস্থাই সকল দুঃখের মূল। সমাজের পুরা-কালে প্রযুজ্য রক্ষণশীল কঠোর বিধান এই অবস্থাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আর সকল কথার সার কথা এই ভীষণ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যই সকল দুঃখের মূল, সকল আশার উৎসাদক।

দরিদ্র হইলে জাতির যে পরিণাম হয়,

শত শত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যে আমাদের তা সকলই ঘটিয়াছে। আমাদের ক্ষুধায় অন্ন নাই, তৃষ্ণায় জল নাই, শরীরে স্বাস্থ্য নাই, রোগে ঔষধ নাই, লজ্জায় আবরণ নাই, অত্যাচারে প্রতিকার নাই। যাহাতে মানুষ মানুষ হয়, যাহাতে জীবন ধারণ হয়, তাহার কিছুই আমাদের নাই। আমাদের রোদন সম্বল। প্রতিপদে আমরা রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী এবং প্রতিপদেই প্রত্যাখ্যাত। সৈন্য সংরক্ষণ এবং হোম চার্জ্জের ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া কিছু থাকে না, তা আমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার ব্যয় কোথা হইতে করা যাবে? সুতরাং সে দিকে কোন আশা নাই। তবে আর আশা কোথায়? দেশের মধ্যে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, তাঁহারাও মোহাচ্ছন্ন। দেশের দুরবস্থা বুঝিবার তাঁহাদের অবসর নাই। নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে, উপাধি লাভ করিতে এবং ভোগ বিলাসে তাঁহারা কেবল মুক্তহস্ত নহেন, তজ্জন্য ঋণভারগ্রস্ত। দেশের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর করাও, শুনিবে, অর্থাভাব। আর পরের দুঃখ তাঁহারা বুঝিবেনই বা কি প্রকারে? প্রজা রক্ত জল করিয়া, প্রাণপণে, রৌদ্র বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া যাহা আহরণ করিবে, তাঁহারা তাহা শোষণ করিয়া আনিয়া বহুদূরে সহরে বসিয়া নানা উপায়ে জলের মত ব্যয় করেন। প্রজার সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই। প্রজার নিকট করাদায় করা মাত্র যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের নিকট সহানুভূতি আশা করা একেবারেই বৃথা।

এই দারুণ নিরাশার মধ্যে একটু আশার কথা এই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত লোক দেশের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যে ঠিক পথে চলিতেছেন, তাহার পরিচয় কোথায়? দেশের ত লক্ষ্য এক, কিন্তু সেই লক্ষ্য-পথে চলিতে চলিতে তাঁহারা বিষম দলাদলির সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। আদর্শ লইয়া মারামারি, কথা-কাটাকাটি, ফলে মনান্তরের সৃষ্টি। দেশ যেখানে আছে, সেই খানেই পড়িয়া থাকিতেছে, তাঁহারা নিজ নিজ পক্ষের জিদ্ বজায় রাখিতেই বদ্ধপরিকর। যতক্ষণ তাঁহারা বৃথা বিবাদে নিযুক্ত, ততক্ষণ যদি দেশের ক্ষত অনুসন্ধান করিতেন ও তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে বুঝি যথার্থ কাজ হইত। কৈ সে দিকে ত কাহারও দৃষ্টি নাই। তাঁহারা বিবাদে নিযুক্ত, এদিকে দেশ হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। কেন এমন হয়? ইহার এই অর্থ নয় কি যে, নেতৃবর্গের মন মুখ এক নন্? তাঁহারা যে স্বদেশ-হিতের কথা বলেন, সে কেবল আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধির ভাণ মাত্র। তাঁহাদের হৃদয়ে আন্তরিকতা নাই, সত্যের আলোক নাই, প্রেম নাই। যে আন্তরিকতায়, যে সত্য লাভের চেষ্টায়, যে প্রেমে প্রাণ পাগল করে, যাহা আদর্শে পৌঁছিবার জন্য সকল ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভুলাইয়া দেয়, যাহাতে আত্মপর, বিবাদ বিসম্বাদ, ভেদাভেদ একেবারেই মুছিয়া দেয়, সেই প্রেম নাই। কোন্ নেতা বলিতে পারেন, দেশের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া তাঁহার আহারে রুচি নাই, চোখে নিদ্রা নাই, তাঁহাকে পাগল করিয়াছে? কে বলিতে প্রস্তুত আছেন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতে, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিতে, ব্যাধিগ্রস্তকে ঔষধ পথ্য দিতে, তিনি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত, সকল বাধা বিঘ্ন, সকল আপদ বিপদ মাথায় করিয়া লইতে, এমন কি, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় দান করিতে, প্রস্তুত আছেন? যাঁহারা

তাহাতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের কথা কেহ শুনিবে না,—রাজা শুনিবেন না, দেশ শুনিবে না। মুখের কথায় আর দেশ ভুলিতে চাহে না। যাহার প্রেম নাই, প্রাণ নাই, অনুভূতি নাই, তাহার কোন কথা বলিবার অধিকারই নাই। হৃদয়ে প্রেম থাকিলে শক্তি আপনি আসিত। যে প্রেম কেবল দিতেই জানে, নিতে জানে না, যে প্রেম আত্ম প্রতিষ্ঠানকে বিষের চক্ষে দেখে, যে প্রেম সকল স্বার্থ, সকল হীনতা, সকল সঙ্কীর্ণতাকে পদদলিত করিয়া লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়, পরার্থেই, পরসেবাতেই যে প্রেমের তুষ্টি ও পর্য্যবসন, যে প্রেম কেবল সেবা করিয়াই তুষ্ট প্রতিদানে শিহরিয়া উঠে, চাই সেই প্রেম। এই দুর্দ্দিনে কেবলমাত্র সেই প্রেমই ঔষধ, অন্য উপায় নাই। সমগ্র লোকের প্রাণে এপ্রেম, এ শক্তি না জাগিতে পারে, কিন্তু যদি একজনেরও প্রাণে জাগে, তবে সে এক লক্ষ লোকের কাজ করিবে। তাহার ইঙ্গিতে দেশ উঠিবে বসিবে। কে এই প্রেমের সাধনা করিতেছে? এ সাধনা কি বড় কঠিন কথা? এই অবতারের দেশে, যোগী ঋষির দেশে, রামচন্দ্র, জনক যুধিষ্ঠিরের দেশে, বুদ্ধ চৈতন্যের দেশে, প্রতাপ, রামমোহন, বিবেকানন্দের দেশে এই ত্যাগ, এই সাধনা কি নূতন কথা? এ যে সন্ন্যাসীর দেশ, এযে কেবল ত্যাগেরই দেশ! এখানে ত ভোগ বিলাস ছিল না। সবই ছিল, সবই আছে, নাই কেবল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাহস। একবার মোহ অপসারিত করিয়া, অবসাদ দূর করিয়া সাধনায় তৎপর হও, দেখিবে, এই মানুষ দেবতা হইবে, এই মানুষই অসাধ্য সাধন করিবে। গিরি নদ নদী সাধকের সকল পথ ছাড়িয়া দিবে।

রাজ-মন্ত্রণা-সভায় উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তৃতায় ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে, সংবাদ পত্রে বা বক্তৃতামঞ্চে রাজ কার্য্যের সতেজ আলোচনা করিলে বা বিপক্ষকে তর্কে পরাভূত করিতে পারিলেও তুষ্টি লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কার্য্য হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিব না।

দেশের জন্য আমরা কতই না করিতেছি, কিন্তু যাহাদের লইয়া দেশ, যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, যাহারা দেশকে রক্ষা করিতেছে, অথচ যাহারা উপেক্ষিত, পদদলিত, তাহাদের জন্য আমরা কি করিতেছি? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোক না থাকিলেও দেশ চলিতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত বর্ব্বর বলিয়া যাহাদিগকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি, অথচ যাহারা আছে বলিয়া আমরা রক্ষা পাইতেছি, তাহারা না থাকিলে দেশ থাকে না। অথচ তাহারাই ক্রমে নানা উপসর্গে উচ্ছন্ন যাইতেছে। তাহাদের সচ্ছল উদরান্নের সংস্থান না করিলে, তাহাদিগকে ব্যাধির করাল গ্রাস হইতে রক্ষার বন্দোবস্ত না করিলে, তাহাদের সুপানীয় জলের ব্যবস্থা না করিলে, তাহাদিগকে বিদ্যার আলোক দিবার আয়োজন না করিলে, কেবল তাহাদের নয়, বিধাতার অভিশাপে দেশ দগ্ধ হইয়া যাইবে। যত আন্দলন, যত আস্ফালন সব বৃথা হবে।

উচ্চ নীচের ভেদাভেদ, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ যতদিন সকলকে পৃথক পৃথক করে রাখিবে, যতদিন নিপতিত জাতিকে, শূদ্রকে ভাই বলিয়া হাত ধরিয়া তুলিতে না পারিবে, তাদের সকল জ্বালা যন্ত্রণার অংশী হইতে না পারিতেছ, ততদিন তোমার বৃথা আস্ফালনের পৃষ্ঠপোষক কেহ নাই, জানিবে। আগে তাহাদের আপন কর, ভালবাস, তাদের দুঃখের সংবাদ লও, তাদের মধ্যে তাদের এক

জন হইয়া বসবাস কর, সকল অহঙ্কার ত্যাগ কর, দেখিবে, আর দলাদলির কোন আবশ্যক নাই ; তোমার বৃথা শ্রমের লাঘব হবে, তখন দেখিবে তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে কোটি কোটি নরনারী উঠিবে, বসিবে, প্রাণ দিবে। দেখিবে, তোমার পশ্চাতে দুর্জ্জয় সংঘবদ্ধ বিরাট শূদ্র-শক্তি তোমার সাধনার সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধী এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, আর আজ ভারতবর্ষেও তাঁহার পশ্চাতে কি এক নির্ভীক অপরাজেয় শক্তি সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার পরিচয় অতি অল্প দিন পূর্ব্বেই পাইয়াছ। এই শক্তি সাধনায় লাভ হয়, তাহাত দেখিয়াছ, আর এই শক্তি লাভ করিলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহার তুলনা নাই। প্রেমেই এই আত্মপ্রসাদের প্রতিষ্ঠা। প্রেমেই ত্যাগ আনিয়া দিবে, আত্মসমর্পণ-যোগ শিক্ষা দিবে। যদি নিরঙ্কুশ, নিরাবিল ভোগের লালসা থাকে, তবে ত্যাগ কর। একবার ত্যাগ কর, দেখিবে আর ত্যাগ করিতে হবে না, তোমার ভোগের পরিসীমা থাকিবে না। একবার ত্যাগ কর, দেখিবে, সমগ্র দেশ তোমার ভোগের শত উপচার সংগ্রহ করিয়া তোমারই জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, যদি আপন ভাইএর রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকেই পদদলিত করিয়া রাখিতে চাও, তবে দেখিবে, একদিন এই দুর্জয় জাগ্রত শূদ্র-শক্তি তোমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া নিজের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে এবং বিধাতার নির্দ্দিষ্ট সমতা সাধন করিবে, তোমার প্রতীক্ষায় আর বসিয়া থাকিবে না। সে দুর্দ্দিনে তোমার আর্ত্তনাদে সমবেদনা জানাইতে আর কাহাকেও পাইবে না।

হে নিত্যসিদ্ধ, সত্যব্রতধারী বীরহৃদয় প্রেমিক সাধক, এস, তোমার কর্ম্মস্থল প্রস্তুত। ভারত-শ্মশানে তোমার শব সাধনার সকল উপচার প্রস্তুত হইয়া তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সময় যে বহিয়া যায়। একবার এই সাধনার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হেলায় হারাইলে আর সময় মিলিবে না। এই দারিদ্র্য, এই আধি ব্যাধি, এই মহামারি, এই দুর্ভিক্ষই তোমার দেব-পূজার ষোড়শোপচার। লক্ষ লক্ষ নরনারী তাহাতে দেহ ত্যাগ করিয়া—তোমার শব সাধনার আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, তুমি সুখ দুঃখের অতীত হইয়া এস। তুমি যে আপন মহিমায় মহিমান্বিত, তোমাকে আবার কিসে কাতর করিবে ? তোমার বিশ্রামও নাই, এই অসীম নীল চন্দ্রাতপতলে, বিস্তীর্ণ আতপ-দগ্ধ ধূলি-রাশির উপর তোমার বিশ্রাম স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, তোমার ভাইএর ক্ষুৎ পিপাসা দূর করিয়া তোমার নিজ ক্ষুৎপিপাসার শান্তি কর। এস, এসে এমন হোমানল প্রজ্জলিত কর, যাহার শিখা দেবতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের সহায়তায় নিযুক্ত করিবে। প্রেমের অসাধ্য কি আছে, ভাই ? দেখিবে, তোমার যজ্ঞাগ্নিতে ভারতের সকল পাপ তাপ, সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভস্মীভূত হইয়া এক স্বর্গ-রাজ্য সৃষ্টি করিবে।

আর হে অনাদি দেব, হে বিধাতা, তুমি ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছ। তুমি ত বলেছ, তুমি আবার আসিবে। ধর্ম্মের বড় গ্লানি, অধর্ম্মের এত বড় অভ্যুত্থান ত কোন যুগে হয় নাই ! এখনও কি তোমার ধৈর্য্যচুতি ঘটিল না ? এস, যথেষ্ট হয়েছে। এস, আর আমরা আত্মবিস্মৃত হব না, আর আমরা ভাইকে

পর করে দেব না, আর আমরা আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব হব না। এস, এইবার এসে, ঠিক কেন্দ্র স্থানে বসে আবার তেমনি করে তোমার প্রাণ-মাতান পাগলকরা বাঁশরী বাজাও, যাহাতে আকৃষ্ট হয়ে আমরা "গৃহ-কাজ লোক-লাজ" ভুলে তোমার পানে পাগলের মত ছুটে যাব। আবার তেমনি করে বাঁশরী বাজাও, যাহার অনাহত শব্দ-তরঙ্গে বনের পশু পক্ষী ঊর্দ্ধশ্বাসে তোমার দিকে ধাবমান হবে, আবার তেমনি করে যমুনা উজান বহিবে। আবার তেমনি করে মধুর বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর মদনমোহনরূপে দিক আলো করে রাসলীলা কর। হে দেবচক্রপাণি, তোমার সুদর্শন এনে দেশের সকল পাপ, সকল ত্রুটী চিরতরে বিনষ্ট কর। আবার রাধানামে জগৎ মাতাইয়া ঐ নামে সকল চৈতন্য-ধারা বহির্মুখ হইতে অন্তর্মুখী কর। নিরুপায় অসহায় জীব কেবল তোমার দিকেই চেয়ে আছে। প্রকাশিত হবে না কি ?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ভগবদ্‌গীতা।

বর্ষাকালে শত শত নদনদী যেমন নানা দিক্ দেশান্তর হইতে ধাবিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তেমনি অগণিত নরপতি অসংখ্য সৈন্য লইয়া সুবিস্তৃত ভারতের সকল স্থান হইতে আসিয়া, কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ প্রান্তরে উভয় পক্ষ শিবির স্থাপন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব প্রবল পরাক্রান্ত মদগর্ব্বিত কৌরব-গণের সেনাপতি হইয়াছেন, আর কৃষ্ণ দুর্ব্বল ও দরিদ্র পাণ্ডবগণকে পরিচালিত করিতেছেন।

ক্রমে প্রভাত হইল। দিবাকর ভারতে বিষম আত্মদ্রোহ উপস্থিত দেখিয়া রক্তিম বর্ণে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ স্বীয় স্বীয় শিবির হইতে নির্গত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষই সৈন্যগণকে অস্ত্র সস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে সকলকে দণ্ডায়মান করিলেন।

শ্বেতঅশ্বচতুষ্টয় অহঙ্কারদৃপ্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথ বহন করিতেছে। সেই রথের চূড়ায় কপিধ্বজা গৌরবে উড়িতেছে। কৃষ্ণ স্বয়ং সেই রথের সারথি। এমন সময় ভীষ্মদেব ভীষণ শঙ্খনাদ করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন। অমনি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন স্বীয় স্বীয় শঙ্খের গভীর নির্ঘোষ দ্বারা স্বীয় সৈন্যদল মাতাইয়া তুলিলেন। অমনি উভয়পক্ষে বহু শঙ্খ ধ্বনিত হইল, কিছুকাল পরে আবার স্থির ও শান্তভাব ধারণ করিল। মহাঝটিকায় পূর্ব্বে প্রকৃতি প্রশান্ত হইল।

তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ, উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ রাখ, আমি একবার সকলকে দেখি।" কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। তখন অর্জ্জুন দেখিলেন, তাঁহার ভক্তি-ভাজন পিতামহ ভীষ্মদেব, পূজ্যপাদ আচার্য্য দ্রোণ, স্নেহাস্পদ আত্মীয় স্বজন, সকলেই কোন না কোন পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল। তিনি

বলিলেন, "মাধব, এই যুদ্ধে গুরুজনদিগকে নিহত করিতে হইবে, বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনষ্ট করিতে হইবে, কুলক্ষয় করিতে হইবে। এত অকর্ত্তব্য কার্য্য, এত অধর্ম্মাচরণ আমি করিতে পারিব না। জয়, রাজ্য বা সুখ, কিছুই আমি চাহি না। তাহাপেক্ষা ভিক্ষাদ্বারা জীবন যাপন করিব।" এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া, অতি বিষণ্ণ মনে রথ মধ্যে বসিয়া পড়িলেন।

তখন কেশব সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন, আর গীতার মধুর মঙ্গল গীতি আরম্ভ হইল :—

[ক] কর্ম্ম-যোগ। *

অর্জ্জুন, এই বিষম বিপদ সময়ে তোমার মোহ উপস্থিত হইল! হায়, মোহই যে সকল অনর্থের মূল (২—২)! তুমি মোহ বশতই দুঃখিত হইতেছ, ভীত হইতেছ, কাপুরুষতা প্রকাশ করিতেছ। মোহ বশতই কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছ, কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য ও অধর্ম্ম বলিয়া ভাবিতেছ।

১। আত্মা নিত্য বস্তু, তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা নষ্ট হয় না(২—১৮।২০)। এই জন্য জ্ঞানীগণ কেহ জন্মিলেও আনন্দিত হন না, কেহ মরিলেও দুঃখিত হন না (২—১১। মনুষ্য যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া, নূতন শরীর গ্রহণ করে (২—২২)। তবে দুঃখিত হইতেছ কেন? যদি মনে কর আত্মা জন্মিতেছে আর মরিতেছে, তাহতেই বা দুঃখ কি? সংযোগ হইলেই বিয়োগ হইবে, বিয়োগ হইলেই সংযোগ হইবে। জন্মিলেই মরিতে হইবে, মরিলেই জন্মিতে হইবে (২—২৬।২৭)। যেমন এই দেহে কুমার, যৌবন, জরা, এই ত্রিবিধ অবস্থা হয়, সেই রূপ মৃত্যুও হয়। (২—১৩)। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। তবে কেন অপরের প্রাণত্যাগে দুঃখিত হইবে? বা মহৎকার্য্যে আত্মোৎসর্গ প্রদান করিতে ভীত হইবে?

২। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন কর (২—৩১) স্বদেশ সেবাই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও জন সাধারণের হিতসাধন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করা, দেশের জন্য প্রাণদান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা, দক্ষতা এবং স্বাধীনতা ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম, দেশসেবকেরই কর্ম্ম (১৮—৪৩)। আর, আজ তুমি তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছ! কৌরবেরা অন্যায় অত্যাচার বলিয়া তোমাদের রাজ্য গ্রাস করিয়াছে। তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া ও তোমাদের রাজ্য উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য। কারণ অত্যাচার ও অবিচার প্রশ্রয় পাইলে কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারেনা, কোন দেশই উন্নত হইতে পারে না। অতএব দেশোপকারের জন্যও তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি তুমি এই যুদ্ধ না কর, সকলেই তোমার নিন্দা করিবে। হায়, নিন্দিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ! যদি এই যুদ্ধে

* কোন একটী বিষয়ে মনকে সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত রাখার নাম, অর্থাৎ একাগ্রতার নাম যোগ। এখানে কর্ম্ম-যোগ অর্থে কর্ম্ম করিবার কৌশল বা প্রণালী (গীতা ২—৫০)। গীতার কর্ম্ম অর্থে সকল প্রকার কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত M-A, B-L প্রণীত গীতার ঈশ্বরবাদ পৃঃ ৩৭। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত ৫ খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদ। আমরা গীতার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত আদির সহিত তাহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বলিতেছি। ইহা গীতার উপর Lecture বিশেষ।

তোমার মৃত্যু হয়, সেও ভাল। দেশের জন্য সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা পুরুষের প্রশংসার বিষয় আর কি আছে? আর যদি জয়ী হও, ভারত ভোগ করিতে পারিবে (২—৩৭)।

৩। কর্ম্ম কখনও ত্যাগ করিও না *। তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা-উপজীবী সন্ন্যাসী হইতে চাহিতেছ, ইহা অত্যন্ত অকর্ত্তব্য। (১) কর্ম্মত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। জীবন ধারণের জন্যও যে অহরহ কর্ম্মের প্রয়োজন (৩—৮)। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। মনুষ্য ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতিই তাহাকে সতত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে (৩—৫)। (২) বেদ যে যাগ যজ্ঞের বিধি দিয়াছেন, সেই যাগযজ্ঞও কর্ম্ম ব্যতীত আর কি (৩—১৪।১৫)? অতএব কর্ম্ম কোন ক্রমেই নিন্দনীয় নহে। (৩) জনকাদি রাজর্ষি কর্ম্ম দ্বারায়ই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন (৩—২০)। (৪) মনুষ্য সমাজের উন্নতির জন্যও কর্ম্ম করা প্রয়োজন (৩—২০)। একমাত্র কর্ম্ম-বলেই মনুষ্য-সমাজ চলিতেছে, একমাত্র কর্ম্ম ফলেই এত উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। একমাত্র কর্ম্মদ্বারাই দেশোন্নতি সাধিত হইতেছে। এই পৃথিবী মহা কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মত্যাগে দেশে অলসতা আসিবে, দুঃখ বৃদ্ধি হইবে, দেশ অধঃপাতে যাইবে। (৫) এই বিশ্বের কর্ম্মই কৌশল। ইহাও কার্য্যকারণ পরম্পরায় চলিতেছে। অতএব কর্ম্মত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। (৬) আবার কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলেই কি মুক্তি লাভ হয় (৩—৪)? তাহা হইলে পাহাড় পর্ব্বত ত আজন্ম-সিদ্ধ? কেহ কর্ম্ম না করিয়াও যদি মনে মনে সতত কুচিন্তা করে, তবে সে ঘোর পাপী (৩—৬)। মন-শুদ্ধিই আসল কথা, মন-শুদ্ধিই মুক্তির উপায় (৩—৬।৭)। (৭) শুধু জ্ঞানের দ্বারায়ও মুক্তি অসম্ভব। কারণ জ্ঞান আহরণার্থ কর্ম্ম করার প্রয়োজন (৬—৩)। কর্ম্ম না বলিয়া কোন জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ লয় না *। কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞান সংশোধিত হয়। কর্ম্ম দ্বারায়, সাধনা দ্বারায় জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়। কর্ম্মই দুঃখ দূরের উপায়, বিমল আনন্দ লাভের হেতু। তেমনি

* গীতা ২—৪৭।৪৮॥ ৩—৭।৮।১৯।২০।২৬।৩০॥ ৫—২॥১৮—৯।২৩।৪৬। অর্জ্জুন যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে, কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ করা কোনমতে কৃষ্ণের মত হইতে পারে না। আর তাহা হইলে গীতার কর্ম্মযোগের সার্থকতাই থাকে না। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত, ভারতের এই ষড় দর্শন। ইহাদের মত এই যে, সংসারে সুখের ভাগ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই বেশী। সেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এবং অত্যন্ত ও নিত্য সুখ লাভই পরম পুরুষার্থ। তাহার উপায় কি? পূর্ব্ব মীমাংসার মত এই যে, স্বর্গ কামনায় বেদবিহিত যাগ যজ্ঞ কর। কারণ তাহা হইলে স্বর্গ লাভ হইবে এবং স্বর্গ লাভ হইলে দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের সাক্ষাৎ হইবে। আর সকল দর্শনের মত এই যে, মনুষ্য যত কার্য্য করে, সুখ ভোগের বাসনায় করে। কিন্তু সকল কার্য্যই সুখের হয় না, সুখকর না হইলে দুঃখেরই কারণ হয় মাত্র। অতএব বাসনাই দুঃখের মূল। সেই বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে কি রূপে? কর্ম্মত্যাগ করিলে বাসনাও যাইবে। অতএব কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করাই শ্রেয়। কৃষ্ণ গীতায় এই সকল মত খণ্ডন করিতেছেন। বলিতেছেন, "কাম্য কর্ম্ম করিওনা, তাহাতে দুঃখ হইবে। কিন্তু নিষ্কামভাবে আজীবন লোকহিত, দেশহিত সাধন কর, তাহাতে দুঃখ হইবে না, বরং আনন্দ হইবে। তাহা করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম।" ইহাদ্বারা দেখা যায় যে, সন্ন্যাস ও বানপ্রস্ত কৃষ্ণের মতবিরুদ্ধ। ইহা কৃষ্ণের ন্যায় মহাকর্ম্মবীরের মহাদেশ-সেবকের উপযুক্ত বটে।

আবার জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাচিত হয়, জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হয়। যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সে কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারেনা। জ্ঞান ও কর্ম্ম, ইহারা নিত্য-সম্পর্ক বিশিষ্ট। (৮) আবার জ্ঞানী ব্যক্তিরও সতত কর্ম্ম করার প্রয়োজন (৩—২৬)। কারণ জ্ঞানীরা যাহা করেন, সাধারণেও তাহাই করে (৩—২১)। এজন্য জ্ঞানীগণের উচিত যে সতত কর্ম্মেলিপ্ত থাকিয়া জনসাধারণকেও কর্ম্মে নিযুক্ত রাখেন (৩—২৬)। দেখ, আমার কোন স্বার্থ নাই, তথাপি আমি দেশ-হিতার্থে সতত কর্ম্ম করিতেছি. আমি কর্ম্ম না করিলে, আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপর সকলেও কর্ম্মত্যাগ করিবে। তাহাতে মনুষ্য-সমাজ উৎপন্ন হইবে, দেশ অধঃপাতে যাইবে (৩—২৩।২৪) দেশোপকারই আসল কথা। দেশোপকারার্থ জ্ঞানীগণ সতত কর্ম্ম করিবেন (৩—২৫)। তবে সকল কর্ম্মকরারই উৎকৃষ্ট কৌশল আছে, প্রণালী আছে। তাহাকেই কর্ম্ম-যোগ বলে (২—৫০)। তদনুসারে কর্ম্ম কর, দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, বিমল আনন্দের উদয় হইবে। কৃতকার্য্যও হইবে, মুক্তিলাভও করিতে পারিবে।

৪। **কাম্যকর্ম্ম**—অবশ্য ত্যাগ করিবে। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য তোমার স্বার্থ-সাধন, যশ-উপার্জ্জন, নিজের সুখভোগ বা বিলাস সম্ভোগ, তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। কুকর্ম্ম কাম্য কর্ম্মের অন্তর্গত। কারণ লোকে নিজের সুখের লালসায় কুকর্ম্ম করে। স্বার্থ সাধনের জন্য যে বাসনা, তাহাই দুঃখদায়ক। দেশহিতার্থে কর্ম্ম করিবার যে বাসনা, তাহা কেবলই আনন্দদায়ক।

৫। **কর্ত্তব্য কর্ম্ম** অবশ্য করিবে। যাহা করাই ধর্ম্ম, না করাই অধর্ম্ম। যাহা করা কর্ত্তব্য বুঝিবে, তাহা কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবশ্য করিবে (১৮—৯)। সকল কর্ত্তব্য অতি পবিত্র। কিন্তু জনসাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য, তাহা পবিত্রতম। অতএব সিদ্ধি বা অসিদ্ধি, নিন্দা বা প্রশংসা, লোভ বা ভয়, সুখ বা দুঃখ, কিছুতেই কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিরত হইওনা (১৮—৮।১০) কৃতকার্য্য না হইলেও, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে বলিয়া আনন্দিত হইতে পারিবে। যশস্বী হইতে পারিবে। কল্যকার কর্ত্তব্য অদ্যই করিবে, অপরাহ্ণের কর্ত্তব্য পূর্ব্বাহ্ণেই সুসম্পন্ন করিবে। যখন সকলেই সকল ভুলিয়া কর্ত্তব্য করিবে, তখন সকলের লক্ষ্য এক হইবে, কার্য্য এক হইবে, দেশে একতা ও সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইবে, মহা-মিলনের দিন আসিবে। তখন অসাধ্য সাধিত হইবে, অসম্ভব সম্ভবপর হইবে।

৬। **কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যেও আবার অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম আছে এবং কুকর্ম্মের মধ্যেও আবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে।** (৪—১৮) তাহা নির্ণয় করিতে অতি বুদ্ধিমানেরও ভুল হয় (৪—১৬)। অতএব সে সকল জানিয়া কার্য্য করিবে। যেমন কাহারও হিংসা করা কুকর্ম্ম। কিন্তু যুদ্ধে হিংসা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তেমনি, অপরের উপকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু যদি তাহা করিলে অন্যায়ের প্রশ্রয় প্রদত্ত হয়, দেশের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা করা উচিত নহে। তাহা অকর্ম্ম। তথাপি যদি সেই কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে কুকর্ম্ম হয়। স্বদেশ সেবা-ব্রত সর্ব্বোচ্চ ও

সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহার নীচে অন্য সকল কর্ত্তব্য। এই মহৎ কর্ত্তব্য-পালন-পথে যদি অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অন্তরায় হয়, তবে তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে। আবার যাহার মন ভোগৈশ্বর্য্যে মত, সে কখনও কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না (২—৪৪) তাহাতে তাহার স্বার্থ সাধিত হয়, সে কেবল তাহাই বুঝে, তাহাই করে।

৭। **নিষ্কাম** ভাবে সতত কর্ম্ম করিবে (৩—১৯)। (১) তুমি যে কার্য্য করিবে, তাহার ফল তুমিই ভোগ করিবে, কদাচ এই রূপ কামনা করিবে না। (২) এইরূপ কামনা তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ যেন না হয়। (৩) এইরূপ কামনা কার্য্য করিবার সময় তোমার মনে যেন কদাচ উদিত না হয় *।

কেন নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবে?

(১) যিনি নিষ্কাম, একমাত্র তিনিই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে পারেন। স্বার্থপর ব্যক্তির সাধ্য নাই যে তাহা করে। (২) নিষ্কাম না হইলে নিঃস্বার্থপর হওয়া যায় না। তাহা না হইলে বহু ব্যক্তি ও বহুজাতি একতায় আবদ্ধ হইতে পারে না, কোন মহৎ কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে পারেনা। (৩) নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষ্য মাত্র একটী—কি উপায়ে দেশহিত সাধিত হইবে। আর কার্য্য কর্ম্মের লক্ষ্য অনন্ত (২—৪১) কারণ কামনা অনন্ত, ভোগ্য বস্তুও অনন্ত। (৪) সকাম কর্ম্মে কামানানুরূপ ফল উৎপন্ন না হইলে, আর সেই ফল ভোগ করিতে না পারিলে দুঃখ হইবেই হইবে। কিন্তু নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিলে, সেরূপ দুঃখের সম্ভাবনা নাই। অকৃতকার্য্য হইলেও, নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলে বলিয়া বিমল আনন্দ পাইবে। (৫) তুমি যদি নিষ্কাম কর্ম্মী না হও, তাহা হইলে কাহারও উপকার করিলে প্রত্যুপকারে প্রত্যাশা করিবে। যদি তাহা না পাও, তাহা হইলে একজনের কৃতঘ্নতায় আর সকলের উপকার করিতে বিরত হইবে। সমাজস্থিতির মূলই যে পরোপকার, তাহার অভাব হইলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। (৬) নিষ্কাম কর্ম্মীর বুদ্ধি † সতত শুদ্ধ। তিনি কিছুই নিজের স্বার্থের জন্য করেন না, সকলই সকলের জন্য, দেশের জন্য করেন। সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যেই পাপ হয় না (১৮—১৭)। (৮) নিষ্কাম কার্য্য কখনও বিফল হয় না (২—৪০)। নিষ্কাম ভাবে দেশহিতার্থে একবার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে কর্ম্মের আর শেষ হয় না। তাহাতে যে বিশুদ্ধ আনন্দের উদয় হয়, তাহা একের পর অন্যটী, এইরূপে আজীবন নিত্য নূতন দেশহিতকর কার্য্য করিতে উৎসাহিত করে। যদিও তুমি কোন কারণে তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে না পার, তাহা হইলেও তোমার পশ্চাতে যাহারা আসিতেছে, তাহারা তোমার নিষ্কাম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, তোমার ন্যায় নিষ্কাম ভাবে দেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইবে। যুগের পর যুগ, বংশের পর বংশ তোমার অসম্পন্ন কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। একবার নিজ জীবনে এই নিষ্কাম দেশ-সেবা-ব্রত আরম্ভ করিয়া দাও, দেখিবে, তাহার কি আশ্চর্য্য ও অবিনাশী পরিণাম হয়। এক দিকে তাহা তোমার হৃদয় মন উদার ও উন্নত করিবে, অন্য দিকে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমিক সংখ্যা ... কলিকাতা।

* বুদ্ধ দেব নিষ্কাম কর্ম্ম প্রধান ধর্ম্ম প্রচার করেন। চারুচন্দ্র বসুর অশোক, উপক্রমণিকা পৃঃ ১।

† বুদ্ধি—অভিপ্রায়—motive.

তোমার নিষ্কাম কার্য্য লোকসমাজে এমন প্রভাব বিস্তার করিবে যে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। আবার নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিলে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে (২—৪০)। যে নিজের সুখ দুঃখ. লাভালাভ, সমুদয়ই দেশের চরণে উৎসর্গ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মী হইয়াছে, তাহার আর আছে কি. যাহার ক্ষতি বৃদ্ধিতে ভীত হইবে? (৮) আবার নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করাই কৃতকার্য্যতার মূল। যদি ভাব, তোমার কর্ম্মের ফল তুমি ভোগ করিবে, তাহা হইলে সেই ফলভোগের লালসা, কিরূপে কোন্ সময়ে সেই ফল ভোগ করিতে পারিবে, কি উপায়ে অধিকাংশ ফলই তুমি প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি বহু চিন্তা, আবার কখনও যশের লালসা, কখনও ধনের বাসনা, কার্য্য করিবার সময়েই তোমার মনকে বিচলিত করিবে। কিছুতেই সেই কার্য্যে তোমার একাগ্রতা জন্মিবে না, কৃতকার্য্যও হইতে পারিবে না। আর যদি তোমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগে তোমার বাসনা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল চিন্তার একটীও তোমার মনে উদিত হইবে না। কিরূপে সেই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইবে, কেবল তাহারই একটী মাত্র চিন্তা অহরহ তোমার মনে জাগরূক থাকিবে। সুতরাং তুমি একাগ্র চিত্তে মন প্রাণ দিয়া ঐ কার্য্যটী করিতে সমর্থ হইবে। কাজেই কৃত-কার্য্যও হইতে পারিবে। (৯) দশজনে মিলিয়া মিশিয়া যে মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা করার সময় প্রত্যেকেই যদি ভাবে যে সেই কার্য্যের ফল সেই একা উপভোগ করিবে, তাহা হইলে প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইবে, একজনের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থি হইবে, সকলই পরস্পরের সহিত বিরো থাকিবে; কেহই কার্য্যটা সুসম্পন্ন কার সচেষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে সকলেই নিষ্কাম ভাবে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তা হইলে কেহই নিজের লাভালাভের প্র দৃষ্টিপাত করে না, কাজেই কাহারও সহি কাহারও বিরোধ উপস্থিত হয় না। সকলে মন প্রাণ দিয়া সেই কার্য্যটী সুসম্পন্ন করি চেষ্টা করে। যুদ্ধ করিবার সময় সৈনিকগ যদি ভাবে যে তাহাদের যুদ্ধজয়ের ফ তাহারাই ভোগ করিবে, তাহা হইলে তাহা জয়লাভ করা অপেক্ষা, প্রাণরক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়। প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হইলে কখনও যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়? সৈনিকেরা তাহাদের পরিশ্রমের ফলভো করিতে চায় না, যুদ্ধের সময় সেই ফলভোগে বাসনা যাহাদের মনে একবারও উদিত না, একমাত্র তাহারাই প্রাণপণে যুদ্ধ করি পারে এবং তাহারাই কৃতকার্য্য হয়। (১ কর্ম্ম করা বা না করা তোমার ইচ্ছাধীন, কি কর্ম্মের ফল তোমার ইচ্ছাধীন নহে। তোমা সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তোমার বা তোমা সহকারীর সামান্য ত্রুটীতে সকলই পণ্ড হই পারে। ঝটিকা, বৃষ্টি, বর্ষা, অগ্নি প্রভৃতি দৈব কারণেও তোমার কার্য্য নষ্ট হই পারে। ফল যখন অনিশ্চিত, তখন কর্ম্মে ফল তুমিই ভোগ করিবে, এইরূপ কামনা যে তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ না হ এইরূপ কামনা যেন কর্ম্ম করিবার সম তোমার মনে উদিত না হয় (২—৪৭)* (১১) নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে কাহার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই (২—৪০)। কার

* সহকারীর সামান্য ত্রুটীতে সমুদয় কর্ম্ম নষ্ট হয়। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই, ওয়াটালু যুদ্ধের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় সেনাপতি নে কর্ত্তৃক কোয়াটার ব্রাস নগরী অধিকার না করা এবং তাহা অধিকার করিয়া যে বসিয়া

মার নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যেমন অপর সকল াগ করিবে, তেমনি অপরের নিষ্কাম কর্ম্মের ন সেই কর্ম্মকর্ত্তা ভোগ না করিলেও, তুমি ং সাধারণে তাহা ভোগ করিতে পারিবে। ষ্কাম ভাবে কার্য্য করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার , যদি সেই কার্য্যের ফল অযাচিতরূপে ামার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহা ধারণের সহিত ভোগ করিতে পারিবে *। ২) অভ্যাস যোগ অপেক্ষা জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ। ান-যোগ অপেক্ষা ধ্যান-যোগ শ্রেষ্ঠ। ধ্যান-াগ অপেক্ষা নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। র্ম্মফলে লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই নের চাঞ্চল্য যায়, শান্তিলাভ হয় (১২—১২)। ষ্কাম ভাবে কর্ম্মকরার তুলনা নাই। যিনি ষ্কামভাবে কর্ম্ম করেন, তিনি এত উন্নত, ন মহান্ যে, সেই অসামান্য পুরুষকে কেহই াজিত করিতে পারে না। (১৩) যদিও দ স্বর্গ সুখ কামনায় যাগ যজ্ঞ করিতে বস্থা দিয়াছেন, তুমি তাহাতে প্রলুব্ধ হইও (২—৪২ লাং ৪৫॥৯-২১)। স্বর্গের দেব-কে আরাধনা করিলে দেবগণকেই প্রাপ্ত ইবে, ঈশ্বরকে নহে (৯—২৫)। তাহা দাচ বাঞ্ছনীয় নহে। ঈশ্বরই সকলের লক্ষ্য। তএব তুমি, কি এই যুদ্ধ বা অন্য কর্ম্ম, কলই নিষ্কাম ভাবে করিবে। জ্ঞানীগণ খনও স্বীয় কর্ম্মফল ভোগে বাসনা করেন া (২—৫১)।

৮। কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে—(৩—৩০)। ঈশ্বর সর্ব্বসাধারণে বর্ত্তমান (৬—৩১)। সর্ব্ব সাধারণই ঈশ্বর। যে কর্ম্মের ফল নিজে উপভোগ না করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপভোগার্থ প্রদান করা হয়, তাহাই ঈশ্বরে অর্পিত হয়। তবেই তুমি তোমার সুখ সুবিধার জন্য লালায়িত হইও না, অপর সকলের—সমগ্র দেশের সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত হও। তেমনি অপর সকলেও যেন নিজ নিজ সুখ সুবিধা করিতে বাসনা না করে, কিন্তু অপর সকলের—সমুদয় দেশের সুখ সুবিধা করিতে লালায়িত হয়। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করাকেই নিষ্কাম ভাবে বা নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করা বলে এবং এইরূপ কর্ম্মের ফল ঈশ্বরে বা জনসাধারণে অর্পণ করা বলে। অতএব জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিও না, অবহেলা করিও না, তাহাদের উন্নতির জন্য রাত্রি দিন নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর। তাহাদের দিয়াই দেশ, তাহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। কতিপয়ের উন্নতিতে কখনও দেশ উন্নত হয় না।

৯। অহং-নাশ করিবে (১৬—২৪ লাং ১৮)। নতুবা নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা অসম্ভব। তোমার অস্তিত্ব ও স্বার্থ সর্ব্ব-সাধারণের অস্তিত্বে ও স্বার্থে ডুবাইয়া দিবে। সতত মনে রাখিবে, তুমিও তোমার জন্য নহ; তুমিও সকলের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য †। (২) কোন কর্ম্মই অহঙ্কার বুদ্ধিতে করিবে না, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে করিবে। অহঙ্কার-বুদ্ধি কি?

নেপোলিয়নকে সংবাদ দেয়া। দৈবকারণে সকলেই নষ্ট হইবার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, নেপোলিয়নের রুষ অভিযান ও নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই তুষার পতন ও তজ্জন্য তাঁহার বিপুল সৈন্যক্ষয়। মৎপ্রণীত বীর কেশরী নেপো-লিয়ন বোনাপার্ট দ্রষ্টব্য।

* কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়ার পরে ভারত ভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (২—৩৭)। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বিষয় ভোগ করিতে আদেশ করিলেন (২—৬৪)) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ীর পরে রাজা যুধিষ্ঠির বনগমনে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাজ্য ভোগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

† অহং-নাগ = Selfefacement.

আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি কর্ম্মকর্ত্তা, আমি একজন। মনের এই যে বিকার, তাহাই অহঙ্কার-বুদ্ধি। যে কার্য্য অহঙ্কার-বুদ্ধিতে করা হয়, তাহার মূলে স্বার্থ। অহঙ্কার বুদ্ধিতে দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, কর্ম্মকর্ত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, যশ উপার্জ্জন বা অন্য স্বার্থ সাধন। (৩) অহঙ্কারী অপরের সম্মান করেনা, অপরের মতের সমাদর করিতে জানে না, অন্যের নিকট হইতে কিছু শিখিতেও পারে না। সুতরাং দশজনের সহিত মিলিত হইয়া কোন মহৎ কার্য্যও করিতে পারে না। আবার সকলই অহঙ্কারীকে ঘৃণা করে, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চায়। (৪) সমস্ত কার্য্যই তুমি করিবে, কিন্তু মনে এইরূপ ভাবকে কদাচ স্থান দিওনা যে তুমিই কর্ম্মকর্ত্তা, যদি তাহা ভাব, তাহা হইলে মনে অহঙ্কারের উদয় হইবে। অহঙ্কারের উদয় হইলেই জ্ঞান নষ্ট হইবে, জ্ঞান নষ্ট হইলে স্মৃতি ভ্রংস হইবে, স্মৃতি ভ্রংস হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মও পণ্ড হইবে। (৫) যদি তুমি ভাব, তুমিই কর্ম্মকর্ত্তা, তাহা হইলে অন্য কর্ম্মাকর্ত্তারা, তোমার সহকারীরা ভাবিবে, তবে কি তাহারা শয়ন করিয়া কাল কাটায়? তখনই তাহাদের সহিত তোমার কলহ উপস্থিত হইবে। যে কার্য্যের সফলতা দশ-জনের সমবেত চেষ্টার উপর নির্ভর করে, তাহা পণ্ড হইবে। যুদ্ধের সময় সেনাপতিগণ বা সৈনিকগণ, প্রত্যেকেই যদি ভাবে যে সে-ই কর্ম্মকর্ত্তা, তাহা হইলে কিছুতেই সকলে একতায় কর্ম্ম করিতে পারে না, যুদ্ধেও জয়-লাভ করিতে পারে না। (৬) প্রকৃতিই লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে (৩—২৭)। তবে তুমি যে কর্ম্মকর্ত্তা, ইহা ভাবিবে কেন? (৭) আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি একজন, এই আমি আমি উদ্ধত ভাব সকল অনিষ্ঠের মূল। দেখ, তোমাপেক্ষাও কত অধিক ধনী, মানী, জ্ঞানী এ জগতে বর্ত্তমান। তবে অহঙ্কার করিবার কি আছে? ভাব, এই বিশাল বিশ্বের তুলনায় তুমি মত নগণ্য! (৮) আমার পুত্র, আমার বিত্ত, আমার সংসার—এই আমার আমার ভাব সঙ্কীর্ণতার মূল, বিবাদ বিসম্বাদের কারণ। অপরের পুত্র ও বিত্তকেও তোমার পুত্র ও বিত্তের ন্যায় মনে করিবে, সমুদয় বসুধাকে আপন ও আত্মীয় করিয়া তুলিবে। তবেত অপরের পুত্রের,অপরের বিত্তের ক্ষতি করিয়া তোমার পুত্রের, তোমার বিত্তের উপকার করিতে বিরত হইবে। (৯) অহঙ্কারীর মন অতি নীচ ও নিকৃষ্ট, তাহার আত্মোন্নতি সুদূরপরাহত। তাহার স্বদেশ-সেবা বহ্বাড়ম্বর মাত্র। যিনি অহং-নাশ করিতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই নিষ্কাম ভাবে স্বদেশ-সেবা করিতে সমর্থ। (১০) মনে রাখিবে, 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।

১০। বুদ্ধি—সতত শুদ্ধ রাখিবে* তাহা হইলে কোন কার্য্যেই অধর্ম্ম হইবে না (১৮—১৭)। তুমি যদি আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধকর, দেশোপকারার্থ যুদ্ধ কর, কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া যুদ্ধ কর,তাহা হইলে অধর্ম্ম হইবে না। যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ, তাহার নিকট লাভালাভ, জয়পরাজয়, সুখ দুঃখ, সকলই সমান। কারণ সে স্বার্থ সাধনের জন্য কোন কর্ম্ম করেনা, এজন্য অধর্ম্মেও পতিত হয় না (২—৩৮)।

* বুদ্ধি=অভিপ্রায়॥ motive.

১১। কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইওনা—ফলভোগে কামনা করিয়া যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে আবদ্ধ হইতে হয় (৫—১২)। কারণ কাম্যবস্তু অনন্ত। একটী কাম্যবস্তু উপভোগের নিমিত্ত কর্ম্ম করার পর, আর একটী কাম্যবস্তুর ও ভোগের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে আসক্তি জন্মে। মনের এই অবস্থাকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বলে। অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি কর্ম্ম-বন্ধনের সহায় (১৬—৪।৫)। তেমনি যে কর্ম্ম ঈশ্বর উদ্দেশে—জনসাধারণের হিতার্থে করা হয়, তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না (৩—৯।৩১)। যিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত আপনাকে একীভূত করিয়া লইয়াছেন, তিনি কখনও কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হন না (৫—৭)। কারণ তিনি যাহা করেন, নিষ্কাম ভাবে করেন, দেশহিতার্থে করেন। তাহাতে মন ক্রমেই উদার ও উন্নত হয়।

১২। অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিবে—(২—৪৮) কার্য্যসিদ্ধি হউক বা না হউক, সম্পদ আসুক বা যাক, আত্মীয় স্বজন থাকুক বা মহাপ্রস্থান করুক, এই দ্বিবিধ অবস্থাই যাঁহার নিকট সমান, তিনিই অনাসক্ত। রূপ রসাদি কোন বিষয়ই যেন তোমাকে পরাধীন না করে। তুমি সতত স্বাধীন থাকিবে, তাহাদের প্রভু থাকিবে। আসক্তি জন্মিলে স্বাধীনতা যায়, স্বাধীন ভাবে ভাবিবার ক্ষমতা বিনষ্ট হয়, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি নষ্ট হয়। মন স্বাধীন না হইলে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা যায় না, কর্ত্তব্য কার্য্যও নির্ণয় করা যায় না। যে দাস, তাহার নিকট কি প্রত্যাশা কর? আসক্তি থাকিলেই সকাম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে। আসক্তিই নিষ্কাম ধর্ম্মের অন্তরায়। অতএব পদ্মপত্র যেমন জলের মধ্যে থাকিয়াও আদ্র হয় না, তুমিও তেমনি রূপ রসাদি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ে জড়িত হইও না, স্বাধীনতা হারাইও না *

১৩। লক্ষ্যস্থির করিবে। পরে কোন্ কোন্ উপায় দ্বারা সেই লক্ষ্যলাভ হয়, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করিবে। শেষে স্থান কাল পাত্র বিবেচন করিয়া কার্য্য করিবে। তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

১৪। আত্মবিশ্বাস কর। (৬—৫)। আত্ম শক্তিতে কদাচ সন্দিহান হইওনা। তোমার মধ্যে ঈশ্বর বর্ত্তমান, তোমার মধ্যে অসীম শক্তির নিদান, তবে আর চিন্তা কি? এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্য করিবে। সংশয়ান্বিত ও অস্থির-চিত্ত ব্যক্তি কোন দিন কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। কদাচ আত্মাকে অবসন্ন করিও না (৬—৫), কদাচ দুর্ব্বলতার অধীন হইওনা। যে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে কখনও মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। যে কর্ম্ম দেখিয়া, প্রতিপক্ষ দেখিয়া ভয় পায়, সে কোন দিন কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। ভয়ই মানুষের সর্ব্ব প্রকার

* অনাসক্তের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথামৃতে আছে। উন্নতিকাম প্রত্যেকেরই সেই অমৃতোপম বইগুলি পড়া উচিত। তাহাতে আছে, এক চাষা এক ছেলে মরেছিল। সে কাঁদল না। তাহার স্ত্রী বল্লে, "হায়, তুমি একটু কাঁদলে না? "চাষা উত্তর করিল "কাল রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছিলাম "যে রাজা হয়েছি, আর সাত বেটার বাপ হইয়েছি। এখন ভাবছি, সেই রাজ্য আর সেই সাত ছেলের জন্য কাঁদব, কি তোমার একটা ছেলের জন্য কাঁদব?"

অবনতির মূল। মনুষ্যের অসাধ্য কোন্ কর্ম্ম আছে? তোমার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, এই রূপ দৃঢ় আত্ম বিশ্বাস লইয়া নির্ভয়ে ও প্রাণপণে কার্য্য কর, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। মনে রাখিবে, যাহা একদিন একজনে করিয়াছে, তাহা অপরেও অতঃপর নিশ্চয়ই করিতে পারিবে।

১৫। আত্মনির্ভর কর। আত্মাদ্বারায় আত্মাকে উদ্ধার কর (৬—৫)। তোমার চেষ্টা দ্বারা, তোমার সাধনা দ্বারা তোমাকে উন্নত কর। কদাচ কাহারও মুখাপেক্ষী হইও না। কদাচ কাহারও সাহায্যে তোমার কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহিও না। (৪—২০)। পরের উপর নির্ভর করিলে, তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে, ইহা কখনও ভাবিওনা। যাহারা আত্মচেষ্টায়, স্বীয় ক্ষমতায় অভীষ্ট না পায়, তাহারা কদাচ পরের সাহায্যে পরের কৃপায় তাহা পায় না। ঈশ্বর তাহাদেরই সহায়, যাহারা নিজ চেষ্টায় উন্নত হইতে চায়।

১৬। মনের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায়—সর্ব্বাগ্রে, সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই রক্ষা করিবে। (২—৪৮॥১৮—২৬), যাহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সংলগ্ন হইতেও মনকে বিচলিত করিতে পারে না, তাহারই মন স্থির হইয়াছে (২—৬৮)। মনের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায় ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধি হয় না। মন যদি সুখ দুঃখ প্রভৃতি কোন কারণে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুদ্ধিও চঞ্চল হইয়া উঠে। মনের যে শক্তি দ্বারা আমরা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করি, তাহাই বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি চঞ্চল হইলে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ভুল রূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় না এবং কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যায় না। যাহার মন স্থির নহে, ধীর নহে, তাহার উৎসাহ নাই, অধ্যবসায় নাই। তাহার মনে যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখনই সে তাহা করিয়া বসে। একবার এক কর্ম্মে, অন্যবার অন্য কর্ম্মে হাত দেয় ও সকল কার্য্যেই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করে। এইরূপ মন উশৃঙ্খলতা-জনক। একাগ্রতা দ্বারা এইরূপ চঞ্চল মনকে সংযত করিবে। একাগ্রতাই কার্য্য সিদ্ধির উপায়।

১৭। প্রবল পুরুষকার সহকারে কার্য্য করিবে। ঈশ্বরই মনুষ্যের মধ্যে পুরুষকাররূপে বিরাজ করিতেছেন (৭—৮)। তবে আর চিন্তা কি? প্রবল পুরুষকার ব্যতীত কখনও রিপুগণকে পরাজয় করা যায় না, কখনও কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। জ্ঞান ও চেষ্টা দ্বারা অতি চঞ্চল ও দুর্দ্দমনীয় মনকেও বশীভূত করা যায় (৬—৩৫)। চেষ্টা দ্বারা দুঃখ দূর করা যায়, চেষ্টা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হয় (১৮—৩৬)। সকলের মধ্যেই উন্নতি ও মুক্তির সামর্থ্য আছে, প্রবল পুরুষকার প্রদর্শনের শক্তি আছে। নতুবা যে চরিত্রহীন, সে চিরদিনই চরিত্রহীন থাকিত; যে অধঃপতিত, যে চিরদিনই অধঃপতিত থাকিত। তাহা ত নহে। প্রবল পুরুষকার দ্বারা কতজন উন্নত হইতেছে, আজ যে পতিত, কাল যে উদ্ধার হইতেছে, অসাধ্য সাধন করিতেছে।*

১৮। আত্মোৎসর্গ প্রদান করিবে।

* গীতা Predestination বা নিয়ুক্তবাদ-বিরোধী। নিয়ুক্তবাদ স্বীকার করিলে কর্ম্মের প্রাধান্য বিনষ্ট হয়, আচার্য্য নীলকণ্ঠ মজুমদার M-A কৃত গীতারহস্য পৃঃ ৬৪।৬৫।

লোকহিতার্থে, দেশ হিতার্থে সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিবে। মনুষ্য সমাজের কল্যাণার্থে দেশের মঙ্গলার্থে যে ব্যক্তিগত ত্যাগ, তাহা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম (৮—৩)। আত্মোৎসর্গ বিনা কোন মহৎ কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। যে অহং-নাশ করিয়াছে, যে নিষ্কাম হইয়াছে, একমাত্র সে-ই আত্মোৎসর্গ প্রদান করিতে পারে, সকলেই নহে। অতএব চরিত্র-যজ্ঞে যেমন রিপুগণকে আহুতি দিবে, তেমনি দেশ-যজ্ঞে—শুধু রিপু নয়, শুধু ধন নয়, মান নয়—সমুদয়ই আহুতি দিবে, আত্মোৎসর্গ প্রদান করিবে।

১৯। কর্ম্মোন্মাদ্ হইবে। সৎ কর্ম্মে যাহার আনন্দ ও উন্মত্ততা জন্মিয়াছে, সে-ই সিদ্ধিলাভের পথে আসিয়াছে। অতিশয় উৎসাহ, অতিশয় অধ্যবসায় ব্যতীত কেহই কর্ম্মোন্মাদ হইতে পারে না।

২০। সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িওনা। যে ব্যক্তি এক এক সময় এক এক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, পরক্ষণেই তাহা পরিত্যাগ করে, সে কখনও কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। আর যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সহস্র বাধা ও বিঘ্ন সত্বেও তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়েন না, একমাত্র তিনিই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, একমাত্র তিনিই যশস্বী হন। কার্য্যসিদ্ধিতেই উন্নতি ও কার্য্যের নিষ্ফলতায় অবনতি, ইহা ভুলিওনা।

এই প্রণালীতে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম্মযোগী। এইরূপ উচ্চ আদর্শ অনুসারে কর্ম্মজীবন গঠন করিতে হইলে জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

ইয়ুরোপীয় মহাসমরে অদৃশ্য হস্ত।

এক প্রাণরূপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, স্রষ্টা, সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপে জাগ্রত আছেন বলিয়া সৃষ্টির ব্যাপার সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতেছে; ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ নিজের জীবনে প্রত্যেক জাতির উত্থান, স্থিতি ও পতনে এবং সমগ্রমানবমণ্ডলীর ক্রমবিকাশ মধ্যে তাঁহার মঙ্গলময় অদৃশ্য হস্ত জ্ঞান-চক্ষে দেখিতে পান। তাঁহার অগোচরে বৃক্ষ হইতে একটী পত্রও পতিত হয় না; ক্ষুধার্ত্ত কাকশাবকও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল-কাম হয় না। এই সকল পুরাতন কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অবিশ্বাসী কি বিষয়ের কীট অর্দ্ধবিশ্বাসীদের, বিশেষতঃ এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞদের, ব্যবহার দেখিয়া অনেক সময়ে ইহার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক হয়। প্রাচীন কালে চার্ব্বাক, এপিকিউরাস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে জড়বাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক দার্শনিক ডারউইন্ প্রভৃতি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ ইতর জীব জন্তুর ব্যবহারকে প্রকৃতির নির্দ্দেশ জ্ঞানে, তাহা মনুষ্যেরও উপযোগী বলিয়া ঐ জড়বাদের সমর্থন করেন। "ক্ষুদ্র মৎস্যকে বৃহৎ মৎস্য; বৃহৎ মৎস্যকে, তিমি মৎস্য ভক্ষণ করিয়া নিজ নিজ শরীর পুষ্টি সাধন করে। তিমিংগিল তিমিকে, এবং তিমিং গিলংগিল, তিমিংগিলকে ভক্ষণ করে। এইরূপ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই জীবন-সংগ্রাম

চলিতেছে। এই সংগ্রামে যে বিজয়ী, সেই প্রকৃতির নিয়ম মতে জীবিত থাকার উপযোগী।" ডারউইনের এই মত ইতর জীব জন্তু সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইলেও তাহা যে সুসভ্য মনুষ্য সমাজের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য, কি আদর্শ নীতি নয়, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কারণ, পাশব বল অপেক্ষা নৈতিক বল, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র এবং দেব-প্রকৃতিই মানব প্রকৃতির বিকাশ-পরিণাম। প্রাচীন ইহুদী পৈগম্বরগণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষবৎ পরমেশ্বরের বিধান দেখিতেন এবং ইহুদীগণ তাঁহাকে রাজাজ্ঞানে আরাধনা করিতেন। হিন্দুগণও তাঁহাকে জগৎপিতা, জগৎপাতা ও জগৎসংহর্ত্তা জ্ঞানে আরাধনা করেন। চাণক্য, মেকিয়াভিল্, বিস্মার্ক প্রভৃতি যে রাজনীতি অনুসরণ করেন, ডারউইনের প্রচারিতজড়বাদপোষক মতে তাহা নির্ব্বাণোন্মুখদীপশিখার ন্যায় বৃদ্ধিপায় এবং সম্প্রতি বিগত মহাসমরে তাহা ক্ষীণপ্রভ ও হীনবল হইয়াছে, শীঘ্রই লোপ পাইবে, এরূপ আশা করা যায়।

স্থূলদর্শী অর্দ্ধবিশ্বাসী লোকেরা মনে করে, "ভগবান্ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার শাসনভার তিনি শয়তানের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টির সর শয়তানের চেলারা ভোগ করে।" যেন মনে করে, তিনি সৌরজগৎ রূপ "টাওয়ার ক্লকে" (Tower Clock), চাবির দম দিয়া সুদূর বৈকুণ্ঠ ধামে প্রস্থান করত প্রকৃতির সেবা গ্রহণ করিতেছেন; কিম্বা, বিশাল বিশ্বের অসংখ্য সৌরজগতের অন্য কোনও একটীতে ঐরূপ চাবির দম দিতে গিয়াছেন। সূর্য্য "পেণ্ডুলাম", মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি মধ্যে এক দোলন সমাপন করিয়া নরলোকে এক বৎসর এবং ব্রহ্মলোকের ক্রেস্কো-গ্রাফে" Cresco-graph) * ৩৩৬০০ "সেকেণ্ড" জ্ঞাপন করিতেছে, কারণ ব্রহ্মার একদিবসে মনুষ্যের ৪৩২ কোটী বৎসর বা এক কল্প হয়। পুরাতন "বাইবেলে" উল্লেখ আছে, পরমেশ্বর ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পরিশ্রম-বোধ, কি বিশ্রাম নাই, তিনি ক্রিয়াশীল, সর্ব্বত্র, সকল সময়ে বর্ত্তমান সর্ব্বান্তর্যামী; সৃষ্টি শাসন ও পালন কার্য্যে তাহার অন্য কাহারও সাহায্য আবশ্যক করে না; আর, অদূরদর্শী সাধারণ লোকেরা যাহাকে সৃষ্টির সর বলিয়া মনে করে, তাহা "দিল্লির লাড্ডুবৎ একটী নামজাদা চিত্তাকর্ষক কোনও কিছু; "যো'বি খায়া ও'বি ফস্তায়া, যো'বি না খায়া ও'বি ফস্তায়া" নির্ম্মল বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্য-সম্পাদন-জনিত আত্ম প্রাসাদই সৃষ্টির সর।

ইয়ুরোপীয় মহাসমরের ঘটনাবলী ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে যে সকল উপদেশ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই সেই মঙ্গলময় অদৃশ্য হস্তের বর্ত্তমানতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ইয়ুরোপে, বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, কল্যাবিদ্যা প্রভৃতি ক্রমশঃ বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে ধনবৃদ্ধি, ও বিলাসিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। বিলাসিতায় ধনস্পৃহা এবং ধনস্পৃহায়, লোভ, জড় বিজ্ঞান

* স্যার জেঃ সিঃ বসু, Dsc. F. R. S. মহোদয়ের আবিষ্কৃত যন্ত্র; ইহার দ্বারা উদ্ভিদ শরীর বৃদ্ধি-জ্ঞাপক গতি ১০ কোটী গুণ বৃদ্ধি পায়।

ও কলাবিদ্যার উন্নতি, প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্তাধীন করিয়া মনুষ্যের কার্য্যে নিযুক্ত করায়, ক্ষমতাবৃদ্ধি ও পুরুষকার-জনিত অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইয়া, সভ্যতাভিমানী জাতিগণ মধ্যে পাপবীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিষবৃক্ষ আকারে পরিণত হইয়াছে।

মনুষ্য মধ্যে পশু, দৈত্য ও দেব প্রকৃতি আছে। পঙ্কে পদ্মোৎপত্তিবৎ, পশু ও দৈত্য প্রকৃতির মৃত শরীরের গলিতপদার্থরূপ সার মধ্যে দেবপ্রকৃতি বিকাশ পায়। পাপবীজোৎপন্ন বিষবৃক্ষের অনিবার্য্য পরিণাম ধ্বংস। যখন লোকে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয় এবং ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, তখন তিনি "দর্পহারী ভগবান্" রূপে সাম্রাজ্য সকল ও নরপতিগণের পতন সাধন করিয়া মনুষ্য-সমাজে নূতন শাসন-প্রণালীর অবতারণা করেন; ইহাকেই অব্দ বা যুগ বলে।

পৌরাণিক দেবাসুরের যুদ্ধ ও দেবী যুদ্ধ, এবং মহাকাব্য-বর্ণিত লঙ্কা-সমর, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, ট্রোজান্ সমর প্রভৃতি হইতে "ধর্ম্মের জয় ও পাপের ক্ষয়" এই উপদেশটী স্পষ্ট বুঝা যায়। পৃথিবীর আধুনিক ঐতিহাসিক ঘটনামূলক মহা সমর সকলের বিষয় চিন্তা করিলেও ঐরূপ উপদেশ পাওয়া যায়।

যখন প্রাচীন রোমানদের মধ্যে বিলাসিতা, নিষ্ঠুরতা, অহঙ্কার প্রভৃতি জনিত নানা পাপের মাত্রা পূর্ণ হইল, তখন অসভ্য "হান" (Hun) ও "ভ্যাণ্ডাল" (Vandal)দের হস্তে তাহাদের ধ্বংস হইল। রোমের পোপ "স্বর্গের দ্বারের চাবিওয়ালা" দৌবারিক হইয়াও অবশেষে পৃথিবী-তলে ঈশ্বরের প্রতিনিধির ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন-প্রয়াসী হন। প্রায়স মস্ত ইয়ুরোপীয় সম্রাট, নৃপতি ও মুকুটধারী রাজন্যবর্গ, তাঁহার শিষ্য, তাঁহার মঠবাসী সন্ন্যাসিগণ ও মঠবাসিনী সন্ন্যাসিদের পাপস্রোতে ইয়ুরোপ প্লাবিত; কিন্তু সামান্য একজন সন্ন্যাসী, মার্টিন লুথারের হস্তে তাঁহার অধঃপতন। ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনের মুষ্টিমেয় সেনা হস্তে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান বোনাপার্টীর পরাজয়। পৃথিবীর এক সপ্তাংশব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং শান্তি যাঁহার করতলে বলিয়া গর্ব্ব, সেই সকল রুসিয়ার জারকে প্রথমে ক্ষুদ্র জাপানবাসীদের হস্তে পরাজয় ও পরে অত্যাচারগ্রস্ত প্রজার হস্তে সবংশে নিধন পাইতে হইল! জার্ম্মান্ কৈসারের (Kaiser) মিত্র শক্তির হস্তে অপরিমিত গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। যেমন বিশাল বনস্পতির পতনে আশ্রিত লতাগুল্ম, শকুনী, বাজ ও চিল প্রভৃতি পক্ষীর কুলায় এবং নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরু সকল ভূতলশায়ী হয়, সেইরূপ, জার্ম্মান্ সম্রাটের পতনে, তাঁহার কুমন্ত্রী পারিষদ ও পাপাচারী সেনাপতিগণ, আশ্রিত রাজন্যবর্গ, এবং প্রতিবেশী অষ্ট্রিয়ান্ সম্রাট ও বুলগেরিয়ার রাজা এবং মিত্রতাবদ্ধ তরুষ্কের সুলতান, সকলেরই পতন সাধিত হইল। এই সকল দ্বারা কি দর্পহারী ভগবানের লীলা বুঝা যায় না?

পুরাণে কথিত আছে, বিশ্বামিত্র ঋষিও কতকগুলি পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এমন কি, অনুরূপ যুগ্ম পদার্থের মধ্যে তাঁহার সৃষ্টটীই উত্তম এবং ত্রিশঙ্কুরাজার জন্য তিনি এক নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করেন। জার্ম্মান্গণ ব্যবহারিক কেমিষ্ট্রির সাহায্যে অনেকগুলি নকল সৃষ্টির অবতারণা করায় কৈসার অহঙ্কারে এতই স্ফীত হন যে, তিনি নিজকে "লোকোত্তর" মানুষ (Superman) এবং জার্ম্মান নিরীশ্বর সভ্যতাকে 'কাণ্টার"

(Culteur) বা উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না; জার্ম্মানেরা যেন ত্রিদিববাসী এবং তিনি তাহাদের শচীপতি ইন্দ্র। তাঁহার এই অপরিমিত ধৃষ্টতার কথা চিন্তা করিলে, প্রাচীন বাইবেলোক্ত ব্যাবেলের (Babel) কথা মনে উদয় হয়। প্রাচীন "কণ্ডিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী মহানগরী "ব্যাবিলন", আধুনিক ফরাসী রাজ্যের রাজধানী প্যারী নগরী বৎ, বিলাসব্যসন, বিজ্ঞান, ও সমৃদ্ধির প্রিয় আবাস-ভূমি ছিল। নিরীশ্বর নাগরিকেরা এতই গর্ব্বিত হয় যে, তাহারা সশরীরে স্বর্গে যাতায়াতে জন্য অভ্রভেদী উচ্চ একটী সিঁড়িপথ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাহাদের ঐ বাতুল অনুষ্ঠান কিছু অগ্রসর হইলেই, "জিহোবা (Jehova) তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে ভাষার এরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিয়া দেন যে, তাহাতে কেহই কাহারও কথা বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়। জার্ম্মানির কৈসারের, বিজ্ঞান-সিঁড়িপথেও জেপেলিন বিমানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রত্বের সনদ আনয়ন জন্য সশরীরে ব্রহ্মলোকে যাওয়ার প্রয়াসও তদ্রূপ বিফল হইয়াছে। বিকলপক্ষ উড়োকলের আরেহীবৎ তাঁহাকে "পুনর্মূষিকো ভব" বৎ ভূতলে পতিত হইতে হইয়াছে। পিপিলিকার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার পক্ষোদ্গম হয়। সে গর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়া কিয়ৎকাল বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর মধ্যে উড্ডীন হইয়া নিজকে গগনবিহারী পক্ষীরাজ গড়ুরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং ইতিমধ্যে হঠাৎ ছিন্নপক্ষ হইয়া ভূতলে "পপাতচ মমারচ" অভিনয় করে। কৈসারের দশাও কি তদ্রূপ নয়?

অজ্ঞাত অরণ্যবাস সময়ে সায়াহ্নে নিস্তব্ধ সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যে দুঃখকাহিনীর আলাপন হইত, এখন নির্জ্জন বেল্টিঙ্ক ভবনে সন্ধ্যার পর চা-পান সময়ে "জারিনার" সঙ্গেও কৈসারের তদ্রূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে "জারিণা ও জারের উপমা দেওয়ায় শ্রুতিকটু দোষ ঘটে; তজ্জন্য মন্দোদরী ও রাবণের সঙ্গে নির্বাসিত জার্ম্মান-দম্পতীর তুলনা করা যাইতে পারে। সম্ভবত "জারিণা" "কার্টেন লেক্চার" স্বরূপে, রাবণের প্রতি রাণী মন্দোদরীর উক্তির অনুকরণে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন,—

"নিজকর্ম্ম দোষে, নাথ, মজালে জার্ম্মনজাতি,
মজিলে আপনি, তব সহ মিত্রত্রয় আর।"

মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মানিতে যে এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের অভ্যুত্থান হয়, তাঁহাদের মতে, জাতীয় স্বার্থোন্নতি জন্য বিবেকবর্জ্জন, সত্যগোপন ও চম্বুক-চাতুর্য্য-আবশ্যকীয় গুণ, এবং যুদ্ধ, জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যোন্নতির আবশ্যকীয় ব্যায়াম বলিয়া গণ্য হইত। মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য ভাষার আবশ্যক; কিন্তু, ইহাদের মতে যেন মনের ভাব গোপন করার জন্যই ভাষার আবশ্যকতা। বস্তুত এই ভাষাদ্বারা ভাব গোপন প্রথাটী পৃথিবীর অনেক স্থানে রাজনীতিজ্ঞমণ্ডলী মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে, চতুর প্রিন্স বিস্মার্ক যাহা করিবেন, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিতেন, কারণ তিনি জানিতেন, তাঁহার বিপক্ষেরা, তাঁহার প্রকাশ্য উক্তির বিপরীত অর্থ করিয়া অসতর্ক থাকিবে এবং তিনি ঐ সুযোগে নিজের স্বার্থ সাধন করিতে পারিবেন। আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ও অন্যান্য কয়েকটী দেশ ব্যতীত এই দূষিত প্রথা সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

সুতরাং রাজনীতিজ্ঞমণ্ডলী-সভায় ঈশ্বরের নাম "দোকান মে মহাভারত?" * "বৎ হইবে, তাহা বিচিত্র কি? এস্থলে বলা আবশ্যক যে গ্ল্যাডষ্টোন্, ব্রাইট্, ফসেট প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই শ্রেণীভুক্ত নন। যাহা হউক, বিপদে, নাস্তিক, আস্তিক, অর্দ্ধনাস্তিক, সকলেই মধুসূদনকে প্রাণের সহিত ডাকে। ৫৭ মাইল দূর হইতে একটী অষ্ট্রিয়ান কামান হইতে প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর যখন বিলাসের আবাসভূমি প্যারী নগরীর উপর গোলা-বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন মিত্রশক্তি মধ্যে পুনর্ব্বার 'ত্রাহি মধুসূদন" ধ্বনিত হইতে লাগিল। সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কলা বিদ্যার, মোহিনী মূর্ত্তি হরিণাঙ্গনা রূপসী কুহকিনীবৃন্দের, নরশোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্র সদৃশ নরঘাতক দস্যুর, স্বর্গদ্বারের চাবিওয়ালা রোমের পোপের একদা প্রিয়ভূমি ইটালী রাজ্যে, শত্রুর বিপুল সেনাদল যখন, দুর্নিবার মত্ত হস্তীর পদ্মবলে প্রবেশবৎ, ভীতি বিস্তারে প্রবেশ করিল, তখন "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক উত্থিত হইল। যখন শত্রুসৈন্য প্রবল বেগে প্যারীনগরীর ২০ মাইল পূর্ব্ব দিকে উপস্থিত হইল, তখন, মিত্রশক্তির বিজয়াশা-রবি নিরাশার আবর্ত্তক মেঘে আবৃত হইল এবং "ত্রাহি মধুসূদন" বলিয়া পৃথিবীর সভ্য দেশ সকলের সমবেত প্রার্থনা এক স্বরে স্বর্গদ্বারে উত্থিত হইল। যাহারা সুবর্ণ কি রৌপ্য চামচ মুখে করিয়া পৃথিবীর আলোক দর্শন করিয়াছে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি এযাবৎ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এই দুঃখ পূর্ণ পৃথিবীর কোনও প্রকার আপদ বিপদে পতিত হয় নাই এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের নাম করা দূরে থাকুক, তিনি আছেন কি না, তাহারও তত্ত্ব লওয়ার আবশ্যক জ্ঞান করে নাই তাহারাও এখন সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনার সঙ্গে নিজদের প্রার্থনা মিশাইল। বাস্তবিক, বিপদই মনুষ্যের সম্পদ, কারণ সম্পদে ঈশ্বরবিস্মৃতি জন্মায় এবং বিপদে ঈশ্বর দর্শনলাভ হয়; তজ্জন্য, মহাভারতে এই সম্বন্ধে উপদেশপ্রদ সুন্দর একটী উপাখ্যান আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রাজধানী দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনোদ্যত হন, তখন তিনি, পাণ্ডব পরিবারের সকলকে নিজ নিজ অভীপ্সিত বরপ্রার্থনা করিতে বলায়, কুন্তী বর স্বরূপ বিপদ প্রার্থনা করিলেন। এই অদ্ভুত বর-প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কুন্তী বলিলেন, 'হে যাদব, তুমি, আমাদের বিপদের সময়েই দর্শন দিয়াছ; যদি, আমাদের বিপদ না হইত। তাহা হইলে ত তুমি আমাদিগকে দর্শন দিতে না।"

এই সত্যটী যেমন মনুষ্যের ব্যক্তিগত

* এরূপ কথিত আছে যে, একদা কাশীধামে কোনও এক স্থানে মহাভারত পাঠ হয়; তাহাতে একটী উপদেশ থাকে যে, গরু কোনও খাদ্য দ্রব্যে মুখ প্রদান করিলে তাহার এক গ্রাস সম্পূর্ণ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে তাড়ান উচিত নয়। শ্রোতবৃন্দের মধ্যে কোন এক মুদী দোকানের একটী বালক ছিল। কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের ষাঁড়ের অভাব নাই। পরদিন একটী ষাঁড় সেই দোকানের নিকট দিয়া যাইতে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত চাউল মধ্যে মুখ প্রবিষ্ট করে। সরল-মতি বালক, পূর্ব্বদিনের উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া, ষাঁড়কে বাধা না দিয়া, ষাঁড়ের তণ্ডুল গ্রাস গ্রহণের অপেক্ষায় উদাসীন দর্শকের ন্যায় থাকে; ইতিমধ্যে দোকানদার আসিয়া তথায় উপস্থিত হয় এবং বালকের ঐরূপ আচরণ জন্য ভৎর্সনা করিতে করিতে তাহার কৈফিয়ৎ তলব করে; বালক তখন মহাভারতের উপদেশের কথা বলায়, দোকানদার সক্রোধে বলে "দোকানমে মহাভারত?"

জীবনে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় জীবনেও তাহা লক্ষিত হয়।

যাহা হউক, মিত্র শক্তির কাতর প্রার্থনায় অবশেষে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উইলসন্, ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ও অন্যান্য জননেতাদের প্রতি "ওয়ারলেস্" (Wireless) বৎ, স্বর্গ হইতে প্রত্যাদেশ প্রেরিত হইল এবং বিবেক বাণী রূপে তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পাইল। চিত্তের নিষ্কামত্ব অনুসারে কেহ ঐ বাণী "ওয়ারলেস্ টেলিগ্রাফীর", কেহ বা "ওয়ারলেস্ "টেলিফোন্" বার্ত্তার ন্যায় যথাক্রমে পাঠ ও শ্রবণ করিলেন। প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ সম্ভবত "ওয়ারলেস্ টেলিফোন্ বার্ত্তায়" "আর্ম্মি কমিশন" (Army commission) পাইয়া সমরে সাজিলেন। ঐ স্বর্গীয় আদেশের মর্ম্ম সম্ভবত এইরূপ হইবে:—"তোমরা আমার রাজভক্ত প্রিয় প্রজা, প্রস্তুত হও, অবিলম্বে মহাসাগর পার হইয়া পৃথিবীর সভ্যতাকে বৈজ্ঞানিক অসভ্যতা-রাক্ষসীর আক্রমণ হইতে রক্ষা কর।"

প্রাচীন ইহুদী "ইজরিলের" বংশধরেরা যেমন "জিহোভার" প্রিয় প্রজা ছিলেন, "মেফ্লাওয়ার" (Mayflower) আরোহী "পিল্‌গ্রম্ ফাদার্স" (Pilgrim Fathers) যাত্রীগণের বংশধরগণ এবং তাঁহাদের সংসর্গজনিত গুণ প্রাপ্ত অন্যান্য "ইয়াঙ্কিগণ" (yankee) (কারণ, চন্দন-তরুর সহবাসে রাজে বৃক্ষও কি চন্দন বৃক্ষে পরিণত হয় না?) যে ঈশ্বরের প্রিয় প্রজা হইবেন, তাহা অসম্ভব কি? স্বাধীনতার যুদ্ধাবসানে, ধর্ম্মপ্রাণ "জেনারাল্ জর্জ্জ ওয়াশিংটন," জয়দাতা জনার্দ্দনকে, পারিষদ্-বেষ্টিত হইয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত ধন্যবাদ দিয়া, সর্ব্ব প্রথম প্রজাতন্ত্র-প্রণালীর রাজকার্য্য পরিচালন আরম্ভ করেন; সেই প্রথা, এই নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক যুগে এখনও "ওয়াশিংটন" নগরের "হোয়াইট হাউসে" (White House) অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধও রাজা প্রথম চার্লসের সময়ে পুনর্ব্বার আরম্ভ হয় এবং "ওলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell) তাহাতে যে প্রকারে জয়ী হন, তাহা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। ক্রম্‌ওয়েলও রাজকার্য্য পরিচালনে মুসাপৈগম্বরের ন্যায় সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনার ন্যায় ক্রমওয়েলেরও একদল সেনা ছিল; তাহাদিগকে তিনি নিয়মিত রূপে ঈশ্বর-প্রার্থনা মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তাহারা যুদ্ধে যাত্রা করিবার কালে ঈশ্বরের স্তুতিগান করিতে করিতে যাইত।* "জয়ন্ত পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ" কথাটীর সার্থকতা, এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা কি প্রতিপন্ন করে না? দর্পী নেপোলিয়ান্ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন "যে পক্ষে সৈন্যবল অধিক, সেই পক্ষেই ঈশ্বর থাকেন" (God is always on the side of the heaviest battalion)। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনও ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নারায়ণী সেনাবল-প্রার্থী হন। নেপোলিয়ান ও দুর্য্যোধনের যে পরিণাম হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে, কার্পাস ও ইক্ষুর আবাদ সকলে, আফ্রিকা হইতে আমদানী হতভাগ্য কাফ্রীক্রীত দাসদের আর্ত্তনাদে ও মৃতদেহে যে বায়ু মণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠ দূষিত হইয়াছিল, তাহাও উত্তর ভাগের অনুষ্ঠিত ক্রীতদাস মুক্তির যুদ্ধানলে বিশোধিত হয়। সুতরাং ঐ যুক্তরাজ্যবাসীগণ যে আধুনিক সভ্যজাতিদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়-প্রজা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? তৎপর প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ দলবলে ফ্রান্স ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা কি, সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন জন্য বিপুল কটক সহ শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা সমরাভিযান বৎ নয়? বন্দুকধারী শীকারীগণের আগমনে নরশোণিতলোলুপ শার্দ্দূল যেরূপ দূরবর্ত্তী অরণ্যে বিবরাশ্রয়ান্বেষণে পলায়ন করে, তদ্রূপ, নরপুঙ্গব (=নরবৃষ) লোকাত্তর পুরুষ (Superman) হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া "আর্ম্মার্ডকারে" (armoured car) আরোহণ করিয়া "কাউণ্ট বের্ণস্টর্ফ" ভবনাভিমুখে একাকী পলায়ন করিলেন। ইহা কি কালফণীর, বিষ্ণুদূত গড়ুরের ভয়ে ইন্দুরের গর্ত্তে প্রবেশকরণবৎ নয়? কিম্বা দূর হইতে লালপর্গ দেখিয়া, শ্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া, "হাওয়া গাড়ীতে" চড়িয়া ডাকাইদের দলপতির ফেড়ার-হওন বৎ নয়? কৈসারের পারিষদগণও অভিমান "পকেটে" করিয়া, "যঃ পলায়তি স জীবতি", বাক্যের অনুসরণ করিলেন! মিত্রশক্তিগণ এইরূপ দৈবপ্রেরিত সাহায্য পাইয়া দৈববলে বলী হইয়া জয়লাভ করিলেন। জয়দাতা জনার্দ্দনকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য দিন নির্দ্ধারিত হইল, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকেই উৎসবের দেবতাকে বিস্মৃত হইয়া, ঐ উপলক্ষে তাহাদের পূর্ব্বাভ্যস্ত আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। অনেক রোগী, হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের যাদুবৎ ক্রিয়া-বলে, কৃতান্তের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়া, সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্তির পর, হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রতি সন্দিহান হয়। নিদাঘের শুষ্ক তরাগের কর্দ্দম-লুক্কায়িত মৃতকল্প জলৌকা যেরূপ প্রাবৃটের পর্জ্জন্যের নবাম্ভ সমাগমে পুনঃ সঞ্জীবিত হয়, তদ্রূপ মিত্র শক্তির অনেক নেতৃগণের সার্ব্বভৌম সাশনেচ্ছা (Imperialism) পুনর্জাগ্রত হইত। আয়ার্ল্যাণ্ড, মিসর, ভারত প্রভৃতি হইতে চরমপন্থীদের পূর্ব্ববৎ চীৎকার আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পৌঁছিল; প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিঃস্বার্থ মীমাংসা ইটালী অগ্রাহ্য করিলেন, সিনেই পর্ব্বতের (Mount Sinai) দশ আজ্ঞাবৎ মান্যার্হ, মহাত্মা উইল্‌সনের ১৪টী প্রধান লক্ষ্য বিষয়ের কয়েকটী স্বার্থের চাপে ঢাকা পড়িল। তখন যুক্তরাজ্যের "সিনেটার লজ" (Senator Lodge)-প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মনে করিলেন, "পার হইলে লোকে, পাটনীকে যে অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রিয়তমার সহোদর আখ্যায় অভিহিত করে, ইহাও তদ্রূপ ব্যাপার। মিত্রশক্তিগণ যে উইলসন্‌কে কর্ণধার করিয়া, বিপদ-সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন, এখন যেন সেই উইল্‌সনই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের ভাগ্যবিধাতা নন। তাঁহারা মিত্রশক্তির হস্তে "বিড়ালের থাবা" (Cat's paw = অন্যের অভীষ্ট-সাধনের যন্ত্র) হইতে ইচ্ছা করেন না; তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্বপ্রচলিত চিরাগত

* "And then was organized that strange army ,by means of which Oliver achieved all his glories. There were, no doubt, many hypocrities in the ranks; but a spirit of sincere religion pervaded every regiment. Officers and men met regularly in the tents or the barrack-rooms to pray. They neither gambled, drank, nor swore. They often sang hymns as they moved to battle. And when, in the later days, they fought the battles of England on the Continent, the finest troops in Europe were scattered in flight before their terrible charge." Collier'sHistory of the British Empire.

"মন্‌রো নীতিই" (Monroe Policy) নিরাপদ ; তবে পৃথিবীর সভ্যতা ও শান্তির বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আবশ্যক মত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন।" তাই,—

"লিগ্ অব্ নেশান্‌স্ না হ'তে সম্পূর্ণ গঠন,
ক্ষোভে চলি গেলা দেশে, ছাড়ি মন্ত্রণা প্রাঙ্গণ,
মহামতি উইল্‌সন্।"

মনের হর্ষ বিষাদ ও শরীরের সর্দ্দি গর্ম্মি, এই দুইটীর মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দুর্দ্দিনের আশ্রয় মধুসূদনকে, জয়দাতা মঙ্গল-বিধাতা জনার্দ্দনকে স্বার্থান্ধ লোকেরা সুদিনে বিস্মৃত হওয়ায় তাহার শাস্তি স্বরূপ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হয়। এই শাস্তি ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধেও যেরূপ, জাতি বিশেষের পক্ষেও তদ্রূপ। শয়তানের চেলারা, বলে ও কৌশলে যাহা সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহা তাহারা ছলে সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহাদের প্রভু সর্ব্ব-প্রথমে এই নীতি, "ইডেন্" উদ্যানে মানব জাতির আদি জনক জননীর প্রতি প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হয়। যাহা হউক, তাহারা কৃতকার্য্য হইলেও দুষ্কৃতির পরিণাম-ফল কিছুতেই এড়াইতে পারে না। শীঘ্রই হর্ষ বিষাদে, জয় পরাজয়ে পরিণত হয়।

কৈসারের অতিবুদ্ধি পারিষদগণ, রুসিয়ার শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী সৈন্যদের সহিত কপট ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য জার্ম্মান্ সৈন্যদিগকে উপদেশ দেওয়ায়, তাহারা রুসিয়ার সৈন্যদিগকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া বুঝাইল,—

"ভাই সকল, এই যুদ্ধে আমরা গরীব লোক সকল ভাই ভাই মধ্যে পরস্পর মারা-মারি কাটাকাটি করিয়া কেবল নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছি ; এই যীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে আমাদের কোনও লাভ নাই ; লাভ আছে দেশের ধনী, মানী, ক্ষমতাশালী, বিদ্বান ও হোমড়া চোমড়া অন্যান্য বড়লোকদের ; তাহারা নিরাপদে থাকিয়া অর্থ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও উন্নতি লাভ করিতেছে ; আমাদের কপালে চিরকালই দুঃখভোগ ও বড়লোকদের দাসত্ব করণ। আমাদের স্ত্রীপুত্রগণ অন্নাভাবে মরিয়া যাইতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা পঙ্গপালের ন্যায় পালে পালে মরিতেছি ; যাও, তোমরা বাড়ী চলিয়া যাও, আমরাও বাড়ী চলিয়া যাই ; যুদ্ধ করার প্রয়োজন নাই।"

কথাগুলি সত্য এবং তাহা রুসিয়ার সৈন্য-গণের মনের কথাও বটে ; তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া দলে দলে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তৎপূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মান্ "মার্ক" (Mark = মুদ্রাবিশেষ) জারিণার অন্তঃপুরে প্রবেশ করত আধিপত্য বিস্তারের জনশ্রুতি দেশমধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। "জার্" অনন্যোপায় হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করি-লেন। "নিহিলিষ্ট্" (Nihilist)গণের হর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু, জার্ম্মানেরা বিষাক্ত গ্যাস্ ও দ্রব অগ্নিধারা প্রয়োগে যাহা করিতে পারে নাই, তাহা এখন শয়তানী নীতি অবলম্বনে সহজেই সাধিত হইল। ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের পালের মুক্তদ্বার মেষ খোয়ারে প্রবেশবৎ, ক্ষুধার্ত্ত জার্ম্মান্‌গণ খাদ্য সংগ্রহার্থ রাজ্যজয়াভিলাষে প্রবলবেগে রুসিয়াররাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রুসিয়ার জন-নেতৃগণ নিরুপায় হইয়া, পরাজিত পক্ষের ন্যায় সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাও একটী হর্ষবিষাদ ; রুসিয়ায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হর্ষের এবং জর্ম্মানির ছলনামূলক পরা-জয় বিষাদের কারণ।

এরূপ জনরব আছে যে, জার্ম্মান্ বৈজ্ঞা-নিকগণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" রোগবীজাণু বৃদ্ধি

করিয়া মিত্রশক্তি সৈন্যগণের বিনাশসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হয় ; কিন্তু ঐ সংক্রামক ব্যাধি পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া যে অসংখ্য লোকক্ষয়ের কারণ হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। কৈসারের মন্ত্রীদের আবিষ্কৃত "ভ্রাতৃভাবস্থাপন ছলনামন্ত্র বিষ" ও "বোল্‌শিভিজম্" (Bolshivism) আকারে পৃথিবীর শাসনতন্ত্র-সমাজ-শরীরের (body Politic) "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" ব্যাধিরূপে অল্প সময় মধ্যে সমস্ত পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া মৃত্যু ও অশান্তি বিস্তার করিতেছে।

"দুষ্কার্য্য দুষ্কর্ম্মার উপর প্রত্যাবর্ত্তন করে" (Evil deeds recoil upon the evil-doer), "লোকে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরে" ; ঊর্ণ-নাভ নিজের বিস্তৃত জালে আবদ্ধ হয়" ; "বিষ-বৃক্ষ রোপণকারীকে বিষফল ভোগ করিতে হয়।" "বোল্‌শিভিজম্" বিষ বীজাণু অচিরাৎ জার্ম্মানির "সোশ্যালিষ্ট" দলে অনুকূল অবস্থা পাইয়া অসংখ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল এবং জার্ম্মান্ সৈন্যদের ভিতরেও তাহা গোবীজের কৃত্রিম বসন্তের ন্যায় পরিবর্ত্তিত আকারে সংক্রামিত হইল। "কৈসার"ও বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিলেন। ইহা কৈসার ও তাঁহার দলের লোকদের হর্ষবিষাদের কারণ নয় কি ?

জার্ম্মানিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল ; প্রুসিয়ার রাজবংশের প্রবর্ত্তিত সৈনিকতন্ত্র (Prussian militarism) এতদিন জার্ম্মা-নির বুকের উপর আরব্যোপন্যাসোক্ত "সিন্ধ-বাদ" বণিকের (merchant Sindbad) ঘাড়ে চাপা রাক্ষসের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা এখন অপনীত হইল। বেলজিয়াম্ ও ফ্রান্সের রণভূমি রঙ্গপ্রাঙ্গণে লোমহর্ষণ নাটকের অভি-নয়ের চতুর্থ অধ্যায় শেষ হইল, কৈসারের প্রস্থান ও যবনিকা পতন। এখন পঞ্চম অধ্যা-য়ের অভিনয় আরম্ভ ; শ্রমজীবী ও তাহাদের নেতাগণ অভিনেতা।

ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ অবতারবাদীগণের মতে, পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয়, তখন দুষ্কৃত-কর্ম্মাদের বিনাশ সাধন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য ভগবান্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন। ভবিষ্য পুরাণে কথিত আছে, কলির শেষে যখন পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইবে, তখন কল্কী অবতারের আবির্ভাব হইয়া ধরাতলে প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, কল্কী লোক ক্ষয় ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিবেন, অবশেষে বারিবর্ষণ হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত, ভূপৃষ্ঠ ধৌত, পবিত্র ও স্নিগ্ধ হইবে এবং সত্য যুগ নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে। স্থূল-দর্শী উপমাবাক্যদুগ্ধতা-প্রবণ কোন কোন ব্যক্তির মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে ;—"কৈসারই কল্কী অবতার, তাঁহার প্রজ্জলিত বহুলোকক্ষয়কারী পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ড, প্রেসিডেণ্ট উলসন্ কর্ত্তৃক আনীত শান্তিবারি দ্বারা ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ এবং "লিগ্ অব্ নেশান্‌স্" ও তদধীন আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার উচ্চতম বিচারালয় স্থাপনাদ্বারা পৃথিবীতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সভ্যতা ও শান্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন ও পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ চিরকালের জন্য নির্ব্বাসন,—এই সকল কি সত্য যুগের লক্ষণ নয় ?"

এই মহাসমরকে দীর্ঘকালস্থায়ী একটী প্রবল চক্র বাত্যার (cyclone) সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, অশনিপাত প্রভৃতি দ্বারা দূষিত বায়ুমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের ময়লা দূর হইয়া মনুষ্যের উপকার হয়। মহা-সমর দ্বারাও তদ্রূপ রাজনৈতিক ময়লা মনুষ্য-সমাজ হইতে দূর হয়। মনুষ্য ষড়রিপুর

উত্তেজনায় ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পৃথিবীতে অমঙ্গল, অশান্তি, পাপ ইত্যাদি সৃষ্টি করে; ঈশ্বর সেই সকল অমঙ্গল হইতে মঙ্গল, অশান্তি হইতে শান্তি, এবং পাপ হইতে পুণ্য উদ্ভাবিত করেন। এই মহাসমরাবসানে যে নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্বার্থপরতা হইতে পাপ এবং পাপ হইতে ধ্বংস হয়। পরার্থই উত্তম স্বার্থ; যাহা জগতের কল্যাণকর, তাহাই সকল জাতির পক্ষে ও প্রত্যেক পরিবার ও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর। জার্ম্মাণ কৈসার ও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের আচরণ দ্বারা যথাক্রমে এই দুইটী সত্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। "ভগবানের যাঁতা ধীরে ধীরে পেষণ করে" (God's mill grinds slowly)। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পর আল্‌সেস-লোরেন্ পুনঃ ফ্রান্সদেশভুক্ত হইল। বহুকাল পর বিলুপ্ত পোল্যাণ্ড রাজ্য পুনর্গঠিত হইল; ভারতে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাত ও "ভবঘুরে" ইহুদীগণ তাহাদের "প্রতিশ্রুত" ভূভাগে পুনঃস্থাপিত হওয়ার আশায় আশ্বস্ত হইল; "টার্কদের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আরব, মিসর, মেসোপটেমিয়া, আর্ম্মেনিয়া, প্যালেষ্টিন্ প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হইল; তির্ব্বত, চীন, জাপান, ভারত, আফ্‌গানিস্থান, পারস্য, চীন তাতার প্রভৃতির রুস-ভল্লুক ভীতি দূর হইল। চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানেডা, কালিফর্নিয়া প্রভৃতি দেশের জাপান-ভীতি প্রশমিত হইল। ফিন্‌ল্যাণ্ড, ইউক্রেইন, ককেসাস্ প্রভৃতি দেশ রুসিয়ার অধীনতা বর্জ্জন করিল। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যভুক্ত অনেক গুলি দেশ পুনঃ পৃথক হইয়া গেল। সর্ব্বত্রই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল কি সেই মঙ্গলময় হস্তের সাক্ষ্য প্রদান করে না? এই মহাসমরে যে যে প্রকারে ভারতের শাসনসংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে না পান এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন? হতাশ ও ধৈর্য্যহারা হইবার কারণ নাই; স্বার্থপর অত্যাচারী লোকেরা কখনই তাঁহার সুন্দর সৃষ্টি শ্রীভ্রষ্ট করিতে পারে নাই ও পারিবে না। নির্ম্মল বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্য সাধনে, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, পুরুষকার-অবলম্বনে, আশাপূর্ণ হৃদয়ে স্থিরচিত্তে কার্য্য করা এবং ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ক্রাইষ্ট-চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রেমের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যদৃঢ়তা সর্ব্বদা আদর্শ স্বরূপে মনে রাখা প্রত্যেক কর্ম্মবীরের পক্ষেই আবশ্যক। অভাব অভিযোগ তাঁহাকে জানাইলে সুবিচার নিশ্চয় হয়, তাঁহার বিচারে, উকিল মোক্তার সাক্ষী আবশ্যক করে না; পার্থিব বিচারকদের যেরূপ ভ্রম প্রমাদ, পক্ষপাতিত্ব, আইন নজীরের অনভিজ্ঞতা, কি অজ্ঞতা থাকায় বিচার-বিভ্রাট হওয়ার আশঙ্কা, তাঁহার বিচারে সেরূপ কোনও আশঙ্কা নাই। তাঁহার প্রচারিত আদেশ কার্য্য পরিণত করার বন্দোবস্ত তিনিই করেন। শত্রু হঠাৎ মিত্রে পরিণত হয়; অপরিচিত লোক বন্ধু ও সহায় হন, হৃদয়ে বল, আশা ও শান্তির সঞ্চার হয়। তিনি যখন কর্ণধার, তখন উন্নতির ক্রম-বিকাশ-তরীর গতি নিরাপদ।

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(কেশব-একাডেমিতে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সভায় পঠিত। ঘটনা সমূহ ও আর আর কথা ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত হইতে গৃহীত।)

একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, পর্ব্বত ও সমুদ্র যেরূপ দেশের উচ্চতা ও গভীরতার পরিমাণ প্রদর্শিত করে, মহাপুরুষগণ সেইরূপ জাতীয় জীবনের উচ্চতা ও গভীরতা সূচিত করে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের অসীম শক্তি ও মহাপ্রাণে জাতীয় জীবনের যুগান্তব্যাপী সাধনাই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশ শক্তিসাধক, শক্তির উপাসক; আবার এই বঙ্গদেশই চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাভাব ও মহাপ্রাণে উদ্বেলিত। একদিকে জননী জন্মভূমি মহাশক্তির মূর্ত্তিধারণ করিয়া সন্তানদিগকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দান করিতেছে; অপর দিকে প্রকৃতির নন্দনকানন, সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন, কবিত্বের অনন্তধনি হিমগিরি কিরীটিনী-সাগরাম্বরা, মুক্তগগনের উদারবক্ষে সুখসুপ্তা, হিমালয়-দুহিতা, পুততোয়াভাগীরথীর তরঙ্গ-শিকর-শীতলা, নানাজাতীয় বিহগ-কূজনমুখরিতা, শস্য-শ্যামলা, সুজলা সুফলা 'কাননকুন্তলা' বঙ্গজননী বিশ্বজনীন প্রেমের মধুর ঝঙ্কারে মুক্তজীবনের পূর্ণতার সঙ্গীত শুনাইয়া সকলকে উন্মত্ত করিতেছে। বঙ্গদেশের এই শক্তিসাধনা ও মহাপ্রাণ, জীবনের লক্ষ্যপথে অচঞ্চল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভোজ্জ্বল প্রাণে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষে সর্ব্বধ্বংসকারী কালস্পর্দ্ধী স্থির মৈনাকের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মানবজাতির বিস্ময়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

হৃদয়ই শক্তির অনন্ত প্রসরণ। যে হৃদয় সুদৃঢ় সংকল্পে স্থির থাকিয়া কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে সফলতার উচ্চশিখরে উত্তোলিত করিয়াছিল,—নিঃসহায় সম্বলহীন জীবনের কঠোর পরিশ্রমকে সার্থক করিয়াছিল, পিতৃ-সেবা ও ভ্রাতৃ-সেবারূপ ব্রতপালনে সুক্ষম করিয়াছিল, নিদ্রাজয় করিয়া গভীর রাত্রি বা রাত্রি অবসান পর্য্যন্ত দিনের পর দিন অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিবার জন্য প্রাণে অসীম শক্তি সঞ্চারিত করিত, পার্থিব শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকিয়া করুণাব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য বিধবার দুঃখ-কাতর প্রাণে দুর্জ্জয় সাহস ও অমিত তেজ সঞ্চারিত করিয়াছিল, মাতৃ-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রাবৃটের দামোদরের খরস্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহুতে অমানুষিক শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, আত্ম-সম্মান ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পার্থিব সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, রোগ ও মৃত্যু ভয়ের উপর জয়লাভ করিয়া পথিপার্শ্বে-শায়িত বিসূচিকা রোগাক্রন্তকে বক্ষে করিয়া নিজের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য প্রণোদিত করিয়াছিল, দরিদ্রের দুঃখমোচনে অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতে, মহিলাদিগের শিক্ষোন্নতির জন্য অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিতে, দুর্ভিক্ষ-কিষ্টের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে প্রাণে মাতৃপ্রাণের আত্মহারা ভাব খুলিয়া দিয়াছিল, সাধারণে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য নূতন সাহিত্য সৃষ্টি ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নের উজ্জ্বল প্রতিভার উদ্বোধন আনয়ন করিয়াছিল, সে হৃদয়ের অসীম শক্তির কে পরিমাণ করিবে? যে হৃদয়ের ধ্যান ও বিশ্বাস বলে দস্যু রত্নাকর

কবি গুরু বাল্মীকি হইয়াছিলেন, সত্যসন্ধ রামচন্দ্র সত্যের জন্য বনবাসজনিত দুঃখ বিপদকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ বিগতনিদ্র হইয়া ভ্রাতৃসেবা করিয়াছিলেন, শান্তনুনন্দন দেবব্রত 'ভীষণ' হইয়াছিলেন, রোমীয় বীর রেগুলাস ন্যায়, সত্য ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কার্থেজবাসীদিগের কঠোর মর্ম্ম-নির্য্যাতন ও মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, সক্রেটীশ অকাতরে উজ্জ্বল অমর জীবনকে সম্মুখে রাখিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারক মার্টিন লুথার জার্ম্মাণীর প্রতিকূল রাজন্যবর্গের সমক্ষে সত্যের ও পবিত্রতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, মার্কিন রাজ্যের থিয়োডর পার্কার দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, মেট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অসীম শক্তি, সাহস ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন; আর বলিব কি, দৈবভাবে অনুপ্রাণিত, বিশ্বাসোজ্জ্বল, ঈশ্বর ভক্তি ও মানব প্রেমে অটল অচল হৃদয়ের মহীয়সী শক্তিতে যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, বুদ্ধদেব কঠোর তপস্যায় নির্ব্বাণের মহৌষধ লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য উন্মত্তের ন্যায় কত দেশ পর্য্যটন করিলেন, আর মহাপুরুষ মহম্মদ স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়া প্রবল শত্রুসমক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর যে তরবারি তাঁহার মস্তকছেদন করিবার জন্য উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা হস্তচ্যুত হইয়া তাঁহারই পদতলে পড়িল, আর প্রবল শত্রু পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, সেই আত্ম-বিস্মৃত হৃদয়ই শক্তির উৎস, প্রতিভার জনক, মঙ্গলের আকর, সভ্যতার খনি। হৃদয়ের বলই বল। এজন্য সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়কে নির্ম্মল রাখা প্রয়োজন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এই প্রেমবীর ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ ও প্রাচীন শাস্ত্র শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তখনও, ইংরাজী শিক্ষা বিশেষ প্রচলিত হয় নাই; এবং কলিকাতা বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইলেও, এখন যেরূপ উহা শিক্ষার কেন্দ্র, তখন শিক্ষা বিষয়ে উহা উচ্চ স্থান লাভ করে নাই। বঙ্গীয় সমাজ গ্রামে বাস করিত। মুক্ত বায়ু, ক্রীড়া কৌতুক পূর্ণ সহজ জীবনপ্রবাহ, বঙ্গ পল্লীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাচুর্য্যের নিবাস-ভূমি ও স্বাস্থ্য-নিকেতন করিয়াছিল। পল্লীসমাজ আনন্দ-ধ্বনিতে মুখরিত, নিত্য পূজা উৎসবের কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনিতে, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের কোলাহলে চির-উৎসবময়। ধান্যক্ষেত্র, ফলফুল সম্ভার বৃক্ষলতা, ঘনচ্ছায় শ্যামল বিটপীশ্রেণী, পদ্মকহ্লার-সমুজ্জ্বল স্ফটিক-স্বচ্ছজলপূর্ণ তড়াগশ্রেণী পল্লীকে বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র আলেখ্যের ন্যায় স্নিগ্ধ শোভা পূর্ণ করিয়া রাখিত।

বাল্যজীবন ভাবীজীবনের মাহাত্ম্য সূচনা করে। মানব কি বিশেষ শক্তি ও প্রতিভা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাল্যকালেই তাহার কোন না কোন নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই শক্তিই উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও বিকশিত হইয়া মানবকে মহত্ত্বের উচ্চ পদবীতে আরূঢ় করে। কথিত আছে, বালক প্রহ্লাদ অক্ষর পরিচয় লাভের সময়ে 'ক' অক্ষর দ্বারা উচ্চারণ-সাদৃশ্যে 'কৃষ্ণ' নাম স্মৃতিতে উদ্দীপিত করিয়া দিত, আর কৃষ্ণ-ভক্তিতে তাঁর হৃদয় গলিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া দিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে কৃষ্ণলীলা জীবনে অভিনয় করিতে ভাল

বাসিবেন। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হজরৎ মহম্মদ বাল্যকালেই ঈশ্বর-বিশ্বাসে অমানুষিক দৃঢ়চিত্ততা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি দস্যু রত্নাকরের জীবন পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিবা-মাত্র পক্ষীমিথুনের একটীকে শরবিদ্ধ দেখিয়া অপরটীর সঙ্গে সমবেদনায় বিগলিত হইয়া ছন্দোবদ্ধ কবিতায় হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বসিত বেদনা প্রকাশিত করিলেন। কর্ম্মিকার সামান্য ব্যবহার-জীবীর সন্তান যে পরিশেষে মহাবীর হইয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নূতন রাষ্ট্রীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইউরোপীয় রাজ্য সমূহকে প্রবল ভূমিকম্পে আলোড়িত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন, বাল্যকালে বরফের দুর্গ নির্ম্মাণ ও তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া আনন্দোভোগের মধ্যেই তিনি তাহার প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার বাল্য জীবনে ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসরের সময় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া অন্যেরা যাহা পাঁচ, ছয় বৎসরে শিক্ষা করে, তাহা ৩ বৎসরেই তিনি শিখিয়া লইয়াছিলেন। বীরনগর হইতে কলিকাতা আসিবার পথে মাইল-নির্দ্দেশক কাষ্ঠ-ফলকে ইংরেজী এক দুই সংখ্যা খোদিত দেখিয়া সংখ্যা-জ্ঞাপক ইংরেজী এক, দুই প্রভৃতি চিনিয়া লইয়াছিলেন। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অবগাহিত করিয়াও বাল্যকালে স্কুলের বৃত্তির টাকা দরিদ্রের সেবায় অকাতরে দান করিতেন, আর, বাল্যকালের সকল কার্য্যেই তিনি তাঁর দৃঢ়চিত্ততা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সময় সময় এই দৃঢ়চিত্ততা একগুঁয়েমিতেও পরিণত হইত। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে, তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটনে অনেক বৎসর অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাঁহার মুখশ্রীতে তাঁহার পিতামহ ভবিষ্যৎ নির্ভীক দৃঢ়চিত্ততার এমন কোন নিদর্শন দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহে আসিবামাত্র তাঁহার পিতামহ বলিলেন—"একটা এঁড়ে বাছুর আমাদের বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।" এই এঁড়ে বাছুরের ভবিষ্যতের সেই সত্যে অটল, সঙ্কল্পে দৃঢ়, অচল, মানব-হিত-ব্রতে নির্ভীক কর্ম্মবীর, অত্যাচার, অপমান, নির্য্যাতনে শৈল সদৃশ স্থির অবিচলিত, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে অক্লান্ত, হৃদয়ের অতল গভীরতায়, অপার বিশালতায় ও উচ্ছ্বাসময় বিশ্বপ্লাবী শক্তিতে অক্ষুব্ধ সাগর সদৃশ, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার কোন জমিদারের সেরেস্তায় ১০৲ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় প্রবেশ করেন। তথায় তিন বৎসর শিক্ষা করিয়া গুরুমহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া আসেন। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মহামতি ভারতহিতৈষী মানব প্রেমিক হেয়ার সাহেব মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তায় কলিকাতায় ১৮১৬ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঈশ্বরচন্দ্রকে ১০৲ টাকা বেতনের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু কলেজে ইংরাজি শিক্ষা দিতে সংকল্প করেন। তিনি জমিদারী সেরেস্তায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া ও দুবেলা স্বহস্তে রন্ধনাদি সকল কার্য্য করিতেন, ও অষ্টমবর্ষীয় বালকের প্রবাসে মাতৃ-স্থানীয় হইয়া অকাতরে

সেবা করিতেন এবং সময় সময় স্বহস্তে মলমূত্রাদিও পরিষ্কার করিতেন। এ অবস্থায়ও দেশের তখন যতদূর উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় সেরূপ উচ্চ শিক্ষা সন্তানকে প্রদান করিবার জন্য পিতার মনে দৃঢ় সংকল্প। এরূপ পিতা না হইলে কি সন্তান এত মহৎ হইতে পারে? পিতার কর্ত্তব্য-বিমুখতা, উদাসীনতা, ও দুর্নীতার জন্য কত সন্তান তাহাদের শক্তি সামর্থ্য ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে পারে নাই। ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু কিছুদিন পরে উদরাময় রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে লইয়া গেলেন। গ্রামের স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্ত নির্ম্মল বাতাস ও মাতা ও পিতামহীর সেবা শুশ্রূষা তাঁহাকে রোগ-মুক্ত করিল। তিনি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিয়া ছয় মাস পরে পুনরায় পিতার সঙ্গে কলিকাতা আসিলেন। তখনও দেশে রেল-পথ বিস্তৃত হয় নাই। অষ্টম বৎসরের বালক পিতার সঙ্গে স্বীয় গ্রাম হইতে কলিকাতা ২৬ ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিয়া আসিলেন। তখন পথ-ঘাটও ভাল ছিল না; বিশেষতঃ পথে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের হাটিতে হাটিতে পদদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পিতার সঙ্গে তিনি কলিকাতার পথে চলিয়াছেন। অবশেষে স্নেহশীল পিতা তাঁহাকে স্কন্ধ-দেশে লইয়া কলিকাতা পৌঁছিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার মনে বংশ-গৌরব জাগিয়া উঠিল; পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থা অবলম্বন করিয়া যাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী হইয়া গৃহে চতুষ্পাঠী খুলিয়া বিদ্যাদান করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাদান করাই স্থির করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার ছয় বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট, হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বিচারাদিতে পরামর্শদাতা জজ-পণ্ডিত প্রস্তুত করিবার জন্য লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ প্রবেশ করেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম মাত্র ৯ বৎসর। তিনি অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি ছিলেন; তিনি যখন অনেক পুস্তক হাতে করে স্কুলে যাইতেন, তখন অনেকেরই তাহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। স্কুলের সহপাঠিগণ তাহাকে 'যশোরে কৈ" বলিত। তিনি কলেজে যাহা পড়িয়া আসিতেন, পরে পিতার নিকট তাহার আবৃত্তি করিতেন। শিক্ষা বিষয়ে পিতার কঠোর শাসন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিশ বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া পরে ছয় মাস অমর কোষ ও ভট্টিকাব্য পাঠ করেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, আর এক বৎসর পরীক্ষা-প্রহেলিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি সাহিত্য-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনিই শ্রেণীতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-বয়স্ক ছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁহার সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও রস বোধ প্রবল ছিল। তিনি যেরূপ সহজে অন্বয় ও অর্থ করিতে পারিতেন, শ্রেণীর আর কেহই সেরূপ পারিত না। তাঁহার অনুবাদ করিবার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল। পরে তিনি ইংরেজী সাহিত্য ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে যে সকল মুক্তারাজি সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ভাব ও শব্দ-সম্পদে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই অনুবাদ করিবার অসীম ক্ষমতার ফলস্বরূপ। তাঁহার শ্রবণ শক্তিও অত্যন্ত প্রখর ছিল।

তিনি নাটকের প্রাকৃত ভাষাও প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরই ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া অনেক পরিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় দুর্গন্ধময় অন্ধকার গৃহে থাকিয়া কিরূপ জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তাহার চিত্র সকলের শিক্ষাপ্রদ। তাঁহাদের কোন দাসদাসী ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার লিখিত 'বিদ্যাসাগর চরিতে' তাঁহার প্রতিদিনের জীবনের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া বড় বাজার ট্যাকশালের গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আসিবার সময় বড়বাজার কাশীনাথ বাবুর বাজারে যাইতেন। তথায় বাটা মৎস্য আলু পটল তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পঁহুছিয়া প্রথমতঃ হরিদ্রাদি ঝাল মশলা বাটিয়া উনন ধরাইয়া মুগের দাউল পাক করিয়া মৎস্যের ঝোল রন্ধন করিতেন। ভোজনের পর তাঁহাকেই উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিতে হইত। হাঁড়ি মাজিয়া, বাসন ধৌত করিয়া, স্থান মুক্ত করায় অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও নখগুলি ক্ষয় হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্য তাঁহার হাতে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত। ভোজন করিতে করিতে যদি একটী ভাত ছড়ান হইত বা পাতে কিছু উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে পিতৃদেব বড় মারিতেন; এজন্য সর্ব্বদা ভোজনের পাত পরিষ্কার করিয়া খাইতেন। এ কারণ তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাত্রে অনেকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রি ৯টার সময় বাসায় আসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠাভ্যাস করিতে দেখিলে তিনি পরমাহ্লাদিত হইতেন। প্রদীপ জ্বলিতেছে, পুস্তক খোলা রহিয়াছে, আর উভয়ে নিদ্রা যাইতেছে দেখিবা মাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যন্ত প্রহার করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাসায় আগমন করিলে ঈশ্বরচন্দ্র পাকারম্ভ করিতেন। পাক ও আহার করিয়া রাত্রি একাদশ ঘটিকার পর শয়ন করিতেন। পুনর্ব্বার শেষ রাত্রিতে পিতার নিকট অনেক কবিতা আবৃত্তি করিতেন। পরে সূর্য্যোদয় হইলে পর কলেজের পাঠ্য পুস্তকের পাঠ সমাপন করিয়া গঙ্গা স্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিতেন ও পাকাদি কার্য্য সমাধানান্তে ভোজন করিয়া বিদ্যাসাগর যাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা চরখা সূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা বস্ত্র পরিধান করিয়া অধ্যয়নার্থ উভয় ভ্রাতা কলেজে যাইতেন। দুই বেলা পাকাদি কার্য্য করিতে করিতে নিজের পাঠ্য পুস্তক লইয়া ঈশ্বরচন্দ্র পাঠানুশীলন করিতেন, ও কলেজে যাইবার সময় পথে বহি দেখিতে দেখিতে যাইতেন। বাসায় প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। কোন কোন দিন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় বিদ্যালয় ছুটী হইলে ছুটীর পর কলেজের অধ্যাপকদিগের বাসায় গিয়া নানা গ্রন্থ আলোচনা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে গৃহে পাক করিতেন, তাহার অতি সন্নিহিত স্থানে অপরের পায়খানা ছিল, সুতরাং পাকশালায় বসিলেই অত্যন্ত দুর্গন্ধ বোধ হইত। পাকগৃহটী অত্যন্ত ছোট ও অন্ধকারময় ছিল, তৈলপায়ী অর্থাৎ আরসুলায় পরিপূর্ণ থাকিত। প্রায় মধ্যে মধ্যে দু চারিটা আরশুলা ব্যঞ্জনে পতিত হইত।

দৈবাৎ একদিন অগ্রজের ব্যঞ্জনে একটা আরশুলা পড়িয়াছিল। প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে ভ্রাতৃগণ বা পিতা ঘৃণা প্রযুক্ত আর ভোজন করিবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত আরশুলা ব্যঞ্জন সহিত উদরস্থ করিলেন। যে স্থানে আহার করিতে বসিতেন, তাহার নিকটস্থ নর্দ্দমা হইতে কেঁচো ও অন্যান্য কৃমি উঠিয়া ভোজন পাত্রের নিকটে আসিত, এজন্য তিনি এক ঘটি জল কাছে রাখিতেন, ঐ জল ঢালিয়া দিয়া কৃমি গুলিকে সরাইয়া দিতেন। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক বিছানায় শয়ন করিতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিদ্রিতাবস্থায় বস্ত্রে মল ত্যাগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গভীর রাত্রিতে শয়ন করিয়াই নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ হইলে দেখিলেন, তাঁহার পীঠ, বুক প্রভৃতিতে বিষ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে। কোন কথা না বলিয়া গাত্র ধৌত করিয়া সমস্ত শয্যা স্বহস্তে কূপোদক দ্বারা প্রক্ষালিত করিলেন।"

তাঁহার জননী দেবীর স্বহস্ত-নির্ম্মিত মোটা বস্ত্র তিনি পরিধান করিতেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এসময় সংস্কৃত রচনায় বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক ও ৮৲ টাকা বৃত্তি পান। তিনি অলঙ্কার শ্রেণী হইতেই স্মৃতি শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়া, এমন কি, অনেক দিন মাত্র রাত্রি ১০টা হইতে ১২টা এই দুই ঘণ্টা নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া, সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন পূর্ব্বক যে সকল কঠিন স্মৃতি-গ্রন্থ অপর ছাত্রগণ ২ বৎসরে পরিসমাপ্ত করিতে পারিতেন না, তাহা ছয় মাসে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া 'ল' কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্মশ্রুরেখা-বিরহিত অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গভর্ণমেণ্ট ত্রিপুরা জেলার জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পিতৃদেবের অসম্মতি-নিবন্ধন তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করেন নাই।

ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি বেদান্ত শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি সত্য কথনের মহিমা বিষয়ে সংস্কৃতে এক সন্দর্ভ লিখিয়া একশত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা রচনার জন্য শিক্ষা-সমাজ হইতে ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এখন তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। দর্শনের পরীক্ষায়ও সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১০০৲ টাকা পারিতোষিক ও সংস্কৃত কবিতা রচনার জন্য আর এক শত টাকা প্রাপ্ত হন। চারি বৎসর রীতিমত পরিশ্রম করিয়া তিনি সমগ্র দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অপর ছাত্রগণ দশ কি দ্বাদশ বৎসরের কমে দর্শন শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি এই সময়ে দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষায় এক শত টাকা, কবিতা রচনার জন্য একশত টাকা, আইনের পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা ও হস্তাক্ষরের জন্য ৮৲ আট পারিতোষিক লাভ করেন। এইরূপে স্বীয় প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম পূর্ব্বক ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই সময়ও তিনি তাঁহার হৃদয়ের দয়া ও স্নেহের কত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিজে অনাহারে থাকিয়া অন্যকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, দীন সহপাঠীদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দান করিয়াছেন;

নিজে সময় সময় কঠোর রোগে রুগ্ন হইয়াও, প্রতিবেশীদিগের খবর নিতেন ও রোগীর সেবা করিতে আনন্দ লাভ করিতেন।

কর্ম্মজীবন—আত্মত্যাগ, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও আত্মনির্ভর। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। সে সময় সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাহেবেরা ভারতে আসিলে প্রথমে এই কলেজে বাঙ্গালা ও হিন্দি শিক্ষা করিতেন। এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র রীতিমত ইংরেজী ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার ভাষা শিক্ষা করিবার অদ্ভুৎ ক্ষমতা ছিল। স্বদেশ-প্রাণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা খ্যাতানামা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম সুহৃদ্ ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রথমে ঈশ্বর চন্দ্র ইংরেজী শিক্ষা করেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে বিদ্যাদান করিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। অনেকে সংস্কৃত শিক্ষার অভিলাষে প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহার বাস গৃহে সমবেত হইতেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রধান ব্যাকরণ অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। তদনীন্তন সম্পাদক ঈশ্বচন্দ্রকে ৯০৲ টাকা বেতনে সে পদে নিযুক্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র তারানাথ তর্কবাকস্পতিকে এই কার্য্যের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত এবং ঐ কার্য্য তাঁহারই প্রাপ্য মনে করিলেন। এইজন্য নিজে ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ঐদিবস তিনি গঙ্গা পার হইয়া পদব্রজে প্রায় ৩০ ক্রোশ গমন পূর্ব্বক তর্কবাচস্পতি মহাশয় হইতে তাঁহার প্রশংসা পত্র সহ আবেদন-পত্র লইয়া আসেন। তাঁহারই অনুরোধে সাহেব তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ঐপদে ৯০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন ৫০৲ বেতনে কাজ করিতেন; তাহা হইতে ২০৲ টাকা পিতৃ-মাতৃ সেবায় ব্যয় করিতেন; অবশিষ্ট ৩০৲ টাকায় তিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া নয় জন পোষ্যবর্গ সহ কলিকাতায় বাস করিতেন। এই অবস্থায় পর্য্যাক্রমে তিনিও স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। এই সকল খরচ নির্ব্বাহ করিয়াও তিনি দুঃখী, দরিদ্র ও আত্মীয় স্বজনদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। ৫০৲ টাকা বেতনে এত কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিয়া ও ৯০৲ টাকা বেতনের একটা কর্ম্ম নিজে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার সমপাঠীকে তাঁহা অপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিয়োজিত করাইলেন। এইরূপ গুণের সম্মান, ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল।

সংস্কৃত কলেজের কোন রূপ উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া তদানীন্তন, শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ৫০৲ টাকা বেতনে কলেজের সহকারী সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এই পদ গ্রহণ করিয়া কলেজের শিক্ষা কার্য্যে নূতন জীবন-সঞ্চার ও নূতন শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন, ব্যাকরণ শিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং সাহিত্য পুস্তক হইতে অশ্লীল কবিতা সকল তুলিয়া দিলেন।

এই চাকুরী-জীবনে তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এক দিনের জন্যও ক্ষুণ্ণ

করিতে পারে নাই। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে তাঁহাকে স্খলিত করিতে পারিত না। আর বড় লাট হইতে সকল প্রধান ২ ইংরেজ ও দেশীয় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সকলের নিকটই তিনি মনুষ্যত্ব-গৌরব সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিতেন। তাঁহার সত্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহাকে সত্যই মনুষ্যত্বের উচ্চ গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল, সেজন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আত্ম মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যদি কখনও কোন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হইয়া থাকেন, উন্নতযশঃ রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পোষণ করিয়াছেন।

যখন সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সম্পাদকের সঙ্গে কলেজ পরিচালনা বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইল, তখন তিনি সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। সে সময় প্রায় ২০ জন তাঁহার কলিকাতার বাসায় থাকিয়া তাঁহার ব্যয়ে অধ্যয়ন করিত। দেশের পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা পাঠাইতেন। এতৎব্যতীত কত অনাথা বালক ও দরিদ্রকে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন। তিনি কোন বিষয়ে ব্যয় সঙ্কুচিত করেন নাই, কাহাকেও তাঁহার অর্থের অভাব বুঝিতে দেন নাই। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, দারিদ্র্যে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত, কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তিনি দারিদ্র্যকে ভয় করিবেন কেন? আলু পটল বিক্রয় করিয়া খাইবেন, তথাপি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন না। এই সময় তিনি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য হিন্দি ও ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে লাগিলেন ও সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারী নামে এক মুদ্রাযন্ত্রও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। তিনি এই সময় বিশেষ মনোযোগ সহকারে ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই ভাষায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। কয়েকমাস পরেই তিনি আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৯০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তিনি ইংরেজীতে যে কলেজের বার্ষিক বিবরণ লিখিতেন ও নানা বিষয়ে যে আপনার মত ব্যক্ত করিতেন, তাহা ভাল ভাল ইংরেজদিগেরও শ্লাঘনীয় হইত। পরে তিরি আবার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই পদ হইতে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। তখন তিনি মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতন স্বরূপ লাভ করিতেন। তিনি যে কাজই করিতেন, তাহাতে সমুদয় হৃদয় মন ঢালিয়া দিয়া এক নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতেন। তিনি কলেজে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন; ক্রমে এই কলেজের ছাত্রগণও বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করেন। এই সময় ক্রমে ক্রমে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রেণীমাধব দাস।

সাধক জীবনে খ্রীষ্টের স্থান।

যে ধর্ম্মটা এযুগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নামে অভিহিত, তাহাই যে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ছিল, বা তাহাতেই যে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টের শিক্ষার সর্ব্বোত্তম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। যে সকল জাতিরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক পরিমাণে আপনাদেরই সাজে খ্রীষ্টকে সাজাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, ঐ সাজের মধ্যেও খ্রীষ্টের স্বাভাবিক মূর্ত্তিটা দৃষ্টিগোচর হয়।

ভারত ধর্ম্মের দেশ। এ দেশটা চিরকাল ধর্ম্মের দেশই থাকিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ধর্ম্মের বহিরাবরণটা যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু ধর্ম্মের যাহা সার বা সাঁশ, সে জিনিসটা অবিনশ্বর। তাহাতে অভিব্যক্তি আছে, কিন্তু তাহার ধ্বংস নাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের বহিরাবরণ বহু পরিমাণে ভাঙ্গিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার বা সাঁশ, সে জিনিসটাকে পরিপুষ্টই করিয়াছিল। বাহ্যিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বৌদ্ধধর্ম্ম আভ্যন্তরীণ হিন্দুধর্ম্মকে প্রাণের দোসরের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া তার সঙ্গে একই ভিটায় একই ঘরে বাস করিতেছে। হিন্দু মতাবলীর মধ্যে বৌদ্ধ মতাবলী সোণায় সোহাগার মতন মিলিয়া আছে। হিন্দু সাধকের জীবনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বুদ্ধদেব এখনও নির্ব্বাণ মন্ত্র লইয়া বিরাজ করিতেছেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মটাও হিন্দুধর্ম্মের ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিতে আসে নাই। অর্ব্বাচীন, অদূরদর্শী, আত্মকেন্দ্রী খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের আক্রমণে হিন্দুধর্ম্মের বহিরাবরণ কিছু কিছু ভাঙ্গিতে, পারে বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সার জিনিসটার অণু মাত্রও অনিষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রভাতের বাতাস যেমন করিয়া ফুলের কলিকা ফুটাইয়া দেয়, খ্রীষ্টের কোমল স্পর্শেও হিন্দু সাধক জীবন তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। এ প্রস্ফুটনে যে সুরভি ধারা নির্গত হইবে, তাহাতে শুধু ভারত নহে, বরং সমগ্র জগৎ সুরভিময় হইয়া যাইবে।

একটা ঠাকুর গড়িয়া তাহার পূজা করা সহজ, কিন্তু যে দেবতার ঠাকুর গড়া হয়, কয়জন তাঁহার দর্শন পায়? সাধক জীবন দর্শনের জীবন—অনুভূতির জীবন—প্রাণে প্রাণে উপভোগের জীবন। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস পাঠ করিলে অনেক সময় মনে হয়, যে সকল দেশ খ্রীষ্টান্ দেশ নামে বিখ্যাত, সে সকল দেশে খ্রীষ্টেরও যেন একটা ঠাকুরই গড়া হইয়াছে। অধিকাংশ লোক ঠাকুর পূজার মতন খ্রীষ্টোপাসনা করে। খ্রীষ্টের সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই—সাধনার যোগ নাই। তাই মানুষগুলো ঠাকুর পূজা করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে ঠাকুরের ন্যায় জড়ভাবাপন্ন হইয়া আছে। ঐ সকল দেশে খ্রীষ্টপ্রাণ নর নারী যে আদবেই নাই, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ। কয় জন লোক খ্রীষ্টকে ঠাকুর ছাড়া গুরুরূপে, সখারূপে বরণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গভীর তত্ত্ব-সাগরে ঝাঁপ দেন? "Eat, drink and be merry"—খাও দাও মজা কর, ইহাই কি ও সকল দেশের ধর্ম্ম নহে?

প্রাচীন মণ্ডলীর অবস্থা কিন্তু আর এক রকম ছিল। সে যুগে খ্রীষ্টের ঠাকুর গড়া হয় নাই। সে যুগে খ্রীষ্ট একটা living personality "জীবন্ত ব্যক্তিত্ব" ছিলেন। ঐ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যে আসিত, সেই

একটা জীবন্ত ব্যক্তি হইয়া যাইত। মানুষের প্রাণের সুভাবগুলি ঐ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ফুটিয়া উঠিত। অটল বিশ্বাস, আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, নির্ম্মল জীবন, আত্মহারা প্রেম, প্রাণভরা সহানুভূতি খ্রীষ্টানদের প্রাণে প্রাণে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইত। তখন creed বা ধর্ম্মমত রচিত হয় নাই। বিশ্বাসীদের বিশ্বাস স্বাধীন—বিবেক স্বাধীন—প্রাণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু যখন চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম ও রাজ্যের ধর্ম্ম (state religion) হইল, তখন অবস্থা একেবারে বদলিয়া গেল। খ্রীষ্ট আর living personality বা জীবন্ত ব্যক্তিত্ব রহিলেন না। তিনি একটা dogma বা মত রূপে পরিণত হইলেন। সে dogma বা মতে তাঁহাকে উচ্চতম পদ প্রদত্ত হইল। "God of God, light of light, very God of very God" (দেখুন Nicene creed.) কিন্তু যিনি "ঈশ্বরের ঈশ্বর", তিনি তো ঈশ্বরত্বে নীত হইলেন—মানব-জীবনে আর তাঁর স্থান রহিল না। মাটির ঠাকুরই বল, আর মতের ঠাকুরই বল, উভয়ই প্রাণহীন। এদেশ মাটির ঠাকুর পূজা করিয়া রসাতলে গিয়াছে—ও দেশ মতের ঠাকুর পূজা করিয়া দৈত্য দানবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গত যুদ্ধই তাহার প্রমাণ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ নাই, তাহা আমি বলিতেছি না। ঐ সকল প্রহ্লাদদের গুণেই ধরাটা এখনও ধরাবক্ষে বাঁচিয়া আছে, নতুবা সাগর জলে ডুবিয়া যাইত।

যাহা হউক, পরের কথা লিখিয়া লাভ কি? আমরাই যে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের দেশে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য রূপে জীবন যাপন করিতেছি, তাহা নহে। আমাদের শত দোষ, শত পাপ, শত ত্রুটি আছে। নরকের বীভৎস চিত্র আমাদেরও সমাজ ও বুকের ভিতর আছে। না ওঁরা ভাল মানুষ, না আমরাই খুব ভাল মানুষ। গত পঞ্জাব বিভ্রাটে, ব্যথা পাইয়াই হউক বা না পাইয়াই হউক, আমরা যখন যষ্টি প্রহারে জন কতক শ্বেতাঙ্গকে ধরাশায়ী করিলাম, তখন "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মন্ত্র মনে রাখি নাই। আবার ওঁরা যখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া "জালিয়ানওয়ালা বাগে" অসংখ্য কৃষ্ণকায়কে ধরাশায়ী করিলেন, তখন "এক গালে চড় মারিলে অপর গাল পেতে দাও" এ কথাটা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। পাপের নাম পাপ—তার সাদা কালো পোষাক নাই।

খ্রীষ্ট একটা living personality বা জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি মৃন্ময় বা মতামত মূর্ত্তি নহেন। যদি প্রাচীন মণ্ডলীর ন্যায় পরবর্ত্তী মণ্ডলীতেও তিনি জীবন্ত ব্যক্তিত্ব রূপে বিরাজমান থাকিতেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য জগৎটা আর এক রূপে গঠিত হইত, উহার আর এক কলেবর হইত। কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন প্রাচ্য জগতের পালা পড়িয়াছে। খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে নানা প্রকারে অনুরোধ ও উপরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমরা কোন্ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিব? মত-গড়া খ্রীষ্টকে না জীবন্ত ব্যক্তিত্বকে? শত বৎসরের অধিক মিশনরীগণ ভারতে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত করিয়াছেন—শত বৎসরের অধিক ঐ মণ্ডলীতে মিশনরীগণ মত-গড়া খ্রীষ্টের উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু তাহাতে মণ্ডলী মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কতটা বাড়িয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। হিন্দু আপনার মন্দিরে গিয়া মৃন্ময় ঠাকুরের পূজা করে। তোমরাও গির্জ্জায় গিয়া একটা মতময় ঠাকুরের পূজা কর। পার্থক্য কোথায়? জীবন ও নীতি তো প্রায় উভয়ত্র একই। শুধু খ্রীষ্টীয় সমাজ নামে আর একটা সমাজ বা জাতি গড়া হইয়াছে মাত্র।

ভারতে ঠাকুরের অভাব নাই। ভারতে তেত্রিশ কোটী দেবতা ঠাকুর। আরো যে কত উপ-ঠাকুর আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে দেশে এত ঠাকুর পূজা হইতেছে, সে দেশে আর একটা নব ঠাকুর আনিয়া কি লাভ? আমাদের মন্দিরে আর একটা ঠাকুরের সংখ্যা বাড়িবে মাত্র, ঐ নব

ঠাকুরের আগমনে ভারত নব জীবন পাইবে না।

কিন্তু খ্রীষ্ট বলেন "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." তিনি ঠাকুর হইয়া ঠাকুর ঘরে পূজা গ্রহণ করিতে আসেন নাই। তাঁহার মিশন ছিল "জীবন"—"প্রচুর জীবন।"

অতএব সাধক জীবনে খ্রীষ্টের স্থান ঠাকুরের স্থান নহে। তিনি প্রাণহীন ঠাকুর রূপে কাহারও জীবনে বিরাজ করিতে চান না। তিনি জীবন্ত ব্যক্তিত্ব রূপে মানব জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া সে জীবনকে প্রাচুর্য্য ও পূর্ণতায় পরিণত করিতে চান। খ্রীষ্টকে ঠাকুর না বলায় খ্রীষ্টীয় বিদ্যাবাগীশগণ আমাকে heretic বা বিধর্ম্মী মনে করিবেন না। আমি আপনাদের খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিতেছি না। তিনি তত্ত্বতঃ মানুষ ছিলেন, কি ঈশ্বর ছিলেন, কি মানুষ ও ঈশ্বর উভয়ই ছিলেন, সে বিষয়ে তর্ক করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তিনি একজন "ব্যক্তি" ছিলেন, ও তাঁহার ব্যক্তিত্বটা তাঁহারই ব্যক্তিত্ব ছিল, এস্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইল। ঐ ব্যক্তিত্বটা প্রাচীন মণ্ডলীতে নর নারীর মধ্যে একটা নব ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন করিয়াছিল, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। এ যুগে যে conversion বা মন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু মন পরিবর্ত্তন অপেক্ষা dogmatism বা মতবাদীত্বের প্রাধান্যই যে অধিক, তাহা চক্ষু থাকিতে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব?

পাঠক, এখন একবার ভারতের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হউন ও ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে খ্রীষ্টের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন। বৈদিক কাল আমাদের ধর্ম্ম জীবনের বাল্যকাল না হইলেও তরুণ বয়স ছিল। ঐ তরুণ বয়সে আমাদের পিতৃগণ যখন ভারত ক্ষেত্রে পদার্পণ পূর্ব্বক ইহার সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্য শ্যামলা প্রকৃতির পানে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন প্রকৃতির প্রতি পদার্থ তাঁহাদের দৃষ্টিতে জীবনময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঋগ্বেদের মন্ত্রনিচয় পড়িলে মনে হয়, কোন মৃত বস্তুকে তাঁহারা যেন দেখেন নাই। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু, বনস্পতি, রাকা, ঊষা, সকলি যেন জীবন পূর্ণ—সকলি যেন আলোকময়। সে যুগে বিদ্যুতের দ্যুতি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবু এই বিশ্বমণ্ডল বিদ্যুতের দ্যুতি অপেক্ষাও দ্যুতিমান। প্রতি পদার্থের অন্তরালে কোন না কোন দ্যুতিকে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। ঐ দ্যুতিকে তাঁহারা "দেব" নামে সম্বোধন করিতেন। বালক যেমন প্রতি জনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতে, সেইরূপ তাঁহারা ঐ দ্যুতিমান দেবগণের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিতেন—তাঁহাদিগকে আপনার লোক বলিয়া ভাবিতেন।

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো
মূলতানঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম
বহুলং বিয়ন্ত ॥—ঋগ্বেদ ৬।৫১।৫।

"হে দ্যৌঃ পিতঃ, পৃথিবিমাতঃ, অগ্নি ও বসুগণ ভ্রাতঃ, তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। হে আদিত্যগণ ও অদিতি, তোমরা সমবেত হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর।"

প্রকৃতির প্রতি বস্তুতে জীবন দর্শন—দেব দর্শন—ও প্রতিবস্তুর অন্তরালস্থ দেবতার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ অনুভব করা, ধর্ম্ম জীবনের বাল্য বা তরুণ কাল হইলেও, একটা উপাদেয় অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহারা দার্শনিক ভাবে জড় ও চৈতন্যে প্রভেদ করিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না—(পরে তাহাও কতকটা শিখিয়াছিলেন।) তাঁহারা খাঁটি দার্শনিক হউন বা না হউন, তাঁহারা দ্রষ্টা ছিলেন—ঋষি ছিলেন—কবি ছিলেন। তাঁহারা জড়ে জীবন জড়িত দেখিতেন। সে জীবন অন্ধকারময় নয়, ত্রাসময় নয়—আলোকময়, আনন্দময়। সে জীবনের নাম "দেব।" ঐ দেব পদে পদে তাঁহাদের সহায়, রক্ষক ও পথপ্রদর্শক। তাঁহারা ঐ দেবগণের স্তুতি

করিতেন—ঐ দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এ যুগের পণ্ডিতেরা এই ধর্ম্মটাকে physiolatry বা প্রকৃতির উপাসনা বলেন। আমার ইচ্ছা করে, এই ধর্ম্মটাকে "জীবন বাদ" নামে অভিহিত করি। খ্রীষ্টের ধর্ম্মও জীবনবাদ ছিল। "I am come that they might have life,and that they might have it more abundantly." "More "abundantly"র অর্থ "over flowingly"ও হইতে পারে, শুধু প্রচুর বা পরিপূর্ণ জীবন নয়, বরং বর্ষাকালের নদীর মতন উবছে-পড়া জীবন। নদী যখন উবছে পড়ে, তখন নদীটাকে আর চেনা যায় না—সমস্ত মাঠ, সমস্ত দেশ জলে জলাকার হইয়া যায়। খ্রীষ্ট এই আত্মভোলা আত্মহারা উবছে-পড়া জীবনের কথা বলিতেছেন। সাধক জীবন অন্তরে বাহিরে উবছে পড়ে। সাধক যে প্রকৃতির মধ্যে বাস করেন, ঐ প্রকৃতিটার মধ্যে উবছে-পড়া জীবন দেখেন। ঐ সবুজ গাছটা উবছে পড়িতেছে—ঐ ফুলটা উবছে পড়িতেছে—ঐ ছোট পাখীর সুললিত কাকলিটুকু উবছে পড়িতেছে। ইহারই নাম প্রকৃতিতে জীবন বা দেব দর্শন। জীবন্ত বা দিব্য নেত্র না হইলে এই জীবন ও দেব দর্শন অসম্ভব। ঐ দেবগুরু যীশু চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন লাগিয়ে দিলেন, আর সাধক প্রকৃতিতে দেবদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার নূতন ধর্ম্ম নহে, ইহা সনাতন ধর্ম্ম—মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বৈদিক যুগের সরল ঋষিগণ তাই না জানি কি মন্ত্র বলে প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে, কক্ষে কক্ষে দেবদর্শন করিয়াছিলেন। এটা কি জড়োপাসনা? ওরে মূর্খ! জড় কি উবছে পড়তে পারে? ঐ নদীটা জলভরে উবছে পড়িতেছে—এটা কি জড়ের লীলা? জড়ের আড়ালে অজড়কে দেখ—প্রকৃতিতে দেবদর্শন কর। প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে পারে, কিন্তু যেটা নামে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, সেইটাই কি খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ছিল? খ্রীষ্ট এই দেব দর্শনের প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি স্বয়ং ইহার প্রচারক ছিলেন। প্রকৃতিতে দেব দর্শন কর—প্রকৃতিতে উবছে-পড়া জীবন দেখ—সে জীবনে ডুবিয়া এ জীবনে ধন্য হইয়া যাও। খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রকৃতিতে দেবদর্শন করিয়াছিলেন—প্রকৃতিতে উবছে-পড়া জীবন দেখিয়াছিলেন। তাই কোন পাহাড়ে গিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন।

বৈদিক যুগ আর এক যুগকে প্রসব করিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের গোটাকতক সঙ্গীতে সে যুগের সূচনা দেখিতে পাই। প্রথমে Polytheism বা বহুদেববাদ—অতঃপর Kathenotheism বা বহুমধ্যে একদেববাদ—অবশেষে Monotheism, Monism বা একত্ববাদ—ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ। উপনিষদগুলিতে একত্ববাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্মের বহিরাবরণ দেখিলে মনে হয়, উপনিষদের একত্ববাদ যেন বৈদিক ধর্ম্মের মূলচ্ছেদন করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মের অন্তরাবরণে প্রবেশ করিলে আর এক তত্ত্বের পরিচয় পাই। বৈদিক ঋষিগণ ভূতে ভূতে দেবদর্শন করিতেন। উপনিষদের ঋষিরাও ভূতে ভূতে দেবদর্শন করিতেছেন—

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

তবে প্রভেদ কোথায়? কেহ তিল তিল করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছে—কেহ তিল তিল করিয়া চয়ন পূর্ব্বক এক তিলোত্তমায় সবটা একাধারে দেখিতেছে। বৈদিক ঋষিরা ভূতে ভূতে পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেন—তাঁহারা ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার নাম রাখিয়াছিলেন। জীবন জিনিসটা তো একই। কিন্তু ঐ জীবন্ময় দেবতা জ্যোতির্ম্ময় আকাশে দ্যৌঃ, আবরণকারী আকাশে বরুণ, বৃষ্টিদাতা আকাশে ইন্দ্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। উপনিষদের ঋষিরা ঐ জীবন্ময় দেবতাকে সর্ব্বভূতের অন্তরালে এক আত্মা ও এক ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। তাঁহারা ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া সমষ্টিকে ধরিলেন। কিন্তু ভূতকে একেবারে ভুলিতে পারিলেন না। তাই উপনিষদেও "ভূতেষু ভূতেষু

বঙ্গীয় ক্রমিক সং শ্রেণী সং কলিকাতা।

বিচিন্ত্য ধীরাঃ।" ধীরগণ ভূতে ভূতে চিন্তা করিতেছেন—ভূতে ভূতে তাঁহাকে দেখিয়া অমর লোকে প্রবেশানন্তর অমর হইয়া যাইতেছেন।

উপনিষদের ধর্ম্মে জীবন ব্রহ্মমুখী। ভূত খোসা মাত্র। খোসা ছাড়িয়ে সার বা সাঁশটা গ্রহণ কর। অথবা যদি সম্ভব হয়, তবে খোসাটাকেও অনস্তিত্ব করিয়া ফেল—অথবা খোসাটাকেও সাঁশ বানাইয়া লও। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" দেখ, খোসাটা আর খোসা রহিলনা—খোসাটা সাঁশ হইয়া গেল। সাধকের দৃষ্টি ব্রহ্মে। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তিনিই ভূমা, তিনিই মহান্, তিনিই রস স্বরূপ তৃপ্তির হেতু, তাঁহাকেই জান, তাঁহারি বিষয় চিন্তা কর, তাঁহাকেই নিদিধ্যাসন কর। সংক্ষেপে উপনিষদের ধর্ম্মটা এই। দিগ্‌দর্শনের কাঁটার ন্যায় জীবন একদিকে চেয়ে আছে। আর কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

এই মহাযুগের পরে আর একটা যুগ আসিল। ভারতের আবহাওয়ায় জীবনটা আর সুখ ও মধুময় নহে। বহির্জ্জগৎ ক্লেশে পরিপূর্ণ। অন্তর্জ্জগৎ ক্লেশে পরিপূর্ণ। জীব ক্লিষ্ট—জীবন ক্লিষ্ট। দৃষ্টি নিরাশায় পূর্ণ। এই ভাবটাকে পাশ্চাত্যেরা Pessimism বা "নিরাশবাদ" বলেন। কিন্তু ধর্ম্মজগতে Pessimism বা নিরাশবাদেরও একটা স্থান আছে। জাগর্ত্তি Optimism বা "মজাবাদে" হয় না। প্রাণটা যতক্ষণ নিরাশার ভারে দাবিয়া না পড়ে, ততক্ষণ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হয় না। ইহাই আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—ইহাই আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা। ঐ Pessimistic বা নিরাশবাদী যুগে জীবের ক্লেশ দেখিয়া এক জনের প্রাণ জাগিয়া উঠিল, একজনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কপিলবস্তুর রাজনন্দন ক্লিষ্ট জীবের ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ সাধনার্থ নির্গত হইলেন। নির্ব্বাণ জিনিসটা কি, তাহা আমরা বদ্ধ জীব কি করিয়া বুঝিব? নির্ব্বাণকে অনেকে অস্তিত্বহীনতা বা annihilation মনে করেন। কিন্তু যতটুকু আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে পারি, তাহাতে অস্তিত্বহীনতাকে নির্ব্বাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। আমার বোধ হয় নির্ব্বাণ তৃষ্ণার নিবৃত্তি—নির্ব্বাণ প্রেমের স্ফূর্ত্তি। তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি জন্মে—প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্ম—কর্ম্ম হইতে বন্ধন। তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হইল—প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে বিলীন হইল—কর্ম্ম গেল—বন্ধন গেল। এটা নির্ব্বাণের একটা দিক্। নির্ব্বাণের আর একটা দিক্ আছে, সেটা প্রেমের স্ফূর্ত্তি। তৃষ্ণায় অহমিকা আছে। অহমিকা অহেতুকী প্রেমের বৈরী। অতএব নির্ব্বাণ ভিন্ন প্রেম অসম্ভব। একটা আকর্ষণের নামই প্রেম নহে—প্রেম আর এক জিনিস। ঐ মেয়েটী সুন্দরী বা সুশীলা। তুমি ঐ মেয়েটীকে ভালবাসিতে চাও। কেন? তৃষ্ণা প্রযুক্ত—আকর্ষণ প্রযুক্ত। তাহার সৌন্দর্য্য মাধুরী বা চরিত্রের অমিয়তা তোমাকে পাগল করিয়া রাখিয়াছে। তুমি তৃষার্ত্ত, তোমার অহমিকা তৃষ্ণায় ছট ফট করিতেছে। কিন্তু যখন তুমি নির্ব্বাণ সাধনে সিদ্ধ হইলে, তখন তোমার তৃষ্ণা গেল, অহমিকা অহংশূন্য হইল। তখন তুমি আর তোমার জন্য তাহাকে ভালবাসিবে না। তখন তোমার ভালবাসার অভিপ্রায় তার ক্লিষ্ট জীবনটাকে মিষ্ট করা, মিষ্ট জীবনটাকে সুখী করা। ইহাই নির্ব্বাণ মন্ত্রের সার তত্ত্ব। তৃষ্ণার বিরতি—প্রেমে রতি। কিন্তু সে রতিতে অনুমাত্রও আত্মত্ব নাই—অনুমাত্রও আপনার দিকে টান নাই—সম্পূর্ণ অহেতুকী। এ সাধনে কে কে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। আমরা বদ্ধজীব—তৃষার্ত্ত—প্রবৃত্তির পথে চলি। এ সাধন সম্ভব কি না, তাহাও বুঝিতে পারি না।

উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মমুখী ছিলেন। কেবল তাঁহাকে জান। জগৎ ও জীব থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। দৃষ্টি শুধু একমেবাদ্বিতীয়মের দিকে। বুদ্ধ জীবমুখী হইলেন। জীবের ক্লেশ অক্লেশে পরিণত কর, জীবে দয়া কর—জীবে

দয়া কর—জীবে দয়া কর। ইহাই নির্ব্বাণের প্রচার মন্ত্র ছিল। ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহা ভাবিবার, বা সে কথাটা প্রচার করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার সমস্যা জীব—জীবের কষ্ট দূর হইলেই তাঁহার নির্ব্বাণ সাধন সার্থক হইবে।

পাঠক, এখন একবার খ্রীষ্টের দিকে এস। বৈদিক, ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধ ত্রিবিধ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব খ্রীষ্টে একাধারে দেখিতে পাইবে, বৈদিক ধর্ম্ম জীবনবাদী ছিল, আমরা খ্রীষ্টে সেই জীবনবাদ দেখাইয়াছি। বৈদিক জীবন জড়ে জড়িত, ঐ জড়ের মধ্যে জীবনময় দেবতাকে দেখা। খ্রীষ্ট এ ধর্ম্মের প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি জগতে একটা দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত করিতে আসেন নাই। তিনি সামান্য সূত্রধর-তনয় ছিলেন। যেরুশলেমের কোন ইহুদীটোলে বা রোম সাম্রাজ্যের কোন গ্রীক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। বিশ্বটাই তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সাধারণ চক্ষে যে জড় ও জীবকে দেখিতেন, সাধারণ ভাবে তাহাদের অস্তিত্ব মানিতেন। জড় ও জীবকে অনস্তিত্বের জলে ডুবাইয়া দিয়া নিরলম্ব ভাবে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক ঋষিদের ন্যায় জড়েই দেব দর্শন করিতেন — জড়েই জীবনের লীলা দেখিতেন। গাছের ফুল, ক্ষেতের শস্য, অরণ্যের পাখী তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিত।

জড়ে জীবন মানা ও জড়কে জীবনের উৎস মানা, এক কথা নহে। খ্রীষ্ট বলেন, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God" মূল গ্রীক অনুসারে "Except a man be born from above" মানুষের দ্বিজত্ব বা নবজীবন লাভ একটা আধ্যাত্মিক রহস্য। কিন্তু সাধক জীবনে এটা একটা বাস্তব কথা। নবজীবন লাভ না করিলে আমাদের চক্ষুর্দ্বয় খোলে না, আমরা প্রকৃতিতে দেব দর্শন করিতে পারি না। এই দ্বিজত্ব লাভ না করিলে আমাদের অন্তশ্চক্ষুও খোলে না, আমরা "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" রজরহিত, কলারহিত পরব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে পারি না। কিন্তু এই নবজীবনের উৎস কোথায়? "Except a man be born *from above*" এ জীবনের উৎস উর্দ্ধে। উর্দ্ধ হইতে জন্ম গ্রহণই নব জীবন লাভ। বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি একটা পৌরাণিক আখ্যান হইতে পারে; কিন্তু যে পুণ্যতোয়ায় পাপী তরে যায়, পতিত মানুষ নব জীবন পায়, তাহার উৎস উর্দ্ধে—বিষ্ণু বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মপদে *। যখন ঐ উৎস হইতে জীবনধারা জাগতিক জীবে এসে গেল, তখনই তার আধ্যাত্মিক নব জন্ম লাভ হইল। এই নব জন্ম পেয়ে যে দিকে দেখ, জীবনই জীবন দেখিতে পাইবে—সমগ্র বিশ্বজীবনে উবছে পড়িবে। জীবনে বন্যা আসা চাই—বন্যা উপর হইতে আসে।

অতএব উপনিষদের ঋষিগণের ন্যায় খ্রীষ্টও উর্দ্ধমুখী ছিলেন। জড়ে জীবন আছে কিন্তু জড় জীবন নহে, জীবনের উৎস উর্দ্ধে তিনি আপনার সত্তা, আপনার অস্তিত্ব উর্দ্ধে উপলব্ধি করিতেন। "No man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man, which is in heaven." খ্রীষ্টানেরা এই প্রকার উক্তিগুলিকে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তিনি ঈশ্বর হউন বা মানুষ হউন, তিনি এই উক্তিতে আপনাকে Son of man বা মনুষ্য-তনয় বলিতেছেন। এই মনুষ্য-তনয় পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া আপনাকে স্বর্গস্থ বলিতেছেন। কেন? একত্ববোধে। তিনি আপনাকে কঠোপনিষদের ঋষিদৃষ্ট "ঊর্দ্ধমূল অশ্বত্থের' ন্যায় মনে করিতেন। পিতা হইতে নিঃসরিত—অধঃপানে আসিয়াছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে—পিতায় স্থিত। উপনিষদের ঋষি যেমন একত্ব সাধনের চরম সোপানে পদার্পণ পূর্ব্বক "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলেন, খ্রীষ্টও তেমনি "I and my Father are one" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলেন। "আমি ও আমার পিতা এক"—ইহা একত্ব-বোধক, কিন্তু অদ্বৈতবাদ নহে। ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলিতে চাও বল—এটা সাধক জীবনের অভিজ্ঞতা, দার্শনিক তর্কসিদ্ধ মত নহে। তিনি অনন্ত, আমি সান্ত, তিনি ও আমি এক নহি—এ অর্থে দ্বৈতবাদ। কিন্তু যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই আমার ইচ্ছা, এ অর্থে অদ্বৈতবাদ। তাঁহার ও আমার দুই ইচ্ছা নাই। জীবনের স্বাতন্ত্র্য পৃথক ইচ্ছায় হয়। যখন ইচ্ছাটা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পণ করা হইল, তখন আর নিজত্ব কোথায় রহিল? তখন "দগ্ধেন্ধন নিবানলম্" হইয়া গেল। ইন্ধন আছে, কিন্তু ঐ দগ্ধ ইন্ধনে অগ্নিই দেখা দিচ্ছে—দ্রষ্টা আগুনই আগুন দেখিতেছে। যদি ইন্ধনের আত্মবোধ থাকিত, তবে সেও বলিত, আমি আর কাঠ নই, আগুন। তেমনি I and my Father are one. সত্তায় পৃথকত্ব থাকিলেও অনুভূতিতে একত্ব। এই অনুভূতি বশতঃ এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "He that hath seen me hath seen the Father" "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে।" আমার কিছুই নাই। পিতার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, পিতার প্রেম আমার প্রেম, পিতার পুণ্য আমার পুণ্য, পিতার কার্য্য আমার কার্য্য—আমি সেই ঊর্দ্ধস্থ জীবনের উৎসে পরিপূর্ণ। ঐ তোমার গৃহ সম্মুখে যে প্রবাহিত গঙ্গাজল দেখিতেছ, তাহা গোমুখী পর্ব্বতেরই জলধারা। আমাতে যে জীবন দেখিতেছ, তাহা জীবনাধার পিতার জীবন। এই জীবন দেখ, সে জীবন টের পাবে। এই একত্ববোধের চরম পরিণতি "Thy will be done"এ। আমার নহে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ক্রুশে আপনাকে বলিদান পূর্ব্বক খ্রীষ্ট আপনার এই একত্ব-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

খ্রীষ্ট বৈদিক ঋষিগণের ন্যায় জীবনবাদী ছিলেন। উপনিষদের ঋষিদের ন্যায় ব্রহ্মমুখী ছিলেন। তিনি "ঊর্দ্ধমূল অশ্বত্থের" ন্যায় আপনাকে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত ও ব্রহ্মে স্থিত অনুভব করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব ঈশ্বরে ডুবিয়া গিয়াছিল, "দগ্ধেন্ধন নিবানলম্" বৎ তাঁহার মনুষ্যত্বে ঈশ্বরই ঈশ্বর দৃষ্ট হইতেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে identify হইয়া গিয়াছিলেন। এই ভাবটাকে চাই অদ্বৈতবাদ বল, চাই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বল, তোমার অধিকার আছে। এটা ভারতীয় ভাষায় সাধক জীবনের উচ্চতম অভিজ্ঞতা।

কিন্তু খ্রীষ্টের ভাষায় ইহাই উচ্চতম অভিজ্ঞতা নহে। এ অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা আর একটা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সেটা জীবের সঙ্গে একত্ববোধ—পতিত মানুষের সঙ্গে আপনাকে identify করা। বুদ্ধ জীবমুখী হইয়া এই ভাবের সাধন করিয়াছিলেন। জীবকে অস্বীকার করিয়া শুধু ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম্মের আধখানা মাত্র। আবার ঈশ্বরকে ধর্ম্মরাজ্যে না আনিয়া শুধু জীবমুখী হইয়া নির্ব্বাণ মন্ত্র প্রচার করাও ধর্ম্মের আধখান। খ্রীষ্ট এই দুই অর্দ্ধ মিলাইয়া ধর্ম্মকে পূর্ণ কলেবর প্রদান করিয়াছেন।

ঈশ্বর কোথায়? ঐ মেঘের উপর সুদূরস্থ কোন ঠাঁই? না, তাহা নহে। "ভূতেষু—ভূতেষু" হাঁ, ভূতে ভূতে তিনি আছেন। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে"—হাঁ, সেখানেও তিনি আছেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তোমাকে আর এক স্থানে ব্রহ্মদর্শন করাইতে চান। সে স্থানটা ক্লিষ্ট পতিত নরে। ঐ যে অসংখ্য নরনারী পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া হা হুতাশ করিতেছে, ব্রহ্ম উহাদেরই মধ্যে। আকাশে, স্বর্গে Angels বা দূতগণের মধ্যে মহামহিমাময় ব্রহ্ম থাকিতে পারেন, কিন্তু সেথায় আমার চর্ম্মচক্ষুর প্রবেশাধিকার নাই। আমি আমার ঈশ্বরকে কাছে দেখিতে চাই। খ্রীষ্ট ঐ পতিত নরনারীদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাইতেছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবলে ওরা ঈশ্বরের প্রতিরূপ (image of God)—বৈদান্তিক বলেন, ওখানে ব্রহ্মের মায়াবদ্ধ প্রতিবিম্ব। প্রতিরূপ হউক বা প্রতিবিম্ব হউক, এ জগতে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান ঐ প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব দ্বারাই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এ কারণ যে মানুষটা মানুষের

* বিষ্ণু ব্যাপকার্থক বিষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই অর্থে কঠোপনিষদের তৃতীয়া বল্লীতে বিষ্ণুশব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই।

সঙ্গে যে পরিমাণে একত্ব বোধ করিতে পারে—যে পরিমাণে আপনাকে identify করিতে পারে, সে মানুষটা সেই পরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। ঐ যে ক্রিষ্ট মানুষ তোমার দ্বারে ক্ষুধায়, পিপাসায়, রোগে, শোকে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, যদি তোমার চক্ষু থাকিতে তাহাকে তুমি দেখিতে না পাও বা দেখিতে না চাও, তবে কেবল চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে বসিলেই কি তাঁহার দর্শন পাইবে? সম্ভবতঃ ধ্যানে তুমি যাহা দেখিতেছ, ওটা তোমার কল্পনার ছবিমাত্র। এ কারণ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কেবল ঊর্দ্ধমুখী হইলে হইবে না, তোমাকে জীবমুখী হইতে হইবে। স্বর্গের সিঁড়ি উপরের দিকে নয়, নীচের দিকে।

মানুষ মানুষকে কখন্ পূজা করে? যখন মানুষ মানুষের সঙ্গে সহানুভূতি দেখায়। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কেহ তাঁহাদের পূজা করিয়াছিল কি না জানিনা। কিন্তু শাক্য মুনির শত নিষেধ সত্ত্বেও দেশটা তাঁহার মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কেন? বুদ্ধ জীবমুখী ছিলেন, এ জন্য। জগৎ আজ সূত্রধর-তনয় যীশুকে কেন পূজা করিতেছে—চাই পূজায় ভ্রান্তিই থাকুক না কেন? সূত্রধর-তনয় যীশু জীবমুখী ছিলেন বলিয়া,—তিনি পাপী তাপী নরসঙ্ঘে পিতার মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন বলিয়া—তিনি মানুষের সঙ্গে আপনাকে identify করিয়াছিলেন বলিয়া। খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে "God-man" বা "ঈশ-নর" বলে। সত্য সত্যই তিনি God-man বা ঈশ-নর ছিলেন। তাঁর জীবন একদিকে ঈশে ডুবিয়াছিল, অপরদিকে নরে ডুবিয়াছিল। তাই তিনি ঈশ-নর বা "নরহরি" হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ঈশে ডুবিয়া ঈশসঙ্গে একত্ব বোধ করিতেন, আবার নরে ডুবিয়া নরের সঙ্গে একত্ব বোধ করিতেন। নরের দুঃখ, নরের পাপ, নরের তাপ নিজ প্রাণে উপলব্ধি করিতেন। তাই তাঁর নাম পড়িয়াছিল "the Man of sorrow"—শোকের মানুষ। আমরা স্বার্থপর জীব, আপনা লইয়া থাকি, আমরা তাঁর নরের সঙ্গে ঐ একত্ব-বোধ বুঝিতে অক্ষম। ক্রিষ্টের সঙ্গে ক্রিষ্ট হওয়া, নিজে বিশুদ্ধ হইয়া পরের পাপে আপনাকে অশুচি বোধ করা, এ এক আশ্চর্য্য তত্ত্ব। নির্ব্বাণতত্ত্ব এক্ষেত্রে পরিণাম তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। পিতাকে বলিতেন "আমি নহি, তুমি"—মানুষকে বলিতেছেন "তুমি নহ, আমি।" ঐ পাপটা তুমি কর নাই। আমি করিয়াছি—তোমার অপরাধ আমার অপরাধ—তোমার প্রায়শ্চিত্ত আমার প্রায়শ্চিত্ত। খ্রীষ্ট অপরের পাপের জ্বালায় জ্বলিতেন—পরের নরক নিজ প্রাণে ভোগ করিতেন। ইহারই নাম vicarious suffering বা বদলে দুঃখ ভোগ। এই দুঃখ তাঁহাকে ক্রুসে বলীকৃত করিয়াছে। সে বলিদানের অর্থ কি, তাহা আমি জানি না। এ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার যে সব অর্থ করিয়াছে, সে সব কল্পনা ও জল্পনা অনুমান মাত্র। ঐ কল্পনা ও জল্পনা কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা, তাহা আমি জানি না। যে যে ভাবে চাহুক, ঐ ক্রুশতত্ত্ব গ্রহণ করুক। সাধক ও তত্ত্বে অন্ততঃ একটা জিনিস দেখিতে পান, সে জিনিসটা "প্রেম।" প্রেমের খাতিরে যীশু প্রাণ দিয়াছেন—প্রেমের বুক খুলিয়া তিনি ডাকিতেছেন:—

"Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light"

পাঠক এস। এই আহ্বানকারীকে লইয়া একবার সাধন ক্ষেত্রে ব'স। জড়ে দেবদর্শন কর, প্রাণে ব্রহ্মদর্শন কর, মানুষে আপনাকে বলি দাও।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আমাদের শিক্ষা ও জীবন-সংগ্রাম।

শিক্ষা সম্বন্ধে দেশময় একটা মহা সোরগোল উঠিয়াছে। দেশের লোক কেবলই বলিতেছে, "শিক্ষা যে আমরা কিছুই পাইতেছি না, কোনও দিকেই যে বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদিগকে কিছুই দিতেছে না। আমরা যদি উদরান্নের সংস্থানেও অক্ষম হইলাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনী-স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির অশন-বসনের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিতে না পারিলাম, তবে কোথায় আমাদের শিক্ষা?"

কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব। কিন্তু মনুষ্যত্ব গ্রাসাচ্ছাদনের হিসাবকে বাদ দিয়া নয়। সংসারীর পক্ষে সদুপায়ে সংসার নির্ব্বাহের সকল প্রকার উপযুক্ততাই মনুষ্যত্ব। বিশেষতঃ উদরান্নের চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইতে না পারিলে কিছুতেই মানুষ মানুষ হইতে পারে না, কোনও উন্নত চিন্তায় মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। এমন কি, মানুষ পশু হইয়া উঠে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন যে এত মনস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, আর এখন যে তেমন হইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ সমূহের মধ্যে জীবিকানির্ব্বাহের প্রশ্ন অন্যতম। বর্ত্তমান বিপদরাশি দ্বারা যদি ভারতের উন্নতির শ্রেষ্ঠ যুগ জর্জ্জরিত থাকিত, তবে একত্রে এত মনস্বীর আবির্ভাব সম্ভব হইত কি না, ঘোর সন্দেহের বিষয়। সেই মনীষিবৃন্দের ন্যায় প্রতিভা সহস্র নর-নারীর মধ্যে আজও যে নিহিত না আছে, এমন নয়, তবে Chill Penuryতে তাহাদের genial current of the soul প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বকার সুখ স্বচ্ছন্দতা দেশে বিরাজমান থাকিলে আরও কত জগদীশচন্দ্র, কত প্রফুল্লচন্দ্র, কত রবীন্দ্রনাথ পাইয়া আমরা অধিকতর সৌভাগ্যশালী হইতে পারিতাম।

শিক্ষা এ যাবত কি করিয়াছে এবং কি করিতে পারে, কোথায় আমাদের অভাব, এ সবই বর্ত্তমানে চিন্তনীয় বিষয়। শিক্ষা হাত, পা, মস্তিষ্ক এবং হৃদয় খুলিয়া দিতে না পারিলে তাহা আর শিক্ষা হয় না। অর্থাৎ তিনটী Hএর উপর শিক্ষা নির্ভর করে, যথা, Head, Heart ও Hand. দেখিতে হইবে, ইহাদের ভিতর আমাদের কোন্‌টার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভাব। প্রথম দুইটী সম্বন্ধে যেমনই হউক, শেষটীর শিক্ষা আমরা আদৌ পাই নাই। আমরা এইটীকে বাদ দিয়া কেবল মুখের কথায় চিঁড়া ভিজাইয়া দিন কাটাইতেছি। ফলতঃ আমরা সংসারের জন্য প্রস্তুত হইয়া কেহই শিক্ষামন্দির হইতে বাহির হইতেছি না। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, আমাদের শিক্ষা না চলে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আদর্শে, না চলে আধ্যাত্মিক সভ্যতার আদর্শে। আমরা না করি ইহকালের সেবা, না হই পরকালের জন্য প্রস্তুত। ভগবান সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই যেন ঠেকিয়া বাঁচিতে হইতেছে। আমাদের শিক্ষায় না আছে অর্থের চেষ্টা, না আছে জ্ঞানের চেষ্টা। বীণাপাণির উদ্দেশ্যে আমাদের বীণাপাণির অর্চ্চনা নয়; চাকুরীর উদ্দেশ্যেই বীণাপাণির সেবা, যেমন অনেকস্থলে কালীপূজার উদ্দেশ্যে পাঠা না হইয়া, পাঠার উদ্দেশে কালীপূজা হয়। সুতরাং বীণাপাণির অধিষ্ঠান ও আমাদের পূজার পরিমাণেই হইয়া

থাকে। এইত জ্ঞানের কথা। তারপর অর্থ। বর্ত্তমান শিক্ষাকে অনেকেই অর্থকরী বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারে যে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের শিক্ষা অর্থ বহন করিয়া আনিতে পারে কি? অভাব মোচন করিতে পারে কি? বরঞ্চ বলা চলে ইহা "দাসকরী," ইহা দাস সৃষ্টির কল, এই নির্জ্জীব পদার্থ টীই শিক্ষা সৃষ্টি করিতেছে মাত্র। ইংরেজ এদেশে তাহাদের প্রয়োজনানুসারে কতকগুলি কেরাণী সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা দেখিলাম, স্কুলকলেজ হইতে বাহির হইয়াই এক একটা চাকরী পাইতেছি। দেশের তদানীন্তন অবস্থায় জীবিকার ভাবনাও বিশেষ ভাবিতে হইত না, যাহা পাইতাম, তাহা না পাইলেও বিশেষ আসিয়া যাইত না। ফলে এই দাঁড়াইল, আমরা বংশানুক্রমিক কেরাণী জাতিতে পরিণত হইলাম। চোক মেলিয়াই দেখিতাম, পিতাপিতামহ সকলেই কেরাণী, আমরাও বুঝিলাম, এইটাই জীবনের ব্রত। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বালকগণ যে বয়সে যেভাবে বড় হইয়া কখন কি নূতন কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিবে, এই ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার পৃথিবী হইতে কখন কি নূতন বস্তু আবিষ্কার করিবে, আমরা সে বয়সে ভাবিতে লাগিলাম, কখন ঐ চাকুরীর ফাঁস গলায় পরিয়া ধন্য হইব। মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা কিছু, তাহা পাশের ছাপ আর চাকুরীতেই ধরিয়াই লইলাম। চাকুরী চাকুরী জপ করিতে করিতে বড় হইয়া হাড়কাঠে মাথা গুঁজিয়া মনুষ্যত্বকে বলি দিতে চলিলাম। সমাজ-স্বদেশ-আত্মদৃষ্টি কোথায় ভাসিয়া গেল। শিক্ষাত এইখানেই আসিয়া চির নির্ব্বাণ লাভ করিল। উচ্চ ও নিম্ন, সকল শিক্ষাই পার্থক্যহীন হইয়া একাকার ধারণ করিল। চাকুরী ছাড়া উচ্চ শিক্ষারও কোনও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রহিল না। জ্ঞানচেষ্টা ও অর্থচেষ্টার যাহা কিছু উদ্দেশ্য, ইহাতেই চরিতার্থতা লাভ করিল। এইরূপে আভিজাত্যের নেশায়, গরুর গাড়ীর ঢিমে তেতালা চালে পিতৃপিতামহাদিক্রমে একটা ঘৃণ্য আরামের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া এমন স্তরে পৌঁছিয়াছি, যেখান হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই কেরাণীগিরির মেসিনে তৈরী হইয়া জীবনীশক্তি একরকম হারাইয়া বসিয়াছি, রক্তের মধ্য দিয়া জাতির ভিতর সেই মোহ প্রবেশ করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনাশক্তি রহিত করিয়া দিয়াছে। জীবন-সংগ্রাম ক্রমেই কঠোর হইয়াছে। শিক্ষা কিম্বা বিদেশীর সংঘর্ষ, যে জন্যই হউক, দেশে বিলাসিতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে আফিসে আদালতেও বেজায় ভিড় বাঁধিয়াছে। চাকুরী আর জুটে না, জুটিলেও তাহাতে দিন গুজরায় না। দেশের গ্রাজুয়েটগণও অন্ন সংস্থানে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। ১৫, ২০, ২৫ টাকায় অনেকে চাকুরী করিতেছেন। আমি জানি, একজন গ্রাজুয়েট ১৫৲ টাকা বেতনের একটা আদালতের চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। আমরাত এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। শিক্ষা যদি এই হালেই চলিতে থাকে, আর দেশ শুদ্ধ লোক যদি এমন করিয়াই অভাবে মরে, তবে ছেলের বি-এ, পাশ অপেক্ষা সেই খরচের টাকায় পুঁজি দিয়া তাহাকে মুদীদোকানে বসানই অধিকতর সৎপরামর্শ বলিয়া মনে করি।

এমনভাবে একমুখী হইয়া আমরা গঠিত যে, এমন ছাঁচে আমাদের মন ঢালা যে, চাকুরীর দ্বার হইতে ফিরিয়া নিজের ভিতর

কোনও উপযুক্ততাই খুঁজিয়া পাই না। বড় জোর ওকালতি, কিন্তু সেখানেও ভিড়। তারপর একদিকে "পাশের" পেষণ এবং অন্য দিকে বয়স বৃদ্ধিতে উৎসাহ দমিয়া যায়, হতাশা ও হাহাকার আসে। আশ্চর্য্যের বিষয়, "বাবু" নাম কিনিবার এমন একটা মারাত্মক প্রলোভন আমাদের মধ্যে ঢুকিয়াছে যে, ঘরের ছেলে ঘরে যাইয়া, চাষীর ছেলে যে চাষ করিবে, তাঁতির ছেলে যে তাঁত বুনিবে, ব্যবসায়ের উন্নতিতে মনোযোগ দিবে, তাহাতেও দারুণ লজ্জা অনুভব করে! নির্দ্দোষ স্বাধীন জীবন যাপন অপেক্ষা পরাধীন ও ডানহাতে বাঁহাতে চুরিচামারির জীবনকে যে শিক্ষা বড় করিয়া দেখায়, তাহাকে শিক্ষা বলিতে লজ্জা হয় না কি? নিজ ব্যবসায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়, সে কি সর্ব্বনেশে শিক্ষা! এমন ধারাত পৃথিবীর কোন দেশেই হয় না। বরঞ্চ পিতার দশমণের জমিতে লেখাপড়া শিখিয়া পুত্র বিশমণ জন্মাইতে পারিলে তবেত শিক্ষার সার্থকতা। বিভিন্ন দেশও চলিয়াছে এই ভাবেই। আমরা দেখিতে পাই, নানাদেশের লোক যতই শিক্ষিত হইতেছে, ততই ভগবানের সৃজন শক্তিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে বিশেষত্বহীন করিয়া ধরিবার চেষ্টায় স্বীয় ক্ষমতার অবিরাম নিয়োগে অর্জ্জিত শিক্ষাকে ধন্য করিতে চাহিতেছে। সে তুলনায় আমরা কোথায়, ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

উপায় কি? এবার ত বাতগ্রস্ত পাথরের মত ভারি হস্তপদগুলিকে চালনা করিতে না পারিলে সমগ্র জাতিটা উচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। এই যখন দেশের লোক বুঝিল, তখনই কথা উঠিল, শিক্ষাসংস্কার আরম্ভ কর। কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য উন্নতি করিতে না পারিলে আমাদের এই সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু মরিতে বসিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাই কি করিতে পারিতেছি? আমরা ত সুবোধ, সবই বুঝি। এই অভাবের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে থাকিয়া আমরা বেশ বুঝি, আজ হয় টাকা ব্যয়ে এক জোড়া বস্ত্র না কিনিয়া নিজেরা সুতা কাটিয়া ও তাঁত বুনিয়া প্রত্যেক নিজ পরিবারের জন্য অনেক সুলভে বস্ত্র যোগাইতে পারি; আমরা বুঝি, দশ টাকায় যখন কেরোসিনের বাক্স বিক্রীত হয়, তখন বনে জঙ্গলে অযত্ন বিক্ষিপ্ত "রণা" অথবা "পুন্যাল" বীচি সংগ্রহ করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে মোটেই পয়সা খরচ হয় না; কিন্তু এই সব সুবিধার কথা ভাবিয়াও কি আমরা কোনও দিন গাঁটের পয়সা বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছি? অর্থ বাঁচাইবার কিম্বা অর্থোপার্জ্জনের যাহা কিছু উপায় আমাদের আছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিবারই বা চেষ্টা কোথায়? কিছুই যে করিতে পারি না। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে যদিও অনেক কথাই আসিয়া পড়ে, তথাপি মোটামুটি ভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, বহুপুরুষ যাবত পরের হাতে খাইয়াই আরাম বোধ করিয়া আসিতেছি। কাছারীতে যাওয়া আসা ছাড়া কলমপেশা ব্যতীত কিছু করি নাই বলিয়াই আমাদের কর্ম্মশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা আরামপ্রিয় হইয়াছি—এমন হইয়াছি, রাজার পালিত অলসপালের ন্যায় বিছানায় শুইয়া আগুনে পুড়িয়া মরিতে প্রস্তুত, তথাপি আত্মরক্ষার পথ দেখিতে রাজি নহি। তাই মনে-মুখে যাহা বুঝি ও বলি, কার্য্যতঃ ছুটি কেরাণীগিরিরই দিকে। দুপয়সা থাক্ আর না-ই থাক্, দেহান্তে সংস্কারবদ্ধ আত্মার মত আমাদের সংস্কারবদ্ধ মনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ চাকুরীর নেশাটাকে আর ছাড়িতে চাহে না। ইহারই জন্য অর্থ উপার্জ্জনের

ক্ষেত্রও নিজ হইতে রচিত হইতেছে না। আমাদের মধ্যে কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। দেশের ভিতর যথার্থরূপে কর্ম্মশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইলে বহুদিনের অবধারিত সভ্যতার standardটাকে বদলাইয়া ফেল—যে standard ধরিয়া লেখাপড়া-জানা চাষীর ছেলে চাষ করাকে ঘৃণ্য মনে করে, তাহার সেই standardটাকে ভুল বলিয়া ধরাইয়া দাও।

শৈশব হইতে বহুদিন যেমন দাসত্বের ভাব, কেরাণীগিরির ভাব রক্তমাংসের সহিত মিশিয়া আসিয়াছে, তেমনই শৈশব হইতে স্বাধীনজীবিকার্জ্জনের ভাবকে রক্তমাংসের সহিত মিশাইয়া দিতে থাক। যাহাকে যেমন করিয়া পাইতে চাও, জীবনের প্রভাতেই তাহাকে তেমন করিয়া গড়িয়া তোল। ইহারই জন্য জনৈক মনস্বী বলেন, "Whatever you would like to introduce in a society, introduce in its school." এই স্থানের গঠনদ্বারাই সমাজ গঠিত হয়; সুতরাং সাবধানতার সহিত প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টি রাখিয়া মানুষ-গঠনের চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত কর।

চাই দেশের মনের মধ্যে একটা নেশা বা ঝোঁক ধরাইয়া দেওয়া, নিষ্ক্রিয় হস্তপদগুলাকে লজ্জিত করা, সকল আশঙ্কা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, সকল অক্ষমতার ভ্রম সংশোধন করা; আরো চাই, দেশের ধনী ও দরিদ্র সকলকে এক প্রণালীতে শিক্ষিত করা, তাহা হইলেই যৌথ কারবারে, কলকারখানায় ধীরে ধীরে দেশ ছাইয়া পড়িবে। শিক্ষার কাঠামটাকে চেহারাটাকে এমন করিয়া বদলাও, যাহাতে কেরাণীগিরির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইয়া স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের দিকে দেশের মনকে মাতাইয়া তোলে। আমার ত মনে হয়, বর্ত্তমান স্কুল কলেজ যতদিন থাকিবে, ততদিন কেরাণীগিরির অতিরিক্ত অন্য কোন ধারণাই আমাদের মনে জাগিবে না। ঐগুলোতে পা দেওয়া মাত্র যেন দাসত্বের মোহটা আমাদের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সুর সুর করিয়া উঠে। অতএব পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষি ও শিল্পশিক্ষা শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত কর। অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেসন্ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজনীয়। চাই হাতে কলমে শিক্ষা। বাগান তৈরী করাইয়া, জমিতে সোণা ফলাইবার উপায় দেখাইয়া, এক ছটাক আলুটাকে এক পোয়া করিয়া জন্মাইবার কৌশল শিখাইয়া, ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি যথাসম্ভব শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া নব শিক্ষার আয়োজন কর। বিদ্যালয়ের গ্রন্থের সংখ্যাও যদি কিছু কমাইতে হয়, কমাও। কৃষিশিল্পের কথা না তুলিলেও, যুবকদের মঙ্গল ও তৎসঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গল ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। ইউনিভারসিটির গ্রন্থভার স্কন্ধে চাপিয়া দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে বাধা দিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে—দেশের বলবীর্য্য, উদ্যম, উন্নতিকে বিনষ্ট করিয়াছে। অতএব সমগ্র মানুষটাকে পুঁথিতে আটকাইয়া নির্জ্জীব পঙ্গু করিয়া না রাখিয়া, তাহার মনকে কর্ম্মক্ষেত্রে ভাগ করিয়া দিতে পারিলেও দেশের এক মহোপকার সংসাধিত হয়। সভ্যতা রক্ষার পক্ষে লেখাপড়া যেমন প্রয়োজনীয়, শিল্পবাণিজ্যও তেমনই আবশ্যক। তবে উভয়বিধ শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলে এখন বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যেই লেখাপড়া আমাদিগকে "বাবু" বানায়, তাহাকে সংসারী হওয়ার শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র করিলে আর উপায় নাই। ঐ আগুন দেখিলেই সংস্কার বশে আমরা পতঙ্গের মত হু হু করিয়া উড়িয়া পড়িব, আর মরিব। সুতরাং বাল্যে মানুষ গঠনের যে ব্যবস্থা করিব, তাহার সঙ্গে সংসারী শিক্ষার ভাজ রাখিতে হইবে। আমাদের সংস্কার পরিবর্ত্তিত না হইলে, সমুদয় দেশের মনের মধ্যে দৃঢ়তা বাঁধাইতে না পারিলে খালি খালি দু-চা'রটা কৃষিশিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াও তেমন লাভ হইবে না। দশ বিশ জন লোক তাহাতে জুটিতে পারে? যেহেতু সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষেত্র পাওয়া যায় না, দেশের লোকের সহানুভূতি মিলে না। দেশের ধনীরা সুদের ব্যবসায় ধরিয়াই দরিদ্রদের হাড়মাংস চিবাইবে, এই সবদিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, অধঃপতনের এমন সীমায় আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি যে, বিদেশ হইতে বিবিধ শিল্পকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া জনৈক ভদ্রলোক ধনীদের সহানুভূতির অভাবে আইন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের এই দুর্ভাগ্যের কথা ভিন্ন-দেশের লোককে শুনাইতে মরমে মরিয়া যাইতে হয়। তাই বলি, সমুদায় দেশের মনকে গড়িতে হইলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিশিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত কর। বিরাট আয়োজন স্বতন্ত্র করিয়া যে দিকে যাহা হয় করিতে পার, আপত্তি নাই, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেসন পর্য্যন্ত এইটুকু আগেভাগে করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

অবস্থাভেদে ব্যবস্থা। দশ দেশের দশটা নজির দেখাইয়া কিছুই হইবে না। অন্যের আদর্শে আমাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। কারণ আমরা যে সব অবস্থায় দিনপাত করিতেছি,

বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া দেখিলে অন্য জাতি তাহা হইতে অনেক অংশে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। ছাঁচে ঢালিয়াই মানুষকে ফুটাইতে পারা যায় না; তাহাকে বুঝিতে হইবে, চিনিতে হইবে। আর জগতের শিক্ষা ও জীবন সংগ্রামের শিক্ষা, কিন্তু আমরা কি সেই ছাঁচেই গঠিত হইতেছি? আজ চাকুরী গেলে কালই যে মরিতে বসি, জগৎ অন্ধকার দেখি।

দেশের যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, এই আসন্ন বিপদে যুবকদিগকে প্রথম বয়সেই সংসার প্রতিপালনের যোগ্য করিয়া দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে। এই গরীব দেশের অনেক পরিবারেই সংসাররক্ষার চেষ্টায় অবিলম্বেই ছেলের ডাক পড়িতেছে। সুতরাং দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষাটাকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া দাও। বলিতেছি না যে, উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিতে হইবে, তবে সর্ব্বসাধারণের জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাটা পূর্ব্বে করিয়া লইতে হইবে। তারপর আমরা দেখিতে পাই, পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দেয়, এমন ক্ষমতাও দেশের মুষ্টিমেয় পিতারই আছে। তথাপি দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কৃষি সকল বিভাগেরই জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা দরকার। রুচিভেদে ও অবস্থানুযায়ী শিক্ষার্থী যাহাতে আপন আপন পথ বাছিয়া লইতে পারে, বেরূপ সুযোগ হইতে কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। যাহাদের বিভিন্ন বিভাগে শক্তি আছে, তাহারা শক্তি ফলাইতে পারে, এমন ক্ষেত্র রচনাও করা চাই। ফলকথা, সর্ব্বসাধারণের খাওয়া পরার যোগাড়টা করিয়া, যাহার জন্য বিশেষ যাহা করিতে পার ভাল-ই। শিক্ষার দ্বারা দেশের লোক এইটুকুই চাহিতেছে। বাঙ্গালার সভ্যতা

রক্ষায়, ভারতের ইজ্জত রক্ষায় গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানই, টাকাই আমাদের মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমাদের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, অভাবক্লিষ্টের উন্মত্ত শ্বাসে বাঙ্গালার আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; নিঃসহায়ের অশ্রুবর্ষণে ধরণী বক্ষ অবসিক্ত হইতেছে; প্রতি বৎসর শত সহস্র নরনারী জঠর জ্বালায় ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে এবং কেহ কেহ বা শেষ আশ্রয় মৃত্যুর কবলে সকল বেদনার অবসান করিতেছে। মানুষের প্রাণে এ দৃশ্য কত আর বরদাস্ত হইবে! দেশকে বাঁচাও, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার উপায় উদ্ভাবন কর। অন্য জাতির শিক্ষা দীক্ষা যাহাই হউক, প্রাণে বাঁচিবার শিক্ষাই আমাদের শিক্ষা, বর্ত্তমানে একথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য কর।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

দর্শন।

বিশ্বরাজ, এই বিশ্বে, যাহা কিছু আছে,
তোমারে ভকতগণ সবাকার মাঝে
করেছেন দরশন ;—বলেছেন তা'রা
ঔষধে বনেতে পুষ্পে ব্যাপ্ত বসুন্ধরা
আছ তুমি ;—তাই ক্ষুদ্র লতার সম্মুখে
করে অবনত শির দীন হ'য়ে থাকে।
হে রাজেন্দ্র, মোর এই সামান্য জীবনে
তাই তো ভরসা, এই নিখিল ভুবনে
সমস্তের মাঝে যদি থেকে থাকো তুমি,
শুধুই আমাতে নাই ?—এই কথা আমি
কেমনে মানিয়া ল'ব ? তাই কহি পিতঃ,
তুমিও আমার মাঝে আছ বিরাজিত !
অন্ধ আমি, মূঢ় আমি তাই তো এমন
না হেরি আমার মাঝে ও রাঙ্গা চরণ।

শ্রীহিরণবালা সেনগুপ্তা।

স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী।

১৮৫২ অব্দে পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দগ্রামে প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহেশচন্দ্র চৌধুরী স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া প্রসন্নচন্দ্র অতীব মহত্তের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক অনেক নির্য্যাতনও সহ্য করিয়াছেন। বাল্যকালে পাবনা এবং রাজসাহীতে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৭৩ অব্দে রাজসাহী হইতে এণ্ট্রান্স পাস করেন, এবং সেই স্থানে অবস্থানকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গোপনে তাহার সভ্য মনোনীত হন। ক্রমে তাহা প্রকাশ পাইলে জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহা করিতে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা বন্দ করিলেন। এণ্ট্রান্স পাস করিয়া পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৮ অব্দে পুলিস বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কার্য্য প্রাণপণে অতীব সততার সহিত সম্পন্ন করেন, কখনও ঘুঁস লওয়া বা কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলম্ব করা

তাঁহার অভ্যাস ছিল না, সেইজন্য উচ্চতন কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। যখন যেখানে কাজ করিয়াছেন, সেই স্থান হইতেই সুখ্যাতি এবং প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন। এই বিভাগে কর্ম্ম করা কালে প্রাচীন হিন্দু সমাজের অন্ধ কুসংস্কারগুলি অবলোকন করিয়া সেই প্রাচীন সমাজের উপর তাঁহার বিরক্তি ও অনাস্থা হয় এবং অপর দিকে, তিনি যখন রংপুর জেলার নেলফামারী মহকুমার কোর্ট ইনেস্পেক্টর ছিলেন, সেই সময়ে সাধু মহাপুরুষ হরনাথ দাস মহাশয়ও সেইখানে সেরেস্তাদার ছিলেন। সুতরাং অতি সহজেই তাঁহার সহিত পরিচয় হয় এবং তাঁহার উন্নত আদর্শ চরিত্র, ত্যাগ ও নির্য্যাতনে-সহিষ্ণুতা দর্শন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস এবং ভক্তি দৃঢ় হয়। ১৮৮৫ অব্দে দীক্ষিত হন। তাহার পর হইতেই নির্য্যাতনও আরম্ভ হয়। আত্মীয়গণ এই কথা শুনিয়া নানাপ্রকার ভৎর্সনা ও বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, এমন কি, ঘৃণা করিয়া কেহ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত করিতেন না বা চিঠি লিখিয়া সংবাদও লইতেন না। কিন্তু তিনি তাহাদের ভুলিতেন না, সর্ব্বদাই সংবাদ লইতেন। একবার বিদেশে কর্ম্মস্থলে তিনি নিজে ও বাসাস্থ সকলে খুব পীড়িত হন, শুশ্রূষা করিবার কেহই ছিল না, চেষ্টা করিয়াও যখন লোক পাওয়া গেল না, অগত্যা তখন তিনি বাড়ীতে আত্মীয়দিগের নিকট সমস্ত বিবরণ লিখিয়া শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের একজনকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই আসিলেন না, বরং তাহার উত্তরে লিখিলেন "আপনি আপনার পায়ে নিজেই কুঠার আঘাত করিয়াছেন, এখন তাহার ফল একাই ভোগ করুন, আমরা কি করিব।" আর একবার কর্ম্মোপলক্ষে পাবনার কোন এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা ভোজন করিবার সময় তাঁহাকে পৃথক ঘরের বারান্দায় কলার পাতায় ভোজন করিতে দিয়া আপনারা পৃথক ঘরে ভোজন করিয়াছিলেন বিধর্ম্মী বলিয়া এক সঙ্গে আহার করিলেন না। আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক এইভাবে অনেক বার নির্য্যাতিত হইয়াছেন, তথাপিও তাঁহাদের ভোলেন নাই। জীবনে তাঁহার পরীক্ষারও অন্ত ছিল না, কিন্তু ভক্তবিশ্বাসী তাহা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কখনও মুহ্যমান হন নাই। ক্রমান্বয়ে তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার পত্নীগণ সকলেই অকালে ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। একে একে ৪টী পুত্র কন্যা অকালে ছাড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষে বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষিত পুত্রও যখন চলিয়া গেল, তাঁহার নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল না, ভগবানকে কৃতজ্ঞ অন্তরে ধন্যবাদ দিলেন "তোমার কার্য্য তুমিই করিয়াছ, ধন্য তুমি। পুত্রকে রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছ, আমি কেন বৃথা শোকার্ত্ত হইব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" তিনি অতীব দয়ালু ছিলেন, পর দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। যদিও ধনী ছিলেন না, তথাপি সাধ্যমত তাহা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেন। ভিখারীকে কখন বিমুখ করিতেন না। তিনি স্ত্রী শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ও তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগীও ছিলেন। গিরিধি বালিকা বিদ্যালয়ের অতীব

শোচনীয় অবস্থার সময়েই তিনি তাহার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া, গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য বৃদ্ধি করাইয়া তাহার বিশেষ উন্নতি বিধান করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কর্ম্মজীবন বড়ই ভাল বাসিতেন। নিষ্কর্ম্মে বসিয়া থাকা পছন্দ করিতেন না। অবসর গ্রহণের কিছুদিন পরেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া যায়, নিজে লিখিতে পরিতে পারিতেন না। ৩।৪ বৎসর পরে একটী চক্ষু অস্ত্র চিকিৎসায় ভাল হইয়াছিল, তখন প্রায় ১ বৎসর বেশ লিখিতে পড়িতে পারিতেন, কিন্তু অধিক দিন থাকিল না, পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং বলিতেন, "চক্ষু থাকিলে এক জিনিষই বার বার দেখিতাম, নূতন কিছুই দেখিতাম না, সুতরাং আমার কোন দুঃখই নাই, তবে দয়াময় যদি বাহ্য দৃষ্টি লইয়াছ, অন্তরে যেন দেখা পাই।" তিনি অতি সদালাপী ও বিনয়ী ছিলেন. যে কেহ তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে ভোলেন নাই। অহঙ্কার বা পরিচ্ছদের তাহার কোন গর্ব্ব ছিল না, নিজেকে অতি হীন মনে করিতেন। যে বিভাগে কার্য্য করিতেন, ইচ্ছা করিলে অসৎ উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া সত্য পথ অবলম্বন করিয়া বিবেকের আদেশে চলাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং তদনুসারেই চলিতেন। যখন যে অবস্থায় থাকিতেন, ঈশ্বরভক্ত তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, সর্ব্বদাই বলিতেন "তুমি যাহা দেও, তাই ভাল, বিষাদের পাশে রেখেছে হরষ, আঁধারের পাশে আলো" "আমি বাছিয়া লব না তোমার দান" এই সঙ্গিতটী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। ইদানীং প্রায়ই রুগ্ন থাকিতেন, সেই জন্য এবার মাঘোৎসবে কলিকাতা যাইবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্ত ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। এক দিন আদেশ পাইলেন—"শরীর অসুস্থ হইবে বলিয়া উৎসবে যাইবে না? এই শরীর কি তোমার চিরদিন থাকিবে? উৎসবে যাও, সেখানে কত ভক্ত সাধু মহাপুরুষের সমাগম হইবে, তাঁহাদের দর্শন করিয়া তোমার ভক্তি বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি হইবে।" তজ্জন্য ১৪ই জানুয়ারী গিরিধি হইতে কলিকাতা গমন করেন, কিন্তু ২।৪ দিন মাত্র উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, সহসা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে গিরিধি আসিবার সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত হইয়াছিল; তজ্জন্য গাড়ীও রিজার্ভ করা হইয়াছিল, কিন্তু সেই দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সাধু ভক্ত ৬৮ বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন নাই; শেষ মুহূর্ত্তে বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে ঈশ্বর স্মরণ করিতে বলেন, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"তাহা আর আমাকে বলিতে হইবে না, আমি তাঁহাতেই ডুবিয়া আছি।" অস্ফুট স্বরে 'দয়াময়' 'দয়াময়' উচ্চারণ করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র কর্ম্মকার।

দক্ষিণ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে যে সমস্ত মহাত্মা বাস করিতেন, তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে গুরুভক্তি এবং গুরুসেবার অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ, গুরুসেবা করা ও গুরু উপদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করা। গুরুকরণ না হইলে ধর্ম্মজগতে প্রবেশ লাভই করা যায় না। সেই বাল্য হিন্দু ধর্ম্মে পূজা করিতে বসিলেই প্রথমেই গুরুর ধ্যান করিতে হয়।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

সেই জন্যই যতক্ষণ পর্য্যন্ত নারদ আসিয়া ধ্রুবের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াছিলেন, ততক্ষণ এত কঠিন সাধনেও নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন দেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মের মতে গুরুই ব্রহ্ম। স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধককে কৃপা করেন এবং সাধু সঙ্গরূপ তরণীর সাহায্যে ভবসাগর উত্তীর্ণ করিয়া দেন।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরং ধনং।
গুরুরেব পরঃকামো গুরুরেব পরায়ণম॥
গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ।
তস্মাৎ তদুপদেশো তস্মাদ্‌গুরুতরো গুরুঃ॥

গুরুসেবার একটী উদাহরণ এস্থানে দিতে ইচ্ছা হইতেছে। রামানুজের একটী শিষ্যের নাম দাশরথি—ইনি মহাপণ্ডিত। তিনি একদা রামানুজের নিকট গমন করিয়া গীতার চরম শ্লোকের রহস্য জানিবার জন্য আবেদন করিলেন। গীতার চরম শ্লোকটীই এই—

সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই শ্লোকের অর্থ অতি সহজ, কিন্তু দাশরথির মত মহাপণ্ডিত লোক ইহার অর্থ জ্ঞাত নহেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য আমিও ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, তবে এইটুকু জ্ঞাত আছি, বিনা সৎগুরুর কৃপায় আমরা যে গীতা পাঠ করি, তাহা অধুনা স্কুলের ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিবার অনুরূপ। কেহ কিছু বোঝে না, তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য গলাধঃকরণ করা মাত্র।

দাশরথির আবেদন শ্রবণ করিয়া রামানুজ বলিলেন—"তুমি আমার আত্মীয়, সুতরাং তোমার দোষগুলি আমার দৃষ্টিতে পড়িবে না। ঐ শ্লোকের অর্থ জানিতে হইলে সম্পূর্ণ নিরভিমান হওয়া প্রয়োজন এবং এক বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা বিধেয়, সুতরাং তুমি মহাত্মা গোষ্টিপূর্ণের নিকট গমন করিয়া শ্লোকার্থ জ্ঞাত হও"। কিন্তু তাঁহার নিকট ছয় মাস কাল গতায়াত করিয়াও শ্লোকার্থ জ্ঞাত হইতে পারিলেন না। তৎপর একদিন গোষ্টিপূর্ণ বলিলেন, দাশরথে, তোমার এখনও কুলের অভিমান এবং বিদ্যার অভিমান

রহিয়াছে, সুতরাং আমার নিকট শ্লোকার্থ পাইবে না—তুমি রামানুজের নিকট গমন কর। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি রামানুজের নিকট গমন করিয়া সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। সেই সময়ে রামানুজের গুরুকন্যা অণ্ডুলা তাঁহার নিকট আগমন করিয়া নিবেদন করিলেন যে, তাহাকে স্বামিগৃহে বন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং দূরবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল আনয়নও করিতে হয়। এই সমস্ত কার্য্যে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় শ্বশ্রূকর্ত্তৃক অত্যন্ত ভৎর্সিত হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য রামানুজকে অনুরোধ করিলেন। তিনি সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অণ্ডুলাকে বলিলেন, "আমার এখানে অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, একজন যাইয়া তোমার রন্ধনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি দাশরথির প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র গুরুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দাশরথি এই রন্ধন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং ছয় মাস কাল এই দাসত্ব করিয়া মন হইতে একেবারে অভিমান দূর করিয়া দিলেন। পরে ঘটনাসূত্রে সমস্ত প্রকাশ হওয়ায় রামানুজের শিষ্যগণ তাঁহাকে গুরুর নিকট আনয়ন করিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলেন। তখন রামানুজ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্লোকার্থ দান করিলেন। আমি অতি সংক্ষেপে ঘটনাটী বর্ণন করিলাম, যদি কেহ এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে বাসনা করেন; তিনি যেন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দ-স্বামিকৃত রামানুজ-চরিত পাঠ করেন।

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দর্শন করিয়া তথা হইতে জম্বুকেশ্বর রওনা হইলাম। ইহা শিবের মন্দির এবং শ্রীরঙ্গনাথ হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল দূরে। এই মন্দিরটীও অতি সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত, কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের ন্যায় বিশাল নহে এবং ততগুলি প্রকারবিশিষ্টও নহে। মন্দিরের ফটক পার হইবা মাত্র একটী বালক আসিয়া আমার পাণ্ডা হইবার বাসনা প্রকাশ করিল, সে বেশ ইংরাজী বলিতে পারে দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলাম। ফটক পার হইয়াই দেখিলাম, একস্থানে যজ্ঞ হইতেছে। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, পূজার নানাবিধ উপকরণ সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে। আমিও সেই স্থানে একটু উপবেশন করিলাম। মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় বলিলেও তামিল ভাষার উচ্চারণের সহিত মিশ্রিত বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর চারিদিক বেড়াইয়া বহুবিধ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। জম্বুকেশ্বর লিঙ্গ যে স্থানে স্থাপিত, সেই স্থানে একটী জম্বুক বৃক্ষ আছে, উহা পাথর ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছে। ইহা শিবের মন্দির, সুতরাং মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ বৈষ্ণবগণ প্রাণ গেলেও এই মন্দিরে প্রবেশ করেন না। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, বৈষ্ণবগণ কপালে শ্রীচিহ্ন ধারণ করেন, সুতরাং লিঙ্গ দর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে এক-জন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, শ্রীচিহ্নধারী বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ প্রাকৃতিক কার্য্য সমূহ সম্পাদন কালে কি প্রকার প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা জানিতে বাসনা হয়। শৈব বৈষ্ণবে দ্বেষাদ্বেষী বঙ্গদেশেও আছে, তবে মান্দ্রাজ প্রদেশের ন্যায় এতটা বাড়াবাড়ি নাই। আমি শুনিয়াছি, ঝড় বৃষ্টিতে রাস্তায় মৃত্যুর সম্ভাবনা হইলেও নিকটস্থ কোন শিব-মন্দিরে বৈষ্ণব প্রবেশ করিবেন না, আর শৈবের পক্ষেও ঐ প্রকার ব্যবস্থা।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমার পাণ্ডা মহাশয়কে একটী সিকি দিলাম, তিনি তাহাই পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমার গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি-লেন।

আমার বন্ধুটীর বাসস্থানের নাম টেপা-কুলম্। মন্দির হইতে পুনরায় কাবেরী নদী পার হইয়া তথায় আগমন করিলাম। বন্ধুটী স্কুলে গিয়াছিলেন, সুতরাং স্কুলটী দেখিবার অভিলাষে তথায় গেলাম। স্কুলটীর নাম Tepa-culum Hindu Secondary School, একটী তামিল ভদ্রলোক উহার মালিক। প্রায় ৪৫০ জন ছাত্র পাঠ করিতেছে। যে সময়ে স্কুলে পৌঁছিলাম, সেই সময়ে তাহাদের টিফিনের ছুটি হইয়াছিল। সমস্ত বালক নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত খাবার খাইতেছিল। এ সমস্ত খাবার তাহারা স্কুলে আসিবার সময় নিজেরাই লইয়া আসিয়া থাকে। সমস্ত বালকের মস্তকে লম্বা লম্বা চুল, পরিধানে কাছাবিহীন ধুতি এবং কপালে নিজ নিজ ইচ্ছানুমোদিত লম্বা লম্বা তিলক। কাহার তিলক ত্রিশূলাকৃতি, আবার কাহার তিনটী রেখা মাত্র। বঙ্গদেশের ছেলেরা ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে যেমন নিজ নিজ কৌলিক ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়ে, এদেশে দেখিলাম, তাহা হয় না। অধিকাংশ ছাত্রেরই জুতা পায় নাই, শিক্ষকদিগেরও জুতা, নাই এবং তাহাদেরও কপালে লম্বা লম্বা ফোটা ও পরিধানে কাছাবিহীন ছোট ছোট ধুতি। স্কুলের কর্ত্তা ব্যক্তিও টিফিন সময়ে দেখিলাম, একটী নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসিয়া কিছু আহার করিতেছেন। আমাকে বিশেষ আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন। আমি কিছুক্ষণ আরামের পর সকলের নিকট বিদায় লইয়া আবাস অভিমুখে রওনা হইলাম।

এই টেপাকুলমের মধ্যস্থলে একটী ছোট পাহাড় আছে। প্রবাদ এই যে, বিভীষণ অযোধ্যা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার রথের চাকা এই স্থানে আটকাইয়া যায়।

Trichinopolyর নাম শ্রীশিরঃপল্লী, কিন্তু সাহেবদের অনুগ্রহে উহার প্রকৃত নাম গুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন Trichinopoly না বলিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। আমাদের দেশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বড় লোকদেরও নাম ঐ প্রকার বদলাইয়া গিয়াছে, ইংরাজী নামে না ডাকিলে তাহাদিগকে বুঝিতে পারা যায় না। সহরে সুন্দর পানীয় জলের কল আছে, কিন্তু পাইখানার ব্যবস্থা বড় সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইল না।

আমার বন্ধুটীর সুন্দর সুন্দর কন্যা কয়েক-টীর নিকট বিদায় লইয়া রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীরঙ্গম হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ৪টার সময় Trichinopoly বড় ষ্টেসনে উপ-স্থিত হইলাম। শুনিলাম, রামেশ্বর যাইবার গাড়ী রাত্রি ৯টার সময় পাওয়া যাইবে, সুতরাং waiting roomয়ে আশ্রয় লইলাম। আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ ছিল, সুতরাং নির্ভয়ে second class waiting room এ প্রবেশ করিলাম। নির্ভয়ে বসিলাম বটে, কিন্তু উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও দুইজন ইংরেজকে দেখিয়া ততটা নির্ভয় হইলাম না। কি জানি কখন কি ঘটে, মনে মনে ভাবিয়া গৃহের এক পার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। সাহেব দুইজন নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত, সুতরাং আমার দিকে লক্ষ্যও করিল না দেখিয়া একটু সাহস

হইল। তখন একটু ভাল করিয়া বসিলাম। তাঁহাদের কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম, তাঁহারা রেল-কর্ম্মচারী নহেন; গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী, সুতরাং রেলওয়ে সাহেবদিগের নিকট যেপ্রকার অভদ্রোচিত ব্যবহার ও হটকারিতা আশা করা যায়, উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীদিগের নিকট তাহা প্রায়ই ঘটে না। বসিয়া বসিয়া অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল। নিজের দেশ, চারিদিকে স্বদেশের সহস্র সহস্র লোক বিদ্যমান, অথচ বহু দূরদেশ হইতে আগত মুষ্টি-মেয় লোকের ভয়ে আমরা কি জড়ের ন্যায় বাস করিতেছি! এখন যদি ইংরেজের সহিত কোন কারণে আমার কলহ উপস্থিত হয়, আর এই ইংরেজ যদি আমাকে খুন করিয়াও ফেলে, তবু কেহই আমাকে সাহায্য করিতেও উদ্যত হইবে না!

সন্ধ্যার সময় কিছু আহারের অন্বেষণে বাহির হইলাম, Indian refreshment room আছে জানিয়া তথায় গেলাম, কিন্তু সেখানে কেহই আমার কথা বুঝিল না এবং আমিও তাহাদের কথা বুঝিলাম না, শেষে একজন ইংরেজীশিক্ষিত লোকের সাহায্যে হোটেলে আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইলাম।

হায় রে দুঃখ, আমিও ভারতবাসী, আর এই সমস্ত লোকও ভারতবাসী, কিন্তু কেহই কাহার কথা বুঝিনা। উভয়ের কথা বুঝিবার সাহায্য জন্য ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লইতে হইল। উত্তর-ভারতে প্রায় সর্ব্বস্থানেই কিছু হিন্দি ভাষা জানিলেই কোন প্রকারে চলিতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে তাহা প্রায়ই চলে না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দিভাষা প্রচলন পক্ষে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে কৃত-কার্য্য হইলে দেশের পক্ষে বড়ই মঙ্গলজনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা ঘটিবে কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশে Matriculation পরীক্ষায় একটু সংস্কৃত পড়িতে হয়, সুতরাং এই প্রদেশের বালকগণ হিন্দি অক্ষর পড়িতে পারে এবং একটু চেষ্টা করিলেই হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশের পক্ষে ইহা একটু কষ্টজনক ও সময়-সাপেক্ষ।

রাত্রি ৮টার সময় হোটেলে আহারের জন্য গমন করিলাম। শুনিলাম, মোট তিন আনা দিতে হইবে। কেহ কাহার কথা বুঝে না। আমি কলের ছবির মত এক স্থানে বসিলাম, একটী লোক আসিয়া আমার সম্মুখে কিছু অন্ন এবং একটু তরকারী দিয়া গেলেন। তরকারী মুখে দিয়া হা হতাশ করিয়া পড়িলাম; তাহাতে এত অধিক পরিমাণে লঙ্কা মরিচ পড়িয়াছে যে, মুখে দেওয়া অসম্ভব। তদন্তর খানিকটা ঘৃত পাইলাম, সুতরাং তাহার দ্বারা আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ডাইলের তামিল কথাটা শিখিয়াছিলাম, সুতরাং পরপু পরপু বার বার বলাতে একটী লোক আসিয়া কি বলিল, বুঝিলাম না। অনুমানে স্থির করিলাম, ডাইল নাই। পরে জানিলাম, রাত্রে ডাইল দেওয়ার প্রথা নাই। অতএব শুধু ঘৃতের সাহায্যে ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলাম, পরে কিন্তু একটু ঘোলও দিয়াছিল। যাহা হউক, আহার সমাপন করিয়া নগদ তিন আনা পয়সা দিয়া waiting roomএ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম এবং যথা সময়ে ট্রেণ আসিলে গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ীতে বেশ ভিড় ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যে একজন Boy থাকে, তাহার নিকট গমন করিবামাত্র, সে একটী কামরার উপরের

বেঞ্চ দেখাইয়া বলিল, আর স্থান নাই। সুতরাং একটু কষ্ট করিয়া উপরের Benchএ উঠিয়া শয়ন করিলাম এবং নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইলাম।

প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া সমুদ্রমধ্যস্থিত জলের উপরে কি মনোহর শোভাই ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া বলিলাম, হে সবিতৃদেব! তুমি কত কোটী কোটী যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই প্রকারে উদয়াস্ত দ্বারা কোটী কোটী জীবের ও স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তি ও বিনাশ সাধন করিতেছ, তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার। পূর্ব্বকালের ঋষি যোগীগণ তোমাকে কত প্রকারে স্তব স্তুতি করিয়া গিয়াছেন—তোমাকেই জগতের প্রাণ বলিয়া উপাসনা করিয়া গিয়াছেন এবং তোমাকেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা ভাবিয়া তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। তুমি দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাক বলিয়া তোমাকে দেবমধু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু।

তুমি সর্ব্বযজ্ঞের ফলস্বরূপ। তোমারই প্রীতির জন্য দেবগণ সর্ব্ববিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। আমরা অজ্ঞান মনুষ্য, তোমার মধু বিদ্যা সম্যকরূপে জ্ঞাত নহি, সুতরাং তোমার উদয় ও অস্ত দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের পরমায়ু হরণ করিতেছ, কিন্তু শুনিয়াছি, এমন ব্রহ্মবিৎ আছেন, যাহার নিকট তোমার উদয়ও নাই, অস্তও নাই, সদা সর্ব্বদাই একই ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাক, কারণ তিনি নিজেই জ্যোতির্ম্ময়। হে সবিতৃদেব! তুমি আমাদের চক্ষুস্বরূপ, কিন্তু আমরা চক্ষু দ্বারা যে সমস্ত শুচি অশুদ্ধি পদার্থ দর্শন করিয়া থাকি, তুমি সে সমস্ত বস্তুতে লিপ্ত থাক না; তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার। সমুদ্রের সঙ্গে তোমার বড়ই সদ্ভাব, কারণ তিনি অকাতরে তোমাকে জলদান করিতেছেন, আর তুমি সহস্র জিহ্বা দ্বারা তাহা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া বৃষ্টিরূপে আমাদিগকে দান করিয়া আমাদের জীবন ধারণ করিতেছ। হে সবিতৃদেব, তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার। তোমার মধ্যস্থিত যে মহান পুরুষের শক্তিতে তুমি জগৎপূজ্য হইয়াছ, সেই মহান পুরুষকে দেখিবার শক্তি আমাকে দাও।

লোহিতবর্ণ সূর্য্য দেখিতে দেখিতে শুক্লবর্ণ ধারণ করিলেন, আর তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার শক্তি নাই। এমন সময় দেখিলাম, গাড়ী সমুদ্রোপরিস্থ বৃহৎ পুলের উপর উঠিয়াছে। এই পুল অতিক্রম করিলেই রামেশ্বরের দ্বীপে উপস্থিত হইব। এই পুলের বিবরণ লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, আজ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। দুই দিকে বিশাল সমুদ্র, উহার মধ্যস্থান দিয়া রেল গাড়ী অতি দর্পের সহিত ঘনঘটা-শব্দ করিয়া দৌড়াইতেছে—চক্ষু মোটে দুইটী, কোন্‌দিকে দেখিব, এদিক দেখিলে ওদিক দেখা যায় না, আবার ওদিক দেখিলে এদিক দেখা যায় না, ইচ্ছা হইতে লাগিল, গাড়ীখানা যদি এই স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া এই অভিনব দৃশ্যটী দর্শন করিয়া লইতাম। পুলের নিম্নে জলের মধ্যে অসংখ্য প্রস্তর, তাহার উপর দিয়া জল কল-কল ধ্বনি করিয়া যাইতেছে এবং ছোট ছোট মৎস্যগুলি মনের আনন্দে উজাইয়া যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ী সমুদ্রের অপর উপস্থিত হইল এবং পাম্বাম নামক

ষ্টেসনে দাঁড়াইল। এইস্থানে অসংখ্য নারিকেলের বাগান। মাদ্রাজের সর্ব্বানন্দ স্বামী এই স্থানের একজন ভদ্রলোকের নিকট আমার আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন। যথা সময়ে তিনি গাড়ীর নিকট আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমাকে চিনিয়া লইতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই, কারণ ঐ গাড়ীতে একমাত্র আমিই বাঙ্গালী ছিলাম। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া আমার সঙ্গে উহার পরবর্ত্তী ষ্টেসন রামেশ্বর পর্য্যন্ত গেলেন। ইতিপূর্ব্বে ত্রিচোনাপলি হইতে রামেশ্বরের একজন পাণ্ডা আমার পিছনে লাগিয়াছিল, তাহার দ্বারা আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি রামেশের না নামিয়া সেই গাড়ীতেই বরাবর ধনুষ্কোটিতে গমন করিলাম। উক্ত ভদ্রলোকটী আমার ব্যাগ ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং পাণ্ডার লোক আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। রামেশের হইতে ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত কেবল সমুদ্রের বালির চড়া। কলম্বোগামী জাহাজ এই ধনুষ্কোটি হইতেই রওনা হয়।

গাড়ী যতদূর যাইতে পারে, ততদূর যাইয়া থামিল এবং আমরাও নামিয়া পদব্রজে সমুদ্রের কুলে গেলাম। তথায় দেখিলাম, অসংখ্য লোক স্নান করিতেছে, পূজা করিতেছে এবং মন্ত্র পাঠ করিতেছে। পূজার সময় বালির উপর লক্ষ্মণের ধনুর চিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে। পূজার উপকরণ অতি সামান্য, একটী নারিকেল, একটু কর্পূর এবং ২।৪টা ফুল ও একটু ধুনা। সমস্ত দ্রব্য সেই স্থানেই খরিদ করিতে পাওয়া যায়। পুরোহিত মহাশয়গণ সকলেই একটু একটু হিন্দি বলিতে পারেন। আমি একটু মুস্কিলে পড়িলাম, পূজা করিব কি না করিব? ভাবিতে ভাবিতে আমার একটী বন্ধুর স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তিনি পুরীর জগন্নাথ দেখিয়া আমার বাসায় আসিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কত টাকার আটিকা বন্ধন করি?" আমি তাঁহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম—"আটিকা বন্ধন সম্পূর্ণ ফাঁকি—পাণ্ডাদের উহা একটী উপরি আয়! তবে বেশী টাকার আটিকা বন্ধন করিলে মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিতে হয় এবং সেই টাকা দ্বারা ঠাকুরের ভোগও হয়।" তিনি আমার কথা বেশ বুঝিয়া বলিলেন "আমি বেশ বুঝিলাম, আটিকা বন্ধন বৃথা, কিন্তু গ্রামে গেলে পাড়ার লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কত টাকায় আটিকা বাঁধিয়াছে, তখন কি উত্তর দিব? তাহারা তো এত ব্যাপার জানে না, আটিকা বন্ধন করিনাই শুনিয়া তাহারা যখন মুচকি হাসিয়া বিদ্রূপ করিবে, তখন আমার উপায় কি?" আমি তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আটিকা বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। এই ব্যাপার স্মরণ করিয়া আমিও সমুদ্রে স্নান করিয়া পূজার উপকরণাদি গ্রহণ করিয়া পূজা করিতে বসিলাম। মন্ত্র পাঠে বুঝিলাম, আর আমাকে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। কে জানে কি হইবে। পুনর্জন্ম আছে কিনা, কে বলিতে পারে? কেহ বলেন "আছে, কেহ বলেন নাই," এপ্রকার অবস্থায় একটা নিশ্চিত ধারণা রাখা গর্ব্বের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কঠোপনিষদে নচিকেতা যম রাজাকেও এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"পরলোক আছে কি নাই।" তদুত্তরে তিনি তাহাকে বলেন, চিন্তাহীন এবং ধনমোহে আচ্ছন্ন অজ্ঞানীর নিকট পরলোক প্রকাশিত হয় না। তাহারা কেবল এই লোকই আছে, কিন্তু পরলোক নাই, এইরূপ মনে করিয়া থাকে সুতরাং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়। তথা আপন আপন কৃত কর্ম্ম ও আপন আপন উপার্জ্জিত বিজ্ঞান অনুসারে কোন কোন আত্মা শরীর গ্রহণার্থ যোনিতে প্রবেশ করে, আবার অন্য কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমাদের মাথা ঘামান যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। তবে আমি এই সার কথাটুকু স্মরণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ যাহা থাকিলেও থাকিতে পারে, না থাকিলেও না থাকিতে পারে, এমত স্থানে থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহাই স্থির রাখা সঙ্গত।

পূজা সমাধা করিয়া পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া চারি দিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম, সমস্ত লোক কেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পুরোহিতের নিকট উপবেশন করিয়া পূজা করিতেছে এবং নানাবিধ দ্রব্য দান করিতেছে। আমার ন্যায় সন্দেহযুক্ত হইয়া ইহারা ক্রিয়া করিতেছে না, অর্থাৎ থাকিলেও থাকিতে পারে, এমত বিশ্বাস লইয়া পূজা করিতেছে না। ইহাদের দৃঢ় ধারণা, এই সমস্ত ক্রিয়া করিলে আর ইহজগতে পাপের বোঝা বহন করিতে আসিতে হইবে না। এক জন পণ্ডিত লোক বলিয়াছিলেন, তীর্থে স্নান ও ক্রিয়াকলাপ অন্ধ বিশ্বাসের সহিত না করিলে কোন উপকার হয় না, কারণ ইহার ফলাফল সমস্তই অদৃষ্ট, অর্থাৎ কেহই চক্ষে দর্শন করে নাই, এরূপ স্থলে ধর্ম্মগ্রন্থাদি-প্রতিপাদিত কোনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত ধারণ করিয়া রাখাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

সমুদ্র-তীর হইতে ষ্টেসনে আসিবার মধ্যস্থানে বালির চড়ার উপর মহাবীরের মন্দিরে

উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইবামাত্র এক ব্যক্তি সকলকে সমাদর করিয়া বসাইয়া মহাবীরের চরণামৃত এবং মোহন ভোগ ও বুট ভিজান প্রসাদ দিতে লাগিলেন। যাত্রীদিগের মধ্য হইতে প্রসাদ লইবার সময় কেহ এক পয়সা, দুই পয়সা প্রণামীও দিতে লাগিলেন। মাড়ওয়ারীদের মধ্যে কেহ কেহ বেশীও দিলেন। আমরা এই প্রসাদ পাইয়া তথায় অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, কারণ রামেশ্বর যাইবার গাড়ী ছাড়িবার অনেক বিলম্ব ছিল। মন্দিরটী নারিকেল পত্রের দ্বারা ছাউনি-বিশিষ্ট কিন্তু অনেক বড়, মধ্যস্থলে মহাবীরের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে এবং তাহার পার্শ্বেই দুইজন সন্ন্যাসীর বসিবার স্থান। ইহারাই মঠের অধিকারী। মধ্যে মধ্যে বেশ গঞ্জিকা সেবন চলিতেছে। একজন সন্ন্যাসী বার বার আসিয়া উপস্থিত সকলকে বুট ভিজান প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমাদের প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি তাহা শুনিবেন না; সুতরাং উহা লইয়া পশ্চাৎ নিক্ষেপ করিতে হইল। এই মঠ থাকাতে যাত্রীদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে, কারণ স্নান ইত্যাদির পর পরিশ্রান্ত হইয়া তাহারা এই স্থানে বেশ একটু বসিবার স্থান পায় এবং নির্ম্মল পানীয় জল পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদ্বয় কাহার নিকট কিছু চাহিতেছেন না, কিন্তু যাত্রীগণ সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু কিছু দান করিতেছেন।

এই মন্দিরের মধ্যে হঠাৎ একটী বাঙ্গালী যুবক দেখিলাম। আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া নিকটে আসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার জন্মস্থান বসীরহাটে। যৌবনকালেই সংসার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন

করিয়া ভেক গ্রহণ করিয়াছেন। বৃন্দাবনে [illegible] বাস করিতেন, সম্প্রতি গুরুর আদেশে [illegible] ব্রজে চারি ধাম ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে পুরী এবং পুরী হইতে পদব্রজেই এখানে আসিয়াছেন, এক্ষণে এই খান হইতে দ্বারকায় যাইবেন। গুরুবাক্যে কি বিশ্বাস এবং কি প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করিবার সঙ্কল্প!

যথা সময়ে মন্দির হইতে বাহির হইয়া ষ্টেসনে যাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় রামেশ্বরে পৌঁছিলাম। ধনুষ্কোটী হইতে রামেশ্বর প্রায় ২২ মাইল রাস্তা—ইহার মধ্যে কোন গ্রাম কি কোন প্রকার বড় বড় বৃক্ষ নাই, কেবলই বালিকারাশী দ্বারা পূর্ণ। গাড়ীর মধ্যে একটী বালক তামিল ভাষায় সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার গানের অর্থ বুঝিলাম না বটে, কিন্তু গলার স্বরটী অতি মিষ্ট লাগিল। অনেকেই তাহাকে ২।১ পয়সা ভিক্ষা দিলেন। সে আমাদের গাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গান আরম্ভ করিল। এই প্রকারে ধনুষ্কোটী হইতে রামেশ্বরে পর্য্যন্ত তাহার বেশ রোজগার হইল।

এই গাড়ীর মধ্যে বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে-ভূষিতা একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া সূর্পনখার স্মৃতি জাগরিত হইল। এ প্রকার স্ত্রীলোক আমি জীবনে দেখি নাই, যেমনি তাহার কাল রং, তেমনি তাহার শরীরের নানাবিধ অঙ্গ-সৌষ্ঠব। মস্তকের চুলগুলি ঝকড়া ২, চক্ষুটী ক্ষুদ্র, হস্তপদগুলি বেশ মোটা মোটা এবং সুগোল। সঙ্গে দাস দাসীও রহিয়াছে, সুতরাং বড় ঘরের কন্যা বা স্ত্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ষ্টেসন হইতে পাণ্ডার বাড়ী পৌঁছিলাম। তিনি অতি সমাদর করিয়া আহারের যোগাড় করিয়া দিলেন। তাঁহার মাতা স্বয়ং পরিবেশন করিয়া আমাকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। আহারাদির পর পাণ্ডা মহাশয় তাঁহার নিকট আমাকে বসাইয়া একখানি বাঙ্গালায় ছাপান ফর্দ্দ দিলেন। রামেশ্বর যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়, তৎসমস্ত সেই ফর্দ্দে উল্লেখ আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকার মধ্যে আপনি এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন? আমি বলিলাম, ঐ সমস্ত ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। সমস্ত দর্শন করিয়া এবং যেখানে যাহা দেওয়া প্রয়োজন, তাহা নিজেই দিব। আপনাকে প্রণামী কিছু দিব। তিনি আর বেশী কিছু বলিলেন না এবং আমাকে আর কোন যত্নও করিলেন না।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাণ্ডার দ্বিতল গৃহে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম, সুতরাং সেই স্থানে যাইয়া একটু শয়ন করিলাম। অপরাহ্নে উঠিয়া দেবমন্দির ও অন্যান্য স্থান দর্শন করিবার জন্য একাকী বাহির হইলাম; পাণ্ডার কোন লোককে সঙ্গে লইবার প্রয়োজন করিলাম না। মন্দিরের বড় ফটক পার হইয়াই দেখিলাম, তথায় বৃহৎ একটী বাজার বসিয়াছে! তথায় নানাবিধ খেলনা ছবি ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। জাপান ও চিনদেশে বাঁশের দ্বারা যেমন সুন্দর সুন্দর ব্যাগ, ফুলের সাজি ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এখানেও সেই প্রকারের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। দ্রব্য-গুলিতে বেশ নির্ম্মাণ-কৌশলতা আছে, কিন্তু মূল্য অতি কম। বাজারের দুই দিক হইতে বহু রাস্তা গিয়াছে। আমি কোন্ দিকে যাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, ভয় হইল পাছে এই মন্দিরের মধ্যে হারাইয়া

যাই। দর্শনীয় কোথায় কি আছে, তাহাই বা নিজে নিজে কি প্রকারে জানিব? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানিবার উপায় নাই, সুতরাং পুনরায় বাসায় গিয়া পাণ্ডার লোকটীকে সঙ্গে করিয়া আনিলাম। তিনি আমাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া সমস্ত দেখাইলেন। বিশাল মন্দির, কোথায় কি আছে, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইলে অল্প সময়ের কার্য্য নহে। মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিবার হুকুম নাই, কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। পরে শুনিলাম, বিশেষভাবে প্রণামী দিলে নাকি ভিতরেও যাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতর অন্ধকার, তথায় নানাপ্রকারের দীপ জ্বলিতেছে। বাহিরের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ঠাকুর দর্শন করিলাম। ভোগাদি যাহা কিছু দিলাম, তাহা নিকটস্থ একটী জলপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইল। শুনিলাম, অবশেষে সমস্ত একত্র করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইবে। যে স্থানে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করিতে হয়, সেই স্থলটী কাষ্ঠ দ্বারা ঘেরা রহিয়াছে।

মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে বিশাল প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃষ-মূর্ত্তি উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। প্রস্তরে কোন প্রকার জোড়া আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

মহাদেবের মন্দির হইতে ভগবতীর মন্দিরে যাইয়া তথায়ও ভোগের জন্য কিছু দিলাম। তারপর অন্যান্য দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলাম। তথায় বহু সংখ্যক প্রস্তর জলের মধ্যে ও উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বোধ হয় এই সমস্ত

[illegible]রগুলিই মহাবীর হনুমান কর্ত্তৃক বহু দূর আনীত হইয়াছিল।

রামেশ্বর একটী বড় সহর নহে। সুতরাং সমস্ত গ্রামটী দেখিতে বেশী সময় লাগিল না। বাসায় প্রত্যাগমন কালে একটী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার সে দিন আহারের যোগাড় হয় নাই, সুতরাং সেদিনকার উক্ত ব্যাপার ভগবান আমার দ্বারাই সম্পাদন করাইলেন।

বাসায় আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলাম, তৎপর রাত্রি প্রায় ৮৷৷০টার সময় যে পাণ্ডা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, তাহাকে ডাকিয়া আমার আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রে কোন আহার পাইব না। অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, এক্ষণে উপায় কি? তাড়াতাড়ি হোটেলে গেলাম, শুনিলাম, সমস্ত শেষ হইয়াছে, আর কিছু পাইবার উপায় নাই। পাণ্ডার লোকটীকে বলিলাম, "বাপু? আমাকে কিছু লুচি কিম্বা পুরী খরিদ করিয়া আনিয়া দাও, নচেৎ ক্ষুধায় মারা পড়িব।" তিনি পয়সা লইয়া বাজারে গেলেন এবং অর্দ্ধঘণ্টা পর কতকগুলি চামড়ার মত শক্ত পুরী আনিয়া দিলেন। একে আমার দন্ত নাই, এবং যে ২।১ টী অবশিষ্ট আছে, তাহাতেও অত্যন্ত বেদনা, সুতরাং পুরী-গুলি রাখিয়া দিলাম এবং পরদিন একটী দরিদ্রকে দান করিলাম। সে রাত্রে ভগবান ব্রহ্মচারির অন্ন আমার দ্বারা সংগ্রহ করাইলেন, কিন্তু আমাকে আর কিছু দিলেন না। যাহা হউক, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিলাম, এবং নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতে উঠিয়া কাফিখানায় গেলাম। এদেশে কাফি খাওয়ার বেশ ধুম ধাম আছে, রামেশ্বরে অনেকগুলি কাফির লোকান। সেখানে যাইয়া

সঙ্কেত দ্বারা কাফি চাহিলাম। ঘরটী অন্ধকার, কতকগুলি তক্তা পাতা আছে, তাহারই উপর উপবেশন করিবার অনুমতি পাইলাম। তৎপর একটী পিতলের গ্লাসে কাফি পাইলাম। পেয়ালার প্রথা দেখিলাম না। গ্লাসে মুখ লাগাইয়া পান করিবার যোগাড় করিতেছি, এমত সময়ে, কাফিখানার কর্ত্তা মহাশয় সঙ্কেত দ্বারা জানাইলেন যে, মুখ লাগাইতে পারিবে না। গেলাস উচু করিয়া গলার মধ্যে ঢালিয়া দিতে হইবে। দেখিলাম, তথায় সেই প্রকারে সকলেই পান করিতেছে। আমার কিন্তু উক্ত প্রকারে কাফি পান করিবার অভ্যাস ছিল না, সুতরাং গরম গরম কাফি মুখে ঢালিতে যাইয়া প্রায় সমস্তটাই গায়ে পড়িয়া গেল। কাপড় ত ভিজিয়াই গেল, অধিকন্তু জিহ্বায় এবং গালেও বেশ একটু উষ্ণতা অনুভব করিলাম। এই প্রকারে নাজেহাল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও একা একা তীর্থভ্রমণে বাহির হইব না।

রামেশ্বরে থাকা আর সুবিধাজনক মনে হইল না, সুতরাং এস্থান হইতে পলাইবার যোগাড় করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় যে ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাকে অনুসন্ধান করিয়াও পাইলাম না। পূর্ব্বরাত্রে মনে করিলাম, নিজেই খিচুরি পাক করিব।

স্নানের ব্যবস্থা কি হইবে, জিজ্ঞাসা করায় একটী লোক একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া দিল। তাহার জলে স্নান ত দূরের কথা, উহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিলাম। পূর্ব্বদিন ধারওয়ার প্রদেশের একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তিনি সপরিবারে তীর্থভ্রমণ করিতেছেন। Deputy-Collector ছিলেন, সম্প্রতি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম K. G. Kalghatgi. তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার বলিলে তিনি আমাকে কোটীতীর্থে স্নান করিতে বলিলেন। নামটী শুনিয়া একটু কৌতূহল হইল। পাণ্ডার লোকটীকে সঙ্গে করিয়া কোটীতীর্থে স্নান করিতে গেলাম।

তথায় দেখিলাম, বহু স্ত্রীলোক স্নান করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোটীতীর্থ রামেশ্বরের মন্দির অভ্যন্তরস্থ একটী কূপ মাত্র। প্রাচীর দ্বারা ঘেরা, সেই প্রাচীর মধ্যে একস্থানে একটী নল স্থাপিত আছে। প্রতি বালতী জলের বাবদ ২টী পয়সা দিলে একটী লোক জল তুলিয়া উক্তনলের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। প্রাচীরের অন্য পার্শ্বে স্নানার্থী উপবেশন করিয়া থাকে এবং নলের মধ্য দিয়া জল আসিয়া তাহার মস্তকে পড়ে। দেখিলাম, অনেক লোক এই প্রকারে স্নান করিতেছে এবং একটু একটু জল তাহাদের প্রিয়জনের মস্তকে দেওয়ার জন্য সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। আমি দুই পয়সা দিয়া একবালতী জল মস্তকে ঢালিয়া দেখিলাম, আমার পাপরাশি এক বালতী জলে ধৌত হইবে না, সুতরাং আরও দুইচার বালতী দিতে প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আর এক বালতী মাত্র দিয়া স্থগিত করিল। উহারা বোধ হয় ভাবিল যে, আমি জলক্রীড়া আরম্ভ করিলাম। বহু স্নানার্থী বর্ত্তমান, সুতরাং আমার আবেদন মঞ্জুর হইল না।

কোটীতীর্থের স্নানে পুণ্য থাক বা নাই থাক, কিন্তু বড়ই আরাম পাইলাম। এখান হইতে বাসায় আসিয়া রান্না করিবার জোগাড় করিতে যাইয়া দেখিলাম, কালঘাটাগি মহাশয় তাঁহার ভগিনী দ্বারায় আমার জন্য অতি উত্তম খিচুড়ি পাক করাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম।

গাড়ীর সময় নিকটে হইয়াছে দেখিয়া পাণ্ডার নিকট বিদায় লইতে গেলাম। তিনি বহু যাত্রীকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া তাকিয়া ঠেস্‌দিয়া তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিতেছেন। কাল নাদুস নুদস চেহারাটী, কপালে চন্দন, গলদেশে যজ্ঞোপবীত, তাঁহার পার্শ্বে মহুরীগণ বসিয়া যাত্রীদিগের নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইতেছে। পাণ্ডা মহাশয় আমাকে স্নেহ সহকারে নিকটে বসাইয়া সুফল করিতে বলিলেন। আমি দুই টাকা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সুতরাং ভবিষ্যতে বেশ একটু আশা আছে বিবেচনা করিয়া ঐ সামান্য অর্থ লইয়াই সুফল দিলেন অর্থাৎ গোটাকতক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালে খানিকটা চন্দন ও তিলক লেপিয়া দিলেন এবং প্রায় একপোয়া মিছরি ও চন্দন হস্তে দিলেন।

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।

রামমোহন-স্মৃতি-মন্দির।*

আজ এই অপরাহ্নে—চৈত্র-সংক্রান্তির এই দারুণ গ্রীষ্মে আমরা এতগুলি লোক যে এখানে সমবেত হইয়াছি, ইহা যে একটা বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা আজ এখানে আমাদের একজন মহাপুরুষের, আমাদের একজন বড় আপনার লোকের (যাঁহার মহৎ উদার প্রাণ তাঁহার দেশবাসীর দুঃখে কাঁদিয়াছিল এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যিনি অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন) স্মৃতির তর্পণ করিবার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি।

রাজা রামমোহন রায় আমাদের কে ছিলেন? তিনি আমাদের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার স্মৃতি রক্ষাকল্পে আমরা এতটা করিব? তাহার বিস্তারিত পরিচয় দিবার স্থান ইহা নহে এবং আমার মত একজন হীন অযোগ্য ব্যক্তি ঐ পরিচয় প্রদানের অধিকারী নহে। সে কার্য্য আমার অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্যতর ব্যক্তির উপরে ন্যস্ত। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বেশ জোরের

---

* পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁহার একটী স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। অনারেবল স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। থানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের বার্ষিক উৎসবের সভাপতি রূপে নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয় প্রথম এই স্মৃতিমন্দিরের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বত্বাধিকারী মহোদয়ের নেতৃত্বে এই স্মৃতিরক্ষা-কমিটী সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে গত ৩০শে চৈত্র হিজলী কাঁথিতে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে, দে, আই সি-এস, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই অভিভাষণটী পাঠ করিয়াছিলেন। ন, স।

সহিতই বলা যায় যে, আজ আমরা যাহা হইতে পারিয়াছি—বাঙ্গালী বলিয়া, ভারতবাসী বলিয়া—আমরা যে আজ জগতের সভায় দাঁড়াইয়া নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে পারিতেছি, তাহার মূলে রামমোহনের সেই প্রাণপাত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। তিনিই এই বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া গিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা মহা মহীরুহে পরিণত।

বর্ত্তমান সময় যে বিশিষ্টরূপে রামমোহনের যুগ, একথা শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেই জানেন। আমার এ বিষয়ে বিস্তার করিয়া কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। তদধীন কালে ভারতের, তথা বাঙ্গালার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে রামমোহনের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবের যে বিশেষরূপে প্রয়োজন ছিল, তাহা যাঁহারা ধীরচিত্তে তখনকার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

আজ যে আমরা এতজনে সেই মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজার জন্য সমবেত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কিছু যায় আসে না, কারণ তিনি এখন আমাদের স্তুতি নিন্দার বাহিরে। কিন্তু আমরা যে তাঁহাকে চিনিবার, তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার ও তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কর্ম্মার্থ মঙ্গল সাধনা করিবার চেষ্টা করিতেছি, ইহা আমাদেরই পরম সৌভাগ্যের কথা। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের এইরূপ সুফল দেখিয়া রামমোহনের আত্মাও পরিতৃপ্ত হইতেছে।

১৪৭ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ঠাকুর অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাঠ এককালে বিদ্যাবুদ্ধি ও যশোপ্রভায় উজ্জ্বল খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিধানে অবস্থিত দারকেশ্বর তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাধানগর গ্রাম রামমোহনকে বুকে করিয়া ধন্য হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৮৩ বৎসর পর পর্য্যন্ত তাঁহার জন্মগ্রামে যথোপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা হয় নাই, ইহা আমাদের বড়ই লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। আমরা নিজেরা খুব বড় বলিয়া সর্ব্বদা নাম জাহির করিতে চাহিলে ত চলিবে না, আমরা যে আসল বড়কে চিনিতে পারিয়াছি, এবার বাহ্যিক অভিব্যক্তি তাঁহার স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণরূপে না প্রকাশ পাইলে, ও কথার সার্থকতা কোথায় থাকে? আমরা অতি ছোট, কিন্তু এই ছোটর মধ্যে যে বড় একজন কেহ বাস করেন, তাহার প্রমাণ তখনই পাওয়া যায়, যখন আমাদের মন যথার্থ একজন বড়কে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করে। এতদিন রামমোহনের সম্মান—তথা স্মৃতি-রক্ষায় উদাসীন থাকিয়া আমরা জাতীয় ঋণ লজ্জা ও কলঙ্কের বোঝা বাড়াইয়াছি মাত্র।

এ বিষয়ে ইংরাজ যে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়, তাহা তাহারা কার্য্যে প্রমাণ করিয়াছে। আপনারা জানেন যে, রাজা রামমোহন ব্রিষ্টল নগরের নিকট দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার গুণমুগ্ধ ইংরাজ ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে ও চেষ্টায় সেখানে একটী সুন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তথায় প্রতি বৎসর শত সহস্র রামমোহন-ভক্তবৃন্দ সেই পবিত্র পুণ্যতীর্থে তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি প্রেম পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে নিজেদের ধন্য করিয়া থাকেন। তবে এটা কি আমাদের বিশেষ ক্ষোভের কথা নহে যে, তাঁহার প্রিয় জননী জন্মভূমিতে সেই পবিত্রাদপি

পবিত্র তীর্থ স্থানে তাঁহার কোনও স্মৃতি চিহ্নের স্থাপনা এখনও হয় নাই?

যাহা হউক, এতদিন পরে, যে আমরা আমাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছি এবং তাহার নিরাকরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, তাহা বড়ই আশার কথা। গত ১৩২৩ সালে রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্মভিটায় তাঁহার স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনা হইয়া গিয়াছে। বিশেষ রূপে আমাদের সুযোগ্য উদ্যোগী ও অক্লান্ত কর্ম্মী একনিষ্ঠসম্পাদক মহাশয়ের প্রাণপাত চেষ্টায় এই কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে, স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। তৎসংলগ্ন একটী পানীয় জলের বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হইবে এবং একটী বেদান্ত চতুষ্পাটী ও অনাথ-আশ্রম, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন এবং সহৃদয় রাজ-কর্ম্মচারীগণের চেষ্টায় L-A কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলীর একটী নির্ভুল শোভন ও সুলভ সংস্করণ প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত আচার্য্য-প্রবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছে।

কার্য্য অবশ্য অতি বৃহৎ, তাহার তুলনায় আমাদের সামর্থ্য অতি ক্ষুদ্র। আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে যতটুকু সম্ভব হয়, ততটুকু কার্য্য আমরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি মাত্র। এখন এই মহৎ কার্য্য শেষ করিয়া তোলার ও তাহার সাফল্য বিধান করার ভার সম্পূর্ণরূপে আপনাদের হস্তে। এই বিরাট ব্যাপারে বহু অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য টাকাকড়ি অনেক সংগ্রহ হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু এখনও অনেক বাকী। ভারতবাসী যতই দীন দরিদ্র হউক না কেন, সৎ ও মহৎ কার্য্যে দানশীলতার কথা এদেশে চিরপ্রসিদ্ধ। আর এই মহৎ কার্য্য যে আবশ্যক মত অর্থাভাবে বিফল হইয়া যাইবে, এ সংশয় মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের মনে উদয় হয় না।

তাই আজ সুদূর কলিকাতা হইতে আমরা আপনাদের দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের বিশেষ আশা আছে যে, ভিক্ষার্থী অতিথিকে আপনারা প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বরং আবশ্যকের অতিরিক্ত ভিক্ষায় আপনারা তাহাদের ঝুলি পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের কথা আপনারা জানেন। তাই এই মহৎ কার্য্যে যাহার যতটুকু সাধ্য, তাহা যতই ক্ষুদ্র, যত অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন—সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়! এই সুযোগে আরও দুই একটা কথা না বলিয়া এই ক্ষুদ্র বক্তব্যের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তজ্জন্য আপনারা ক্ষমা করিবেন। এই উন্মুক্তউদার অকাশ তলে বিরাজিত, অদূরে নীল সিন্ধুজলধৌত বেলাভূমি-শোভিত, চতুর্দ্দিকে শ্যাম বনানী পরিবেষ্টিত এবং উপন্যাস-তথা কথা সাহিত্যের একচ্ছত্র ও অবিসংবাদী সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুর স্মৃতি-বিজড়িত আপনাদের এই সুন্দর দেশে আসিয়া আমরা যে কি তৃপ্তি—কি আনন্দ লাভ করিয়াছি—তাহা মুখে প্রকাশ করিয়া বলিবার নহে। বাস্তবিক পল্লী-জননীর এই স্নিগ্ধ শ্যাম অঞ্চলের ছায়ায় আসিয়া আমাদের প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে যেন এই দেশ প্রকৃতি রাণীর লীলাভূমি, এখানে যেন দুঃখ কষ্ট কিছু নাই। এবং এই দেশের সুবিশাল প্রান্তর ও ধান্য-ক্ষেত্র সমূহ দেখিয়াই বোধ হয় কবি গাহিয়াছেন—"অগ্রাণে তোর ভরাক্ষেতে কি

দেখেছি মধুর হাসি" অথবা "এখন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে"। বাস্তবিক "লক্ষ্মীজলা" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যেন এইখানেই মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজিত। মালক্ষ্মী যেন এখানে চারিদিকে সোনা ঢালিয়া রাখিয়াছেন। তাহার উপর আপনাদের সকলের বিশেষতঃ আমাদের সুযোগ্য রাজ-কর্ম্মচারী দে সাহেবের, কাঁথির grand old man উপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনায় অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শনে এবং উদার আথিতয়তার ভাব আপনাদিগকে একেবারে মুগ্ধ—অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং আমার কলিকাতার বন্ধুগণের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আমাদের অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা ও শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে শ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিক কামনা এই যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে, যে মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সাহায্য কল্পে আজ আপনাদের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি, তাহা সফল হউক।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।

উত্তরচরিত-সমালোচনা (২)

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পর্য্যন্তই চিত্রের বর্ণনীয় বিষয় ছিল। "কিয়ন্তমবধিং যাবৎ" প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ যেমনই "যাবদার্য্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ" এই কথা বলিলেন, অমনই রামের অভিমানে ঘা পড়িল। তখন সীতার প্রতি তাঁহার কি উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা প্রকাশ পাইল। স্বতঃপূত তীর্থোদক ও বহ্নির আবার বিশুদ্ধি কি? উৎপত্তি-পূতা সীতার আবার বিশুদ্ধি কি?

রাজর্ষি সীরধ্বজ লাঙ্গল হস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে অলোকসামান্য জ্যোতি প্রাপ্ত হন; তজ্জন্য ইহার নাম সীতা। রামচন্দ্রও কথায় কথায় "দেবযোনি সম্ভবে সীতে" বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। সীতা জনকেরই আত্মজা। কণ্বের শকুন্তলার মত কেবল পালিতা কন্যা নন। শকুন্তলা মেনকার গর্ভসম্ভূতা, বিশ্বামিত্রের ঔরস-জাতা। মেনকা রূপ দর্শনে বিহ্বল রাজর্ষির অঙ্গসম্ভূত তেজ যজ্ঞভূমিতে পতিত হইয়া এই প্রভাতরল জ্যোতির উদ্ভব করিয়াছিল। সখী অনসূয়ার কাছে সীতা নিজমুখে আপনার জন্ম পরিচয় এইরূপ জ্ঞান করিয়াছিল।

সখীরাকর্ষণং কর্ত্তুং গতঃ কালে পিতা মম।
পত্নীভিঃ সহ ধর্ম্মাভিঃ সদদর্শাদ্ভুতং মহৎ॥
অন্তরীক্ষে চ গস্তন্তীং দিব্যরূপাং মনোরমাং।
মেনকাং বৈহ্যস্পারসাং দ্যোতয়ন্তীং দিশস্ত্বিষা॥
তস্যঃ লাঙ্গলহস্তস্য কর্ষতে যজ্ঞমণ্ডলং।
অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং জগতঃ পতিং॥

এই যজ্ঞভূমি কর্ষণ ধর্ম্মমূলক বলিয়াই জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল ধারণ করেন। নচেৎ রাজা হইয়া স্বহস্তে লাঙ্গল চালনা করিবেন কেন?

মহাবীরচরিত নাটকে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থলে হরধনু ছিল। ঋষিবরের নিমন্ত্রণে রাজর্ষি জনক নিজে যাইতে না পারিয়া তাঁহার ভ্রাতা কুশধ্বজকে সীতা উর্ম্মিলা সহ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রেরণ করেন। রাম লক্ষ্মণও সেইস্থলেই হরধনুভঙ্গ করেন। আর সেই সময়ে রাবণের অনুচরও তথায় উপস্থিত ছিল। কবি উত্তরচরিতে রামায়ণানুসৃত পথ অবলম্বন করিয়া মহাবীরচরিতে কৃত দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। "এষ মিথিলাবৃত্তান্তঃ", তারপর রামের সৌম্যসুন্দর শ্রীর পানে জনকের বিস্ময়স্তিমিত দৃষ্টি পড়িল; শঙ্কর শরাসনও রাম কর্ত্তৃক অনাদরে খণ্ডিত হইয়া গেল।

মহাবীরচরিতে হরধনু ভঙ্গের পর মিথিলাপ্রস্থান। পথের মধ্যে তাড়কার বধ হয়। রাবণের কূটবুদ্ধি মন্ত্রী মাল্যবানের পরামর্শে তাড়কা রাক্ষসী রাম লক্ষণকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করে। উত্তরচরিতে কবি রামায়ণানুসৃত পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বামিত্র-আশ্রমে উপস্থিতির পূর্ব্বেই তাড়কাকে বধ করাইলেন।

মহাবীরচরিতে হরধনু ভঙ্গের পর সকলে মিথিলা যাত্রা করেন। তথায়ই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। আর বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও শতানন্দের সম্মুখে জনকের গৃহে বিবাহ সভায় পরশুরামের আগমন হইয়াছিল। উত্তরচরিতে কবি মহাবীরচরিতের অনুসৃত পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত রামায়ণের মত গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার পথে পরশুরামকে উপস্থিত করিয়াছেন। "এষ মিথিলা বৃত্তান্তঃ" প্রস্তাবের পরে "এতে রামযোধ্যাং প্রাপ্তা" বলার পূর্ব্বে "অয়ঞ্চ ভগবান ভার্গব" কথা নিবেদিত দেখিতে পাওয়া গেল। অতএব পূর্ব্বকৃত দোষের উদ্ধার হইল।

মহাবীরচরিতে মাল্যবানের চক্রান্তে সূর্পণখা মন্থরা সাজিয়া কৈকেয়ীর প্রেরিত বলিয়া একখানি জালপত্র রাজ্যাভিষেকোৎসব ক্ষেত্রে দশরথের নিকট উপস্থিত করেন। কৈকেয়ীর দোষক্ষালনের উদ্দেশ্যে এই নব উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা কবির মনঃপূত হইল না; তাই তিনি উত্তর-চরিতে কৈকেয়ীর ব্যাপার সত্য বলিয়াই দাঁড় করাইলেন। লক্ষ্মণ এষা মন্থরা বলিবামাত্র রামচন্দ্র কেমন মৌন তিরস্কারের সহিত মাতার কলঙ্কব্যাপারটী এড়াইয়া গেলেন, গুরুজন নিন্দার প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। লক্ষ্মণও বুঝিলেন "অয়ে মধ্যমাম্বা বৃত্তান্তোঽন্তরিত আর্য্যেণ"। বনবাসে যাওয়ার জন্য রাম যে মধ্যম মাতার উপর বীতশ্রদ্ধ হন নাই, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

রামচন্দ্রের চরিত্রই অদ্ভুত। লক্ষ্মণ ভার্গবের নামোল্লেখ করিবামাত্র "নমস্কার লহ ঋষিবর" বলিয়া বিজয়ী রাম আপনার বিজয়রূপ ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ যেমন ভার্গবের পরাজয় বর্ণনা আরম্ভ করিতে যাইবেন—অমনই রাম অসহিষ্ণু হইয়া "অনেক দেখাইবার আছে তাই দেখাও" বলিয়া লক্ষ্মণের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত আত্ম-প্রশংসা শ্রবণে অনিচ্ছা এবং আপনাকে অপরাধী করিয়া ছোট করা এক রামেরই সাজে। বিশ্রম্ভ স্থানে বিশ্রম্ভালাপে আপনার কাছে এই লজ্জিত হওয়া, এই কুণ্ঠিত হওয়াই বাস্তবিক অনন্যসাধারণ। প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা হইতে অব্যাহতি লাভ করাই প্রকৃত সাধনা। কৃত্রিম লজ্জা ও কুণ্ঠা প্রদর্শনও সুখ্যাতির

বিষয়। কিন্তু ভিতরের লজ্জা ও কুণ্ঠাই প্রকৃত সাধুতার চিহ্ন। এমন আত্মজয়ী পুরুষই আমাদের আদর্শ, আমাদের পূজ্য, আমাদের দেবতা। ভোগ ও ত্যাগের প্রেম ও বৈরাগ্যের সকাম ও নিষ্কামের এমন মিলন স্থান আর কোথায় মিলিবে?

এই সকল গৌরবজনক ঘটনাগুলির প্রতি লক্ষ্মণ রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু পতি-সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা সীতার লোলুপ দৃষ্টি যে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ গৌরবে, গর্ব্বে ও আনন্দে সীতার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া সেই চিত্রগুলির উদ্দেশ্যে ইন্দীবর-মালার সৃষ্টি করিতেছিল। বৃদ্ধ ইক্ষাকু রাজগণ পরিণত বয়সে জরা-শিথিলাঙ্গ হইয়া যে পুণ্য আরণ্যক ব্রত গ্রহণ করিতেন, আর আজ রামচন্দ্র প্রথম যৌবনে সেই কঠোর পবিত্র ব্রত অবলম্বন করিতেছেন—ইহা কত বড় গৌরবের ব্যাপার। রামগতপ্রাণ লক্ষ্মণের, রামময়-জীবিতা জানকীর ইহা কতবড় আনন্দের বিষয়। লক্ষ্মণের হৃদয় যেমন এই পুণ্য আরণ্যক ব্রত গ্রহণ ব্যাপারে গৌরবে নাচিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সীতার চক্ষু বিস্ফারিত আনন্দোজ্জ্বল অশ্রুময় হইবার উপক্রম করিল—অমনই রামচন্দ্র প্রসন্ন পুণ্যসলিলা রঘুকুল-দেবতা ভাগীরথী দেবীর কথা আনিয়া ফেলিলেন। "সীতায়ং শিবানুধ্যান পরা ভব" বলিয়া ভাগীরথী দেবীর উপর সীতার মঙ্গলের ভার অর্পণ করিলেন। এই উক্তির জন্য ভাগীরথী দেবী সীতার পুত্রদ্বয়কে রক্ষা করত স্তন্যত্যাগান্তে বাল্মীকির করে ন্যস্ত করিলেন। রামসীতার মিলানন্দের ছবি বিরহের চিত্র লক্ষ্মণের সম্মুখেই সম্পূর্ণ একপ্রকার নগ্নভাবেই ফুটিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ সীতার কত আদরের দেবর, তাহা চিত্রদর্শনের প্রথমেই দেবের ভাজের পবিত্র রসালাপের ভিতর দেখেই বুঝিতে পারা যায়। "বৎস, অপর এইটী কে?" কি সুন্দর স্বচ্ছ পবিত্র এবং সরল ব্যঙ্গ। সীতাই লক্ষ্মণকে, তামাসাই বল, আর ব্যঙ্গই বল, করিয়া সুখ পাইতেন, তাহা বলিয়া লক্ষ্মণও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, মাতৃসম পূজ্যা সীতাকে তামাসা বা ব্যঙ্গ করিতে পারিত না। আজি কালিকার আমাদের অন্তঃপুরের মধ্যে বউদিদি যতটা ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন, বা করিতে পারেন, দেবরেরা কি ততটা করেন, না—করিতে পারেন? বিশেষতঃ লক্ষ্মণ যে সীতার মুখের পানে কখন দৃষ্টিপাত করে নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর রমণীর মুখ দেখে নাই—সে ঐ প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিল না, কেবল লজ্জার হাসি হাসিল মাত্র। লক্ষ্মণ সীতাকে ভক্তি সম্ভ্রম করিত বলিয়া উত্তর দেয় নাই, নচেৎ সে যে গোবেচারী ছিল, কি ওসকল রসিকতা বুঝিত না, তাহা নহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন—তজ্জন্যই যে অতটা সঙ্কোচ, সেই কারণেই যে তাড়াতাড়ি কথাটী চাপা দিয়া ভার্গবের কথা আনিয়া ফেলিল, এমনও নহে। লক্ষ্মণের এই সংযত মৌন সম্ভ্রম, এই লাজুক ভাব তাহার সংযত চরিত্রেরই লক্ষণ। রাম উপস্থিত না থাকিলেই যে লক্ষ্মণ ঐ কথার উত্তর দিত, তাহা নহে। সে দিন কথক-ঠাকুরের লক্ষণ সম্বন্ধে একটী সরল কথা মনে পড়িল, তাহা উপাদেয় বোধে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

সীতার সঙ্গিনীরা জনকালয়ে রামকে প্রশ্ন করিল "বল তুমি কার মেয়ে বিয়ে করেছ?" সীতা যজ্ঞ ভূমিতে উৎপন্না, কাজেই পিতার ঠিক নাই। প্রশ্নের এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়াই রাম উত্তর দিলেন, "কেন, জনকের কন্যা"। অমনই সঙ্গিনীদের মধ্যে হাসির লহর ছুটিল; এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। রসিকা কোন নারী অমনই রামকে শুনাইয়া বলিল, "তা বটে, অজবংশে এমন ধারাই হয়ে থাকে।" জনকের কন্যা, কাজেই সহোদরা। আর অজবংশ ছাগলের বংশ। রাম অপ্রতিভ হইয়া মৌন হইয়া রহিলেন। বিজয়-গর্ব্বে উল্লাসিতা সঙ্গিনীরা লক্ষ্মণের নিকট যেমন ঐ প্রশ্ন করিল, অমনই চতুর লক্ষ্মণ মুখের মত উত্তর দিল "কেন, তোমাদের জনকের কন্যা।" সঙ্গিনীরা লজ্জায় অপমানে এতটুকু হইয়া গেল। সকলে হারিয়া মুখ চুণ করিয়া রহিল। "তোমাদের জনকের কন্যা" বলিতে তো তাহাদিগকেই নির্দ্দেশ করা হইল। তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। আর এদিকে "তোমাদের জনক রাজা" কথাটী দোষেরও হয় নাই।

সংসারে নানা ঝঞ্ঝাটে, দুঃখ, শোক, অভাব, দৈন্য, অবজ্ঞা ও প্রতারণার মধ্যে পড়িয়া আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি "সেদিন চলিয়া গিয়াছে।" এতদিনের পর সীতাকে লাভ করিয়া অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া এমন সুখের মুহূর্ত্তেও রামের মুখে উচ্চারিত হইল" তে হি নো দিবসা গতা।" প্রথম বয়সে বিবাহ, তরুণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা ভরা দিনগুলি বড়ই মধুর। লজ্জা ও অনুরাগের মাঝখানে দিয়া সেই প্রেমের খেলা বাস্তবিক উপভোগ্য! সুখের চেয়ে সুখের স্মৃতি মিষ্ট। বর্ত্তমানের তুলনায় অতীত চিরদিনই মূল্যবান।

তারপর চিত্রকূটগামী পথের মধ্যে কালিন্দী-তটে শ্যামনামক বটবৃক্ষের মূলে প্রণয় সুখ ভোগের কথা উঠিল। নির্জ্জন স্থলে সেই

ক্লান্তিনাশক মৃদু মৃদু সংবাহন, সেই বৃক্ষের উপর আলসলুলিত দেহে সেই সুখনিদ্রা প্রথমে সীতার মনে পড়িল। রামও কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? তারপর জলস্থান মধ্যবর্ত্তী মেঘমেদুরিতনীলিম" প্রস্রবণ গিরি মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। সেখানে অবিদিত-গত-যামা কত রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, তাহা মনে হইল। পরস্পরের একটী একটী বাহু পরস্পরের অঙ্গে জড়াইয়া আছে, ক্রম-শূন্য সপ্রেম রসালাপের উচ্ছলপ্রবাহ দম্পতীর উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হৃদয়ের মাঝখান দিয়া বহিয়া যাইতেছে—তাহার আর উদ্বোধ রহিল না। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত কি সুন্দর তন্ময়াবস্থা!

উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দর্শনে সহৃদয়গণ এমনই ভাববিহ্বল ও তন্ময় হইয়া উঠেন যে, তখন অভিনয় বাস্তব বলিয়াই বোধ হয়। চিত্রদর্শনেও চিত্র সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে। অতীত ঘটনার চিত্র দর্শনে স্মৃতি যে অনুভূতির আকারে ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন, ভাবনা প্রকর্ষে স্মৃতি প্রত্যক্ষ সমানাকার হইতে পারে। তাই শূর্পনখার চিত্র দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত-চিত্তা সীতার বিরহভীতি জাগিয়া উঠিল—"হা আর্য্যপুত্র, তোমার সহিত সাক্ষাৎ আজ শেষ হইল।"

তারপর সীতা হরণ হইয়া গেল। মিলন চিত্র শেষ হইয়া বিরহ চিত্রের পালা আসিল। সীতা-বিরহে রামের কি ভাবে দিন কাটিয়াছিল; সীতা-বিরহিত বিকলেন্দ্রিয় রামের পাষাণবিদারী ক্রন্দন কিভাবে বনস্থলী ফাটাইয়াছিল, তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইল। যে রোদনে বজ্রের হৃদয় গলিয়া যায়, তাহা যে সীতার নয়নে অশ্রু বহাইবে, আশ্চর্য্য কি?

অয়ি রঘুকুলানন্দ, আমার জন্য তুমি এত কষ্ট পেয়েছ? তৎক্ষণাৎ রামের হৃদয়ে অতীত দুঃখের বিলীন সংস্কার ফুটিয়া উঠিল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। পদ্মপলাসনেত্র হইতে অশ্রুধারা মুক্তামালার মত টপ টপ করিয়া ভূমে পতিত হইল। উষ্ণ মৃত্তিকা সিক্ত হইল!

সুখের সময়ে অতীত দুঃখের স্মৃতি জাগিয়া উঠিলে বেদনা জন্মে—কবি রামের মুখ দিয়া এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন।

সেই সময়ে সীতা হরণের পর বিরহ দুঃখাগ্নি তীব্র হইলেও প্রতিকার আশায় তাহা কোন রকমে সহ্য হইয়াছিল; কিন্তু আজ তাহা চিত্র দর্শনে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মর্ম্মস্থ ব্রণের মত বেদনা দিতেছে।

কালিদাস একটী মাত্র শ্লোকে (রঘুবংশে) চিত্র দর্শনের অবতারণা করেন। তাহাতে কিন্তু সুখের সময়ে অতীত দুঃখের স্মৃতি সুখকরই হইয়া উঠে—এইরূপ মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

দণ্ডকারণ্যে প্রাপ্ত দুঃখ স্মরণ করিয়া রাম ও সীতার সুখ জন্মিতেছিল, দুই মহাকবির এই মত-বৈষম্য বড়ই বিস্ময়কর। ইহার বিচার পাঠকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে করিবেন।

"কিং নামধেয়" পর্ব্বতের তরুমূলে অনুভাবসৌভাগ্যমাত্র পরিশেষ ধূসর শ্রী" রোরুন্যমান রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া আছেন। সীতা সেই দৃশ্য হইতে দৃঢ়বদ্ধ চক্ষু দুইটীকে কোনরূপে আকৃষ্ট করিতে না পারিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আপনার মন দিয়া রামের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া লইলেন। তার পর মাল্যবান পর্ব্বতে রামের সীতাবিরহশোক যখন সহ্যের অতীত হইয়া আসিল, তখন "বৎস, বিরত হও, আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না" বলিয়া রাম চিত্র দর্শন বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিলেন।

সীতা বিহনে রামের সেই করুণা অবস্থা দেখিয়া সীতার প্রাণ যদিও কাতর, চক্ষু অশ্রুময় হইতেছিল, তথাপি তাহাতে একটী সুখ, একপ্রকার সৌভাগ্য-গরিমা বিদ্যমান ছিল। সমবেদনার বালুকার ঘরে আত্মতৃপ্তির ফল্গুস্রোত নীরবে বহিয়া যাইতেছিল। করুণ রসান্বিত নাটকের অভিনয় দর্শনে সহৃদয়ের চিত্ত কাতর, নয়ন বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়া থাকে; অথচ তাঁহারা তাহাই শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হন। অবশ্যই সেই দুঃখের মধ্যেও এমন একটী আনন্দ রসের অনুভূতি জন্মে—যাহা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। ইচ্ছা করিয়া কেহ দুঃখ ভোগ করিতে চাহে না। রামের দুঃখে সীতার সমবেদনা যতই জাগুক, নয়নে যতই অশ্রুর ধারা বহুক, তথাপি তাহাতেই সীতার সুখ, সীতার গর্ব্ব, জীবনেরও সার্থকতা। এ দুঃখ যে সীতারই জন্য; এ দুঃখ যে কেবল একাই রাম পাইতেছেন, তাহা নহে, সীতাও যে ও দুঃখের সঙ্গী। কাজেই তাঁহার দেবতা তাহার জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন—ইহা দেখিয়া পতিগতপ্রাণা রামময়জীবিতার মন প্রাণ সৌভাগ্য গর্ব্বে নাচিয়া উঠিবে না? হতভাগিনী সীতার এত মূল্য! তাহা হইলে সীতার রাবণগৃহে বাসও ধন্য, রামবিরহ সহ্য করাও সুখকর।

চিরপরিচিত বনস্থলীর চিত্র দেখিয়া সেই বনস্থলী দেখিতে সীতার ইচ্ছা জন্মিল। রামের সহিত সেইখানে বেড়াইতে যান, এমন আকাঙ্ক্ষা সীতা প্রকাশ করিল। গর্ভাবস্থায় চিত্তের অভিলাষপূরণ কর্ত্তব্য, আর এ বিষয়ে

গুরুজনের আদেশও সম্প্রতি পাইয়াছেন, কাজেই রামচন্দ্র তখন গর্ভাবস্থার উপযোগী রথ সজ্জীভূত করতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া যাইলেন।

পরিশ্রান্তা জানকী তখন আপনার অলসলুলিত স্বেদসিক্ত বাহু দুইটী রামের বিস্তৃত বক্ষে বিন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশায়িতা হইলে সেই উন্মাদক স্পর্শের ইন্দ্রিয়মোহবিকার রামের চেতনাকে কখন উন্মীলিত, কখন বা বিভ্রান্ত করিতেছিল। সে যে কি, স্পর্শ রাম ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সীতার একে পূর্ণগর্ভভার, তাহাতে দেহের, ইন্দ্রিয়ের ও মনের শ্রান্তি, তদুপরি শীতল সুখকর পতিস্পর্শ—সীতা রামবাহু উপাধান করিয়া মুহূর্ত্তেই ঘুমাইয়া পড়িল। সেই সুন্দর ঘুমন্ত মুখখানির পানে চাহিয়া, সেই মৃণালদুর্ব্বল অঙ্গললিতা আলিঙ্গন করিয়া রাম যখন আপনার সুখসৌভাগ্যের চিন্তা করিতেছিলেন—এমন সময়ে বিধাতার অভিশাপের মত মূর্ত্তিমান বিরহ দুর্মুখ আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। বিরহ ব্যতীত সীতার সবই মধুর, সবই সুন্দর—ঠিক এমন সময়ে সেই বিরহই দেখা দিল। তীব্র সংবেগ বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিয়া রামের সুখ শান্তি শেষ করিয়া দিয়া দুর্মুখ আপনার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিল। পরিশেষে ধূমকেতুর মত পশ্চাতে অমঙ্গল ছায়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

এত বড় কুৎসিত নিন্দা যাহারা সীতার চরিত্রে নিক্ষেপ করিল, রামের স্বর্গীয় প্রেম রাজ্যপ্রতিষ্ঠা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিল—সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজারা সাধারণ রাজার বিচারে দণ্ডার্হ বিবেচিত হইত। কিন্তু "লোক গরিমা ব্রতৈকদীক্ষ" মহারাজ রামচন্দ্র সেই প্রজাদিগকে কিছুমাত্র অনুযোগ করিলেন না, বরং বলিলেন "যচ্চাদ্ভুতং কর্ম্ম বিশুদ্ধিকালে প্রত্যেতু কস্তদ্ভুবি দুর্বৃত্তং।" লঙ্কায় আচরিত সেই অগ্নি বিশুদ্ধিরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম অযোধ্যার প্রজাবৃন্দের বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। একবার যে রাম লক্ষ্মণের মুখে "যাবদার্য্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ" সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত এই কথা শুনিয়া বড় গলা করিয়া বলিয়াছিলেন—"উৎপত্তিপরিপূতা সীতার আবার শুদ্ধি কি"? এক্ষণে তিনিই আবার সেই "বিশুদ্ধিকালে" অগ্নিশুদ্ধি সময়ে এই কথাটী ব্যবহার করিলেন। লক্ষ্মণকে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহাই তাঁহার অন্তরের কথা, হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা। আর দুর্মুখের নিকট তিনি যে প্রজাদিগের প্রতিনিধি, দেশের ধর্ম্মার্থকামরক্ষক রাজা—কাজেই তাঁহাকে সাধারণ প্রচলিত ধারণারই অভিব্যক্তি লোকমতেরই পুনরুক্তি করিতে হইল। রাজা হইয়া আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে অন্তরের দৃঢ় ধারণা সাধারণ প্রজার বিশ্বাসযোগ্য না হইলে তিনি কেন প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বলতা দেখাইবেন? তিনি রাজ্যের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ও আচারের প্রবর্ত্তক, রক্ষক। কাজেই সাধারণ প্রজার দৃষ্টি লইয়াই সুবিচারকের বিচার লইয়াই বিচার করিলেন।

"বিশ্রম্ভছরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রাং" "প্রিয় গৃহিণী গৃহস্য শোভাং" দৃঢ়বিশ্বাসে চক্ষের উপর পড়িয়া নিদ্রাপ্রাপ্তা গৃহের শোভা প্রিয়গৃহিণী সীতাকে যে ত্যাগ করিতে হইবে, "আতঙ্ক স্ফুরিতকঠোর গর্ভস্তম্ভা" প্রিয়তমাকে যে সিংহ ব্যাঘ্রাদির বলিরূপে দিতে হইবে, তাহা তিনি তখনই বুঝিতে পারিলেন। সীতার প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য লৌকিক বিচার করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না। সীতার চরিত্রে যদি তার বিন্দুমাত্র

সংশয় থাকিত, সুখদুঃখ গণনা করিয়া যদি কার্য্যে অগ্রসর হওয়া তাঁর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলেই বিচারের আবশ্যক হইলেও হইতে পারিত। সীতার চরিত্র লইয়া বিচার-ইহা অসম্ভব! তাঁহার সম্মুখে প্রজারা কে সাহস করিয়া মনের প্রকৃত ধারণা ব্যক্ত করিবে? সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণাদিকে ডাকাইয়া একপ্রকার বিচারের অভিনয় করিয়া সীতা ত্যাগ করেন। সীতা বিবাসন সত্য-কারের আত্মবলি। স্বহস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদ বুঝি এত মর্ম্মভেদী নহে। কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্ত নিবারণার্থই হউক, সূর্য্যবংশের কলঙ্কদূরীকরণ উদ্দেশ্যে বা লোকারাধনা-ব্রতপালন নিমিত্তই হউক—রামের এই কার্য্যে, সীতা-বিবাসন জন্য, সহৃদয় কোমলপ্রাণ দুর্ব্বলমনা ব্যক্তির তাঁহার উপর কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। এই নির্ব্বাসন ব্যাপারে রামের যে ক্ষোভ, যে মর্ম্মান্তদ যাতনা, তজ্জন্য গভীর সমবেদনা করেন না—এমন সীতাভক্তও বোধ হয় কেহ নাই। মহারাজ সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের হস্তপদ, মনপ্রাণ সবই প্রজারাধনা ব্রতের মঙ্গলসূত্রে আবদ্ধ—কাজেই জড়যন্ত্রের মত তিনি সীতা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। "ব্রুহি লক্ষ্মণ এষ তে নূতনো রাজা সমাজগ-পয়ক (কর্ণে এবসেব)" চলিয়া আজ তিনি নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যবংশের রাজাসনে না বসিলে ত তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করিতে হইত না, সীতার মত প্রিয়তমা, নিষ্কলঙ্কা সহধর্ম্ম-চারিণীকে হিংস্র ব্যাঘ্র মুখেও দিতে হইত না। আর অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া ইক্ষাকু বংশীয় কোন রাজাই এমন অপূর্ব্ব নৃশংস কর্ম্ম করিয়া যান নাই—তাই বড় ক্ষোভে, বড় দুঃখে, বড় লজ্জায় রাম আপনাকে নূতন রাজা বলিয়া পরিচিত করিলেন। রাম দুঃখে শোকে অনুতাপে যাহা নৃশংসতার দিক দিয়া অপূর্ব্ব কর্ম্ম করিলেন, আমরা লোকারাধনা ব্রতপালনের দিক দিয়া সেই কার্য্যকে অপূর্ব্বই বলি।

দুর্ম্মুখ চলিয়া গেল। রাজাদিগের চার চক্ষু। কাজেই চক্ষুস্বরূপ দুর্ম্মুখ প্রভুকে বঞ্চনা না করিয়া সত্য বলিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালনই করিয়াছে। চক্ষু প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, দুই দেখিতে বাধ্য, আর মনের কাছে তাই পৌছাইয়া দেয়। গুপ্তচর দুর্ম্মুখের অপ্রিয়সত্য-কথনই এক্ষেত্রে তাহার ধর্ম্মপালন। এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহার নিকটও বড় কঠোর; তথাপি সেই কঠোর কর্ত্তব্য পালনেও সে পঞ্চাংপদ হয় নাই।

সীতা ত্যাগ করিতে হইবে, রাম বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিশ্রম্ভশায়িতা সুপ্তা সীতার পদপল্লব মাথায় লইয়া গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় দিলেন, "দেবি অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পদপঙ্কজ-স্পর্শ" বলিয়া কাঁদিতে বলিলেন। দেবি, রামের মস্তকে আজ তোমার শেষ পদস্পর্শ—এই কথাটীতে স্বতই সংশয় জন্মে যে, তবে কি রাম মধ্যে মধ্যে সীতার পদদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিতেন?

রাম মধ্যে মধ্যে যে সীতার পদদ্বয় মাথায় করিতেন, এমন কি, কখন কখন করিতেন, তাহাও প্রকৃত নহে। তবে সীতার পদযুগ যে তাহার মাথায় রাখার যোগ্য, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল। স্বতঃপূতা জানকীর নিকট যে তিনি আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেন, আপনার অপেক্ষা সীতাকে যে উচ্চাসনে বসাইয়া মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারই অভিব্যক্তি দেখা গেল। রাম সীতাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে এতদিন

মনে মনে যে পূজাই করিতেন, "দেবযোনি মন্তবা" "স্বজন্মানুগৃহীত বসুন্ধরা" বহ্নির মত স্বতঃপবিত্রা সীতাকে যে উপাসনীয়া ভাবিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইল। সীতার প্রভু পতি হইয়া সীতার উপর এতদূর গভীর শ্রদ্ধা, এতাদৃশ গৌরবের ভাব রাম অপর লোককে দূরে থাক্, আপনাকেও জানিতে দিতে চান না। ধর্ম্মতঃ সীতা যে তাঁহার দাসী, সীতার তিনি যে উপাস্য দেবতা, তার নারী-হৃদয়ের সর্ব্বময় প্রভু, তিনি কেমন করিয়া এই সাধারণ-বিরুদ্ধ "মস্তকে পদগ্রহণ কার্য্যটী" লোক সমক্ষে করিবেন? আর সীতাই বা কেন তাঁহার দেবতা রামকে পাদস্পর্শ করিতে দিয়া অপরাধিণী হইবেন? আজ সীতা গভীর নিদ্রা-মগ্না, আর আজি সে জন্মের মত চিরতরে বিদায় লইয়া নির্ব্বাসিতা হইতে চলিয়াছে। আজ আর লজ্জা সঙ্কোচ কি? এতদিন আপনার হৃদয়ে সীতার স্থান কিরূপ ছিল, সীতার উপর তাঁহার কি উচ্চ ধারণা ছিল—এক কথায় সীতা কি ছিল—তাহার পরিচয় আজ না দিলে আর কখনও দেওয়া ঘটিবে না। এতদিন যে ভাবটীকে অতি সন্তর্পণে হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আজ তাহার বহিঃ প্রকাশের উপযুক্ত অবসর। এ সুযোগ আর মিলিবে না। অন্তরের প্রতিচ্ছবি আজ বাহির হইয়া দেখা দিল, ধারণা কার্য্যাকারে ব্যক্ত হইল। সীতা অবশ্য জানিল না, তথাপি রাম নিজের অন্তরের কাছে আজ একটী দায় হইতে খালাস পাইলেন। নিজের কাছেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইলেন। সীতাকে জানাইয়া বা সীতার জাগরণাবস্থায় করিলে, উহা প্রশংসনীয় কার্য্য হইত না।

এইরূপ মানসিক দুর্ব্বল অবস্থায় কুম্ভীননী রাক্ষসীর গর্ভজাত মধুদৈত্যের পুত্র লবণের উপদ্রবের কথা শোনা গেল। লবণোৎপীড়িত ঋষিগণ "অব্রহ্মণ্য" বলিয়া অযোধ্যার দ্বারে আসিয়া রামের নিকটে সাহায্যার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রজার প্রতিনিধি আদর্শ নরপতি রামচন্দ্র নিজের দুঃখকষ্ট অমনই ভুলিয়া গেলেন। কঠোর কর্ত্তব্যের টানে আপনার হৃদয়কে গড়িয়া লইয়া শত্রুঘ্নকে লবণদমনার্থ প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। বীরত্বের যশোমাল্য শত্রুঘ্নের শিরে অর্পণ করিবেন বলিয়াই চলিয়া যাইতে যাইতে তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া ধীরে ধীরে সীতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবাল্য-পরিচিত ঘুমন্ত মুখখানির উপর এক বার শেষ সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিলেন। "ভগবতী বসুন্ধরে, তোমার শ্লাঘণীয়া দুহিতাকে দেখিও" বলিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করিলেন। স্বামীত্যক্তা দুহিতাকে জননী কখন ত্যাগ করেন না। আর অসহায় সীতার সহায়স্বরূপা কেহই নাই। পৃথিবী, তুমি সহায় হইও। রামের কথায় ধরিত্রী তাঁহার জিনিষটী রক্ষা করিলেন। এ কথাগুলি নিজেই রামের কাছে বলেন।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতা দুঃস্বপ্নবিপ্রলব্ধা সীতা দুর্ম্মুখের মুখে শুনিলেন যে, "কুমার লক্ষ্মণ বন গমনার্থ রথ সজ্জীভূত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এইক্ষণেই যাইতে হইবে। সীতা বনবাসের কথায় আর্য্যপুত্র তোমাকেও কিন্তু যেতে হবে, এই কথা বলায় রাম উত্তর দিয়াছিলেন, "অয়ি কঠিনহৃদয়ে এতদপি বক্তব্যং"—অয়ি কঠিনহৃদয়ে, ইহা আর বলিতে ইহবে? কাজেই সীতা জানে, আর্য্যপুত্র সঙ্গেই যাইবেন।

সীতা ধীরে ধীরে দুর্ম্মুখের অনুগমন করিতে লাগিল। তরলপ্রাণা হরিণী বংশী-

নাদ মনে করিয়া আনন্দে ছুটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিবে যে, উহা তাহারই মরণের সঙ্কেত, তখন তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে? অযোধ্যায় সীতাকে প্রকৃত ব্যাপার কি জানিতে দেওয়া কোনমতেই নিরাপদ নহে। তাই কাপট্য অবলম্বন আবশ্যক হইল। তপোধনদিগকে, সকল গুরুজনদিগকে আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম করিয়া সীতা যবনিকা অন্তরালে চলিয়া যাইল। প্রথমাঙ্কের যবনিকা পড়িয়া গেল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

সিনেট-সভায় স্যর আশুতোষের সভাজন আলোচনা।

মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে একটিন্ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান বিচারপতি বিদায় গ্রহণ করিলে জজদের মধ্যে যিনি সিনিয়র, তিনি একটিনি করিয়াই থাকেন—এস্থলে তাহাই হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র ও স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ একাধিকবার এইরূপ একটিনি করিয়াছিলেন। অতএব ইহাতে অপ্রত্যাশিত বা অভূতপূর্ব্ব কোন ব্যাপার ঘটে নাই। যাহা হউক, তথাপি, দেশের একজন এই অত্যুন্নত পদাভিষিক্ত হইয়াছেন—তাই শিক্ষিত সাধারণ এতদুপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনেট সভাও স্যর আশুতোষকে সভাজিত করিয়াছেন। তা বেশ। কিন্তু সিনেট্ সভায় যে সভাজন করা হইয়াছে, তদুপলক্ষে উক্তি প্রত্যুক্তিতে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ খটকা বাঁধিয়াছে। তাই এই বিষয়ে দু একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় বলিয়াছেন "He (স্যর আশুতোষ) has advanced the cause of education as no other person in this generation has done" * অর্থাৎ স্যার আশুতোষ শিক্ষা ব্যাপারের যাদৃশ উন্নতি বিধান করিয়াছেন, এতৎকালীন কেহই তাদৃশ করেন নাই।

মাননীয় স্যর নীলরতনকে আমরা একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি। তিনি নিতান্ত দারিদ্র্যাবস্থা হইতে আপন বাহুবলে সমৃদ্ধিবান হইয়াছেন, এবং সত্যের জন্য বিবেকের অনুগত হইয়া পৈতৃক ধর্ম্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতাদৃশ ব্যক্তি যাহা বলিবেন, তাহাতে আমাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্থাপন করাই উচিত। যদি কেবল ৮।১০ হাজার ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীর আয়তন বাড়িতেছে, আফিসে কেরাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং রীডার, লেক্‌চারার, প্রফেসর ইত্যাদি বহু সংখ্যক নিযুক্ত হইতেছেন, এই সকল

* ইহা এবং পরবর্ত্তী কোটেসনগুলি বিগত ২৮শে মার্চ্চ তারিখের "বেঙ্গলী" হইতে উদ্ধৃত।

দেখিয়া 'এডুকেশন্ এড্‌ভান্স্' করিতেছে মনে করিতে হয়, তবে আমরা নাচার। ফলতঃ এ যুগে কেন, কোনও যুগেই এমন ব্যাপার দেখা যায় নাই। তবে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হইবে, ইহা প্রত্যাশিত। কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যাপার গুলির প্রতি নিরীক্ষণ করিলে স্যর নীলরতন কি শিক্ষার উন্নতি হইতেছে বলিতে পারেন? প্রথমতঃ শিক্ষার অপকর্ষ দেখান যাইতেছে। পূর্ব্বে ১ম শ্রেণীতে পাস্ কম হইত; দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীতেই অধিক ছাত্র পাস্ হইত। এখন প্রথম শ্রেণীতেই (ম্যাট্রিকুলেশন্ ও আই-এ, আই-এস্ সি-তে অন্ততঃ) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাস্ হয়—তারপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে; তৃতীয় শ্রেণীতে অতি কমই যায়। যে ছাত্রগুলি পাস্ হয়, তাহাদের অপটুতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখনকার আই-এ পাস্ অপেক্ষা পূর্ব্বকার এণ্ট্রান্স পাস্ ছাত্র অধিকতর শিক্ষিত হইত, অনেকেরই এমন ধারণা। তিন চারিটী প্রশ্ন দিয়া যে কোনও একটীর উত্তর চাওয়াতেই বিশেষতঃ ছেলেরা পাস্ করিবার সুবিধা পায় এবং কম্ পড়িয়া অধিকতর ফললাভ করে। ইহার উপর গ্রেস্ (ফাউ) নম্বর দিবার ব্যবস্থা আছে; ফেইল ছাত্রকে ২।৪ নম্বর ফাউ দিয়া পাস্ করাটা তেমন দোষাবহ নহে; কিন্তু বি-এ অনার্স তথা এম্-এ, পরীক্ষায়ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস্ হইবার নম্বর রাখিয়াও 'গ্রেস্' পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে—একথাও শুনা গিয়াছে।

তারপর নানা বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষা হইতেছে এবং লেকচারার, প্রসেফর ইত্যাদিও নিযুক্ত হইতেছেন—বাহ্যতঃ দেখাইতেছে ভালই। কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত শিক্ষা কতদূর কি হইতেছে, ভগবানই জানেন। নিয়ম হইয়াছে, যিনি যে বিষয়ে লেক্‌চারার, তিনি সেই বিষয়ে পরীক্ষক থাকিবেন। লেকচারার ও ছাত্র উভয়েরই ইহাতে পরম সুবিধা। অধ্যাপক যতটুকু জানেন ও শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সীমার ভিতরেই প্রশ্ন দিলেন, ছাত্রেরাও লেক্‌চারারের নোট্ পড়িয়াই প্রথম শ্রেণীতে পাস্ হইবার উপযুক্ত নম্বর রাখিতে পারে। পূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর কলেজ মাত্রেই নানা বিষয়ে এম-এ পড়াইবার অধিকারী ছিল এখন আর তাহা হইবার যো নাই। অবশ্য দু একটা কলেজে এম-এ পড়ান হয়, তাও দু একটা বিষয়ে মাত্র। ইহাতে ইউনিভার্সিটী লেক্‌চারারগণের ও ছাত্রবর্গের প্রাগুক্ত সুবিধার পথ প্রশস্তই হইয়াছে। এদিকে কলেজগুলিতে এম্-এ ক্লাস্ না থাকায় অধ্যাপকগণ উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষাদান পূর্ব্বক যে আত্মোন্নতি করিতেন, তাহার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন দেখুন, স্যর নীলরতন যে বলেন, শিক্ষা ব্যাপারের উন্নতি হইয়াছে, তাহা কতদূর বিচারসহ।

এই গেল শিক্ষার অপকর্ষ; অতঃপর গুরুতর কথা হইতেছে—নীতির অপকর্ষ। শিক্ষা দ্বারা ত সন্নীতি সদাদর্শ বিস্তার লাভ করিবে? কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এবিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ হতাশ হইতেছি। স্যর আশুতোষ প্রবল প্রতিভাবান্ এবং প্রকাণ্ড কর্ম্মী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তদীয় মহনীয় চরিত্রে দুএকটা এমন ছিদ্র আছে—যাহাতে ঐ সকল গুণ সত্ত্বেও আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে দু চারি কথা না বলিয়া পারি না। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য—কিন্তু আমরা নিরুপায়।

তাঁহার প্রধান দোষ, তিনি স্তুতিবাদে গলিয়া

যান। যদি তিনি স্বকীয় সম্পত্তি হইতে স্তাবকদের পুরস্কার বিধান করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কোনও কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীর" নিকেতন—ইহার পরিচালনায় স্তাবকের প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? তাঁহার নামে উৎসর্গকরা হইয়াছে, এমন অনেক পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পরীক্ষক হইতে হইলে তাঁহার আলয়ে যাতায়াত করিতে হয়—এ ধারণাও লোকের মনে জন্মিতে পারিয়াছে। স্যর আশুতোষের স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতাবশতঃ সকলেই তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় করিতে পারে। এটা ভালকথা—কিন্তু তখন চাটুবাদের অবসর পাইয়া কত স্বার্থপর লোক যে স্বকার্য্যোদ্ধার করিয়া তাঁহাকে অপযশের ভাজন করিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ (বোধ হয় এইরূপ লোকদেরই প্ররোচনায়) স্যর আশুতোষ সামাজিক কোনও কোনও বিষয়ে এমন দু একটা কাজ করিয়াছেন, যাহাতে সমাজে মতান্তরমূলক দলাদলি হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি স্বার্থপর লোক ঐ সূত্রেও তাঁহাকে পঙ্কে ফেলিয়া উহাদের আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। স্তোকবাক্যে অন্ধীকৃত হইয়া (অতি চতুর হইলেও) তিনি ইহাদের হাত এড়াইতে পারেন নাই—"দূর হ শয়তান্" বলিয়া তাড়াইয়া দেন নাই।*

সে যাহা হউক, এই দলাদলির আঁচ বিশ্ববিদ্যালয়কেও স্পর্শ করিয়াছে। যাঁহারা নির্ভীক প্রতিবাদী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রুটী-মৎস্য' (লোভস্ এণ্ড ফিসেজ্) হইতে বঞ্চিত আছেন। †

সে যাহা হউক, ইহা অপেক্ষাও একটী গুরুতর দোষ স্যর আশুতোষে অধুনা দেখিতে পাইতেছি—তাহা স্বীয় আত্মীয় কুটুম্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষণ। জামাতা শ্রীমান্ প্রমথনাথ ভাল পাস্ করা ছেলে, সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহার এই অল্প বয়সে সেনেটে ‡ তথা সিণ্ডিকেটে প্রবেশ লাভ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ প্রাপ্তি, তথা স্যর আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রমাপ্রসাদের এম-এ, পাস্ করিয়াই আই-এ,-পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াও বি, এ, পরীক্ষকতা লাভ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ; এই দুই ব্যাপার না ঘটিলেই শোভন হইত। §

* এরূপ করা দূরে থাকুক, তিনি এ সকল ব্যক্তি দ্বারা কার্য্যসাধনও করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কোনও মোরব্বি সদৃশ ব্যক্তি তাঁহাকে এরূপ লোকের সংশ্রব না রাখিতে বলায়, তাঁহাকে নাকি স্যর আশুতোষ বলিয়াছিলেন "বড় বড় জেনারেল যেমন স্কাউট রাখেন, এগুলিও তাদৃশ জানিবেন"। কথা সত্য হইলে স্যর আশুতোষ নিজকে শত্রুসঙ্কুল সমরক্ষেত্রের জেনারেল মনে করেন, দেখা গেল। এ অবস্থাটা কি শ্লাঘনীয়?

† শুনা যায়, মুখ্যতঃ এরূপ কারণেই নাকি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কারমাইকেল অধ্যাপক হইতে পারেন নাই। এ বার্ত্তা শুনিয়া জনৈক অধ্যাপক বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"আশুতোষ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
হরপ্রসাদমূলঙ্ঘ্য ভাণ্ডার্কে করুণা যতঃ।"

‡ সিনেট শব্দটী লেটিন সেনিস্ (=বৃদ্ধ) শব্দ হইতে জাত; ফলতঃ রোমের সিনেট সভা বয়োবৃদ্ধ দেরদ্বারাই গঠিত হইত। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে বৃদ্ধকে পরাভূত করিয়া নবযুবকেরা প্রবেশলাভ করিতেছেন, ইহাও শুভাবহ বলিতে পারি না।

§ একই বৎসরের মধ্যে স্যর আশুতোষের (১) জামাতা প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইলেন (২) জ্যেষ্ঠপুত্র এম-এ পরীক্ষায় প্রথম (৩) মধ্যমপুত্র আই-এ পরীক্ষায় প্রথম এবং (৪) তৃতীয়পুত্র মেট্রিকুলেসন্ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। অনেকেরই ইহাতে বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। এই বৎসরটা অন্ততঃ স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত থাকিতে পারিলে ভাল হইত না কি? অনেক প্রশ্নপত্রও যে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শক্রমে রচিত হয়।

স্যর আশুতোষের ছেলে বা জামাতা তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হইবেন, এটা বিশেষ কিছু অন্যায় নহে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে না হওয়াটাই ভাল ছিল। কেননা, এইরূপ বিষয় শিক্ষার্থী যুবকগণের গোচরীভূত যত কম হয়, ততই ভাল—যেহেতু এটা ভাল 'আদর্শ' নহে। ইতঃপূর্ব্বে গ্রেস্ দিয়া পাসের কথা বলা হইয়াছে। আবার এই গ্রেস্ দেওয়া ব্যাপার যদি ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধে হয়, তবে ইহা কতদূর অন্যায়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এরূপটাও হইতেছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। তাহার সব কথা সত্য না হইতেও পারে কিন্তু

মৃষা বা সত্যং বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।

ফলকথা এভাবে নৈতিক অপকর্ষ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা আসিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না—এবং এ অবস্থায় সৎশিক্ষার উন্নতি হইতেছে, ইহা বলা চলে কি?

এই যে ১৯১৭ সালে একাধিকবার মেট্রিকুলেশনের প্রশ্ন চুরি ঘটিল, ইহার দ্বারাও কি নৈতিক অধঃপতনের সূচনা হইতেছে না? অপ্রীতিকর বিষয় আর ঘাঁটিব না; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আজকাল শিক্ষার 'উন্নতির' কথা সাজে কি? আশা করি, বিচক্ষণ স্যর নীলরতন এ সকল ব্যাপারের একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

স্যর নীলরতনের প্রশংসাবাদের উত্তরে স্যর আশুতোষ যাহা বলিয়াছেন, এখন তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তিনি বলিয়াছেন "I began life as a research student in Mathematics when research was unknown in this country. And the mission of my life was to be a research professor in my University. Mr. Justice Bannerji, who was then Vice-chancellor of this University made a desperate attempt to create a chair for me, but such were the times that he failed to collect even a modest income of Rs. 4000 a year which was all that he and I thought would be sufficient to maintain me as a research Professor. The consequence was that I drifted into Law etc." অর্থাৎ তিনি গণিত বিষয়ে গবেষক ছাত্ররূপে জীবন আরম্ভ করেন—তখন এদেশে গবেষণা বলিয়া একটা জিনিস যে আছে, তাহা কেহ জানিত না। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রিসার্চ্চ প্রফেসর' হওয়াই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তখন জষ্টিস্ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যর গুরুদাস) ভাইস্-চান্সেলার ছিলেন—তিনি বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা মাত্র বৃত্তি বরাদ্দ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—এমনই তখনকার অবস্থা ছিল। ঐ ৪০০০৲ টাকা মাত্র বার্ষিক হইলেই তিনি (স্যর আশুতোষ) রিসার্চ্চ প্রফেসাররূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন। তাহা না পাওয়াতে তাঁহাকে আইনের প্রবাহে উহ্যমান হইতে হইয়াছিল। ইত্যাদি—। তাঁহার এই বক্তৃতার সারবত্তা পরীক্ষা করা যাউক। প্রথমতঃ তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে 'রিসার্চ্চ' কেহ জানিত কিনা, দেখা যাউক। স্যর আশুতোষের জন্মের প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটী সংস্থাপিত হয়—ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা সকলেই জানেন এবং এখনও ইহা বর্ত্তমান আছে। তারপর কলিকাতায়ই 'এশিয়াটিক রিসার্চ্চেস্' প্রকাশিত হয়—ইহারও নামটীর কি অর্থ দেখুন। স্যর উইলিয়ম জোন্স,

কোলব্রুক, উইল্‌সন্, কনিংহাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ এদেশে একটা গবেষণার যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণও যোগদান করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে গ্রহীতব্য। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বে এদেশে 'রিসার্চ্চ' কেহ জানিত না, এ কথাটা স্যর আশুতোষের বলা কতদূর সঙ্গত, দেখুন। বিজ্ঞান বিষয়েও বোধ হয় স্যর আশুতোষের জন্মের সমকালেই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 'বিজ্ঞান-সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন—স্যর আশুতোষ কার্য্যজীবনে প্রবেশের প্রারম্ভে সেই এসোসিয়েশনে গণিত বিষয়ক আলোচনা করিতেন। তারপর তাঁহার অপর উক্তির চর্চ্চা করিব। স্যর গুরুদাস ভাইস্-চান্সেলার হন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐ কাজে ছিলেন। স্যর আশুতোষের কথার ভাবে এই বুঝি যে, তিনি স্যর গুরুদাসের ভাইস্-চান্সেলারির সময় পর্য্যন্ত আইনের দিকে মনোযোগ দেন নাই—কিরূপে "রিসার্চ্চ" প্রফেসর হন, সেই চেষ্টায়ই তন্ময় ছিলেন। এখন স্যর আশুতোষের আইন সম্বন্ধীয় পড়াশুনার যতটা আমরা জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

(১) ১৮৮৪।৮৫।৮৬ এই তিন বৎসর তিনি ঠাকুর ল-লেক্‌চারগুলি এটেণ্ড (attend) করিয়া প্রতিবারই পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক প্রথম হইয়া ঠাকুর স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

(২) ঐ সময়েই তিনি 'ল' ক্লাসে পড়িতেছিলেন এবং ১৮৮৮ সনে বি-এল, পাস্ করেন।

(৩) তৎসমকালেই বোধ হয় তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবার জন্য স্যর রাস-বিহারী ঘোষের আর্টিক্‌ল্ ক্লার্ক ছিলেন।

(৪) তৎকালে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর) 'অনর্স-ইন্-ল' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এবং ১৮৯১ সনের নবেম্বরে ঐ পরীক্ষা দেন।

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আইন তাঁহাকে কোন্ সময়াবধি আকর্ষণ করিয়াছিল। তারপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৪০০০৲ টাকা মাত্র বার্ষিক পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া 'রিসার্চ্চ প্রফেসর'রূপে জীবন কাটাইতে পারিতেন। এই উক্তির চর্চ্চা করিতে গিয়া প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিব, স্যর আশুতোষ কি অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন? তাহার পিতা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন—এমন কি, তিনি তদীয় পুত্রগণের শিক্ষার্থে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। হেমন্তকুমারের মৃত্যু হইলে স্যর আশুতোষই পৈতৃক বিত্তের এক মাত্র উত্তরাধিকারী হন। অতএব তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি তখনও ষ্টুডেণ্টশিপ্ পাইতেছিলেন। তাঁহার "জিওমেট্রি অব্ কনিক্‌স" দ্বারাও বিস্তর আয় হইতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইয়াও ইচ্ছা করিলে তিনি বিলক্ষণ দুপয়সা পাইতে পারিতেন।* তৃতীয়তঃ গবেষণার দিকে প্রবল ঝোঁক থাকিলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার না হইতে পারিলেও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর অনায়াসে হইতে পারিতেন। এবং এমনও শুনিয়াছি,

* শুনিয়াছি, তিনি নাকি পরীক্ষার ফিস্ গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বে সিণ্ডিকেটের মেম্বরগণ পরীক্ষকও হইতেন না। তা যদি অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন হইত, সিণ্ডিকেটে না গেলেও ত পারিতেন।

তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের ইচ্ছাও ছিল—তিনিই নাকি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক স্যর জগদীশচন্দ্র ও স্যর প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজগ্রহণ করিয়া গবেষণায় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিও সেই পথ ধরিলে পৃথিবী-বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। তবে "সাতমণ তেলও পুড়িবে না রাধাও নাচিবে না" এই ন্যায়ে, তাঁহার কথায় ইহাই বোধ হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ্চ প্রফেসরের সৃষ্টিও হইল না—স্যর আশুতোষও রিসার্চ্চ কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন না। আর আইন ব্যবসায় করিতে গেলেও যাঁহার ভিতরে প্রকৃত গবেষণার ঝোঁক আছে, তিনি তদ্বিষয়ে কার্য্য করিবেনই—দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; মফঃস্বলে থাকিয়াও ইনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী শিক্ষিত-সমাজ চিরকাল গৌরব বোধ করিবেন।

ফলকথা, স্যর আশুতোষ যাই বলুন না কেন, তিনি Minerva দেবীর অপেক্ষা Juno দেবীরই সমধিক ভক্ত। তিনিই তো নাকি এক সময় বলিয়াছিলেন "Had I not been a Judge of the High Court I would have been a Professor."—তিনি হাইকোর্টের জজ না হইলে অধ্যাপক হইতেন। তাঁহার পঠদ্দশা হইতে আমরা তাঁহার খবর কিছু কিছু রাখি—তাহাতে আমাদের এই ধারণা যে, তিনি একটা 'বড় লোক' হইবেন—এমন আর কেহ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি—এই যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। তাই উপাধির মালা গাঁথিয়া নামটা যতদূর দীর্ঘ হইতে পারে, করিতে কসুর করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যতটা বোর্ড বা কাউন্‌সিল আছে, প্রধান প্রধান প্রায় সবটারই প্রেসিডেণ্ট হইতে সম্মতিদান করিয়াছেন—এবং যতটা নাগাল পাওয়া যায়, প্রায় সব ব্যাপারেই সংসৃষ্ট হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ফলতঃ এতটা কাজ যিনি করিতে সাহসী হন, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়—তবে এইরূপ ব্যক্তি শমগুণ-সম্পন্ন রিসার্চ্চকারী হইতে পারেন না। এই ব্যাপারে ধ্যান ধারণা একাগ্রসাধনার প্রয়োজন—এই সব স্যর আশুতোষে ততটা দেখা যাইতেছে না।

আর এক কথা। স্যর আশুতোষ এই যে আজ সিনেটের অভিনন্দনের উত্তরে এই কথাটা বলিলেন—সেটা পূর্ব্বে স্যর গুরুদাস জীবিত থাকার সময়ে বলেন নাই কেন? তিনি সায়েন্স্ কলেজের ভিত্তি স্থাপন কালে শোভনতরভাবে ইহা বলিতে পারিতেন।

তার পর আছে "I made a determination at the time that, Heaven willing, I would devote myself to the Service of the University so that in the next generation any aspiring scholars in my position might not drift into Law and they might have adequate opportnnities to devote themselves to the cause of science and learning. It has been given to me through the inspiring example of many distinguished countrymen of mine foremost amongst them men like Sir Rasbehari Ghose, Sir Taraknath Palit, the Maharaja of Cossimbazar, the Maharaja of Durbhanga and others, to lay the foundations of a teaching University in Calcutta. And I do

not now regret that I drifted into Law. If I had not taken to Law and attained the position and influence which carry weight in the world, it might never have been given to me to do for my University what I have been able to achieve." অর্থাৎ তিনি তদবধি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় কোনও উচ্চাভিলাষী ছাত্র যাহাতে বাধ্য হইয়া আইন-জীবী না হয়, ভগবদিচ্ছা থাকিলে সে উদ্দেশ্য সাধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। স্যর রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, কাশিমবাজারের অধিপতি, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ প্রভৃতি স্বদেশের মুখ্য ব্যক্তিগণের অনুপ্রাণনাময় দৃষ্টান্তে প্রণোদিত হইয়া তিনি কলিকাতায় একটা "টীচিং ইউনিভার্সিটির" গোড়া পত্তন করিয়াছেন। তিনি আইন ব্যবসায়ে বাধ্য হইয়া যাওয়ার নিমিত্ত এখন আর অনুতাপ করেন না—কেন না, যদি আইনের ব্যবসায়ী না হইতেন—আর এই সংসারে যেরূপে পদ পদার্থ প্রতিপত্তি জন্মায় তাদৃশ ক্ষমতাশালী না হইতেন, তবে তিনি তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন না। এহ উক্তিতে আত্মগরিমা প্রকটনের ভাব যে টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নাই ধরিলাম। কিন্তু এই বাক্যগুলি ত বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই নহে কি যে, তাঁহার দ্বারাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টা "টীচিং ইউনিভার্সিটি" হইতে চলিয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে রীডার, প্রফেসর, লেক্‌চারার ইত্যাদি নিযুক্ত হইতেছে, এই সকল তাঁহারই কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত, এটাই যেন তিনি লোককে বুঝাইতে চাহিতেছেন। এখন এই বিষয়ে একটু বিচার করিব।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, তখন ইহা একটী পরীক্ষা-সমিতিরূপেই থাকিবে—এরূপ আইন করা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ আইন (একট অব্ ইনকর্পোরেশন) দ্রষ্টব্য। তারপর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কতক সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদের সৃষ্টি করিয়া যান। এই 'টীচিং' আরম্ভ হইল; ১৮৭০ সন হইতে ঠাকুর ল প্রফেসর সন সন নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। তারপর, বোধ হয়, শ্রীগোপাল বসুমল্লিক-প্রবর্ত্তিত 'বেদান্ত লেক্‌চার' ১৮৯৭ সন হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। সরকার বাহাদুর অবশ্য এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন। লর্ড কর্জ্জন যখন গবর্ণর জেনারেল, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করিয়া গড়িবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন্ নিযুক্ত করেন এবং কমিশনের রিপোর্টের ফলে * ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্-

* ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটিজ কমিশনের "টীচিং ইউনিভার্সিটি বিষয়ক রিকমেণ্ডেশন ঐ কমিশনের রিপোর্টের ৬—৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

"There is also a very general desire that the powers in question (i. e. of the Universities) should be enlarged and that all Universities should be recognized as teaching bodies. * * * "We think it expedient that undergraduate students should be left in the main, to the Colleges, but we suggest that the Universities may justify their existence as teaching bodies by making further and better provision for advanced courses of Study. The University may appoint its own lecturers and provide libraries and laboratories; it would also be proper that the University should see that residential quarters are provided for students from a distance." * * * * *

বলা আবশ্যক যে, এই কমিশনে স্যর আশুতোষ ছিলেন না; তবে ইহার কলিকাতার বৈঠকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একজন লোকেল মেম্বরের মত ছিলেন; কিন্তু রিপোর্টের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংশ্রব ছিল না।

সিটিজ একট নং ৮ পাস করেন। সেই আইনের তৃতীয় ধারায় এই আছে :—"—Incorporation and power of the University—The University shall be and shall be deemed to have been, incorporated for the purpose (among others) of making provisions for the instruction of students with powers to appoint University Professors and Lecturers to hold and manage educational endowments, to erect, equip, and maintain University Libraries, laboratories and Museums, to make regulations relating to the residence and conduct of students, and to do all acts consistent with the Act of incorporation and this Act which tend to the promotion of study and research."

এই আইন পাস হইবার পরে আইনের ২৬(২) ধারা মতে সেনেট্ সভার উপরে রেগুলেশন্স্ রচনার ভারার্পণ হয়। তখন স্যর আলেক্‌জাণ্ডার পেড্‌লার ভাইস-চান্‌সেলার ছিলেন। সিনেট সভা প্রথমতঃ এক বৎসর সময় পান, তৎপর আরও ছয় মাস সময় পাইলেও নূতনকল্পে নিয়মাবলী গঠনের গুরুতর কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তখন স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট রেগুলেশন্ গঠনের কাজ আইন অনুসারে নিজ হাতে নিতে বাধ্য হন—তথাপি সিনেট সভাকে তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কাজটী সম্পন্ন করিবার ভার একটী কমিটির হাতে সমর্পণ করেন—সেই কমিটিতে স্যর আশুতোষ প্রেসিডেণ্ট হন—কেন না, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস-চান্‌সেলার ছিলেন। সিনেটের কৃত কার্য্যটী স্যর আশুতোষ ও তদীয় সহযোগিরা মাজিয়া ঘষিয়া সংস্কৃত করিয়া নেন এবং তখন রেগুলেশন্ সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক পাস হয়।

অতএব দেখুন, এই 'টীচিং ইউনিভার্সিটি' গঠনে অথবা যে রেগুলেশন্ দ্বারা ইহা চলিতেছে, তাহাতেও স্যর আশুতোষের হাত কতদূর—এই প্রফেসর ইত্যাদি নিয়োগ করিবার বিধান তাঁহার দ্বারা কতদূর উদ্ভাবিত! স্যর আশুতোষের পরিবর্ত্তে যদি তখন অপর কোনও ইংরেজ বা বাঙ্গালী ভাইস-চান্‌সেলার হইতেন, তথাপি ঐ সকল রেগুলেশন্ প্রায় এ ভাবেই হইত।

তবে স্যর আশুতোষের কর্ত্তৃত্ব কিছু কি ছিল না? অবশ্যই ছিল। এবং ঈপ্সিত বিষয়ে যোগ্যতা সহকারে যিনি কার্য্য করিবেন, গবর্ণমেণ্ট দেখিয়া শুনিয়া তাদৃশ লোকই নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এবিষয়ে মহাকবি কালিদাস দুষ্মন্তের মুখে ঠিকই বলিয়াছেন—

সিধ্যন্তি কর্ম্মসু মহৎস্বপি যন্নিয়োজ্যাঃ
সম্ভাবনা গুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিংবা ভবিষ্য দরুণস্তমসাং বিভেত্তা
তং চেৎ সহস্র কিরণোধুরি না করিষ্যৎ॥

কিন্তু হায়, দুষ্মন্তের বিনয়ৌদার্য্য স্যর আশুতোষে কোথায়? সে যাহা হউক, সেই সময়ের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ স্থাপিত হয়—স্যর রাসবিহারী ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং স্যর আশুতোষ চৌধুরী-প্রমুখ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার পরিচালক হন। স্যর তারকনাথ পালিত তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশ শিক্ষা-পরিষদের হস্তে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তখন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সেই বিত্তটা বিশ্ব বিদ্যালয়ের খাতে আকৃষ্ট করিয়া আনেন। * অপিচ স্যর রাসবিহারীও তাঁহার বদান্যতার স্রোত শিক্ষা পরিষদের প্রত্যাশিত খাতে না বহাইয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের হিতার্থেই প্রবাহিত করিলেন—ইহাতেও স্যর আশুতোষের কিছুটা হাত থাকিবারই কথা। এদিকে পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক কমিয়া পরীক্ষার্থীদের ফিস্ বাড়িল, তখন বাঙ্গালী ভাইস চান্‌সেলার বলিয়াই হয়তো কোনও আন্দোলনই হয় নাই—বিশেষতঃ ছাত্রদের পাসের খুব সুবিধা হওয়াতে লোক সাধারণে ঐ ফিস্ বৃদ্ধি গ্রাহ্য করিল না। সরকার বাহাদুরও তখন স্যর আশুতোষের অধিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষণ যথাসম্ভব করিতে ত্রুটী করেন নাই—এমন কি, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের কোনও কোনও ব্যাপারেও ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়েরই পক্ষ সমর্থন করেন। অবশ্য এ সকল স্যর আশুতোষের খুব শ্লাঘার কথা, সন্দেহ নাই, এবং কর্ম্মকরী শক্তি যে তাঁহার অতুলনীয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে একাদিক্রমে ৮বৎসর ভাইস্-চান্‌সেলার পদে নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহার মনোনীত ও পৃষ্ঠপোষিত সদস্য দ্বারা সিনেট্ ও সিণ্ডিকেট্ প্রভৃতভাবে পরিপূরিত হইবার সুবিধা দিয়া তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাবান্ করিয়া দিয়াছেন। * কিন্তু আসল কথা এই যে, 'টিচিং ইউনিভার্সিটি' করাটা তিনিই যোগাড় যন্ত্র করিয়া ঘটাইয়াছেন, ইহা বলা শোভন হয় নাই—ঐটা সরকারেরই উদ্দিষ্ট বিষয়—তবে তিনি সরকারি কার্য্য বেশ দক্ষভাবেই করিয়াছেন—সেজন্য সরকারও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছেন।

তবে প্রফেসার ইত্যাদি নিয়োগ ব্যাপারে তিনিই কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, এবং তাহাতে সব সময়েই যে যোগ্যতমের নিয়োগ হইয়াছে, সেই কথা বলিতে পারি না। ইতঃপূর্ব্বে অবান্তরভাবে তাহার দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। অনেকে বলেন, প্রফেসর প্রভৃতি পদে অধিকাংশ স্থলেই যে বাঙ্গালীর নিয়োগ হইতেছে—† এটা স্যর আশুতোষেরই কর্ত্তৃত্বের ফল। সে কথাও আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। বরং তাঁহার

* এই ব্যাপারে স্যর নীলরতনেরও কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব ছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

* কিন্তু স্যর আশুতোষ ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব বজায় রাখিতে পারেন নাই। নিজের মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়া "In spite of Government of India" বলিয়া খুব সম্ভব সরকারের কিঞ্চিৎ বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছেন, তাই ইদানীং কোন কোন বিষয়ে সরকারের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ দেখা যাইতেছে।

† ঘোষ ও পালিত প্রফেসরগণ যে ভারতবর্ষের লোক হইবেন, ইহা এণ্ডাউমেণ্ট এর সর্ত্তেই আছে। তবে কেবল 'বাঙ্গালী' নহে—'ভারতবর্ষের যে কোনও প্রদেশের অধিবাসীই হইতে পারেন। এইরূপ সর্ত্তে স্যর আশুতোষের হাত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে "বাঙ্গালী" অন্যান্য প্রদেশবাসীর সঙ্গেই গণ্য হইতেছেন।

ভাইস চ্যান্‌সেলারির সময়ে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিত বা এম-এর ভাগ্যে পড়ে নাই, বেহারী পাণ্ডেয় রামাবতার সাহিত্যাচার্য্যকে আমদানি করা হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা জগদীশ চট্টোপাধ্যায়কে না দিয়া কারমাইকেল প্রফেসরশিপ মারাঠী পণ্ডিত ভাণ্ডারকরকে প্রদান করা হইয়াছে। এবং সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালগিরিও মাদ্রাজের কোনও এক ব্যক্তিকে দিবার প্রস্তাব স্যর আশুতোষের নামে প্রচারিত হইয়াছে। *

এ দিকে, যাহাতে তাঁহার হাত ছিল না, সেই ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক-গিরিতে কয়জন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন? ফলকথা, যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত থাকিলে যোগ্যতম ব্যক্তিরই নির্ব্বাচন হইত।

স্যর আশুতোষ সিনেটের অভিনন্দনের উত্তরে উপসংহারে বলিয়াছেন—"To me it is a source of intense satisfaction that I enjoy the confidence of you all as my colleagues and all my educated countrymen out-side the walls of this house." অর্থাৎ তিনি যে সিনেটে সহযোগিবর্গের ও সিনেটের বাহিরেও শিক্ষিত দেশবাসিগণের বিশ্বাসভাজন আছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে পরম সন্তোষের কথা।

এ বিষয়েও তিনি বোধ হয় ঠিক বলেন নাই। তিনি এখন আর তেমন জনপ্রিয় থাকেন নাই। অবশ্য সিনেট হলের মধ্যে তাঁহার উপরে লোকের ভক্তি বিশ্বাস অব্যাহত থাকিতে পারে—কিন্তু বাহিরে তাঁহার প্রতি সকলেরই যে শ্রদ্ধাভাব আছে, এটা বোধ হয় না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইলেক্‌শনে রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েটরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে ভোট দিয়াছিলেন, এবার সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই—ভোটসংখ্যা অনেক কম দেখা গিয়াছে। মেট্রিকুলেশন্ ও আই-এ ইত্যাদির ফিস্ বৃদ্ধি ব্যাপারে একদিকে যেমন জনসাধারণ আপত্তি করিয়াছে, অপর দিকে গবর্ণমেণ্টও সম্মতি প্রদান করেন নাই, কিন্তু অনেকেরই আবার তাঁহার স্কাউটদের জন্য কিঞ্চিৎ ভীতির ভাবও আছে, এ কথাটা দুঃখের সহিতই বলিতে হইল।

স্যর আশুতোষ চীফ-জাষ্টিসের একটানি পাওয়ায় যে অভিনন্দিত হইতেছেন, তাহার কারণ প্রারম্ভেই বলিয়াছি; ইহাতেই যদি তিনি মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও সমস্ত লোকেরই তিনি শ্রদ্ধাবিশ্বাসের পাত্র, তবে, আমার বোধ হয়, তিনি কিঞ্চিৎ ভ্রান্তির ভাবই পোষণ করিতেছেন।

উপসংহারে পুনশ্চ বলিতেছি, মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অশেষ কার্য্যদক্ষতা ও সুবিমল প্রতিভায় আমরা মুগ্ধ; বিচারক হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি অনবদ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথা এই নব্যভারতেই ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি, এবারও বলিতে হইল। ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। পরন্তু আমাদের 'আল্‌মা মাতর্' বিশ্ববিদ্যালয় মালিন্য লেশশূন্য এবং তাঁহার এক জন প্রকৃষ্ট সন্তান ও সেবক স্যর আশুতোষ অবর্ণসম্পর্করহিত হন, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য, তাই এতাদৃশ অপ্রিয় সত্য কথনে অধ্যবসায়ী হইয়াছি।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

* এ সকলে অনুমান হয়, স্যর আশুতোষ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এক এক ভক্ত সৃষ্টি করিয়া যাইতে চান। ভাণ্ডারকর মহাশয় ত জন্মতিথি উৎসব প্রবর্ত্তিত করিলেন—মাদ্রাজের মহোদয় যদি আসেন, তিনি কি করিবেন, কে জানে?

মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী।

ভাঙ্গিল ধর্ম্মের স্তম্ভ, কাল বজ্র হানি'
"শিবনাথ বিসর্জ্জন" স্তব্ধ ব্রহ্মবাণী.
হায়! বঙ্গ রঙ্গ সাঙ্গ হোল এত দিনে আজ।
শোকাচ্ছন্ন হোল দেশ সমগ্র সমাজ।
নিদারুণ বার্ত্তা, মাগো, পাঠালে ভুবনে,
হারায়ে দুর্লভ রত্ন পুত্র-প্রাণ-ধনে,
বল মা ভারতী দেবি, জন্মিবে তোমার
হেন রত্ন শিরোমণি সন্তান কি আর? ১

নিখিল, যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সনাতন,
দূর ভবিষ্যতে শিরে করিবে বরণ
সেই বিশালতা ব্যাকুলতা এক ধর্ম্ম প্রেমে
উজ্জ্বল করিল দেখ, চরিত্রের হেমে।
ধর্ম্মের বেদীতে করি আত্ম-বলিদান,
বিশ্বহিত সেবাব্রতে কর্ম্মে ঢালি প্রাণ,
মানবে মানবে প্রীতি জাতির কল্যাণে
দেখাল আদর্শ কীর্ত্তি ভারত সন্তানে। ২

বিচ্ছিন্ন দেশের দশা ভাবি অনুক্ষণ
বাঙ্গালীর ভেদাভেদ যত অকারণ
হেরি, স্বজাতি, রমণী দুঃখ করি হায় হায়!
কাঁদিল সতত প্রাণ জননীর ন্যায়।
কত না দুর্জ্জয় বিঘ্ন দুঃখ আজীবন
"কর্ত্তব্য সাধন কিম্বা" শরীর পাতন,
এই দীক্ষা ভিক্ষা মাগি' দেশের ভিতরে
উড়াল ধর্ম্মের ধ্বজা দেশ দেশান্তরে। ৩

সুললিত বঙ্গভাষা স্বভাবের কবি,
নীতি বিদ্যা জ্ঞান শাস্ত্র সাহিত্যের রবি,
আহা! বিনয়ে মণ্ডিতচিত ভাষার নির্ঝর—
কোমল করিল যত পাষাণ অন্তর।
"উদ্যোগী পুরুষসিংহ" তেজস্বী সরল,
উদার চরিত্রবান্ গভীর অটল
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত শক্তি ভক্তি লয়ে—
জন্মেছিল, তব অঙ্কে সুন্দর সময়ে। ৪

হের আজ তাঁর শোকে কাঁদে সর্ব্বদেশ,
শুধু একা হিন্দু নহে জাতি নির্ব্বিশেষ।
রিপু জয়ে আত্মত্যাগে সত্যের প্রচার
পতিত মর্ত্ত্যের আর কে লইবে ভার?
এ উদ্যান শূন্য হায়! ফুরাল সকলি,
সৌরভ গৌরব স্মৃতি, রাখি গুণাবলী
মাহাত্ম্য গরিমা প্রভা, হোল অবসান—
দিগঙ্গনা গাহে শোন হাহাকার গান। ৫

"আর কে দিবে গো অন্যে কুরিয়া আপন
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি প্রেম আলিঙ্গন"—
এক তোমার দেবতা মাগো, বিশ্ব বিধাতার
আর কে পূজিবে বল? অশ্রু অনিদ্রায়।
অমর সে নরলোকে চির বিদ্যমান,
মরণে অমৃত-সুত মহা ভাগ্যবান,
সার্থক মানব জন্ম ধন্য সেই জন—
জননী, দেশের দুঃখ যে ক'রে মোচন। ৬

কাঙাল দুঃখীর ব্যথা বাজিল স্মরণে,
বিগলিত হয় অশ্রু যাদের নয়নে,
ধন্য দুর্লভ সন্তান হেন রত্ন গুণধরে,
ধর মাগো বসুমতি, তোমার জঠরে।
চিরস্থায়ী চিরদিন নহে কিছু ভবে,
জন্মিলে মরিবে ধ্রুব এক দিন সবে,
পূর্ণ হোক ইচ্ছা মাগো কর পুনঃ তুমি
নিখিলের তীর্থ শ্রেষ্ঠ, এ ভারত ভূমি। ৭

হে রুদ্র শ্মশান তুমি ওমা ভাগীরথি-
বিধিদত্ত প্রিয় নিধি যুগ-ধর্ম্ম-রথী,
ওগো, বহু পুণ্য ভাগ্য বলে আজ যা' লভিলে,
অনলে অনিলে জলে, রেখো তারে তুলে।
হে আপন দেশবাসী তোমাদের বলি,
এইরূপে নেতৃবৃন্দ সবে গেল চলি,
এ মিনতি করি শুধু এই স্মৃতি লয়ে-
হও মানুষের মত, তাঁদের স্মরিয়ে।" ৮

যাও তবে 'শিবনাথ' যাও ধর্ম্মগুরু,
রোপিলে বঙ্গের ভূমে তুমি যেই তরু,
ইতিহাস তব গাথা গাবে নিশি দিন,
মরেও অমর তুমি বরে চিরদিন.
আমি, সেই তরুতলে করি অশ্রু বিসর্জ্জন
লও দীন স্নেহাধীন কবির তর্পণ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৺ রায় নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর।

১৮৫২ খ্রীঃ ৮ই মে তারিখে আমাদের পূজনীয় পিতৃদেব চট্টগ্রামের একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বীয় পৈত্রিক পল্লীভবনে আনোয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই দত্ত-পরিবার আন্দাজ ১৬০০ খ্রীঃ হুগলী জেলা হইতে মুসলমান সেনাবাহিনীর সহিত এতদ্দেশে আগমন করেন এবং আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় এই জেলার ভূর্ষি গ্রামে জায়গির প্রাপ্ত হন এবং তদবধি এই দত্ত পরিবার এতদঞ্চলেই থাকিয়া যান। পিতৃদেবের শৈশবশিক্ষার ভার আমাদের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত জুড়ামণি ভট্টাচার্য্যের উপর অর্পিত হয়। এই ক্ষুদ্র বিষয়টী পিতৃদেব বিস্মৃত হন নাই। পরবর্ত্তী কালে জুড়ামণি ঠাকুরের পুত্র ৺ গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যকে তিনি কাশীতে পাঠাইয়া সংস্কৃতে সমুচ্চ উপাধি পরীক্ষা পর্য্যন্ত গুরুপুত্রের কাশীর সমগ্র ব্যয়ভার আনন্দে বহন করেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব কলিকাতায় পাঠার্থে প্রেরিত হন। পিতৃদেব সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং নিজ পিতার নিকট হইতে যথেষ্ট মাসিক বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও ছাত্রনিবাসস্থ অপরাপর ছাত্রবন্ধুদের ন্যায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করিতেন এবং নিজের অন্যান্য ব্যয় ভার নিজেই বহন করিতে যত্নশীল হইতেন। মেডিক্যাল কলেজের দারুণ পরিশ্রমের পর দিনান্তে পটলডাঙ্গা হইতে পদব্রজে যোড়াসাঁকো যাইয়া কোন ভদ্র পরিবারে শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন। দুর্ব্বলতাবশতঃ একদিন পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তৎপর রাত্রে বাসায় আসিয়া আবার পাঠে মন দিতেন। একটী প্যাকিং বাক্স তাঁহার টেবিলের কার্য্য করিত। কয়েকটী মোটা পাঠ্য পুস্তক বালিস, ও একটী মাদুর বিছানারূপে ব্যবহৃত হইত। নিদ্রা জয় করিবার জন্য কখন কখন চক্ষে নস্য দিতেন। দিবসে কোন কোন দিন শব-ব্যবচ্ছেদ করিবার সুবিধা না পাইলে গভীর রাত্রিতে একাকী একটী ক্ষুদ্র কুপি লইয়া সেই সর্ব্বসাধারণের ভীতিপ্রদ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে যাইতেন এবং জমাটবাঁধা অন্ধকার ঘরটীতে প্রবেশ করতঃ কুপিখানি জ্বালাইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত একাধিক শবের মধ্যে বসিয়া এই ক্ষীণকায় অথচ দৃঢ়চিত্ত বাঙ্গালী বালক নির্ভয়ে নিজের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার এই দৃঢ় ও নির্ভীকচিত্ততার কথা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই নির্ভীক দৃঢ়চিত্ততা তাঁহার সারা জীবনের সাথী ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি অশ্বারোহণে পটু হইয়াছিলেন এবং যদিও কতবার কতস্থানে বিপন্ন এবং আহত হইয়াছেন, তবুও প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত তিনি তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে অবাধে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘটনাবহুল জীবনে কত বিপদ আপদ, কত পাপ প্রলোভন আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার এই নির্ভয় গৌরবমণ্ডিত দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মনিষ্ঠা তাঁহাকে সমস্ত পরীক্ষা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই ছাত্রজীবনেই পিতৃদেব আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের সহিত

পরিচিত হন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বীয় পুণ্য-প্রতিভায় তখনকার যুবকবৃন্দের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। পিতৃদেবও আচার্য্যের প্রতিভামুগ্ধ হন। আচার্য্যের বক্তৃতাবলী শুনিয়া যুবক বন্ধুদের ভিতর এই সব ভাব প্রচার করিবার মানসে "মোহন-মেলা" নামক সম্মিলনীতে নিজেই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই খবর পাইয়া স্বয়ং দুই তিন দিন উপস্থিত হইয়া বিশেষ প্রীত হন এবং এই বালকটীকে ডাকাইয়া পরিচয় গ্রহণ করেন এবং তাহাকে "young missionary of Chittagong" বলিয়া অভিহিত করেন। এই উপাধিটী নিতান্ত অসমীচীন হয় নাই, কারণ পিতৃদেব ছুটীতে বাড়ী আসিলে খুল্লতাত মহাশয়দের ও অন্যান্য বন্ধুদের লইয়া জামালখাঁয় একটী কুটীরে স্বয়ং বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন ও স্বীয় পিতৃদেবের পরিত্যক্ত একটী চোগাচাপ-কান্ পরিয়া অনর্গল বক্তৃতা করিতেন।

ক্রমে ছাত্রজীবনের অন্তে অস্ত্রচিকিৎসায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তিনি মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু চিত্ত দৃঢ় হইলে কি হইবে, এই দৃঢ়চিত্তের তাড়নায় শরীর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন সরকারী কার্য্য পাইবার জন্য আবেদন করেন, তখন Medical Board তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া, তিনি সরকারী কার্য্যের অনুপযুক্ত, এই মত প্রকাশ করেন; শুধু তাহাই নহে, তাঁহার পরমায়ুকাল যে ছয় মাসের ঊর্দ্ধ নহে, তাহাও বলিয়া দেন। জানিনা কয়টী যুবক এইরূপ মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য্য জানিয়াও অটলচিত্ত থাকিতে পারে। পিতৃদেব কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, একটী কুলিযাত্রী জাহাজে কার্য্য গ্রহণ করিয়া Mauritius দ্বীপে যান এবং এই সমুদ্র-যাত্রার ফলে লুপ্ত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতঃ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সরকারী কার্য্য প্রার্থী হন এবং এইবার কৃতকার্য্য হন। কিছুদিন চট্টগ্রাম জেল হাঁসপাতালে কার্য্য করিয়া উড়িষ্যার ঢেন্‌কানাল প্রদেশে বদলী হন। উড়িষ্যা প্রদেশ তখন ঘন জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। পথে এক রাত্রিতে একটী ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। পাল্কী-বাহকেরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে, তিনি পাল্কীর ভিতরে বসিয়া দরজা দুটী কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন এবং সেই ব্যাঘ্রটীর তর্জ্জন গর্জ্জন ও নানাবিধ আস্ফালনের মধ্যেও অপরিসীম স্থৈর্য্যের সহিত সারা-রাত্রি কাটাইয়া দেন। সূর্য্যোদয় হইলে ব্যাঘ্রটী চলিয়া যায়।

১৮৭৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময়ে তিনি আলমোড়া প্রদেশে বদলী হন এবং তথায় নিজগুণে তৃতীয় গুর্খা পলটনের প্রধান Medical Officer নিযুক্ত হন। আলমোড়া যাইবার কিছু পূর্ব্বে পিতৃদেবের বিবাহ হয়। এবার মাতৃদেবী তাঁহার অনুগমন করেন। তখন মাতৃদেবীর বয়স ১৩ বৎসর। এই সময় হইতে মাতৃদেবী দেশে বিদেশে, রোগে শোকে, অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত আজীবন পিতৃদেবের সাহচর্য্য করিয়াছেন। জীবনান্তেও এই সাহচর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কারণ দেখিতে পাই যে, জীবন ও মরণের মধ্যে অবস্থিত সীমাহীন সীমার পরপারে চলিয়া যাইবার প্রাক্কালে মাতৃদেবী তাঁহার আসন্ন মৃত্যু ও মৃত্যুদিন নির্দ্দেশ করিয়া কয়েকটী কথা বলেন। তখন বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বাবাকে যত্ন করিও, তিনিও কিছুদিন পরে চলিয়া যাইবেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি বেশীদিন থাকিতে পারিব না। আমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব এবং তোমাদের নিত্য রক্ষা করিব।"

আলমোড়া হইতে নৈনীতাল ও তৎপর অযোধ্যা জেলার সীতাপুরে পিতৃদেব বদলী হইয়া যান। এইস্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হন। তৎপর লাহোর, কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ, রায়বেরিলী, শাহাবাদ ইত্যাদি বহু স্থানে কার্য্য করতঃ ত্রিহুত প্রদেশে দ্বারভাঙ্গা জেলায় মহারাজা বাহাদুরের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বস্তুতঃ এইখানেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের পূর্ণ প্রসার ঘটে। সর্ব্বসাধারণের নিকট চিকিৎসায় ধন্বন্তরী বলিয়া পরিচিত হন, এবং অস্ত্র চিকিৎসায় অসামান্য খ্যাতিলাভ করেন। যদিও দ্বারভাঙ্গা জেলার হেড কোয়ার্টারস লাহেরিয়া সরাইতে একজন সাহেব সিবিল সার্জ্জন থাকিতেন, তত্রাচ planter সাহেব ও মেমমহল পিতৃদেবের প্রায় একচাটিয়া ছিল। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার চিকিৎসায় ও ব্যবহারে এতদূর প্রীত ছিলেন যে, মহারাণীদের—যাঁহাদের স্বয়ং সূর্য্যদেবও চক্ষে দেখিতে পাইতেন না—তাঁহাদের চিকিৎসার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন, মধ্যবিত্ত পরিবারে অনাটন দেখিলে টাকা লইতেন না, এবং এমন করুণামাখা ভাষা ও নম্র মধুরভাবে ঐ টাকা ফিরাইয়া দিতেন যে, গৃহকর্ত্তা কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া যাইতেন। অন্যদিকে তাঁহার নিম্নতন চিকিৎসক মহাশয়েরা যাহাতে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। অনেক সময় রোগ শক্ত না হইলে নিজে না যাইয়া তাঁহাদের কাহাকেও লইয়া যাইতে বলিতেন। আবার ভগবৎ কৃপায় তাঁহার এত প্রচুর উপার্জ্জন হইত যে, নিজে যথেষ্ট ভোগ করিয়াও যথেষ্ট দান ও অতিথি সেবা করিতেন। গৃহ দাসদাসী ও গাড়ী ঘোড়ায় পূর্ণ ছিল, এবং অভ্যাগত প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রই নবীন ডাক্তারের বাড়ীতে সাগ্রহে স্থান পাইতেন এবং এক এক সময় অতিথির ভিড় লাগিয়া যাইত।

পিতৃদেবের প্রৌঢ় ও শেষ বয়সে আমরা তাঁহার অতি গম্ভীর মূর্ত্তিটী দেখিয়াছি। কিন্তু তখন তিনি মহা সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। মহারাজা বাহাদুরের প্রধান ওস্তাদদ্বয় আজ-গার আলী খাঁ ও মোরাদ আলী খাঁ তাঁহাকে সেতার শোনাইতেন ও শিখাইতেন। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় পিতৃদেবের বৈঠকখানায় বন্ধু-বান্ধবেরা সম্মিলিত হইতেন এবং অনেক সময়েই গীতবাদ্য ও নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদে গৃহটী মুখরিত হইত। আমাদের বাগানে একটী ব্যায়ামের আখড়া ছিল। তাহাতে পাড়ার বালক ও যুবকেরা ব্যায়াম শিক্ষা করিত। সেই সুদূর বিহার প্রদেশে একটা বাঙ্গালা স্কুল ছিল। পিতৃদেব তাঁহার সম্পাদক ছিলেন। অপর দিকে বাঙ্গালী যুবকবৃন্দদের লইয়া এমেচিয়ার থিয়েটার পার্টি করিয়াছিলেন, এবং থিয়েটার, সার্কাস, যাত্রা-পার্টি যাহাই দ্বারভাঙ্গায় আসিত, পিতৃদেব তাহাদের সকল বন্দোবস্ত করিবার প্রধান ভার গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এখানে কাহারও নিকট অবিদিত নাই, কিন্তু চট্টগ্রামবাসী অস্তগামী সূর্য্যের প্রতিভাটুকু দেখিয়াছেন মাত্র। দ্বারভাঙ্গায় প্রতি বৎসর রাজ-স্কুলের পুরস্কার বিতরণ হইত। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং ও বিস্তর রাজকর্ম্মচারী এবং

অপরাপর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত হইতেন। পিতৃদেবের ছাত্রদিগের প্রতি অভিভাষণ প্রধান অঙ্গ স্বরূপ ছিল, বহুদূর হইতে এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোক উপস্থিত হইত। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের তিরোধানের পর বর্ত্তমান মহারাজা সিংহাসন অধিরোহণ করেন। মহারাজা পিতৃদেবকে অধিরোহণ দরবারে একটী সময়োচিত বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। পিতৃদেব স্বীকৃত হন এবং বক্তৃতান্তে তদানীন্তন লাট সাহেব বেদিকা হইতে অবতরণ করতঃ পিতার করমর্দ্দন করিয়া বলেন যে, তিনি অনেক ডাক্তার দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সুবক্তা ডাক্তার আর দেখেন নাই। পিতৃদেব দ্বারভাঙ্গায় প্রায় ১৬ বৎসর ছিলেন। এই খানেই তাঁহার তৃতীয় চতুর্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পিতৃদেব সুচিকিৎসক বলিয়া অসামান্য খ্যাতিলাভ করেন। তিনি অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেন। কত রাত্রে তিনি কোন মুমূর্ষু রোগীর কথা ভাবিয়া নিদ্রা যান নাই। বার বার উঠিয়া হাঁসপাতালে লোক পাঠাইয়া ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে ঔষধপত্রাদি দেওয়া হইতেছে কিনা, খবর লইতেন। তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে দুইটী ঘটনা বিবৃত করিব। একবার একটী লোককে বন্য শূকর এমন ভাবে আহত করিয়াছিল যে, তাহার উদর ফাটিয়া Spleen বাহির হইয়া পড়ে। বহু দূর হইতে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া আসে। তখন তাহার প্রায় অন্তিম অবস্থা। পিতৃদেব উপায়ান্তর না দেখিয়া অতি দক্ষতার সহিত তাহার Spleenটী একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া দেন, এবং এমন যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন যে, লোকটী বাঁচিয়া উঠে।

আর একবার কোন বড় জমিদারের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি সেই জমিদারের পল্লীভবনে যান। গিয়া দেখেন যে, জমিদারটীর মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি শ্মশানে নীত হইয়াছেন। পিতৃদেব বলিলেন যে, আমি যখন আসিয়াছি, একবার দেখিয়া যাইব। কারণ হয় ত ঐ জমিদারটীর মৃত্যু সম্বন্ধে মহারাজা বাহাদুর ও Government রিপোর্ট চাহিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত আপত্তি উঠে, কারণ তাহারা ব্রাহ্মণের মৃতদেহ স্পর্শ করিতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই বিষয় লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয় এবং কোন কোন সভাপণ্ডিত পিতৃদেবকে ম্লেচ্ছ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পিতৃদেব বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্মশানে চলিয়া যান এবং একটু দূরে বসিয়া গভীরভাবে শবটীকে দর্শন করিয়া বলিলেন যে, দেহে প্রাণ এখনও বর্ত্তমান এবং তিনি চিকিৎসা করিবেন। এই প্রস্তাবে পুনরায় অনেক গণ্ডগোল উঠে, কিন্তু পিতৃদেব নিরস্ত না হইয়া নিজে ও সঙ্গীয় চাকরটীর সাহায্যে দেহটীকে শ্মশানের কালী মন্দিরের বারাণ্ডায় তুলিলেন। কালীবাড়ীর ঘরটীতে তালাবন্ধ ছিল। চাবিটী কিছুতেই পাওয়া গেল না। গণ্ডগোল ও জনতা বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া পিতৃদেব বলিলেন যে, তাহারা যদি কোন রূপ বাধা জন্মায়, তবে তিনি সরকার বাহাদুরকে জানাইবেন যে, জমিদারটীকে খুন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সকলেই চলিয়া যায়। ঐ শ্মশানে বসিয়া পিতৃদেব ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। অনেক ভগ্ন প্রদর্শন করিয়া একটী তাঁবু ও কয়েকটী বাঁশের চাটাই সংগ্রহ করিলেন। তাঁবুটী নিজের জন্য খাড়া করিয়া লইলেন এবং

মন্দিরের বারাণ্ডার এক অংশ চাটাই দিয়া ঘিরিয়া জমিদারের মৃতপ্রায় দেহটীকে সযত্নে রক্ষা করিলেন। এইভাবে তিনি শুধু কর্ত্তব্যের প্রেরণায় সব বাধা বিঘ্ন সবলে চূর্ণ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। জমিদার বাড়ীর একটী বৃদ্ধ ভৃত্য গোপনে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। কারণ মৃত দেহ ঘরে লওয়া যায় না। সেই শ্মশানেই চিকিৎসা চলিল, কিন্তু তৎপরদিন ভয়ানক মেঘ করিয়া ঝড় উঠিবার উপক্রম করিলে পিতৃদেব মন্দিরের দরজা ভাঙ্গিয়া রোগীকে ভিতরে নিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে বহুতর লোক ও গ্রাম্য মাতব্বর বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন ডাক্তারের দ্বারা ধর্ম্মের ও লোকাচারের অবমাননা করা হইতেছে মনে করিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এই বিপদের মধ্যেও পিতার হৃদয় তাঁহার এই অসহায় রোগীর মঙ্গলের জন্য সাহসে উচ্ছ্বসিত হইল এবং একটী কুঠার হস্তে সকলের সম্মুখীন হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ মন্দির দুয়ারে কুঠারাঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দৃপ্ত রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও বাধা দিতে সাহস হইল না। অতি সাবধানে রোগীকে মন্দিরের ভিতরে লইলেন এবং যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বা চতুর্থ দিবসে ধীরে ধীরে রোগীর চেতনা সঞ্চার হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর এক নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, জমিদারের দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। ক্রোধে অন্ধ হইয়া বহুতর লোক প্রেতাত্মা ও ডাক্তারকে বধ করিবার নিমিত্ত লাঠি ও বর্ষা সহ শ্মশানের দিকে ধাবমান হইবার উপক্রম করিলে পিতৃদেব মধুবাণীর সব্‌ডিভিসনাল অফিসারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সবডিভিসনাল অফিসার অবিলম্বে পুলিশ সহ আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমনে আক্রমণকারীরা পলায়ন করিল। এই ভাবে আরও দুই তিন দিন গত হইলে জমিদার মহাশয় তাঁহার লুপ্তচেতনা ও পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন। এবং তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা বহিতে লাগিল। পিতৃদেব তাঁহাকে নানা প্রকারে শান্ত করিলেন এবং সুচিকিৎসায় তাঁহার রুগ্ন দেহে বল সঞ্চার করিতে লাগিলেন। পরে শুভদিনে জমিদার মহাশয় বৃহৎ শোভাযাত্রা করিয়া শ্মশান হইতে নিজালয়ে ফিরিয়া গেলেন।

দ্বারভাঙ্গা হইতে পিতৃদেব শিবপুরে বদ্‌লি হইয়া যান। এখানে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং ভগবদ্ কৃপায় যদিও তিনি রোগমুক্ত হন, কিন্তু সেই হইতে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সদানন্দভাব আর সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া পান নাই।

শিবপুরের পর বঙ্গদেশের দু একটী জেলায় কার্য্য করিয়া অবশেষে ছোটনাগপুরের পলামৌ জিলায় বদ্‌লি হন। তখন বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের জেল সমূহের jail stomatites রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য ছিল। এই রোগের কোন সুচিকিৎসা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে ছিল না, বহুদিন হইতে এই রোগটী scurvy জাতীয় রোগ বিশেষ বলিয়া সেই ভাবে চিকিৎসিত হইতেছিল। পরে Major Buchanan ইহাকে ম্যালেরিয়া-সম্ভূত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। পিতৃদেব যে সময়ে প্যালামৌ জেলার ভার গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গদেশের মধ্যে এই জেল সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিচিত ছিল

এবং এই জেলে jail stomatitis রোগের বিশেষ প্রাবল্য ছিল। পিতৃদেব অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া এই রোগের একটী নূতন চিকিৎসা-প্রণালী উদ্ভাবন করেন ও আশাতীত ফললাভ করায় পুরাতন মতগুলি খণ্ডন করিয়া ক্ষুদ্র একটী পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং জেলের খাদ্যাদির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। এই পুস্তিকা সম্বন্ধে Major Buchanan এর মত উদ্ধৃত করিতেছি—

"I am very pleased with your paper on Stomatitis and shall be glad to publish it in the Gazette. I am inclined to your view and am not one of those who think that every case of spongy gum is scurvy and I agree that no amount of anti-scorbutic treatment will cure it. I went into the question in my little manual of jail hygiene but now am not inclined to believe in a malarial element. I congratulate you in the health of the jail and you will find yourself mentioned specially in the administration report just going into Government."

এই রোগ ১৯০২ সালে ৬৬ জনের হইয়াছিল। পিতৃদেবের চিকিৎসার ফলে ১৯০৩ সালে মাত্র ১ জনের হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে জেলের ইনস্পেক্টর জেনারলের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু প্রশংসা লাভ করেন।

"I have asked Dr. Dutt to publish his experiments and conclusions in the Indian Medical Gazette for the benefit of medical officers of other jails. Dr. Dutt has made a special study of the dicting of the prisoners and the admirable care and attention he has given to both the prevention and the treatment of the disease has its natural reward. I have to thank Dr. Dutt again for the great improvements in this jail which is one of the best managed in the province." Major Macnamara লিখিয়াছিলেন—

"The health of the jail is excellent there being nobody in hospital and no death for the last two years. This is a great change from what it once was a notoriously unhealthy jail. The present medical officer Dr. Dutt must be credited with having found out the cause of the sickness and mortality. The department is under a deep debt of gratitude to Dr. Dutt for what he has done. I have already mentioned the great improvements in health and the measures taken for economy in expenditure that have been introduced by the Superintendent Dr. N. C. Dutt. In these respects this jail is a model."

পালামৌ হইতে পুনরায় বঙ্গদেশে বদ্‌লি হন। এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ তিনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণের পর পিতৃদেব অধিকাংশ সময় বাড়ীতেই থাকিতেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্নদেহ সত্ত্বেও সকল কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। স্থানীয় Medical Association, ছাত্র সমিতি ও সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। নববিধান-বিশ্বাসী সমিতির চট্টগ্রাম অধিবেশনে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং একবার চট্টল ধর্ম্মমণ্ডলীর সভাপতি হইয়াছিলেন। সমগ্র দেশে যখন সৈন্য সংগ্রহের সাড়া পড়িয়া যায়, পিতৃদেব চট্টগ্রামে সৈন্য সংগ্রহের কার্য্যে বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। চট্টগ্রামে বহুতর সভাসমিতিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যাত্রামোহন-টাউনহলের দ্বার উদ্ঘাটন তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। এই ঘটনায় তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ গুণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মনিষ্ঠা তাঁহাতে এত প্রবল ছিল যে,কোনরূপ নীচতা তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিত না। লিপ্সা বা পরশ্রীকাতরতার লেশ মাত্রও তাঁহাতে ছিল না। কয়েকটী স্থানীয় ভদ্রলোক পিতৃদেবকে যাত্রামোহন-টাউনহলের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করিলে রোগক্লিষ্ট দেহ লইয়াও তিনি ঐ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অপর কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন যে, যাত্রামোহন বাবু আপনার সম্বন্ধে ভাল ভাব পোষণ করিতেন না। এমন কি, অনেকের নিকট আপনার নিন্দা করিয়াছেন। পিতৃদেব অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদের বলেন যে, যদি আমায় নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু স্বর্গীয় যাত্রামোহন বাবু যে দেশের একজন পূজ্য ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার নামে এই দ্বারোদ্ঘাটন ব্যাপারে আহূত হওয়ায় সুখী হইয়াছি। আপনারা সকলেই জানেন যে, ঐ সভাতে স্বর্গীয় যাত্রামোহন বাবুর কথা বলিতে গিয়া পিতৃদেব অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে পিতৃদেব শয্যা গ্রহণ করেন এবং ১৯২০ খ্রীঃ ২৭এ এপ্রিল সূর্য্যাস্তের সময় দেহমুক্ত হইয়া অমরধামে গমন করেন। দেহ-মুক্তির প্রায় মাসাধিক পূর্ব্বে জনৈক পরমহংস মহারাজ পিতৃদেবকে দেখিতে আসিয়া বলেন যে, যে কারণ বশতঃ আপনি এতদিন কষ্টভোগ করিতেছিলেন,তাহা এখন অপসৃত হইয়াছে। এখন আপনার পরম শান্তির সময় এবং পরম শান্তির সহিত আপনি চলিয়া যাইবেন। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার শরীরে আর কোনই রোগ-যন্ত্রণা ছিল না। দেখিয়াই মনে হইত যেন বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,ভাল আছি এবং দিবসের অধিকাংশ সময় গভীর ভাবের ঘোরে থাকিতেন। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিলে হাত তুলিয়া অসম্মতি জানাইতেন। মনে হইত যেন তাঁহার এই ভাবাবস্থা এতটুকু ভঙ্গ হয়, তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। এই ভাবেই তিনি ধীরে ধীরে পরম শান্তির সহিত পরমপদ লাভ করেন। শ্রীশ্রীভগবান নিজ অপার কৃপাগুণে তাঁহার মুক্ত আত্মাকে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করুন।

পিতৃদেবের জীবনে সাধু মহাত্মাদের প্রভাব বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়াছি। এবং মনে হয়, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।

জীবনের পূর্ব্বাহ্ণে পিতৃদেব যখন আলমোরায় বাস করিতেছিলেন, তখন একটী মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করেন। পিতৃদেব একটী অত্যন্ত তেজস্বী অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রকৃতি সংশোধন

করিতে পারিতেছিলেন না। একদিন সন্ধ্যার সময় বারাণ্ডায় বসিয়া ঐ অশ্বটীর কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ধীরে ধীরে ঐ মহাত্মাটী পর্ব্বতারোহণ করিয়া উপরে আসিলেন এবং বলিলেন, তুমি অশ্বের কথা ভাবিতেছ, আমি উহার প্রকৃতি ঠিক করিয়া দিতেছি,ইহা বলিয়া তিনি অশ্বটীর মস্তক হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত তাঁহার মঙ্গল হস্তখানি বুলাইয়া দেন। সেই হইতে অশ্বটী সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া যায়। বহুদিন পরে আলমোরা ত্যাগের সময় পিতৃদেব ঐ অশ্বটীর পৃষ্ঠে পর্ব্বতাবরোহণ করিতেছিলেন। হঠাৎ অশ্বটীর গতি রোধ হয় এবং কষাঘাত সত্ত্বেও তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করিতে সক্ষম হইলেন না। এমনি সময় পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতচূড়া হইতে ঐ মহাত্মাটী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, অশ্বটীকে মারিও না। আমি উহার গতিরোধ করিয়াছি। কারণ তোমার সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে। ঐ স্থানে উঁহাদের অনেক কথাবার্ত্তা হয়।

দ্বারভাঙ্গায় আর একটী মহাত্মার দর্শন লাভ করেন। তিনিও দু'এক দিন রাত্রিকালে আমাদের বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। ঘরে ঢুকিলেন না। বাগানে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। কিছুদিন পরে পিতৃদেব বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কোন একটী ষ্টেশনের একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়াছিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হন এবং জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মাটী হাসিয়া বলিলেন, আমি জানিতে পারিলাম তুমি এই স্থান দিয়া যাইবে। তাই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম।

বিশুদ্ধানন্দ স্বামী,ভাস্করানন্দ স্বামী,ত্রৈলঙ্গ স্বামী, সাধু অঘোরনাথ, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কল্‌নেল্ অল্‌কট্ এবং অন্যান্য মহাত্মা যাঁহাদের বিষয় আমরা বিশেষ কিছু জানি না, তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

রাঙ্গামাটীতে একদিন সন্ধ্যার সময় একটী পূর্ব্বপরিচিত মহাত্মা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন। পিতৃদেব অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁহাকে ঘরে আসিতে আহ্বান করিলে তিনি অস্বীকৃত হন এবং মুক্ত অম্বরতলে বসিয়া উভয়ে অনেক আলাপাদি হয়। আমি নিকটেই একটী ঘরে ছিলাম। শুনিতে পাইলাম, তাঁহারা যোগের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন, এবং মহাত্মাটী নানারূপ আসন-প্রণালী দেখাইয়া দিতেছেন।

পিতৃদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমার পিতামহ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। হিন্দু পরিবারে পিতৃদেবের জন্ম হয়। কিন্তু ছাত্রজীবনে পিতৃদেব আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃই জ্ঞানপ্রধান ছিল, তাই আচার্য্য-প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। বিশ্বপ্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত তত্ত্বরাশি জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তত্ত্বান্বেষী হইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববিদ্যা সমিতিতে (Theosophical Society) যোগদান করিলেন এবং তাঁহার কয়েকজন সমভাবাপন্ন বন্ধু জানেন যে, তিনি তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ে কত প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী স্বতন্ত্র উপাসনার ঘর ছিল। তিনি সেখানে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া নিষ্ঠার সহিত উপাসনায় বসিতেন। শেষ জীবনে অক্ষম হইলে একখানি আরাম-

কেদারায় বসিয়া যুক্ত হস্ত দুখানি বক্ষের উপর রাখিয়া গভীর উপাসনা ও ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। উপাসনা শব্দের যথার্থ অর্থ নিকটে বসা। পিতৃদেব উপাসনাকে ঐ অর্থেই বুঝিতেন, তাই তিনি সজন উপাসনা, এমন কি,কীর্ত্তনাদিরও তত পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহাদের প্রয়োজনীয়তা তিনি বেশ বুঝিতেন, তবুও আমাদের বলিতেন, "অত কথা বলিও না, স্থিরভাবে নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান কর।" পিতৃদেব প্রতিমা পূজারও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেন। একবার কোন বারোয়ারী কালীপূজায় তিনি চাঁদা দেওয়ায় মাতৃদেবী বলেন, "আপনি ত ওসব মানেন না, তবে চাঁদা দেন কেন?" পিতৃদেব উত্তর করিলেন, "আমি নিজে প্রতিমা উপাসনা করি না, কিন্তু ঐরূপ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বুঝি এবং যাঁহারা ঐরূপ পূজাপ্রণালীর সহায়ে ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে প্রয়াসী হইতেছেন,তাঁহাদের সাহায্য করা উচিত বিবেচনা করিতেছি।" ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যেমন নির্জ্জন সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার জীবনে ধর্ম্মকার্য্যও তেমনি নীরবে সম্পন্ন হইত। দুঃখী দরিদ্রদিগকে দান করা তাঁহার জীবনে আর একটী বিশেষ ব্যাপার ছিল। কিন্তু তাহাও নীরবে অনুষ্ঠিত হইত। শীতের সময়ে গোপনে র‍্যাপারের নীচে কম্বল লইয়া সন্ধ্যার সময়ে পথে বাহির হইতেন এবং অন্ধ আতুর দেখিলে পশ্চাৎ হইতে তাহাদের দেহে ঐ কম্বলটী জড়াইয়া দিতেন। একবার জনৈক প্রতিবেশীকে ডাকিয়া বলেন যে, "দেখ, বড় শীত পড়িয়াছে; অমুকের শীতবস্ত্র নাই, তুমি দুইখানি কম্বল উহাকে দিয়া আইস।" তৎপর দিন প্রাতে ঐ প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, কাল আমার বড় শীত করিয়াছে, আমি পাকা বাড়ীতে থাকি, তবু এত শীত; ঐ কম্বল দু'খানিতে উহার শীত নিশ্চয় ভাঙ্গে নাই। এই টাকা নাও; একটী লেপ করাইয়া তাহাকে আজই দিয়া আইস।" এইরূপ প্রাণভরা নীরব দান তাঁহার যে কত ছিল, তাহা বলা যায় না।

একদিকে এত নীরবতার পক্ষপাতী,কিন্তু অপর দিকে কর্ম্মজীবনে অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন। বহু পূর্ব্বে কোন একটী non-regulation প্রদেশে কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গিয়া দেখেন, জনৈক রাজাও সাহেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা বসিয়া আছেন। পিতৃদেব কার্ডখানি পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিলম্ব হইতে থাকায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং সাহেবকে শুনাইয়া চাপরাশীকে বলিলেন যে, তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারেন না। সাহেব ইহা শুনিয়া পিতৃদেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং অত্যন্ত উষ্ণভাবে তর্জ্জনীসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "তুমি জান ঐ লোকটী একজন রাজা; সে দুই ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিতেছে, তুমি এমন কে যে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই গণ্ডগোল লাগাইয়া দিয়াছ?" পিতৃদেব গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'আমি রাজা নহি, আমি চিকিৎসক; আমার সময়ের মূল্য অনেক, আমার এক একটী মুহূর্ত্তের উপর এক একটী রোগীর জীবন নির্ভর করিতেছে।" সাহেব এই নির্ভীক উত্তরের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া চুপ করিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ সদালাপ করিয়া পিতৃদেবকে বিদায় দিলেন।

একবার তিনি অসুস্থ হইয়া বিদায়ের আবেদন করেন। নিকটবর্ত্তী অপর একজন সাহেব সিভিল সার্জ্জন বিরুদ্ধভাবে রিপোর্ট

করায় গভর্ণমেণ্ট ছুটি দিতে অস্বীকার করেন এবং পিতৃদেবকে Medical Boardএ উপস্থিত হইতে হুকুম দেন। পিতৃদেব ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াও Medical Boardএ হাজির হন এবং পরে বিদায় লাভ করিয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া যান। ঐ স্থানে থাকিয়া একটু সুস্থ বোধ করিলে তিনি চাকুরী ইস্তফা দেন। তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর তখন দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন। তিনি চাকুরী-ত্যাগ পত্রখানি পাইয়া ডাকাইয়া পাঠান এবং ফিরাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করেন। পিতৃদেব বলিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পুনরায় চাকুরী গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। পরে লাটবাহাদুরের অনুরোধে ও উন্নত পদ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ইস্তফা পত্রখানি ফিরাইয়া লইলেন।

তিনি কখনও মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ অবনত করিয়া কাহাকেও সেলাম করেন নাই। আমাদেরও তিনি বার বার বলিতেন যে, গাম্ভীর্য্য ও নম্র মধুরতার সহিত হস্তোত্তোলন করিয়া অভিবাদন করিবে, মস্তক অবনত করিবে না। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার আজীবন উৎসাহ ছিল। বিধবা বিবাহ দেওয়া, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা আলোচনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। শেষ জীবনে জীর্ণ শরীর লইয়া ডাক্তারের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও তিনি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গুপ্তের কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা শুনিয়া মহোল্লাসে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য বিপিন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পিতৃদেবের জীবন এতই ঘটনাবহুল যে, তাহা বিবৃত করা সম্ভব নহে। সমস্ত বিষয় আমরা ভাল করিয়া জ্ঞাতও নহি। আজ তাঁহার এই শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার জীবন-উদ্যানের দুই চারিটী পুষ্প সংগ্রহ করিয়া অর্ঘ্য-স্বরূপ তাঁহারই শ্রীচরণে নিবেদন করি।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আজ সকলেই আমাদের কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করুন যেন তিনি সকল অসত্য হইতে সত্যেতে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বপিতার চির শান্তিময় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করুন।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি হরি ওঁ। *

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ দত্ত।

* আমার পরম পূজ্যপাদ স্বর্গগত জ্যেষ্ঠতাত মহোদয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান কর্ত্তৃক পঠিত।—জীবেন্দ্রকুমার।

স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

[১৩২১ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ চট্টগ্রাম শাখা-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে কবিবরের সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায় পঠিত।]

অমরা-প্রবাসী ওহে কবীন্দ্র নবীন,
হইল বছর ছয়
গিয়েছ অমরালয়
প্রদীপ্ত গৌরব-দীপ্ত পতাকা উড্ডীন
করিয়া পশ্চাতে তব ; যাহার প্রভায়
আসমুদ্র হিমালয়,
বিশেষতঃ বঙ্গালয়
কবিকুঞ্জ রঙ্গালয় গৌরবে খেলায়।

কহিব গৌরবে আজি তোমারি ভাষায়—
'ধন্য আশা কুহকিনী'
ধন্য বঙ্গ গৌরবিনী,
"আলোকিত" চিরতরে পূর্ণেন্দু আভায়।

যেহেতু তোমারি আশা, তব প্রতিভায়
'বঙ্গ ইতিহাস খনি'
ছিল অমা নিশীথিনী—
'আলোকিত' চিরতরে পূর্ণেন্দু আভায়।

যে পথে কদাপি কোন কবি বিচরণ
করেনি,' সাহস ভরে
স্বেচ্ছায় সে পথ ধ'রে
অভিনব কাব্যরাজ্য করেছ স্থাপন।

পেতেছ বাণীর নব্য রম্য সিংহাসন,
তোমারি প্রতিভা জ্যোতিঃ
স্থির সৌদামিনী ভাতি
সে রাজ্য প্রবেশ দ্বারে 'আলোকভবন'।

স্বীয় পুণ্যবলে ভেদি তিমিরাবরণ
'অবিদ্ধরতন' যত
করিয়াছ সমবেত,
সুসূত্রে গেঁথেছ মালা ভুবনমোহন—

পারিজাত পরাজিত সৌরভ-সম্ভারে—
সকল কবির আগে
ভক্তি শ্রদ্ধা অনুরাগে
'দোলায়েছ মাতৃভাষা কম কলেবরে'।

'সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে'—
'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র'
'প্রভাস' 'পলাশিক্ষেত্র'
'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' সুধা বিতরণে।

'ভানুমতী', 'রঙ্গমতী', 'খ্রীষ্ট' অলঙ্কারে,
গীতার, চণ্ডীর স্রোতে
কাব্যকুন্দ শতে শতে
'বরবপুঃ সাজাইতে' ষোড়শোপচারে।

তুষিতে ভাষার তৃষা, কবিত্ব সুধায়
ঢালিয়াছ রসনায়,
অমর করেছ তায়,
'লভিয়াছ অমরতা এ মর ধরায়'।

বঙ্গকাব্যারণ্যে তুমি যে রম্য উদ্যান
বাণীর বিশিষ্ট বরে
গিয়েছ সৃজন ক'রে,
কাব্যের সাগরে ইথে ডাকিয়াছে বান।

বাণীর বিচিত্র রাজ্যে ছুটেছে তুফান ;
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর
বঙ্গভাষা কলেবর
সাহিত্য সরিৎ স্রোত বহিবে উজান।

ধর্ম্মের জগতে তুমি নও কনীয়ান্—
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা,
মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা
নখ দর্পণের মত তব অনুধ্যান।

বুদ্ধের নির্ব্বাণে তুমি ছিলে আস্থাবান ;
মহাভারতের নীতি,
শ্রীরামের যশোগীতি
আদর্শ তোমার ছিল যীশু পুণ্যবান।

ধর্ম্মরাজ্যে, কাব্যরাজ্যে তোমার সমান
তুলনা নাহিক আর
তব প্রেম প্রতিভার,
অনন্ত প্রেমের রাজ্যে তোমার সম্মান।

র‍্যাফেল্, রবির চিত্র তুচ্ছ অকিঞ্চন ;
শব্দশিল্পী কবিবর,
তব সম চিত্রকর
কাব্যের মন্দির শোভা করেছে কজন ?

'যাহার যেমন দান তথা প্রতিদান'
'বীজ অনুরূপ ফল
কর্ম্মক্ষেত্রে' অবিরল
তোমারি লেখনী বলে,—তুমিই প্রমাণ

প্রস্তর প্রতিমা তব নাহি চট্টলায়,
তাহে খেদ নাহি কোন,
কীর্ত্তি তব নহে ঊন ;
প্রস্তর মূরতি মূক,—কহিতে না পায়।

অদ্বিতীয় কাব্য তব। প্রতিভা তাহার
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম
ভূভারত যুড়ে দীপ্ত।
কীর্ত্তিস্তম্ভ এর বেশী কি আছে আবার?

অনন্ত অমৃত স্রাবী কাব্যের ভাণ্ডার
রাখিয়ে গিয়েছ যাহা
কস্মিন কালেও তাহা
ফুরাবে না,—স্থায়ী রত্ন বাণী অর্চ্চনার।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ।

অত্যাচারীর প্রতি।

কে আছ পাষণ্ড কোথা
দুর্ব্বলে করিতে দলন?
জেনো আমি আছি সেথা
তোমারে করিতে দমন॥ ১
কামান বন্দুক আসি
দাগিবে বুকেতে আমার?
দাগো তুমি—ফিরে যাবে—
আঘাত লাগিবে তোমার!! ২
আমার মানস-পুত্র
উঠিবে সৈন্য লক্ষ লক্ষ—
অমর সাহসী পটু
সেনানী বীর যুদ্ধে দক্ষ॥ ৩
হুহুঙ্কারে ছুটে গিয়ে
করিবে ছিন্ন তব পক্ষ।
সবেগে ঘেরিবে তোমা'
বধিবে চিরি' তব বক্ষ॥ ৪

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংগ্রাম কথা
শুনেছ নিশ্চয়—তাহা
সত্য—ধ্রুবতারা ঐ যথা॥ ৫
আমারো এ সত্য কথা—
দেখে নিও—হবে না মিথ্যা—
অত্যাচার-যজ্ঞে উঠে
অত্যাচারী বধিতে কৃত্যা॥ ৬
এখনো বলিছি—ছাড়
আঘাত দুর্ব্বলের পরে।
পশু মন্ত্র ছেড়ে দাও
মনুষ্যত্ব বরণ ক'রে॥ ৭
উঠে পড়—খাড়া হও—
নিজ শুভ কর্ম্মের বলে;
ভগবানে চিত্ত রেখে,
অমঙ্গল চরণে দ'লে॥ ৮

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্গণিকা।

(৮)

কল্পনা এক জিনিষ, প্রত্যক্ষানুভূতি অন্য জিনিষ। আমরা এই ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিরা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেই অধিক ভালবাসি। প্রচারক এদেশে অনেক, কিন্তু প্রচারিত এদেশে কই দেখা যায়? ইহা কর, তাহা কর, সকলেই বলেন, কিন্তু নিজেরা কেহ কিছু করে না। আমাদের মনে হয়,

বক্তৃতা কিছু দিন বন্ধ রাখিয়া জীবন-গঠনের চেষ্টা করা উচিত। এক্ষেত্রে অন্যে কি করে, না করে, সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়া উচিত। তুমি বা সে, সত্য আচরণ করে কি না, তাহার বিচার না করিয়া আমি কেন সত্য আচরণ করি না? আত্মোৎকর্ষ সাধনায় যদি সকলে বদ্ধপরিকর হন, তবে কল্পনার রাজ্য সংকীর্ণ হইয়া যায়। বন্ধু, এস, তুমি ও আমি তাহাই করি।

(৯)

অন্ন-সমস্যা এদেশের বিষম সমস্যা। যে দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে বাঁচিয়া থাকাই যেন কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কি দিয়া কি করিব, কোন্ উপায় ধরিয়া সকলকে প্রতিপালন করিবে, সকলের মুখেই এই এক কথা। সকলের মুখই মলিন ও বিষণ্ণ। ঘোরতর দিন যেন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অন্নচিন্তাপেক্ষাও ধর্ম্মচিন্তা অত্যাবশ্যক। আমরা যদি মানুষ হইতাম, তবে এদেশের অভাব অনেক কমিয়া যাইত। আমরা যদি মানুষ হইতাম, অপব্যয় অনেক কমিয়া যাইত। পরন্তু আমরা যদি মানুষ হইতাম, চা চুরুটে যে ব্যয় হয়, তার উপর মদ্যপান বা বিলাসিতায় যে ব্যয় হয়, সে সব কমিয়া যাইত। এদেশের প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৩০৲, তার উপর এই অপব্যয়; কাজেই দেশ দৈন্যে ক্রমেই ডুবিয়া যাইতেছে। হিতৈষিগণের এই অপব্যয় নিবারণ-কল্পে কোন চেষ্টা নাই, কোন প্রতিজ্ঞা নাই। একদিন এদেশে মদ্যপান নিবারণের জন্য কত চেষ্টা হইয়াছিল, ৺প্যারীচরণ সরকার, ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ কাল এদিকে আর কাহারও দৃষ্টি নাই। হায়, সেদিন কাঁসারিপাড়ার মোড়ে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, কত ভদ্রলোক গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মদের দোকানে প্রবেশ করিতেছেন! দেখিয়া প্রাণটা অস্থির হইল, চক্ষে জল পড়িল। দেশে হাহাকার, কিন্তু এদেশের অপব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে! দেশের আশা কোথায়?

(১০)

চতুর্দ্দিক হইতে অনাহারের সংবাদ নিত্য পৌঁছিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক অনশন-ক্লিষ্ট, কিন্তু সেদিকে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না, অথচ বিবাহ ইত্যাদিতে নাচ গান, বাদ্য বাজনায় কত টাকা উড়িয়া যাইতেছে। সকলের যদি প্রাণে মমতা থাকিত, এ দুর্দ্দিন এদেশে উপস্থিত হইত না। আশে পাশের লোকের কষ্ট যদি আশে পাশের লোকেরা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন, এরূপ হাহাকার অনেক কমিয়া যাইত। দেশের জনসাধারণ এ সম্বন্ধে উদাসীন, মধ্যবর্ত্তী লোক উদাসীন, শিক্ষিত শ্রেণী উদাসীন, নেতৃবর্গ উদাসীন। দেশের আশা বল ত কোথায়?

(১১)

রাজনীতির আলোচনা একটা জুয়া খেলার ন্যায়—ইহার নেশায় একবার যিনি পড়েন, তিনি আর ফিরিতে পারেন না; পদ ও গৌরব লালসা তাঁহাদের শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া যায়। রাজনীতির চর্চ্চা ছাড়িয়া দেশের উন্নতির জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইলে, বুঝি বা দেশটা এত হতশ্রী হইত না। পরস্পরের উন্নতির জন্য আমরা সকলে চেষ্টা করি না কেন? কে তাহাতে বাধা

দেয়? আমাদের কাজ যদি আমরা করি, তবে দেশের গতি ফিরে নাকি? এদেশের রাজনীতির সভাগুলি দেশোন্নতির সভায় পরিণত হউক না কেন?

(১২)

তাহা হওয়ার প্রধান অন্তরায়—তাহাতে সম্মান ও গৌরব নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ, কেশবচন্দ্র কি কম গৌরবের পাত্র? ভারত-সংস্কারক সভার ন্যায় এদেশে অসংখ্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয় না কেন? শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, সমাজ-সংস্কারক সভা দ্বারা এদেশকে ছাইয়া ফেলুন। নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন ভিন্ন এদেশ কিছুতেই জাগিতে পারে না। গান্ধী এ সম্বন্ধে অগ্রসর হউন না কেন?

(১৩)

আমাদের বড় দুঃখ, এদেশে বক্তা আছে, শ্রোতা নাই, কেহ কাজ করিতে চাহে না; নেতা আছে, নীত হইতে কেহ চাহে না; বাক্‌চাতুর্য্য আছে, কর্ম্মপটু লোক নাই। যত কিছু অকল্যাণ, এই জন্যই এদেশে হইতেছে। আবেদন নিবেদন করিয়াই আমরা ঘুমাইয়া পড়ি, এদেশের অসংখ্য লোক না খাইয়া মরিয়া যায়, চিকিৎসাভাবে প্রাণ হারায়, শিক্ষার অভাবে আঁধারে ডুবিয়া যায়! হায় হায়, এদেশের উদ্ধারের উপায় কি?

(১৪)

ভাল কথা মনে পড়িয়াছে.—উদাসীনতা এদেশে এত বাড়তেছে কেন, পরনিন্দাই বা এত চলিতেছে কেন? একজন চরমপন্থী লোকের সহিত একদিন সাক্ষাৎ হইলে তিনি মডারেট দলের কয়েকজন লোকের খুব প্রশংসা ও মহত্ত্বের কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলাম। বাস্তবিক অন্যের মহত্ত্ব ঘোষণাতেই আনন্দ। পরস্পরের মহত্ত্ব দেখিতে শিখিলেই ভারতের মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাহা হয় কই? অনেকেই পরনিন্দাব্রত গ্রহণ করিয়া উদাসীনতায় ঘুমাইয়া পড়েন। সকল দলের লোকে যদি কর্ম্মপন্থী হইতেন, তবে এরূপ কখনও হইত না। যাঁহারা কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, অন্যের নিন্দা করিতে তাঁহারা অবসর পান না। কবে আমরা শুধু কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইব!!

(১৫)

ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ওডায়ার লিখিয়াছেন যে, ষ্টেট্ সেক্রেটারী মণ্টেগু সাহেব পঞ্জাব ব্যাপারের সকলই জানিতেন, কারণ সকলই তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। এদিকে জেনেরেল ডায়ার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতেছেন। দুই পক্ষেই অসংখ্য লোক আছেন। মহাত্মা মণ্টেগু এবং ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যগণ বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছেন। যদিও কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাহার মীমাংসা অল্পেই হইয়া যাইবে। দুই চারিটী কথা এদিক ওদিক করিয়া বলিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, মণ্টেগু সাহেবটী বড় সোজা ব্যক্তি নন্। তাঁহার ভারত-সংস্কার আইনেই তাহার নিদর্শন। লোলাকাটি হাতে দিয়া তিনি লোক ভুলাইতে পারিতেছেন, ইহা কি কর্ম্ম-ক্ষমতার পরিচয়?

(১৬)

এই বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান শতাব্দীর নেতা কে? অনেকেই বলিয়া থাকেন, উকীল ব্যারিষ্টারগণই এদেশের নেতৃস্থানীয়—সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁহারাই অধিক চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। এদেশের সমাজ-সংস্কারের নেতা বিদ্যাসাগর উকীল ব্যারিষ্টার নহেন, রাজনীতির নেতা কৃষ্ণদাস পাল উকীল বা ব্যারিষ্টার নহেন, ধর্ম্মসংস্কারক কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ কোন উকীল বা ব্যারিষ্টার ছিলেন না, আর সাহিত্য-সম্রাট ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, দীনবন্ধু প্রভৃতিও উকীল বা ব্যারিষ্টার ছিলেন না। মাইকেল এবং হেমচন্দ্র ব্যারিষ্টার এবং উকীল ছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উকীল বা ব্যারিষ্টার নহেন। গিরিশচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার, গোবিন্দদাস, যোগীন্দ্রনাথ উকীল বা ব্যারিষ্টার নহেন। ধরিতে গেলে উকীল ব্যারিষ্টারগণ অপেক্ষা অন্যান্য ব্যক্তিরাই এদেশের প্রকৃত উপকার বেশী করিয়াছেন। তবে জাতীয় সভা সমিতিতে উকীল ব্যারিষ্টারগণই অধিক কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। তাহার কারণ, অন্যান্য লোকদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা কিছু বেশী। নূতন রিফরমড্ কাউন্সিলে তাঁহারা নেতৃত্ব করিবেন, নানা কারণে আমাদের ইহা মনে হয়। এখানে উকীল ব্যারিষ্টারগণেরই প্রাধান্য হইবে।

(১৭)

আবার বলি, ওডায়ারের মন্তব্যের জন্য মণ্টেগু সাহেব কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু এ অসুবিধা কিছুই নয়। অল্পেই কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুগে কিছুতেই কিছু হইবে না—যত অন্যায় কার্য্য করুক না, পরিপোষকতার গুণে সকলেই নিষ্কৃতি পাইবে। এখন আর ইংলণ্ডের পূর্ব্বের মহত্ত্ব নাই—ইংলণ্ডের এই পতনের অবস্থায় যিনি কিছু আশা করেন, তিনিই ভ্রান্ত। আর তাহাতে মঙ্গল বা কি হইবে? তাহাতে ভিক্ষা বৃত্তিই অধিক পরিস্ফুট হইবে। আমরা বলি, এখনও, সময় থাকিতে থাকিতে ভারত নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইতে চেষ্টা করুন। আবেদন নিবেদনে কেহই বড় হয় নাই, কেহই হইবে না। তাঁহারা ত স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই আসিয়াছেন। স্বার্থের কুহকেই আছেন, স্বার্থের মায়াতেই থাকিবেন। স্বার্থ গেলে আর থাকিবেন কেন? সেই স্বার্থ যাহাতে যায়, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া তাহা সাধন কর। সাধনায় যখন সিদ্ধি পাইবে, তখন তোমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

(১৮)

মানুষ খুন করায় সাহসের পরিচয় নাই, মানুষের প্রকৃত সাহসের পরিচয় আত্ম-জয়ে। আত্মজয়ে যে সিদ্ধ, এই জগৎ তাহার পদানত। নৈতিক বল ভিন্ন একালে আর কোন বলের জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। এই ভারতে নৈতিক বলের জাগরণের জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন, নচেৎ কিছুতেই কিছু হইবে না। নেপোলিয়ন, কাইজার, জার প্রভৃতির পতন দেখিয়াও মানুষ সতর্ক হয় না, ইহাই দুঃখ। সেকালের রামরাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এই নৈতিক বলেরই জয় ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু তাহা মানুষ অনুসরণ করে না, এই যা কষ্ট।

রিপু বাল দিয়াই খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য জগতের রাজা। এই কথাটী নিত্য-স্মরণ্য।

(১৯)

কাল আদমি খুন করিয়া কয়জন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি শাস্তি পাইয়াছেন, তাহার তালিকা সংগ্রহ করা একান্ত উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা কি মানুষ মনে করে? যাঁহারা শ্বেতাঙ্গ রমণীদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তই দেখ। মেমেরা বাঙ্গালীর বধূ হইয়াও, কিছু দিন পর এই দেশ ছাড়িয়া বিলাতে যাইয়া সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়ার অছিলায় বাস করিতেছেন! এ দেশের বায়ু কুবায়ু, এদেশের সমাজ কুসমাজ, এ দেশের লোক কুলোক; —এ দেশের সকল কাজ কুকাজ। ইহার মধ্যে তাঁহারা থাকিতে পারেন না, থাকিতে চাহেন না। এদেশের লোকদিগকে তাঁহারা পশুর ন্যায় মনে করেন। পশুবলিতে কাহারও শাস্তি হইবে, আশা করা বৃথা। জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের অভিনয় সর্ব্বদা সর্ব্ব দেশে হইতেছে, চোখ মেলিয়া দেখ, উৎকর্ণ হইয়া শুন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৭। প্রদোষ-সংবাদ। একটী শিশুর ক্ষুদ্র জীবন-কাহিনী। সুন্দর কাহিনী। পাঠে মর্ম্মস্পর্শ করিল, নয়নে অশ্রু ঝরিল।

৮। উত্তরবেদ ও পরমাপদ। শ্রীকুসুমদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়-বিবৃত, মূল্য ১৲। গ্রন্থকার বলেন, "বেদের মন্ত্র আকর্ষণ, বেদান্তের মন্ত্র বিকর্ষণ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে মানুষের স্থান দেবতারও উপরে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, বেদান্তের যুগ হইতে সে ক্রমশঃ পশুর স্তরে নামিয়া আসিতেছে— আপনার ইচ্ছা-শক্তির পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া ও মায়ার হাত এড়াইতে যাইয়া সে 'মায়ার' হাতের পুতুলই হইয়া বসিতেছে। উত্তর বেদ আবার বৈদিক মন্ত্র আকর্ষণের দিকে তাহারা ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা। যাহাতে আবার মানুষ বিশ্ব-শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া বসিতে পারে—অমোঘ ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া আপনার অঙ্গুলি সঙ্কেতে বিশ্ব চালিত করিতে পারে,— তাহার কথাই উত্তর বেদ।"

সুচিন্তিত ধর্ম্মভাব-মূলক নিবন্ধ। কিন্তু মূল্য বড় বেশী। ৭২ পৃষ্ঠা পুস্তকের মূল্য ১৲, বড় অধিক বলিয়া মনে হইল।

৯। সচ্চিদানন্দ নিয়মামৃত। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, উকীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে কি কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, তাহার সুন্দর বিবৃতি। ইহারও মূল্য বেশী বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পুস্তকখানি অমৃতের খনি,—পুণ্য প্রবাহ। পড়িয়া সুখী হইলাম।

১০। পুণ্যপুঁথি। অমিয় ধারা— প্রথম পঞ্চদশ দিবসের ভাববাণী। মূল্য ৵ কাপড়ে বাঁধাই ৷৷০।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সাধক যে সকল উপদেশ ও আদেশ দিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা। এক একটী কথা অমূল্য—তাহার ব্যাখ্যাও সুন্দর। মানব জীবন এই সকল উপদেশ অনুসারে গঠিত হইলে মানুষ দেবতা হইতে পারে। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? শুনিলেই বা জীবনে তাহা কে প্রতিফলিত করে? প্রতিফলিত যদি হইত, তবে ধরা স্বর্গ হইয়া যাইত। তাহা হয় না বলিয়াই যা দুঃখ। ধর্ম্মের উপদেশ যত শুনা যায়, ততই ভাল। এই পুস্তক প্রচার দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী মহাশয় দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আত্মোৎসর্গ।

এই জীবন মঙ্গলময় বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এই জীবনই সমুদয় মঙ্গলের আকর, আনন্দ ও শান্তির অনন্ত প্রস্রবন। এই জীবনযোগেই বিশ্বের সকল শোভা-সৌন্দর্য্য, সঙ্গীতমাধুর্য্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তত্ত্ব-রহস্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। এই জীবনেই অগবানের চির আবির্ভাব। তাঁকে সেজন্য ঋষিগণ প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকলের সারথি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই জীবন এক মহা তপস্যা। কঠোর কর্ত্তব্যদ্বারাই জীবন গঠিত। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ত্তব্য লইয়া আসে। সকল প্রকার সুখ-স্পৃহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যসাধনদ্বারা জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। এই জীবন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের চির সংগ্রাম-ক্ষেত্র। শ্রেয়ের পথ অমৃতত্বের পথ; প্রেয়ের পথ মৃত্যুর প্রশস্ত-দ্বারে লইয়া যায়। আপাত-সুখকর মৃত্যুর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া চির আনন্দপ্রদ মঙ্গলকে বরণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হয়। এই পরীক্ষাক্ষেত্রে মঙ্গলকে বরণ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ। সদা সচেতন বিবেক, সতত সতর্ক দৃষ্টি, শক্তিসাধনা, বুদ্ধির বিকাশসাধন, উদার-হৃদয় সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, ভগবদার্চ্চনা, দুর্ব্বলতা-জ্ঞানের মধ্যদিয়া ভগবজ্জীবনের আত্মহারা মহাভাব—এই সকলই তপস্যার অঙ্গ।

জীবনের তপস্যাদ্বারাই জীবন লাভ হয়। জীবন চিরবর্দ্ধনশীল, চিরবিকাশময়। ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে। অনেক শক্তির আধাররূপে ভগবান এই জীবন আমাদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। এই শক্তির পরিচালনাদ্বারা তাহাদিগকে বিকশিত করিবার কঠোর কর্ত্তব্যও সেই সঙ্গে তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এই জীবনকে কুটাইবার জন্য প্রকৃতির নিয়ম, রাজবিধি, পিতামাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীর প্রেম ভালবাসার পরিবেষ্টনের মধ্যে জীবন-বিধাতা উহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। এই সকল সম্পর্ক-জনিত কর্ত্তব্য জীবনের শক্তিবিকাশরূপ মহাকর্ত্তব্যের সাধন। এই সকল কর্ত্তব্য পালন দ্বারা জীবনের শক্তি বিকশিত হয়, আর জীবন নব নব সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে।

সমুদয় শক্তিই পরিচালনদ্বারা বিকশিত হয়। বাহিরের অবস্থা এই বিকাশের অনুকূল হইতে পারে—কিন্তু, আভ্যন্তরীন শক্তি আপনার স্বতঃ পরিচালনাদ্বারাই বিকশিত হয়। বাগানের মালী পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহকে বৃক্ষের বৃদ্ধির অনুকূল করিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রিয়াদ্বারাই বীজ গাছে পরিণত, বৃক্ষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ফল ফুলে, পূর্ণতার সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে।

আমাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হৃদয়, ফুস্‌ফুস, ও স্নায়ুমণ্ডলী—এই সকল লইয়া এই দেহ, মন, হৃদয়, ইচ্ছাশক্তি, প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি; আদি কারণ, মহান্ পরমেশ্বরকে

জানিবার ও তাঁহার অর্চ্চনা প্রার্থনা করিবার শক্তি—এই সমস্ত লইয়া মানব জীবন। এই সকলকে যথাযথভাবে পরিচালনাদ্বারা বিকশিত করিলেই মানব-জীবন বিকশিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যেকই অন্যের সঙ্গে জড়িত। ইহাদের একটী ছাড়িয়া অন্যদের সম্যক্ বিকাশ সাধিত হয় না। এই জন্য অনুশীলনের অর্থ মানব-প্রকৃতির সমঞ্জসীভূত বিকাশ।

দেহ ও মন।

দেহ ও মনের মধ্যে এক গভীর সম্বন্ধ আছে। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের উন্নতি সাধিত হয়। দেহের স্বাস্থ্যের উপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও পরিণতি ভিন্ন আমাদের এই জীবনে মানসিক ক্রিয়া ও পরিণতি সম্ভব নয়! এজন্য দেহকে মানসিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। মানসিক ক্রিয়া, চিন্তা, আনন্দ ও প্রফুল্লতা, হৃদয়ের উদারতা, স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি ও ইচ্ছার প্রবল শক্তি ও নৈতিক জীবন বদন মণ্ডলে ও নয়নদ্বয়ে একটা লাবণ্য, শ্রীসৌন্দর্য্য, উজ্জ্বলতা, একটা বিস্ফূরণ, বিস্তৃতি, ও গঠন-সৌষ্ঠব আনয়ন করে।

সংযম।

সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধন জন্য সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। সংযমের অর্থ শক্তি-সঞ্চয়,—অপচয়-নিবারণ; সংযমের অর্থ উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের স্বতঃস্ফূরণ; সংযমের অর্থ জীবনের পূর্ণতা ও পূর্ণতার সৌন্দর্য্যময়, সৌরভময়, সঙ্গীতময়, আত্ম-প্রকাশ। প্রবৃত্তির অভ্যন্তরেই নিবৃত্তির বা উচ্চ জীবনের সংযম-বিধি নিহিত আছে। এই বিধির পশ্চাতে অনন্ত ক্রিয়াশীলতা ও জীবনের আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তিপ্রভাবে সংযম-বিধি প্রবৃত্তিসমূহকে সুসংযত, সুসম্বদ্ধ করিয়া রাখে। সুসংযত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রবৃত্তি অমর জীবন দ্বারা পরিচালিত হইয়া অমরত্ব লাভ করে। এই সংযম-বিধি-বিকশিত না হইলে প্রবৃত্তি আপনার উচ্ছৃঙ্খল ক্রিয়ায় মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তির দ্বৈতগতির অর্থ আত্ম-হত্যা। এই জন্য প্রবৃত্তিসমূহকে সর্ব্বপ্রযত্নে সুসংযতভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন।

ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তি শরীর রক্ষা ও শরীর পোষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য প্রতিমুহূর্ত্ত দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক সংযোগে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, সে উত্তাপ দেহের পেশীসমূহের ক্ষয় সাধন করে। এই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য অন্নের প্রয়োজন। ক্ষয়জনিত যে বেদনা, তাহারই নাম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। ক্ষুধা তৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনদ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করা হয়। শরীরের যে পদার্থের ক্ষয় সাধিত হইয়াছে, অন্ন দ্বারা তাহাই পূরণ করিতে হয়। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য দ্রব্য আহার করিলে শরীর আপন ধর্ম্মে তাহা গ্রহণ করিবে না এবং দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। ইহাতে শরীরের অনেক শক্তির অপচয় হইয়া যায়। এইজন্য শরীরের প্রয়োজনানুসারে আহার নিদ্রা করিতে হইবে; অথবা শরীরের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইবে।

নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক ধর্ম্ম। উহারাও শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শরীরের প্রয়োজন সাধন কিম্বা অন্য প্রকারের

নিত্য নৈমিত্তিক বা শরীরের ক্ষয় সাধন করিলে শরীরের পক্ষে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। নিদ্রাযোগে শরীর বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করে। শরীরের প্রয়োজনাতিরিক্ত নিদ্রা জড়ত্ব-বিধায়ক। উহা দ্বারা শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ দিবা-নিদ্রাকে ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন; কারণ দিবা-নিদ্রাকে শরীরের শ্রান্তি বা অবসাদ-জনিত বলিয়া মনে করা যায় না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রি কালে শরীরের অবসাদ উৎপন্ন হয়। এই জন্য রাত্রিকালই নিদ্রার সময়। রাত্রি-কালেও অতি নিদ্রা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। বালকদিগের পক্ষে আট ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। অধিক বয়স্কদের পক্ষে ৬ ঘণ্টা কি ৭ ঘণ্টার অধিক নিদ্রায় অতিবাহিত করা উচিত নয়। অতি নিদ্রা যেমন জড়ত্ব-বিধায়ক বলিয়া দূষণীয়;—অনিদ্রা বা অল্প নিদ্রাও শরীর ও মন উভয়ের অনিষ্টের কারণ। তাহাতে শরীর ও মনের অবসন্নতা দূর হয় না, এজন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আর জাগিয়া থাকিলেই দুর্ব্বল শরীরে কোন না কোন কাজ করিতে হয়, তাহাতে আরও শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; আর দুর্ব্বল মন অবসন্নভাবে চিন্তা করিয়া আরও দুর্ব্বল হয়, এবং এই অসম্বদ্ধ চিন্তার অর্থই দুশ্চিন্তা; এবং দুশ্চিন্তা কুভাব ও কুপ্রবৃত্তির জননীস্বরূপ। তাহা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল অত্যধিক উত্তেজিত হইয়া উঠে ও বিনাশের পথে নীত হয়। এই জন্য নিদ্রা প্রভৃতিকে শারীর ধর্ম্মদ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে।

যৌবনকে বিষমকাল বলা হইয়াছে। যৌবনের ভরানদীপূর্ণ জীবনের প্রবাহে দুকূল ছাপিয়া চলিয়াছে। উহা আপনার মধ্যে আপনাকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না; উহার তরঙ্গায়িত পূর্ণতা আপনাকে বিতরণ করিবার জন্য তরঙ্গ-ভঙ্গিতে ছুটিয়াছে; সম্মুখে সকল বাধা বিঘ্ন স্রোতোবেগে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহাকে সংযম-বিধির বন্ধন দ্বারা নিয়মিত করিতে না পারিলে, গৃহ জনপদ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সর্ব্বত্র ধ্বংস-মূর্ত্তিতে মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্তৃত করিবে। আর যদি তাহাকে সুসংযত রাখা যায়, তবে তাহার আনন্দ-সঙ্গীতে আকাশ পূর্ণ হবে, তাহার পূর্ণ জীবনের আনন্দময় প্রবাহ নূতন সৃষ্টি, নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবে, এবং চারিদিকে ফল, ফুল, অন্ন বিতরণ করিবে, কত গ্রাম নগরকে শস্যশালী ও পণ্য সম্ভার পূর্ণ করিয়া সর্ব্বত্র মঙ্গলের আকররূপে সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিবে। জীবনের পথে বাধা বিঘ্ন দূর করিবার উদ্দাম প্রয়াসকে ক্রোধ বলা যায়, এবং সকলকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বত্র আপনাকে প্রসারিত করিয়া যে আনন্দ, তাহাকে কাম বলা যায়। এই কাম ক্রোধ জীবন রক্ষা ও জীবনের সম্প্রসারণ জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জীবনের এই সম্প্রসারণ-প্রবৃত্তি হইতে পরিবারের সৃষ্টি, সমাজের গঠন, রাজনীতি রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্ভব, সকল প্রকার মানব-হিতৈষণা ও আত্ম ত্যাগের মহিমাময় আবির্ভাব। জীবনের সম্প্রসারণ ধর্ম্মদ্বারা যদি এই কাম ক্রোধকে সুসংযত রাখা হয়, জীবন-গতির স্থির প্রবাহে বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্যময় সঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র আনন্দ-রস বিতরণ করিবে ও আনন্দময় বিশ্বপ্রাণে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া ধন্য হইবে।

জ্ঞান-লিপ্সা, দয়া, স্নেহ, প্রেম ভক্তি

প্রভৃতি প্রবৃত্তি সমূহ মানবকে উচ্চ ও মহৎ করে। জ্ঞান-লিপ্সা কাপুরুষকে সকল রহস্যে প্রবেশ করিবার অধিকার দেয়। উহা হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, দর্শনের সৃষ্টি। দয়া দীন দুঃখীর সঙ্গে সমবেদনায় হৃদয়কে পূর্ণ করে; দয়াপ্রভাবে যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য, শোক তাপ, সে সকলই হৃদয় আপনার করিয়া লয়। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা জীবনকে সুখময় করিয়া তোলে; গৃহ পরিবার সমাজকে স্বর্গে পরিণত করে। তাহাদের অভাবে সংসার মরুভূমি ও জীবন শ্মশান তুল্য। স্নেহ হৃদয়কে কনিষ্ঠের মধ্যে ঢালিয়া দেয়; প্রেম সকলকে আলিঙ্গন করে, ভক্তি হৃদয়কে পুণ্যের পদে মহত্ত্বের পদে নত করিয়া রাখে। সৌন্দর্য্যানুরাগ কত স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি সুকুমার কলা-শিল্প সৃষ্টি করিয়া জীবনে আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি কাব্য অমর আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া স্বর্গীয় আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করে। বুদ্ধমূর্ত্তি সংযম-শান্তির অমর মূর্ত্তি; উহা প্রাণে শান্তির অমৃতধারা প্রবাহিত করে। প্রস্তর-লিখিত প্রেমের অমর কাব্য সেই সৌন্দর্য্যের অমর মূর্ত্তি তাজমহল প্রাণে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করে। সন্তানবক্ষে মাতৃ-মূর্ত্তি মাতৃত্বের আত্ম-হারা ভাবের মধ্য দিয়া অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপী মানব জীবনের রহস্য প্রকাশিত করিয়া প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব আত্মহারা ভাব ফুটাইয়া তোলে। ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। উহা প্রেম ভালবাসাকে অনন্ত রহস্যে পূর্ণ করে, ও স্বর্গের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে; এবং তাহাদের মধ্যে অনন্তের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। উহা সকল কলা-শিল্পের প্রাণ। ইহা ভিন্ন প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতির স্ফুরণ হয় না, এবং অমর-জীবনের আভাসে শিল্প অমর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয় না। ভক্তি সকল প্রবৃত্তির নিয়ামক। উহা সকল প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া তাহাদিগকে বিশ্ব-দেবতার পূজার উপকরণ-রূপে পরিণত করে। ভক্তির জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন, উহাই ভগবৎ-জীবন।

এই সকল প্রবৃত্তিসমূহ আপন আপন স্রোতে মানবকে ভাসাইয়া নিতে চায়। এজন্য তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এ সময় মানব মনে বিবেক জাগ্রত হয়। বিবেক এখানে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা হিতাহিত বা ন্যায়ান্যায় কিম্বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক। বিবেক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্তিসমূহের কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেয়; এইরূপে ক্রমে নৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা-সমূহ নৈতিক সূত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। এই সকল নৈতিকমন্ত্র অনুসরণ করিয়া জীবন চালাইলে নৈতিক জীবন লাভ করা যায়।

জীবনে নূতন সংগ্রাম আরম্ভ হয়—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সংগ্রাম; উচ্চবৃত্তি ও নিম্নবৃত্তির সংগ্রাম। শ্রেয়ের পথ অমর জীবনের পথ; প্রেয়ের পথ মৃত্যুর পথ। শ্রেয়ের পথ অনুসরণ করিলে অমৃতত্ব লাভ করিয়া মানব ধন্য হয়। এই সংগ্রামই জীবন; উহা চিরন্তন; উহা ক্রমে মানবকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যায়। উচ্চতা হইতে আরও উচ্চতায়, মহত্ত্ব হইতে মহত্ত্বে, আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শে মানব ক্রমে, উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই উন্নতির পথে মানব চিরকালই অগ্রসর হইতে থাকে। এই অগ্রসর হওয়া বা ঊর্দ্ধ গতিই মানবের স্বভাব; এইখানেই স্বধর্ম্ম লাভ, স্বভাবে স্থিতি। এই গতির অর্থই

শান্তি ও স্থিতি। এইখানেই মানবের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়; স্বাধীনতার অর্থ মানব প্রকৃতির স্বধর্ম্মে-স্থিতি—স্বনিয়মে আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

অধীনতা এই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রসূতি। যে নিয়ম বা ধর্ম্ম হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে এবং যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানব-প্রকৃতি আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া স্বাধীনতা-সুখসম্ভোগ করে, তাহা পিতামাতার চরিত্র, পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খলা, নিয়ম পদ্ধতি, বহুপ্রচলিত বহুকালের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত ভাব ধারণা ও অনুষ্ঠান, রাজবিধি ও রাজ্য শৃঙ্খলায় আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে। এই সকল বাহিরের নিয়মের পশ্চাতে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তির অধীনতার অর্থ হৃদয়ের ধর্ম্ম বা নিয়মের বহির্বে ষ্টনে স্থিতি ও বিকাশ লাভ। এই শক্তির অধীনতা হৃদয়ের ধর্ম্মনীতি বিবেক ফুটাইয়া তুলিয়া সকলকে প্রকৃত স্বাধীনতারূপ দেবত্বের গৌরব প্রদান করে। এই অধীনতার ভিতর দিয়া বিবেককে জাগ্রত করিয়া হৃদয়ের নীতিধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হইলে মানব চরিত্র লাভ করে। চরিত্রের অর্থ মানবপ্রকৃতির প্রবৃত্তি-সমূহের সুসংযত সুশৃঙ্খল অবস্থা। ইহা মানবের শ্রেষ্ঠ জীবন; ইহাই দেবত্ব। এইখানেই ভক্তি সকল প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভগবানের সেবা-আরাধনা-বন্দনারূপ পূজায় নিয়োজিত করে। মানব-সেবা, সকল নিত্য নৈমিত্তিক মঙ্গল কর্ম্ম ও পূজায় পরিণত হয়।

ধর্ম্মের পরিচয় কিরূপে পাওয়া যায়? মানব আত্মা অমর। যাহা কিছু চিরন্তন জীবনের সহায়, তাহাই ধর্ম্ম; আর, যাহা কিছুক্ষণস্থায়ী, সাময়িক, চিরন্তন জীবনের অন্তরায়, তাহাই অধর্ম্ম ও অমঙ্গলের হেতু। এই পৃথিবীতেও অমর জীবনের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এক মুহূর্ত্তের সুখ অপেক্ষা অধিক দিনস্থায়ী ও জীবনব্যাপী সুখ স্পৃহনীয়। ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবনে, পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবনে, সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবন আন্তর্জাতিক সার্ব্বভৌমিক জীবনে পরিণত হইয়া বিশালতা, বিশুদ্ধি ও গভীরতা লাভ করে। এই মানবের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তি জীবনের সুখ বিসর্জ্জন—ইহা নীতির পথ। এই বিসর্জ্জনের মধ্যদিয়া চরিত্র বা উচ্চ জীবন লাভ হয়।

চরিত্র জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শোভা। এই চরিত্র যেমন সমুদয় প্রবৃত্তি সমূহের সংযমের ফলস্বরূপ, উহা সেইরূপ, প্রবৃত্তি সমূহকে যথাযথভাবে পরিচালিত করিয়া তাহাদের বিকাশ সাধন করে।

এই বিকাশ সাধনের জন্য যেমন সংযমের প্রয়োজন, তেমন পরিচালনারও প্রয়োজন; সংযত পরিচালনাই বিকাশের মূলমন্ত্র। উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন বিনাশের হেতু, পরিচালনার অভাবও মৃত্যুর লক্ষণ। বীজ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি পরিচালিত করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়, বৃক্ষ তাহার সকল ক্রিয়া যথাযথ নিষ্পন্ন করিয়া বর্দ্ধিত হয় ও ফল ফুলে শোভিত হয়।

পরিচালনা।

প্রবৃত্তির সহজ তাড়নায় দেহের ও মনের শক্তি চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল হয় সত্য, কিন্তু বিকাশের ব্যায়াম ও অধ্যয়নেরও প্রয়োজন। প্রকৃতি সকল সময় যথাযথভাবে সকল শক্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশ সাধনের সুযোগ প্রদান করে না। ব্যায়াম দেহের সকল অংশের

নিয়মিত পরিচালনার সুবিধা প্রদান করে। বিদ্যালয় প্রভৃতি মানসিক শক্তি সমূহের যথাযথ পরিচালনার সুযোগ প্রদান করে। বিদ্যালয়ে মনের সমুদয় শক্তি যাহাতে ঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আনন্দের সহিত দেহের শক্তি পরিচালনা করিবার জন্য যেরূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে, সেরূপ আনন্দের সহিত মানসিক শক্তিসমূহের যাহাতে যথাযথ পরিচালনা হয়, সেরূপ শিক্ষাপ্রণালীও উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। পর্য্যবেক্ষণ-জাত অভিজ্ঞতা বুদ্ধি-বৃত্তির ভিত্তিভূমি। বিদ্যালয়ে পর্য্যবেক্ষণের কোন সুবিধা না থাকাতে বুদ্ধি বৃত্তির সম্যক্ পরিচালনা হয় না। পুস্তকের সাহায্যে বুদ্ধি বৃত্তির সামান্যই পরিচালনা হইতে পারে। ভাষা অন্যের ভাব ও চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবার উপায় মাত্র; কিন্তু নিজের অনুরূপ ভাব ও চিন্তার আলোকে অন্যের ভাব ও চিন্তায় অধিগমন করা যাইতে পারে। নিজের মধ্যে সামান্য পরিমাণ স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি না থাকিলে ভালবাসার জন্য আত্মত্যাগের মহিমা, সন্তানের জীবন রক্ষা করিবার জন্য জননীর জীবন বিসর্জ্জনের মহত্ত্ব, ভক্তি-বিগলিত নয়ন ধারার সৌন্দর্য্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এজন্য দূরবীক্ষণ যেমন চক্ষুবিহীন লোকের নিকট কিছুমাত্র ফলোপধায়ক নহে, সেরূপ পুস্তকও চিন্তাবিহীন লোকের নিকট দুরবগাহ্য ও অর্থশূন্য। চক্ষুর সম্যক্ ব্যবহারের উপর যেমন দুরবীক্ষণের ব্যবহার নির্ভর করে, সেরূপ মানসিক চিন্তা শক্তির পরিচালনার উপর পুস্তকের অধ্যয়ন নির্ভর করে। মানসিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনার জন্য প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ-জনিত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই সকল অভিজ্ঞতা রূপ রস শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞানের বিচিত্রতার মধ্যে একত্ব দৃষ্টি, এবং এই একত্বের সংযোগে সমুদয় বিচিত্রতার মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। স্মৃতিশক্তি অতীত অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে ও পুনরুদ্বোধিত করে। বুদ্ধি অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে সম্মিলিত করিয়া দর্শন করে। কল্পনা অতীতের আলোকে ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করে; বুদ্ধিবৃত্তি, জীবন রক্ষা ও জীবন-বৃদ্ধি ও পরিণতি বিষয়ে ভবিষ্যতের উপযোগিতা অনুপযোগিতা ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, ইন্দ্রিয়াদির যথাযথ পরিচালনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের শব্দ স্পর্শ রস গন্ধ বর্ণ প্রভৃতি। বিষয় সমূহের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য ও সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবার শক্তি যাহাতে লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বুদ্ধি বৃত্তি নিজ শক্তির পরিচালনা দ্বারা সকল বিচিত্রতার মধ্যে একত্বের অন্বেষণে ধাবিত হইবে, একত্বের পশ্চাতে আরও গূঢ়তর একত্ব, তাহার পশ্চাতে আরও শৃঙ্খলতর একত্বে— এইরূপে একত্বের অন্বেষণ করিতে করিতে বিজ্ঞান দর্শন সৃষ্টি করিবে। কল্পনা সকল অভিজ্ঞতাকে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে। এইরূপে মানসিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনাদ্বারা বিকাশ-সাধন করিতে হয়। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী স্বদেশবাসী, দীনদুঃখী আর্ত্তদের ভালবাসিয়া সেবা করিয়া হৃদয়ের প্রেম ভালবাসার বিকাশ সাধন করিতে হয়। কল্পনাতীত ৬০০ শৈলমালা, বিশাল জলধি, অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশে পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত, ফুলের বিকাশ ও বৃক্ষের কথা ভাবিতে ভাবিতে কল্পনাকে বিস্ফারিত করিয়া একটা

বিশালতার ভাবে, রহস্যের ভাবে, সৌন্দর্য্যানুভূতি সাধন করিতে হয়। কর্ত্তব্যের পথে মনকে স্থির দৃঢ় রাখিয়া ও সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া ইচ্ছা-শক্তির সাধন করিতে হয়। এই নীতির অনুবর্ত্তী প্রবল ইচ্ছা-শক্তির নামই মনুষ্যত্ব।

সাধনাই জীবন; সাধনাতেই জীবনের বিকাশ ও পরিণতি। সাধনাহীন জীবনই মৃত্যু। এই সাধনা দ্বারাই বহির্জ্জগৎ হইতে জীবনের উপাদান সংগ্রহ করা হয়; এই সাধনা দ্বারাই প্রতিকূল শক্তিসমূহকে জীবনের অনুকূল করা হয়। পৃথিবীর বক্ষে কত যুগ হইতে জীবন রক্ষার জন্য অন্ন জল আলোক সঞ্চিত আছে। জীবন আপনার শক্তির পরিচালনাদ্বারা সে সকল সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পরিপুষ্ট করে। কত যুগের কত চিন্তা মানব-প্রাণে, মানব-সাহিত্যে সঞ্চিত আছে; এই বিশ্বের মহান গ্রন্থ ভগবানের অত্যাশ্চার্য্য জ্ঞানভাণ্ডার। মানব চিন্তা-শক্তির পরিচালনাদ্বারা সকল চিন্তা, জ্ঞান ও ভাবসম্পদ আয়ত্ত করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসার পরিচালনাদ্বারা জীবন ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করে। ভক্তির পরিচালনা দ্বারা উচ্চ মহৎ জীবনের মহত্ত্ব লাভ করিয়া জীবন ধন্য হয়।

প্রার্থনা।

সাধনা গভীর হইতে গভীরতর হউক, বিনয়ও সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হউক। বিনয় সকল চেষ্টা, সকল সাধনা ও সকল সিদ্ধি ও অর্জ্জনের শোভা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করে। বিনয় আবার সাধনা ও চেষ্টার গভীরতা সূচিত করে। যিনি যত জ্ঞান অর্জ্জন করেন, ততই তিনি তাঁহার অজানিত রাজ্যের বিশালতা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। যিনি যতই নিজের শক্তি সামর্থ্যপরিচালিত করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হন, ততই তিনি নিজের দুর্ব্বলতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করেন। এইজন্য মানুষ তাহার সকল সাধনার ভিতর দিয়া নিজের অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতার জ্ঞান লাভ করে, এবং এই দুর্ব্বলতা জ্ঞানের মধ্যে অনন্ত-শক্তির প্রস্রবণের সন্ধান পাইয়া তাহার উপর নির্ভর করিতে শেখে। প্রার্থনা মানব হৃদয়ের সঙ্গে জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণের সংযোগ সাধন করিয়া দেয়। নিজের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার মধ্যে নিজের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়া বিনীত হৃদয়ে ভগবানের শরণ গ্রহণ করার অর্থই প্রার্থনা। প্রার্থনায় আলস্যের কোন অবসর নাই; ইহা অলস ব্যক্তির বিজৃম্ভন নহে। অলস হৃদয়ে প্রার্থনার অবসর নাই। ভগবান আমাদিগকে অনেক শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই শক্তি ব্যবহার করিতে করিতেই মাত্র ভগবানের করুণা ও আশীর্ব্বাদের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধ হয়; এবং এই করুণার উপর আত্মসমর্পণ করিলে ভগবান যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া ভগবান তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ানুযায়ী আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন।

প্রার্থনার কত অদ্ভুতশক্তি। আমরা আমাদের শক্তি ব্যবহার না করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আমাদের শত চেষ্টার মধ্যদিয়া নিজের দুর্ব্বল হৃদয়ের ক্রন্দন যখন ভগবচ্চরণে উপস্থিত হয়, তখনই প্রার্থনার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়। প্রার্থনা নিরাশ প্রাণে আশা সঞ্চারিত করে, ভগ্নহৃদয়ে সান্ত্বনা আনয়ন করে, পাপ প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য দুর্জ্জয় শক্তি আনয়ন করে, অন্ধকারে আলো ফুটাইয়া

তোলে। প্রার্থনা ভগবজ্জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরবে মানবজীবনকে মণ্ডিত করে, ভগবৎ-তত্ত্ব প্রাণে পরিস্ফুট করে, প্রেম ভালবাসা ভক্তি বিকশিত করিয়া বিশ্বের ও স্বর্গের সুরের সঙ্গে জীবনকে মিলাইয়া দেয়। এখানেই মানব জীবনের পূর্ণ সার্থকতা; এখানেই মার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি।

শ্রীবেণীমাধব দাস।

স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

জন্ম—বরিশাল, শ্রাবণ—১২৬৪।

মৃত্যু—গিরিধি, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ—১৩২৬।

বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনে যাঁহারা প্রধান কর্ম্মী ছিলেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তন্মধ্যে অন্যতম। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বানরীপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা-জীবন সমাধা হইবার পূর্ব্বেই তিনি নানাকারণে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। বিক্রমপুরের কুকুটিয়া গ্রামনিবাসী কালীকুমার দত্তের কন্যা মনোরমার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। মনোরঞ্জন স্বাধীনতার উপাসক, সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা, উদ্যম ও নির্ভীকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভণ্ড স্বদেশপ্রেমিকদিগের ন্যায় তিনি মনে এক ও কার্য্যে অন্যপ্রকার ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত অতি বিরল। কি শত্রু কি মিত্র, কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না। তিনি গরম দলের লোক ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভকাল হইতে তিনি স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে তাঁহার বাক্‌বিভূতি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ মে মাসে "নবশক্তি" নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রচার করেন। বাঙ্গালীর প্রাণে "নবশক্তি" তখন এক নূতনশক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। অবশেষে যখন লর্ড কার্জ্জনের রাজবিধানরূপ ছুরিকাঘাতে বঙ্গমাতা দ্বিখণ্ডিত হন, এবং তাহার ফলে যখন ক্রমে ক্রমে জাতীয় জীবনের জয় পতাকা ভারতাকাশে উড্ডীন হয়, সেই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির সহিত মনোরঞ্জন গুহ যোগদানপূর্ব্বক মাতৃপূজায় জীবন উৎসর্গ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সর্ব্বব্যাপিকা ফলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিচলিত হয়েন। লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি। তাঁহার আদেশে বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঢাকার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস, কলিকাতার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং মনোরঞ্জন, এই নয়জন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ই ডিসেম্বর মনোরঞ্জনকে গিরিধিকে গ্রেপ্তার করিয়া ১৮ই ডিসেম্বর ব্রহ্মদেশের ইন্‌সেন সেন্‌ট্রাল্ জেলে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। শ্যামসুন্দরের সহিত এক জাহাজেই রেঙ্গুন পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৭৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১০ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাইয়া ১৭ই তারিখে "বাঙ্গালী" নামক ষ্টীমারে তিনি কলিকাতায় উপনীত হন। তাঁহার মুক্তির সংবাদ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই দুই পুত্র—সত্যরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন—পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশ গিয়াছিলেন।

তিনি বরিশালের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। শেষ বয়সে অধিকাংশ সময় গিরিধিতে অবস্থান করিতেন। নির্ব্বাসন হইতে আসিবার পর অনেকের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রভূত কষ্ট স্বীকার করেন এবং বহু বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। অবশেষে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য হন। তিনি স্বদেশের আচার ব্যবহার ভালবাসিতেন।

তিনি শেষ জীবনে কেবল সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি "বিজয়া" নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যভার কিছুকাল গ্রহণ করেন। "বিজয়া" বন্ধ হইলে বিবিধ পত্রিকায় নানাবিধ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। নির্ব্বাসন-স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি নির্ব্বাসন-কাহিনী" নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তদীয়া স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর জীবনকথা অবলম্বনে "মনোরমার জীবন-চিত্র" নামে একখানি পুস্তক (দুই ভাগে) লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে তাঁহার জীবনের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা, ছাত্রেরা থাবে কি, প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ আছে।

তিনি জীবনে সুখ দুঃখ অনেক ভোগ করিয়াছেন। শেষ জীবনে গিরিধির নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া ধর্ম্মসাধনা ও সাহিত্যসেবা করিতেন। অতঃপর এই স্থানেই ধরার পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) দারুণ বহুমূত্র রোগে আনুমানিক ৫২ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে দুটী পুত্র ও পত্নী পূর্ব্বেই গতাসু হন। বরিশালের পুলিশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিবার সময় তাঁহার একটী পুত্র আহত হইয়াছিলেন। মনোরঞ্জনের মৃত্যুতে বঙ্গজননী এক জন স্বদেশপ্রাণ সন্তান হারাইয়াছেন। যাও মনোরঞ্জন, তুমি অনন্তধামে যাও—তোমার কীর্ত্তি ধরাধামে চিরকাল থাকিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

নারীর অধিকার—প্রাচীন ও নবীন

নারীর অধিকার—(স্থান স্বর্গ, স্বর্গপতির ইচ্ছা "স্বর্গীয়া" মহিলারা বঙ্গদেশের কল্যাণের জন্য একবার মর্ত্ত্যে গমন করেন)

বিশ্ববরা। ভাবিয়া দেখিলাম, আমার যাওয়া হয় না। প্রথম কথা এই যে, উহারা মেয়েদের উপনয়নের অধিকার হরণ করেছে। দ্বিতীয়, আমার কার্য্য মন্ত্র রচনা ও যাগযজ্ঞে পৌরোহিত্য করা। কিন্তু বৌদ্ধ-বিপ্লবে যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইয়াছে, সুতরাং আমার যাওয়া নিরর্থক। মৈত্রেয়ী যদি যায়।

মৈত্রেয়ী। দেখ, আমি স্ত্রী-প্রজ্ঞা নই, আমার মতিগতি যে দিকে, সে পথ এখন রুদ্ধ। উহারা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চা

BLEED THROUGH.

ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহা নহে, অধঃপতন এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, বলে কি ব্রহ্মজ্ঞানে নারীর অধিকারই নাই। লজ্জাহীনতা এত যে, নিয়ম করিয়াছে, নারী বেদ আলোচনা করিতে পারিবে না। অথচ, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" কথাটার কত ভাষ্য টীকা করিয়াছে। তবে ব্রাহ্মসমাজে যেতে পারি, তাঁহারা নারীর অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং প্রাচীন সুপ্রথাগুলি যাহা লইয়া ভারতের গৌরব, তাহা পুনরুজ্জীবিত করিতেছে। গার্গি, তোমার তো অবাধ গতি, যাজ্ঞবল্ক্যকেও তিন নাড়া দিয়াছিলে, তুমি যাও না?

গার্গী। তা বেশ বলেছ, সে রাম আছে, না সে অযোধ্যা আছে? আমাকে কি আর সভা সমিতিতে যেতে দিবে? যাই তো কত কুৎসা রটনা কর্ব্বে। এক অনার্য্য অবরোধ-প্রথা কোথা থেকে এসে সে আর্য্য দেশ একেবারে শ্রীহীন ও অপদার্থ করে ফেলেছে। বলতো মারাঠা দেশে যেতে পারি হাঁ, ব্রাহ্মদের মধ্যে থাকা চলে। তাঁহাদের নারীরা জাতীয় মহাসমিতিতেও দাঁড়াইবার অধিকারিণী। আত্রেয়ী না হয় যাক্।

আত্রেয়ী। আর কি সে দিন আছে? যদু-পতে, ক গতা তে মথুরাপুরী? যে দেশে নারীর বিদ্যার দৌড় মহাকালী পাঠশালা, ৮ বছরের মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে যে দেশে মদনমোহন সমাজচ্যুত হইলেন, সেখানে আমাকে পাঠাতে চাও, তোমাদের বিবেচনা বেশ! ব্রাহ্মখাতায় নাম লেখাতে বলতো পারি। বেথুন বিদ্যালয় তো আছেই, সিটি কলেজে প্রেসিডেন্সী কলে-জের সুবিধাও পাব। বলতো মুম্বই যাই, সেই-খানে ছেলে মেয়েরা এক কলেজে পড়ে, যেমন দেখেছিলাম বাল্মীকির তপোবনে। মণ্ডন-মিশ্রের ঘরণীকে যাচাই করে দেখ।

উভয় ভারতী। খুব শিকার পেয়েছ। উহারা মাতৃজাতিকে এমন অবিশ্বাস করিতে শিখেছে যে, অপরিচিত পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা তর্ক বিতর্ক তো দূরের কথা, পরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিলেও নারীর সপিণ্ডকরণ করিবে। খাঁচায় বন্ধ হইয়া থাকা আমার পোষাইবে না।

হটি বিদ্যালঙ্কার। আমাকে ডাকাই বৃথা। যাওয়া মাত্রই আমার নামের ব্যাকরণ ভুল ধরিবে, আর পশ্চাতে একটা আকার যোগ করিয়া দিবে, যেন উপাধিরও লিঙ্গ চাই। ঐ দেখ না, ব্রাহ্ম মেয়েরা নামের সঙ্গে উপাধি যোগ করে বলে তাদের কত লাঞ্ছনা।

খনা লীলাবতি। আমাদিগকে কি চির জীবন বাটনা বেটে কুটনা কুটে কাটিয়ে দিতে বল? ও কাজ করবার ঢের লোক পাওয়া যায়, বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর কটক অঞ্চলে। বড় জোর বল্‌বে, অবসর সময়ে রামায়ণ মহাভারত পড়। শাশুড়ী ননদের কৃপায় সে অবসরও বড় পাওয়া যাবে না। তাঁরা নাকি বলে, সেলাই শেখ, রান্না শেখ, বোধোদয় পর্য্যন্ত না হয় পড়, নারীর আবার উচ্চশিখা কি? সেই স্বাধীনতার উন্নত যুগে যা কিছু পেয়েছিলাম, সব খোয়াব কি? ব্রাহ্মেরা ছাড়া আর কেউ আমাদের আদর কর্ব্বে না।

বিদ্যোৎবরা। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি যেখানে, আমি কেবল সেখানেই অবতরণ করিতে পারি, আর কোথায়ও নয়। তিনিও তো ব্রাহ্মসমাজেরই লোক।

অনামা। আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া তো একেবারেই ঘটে না। বিবাহের সময় সপ্তপদী গমনে ক'নে কটা বাধ্যতা অধীনতায় প্রবেশ করছে, তার একটা তালিকা আছে বটে, তার কোন অধিকারের প্রসঙ্গ আছে কি? আর আমাকে বিবাহান্তে কি বলে

স্বামীগৃহে বিদায় দিয়েছিল, মনে নাই বুঝি? "গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথা সো, বশিনী ত্বম্ বিদথম্ আ বদাসি।" (অথর্ব্ববেদ. ১৪।১।২০) গৃহপত্নী হয়ে গৃহে যাও! সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিতে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার পেলে। এখন কিন্তু এঁরা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন "স্ত্রীণাং নাস্তি স্বতন্ত্রতা"। হায়রে হায়, হাতে শিকল পায় শিকল। তবে ব্রাহ্মসমাজের কথা স্বতন্ত্র।

সকলে। তা ঠিকই বটে! এক ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া আর কোথায়ও আমাদের স্থান নাই।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

সীতা। যেখানে স্বামীর সঙ্গে একটু খানির জন্য ঘরের বাহির হইলে নিন্দাভাজন হ'তে হবে, সেখানে আমার পোষাবে কি? এই সে দিনও ইংরাজ আমলের সুরুকে স্বামীর কর্ম্মস্থলে স্ত্রীর যাওয়া লইয়া নাটক নভেল লিখিয়াছে ও ঠাট্টা তামাসা করিয়াছে। আমাকে যে স্বামীর সঙ্গে বনে জঙ্গলেও না থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কল্পনা রাজ্যে আমার উপকার করেছে বটে, কিন্তু বঙ্গসমাজে আমার আর স্থান নাই। লোকগুলি এমন বেয়াদব, মেয়ে মানুষ দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাক্‌বে! মেয়েমানুষ যেন একটা রাজ্য ছাড়া জিনিষ। মায়ের গর্ভে যে জন্মেছে, সে কথা একেবারে ভুলেই যায়।

সাবিত্রী। হাঁ, উহাঁর সীতা সাবিত্রী করে বটে, সেটা কেবল মুখে, মনে মনে যে আমাদিগকে ঘৃণা করে, তার কি কোন সন্দেহ আছে? ওঁরা আমাদিগকে বহুদিন পরিত্যাগ করেছে। সাবিত্রী ব্রতের কথা। সেতো একটা স্বার্থানুশীলন। ঐ এত বয়স পর্য্যন্ত যদি অনূঢ়া থাকি, তবেই তো কুৎসা রটনা করিয়া দেশ ছাড়া করিবে। যদিই বা পণের দায়ে একটু বেশী বয়স হয়, ভাব দেখিন্, আমি পিতার কাছে প্রস্তাব করিলাম, আমাকে লোকজন সঙ্গে দাও আমি পতি খুঁজিতে বাহির হইব, দেশ বিদেশে মনের মত বর চাহিয়া বেড়াইব, তাহা হইলে কি এখন ইহারা আমাকে পাগ্‌লা গারদে আটক করিবে না? দেশের মধ্যে একটা টিটি পড়িয়া যাইবে না? যেন একটা কি কুৎসিত প্রস্তাব করিয়া ফেলিলাম। বিবাহটা যে পুরুষ রমণীর হৃদয়ের যোগ, তা ইহারা ভুলিয়াই গিয়াছে। তাই বিবাহের নামে পুতুল খেলা। আর তখন আমাকে বলিতেও হইল না, বাবা উপযাচক হইয়া বলিলেন "স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ"। আমি তো মনের মত পতি বির্ব্বাচন করিয়া ফিরিলাম। নারদের কথা শুনিয়া বাবা তো অমতই করিলেন। এখন হলে, বাপের অবাধ্য হইয়া মেয়ে বিবাহ করিতে চায় বলিয়া কত না দুর্নাম রটিয়া যাইত। কেহ কেহ ষ্টীক্‌নিয়ার ব্যবস্থা করিতে ছাড়িত না। স্ত্রী স্বাধীনতার মহিমা উহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। মুখে যা বলে তার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য জানে না, কাজে করে তার ঠিক বিপরীত। যার শতাংশের একাংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতে ব্রাহ্ম মেয়েদের উপর এমন অকথ্য অবিচার ও অত্যাচার হচ্ছে, যেখানে সে দেশ মুখো আর আমি হব না। বাঙ্গালীর ধৃষ্টতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আমাকে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। মরণ আর কি! দময়ন্তী না হয় যাক্। ও বেশ জান্দ্রাল মেয়ে। আমি লোকজন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে একাই সব দেশ ঘুরেছে।

দময়ন্তী। বাঃ বেশ তো, তোমাদের যা পরিত্যক্ত তাই বুঝি আমার? না ভাব দেখি, অত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিবার সুযোগ ও স্বাধীনতা দিবে কি? সেইটাই

তো আকাশ-কুসুম। তারপর, পত্রবাহকেরা দ্বারা প্রেমাস্পদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়, সেতো কল্পনারও অতীত। ভাগ্যে সে সময় বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাই পুনঃ স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিয়া নলকে বাহির করিয়াছিলাম, এখন সে পোড়াদেশে এ কিছুই সম্ভব নয়। আমি ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বসে থাকতে পার্ব্বো না।

সুভদ্রা। আমি জানি, বাঙ্গালী আমাকে অনেক উপরে তুলেছে, কিন্তু ভাব দেখি, এখন যদি বাপ ভাইএর নিমন্ত্রিত বরকে অগ্রাহ্য করিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া বাপের ঘর হইতে পলায়ন (Elope) করি, তবে কি উহারা আমাকে আফিং দিয়া মারিবে না? ওরা এমন পদার্থহীন হয়েছে, যদি একটী মেয়েকে বগি হাঁকাতে দেখেইতো একেবারে হাঁ করেন। দ্রৌপদীকে দেখ, আমি অর্জ্জুনের রথে সারথি হয়ে বসেছি, মনে থাকে যেন তখনও কিন্তু বিয়ে হয় নাই। courtship চলিতেছে মাত্র—অর্জ্জুন জ্ঞাতিবর্গের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতেছেন, আমি রথ চালাইতেছি; সামাজিকভাবেই হৌক আর যে ভাবেই হৌক, বাঙ্গালী এ দৃশ্য কল্পনা করিয়াই মূর্চ্ছা যাবে; কাহারও ঘরে আমার স্থান হবে না। আর আমি যে সম্বন্ধে বিবাহ করেছি, সে কথা মনে করে উহারা আমাকে এক দম পরপারে হাঁকিয়ে দেবে। মিত্রবিন্দা বা ভদ্রা যাক্।

মিত্রবিন্দা। সাবাস যুক্তি। উনি পিসতুত ভাই বিয়ে করেছেন বলে জাত গেল, আর আমরা মামাতো ভাই বিয়ে করেছি সুতরাং কুলীনই রইলাম। আসল কথা, বাঙ্গালী আর এখন আমাদের স্বীকার করবে না। তারা একদম বদলে গেছে। আমরাও আর এই অধঃপতিতদের ছায়া মাড়াতে চাই না। ওরা আগেকার কথা সব ভুলে গিয়ে একেবারে অনার্য্য হয়ে গেছে।

জম্বা। আমার কেন স্বামীর কুরুক্ষেত্রে সূচনা কর্ত্তে হবে নাকি? স্বামি হরণ দেখেছি, কুরুক্ষেত্র দেখেছি, আর না। সে দেশের মানুষগুলো এমন রাঙজ্ঞানহীন যে, নারীর অপমানের প্রতিশোধ নারীকে নিজ হাতে না লইলে আর তার প্রতিষ্ঠান নাই, কেরোসিন তেলে পুড়ে মরা ছাড়া নারীর প্রতি অবিচারের আর প্রতিকার নাই, পুরুষগুলো এমনই স্বার্থপর। নারী হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায় জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ। মানুষগুলো এমন নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষ যে, সমাজের দাসত্ব কর্ত্তেই তারা এসেছে, পশুবল ছাড়া অন্য বলের ধার ধারে না। নৈতিক বলে লোকভয়, লোক-লজ্জাকে অতিক্রম করিবার সাধ্য উহাদের আছে কি? তাহারা এমনই পুরুষত্বহীন যে, হৃদয়ের চিরপোষিত অনুরাগের খাতিরেও লোকাচার বর্জ্জন করিয়া স্বাধীন পথে চলিতে চাহিবে না। পুরুষের শত খুন মাপ, কিন্তু অবলা নারীর অঙ্গ যদি কেহ জোর করিয়া স্পর্শমাত্র করে, অমনি তাহার উপর সমাজের সর্ব্ব কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা। ভীষ্ম যে অম্বায় ধরিয়া লইল সে দোষ কি আমার! যে দেশে নারী জন্ম বিধাতার অভিশাপ, সে দেশে অম্বা যাবে না।

অম্বালিকা। দিদি তুমি যে সেই থেকে চটে রয়েছ, তোমার মনের আগুন আর নিভলো না। আগুনে পুড়ে শরীরটাকেও তাতিয়ে ফেলেছ। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, এখনকার চাইতে সে কাল কি শতগুণে ভাল ছিল না? বাবা কত্য সাধ করে বীর্য্যশুল্কে শান্তনুকুলে বিয়ে দিলেন, সে সকল বিষয়ই তো এখন উঠে গেছে। তারপর যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীর্য্য যখন মারা গেল, তখন তো সব দিক্ অন্ধকার। তখন বলে হ'ল, এখন কি আর পাণ্ডুর মত পুত্র লাভ সম্ভব হয়? এখন

ইহারা তো পাণ্ডুচরিত, যুধিষ্ঠির কাহিনী পুণ্য কথা বলে শ্রবণ করে, কিন্তু বল দেখি, আজ যদি পাণ্ডু কি যুধিষ্ঠির তাদের বাড়ীতে জন্ম নিতে যায়, তবে কি তাঁদের ওরা খ্যাংড়া পেটা করে না? দেশটা কপটাচারে ভরে গিয়েছে, এমন পরিবর্ত্তন কোন্ দেশের হয়েছে? দেশটাকে দেখে চেনা যায় না।

মাদ্রী। ঠাকুরুণ, যা বল্লেন তা ঠিক, কিন্তু পরিবর্ত্তন কি কেবল মন্দর দিকেই হয়। এই দেখুন না, এখন তো আর স্বামীর চিতায় পুড়ে মর্ত্তে হয় না, রাজা রামমোহন রায়ের কৃপায় মেয়েরা সে দায় হতে মুক্ত হয়েছেন।

প্রমীলা। আমাকে কিন্তু তার পরেও পুড়িয়েছে। মানুষের কুসংস্কার মরেও মরে না। আচ্ছা, মাদ্রীদেবীর একটু যাওয়ার লোভ হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি, পাণ্ডুর সঙ্গে যেমন করে ঘুরে বেড়াতেন, তেমনটি আর পার্ব্বেন কি না, সে পথ বন্ধ। পথে বেরুলেই টিটকারী আর কাণাকাণি।

রেবতী। না, সে দেশে আবার মানুষ যায়। স্বামীর সঙ্গেও যদি মেয়েরা এখন উদ্যানাদি ভ্রমণে যায় বা সভাসমিতিতে যায়, অমনি কত কথা উঠে। লোকগুলির মনই বিকৃত হয়ে গেছে কি না? নইলে সেকালে আমরা কত কি করেছি। সেই প্রভাসাদি উৎসবে যে বলদেবের হাত ধরে কত নেচেছি, কই, কেউ তো তখন কিচ্ছুই বলে নি। এখন এ কি দৃশ্য। না, আমার যাওয়া হবে না। যেয়ে কি সেই ঘরের কোণে তাঁদের মত কেবল——। যাক্, শক্ত কথা বলে আর কি হবে। এঁরা এখন শত দুর্দ্দশায় নিপীড়িত, শত লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হলেও তো আমাদেরই বোন্। কি অধঃপতন।

জনা। তাকি আর বলতে। স্বামী যখন পুত্রহন্তার সঙ্গে মিত্রতা, কর্ত্তে গেলেনা, রাজটা এমন ঘৃণার্হ বলে মনে হ'ল যে মুখের উপর প্রতিবাদ না করে পার্লাম না। এরা বলবেন, স্বামীর অনুগমনই পত্নীর ধর্ম্ম। তা ঠিক, স্বামী যতক্ষণ ধর্ম্ম পথে থাকেন। কিন্তু যে ধর্ম্মের অনুশাসনে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী, স্বামী যখন সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তখন তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। তখন স্বামীকে মানাই অধর্ম্ম। আমি প্রতিবাদ করিলাম, স্বামী শুনিলেন না, আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলাম। অন্যায় করেছি কি? কখনই না। ভ্রমর আমার সমর্থন কর্বেন। "এরা কিন্তু স্ত্রীনাং নাস্তি স্বতন্ত্রতা" বলিয়া আমাকে নরকে পাঠাবে। তা বলুক, আমি ওদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনি না।

লোপামুদ্রা। আমি ক্ষত্রিয় কন্যা, উগ্রতপা ব্রাহ্মণ অগস্ত্য যখন আমার প্রার্থী হইলেন, আমার সম্মতি না জানা পর্য্যন্ত পিতামাতা কোন উত্তর দেন নাই, ব্রাহ্মণ হলে কি হয়। এখনকার দিনে এ সব প্রথা আছে কি?

সত্যবতী। আমি তো তবে গেছি। পিতৃ গৃহেই ব্যাসকে ক্রোড়ে পাইয়াছিলাম। তাতে কি আমার বরের অভাব হল? যদিও আমি নিজে ধীবর কন্যা, আমারই বংশ কি ভারতে একছত্রাধিপত্য করিল না? মহারাজ শান্তনু নিজে উপযাচক হয়ে আমায় বিয়ে কল্লেন। তখন যে গুণের আদর ছিল। এখন সে সব কথা ইহারা অলীক মনে করে।

কাক্ষিবতী (বৈদিক)। এখন সেখানে সবই বিপরীত। উপযুক্ত পাত্র পাই নাই, সুতরাং আমি পিতৃগৃহে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ছিলাম, কোন কথাই তো উঠে নাই। নিতান্ত অস্বাভাবিক নিয়মের দাস না হইলে কথা উঠিবেই বা কেন? পিতৃ গৃহে কন্যা থাকিবে, ইহাতে আবার কথা কি? উপযুক্ত পাত্র মিলুক আর না মিলুক, কোন বিশেষ

বয়সে কন্যাকে ঘরের বাহির করিয়া দিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? যে আমাকে চায় না, পিতা মাতার ঘর বাড়ী বিক্রয় করা টাকা চায়, তাহারই ঘরে যাইয়া আমাকে থাকিতে হইবে। কি নির্ম্মম অনুষ্ঠান! নারীর কৌমার্য্যের অধিকার লোপ করিয়া সমাজের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে? মনু যে বলিয়াছেন, যে সুপাত্র না পাইলে কন্যা আমরণ পিতৃগৃহেই থাকিবে! উহারা এখন এসব কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালন করে না, স্বার্থপরতার জন্য পুরুষ এখন কন্যার পিতৃধনের অধিকার হরণ করেছে, তাই সে বিবাহ ছাড়া মেয়ের আর গতি নাই। যদিও শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, অনূঢ়াশ্চ দুহিতরঃ পুত্রভাগানুসারাঃ", যদিও বর্ত্তমানযুগের ঋষি রামমোহন নারীর এই অধিকারের জন্য অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন, কিন্তু কেহ আর এখন তাহা মানে না; চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।

গোপা। কি শাস্ত্র কি দেশাচার, কেহই এখন আমার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ মঞ্জুর করিবে না। সুতরাং আমি যাব কোন্ আশায়?

অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী। আমার সাজ পোষাক দেখিয়া উহারা আমাকে নিশ্চয়ই অসভ্যা বলিয়া তাড়াইয়া দিবে। কি পরিবর্ত্তন (চৈতন্যের জন্মে অদ্বৈত্যপত্নী যেরূপ সাজ সজ্জা করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যাইতেছেন, চৈতন্য চরিত্রামৃত হইতে সেই অংশ দ্রষ্টব্য)

রুক্মিনী। ভাব দেখি আমার কথা? পিতা ভ্রাতা জ্ঞাতিবর্গ পরামর্শ করিয়া এক বর স্থির করেছেন। আমি কিন্তু আমার মনোনীত মানুষকে সেদিন সদলে এসে বাপ ভাইর হাত হতে আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে খবর পাঠালাম। আমার অবাধ্যতার জন্য বাপ ভাইএর যে অপমান, যে লাঞ্ছনা হল, তাহাতে বর্ত্তমান বাঙ্গালী কি আতুর ঘরেই গলায় নুন দিয়ে আমায় মেরে ফেল্‌বে না? প্রেমে স্বাধীনতার সে আদর কি আর আছে! ব্রাহ্ম সমাজও আমার হজম করতে পার্ব্বে কি না সন্দেহ। পারে তো সত্যভামা যাক্।

সত্যভামা। মরিরে কি সুখ! একেবারেই সতীনের জ্বালা বেশ পুহিয়েছি, আর না। বলতো ব্রাহ্মসমাজে যাই।

উমা। আর কেন জ্বালাতন কর। সেই উগ্র তপস্যাদ্বারা মনের মতন পতি লাভের আর স্বাধীনতা আছে কি? তারা আমাকে আট বছরে গৌরী দান কর্ব্বে। হায়, আমার নামটাকেই কলঙ্কিত করে ফেলেছে।

শকুন্তলা। আমাকে যেতে বলায় আমি নিতান্ত অপমানিত বোধ কচ্ছি। ভাব দেখি, আজ যদি সেই রাজ সভায় উপস্থিত হয়ে নারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য স্বামীকে তিরস্কার করি, তাহলে তোমাদের বঙ্গসমাজ কি আমাকে আস্ত রাখ্‌বে? স্বামী যা ইচ্ছা তাই বল্‌বে, আর তোমাদের হতচ্ছাড়া আচার অনুসারে পতি দেবতার মুখের উপর কথা বল্‌তে নাই বলিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, তা আমা দ্বারা হবে না। পতি, পতি সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যদি বিপথে যান, তবে গুরু হয়ে তাঁকে উপদেশ দিব, শাসন কর্ব্বো। প্রত্যাখ্যানের অপমান আমি কি নীরবে সহ্য করিলাম। নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি যখন চোখ রাঙ্গাইয়া সেই বিরাট রাজসভা কম্পিত করিয়া বলিলাম, অনার্য্য নিজের মতই সকলকে ভাব', তখনই কি দুষ্মন্তের স্মৃতির আবরণ টুটিতে আরম্ভ করিল না? বাঙ্গালী সে জন্য আমার নিন্দা প্রচার করিয়াছে। স্বার্থপর পুরুষ নিজের সুখ সুবিধা কড়ায় গণ্ডায় বজায় রাখিবার জন্য যে ব্যবস্থা করে, তাহা না

মানিলেই অমনি খড়্গহস্ত। আমার মান কিছু রক্ষা করিয়াছে পাশ্চাত্যেরা, তাঁহাদের যে সামাজিক আদর্শ এখনও উচ্চ আছে। যারা নারীর মর্য্যাদা রাখে না, মা বোনের জাতের অপমান কর্ত্তে, নিন্দা রটাতে কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না—তারা তো গোল্লায় যাবে, তা যাক্। আমি সে দেশে যেতে পার্ব্বো না। আমি যে বিবাহ করেছিলাম, তাহা তো ওঁরা এখন বিবাহ বলেই স্বীকার করে না। ভেবে দেখ দেখি, ওঁদের চোখে আমি এখন কি? ওঁরা আমায় শিকেয় তুলে রেখেছে কেবল সেক্সপিয়রের সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন্য। কি ভীষণ কপটতা। আচ্ছা, আমাকে যদি খুকীটি গরদের পুঁটুলি করিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত করা হয়, তবে "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" লইয়া গৌরব করিবার কিছু থাকে কি? বলতো, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর হতে পারি। আর পারি কেন, হতে তো হবেই। ভরতকে যদি পিতৃরাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে হয়, তবে তো ও বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে কল্লাম ক্ষত্রিয়—যত রাজ্যের আহাম্মক পণ্ডিত পাতি দিয়াছে যে ও বিবাহ হিন্দু-বিবাহ নহে।

অরুন্ধতী। কথাটা ঠিকই। আজ যদি আমার মত কোন মেয়ে বলে যে সর্ব্বদা ঘরে বাইরে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে, এক মুহূর্ত্তও তাঁর পার্শ্ব ত্যাগ কর্ব্বে না, তা হলে তার কি গঞ্জনা হয়, ভাব দেখি? প্রত্যেক নব বিবাহিতা কন্যাকেই ওরা আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন, "অরুন্ধতী বশিষ্ঠস্য দময়ন্তী যথা নলে"—কিন্তু কোথায় বা অরুন্ধতী, কোথায় বা বশিষ্ঠ। মনের মত পতি পাই নাই, সুতরাং বহুকাল অবিবাহিতা ছিলাম। তারপর বশিষ্ঠের সঙ্গে পরিচয়। ইহারা কিন্তু পাঁচ বছরের মেয়েকেই অরুন্ধতী দময়ন্তী বলে দাঁড় করাবেন। সবই ঠিক, আর বাঙ্গালী যে তোমার অপমান করেছে, তাতে তোমার রাগ হওয়াও ঠিক নয়। কিন্তু বল্‌ছি এই, শক্ত কথা বলে আর লাভ কি?

বজ্রবনিতা। হ্যা, উচিত কথা বল্লেই শক্ত বলা হয়? এমন কি গালাগালি আছে যা ওদের খাটে না। যেমন কুকুর তেমনই মুগুর না হলে কখনও হয়? কথায় বলে মুখস্থ লাঠ্যৌষধি! ভাব দেখি, আমি যদি ওদের কেউ হতাম, আমার কি দুর্দ্দশাই না হতো!

দেবহুতী। যা বলছ তা মিথ্যা নয়। ওদের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নাই। আমাকেও কি ওরা এখন ঘরে স্থান দিবে? আমি ছিলাম ক্ষত্রিয়া, মনের মানুষ খুঁজিয়া পৃথিবী আসিয়াছি, শেষে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলাম। মনু এরূপ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, এরা কিন্তু তা কি আর মানে। খৃষ্টান রাজার আইন ছাড়া এ বিবাহ আর এখন সিদ্ধ নয়!

জাম্ববতী। আমার তো কথাই নাই! এঁরা এখন বিদ্বান্ হয়েছেন, বল্‌বেন যে ওরূপ অন্তর্জ্জাতীয় বিবাহ (International) জীব-বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। এঁরা কৃষ্ণের চাইতেও পণ্ডিত। যাক ওরা গোল্লায়, আমার কি!

উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা। আমরাও তো ঐ পর্য্যায় ভুক্ত!

উত্তরা। দেখুন না কেন এই মৎস্যদেশেই একদিন মেয়েদের গীতবাদ্য শিক্ষার প্রথা কেমন সুপ্রচলিত ছিল। আমার পিতা আমার সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কি না আয়োজন করিয়াছিলেন! সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ মানুষ পাইলেই আমার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্য এমন চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া এখন আর কেউ করে না। শিক্ষার ব্যবস্থা তো দূরের কথা, শুনা যায়, না খেতে দিয়ে শুকিয়ে

রাখে পাছে দেখ্‌তে শিগ্‌গির বড় হয়ে উঠে! বিয়ে দেওয়া কষ্টকর কি না? মেয়ে জন্মটা একটা মস্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার করে তুলেছে এখন এমন অধঃপতন হয়েছে, মেয়েরা গান বাজনা শেখে বলে তাঁদের কত নিন্দা! আমি ঐ নাক শিট্‌কান সহ্য কর্ত্তে পারবো না। আমি কি যে সে এই সকল অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিতদের অবহেলা সহ্য করবো? আমার বংশই কি এক দিন হস্তিনাপুরের সিংহাসন রজায় রাখে নাই? সম্মার্জ্জনী সহযোগে ও দেশটার একটা ব্যবস্থা না হলে আমি আর ওখানে যাচ্ছি না। এই লম্বকর্ণেরা অন্য কোন উপদেশ শুনিবে না। এমন নির্ব্বোধ যে আপনার জনকেই চিনে না। বোকা কি গাছে ফলে? সঙ্গীত কলাটাকেই সমাজ জীবনের বাইরে ফেলে দিয়েছিল।

দেবযানি। আমার কথা উঠ্‌তেই পারে না। আমি বঙ্গদেশে গেলে প্রজাপতির শিরঃপীড়া উপস্থিত হবে—আমার বিবাহ ঠিক কর্ত্তে তিনি হালে পাণি পাবেন না। ধর, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালাম—কুমারী থাকিবার অধিকার যখন চলিয়া গিয়াছে বিবাহ তো করতেই হবে, পণের দায়ে বাপ মায়ের ভিটা মাটি উচ্ছন্ন যাক্, তাতে কি? এ দিকে কিন্তু আমার অসবর্ণ বিবাহটা মনুর মতেও অসিদ্ধ। বিবাহটা সিদ্ধ করিতে হইলে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইতে হয়, কেন না, ওরা ভূপেন বোসের বিলটা পাশ করিতে দিলে না।

ইন্দুমতী। সে কথা কেমন করে ভুলি! ও দেশে কি আর এখন প্রেমের সে আদর আছে? আমি মরিলাম, অজ আমার সঙ্গে সঙ্গে মরিলেন। মানুষ এখন এমনই নির্ম্মম কঠিন-হৃদয় হইয়াছে, যে পত্নীর জ্বলন্ত চিতার সম্মুখে বসিয়াই পুনরায় বিবাই সম্বন্ধ স্থির করে, নতুবা নাকি শিগ্‌গির শিগ্‌গির বিবাহ হয় না। এ কথা শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

প্রেমোদ্বরা। এ কথা শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অর্দ্ধেক আয়ু দিয়া স্ত্রীকে বাঁচাইয়া তুলিবে, এমন স্বামী সেখানে কজন আছে? আহাম্মকেরা বলবে লোকটা স্ত্রৈণ, ঘোর কলিকাল!

অন্ধমুনি-পত্নী। আমি শূদ্রা, আমার স্বামী বৈশ্য, কিন্তু আমার পুত্রকে হত্যা করিয়া দশরথের ব্রহ্মহত্যা হইল, আমি তো বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কল্পনার মধ্যেই আসি না। প্রাচীন অসবর্ণ বিবাহের সুপ্রথা তো কেবল ব্রহ্মসমাজকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে, তারপর সিন্ধুর ব্রাহ্মণত্বের দাবী, সে কথা উপস্থিত করলে কি আমার রক্ষা থাকবে? প্রাণের মায়া, ইজ্জতের মায়া থাকতে আমি বঙ্গদেশে যেতে পারি না।

(সিন্ধুর উক্তি দশরথের প্রতি—"শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শৃণু জালপদাধিপ"—

রামায়ণ।

মেহলতা। আবার! একবারই পুড়ে ছাই হলাম, আর নয়। উঁহাদের সব ভণ্ডামি, এত চীৎকার, এত লম্ফ ঝম্ফ—পণ উঠ্‌ল কি? যে দু একটী বড় লোকের বিবাহে দর দস্তুরের প্রয়োজন নাই, দরদস্তুর না করলেই লাভ বেশী, সেই বিবাহের কথা নিয়ে ওরা ঢাকঢোল বাজায়। মরুক, আমারই মত সব পুড়ে থাক হোক। আসুর বিবাহ প্রবল হয়ে দেশটাকে অসুরের দেশ করে তুলেছে, যেন কন্যার বাপের বুকের রক্ত শুষে নেবার জন্যে ছো মেরে বসে আছে!

পঞ্চকন্যা। (অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী—নেপথ্যে) আমাদের কথা তো উঠ্‌তেই পারে না। সকালে উঠিয়া যে উহারা আমাদের নাম করে, তাহা বিদ্রূপ নহে কি? যাহাদের নাম লইয়া মহা পাতক হইতে উদ্ধার পাইতে চায়, তাহাদের একজন যদি কন্যা বা বধূরূপে কোন পরিবারে আশ্রয় লয়, তবে সে পতিত হইবে। এরূপ বিড়ম্বনায় মানুষ কখনও পড়ে নাই! সব কেবলই ভণ্ডামি।

সকলে। দেশটা এমনই রেখাপ্পা হয়ে গেছে, প্রাচীন কিছুরই সঙ্গে আর খাপ খায় না। উহারা আমাদেরই বংশধর, কিন্তু এমনই অন্ধ যে পূর্ব্বপুরুষকে চিনিতে পারে না, পরিচয় দিলে দূর করিয়া দেয়, অথচ আমাদের রক্ত উহাদের গায়ে আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সমাজ ও ধর্ম্ম।

একবার একটী খ্রীষ্টীয় মহিলা আমাদের বাড়ীতে আসেন। তিনি কেমন করিয়া খ্রীষ্টান্ হইলেন, সেই কথাটা বলিতে গিয়া দুই একটা এমন কথা বলিলেন, যাহা সমাজ-নেতৃগণ ও ধর্ম্মনেতৃগণ উভয়েরই একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। ঐ মহিলাটী হিন্দুর মেয়ে—ব্রাহ্মণের মেয়ে—অবস্থাপন্ন গৃহে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। জেনানা মিশনের মিশনরী মহিলারা ঐ বাড়ীতে আসিতেন ও মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মেরও তাঁরা শিক্ষা দিতেন। এই কার্য্যটা উচিত কি অনুচিত, এ স্থলে তাহা বিচার্য্য নহে। তাঁহাদের শিক্ষায় ঐ মেয়েটীর আর হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস রহিল না—তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইলেন। এ সব কথা বেশী দিন ঢাকা থাকে না। বাড়ীর লোকেরা টের পাইলেন। ঘরের বৌ, দেবতার প্রসাদ খাবে না, শুনে শর্ম্মারা অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কিন্তু ঘরের বৌকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও সহজ নহে—চারিদিকে দুর্নাম রটিবার ভয়। কাজেই তাঁরা গৃহ মধ্যেই তাঁর প্রতি নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। মেয়েটী চুপ করিয়া সব সহ্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্মগুর্ব্বী মিশনরী মহিলারা তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, "তুমি এই গৃহে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ কেন? আমাদের সঙ্গে এস, আমরা তোমাকে আশ্রয় দিব।" তিনি বলিলেন "আমি আমার পতি পুত্র কন্যাদের ছেড়ে আপনাদের সঙ্গে যাব না। আপনারা বলেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে হত হইয়াছেন এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীর ক্রুশ বহন করা কর্ত্তব্য। আমি এই গৃহে যে সকল বকুনী সহ্য করি, তাই আমার ক্রুশ। এই ক্রুশ বহনেই আমি আনন্দিতা।" অতএব তখন আর তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ হইল না—প্রকাশ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষাও হইল না। সেই হিন্দুগৃহে সে ললনা নীরবে আপনার ধর্ম্ম বিশ্বাস লইয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। সময়ে স্বামীও তাঁহার দেহত্যাগ করিলেন। তিনি হিন্দু বিধবা বেশেই নিজ বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্ম-সাধন করিতে লাগিলেন। ছেলে মেয়েরা বড় হইতে লাগিল, কিন্তু মা হিন্দুগৃহেই তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বড় মেয়েদের বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু তারা মায়ের বিশ্বাস লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে গেল। এইরূপে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—আরও অনেক ঘটনা হইল। তারপর আর হিন্দু সমাজে তাহাদের টেকা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক সকলেই খ্রীষ্টান হইলেন—সর্ব্বশেষে বিধবাও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিলেন। বিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে এক মেয়ে বিধবা হইলেন, তিনিও বাপ্তাইজিত হইলেন। আর এক মেয়ে স্বামী সহ খ্রীষ্টান হইলেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি। সব কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

এইরূপ খ্রীষ্টীয় সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অনেক ঘটনা পাওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম যতই রক্ষণশীল হউক না কেন, কোন ধর্ম্মই মানুষের মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এক ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মাপেক্ষা ভাল হউক মন্দ হউক, কতকগুলি লোক এক ধর্ম্ম ছাড়িয়া অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেই—অথবা নিজ ধর্ম্মের

কতকটা ও অপর ধর্ম্মের কতকটা মিশাইয়া একটা মিশ্রধর্ম্ম বানাইয়া লইবেই। এই সকল লোকের প্রতি সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব যুগে উৎপীড়ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে আজ কাল যে ধর্ম্ম-নৈতিক স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে কত রক্তপাতের ফল, তাহা ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। মানুষ "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করে, কিন্তু সহজে এক মানুষ অপর মানুষকে বিবেকের স্বাধীনতা দেয় না। ইহাতে ক্ষতি কাহার হয়?

মানুষ সামাজিক জীব, তাহাকে কোন না কোন সমাজভুক্ত হইয়া থাকিতেই হইবে। যখন ভারতের লোক খ্রীষ্টান্ হইতে লাগিল, তখন মিশনরীরা তাহাদের লইয়া একটা ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন করিলেন। হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের সমাজচ্যুত করিলেন, আবার খ্রীষ্টান্‌রাও আপনাদের নব বিশ্বাস ও নব রীতি নীতি লইয়া হিন্দু সমাজে থাকা সম্ভবপর দেখিলেন না। কাজেই সেকালে একটা পৃথক খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন একটা অবশ্যম্ভাবী বিষয় ছিল। সে যুগের মিশনরীরা, এদেশের ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজনীতির মধ্যে যে কোন ভাল জিনিস থাকিতে পারে, তাহা জানিতেন না। কাজেই খ্রীষ্টীয় সমাজটাকে তাঁহারা আপনাদেরই ছাঁচে গড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভারতীয় মনটা ভারতীয় উপাদানেই গঠিত। তাই এখন আবার re-action বা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ এই nationalism বা জাতীয়ত্বের যুগে চিন্তাশীল খ্রীষ্টানদের মনে বিজাতীয়ত্বের প্রতি বড়ই বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইতেছে। এমন সময় ছিল, যখন সাহেব পুরোহিত পাইলে আর সম্ভ্রান্ত দেশীয় খ্রীষ্টানেরা দেশীয় পুরোহিত দ্বারা বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান করাইতেন না। কিন্তু এখন জোয়ার উলটা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি এমন ঘটনা জানি, যাহাতে স্থানীয় সাহেব পুরোহিতকে ছাড়িয়া অন্য স্থান হইতে দেশীয় পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে খ্রীষ্টীয় সমাজে যে সাহেবীত্বে অরুচি ধরিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ যে সাহেব হওয়া নহে, এ কথাটা এখন খ্রীষ্টানেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু কথাটা সম্যকরূপে বুঝিতে এখনও তাঁহাদের অনেক দিন লাগিবে।

আবার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মটাও যে একটা প্রাচ্য ধর্ম্ম, তাহাও চিন্তাশীল খ্রীষ্টানেরা কতক কতক অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য জগৎ খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতে হইবে, তদ্বিষয়েও দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় ভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের একটা ব্যাখ্যা হইতে পারে কি না, অনেকে তাহাও ভাবিতেছেন। সে দিন বাঙ্গালোর নগরে এই বিষয় লইয়া একটা সভা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই কোন কোন বক্তা খ্রীষ্টানগণকে চিত্ত সমাধানার্থ প্রাণায়ামাদি যোগ সাধনেরও উপদেশ দিয়াছিলেন।

যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা নূতন ধর্ম্ম ও নূতন সমাজ স্থাপন করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুদের উৎপীড়নে বা অনুদারতায় ব্রাহ্মদের একটা পৃথক দল হইতে হইয়াছে। খৃষ্টানের ছেলেরা যেমন বংশগত

ভাবে খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মের ছেলেরাও তেমনি বংশগত ভাবে ব্রাহ্ম হইয়া পড়িতেছেন। আর দুই তিন পুরুষ পরে ইহাঁদের নীতি ও ধর্ম্মজীবন কিরূপ থাকিবে, তাহা ভবিষ্যৎ জানে।

এখন দেখুন, হিন্দুরা উৎপীড়ন করিয়া বা অনুদারতা দেখাইয়া একটা প্রকাণ্ড খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন করিয়াছে—ঐ সমাজের প্রত্যেকেই যে ধর্ম্মতঃ খ্রীষ্টান তাহা নহে। ঐরূপ হিন্দুদেরই উৎপীড়ন বা অনুদারতায় ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা ক্ষুদ্র সমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ঐ সমাজের প্রত্যেকেই যে ধর্ম্মতঃ ব্রাহ্ম থাকিবেন, তাহা এখনও বলিবার সময় আসে নাই। এখন, এই খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের লোক যদি কোন রকমে হিন্দু সমাজেই থাকিয়া যাইতেন, তাহাতে কি হিন্দুসমাজের অকল্যাণ হইত?

খ্রীষ্টান মিশনরীদের বিরুদ্ধে (ও ব্রাহ্ম প্রচারকদেরও বিরুদ্ধে) একটা অভিযোগ আছে যে, তাঁহারা পরের ঘর ভাঙ্গেন। পূর্ব্বোক্ত মেয়েটী যদিও গৃহে থাকিতে শত শত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিলেন, তবু তাঁহাকে স-সন্তান ঘর ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেই হইল। মানুষ কি করে? তাহাকে কোন না কোন সমাজের আশ্রয়ে তো থাকিতেই হইবে। সে আশ্রয় স্থলটা সর্ব্বাংশে মনের মত হউক আর না হউক, পূর্ব্ব স্থান অপেক্ষা অনেকটা নিরুপদ্রব, ইহাই যথেষ্ট। যদি হিন্দু সমাজ মানুষকে বিবেকের স্বাধীনতা দেয়, তাহা হইলে মিশনরী ও প্রচারকদের বিরুদ্ধে ঘর ভাঙ্গার অভিযোগ উত্থাপন করিবার আবশ্যকতাই হইবে না। হিন্দু সমাজ অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ছেলেবেলায় হেমচন্দ্রের কবিতায় পড়িয়াছিলাম—

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।

কিন্তু হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর নব সংস্করণে এখন—

চীন, ব্রহ্মদেশ, সুসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।

"অসভ্য" শব্দটাকে "সুসভ্য" করায় কবিতার ওজস্বিতা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবির ওজস্বিতা কমুক বা বাড়ুক, জাপানকে এযুগে অসভ্য বলিবার অধিকার কাহারও নাই। এই "অসভ্য জাপান" কিরূপে "সুসভ্য" হইল, তাহার ইতিহাসটা অনেক দিনের নহে। এই ইতিহাসে আমাদের শিখিবার অনেক কথা আছে। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে দুইটী কথার দিকে আপনাদের একটু মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

(১) জাপানীদের মধ্যে আমাদের দেশের ন্যায় জটিল জাতিভেদ না থাকিলেও যে এক প্রকার ভয়ঙ্কর শ্রেণী-বিভাগ ছিল, তাহা আপনারা জানেন। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান ও আহার বিহার নিষিদ্ধ ছিল। জাপানীরা যখন দেখিল, এই শ্রেণীবিভাগ লইয়া তাহাদের জাতীয় উন্নতি ও সভ্যজাতিদের সমকক্ষতা লাভ অসম্ভব, তখন তাহারা একপ্রাণ হইয়া এই শ্রেণী-বিভাগকে সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক চিরতরে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল।

(২) অর্দ্ধ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে জাপানে কেহ খ্রীষ্টান হইলে তাহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ ছিল। আজ জাপানে ধর্ম্ম বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। অন্য ধর্ম্ম অবলম্বনে মানুষ সমাজচ্যুত হয় না। একারণ জাপানে একই পরিবারে একজন বৌদ্ধ,

একজন সিণ্টো, একজন খ্রীষ্টান ও একজন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও একত্র মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে। চাই মন্দিরে যাও, চাই মসজিদে যাও, চাই গির্জ্জায় যাও, তোমার ইচ্ছাধীন। আহার বিহার, আদান প্রদানে কোন প্রকার বাধা নাই। সমগ্র জাপানী একই সমাজে আবদ্ধ থাকায় জাপানের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

চীন দেশেও এখন এই ধর্ম্ম নৈতিক স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। অখ্রীষ্টান চীনী ও খ্রীষ্টান চীনী মিলে মিশে দেশটাকে আগে বাড়াবার চেষ্টায় আছে।

ভারতে এযুগে কি আমরাও এইরূপ একটা সামাজিক সংহতি স্থাপন করিতে পারি না? জাতিভেদটা তুলিয়া দিলে ও বিবাহের বৃত্তটাকে একটু প্রসারিত করিলে আমরাও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি। বিভাগ অকল্যাণকর। জাতিভেদ হিন্দুজাতিকে শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে—হিন্দুজাতিকে পরের দাস ও পরের গোলাম বানাইয়াছে। যতদিন জাতিভেদ থাকিবে, ততদিন হোমরুলই বল, আর স্বরাজই বল, কিছুতেই কিছু হইবে না, আমরা পরের জুতা বহিব ও পর পদতলে বিদলিত হইব। যাহা পাপ, তাহা পাপ। আশীর্ব্বাদ পুণ্যময় ঈশ্বরের হাতে। এই পাপের কালি বুকে লইয়া কিরূপে আমরা স্বাধীনতা, সুখ ও সমৃদ্ধি পাইতে পারি?

একে জাতিভেদে সমাজ উচ্ছন্নে গিয়াছে, তার পর তোমরা ধর্ম্মের নামে মানুষকে সমাজচ্যুত কর। যে লোকটা মদ খায়, বেশ্যা গমন করে, পরস্বাপহরণ করে, তাকে তোমরা সমাজচ্যুত করিতে পার না—সমাজ সে ক্ষেত্রে paralized বা পক্ষ রোগাক্রান্ত। কিন্তু মানুষ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত কর। বারবণিতারা পর্য্যন্ত "বৈষ্ণবী" নামে সমাজ বক্ষে বিচরণ করিতেছে! সেন্সাসের খাতায় এই "বৈষ্ণবীরা" হিন্দু বলিয়া উক্ত হয় কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু অনেক খ্রীষ্টানকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও "অহিন্দু" নামে অভিহিত হইতে হয়। হিন্দুত্ব কি শুধু জাতিভেদ মানায় ও ঠাকুর পূজায় পর্য্যবসিত? হিন্দুত্বের কি আর কোন উদার ও দৃঢ় ভিত্তি নাই? এযুগে সেই উদার ও দৃঢ় ভিত্তিটা কেন খুঁজিয়া বাহির কর না? সকলকে ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা দাও। এ সময় পৃথক্ পৃথক্ থাকিবার সময় নয়? পার্থক্যে মৃত্যু, ঐক্যে জীবন। ঐক্যে বৈচিত্র্য থাকিবে। কিন্তু বৈচিত্র্যে একত্ব সাধনই দেশ ও সমাজের প্রাণ। খ্রীষ্টান্ ও ব্রাহ্মেরা সামাজিক ভাবে সাধারণ হিন্দুগণ অপেক্ষা অনেকটা সুখ ও স্বচ্ছন্দে আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এসময় সুখ ও স্বচ্ছন্দে থাকিবার সময় নয়। দেশের এ-দুর্দ্দিনে স্বার্থনাশ ও সমবেত শক্তির দরকার। স্বার্থনাশের অর্থ অবশ্য বিবেক নাশ নহে। প্রত্যেকের বিবেক বজায় থাকিবে, অথচ আমরা সব মিলে মিশে একই সমাজ, একই জাতি হইব। তাহা কি অসম্ভব? তাহা যদি অসম্ভব হয়, তবে এই মিছা মিছি "ভারত সংস্কার" "ভারত সংস্কার" বলিয়া চেঁচামেচির প্রয়োজন কি? এস, এক অপরের গলা কাটি ও ভারত সাগরের জলে ডুবিয়া মরি! "বৈচিত্র্যে একত্ব সাধন" "unity in diversity" ইহাই এ যুগে ভারতের জীবন মন্ত্র। বিবেকের স্বাধীনতা দাও, যার ইচ্ছা মন্দিরে যাক, যার ইচ্ছা মসজিদে যাক, যার ইচ্ছা গির্জ্জায় যাক। সমাজটাকে এক রাখ—সমগ্র ভারতকে এক জাতি বানাও। ধর্ম্ম নানা হউক, কিন্তু সমাজ ও জাতি একই হউক। অনর্থক ধর্ম্মের নামে ভাল মানুষকে সমাজচ্যুত করিয়া তার, আপনার ও দেশটার কেন সর্ব্বনাশ করিতেছ?

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

প্রাচীন ভারতে জাতি বিভাগের উৎপত্তি ও উহার প্রসার।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, মীরাট শাখায় পঠিত।)

পৃথিবীর যে কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদ্দেশবাসীদিগের মধ্যে জাতিবিভাগ প্রথা ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান থাকিলেও তাঁহারা এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, এক জাতি বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু ভারতবর্ষ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিপরীত ভাবাপন্ন। প্রাচীন ভারতের অধিবাসিগণ "আর্য্য" নামের বিষয়ীভূত হইলেও তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রধানতঃ এই চারিবর্ণে বিভক্ত ছিলেন তাহা হইতে আবার অসংখ্য শাখা উপশাখা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ শরীর পুষ্ট করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অভিঘাতে ভারতীয় হিন্দু সমাজ শরীর এখন জীর্ণ শীর্ণ—কিন্তু জাতিভেদ প্রথা এমনি ভাবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অস্থি মজ্জায়, শিরায় শিরায়, অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা সমাজের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে আপামর জনসাধারণের এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই জাতিবিভাগ প্রথা প্রকৃতিগত। বাস্তবিক এই জাতিবিভাগ প্রথার উৎপত্তির নিদান কি, ও কি ভাবেই ইহা হিন্দুসমাজে প্রসারলাভ করিয়াছে, আমরা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বায়ুপুরাণ বলিতেছেন :—

"নির্ব্বিশেষাঃ কৃতে সর্ব্বা রূপায়ুশীল
চেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধি পূর্ব্বকং বৃত্তিঃ প্রজানাং জায়তে
স্বয়ম্ ॥ ৫৯
অপ্রবৃত্তিঃ কৃত যুগে কর্ম্মণোঃ
শুভ-পাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্
ন সঙ্করঃ ॥ ৬০। ৮অ

অর্থাৎ সত্যযুগে প্রজাগণের মধ্যে রূপ, আয়ু, শীল ও চেষ্টাতে কোন প্রভেদ ছিল না। কেহ বুদ্ধির সাহায্যে কার্য্য করিতে পারিত না। উক্ত যুগে পাপ পুণ্য বলিয়া কোন ভেদ ছিল না। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও ছিল না। সঙ্কর কাহাকে বলে তাহাও কেহ জানিত না। মহাভারত বলিতেছেন :—

"এক বর্ণমিদং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির
কর্ম্মক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্
ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং
ব্রহ্মমিদং ভাগ্য
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্ ॥

ঋগ্বেদেও আমরা দেখিতে পাই—

"ব্রহ্ম জজ্ঞান প্রথমং"

"প্রথমে ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হয়েন"। ইহারই অনুবাদচ্ছলে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলিতেছেন—

ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্রে আসীৎ একমেব
তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ। ২৩৩ পৃঃ।

পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ জাতি ছিল, তাহা সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইল না, তাই "তৎ শ্রেয়রূপ মত্যসৃজত ক্ষত্রং" তৎপর সামাজিকেরা সেই ব্রাহ্মণ হইতে সমাজের মঙ্গলকর ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিলেন, তাই উক্ত হইয়াছে—

"সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্য্য ব্রহ্ম"—সেই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ জাতিই ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি স্থান। কিন্তু উক্ত জাতিদ্বয় দ্বারা সমাজের সকল কার্য্য সুচারুরূপে চলিল না, তাই পরেই উক্ত হইয়াছে, "স নৈব ব্যভবৎ স বিশ মসৃজত"। ২৩৮ পৃঃ।

তাহা হইতে বৈশ্য জাতির সৃষ্টি করা হইল। ইহাতেও সমাজনেতারা দেখিলেন যে, উক্ত জাতিত্রয়ও সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

স নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণ
মসৃজত। ২৩৮ পৃঃ।

যাহা হউক, উদ্ধৃত শাস্ত্র বচন হইতে ইহাই আমরা জানিতে পারি যে, প্রাচীন আর্য্যগণ সমাজের সুশৃঙ্খলতার জন্য একই বর্ণকে গুণ ও কর্ম্মভেদে শ্রেণী চতুষ্টয়ে বিভক্ত করেন।

"বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।" ৬০।৫৭ অ; বায়ুপুরাণ।

এই জন্যই গীতাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিচ্ছলে বলিতেছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং * গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"

গুণই বর্ণ বা জাতির নিয়ামক, তাই আমরা মন্বাদি সংহিতায় ও অন্যান্য পুরাণাদিতে উচ্চ বর্ণকে হীনবর্ণে ও হীনবর্ণকে উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতে দেখিতে পাই। আমাদের এই উক্তির সমর্থনের জন্য আমরা কতিপয় প্রমাণ অধ্যাহার করিব।

মহাত্মা মনু বলিতেছেন, "শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।"

উক্তঞ্চ শ্রীমতা পরাশরেণ—

"শূদ্রোপি শীল সম্পন্নো গুণবান
ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো
ভবেৎ॥"

শূদ্র শীল সম্পন্ন হইলে গুণবান ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকেন। আর যদি ব্রাহ্মণও ক্রিয়াহীন হয়েন তবে তিনিও শূদ্র হইতে অপকর্ষ ভজনা করেন।

বায়ুপুরাণে বিবৃত রহিয়াছে—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভি
দ্বিজাঃ॥ ৪—৩০ অ

গৃৎসমদের পুত্র শুনক। শুনকের পুত্র শৌনক, সেই শৌনকের চারি পুত্র কর্ম্ম ও গুণগত পার্থক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় ভজনা করেন।

হরিবংশও বলিতেছেন—

—এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রাজাতা বংশে হথ ভার্গবে
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ
ভরতর্ষভঃ।৪০।৩২ অঃ

ইহারা বীজী অঙ্গিরসের সন্তান। তাঁহারা ভৃগুবংশ বলিয়া প্রখ্যাত। এই বংশের লোকেরা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ শূদ্র হইয়াছিলেন।

* "ময়া সৃষ্টং"—'ঈশ্বরেণ সৃষ্টং' এই ব্যাখ্যাও পৌরাণিক প্রমাদ সমুখ।

মহাভারতে লিখিত রহিয়াছে—

"ততো ব্রাহ্মণতাং জাতো বিশ্বামিত্রো
মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশকারকঃ॥

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও কেবল তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাও নহে, তাঁহা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণবংশেরও সমুৎপত্তি হয়।

হরিবংশের অন্যত্র বিবৃত রহিয়াছে—

দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ূ নৃপঃ
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্ততঃ স্মৃতা
এতে বৈ সংশ্রিতাং পক্ষং ক্ষত্রোপেতাস্তে
ভার্গবঃ॥

অর্থাৎ মহারাজ দিবোদাস ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি মিত্রয়ূ অতীব ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। উক্ত ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ুর পুত্র সোম এবং উক্ত সোমের বংশধরেরা "মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত।

ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছেন—

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ স্বপাকাশ্চ
পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কনাদাদ্যঃ তথোলুক্যাঃ
সুতোঽভবৎ॥ ২২
মৃগীজা ঋষ্য শৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালা মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য
মুচ্যতে॥ ২৩
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মুশুকী গর্ভ সম্ভূতঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রবৎ
দ্বিজা॥ ২৪
—৪২ অ, ব্রাহ্মপর্ব্ব ভবিষ্যপুরাণ।

অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, কৈবর্ত্ত-কন্যা, পরাশর স্বপাক কন্যা, শুকদেব শুকী, মহর্ষি কনাদ উলুকী, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী, জগদ্বন্দ্য বশিষ্ঠ স্বর্গ বেশ্যা উর্ব্বশী, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাক নাবিক কন্যা ও মুনিরাজ মাণ্ডব্য মুস্তফী নাম্নী নারী প্রভৃতির গর্ভ সম্ভূত। আরও অন্যান্য অনেকে শূদ্র হইয়াও গুণগরিমায় ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। কি গুণগরিমায় ইঁহারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন? জগৎ-গুরু ভূদেব ব্রাহ্মণ কে? মহাভারত বলিতেছেন—

জিতেন্দ্রিয়ঃ ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচি।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা
ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

যাহা হউক, বাহুল্য বোধে আমরা অধিক প্রমাণ অব্যাধারে বিরত হইলাম। ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে জাতি বিভাগ প্রথা জন্মগত ছিল না, পরন্তু গুণগত ও কর্ম্মগত ছিল। কতকটা একালের এনট্রান্স (Entrance) আই, এ (I. A.) বি-এ (B. A.) এম্-এ (M. A.) তর্করত্ন প্রভৃতি উপাধির ন্যায় ছিল। যেমন এম্-এ (M. A.) বি-এ (B. A.) ও তর্করত্ন প্রভৃতির পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া ঐরূপ উপাধি-লাভে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পুত্রগণ প্রকৃত গুণবান না হইলে প্রাচীনকালে ঐরূপ হইতে পারিতেন না।

অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেন জগন্মান্য বেদেই ত বিশদাক্ষরে বিবৃত রহিয়াছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং মনুষ্যগণকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বেদাচার্য্য পূজনীয় সায়নাচার্য্যও উক্ত মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। হাঁ, পুরুষ সুক্তের দ্বাদশ মন্ত্র বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যৎ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

সায়ণভাষ্য ;—অস্য প্রজাপতে ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণত্ব জাতি বিশিষ্টা পুরুষো মুখমাসীৎ মুখাদুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যেঽয়ং রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি বিশিষ্ট স্য বাহু কৃতঃ বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ বাহুভ্যামুৎপাদিতঃ ইতর্থঃ। তৎ তদানী মস্য প্রজাপতে যদ্বৌ উরূঃ তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্ন উরুভ্যামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথাস্য পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ শূদ্রত্ব জাতিমান্ অজায়ত।

বেদাচার্য্য সায়নাচার্য্যের এ ব্যাখ্যা কতদূর সাধীয়সী তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন, কারণ আমি পণ্ডিতজ্ঞ নহি বা বেদজ্ঞ নহি—তবে আমরা উক্ত ভাষ্যে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। কারণ (১) বিবেক ও যুক্তি ইহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী (২) বেদ উপনিষৎ যখন সমস্বরেই বলিয়াছেন "ঈশ্বরের কোনও দেহ নাই, সুতরাং মুখাদিও নাই "অস্থন্বন্তং যদানস্থা বিভর্ত্তি।" ঋকবেদ। যাঁহার নিজের অস্থি নাই সেই অস্থিহীন ভগবান অস্থিবিশিষ্ট মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তথা হি উপনিষৎ :—

"ওঁ সপর্য্যাগাৎ শুক্র মকায় মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" সেই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, কায়রহিত, ব্রণ ও স্নায়ুহীন, শুদ্ধ ও পাপপরিশূন্য, সুতরাং বেদ কি প্রকারে বেদ বিরুদ্ধ কথা বলিবেন? এরূপ স্থলে মহাত্মা সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা কতদূর যুক্তিযুক্ত (rational) তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে উক্ত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা কালে ঋক্‌বেদের প্রকৃতার্থবাহিনী টীকাকার পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত (rational) এবং সর্ব্ব বিষয়েই সমন্বয় রক্ষিত হইয়াছে এইরূপ বিবেচিত হওয়ায় উহা নতমূর্দ্ধা হইয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"কেহ পুরুষ সূক্তের ১১শ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই সায়ণ ব্যাখ্যা গরীয়সী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ১১শ মন্ত্র বলিতেছেন 'সৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহু কৌ উরূ পাদৌ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ—যখন দেবতারা যজ্ঞ করেন তখন তাঁহারা বিরাট পুরুষকে যজ্ঞের পশু কল্পনা করিয়াছিলেন, তাই এই মন্ত্রে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা প্রশ্ন করিতেছেন যে, বিরাট পুরুষকে যজ্ঞে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল সে কত খণ্ড? এই বিরাট পুরুষের মুখ কি ছিল? বাহু ও উরুদ্বয় কি কি ছিল? এই পদদ্বয়ই বা কি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল? * * *

দ্বাদশ মন্ত্রেরও কি প্রত্যেক পদে অপাদানের চিহ্ন রহিয়াছে? কখনও নহে।

প্রশ্ন।

মুখং কিমস্য
কৌ বাহূ
কৌ উরূ
কৌ পাদৌ উচ্যতে

উত্তর।

ব্রাহ্মণঃ অস্য মুখম্ আসীৎ
বাহূ রাজন্য কৃতঃ
উরূ তদস্য যৎ বৈশ্য
পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত

* * * 'পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' এই অংশের অপাদনকে নিরঙ্কুশ আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীললিতমোহন রায়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। (শেষ)

(৮০ পৃষ্ঠার পর।)

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই সকল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিদর্শন জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে যে বেতন পান, তার উপর আরও ২০০৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও স্কুল সমূহের পরিদর্শক, দুই কাজই করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গভর্ণর সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কত জন কত রাজ-পোষাকে সজ্জিত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দ্বারে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, তাঁর গৃহ, লংক্লথের সামান্য উত্তরীয়, শাদা থান ধূতি ও তালতলার সামান্য চটী-পরিহিত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট চির-অবারিত। কত লোক রাজপ্রতিনিধি-দর্শনের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেন। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় যাইবা মাত্রই তিনিই সর্ব্বপ্রথম আহূত হইতেন। লংক্লথের উত্তরীয় ও চটীর অভ্যন্তরে কত আত্মমর্য্যাদা ও নিঃস্বার্থ মানব-হিতৈষণার জ্বলন্ত বহ্নি জ্বলিতেছিল, তাহার নিকট এক অমানুষিক শক্তির জ্বলন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া সকলেই মস্তক নত করিবেন। এই সময় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হয়। তিনি সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। পরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু শিক্ষকদিগের বেতন প্রদান করিতে ডিরেক্টর অস্বীকৃত হন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর পাঁচ শত টাকা বেতনের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। লেপটেনেণ্ট-গবর্ণরের আগ্রহাতিশয়, বন্ধুগণের অনুরোধ উপরোধ কিছুতেই অর্থের জন্য চাকুরী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। আর একবার তিনি আত্ম সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁর আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি দেশের সেবার জন্য আবার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার যখন দেখিলেন, তিনি যে দেশসেবার অনুরোধে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশ-সেবা ব্রতেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হইলেন, তখন কি তিনি সামান্য অর্থের লোভে কিম্বা শারীরিক পশু জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য দাস বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন? বিদ্যা বিতরণ করাই যে ভারতের প্রাচীনতম প্রথা, সে ভারতের প্রধান বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি কি কখনও বিদ্যা-বিক্রয়ের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া পারেন? তথাপি দেশে সর্ব্বজাতিতে সর্ব্ব শ্রেণীতে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শিক্ষা বিস্তার জন্য ও তাঁহার অতি প্রিয় শিক্ষা-মন্দির সংস্কৃত কলেজের উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যেই তিনি চাকুরী-জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর যখন সেই উচ্চ ব্রত সাধনে তিনি বাধা প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি পাঁচ শত টাকা বেতনের উচ্চপদ লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন। কঠোর তপস্যাই যাঁহার জীবন, দারিদ্র্যের মধ্যে যিনি লালিত পালিত বর্দ্ধিত, তিনি ত জীবন-সংগ্রামে চিরজয়ী। মনুষ্যত্ব যাঁর জীবনের উচ্চ সাধনা, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় যাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, পরম পিতা পরমেশ্বর যাঁহার জীবনে উচ্চ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য অসীম মানসিক শক্তি,

উজ্জ্বল প্রতিভা, দয়ার কোমল মহৎহৃদয় প্রদান করিয়াছেন, লক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ করিয়া লয়। অর্থের অভাব তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে কেন?

সাহিত্য-সেবা।—কর্ম্মজীবনে থাকিতে থাকিতেই তিনি হিন্দি হইতে বেতাল-পঞ্চবিংশতি, ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, কবিতাবলী প্রভৃতি বালক-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অনুবাদে প্রাণ ও প্রাণের গতি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে এত প্রাঞ্জল ও সুন্দর করিয়া তুলিতেন যে, তাঁহার কোন গ্রন্থকে অনুবাদ বলিয়াই মনে হয় না। তাঁহার অনুবাদে এমন একটী ছন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে হৃদয় স্বতঃই সঙ্গীতের মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠে। এইজন্য শিশুগণ তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা ও আনন্দ, উভয়ই লাভ করে। তাঁহার ভাষা হৃদয়কে স্পন্দিত করে বলিয়া তাহা মানস-পটে এত সহজে মুদ্রিত হইয়া যায়। তিনি ক্রমে অনেক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার শকুন্তলা ও সীতার বনবাস এখনও বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ; এবং আরও অনেক অনেক দিন এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। বিদ্যারম্ভে বর্ণপরিচয়, তারপর বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, চরিতাবলী, এবং পরিশেষে শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পাঠ করিয়া কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থপাঠেই এক জন বাঙ্গালা ভাষার সুপণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারেন। এইজন্য বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, হাকিম, কৃষক, সকলের মুখেই বিদ্যাসাগরের নাম। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৌরবে মণ্ডিত হইয়া গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার এই গ্রন্থ বিক্রয় হইতে স্রোতের ন্যায় অর্থ আসিতে লাগিল। তিনি দয়াদ্বারা প্রণোদিত হইয়া শত শত বিপন্নকে নানাপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে, সহস্র সহস্র নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টকে জীবন দান করিতে এই অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন।

সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া যায় না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে একটী আকার দান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে এক বিশেষ সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা গদ্য সমাস-বহুল শব্দ-যোজনায় মন্থরগতি ও বিকলাঙ্গ। তাহার নিজের কোন সহজ গতি-ভঙ্গি, বিশিষ্ট আকার-শ্রী ও ধ্বনি বঙ্গভাষা লাভ করিতে পারে নাই। হৃদয়ই পূর্ণজীবন; বুদ্ধি তাহার একদেশ মাত্র। বাঙ্গালা গদ্য কঠোর চিন্তা প্রকাশেরই ভাষা ছিল। বাঙ্গালা পদ্যই হৃদয়ের ভাষা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যকে ভয়, বিস্ময়, শোক, আনন্দ, মাধুর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব-বৈচিত্র্য-প্রকাশের উপযোগী করিয়াছেন। হৃদয়ের পূর্ণপ্রাণ তানলয় সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে; হৃদয় সঞ্চারিত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাষাকে জীবন্ত ও স্বচ্ছন্দ গতিশীল, হৃদয়ের পূর্ণপ্রাণের ঝঙ্কারে সঙ্গীতময়, ভাবের উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের চিরনবীনতায় সুন্দর সুকোমল সংস্কৃতমূলক সমাস-বহুল ভাষাকে তাহার আদি-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙ্গালী হৃদয়ের স্পন্দনে পূর্ণ জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুমহৎ কীর্ত্তি। তিনি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভাষার এই অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ভাষা অবলম্বনে বাঙ্গালায় জাতীয় জীবনের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালীজাতি তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ। বাঙ্গালী মাত্রই আজ যদি বাঙ্গালা ভাষার জন্য গৌরব অনুভব করেন, সেই গৌরবের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণতলে ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিবে। আজ যদি বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য পৃথিবীর ভাষাসমূহের মহাসভায় উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, সেই গৌরব কি স্বর্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমরাত্মা অনুভব করিতেছেন?

দয়া-ব্রত।—দয়া তাঁহার প্রকৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান, দয়া তাঁর ভূষণ, দয়া তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। কবিবর নবীনচন্দ্র তাঁহার পলাশী যুদ্ধের উৎসর্গ পত্রে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"তাঁহার দয়ার সাগরের বারিবিন্দু সিঞ্চনে যে হৃদয়-কানন দারিদ্র্যের দাবানল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সেই হৃদয়-কাননের এই সামান্য কুসুম তাঁহারই চরণে উৎসর্গীকৃত হইল।" কত জীবন-কুসুম, উজ্জ্বল প্রতিভা তাঁহার দয়া না পাইলে অকালে কাল-কবলে পতিত হইত, বলা যায় না। মধুসূদনের যে উজ্জ্বল কবি-প্রতিভা কাব্য-'মধুচক্র' রচনা করিয়াছে, "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি," এবং "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া বঙ্গ জননীর বন্দনা গান করিয়াছে, তাহা বিকশিত হইবার বহু পূর্ব্বেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত, যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার করুণ হৃদয়ের বেষ্টনে তাহাকে রক্ষা না করিতেন। কোথায় দুঃখিনী পতিহীনা জননী সন্তান বক্ষে লইয়া অনাহারে পথিপার্শ্বে রোদন করিতেছে, আর দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রে করুণ হৃদয় তাহার ক্রন্দনে আত্মহারা হইয়া বিগলিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; কোথায় পিতৃমাতৃহীন শিশু নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া আছে, আর ঈশ্বরচন্দ্র তাহার আশ্রয় স্বরূপ হইয়া তাহার শিক্ষার ও উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন। শীর্ণ-দেহ, কঙ্কাল-মাত্র সার, অনাহার-ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, সহস্র সহস্র নর-নারীর মুখে তিনি স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতেছেন—সে দৃশ্য স্বর্গের দৃশ্য! ভগবানের করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন অবতীর্ণ; শ্রীবুদ্ধদেবের মৈত্রী করুণা যেন আবার ঈশ্বরচন্দ্র-মূর্ত্তিতে পতিত বঙ্গদেশকে ধন্য করিবার জন্য স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় দয়ার অনন্ত প্রস্রবণ। যখন নিজের আহারের সংস্থান ছিল না, তখনও বালক ঈশ্বরচন্দ্র নিজের বৃত্তির টাকায় নিজে না খাইয়াও সহপাঠীকে খাওয়াইতেন, দরিদ্র ছাত্র কি কলেজের ভৃত্যের গাত্রাবরণ কিনিয়া দিতেন। যখন সামান্য মাত্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন, তখনও কত নিরাশ্রয় ছাত্রকে নিজের বাসায় আশ্রয় ও আহার প্রদান করিয়া তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। আর, যখন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মফঃস্বলে পরিভ্রমণ করিতেন, তখন তিনি অকাতরে দুইহস্তে অর্থ বিলাইতেন। বঙ্গের সমুদয় দরিদ্র-প্রাণ, দুঃখী-হৃদয় তাঁহাকে "দয়ার সাগর" বলিয়া অভি-

নন্দিত করিয়াছে। পল্লীর কৃষক বালকও গান করিত—"দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর চিরজীবী হও।" তাঁহার ভ্রাতৃবধূ যখন তাঁহার নিকট গহনা চাহিয়াছিলেন, তিনি দীন দরিদ্রকে বিতরণের জন্য চাউলের ভাণ্ডার গৃহে রাখিতেন, তাহার চাবি তাঁহাকে দিয়া বলিলেন—"দানই হস্তের শোভা সম্পাদন করে।"

তাঁহার দয়া অন্ন দান করিয়া তৃপ্ত হইত না। রোগীর সেবায় তিনি জননী সদৃশ। এক সময় বিসূচিকা রোগীর নিকট কেহ যাইতে চাহিত না। নিকট আত্মীয় যাঁরা, তাঁরাও বিসূচিকা রোগীর সেবা করিতে ভয় পাইতেন। দাস দাসীর এই রোগ হইলে, তাহাদের ত কোন সেবা যত্নই হইত না, তাহারা অযত্নেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এখন ডাক্তারগণ পতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই রোগ এত সংক্রামক ব্যাধি নয়, নিয়মিত আহার করিলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে, আহারের পূর্ব্বে হস্তপদাদি ভালরূপে প্রক্ষালন করিয়া আহারে বসিলে ও জল প্রভৃতি পানীয় দ্রব্যে রোগের বীজ যাহাতে প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এবং তাহা ভালরূপ ফুটাইয়া ব্যবহার করিলে, সমস্তদিন রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ও রোগীর সেবা করিলেও রোগে আক্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যু-ভয় জয় করিয়াছিলেন। যে রোগীর সেবা যত্ন হইত না, তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাদ্বারা রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া কেহ রাস্তায় পড়িয়া আছে, তিনি যদি দেখিতে পাইতেন, তাহাকে কোলে লইয়া তিনি বাড়ী লইয়া আসিতেন, এক এক বার তাঁহার সমস্ত শরীর রোগীর উদ্গীর্ণ পদার্থ ও মলে ভাসিয়া যাইত। নিজ হস্তে তাহার মল পরিষ্কার করিতেন, নূতন বস্ত্র ও বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতেন। তাহার সহাধ্যায়ী ছাত্র, পরিচিত বন্ধু কি অধ্যাপকদের রোগ হইলে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় কে তাঁহাদের অক্লান্ত সেবা করিতেন? যখন দেশে যাইতেন, গ্রামস্থ সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রোগীর সেবা করিতেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের দয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর সাময়িক দুঃখ দূর করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিল না। অজ্ঞানতা অনেক দুঃখ দারিদ্র্যের জননী। দেশের এই অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। নিজের ব্যয়ে স্বগ্রামে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, ও শ্রমজীবীদিগের শিক্ষার জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রকে বেতন দিতে হইত না। আনেক গ্রামে তিনি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা মহিলা শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজ স্থাপনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি তাঁহার শিক্ষামন্দির—মেট্রপলিটন কলেজ। গরিব ছাত্রদিগের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য এই কলেজ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই উচ্চ সৌধ চিরকাল তাঁহার দয়ার উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে।

যে হৃদয় আতুর প্রাণের ক্রন্দনে আকুল হইয়া উঠিত, সে হৃদয় কি বিধবার দুঃখে, নারীর অমর্য্যাদায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে? তিনি পুরুষের বহুদার পরিগ্রহ রূপ সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে সতেজ লেখনীধারণ

পূর্ব্বক ওজস্বী ভাষায় প্রতিবাদ করিয়া সমাজে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের গ্রামে বালবিধবার দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি দরদর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার জননী দেবীর হৃদয়ও অস্থির হইয়া উঠিল; তাঁহার জননীদেবী তাঁহাকে বলিলেন—"ঈশ্বর, শাস্ত্রে কি এই সকল বালবিধবাদের জন্য কোন ব্যবস্থা পাওয়া যায় না?" তাঁহার পিতাও তাঁহাকে বিধবার দুঃখমোচনের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রমূলক যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার হৃদয়ের সুকোমল দয়া ভৈরবী মূর্ত্তিধারণ করিয়া সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে আগ্নেয়বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আগ্নেয়-গিরির অগ্নি উদ্গমের ন্যায় অগ্নিময় ভাষায় সকলের নিদ্রিত প্রাণে নূতন উত্তেজনা সঞ্চারিত করিল; দেশের শক্তিশালী লোকদিগের অল্প কয়েকজন মাত্র তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ লোকই তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিল। এমন কি, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন গভীর রাত্রিতে তিনি সংস্কৃত কলেজ তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন ও গ্রন্থ লেখার কার্য্য সেই দিনের শেষ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিরোধী-পক্ষ-নিয়োজিত একজন বলিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্ত লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যষ্টি প্রহারে তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হয়। তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য নিজের লৌহ-কঠিন হস্তে সমুদয় লগুড়প্রহার গ্রহণ করিয়া প্রভুর জীবন রক্ষা করিয়াছিল। যে ভৃত্য আজ তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, সে এক সময় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদিন যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় গ্রাম বীরসিংহ হইতে কলিকাতা আসিতেছিলেন, তখন তিনি সেই দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার নির্ভীক তেজঃপুঞ্জ দৃষ্টি ও মুখশ্রী, তাঁহার সদাশয়তা ও ক্ষমা, প্রেম ও দয়া এই দস্যুর প্রাণকে বিকলিত করিল, সে তাহার পদতলে পড়িয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার হইয়া গেল। প্রেম ও ক্ষমার কি অপূর্ব্ব মহিমা!

মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ ঈশ্বরচন্দ্রের অতুলনীয়। তিনি মাতাপিতাকে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। পিতা মাতার সেবা করিয়া তাঁহাদের চরণতলে প্রণত হইয়া তিনি হৃদয়ের ভক্তি বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতেন। তাঁহাদিগকে সুখী করা, তাঁহাদের সেবা করা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ছিল। দয়া ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিসমূহ কেবলমাত্র বন্ধুজনে পর্য্যবসিত হয় না। তাহার মধ্যে স্বর্গীয় তেজ ও অমানুষিক শক্তি নিহিত আছে। হৃদয়ে যখন কোন প্রবলভাবের বন্যা বহিত থাকে, তাহার নিকট সমুদয় বাধা বিঘ্ন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। হৃদয়ের শক্তির নিকট প্রকৃতি মস্তক নত করে, পর্ব্বত সরিয়া দাঁড়ায়, সমুদ্র আপন বক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহার গতি-পথ বিস্তৃত করিয়া দেয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। তিনি ছুটীর প্রার্থনা করিলেন; কর্ত্তৃপক্ষ ছুটী দিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার জননী দেবী যে চক্ষুর জলে ভাসিয়া যাইবেন, এই কথা মনে হইবার মাত্র, তাঁহার জননীর সেই সজল-

বদন মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারির নিকট কর্ম্ম-পরিত্যাগ-পত্র লইয়া গিয়া বলিলেন—"আমার জননীর হৃদয়-বেদনা আমার সকল অর্থ কষ্টের অনেক ঊর্দ্ধে, আমার কর্ম্ম পরিত্যাগপত্র গ্রহণ করেন; আমি জননীর তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিলাম।" সেই কর্ম্মচারী তাঁহার অবলা মাতৃ-ভক্তি দেখিয়া হৃদয়াবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ছুটী প্রদান করিলেন। তিনি ছুটী পাইবা মাত্র পদব্রজে দেশাভিমুখে ছুটিলেন। তখন বর্ষাকাল। যখন দামোদরের তীরে উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। নদী তখন কানায় কানায় প্রবল স্রোতে তীর বেগে ছুটিয়াছে। তখন একখানি নৌকাও ঘাটে ছিল না। জননীর বিষাদ-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। তিনি প্রবল স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক নদী অতিক্রম করিবার জন্য নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। হৃদয়ের আত্মহারা ভাব বাহুতে অসীম শক্তির সঞ্চার করিল। নদী যেন এই মাতৃভক্ত সন্তানকে বক্ষে লইয়া আপনি ধন্য হইয়া উঠিল। কত যুগ ধরিয়া এই পর্ব্বত-দুহিতা নদী যৌবনের তরঙ্গায়িত পূর্ণ জীবনে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর তাহার উপর দিয়া প্রখর সূর্য্যকিরণে ঝলসিত করিয়া সুমন্দ বাতাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উল্লাসময় নর্ত্তনে বক্ষ সচঞ্চল করিয়া কিম্বা প্রবল ঝড়ের তাড়নে বৃক্ষকে সংক্ষুব্ধ ও বিলোড়িত করিয়া, ঘন মেঘের কৃষ্ণচ্ছায়ায় বক্ষ অন্ধকারে আবৃত করিয়া, কিম্বা শরতের বিক্ষিপ্ত মেঘমালার বিচিত্র সৌন্দর্য্যে নদীবক্ষ চিত্রিত করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যায় আকাশের বর্ণবৈচিত্র্যময় শোভা প্রতিফলিত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কত ভক্তহৃদয়ের ভক্তি-বন্ধন-লিপ্ত পুষ্পমালায় বক্ষ সজ্জিত হইয়াছে। কত শ্বেত পালে সজ্জিত তরণীর বহর সঙ্গীতে ভাসাইয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত পণ্য দ্রব্য লইয়া অর্ণবপোত তাহার শান্ত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু আজ এই মানব-দেবকে বক্ষে লইয়া যে আনন্দে ইহা বহিয়া চলিয়াছে, তাহার এই সৌভাগ্য বুঝি আর কখনও হয় নাই। মাতৃ-ভক্তির মহাশক্তি দ্বারা সজ্জিত ঈশ্বরচন্দ্রের নির্ভীক হৃদয়ের নিকট যেন মস্তক নত করিয়া তরঙ্গরাশি তাহাকে বক্ষে করিয়া পরপারে লইয়া গেল। সিক্ত বস্ত্রে সেই রজনী কোন আত্মীয়ের বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রত্যূষে মাতৃদেবীর পদ বন্দনা করিলেন। এইরূপ মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত কি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? এই জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবার দুঃখ-মোচনার্থ বিধবা বিবাহ বিধিসঙ্গত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বঙ্গীয় সমাজের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে গভীর আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জননীর হৃদয়ও দয়ায় পূর্ণ, স্নেহে সুকোমল ছিল। প্রতিবেশিগণের মুখে অন্ন দিবার জন্য, রোগীর সেবার জন্য, দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত। তাঁহার গৃহ কত লোকের গৃহ ছিল, তাঁহার মাতৃহৃদয়ে কত লোকের স্থান ছিল। এমন জননী না হইলে কি এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করে? নেপালিয়ন বলিয়াছিলেন, "আমাকে ভাল জননী দেও, আমি মহৎ জাতি প্রদান করিব।" জননীগণ ভবিষ্যৎ বংশের জননী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর

ন্যায় জননী যদি আমাদের দেশে আরও যদি জন্মগ্রহণ করেন, আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ পৃথিবীতে বরণ্য হইবে, সন্দেহ কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতৃস্নেহের তুলনা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে কলিকাতায় থাকিয়াই অধ্যয়ন করিত। তাহারা তাঁহার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিত। কখনও কখনও শয্যায় মূত্র ত্যাগ করিয়া তাহার সমস্ত শরীর ভাসাইয়া দিত। তিনি আনন্দে ঠিক জননীর ন্যায় স্বহস্তে তাহাদের মল মূত্র পরিষ্কার করিয়া দিতেন, বিছানা ধুইয়া দিতেন, তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিতেন, ও নিজে তাহাদের পড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন ও শিক্ষাদান করিতেন। তাহাদের কোন কষ্ট তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিত। তাঁহার সকল ভাই যেন একহৃদয়, একপ্রাণ ও একদেহ। তিনি যখন উচ্চ পদে আরূঢ়, তখন তাঁহার দুই ভাই দুরন্ত বিসূচিকা রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। তিনি তাহাতে কাঁদিয়া ব্যাকুল; কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন নাই; মাতৃবেদনা আরও প্রবল হইয়া উঠিবে, কেবল এই ভয়ে তিনি আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সত্যপরায়ণতা, সত্যানুরাগ নির্ভীকহৃদয়ের নিত্য সহচর। ভীরুতাই মিথ্যার জননী। যে হৃদয়ে অমিত সাহস, মিথ্যা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র হৃদয়ের সাহস ও অকুতোভয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থির অটল হৃদয়ে দুঃখ-ভয়, দারিদ্র্য ভয়, রোগ-ভয়, মৃত্যু-ভয় কিছুই কোন্ দিনের জন্য স্থান পায় নাই। কোন্ ভয়ে তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? সত্যপরায়ণতা মনুষ্যত্ব-জ্ঞাপক। কর্ত্তব্য-পথে অটল, স্থির, উচ্চ মহৎ লক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন কোন্ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া মিথ্যাকে অবলম্বন করিবে? অর্থের লালসা জীবনকে সত্যভ্রষ্ট করে; এবং এই অর্থ বিষয়ে সততা চরিত্রের কষ্টিপাথর স্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় যার নিকট যত টাকা পাইতেন, তার সুন্দর হিসাব রাখিতেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাহারও প্রাপ্য অদেয় আছে কি না, জানিবার জন্য যখন পুরাতন খাতা দেখিতেছিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে দশসহস্র টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার খরচের কোন হিসাব দেখিতে পাইলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি গভর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের হিসাবে ঐ টাকার বিষয় কিছুই সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ঐ টাকা খরচ করিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজের তহবিল হইতে দশ সহস্র টাকা গভর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহার কথা ও কার্য্যে গভীর সামঞ্জস্য ছিল। এক প্রকারে তিনি বলিবেন ও উপদেশ দিবেন, আর অন্যরূপ আচরণ করিবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেরূপ ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। এইজন্যই তাঁহার প্রতি লোকের এত অচলা ভক্তি। তাঁহার কার্য্য ও কথার মধ্যে নীচ স্বার্থপরতার কোন গন্ধ ছিল না। তিনি দেশের মঙ্গলোদ্দেশেই সকল কথা বলিতেন ও সকল কার্য্য করিতেন। এইজন্য তদানীন্তন লেপ্‌টেনেণ্ট-গভর্ণর সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার সকল বিষয়ে, আহারে ও পরিচ্ছদে, গৃহসজ্জায় একটা সাদাসিদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা সূচিত করে। তাঁহার জীবনের একমাত্র বিলাসোপকরণ

তাঁহার পুস্তক। তাঁহার পুস্তক সকল তিনি অতি পারিপাট্যের সহিত সুন্দররূপে বাঁধাইয়া সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। নারিজাতির প্রতি অবমাননা তিনি প্রাণান্তেও সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন তাঁহার কলেজের কয়েকটী ছেলে তাহার ত্রিতল ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের মহিলাদের প্রতি অপবিত্র-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিল। এজন্য সঙ্কুচিত হইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে নিবদ্ধ থাকিতে হইত। এই কথা যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি একদিন সন্ধ্যার সময় গোপনে তাঁর কলেজের ত্রিতল ছাদে উঠিয়া একদল ছেলে দেখিতে পাইলেন। বাঘ যেরূপ শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, তিনি সেইরূপ তাদের আক্রমণ করিয়া হৃদয়ের অগ্নি চক্ষু ও মুখে উদ্গীর্ণ করিয়া তীব্র কঠোর ভাষায় নিজেদের মাতা ভগিনীদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভৎর্সনা করিলেন, আর নিজের কলেজ হইতে তাহাদের বিহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কলেজ উঠিয়া যাইবে, তথাপি এইরূপ ছাত্রদের বেতন দ্বারা তিনি কলেজ পুষ্ট করিয়া রাখিতে পারেন না।

আর সকলের উপর কি তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। নেপোলিয়ন যেরূপ বলিয়াছিলেন—আল্‌পস্ পর্ব্বত আমার পথরোধ করিতে পারিবে না, তিনিও শত সহস্র বাধা বিঘ্নকে প্রবল ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে নত করিয়া তাহাদের উপর দিয়া সবেগে দৃঢ় পদবিক্ষেপে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পথে বন্ধুও দাঁড়াইতে পারেন না, শত্রুও দাঁড়াইতে পারেন না। এখানে মৃত্যুর পরপারে যেরূপ হয়, সেরূপ শাস্ত্রকারের ভাষায় বলিতে হয়, বন্ধু অবন্ধু হয়, পিতা অপিতা হয়। লজ্জা সম্মান তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ কথা। একদিন তাঁহার কোন ধনী বন্ধুর দরওয়ান দরজা হইতে ভিখারীকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহার পর তিনি আর তাঁহার সেই বন্ধুর মুখ দর্শন করেন নাই। দরিদ্র দোকানীর দোকানে সামান্য মাদুরাসনে বসিয়া তিনি তাহার সঙ্গে প্রাণ ভরিয়া আলাপ করিতেন, আর সম্ভ্রান্ত পদস্থ বন্ধু তাহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই, এরূপভাবে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহার পদস্থ বন্ধুর এই সঙ্কোচ দেখিয়া আরও আনন্দের সহিত প্রাণ খুলিয়া দরিদ্র দোকানীর সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আলাপ করিতেন।

মনুষ্যত্বের গৌরবে তিনি ভূষিত ছিলেন এবং সেই গৌরব চিরদিন তাঁহার জীবনে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কোন স্বার্থের নিকট তিনি এই গৌরব বলিদান করেন নাই। এমন মানব-প্রেমে কুসুমের ন্যায় সুকোমল ও বজ্রের ন্যায় সুকঠিন হৃদয় লইয়া তিনি পৃথিবীতে মানব জন্ম সার্থক করিয়া এই পৃথিবী হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন।

মৃত্যু-রোগের সঙ্গে সংক্রামেও তিনি কি বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। পৃষ্ঠদেশে তাঁহার একবার দুষ্টব্রণ হইয়াছিল। ডাক্তার যখন ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন বলিলেন, তিনি বলিলেন—"আপনারা আমাকে অজ্ঞান করিয়া করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন না; আমি স্থির থাকিব, একটুও নড়িব চড়িব না; আপনারা যেরূপ খুসী অস্ত্র করিবেন।" ডাক্তারগণ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন যে, এত কঠিন অস্ত্র চিকিৎসাতে তিনি আপনাকে অজ্ঞান হইতে দিলেন না; একটু মুখ বিকৃত না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। নির্ম্মম মৃত্যু এইরূপ বীর পুরুষেরও সম্মান প্রদর্শন করিল; কিম্বা এই পৃথিবী তাঁর উপযুক্ত নয় মনে করিয়া অন্যত্র এই হৃদয়ের পুরস্কার দান করিবার জন্য তাঁহাকে পৃথিবী হইতে লইয়া গেলেন। বিষম জ্বরের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার কঠিন দেহকে আক্রমণ করিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গদেশের কি বিষম দিন? দেশের দুঃখী দরিদ্র তাঁহাদের স্নেহময় পিতাকে হারাইল, অনাথ বালকবালিকাগণ তাহাদের আশ্রয়তরু হারাইলেন; মৃত্যুশয্যাশায়ী রুগ্নগণ জননী হস্তের স্নেহ-পূর্ণ ও সকল রোগের মহৌষধ স্বরূপ হৃদয়ের আত্ম-হারা সহানুভূতি হারাইল; মহিলাগণ তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধু হারাইল; শিক্ষার্থীগণ তাহাদের কল্পতরু হারাইল; বঙ্গভাষা শ্রেষ্ঠ সেবক হারাইলেন; সাহিত্য-মন্দির আপনার নির্ম্মাতা হারাইলেন—আর বঙ্গজননী তাঁহার এই সুপুত্র হারাইয়া হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বরষার ধারায় বক্ষ ভাসাইলেন। তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইবা মাত্র সেই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কলিকাতার গৃহে গৃহে রোদনধ্বনি উঠিল। বৃদ্ধ, যুবা দলে দলে একবার এই বীর পুরুষের অন্তিম সমাধি দেখিতে শ্মশানাভিমুখে ছুটিল। সকলের মুখেই বিষাদের ঘনচ্ছায়া; সকলের প্রাণ শোকে-অভিভূত, সকল কণ্ঠ তাঁহার যশোগীতিতে ভরিয়া উঠিল; সকল লেখনী পদ্যে গদ্যে তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইল। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার শোক-সভা হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া বালকগণ যদি নিজ জীবনে তাঁহার বিশ্ব-প্রাণ, মহৎ, উদার, সুকোমল, পরদুঃখকাতর জননী-হৃদয়, নির্ভীক তেজস্বী, স্বার্থকলুষশূন্য পুণ্য-সুন্দর চরিত্র লাভ করিবার জন্য যত্ন করে ও মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হয়, তবে বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ জননী বঙ্গভূমির উপর বর্ষিত হইয়া তাহাকে উচ্চ গৌরবে মণ্ডিত করিবে।

শ্রীবেণীমাধব দাস।

স্রোতের শৈবাল।

জল হয়েছে চলছে ভেসে তরঙ্গের শৈবাল,
কোথায় ছিলে কোথায় যাবে হবে কিবা হাল?
ছিলে ঝিলে পুকুর জলে বাসা বেন্ধে সুখে,
ভেবেছিলে গৃহ ছেড়ে যাবে অন্য মুখে।
সেই বাড়ী ঘর জোক পোকাগণ সঙ্গে ছিল জলে
বরষার বারি ধারা আসবে না এই বলে।
আজি ঘর বাড়ী পাতাতারি সঙ্গে নিয়ে সবে
ভাসতে ভাসতে চল্লে কোথা বলবে কিগো এবে।
কোথায় ছিলে কোথায় যাবে কর্ব্বে কি গো সেথা
বন্ধু বান্ধব দারা সুতের পাবে কিগো দেখা।
তারাও সবে যাচ্ছে চলে অনুকূল স্রোতে
কেউ এখানে কেউ সেখানে কেউ বা ডুবেছে পথে।
আমরা সবে এমনি করে যাব কালের স্রোতে,
বন্ধু জনে বিদায় দিলে ভাসি অশ্রু জলে।
কেউ যাবে না মোদের সনে কিন্তু বল ভাই,
এই জলেতে ভেসে ভেসে শেষে কোথা যাই।
সাগর জলে স্রোতে নাই কি থাকবে কোথা বেঁধে,
অকূল স্রোতে চলে যাবে কে সেই বেগ রোধে?
অনন্ত সে অকূল সাগর ঝঞ্ঝাবাতে ভরা,
কেহ পূর্ব্বে কেহ উত্তরে আর পাবে না ধরা।
হায় এমনি তোদের মতন মোদের জীবনের গতি,
কোথায় যেতেম না থাকিলে জগতের পতি!

অকূল পাথার অতল জলে তিনি কর্ণধার
ভয় নাইরে তথায় হবি ভবার্ণব পার।

থাকবে নারে দুঃখ জ্বালা পচা জলের গন্ধ,
সেই দেশেতে পাবিরে ভাই পরম আনন্দ।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

'সখা'-প্রবর্ত্তক প্রমদাচরণ সেন।

জন্ম—৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৬
মৃত্যু—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

খুলনা জেলার সেনহাটী যাঁহাদের পরিচয়ে দেশ বিদেশে খ্যাতলাভ করিয়াছে, বালক-বন্ধু 'সখা'-প্রবর্ত্তক, কর্ম্মী প্রমদাচরণ সেন তাঁহাদের অন্যতম। এজগতে সচরাচর যে শ্রেণীর লোকের জীবনচরিত লিখিত, পঠিত হইয়া থাকে, প্রমদাচরণ সে শ্রেণীভুক্ত হইবার অবসর পান নাই সত্য, কিন্তু শিশু মাসিক সাহিত্য "সখার" জন্মদাতা বলিয়া বাঙ্গালীর নিকট যে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। প্রমদাচরণের পূর্ব্বে খ্রীষ্টান প্রচারকগণ, মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন ও জোঁড়াসাকো ঠাকুর পরিবার হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু শিশু-সাহিত্যের আদর্শ ও মর্য্যাদা সম্যক উপলব্ধি করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 'সখার' পরে তদনুকরণে কত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাহার কোন খানিই সখার সমকক্ষ হইতে পারে নাই—একথা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—প্রমদাচরণ যে ভাবে শিশু-সাহিত্যের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, আর কেহই সে ভাবে ধরিতে পারেন নাই। ইহার কারণ—প্রমদাচরণের ন্যায় উদ্ভাবনীশক্তি ও প্রতিভা সকলের থাকে না, আর তাঁহার ন্যায় কর্ম্মনিষ্ঠ লোকও সাহিত্য ক্ষেত্রে নিতান্ত দুর্লভ।

প্রমদাচরণ যখন বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন তখন আমি নিতান্ত বালক, সুতরাং তিনি ও আমি এক গ্রামবাসী হইলেও তাঁহার সাহচর্য্য লাভ আমার অদৃষ্টে অধিক ঘটে নাই। শিশুকালে অজ্ঞানবস্থায় হয়ত তাঁহাকে দেখিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু জ্ঞানতঃ তাঁহাকে দেখিবার—তাঁহার সহিত কথা বলিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে মাত্র আমার একবার—অল্প সময়ের জন্য—যে খুলনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অম্বিকাচরণ সেনের বাসাবাটীতে—তাঁহার মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য হইলেও, সেই একবারই তাঁহার ব্যবহারে যে অমায়িকতা ও চরিত্রে যে বজ্রকঠোর ও কুসুমকোমল ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়াছিলাম, এই বত্রিশবৎসর ধরিয়া নানা ভাবে নানা লোকের সংস্পর্শে আসিয়াও সে ভাবের অভিব্যক্ত আর বড় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

আমি তখন আমাদের গ্রামের স্কুলের শিশুশ্রেণীর নিম্নতম বিভাগে পড়িতাম। আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গেল—আমরা উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন পাইলাম।

কয়েকদিন পরে শুনিলাম, প্রমদাবাবু নামক কে একজন ভদ্রলোক প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম তিনটী ছাত্রকে পুরস্কার দিবেন। পুরস্কার আনিতে খুলনায় যাইতে হইবে। স্কুল হইতে এই সংবাদ শুনিয়া বাড়ী গিয়া আমার ছোট দাদাকে (দেবঘর-প্রবাসী বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ সেন বৈদ্যরত্ন) প্রমদাবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—'প্রমদা, বাবু আমাদের এই গ্রামেরই লোক—তাঁহার বাড়ী বক্‌সীপাড়ায়—তিনি ছেলেদিগকে বড় ভালবাসেন। আমাদের বাড়ীতে যে সখা আইসে, ছেলেপিলেদের উপকারের জন্য তিনি ঐ পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তিনি পীড়িত হইয়া খুলনায় তাঁহার দাদা অম্বিকা বাবুর বাসায় আছেন। তিনিই নিজের টাকা দিয়া বই কিনিয়া পুরস্কার দিবেন।

আমার ছোট দাদা 'সখার-গ্রাহক ছিলেন। মাসে মাসে আমাদের বাড়ীতে 'সখা' আসিত। আমি উহা বড় বুঝিতে পারিতাম না, তবে ছোট দাদা যখন উপদেশের গল্পগুলি পড়িতেন, তাহা মন দিয়া শুনিতাম। আর উহার ছবি দেখিয়া বড় আমোদ পাইতাম। এই ভাবে 'সখার' সহিত আমার একটা পরিচয়, একটা সখিত্ব জন্মিয়াছিল। সুতরাং যখন শুনিলাম, সখা যিনি বাহির করিয়াছেন, সেই প্রমদা বাবুই পুরস্কার দিবেন, তখন আমার বড় আনন্দ হইল—তাঁহাকে দেখিবার জন্যও বড় উৎসুক হইয়া পড়িলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে অন্যান্য ছাত্র, শিক্ষকবর্গ ও গ্রামের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের সঙ্গে বিশেষ উৎসাহের সহিত খুলনায় যাত্রা করিলাম। আমরা অম্বিকা বাবুর বাসা বাড়ীতে পৌঁছিলাম। তাঁহার বহির্ব্বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ-নিম্নে পুরস্কার-বিতরণ-সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা সেখানে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন লোক আরাম-কেদারায় শায়িত একজন রুগ্ন ভদ্রলোককে সভাস্থলে লইয়া আসিল। ছোট দাদা অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'এই প্রমদা বাবু'।

যথাসময়ে পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হইল। আমরা এক এক করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুরস্কার লইয়া আসিলাম। বই হাতে দিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে কত স্নেহের কথা—কথা উৎসাহের কথা বলিলেন। পুরস্কার বিতরণ ও সভার অন্যান্য কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, লোকজন কমিতে আরম্ভ করিলে আমাকে লইয়া আমার ছোট দাদা তাঁহার কাছে গেলেন—আমরা দুই ভাই তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তাঁহার ও আমার ছোট দাদার উভয়ের এক নাম ছিল বলিয়া প্রমদা বাবু ছোট দাদাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমরা প্রণাম করিলে—আমি পুরস্কার পাইয়াছি বলিয়া তিনি আমার গায়ে মাথায় হাতবুলাইয়া কত আশার, কত উপদেশের কথা বলিতে লাগিলেন। সে স্নেহের স্পর্শে, সে মধুর কথায়, কি জানি এক অনির্ব্বচনীয় আবেশে আমার দেহ রোমাঞ্চিত ও অন্তরাত্মা পুলকাকুল হইয়া উঠিল—সে স্পর্শজনিত সুখানুভব আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এখনও কোন সুখাবেগে আমার দেহ মন পুলকিত হইলে আমার সেই স্নেহস্নিগ্ধ স্পর্শের কথাই মনে পড়ে।

অনেকপূর্ব্বে যশোহর ও খুলনার কলিকাতা-প্রবাসী ছাত্রবৃন্দ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিসমূহ মিলিত হইয়া যশোহর-খুলনা সম্মিলনী সভা স্থাপিত করেন। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, উভয় জেলার গ্রাম সমূহে বালকদিগের নীতি ও ব্যায়াম ও বালিকাদিগের মধ্যে সাধারণ

শিক্ষা প্রচার করা। বৎসরের শেষে এই উদ্যোক্তৃবর্গ বালক বালিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুনাগুণসারে পারিতোষিক প্রদান করিতেন। সেবার আমি নীতিশিক্ষা বিভাগে শিশুশ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়াছিলাম। আমাদের পাঠ্য ছিল, 'শিশুর সদাচার' নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। এই পরীক্ষায় সভার কর্ত্তৃপক্ষীয় আমাকে 'পুরুবিক্রম নাটক' পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই পুরস্কারে আমি কিম্বা আমার অভিভাবকবর্গ কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। প্রমদা বাবু এই সভার প্রাণ-স্থানীয় ছিলেন। তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছোট দাদা সে বই খানা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রমদাবাবু যখন আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নানা কথা কহিতেছিলেন, তখন ছোট দাদা পুস্তকখানা তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন —'আমার ভাই নীতিশিক্ষা বিভাগের শিশুশ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু সভা হইতে পুরস্কার পাইয়াছে, এই পুরুবিক্রম নাটক। ছোট দাদার কথা শেষ কথা না হইতেই সুপ্তসিংহ যেন ক্রোধে ও বিরক্তিতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'কি নীতি শিক্ষার পুরস্কার দিল নাটক—? ইহাতে দেশ-ভক্ত বীরের কথা বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু বালকের হাতে নাটক দিবার ব্যবস্থা কোন ক্রমেই ভাল বলিতে পারিব না। কি করিব, আমি উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া দূরে পড়িয়া আছি, নতুবা এখনই ইহার প্রতিকার করিতাম।' এই বলিয়া ক্লান্তিবশতঃ একটু নীরব হইলেন। একটু পরে গভীর স্নেহ ভরে আমাকে বলিলেন—'মণি, এই বই পড়িও না। আমি সুস্থ হইয়া কলিকাতায় গিয়া তোমাকে ভাল বই পাঠাইয়া দিব। আগামী বৎসর পরীক্ষা দিয়াও এইরূপ ১ম হওয়া চাই। তাহা হইলে খুব ভাল ভাল বই পাইবা। আর সদা সর্ব্বদা লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবা। তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভালবাসিবে।' এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, আমরাও তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার অল্প কয়েক দিন পরে একদিন ছোট দাদা বলিলেন—'কাল প্রমদাবাবু মারা গিয়াছেন!' এই সংবাদ আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল, আর থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সেই শীর্ণ রুগ্নদেহ ও ঈষৎম্লান স্নেহময় মূর্ত্তি মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে 'সখায়' একটী শোক-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে কবিতাটী এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, তাহা পড়িতে পড়িতে আমি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলাম। সে অনেক দিনের কথা; কবিতাটীর আমি আর সব ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু—"ধরা-ধামে নাই আর প্রমদাচরণ" এই পংক্তিটী আমি এখনও ভুলি নাই। সুখে দুঃখে, সময়ে অসময়ে, যখনই সে পংক্তিটী আমার মনে পড়ে, তখনই তীব্রশোকের করুণঝঙ্কারে আমার অন্তরাত্মা আকুলিত হইয়া আমার চক্ষু অশ্রু-সিক্ত করিয়া দেয়।

প্রমদাচরণ যে কি বস্তু ছিলেন—প্রমদা-চরণের মৃত্যুতে দেশের দশের ও বাঙ্গালার বালক সম্প্রদায়ের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তখন তাহা বুঝিবার শক্তি হয় নাই —বুঝিতে পারি নাই—কিন্তু এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক ও সহধর্ম্মীদের নিকট যতই তাঁহার কথা শুনিতেছি, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি! তাঁহার 'মহৎজীবনের আখ্যায়িকা-বলী', তাঁহার 'সাথী, তাহার 'চিন্তাশতক' যত

পড়িতেছি, ততই তাহার মধ্য হইতে তাঁহার স্বরূপমূর্ত্তি বাহির হইয়া আমাদিগকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দিতেছে।

তাঁহার বড় সাধের, বড় আদরের 'সখা' তাৎকালীন বঙ্গীয় বালক সম্প্রদায়ের উপর কি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, সে কথার সাক্ষ্য এখনকার বালকগণের পিতা, পিতামহগণ দিবেন, কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার বালক সম্প্রদায়ের ভাগ্যে 'সখার' মত সখা আর এপর্য্যন্ত জুটে নাই। কিন্তু সে 'সখার' ও সখার জন্মদাতার স্মৃতি রক্ষার জন্য বাঙ্গালী কি করিয়াছে?— কিছুই না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি হইয়াছে? এই অসার পৃথিবীর স্মৃতি তিনি ত কোন দিনই চাহেন নাই। সুতরাং—

'স্মৃতি যদি মুছে যায়,
কি ক্ষতি তাহার তায়?
অসার ধরার স্মৃতি
সে কি কভু চেয়েছে?
'যে ধনের ছিল তৃষা,
যার তরে ছিল আশা—
মিটিয়াছে সে পিপাসা,—
আজিত তা পেয়েছ।'*

—তিনি যে ধনের কাঙ্গাল ছিলেন— যে তৃষ্ণায় কাতর ছিলেন, ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া—ভগবৎপ্রেমসুধা পান করিয়া তাঁহার সে পিপাসা মিটিয়া গিয়াছে। সুতরাং অসার ধরার লোক তাঁহার জন্য কিছু করুক বা না করুক, তাহাতে তাঁহার কিছুই আসিয়া যাইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালী তাঁহার নিকট যাহা পাইয়াছে, তাহার জন্য কি কৃতজ্ঞতা টুকুও দেখাইবে না? দেবতা কিছু চাহেন না বলিয়া ভক্ত কি কখনও তাঁহার পদে অঞ্জলি দিতে বিরত হয়? ভক্ত তাহার আরাধ্যের উদ্দেশ্যে নানাভাবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে, ইহা স্বাভাবিক —যেখানে সেই অনুষ্ঠানের অভাব দৃষ্ট হয়, সেখানে ভক্তির আবেগ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, একথা প্রত্যেক লোকেরই বলিবার অধিকার আছে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

পূর্ব্ববঙ্গে দাসত্ব-প্রথা।

প্রাচীন সময় হইতে পূর্ব্ববঙ্গে এক প্রকার দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দাস বা দাস পরিবার ছিল। কিন্তু ইহারা আফ্রিকা বা আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের ন্যায় উৎপীড়িত বা যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইত না। ইহারা আপন আপন প্রভুর নিকট হইতে জমি প্রাপ্ত হইত এবং তাহা চাষ আবাদ করিয়া পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই সকল দাসদিগকে গোলাম বা নফর বলিত। ইহারা আবশ্যকমত প্রভুর বাটীর ভৃত্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ইহাদের পরিবারগণও সময়ে সময়ে প্রভুর বাটীর চাকরাণীর কার্য্য করিত। এই সকল কার্য্যের জন্য তাহারা

* প্রমদাচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বধীন ত্রিপুরারপররাষ্ট্র সচীব দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন এম এ, বি-এল প্রণীত 'কবিতা কুসুমে'র উৎসর্গ পত্র ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।

লেখক।

কোন বেতন পাইত না, তৎপরিবর্ত্তে জমির উপস্বত্ব ভোগ করিত এবং রীতিমত আহারাদি পাইত। সহায়হীন হইলে যথাসম্ভব আদরের সহিত প্রতিপালিত হইত। প্রভুর বিশ্বাস-ভাজন হইলে অনেক উচ্চপদেও নিযুক্ত হইত, অদ্যাপি অনেকে জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে এইরূপ দাসত্ব প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এই প্রথা লোপ পাইতেছে। পূর্ব্ব বঙ্গে এই সকল দাস শূদ্র নামে খ্যাত। শূদ্রগণের মধ্যে অনেকে এক্ষণে উপযুক্ত শিক্ষা ও উচ্চপদ লাভ করিয়া অগত্যা জন্মভূমি ত্যাগ করতঃ স্থানান্তরে বসবাস করিতেছে এবং সমাজে আপনাদিগের ন্যায্য দাবী স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কেহ কেহ উচ্চ কায়স্থদিগের সহিত পুত্রকন্যা আদান প্রদান করিয়া কায়স্থ নামে পরিচিত হইতেছে। যাহারা রীতিমত শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহারা কনষ্টেবল, আদালতের পিয়ন, বরকন্দাজ, সর্দ্দার প্রভৃতির কার্য্য করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কিম্বা প্রচলিত থাকিলেও অনেক দিন হইতে ইহার লোপ হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে শূদ্র বলিয়া কোন শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয় না। সকলেই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গেও শূদ্রগণ এক্ষণে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। ইহা স্বাভাবিকও বটে। এজন্য লোক সংখ্যা গণনার সময় অনেকেই জাতিবিভাগে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লিখাইয়া দিয়াছে। ইহাতে স্থানে স্থানে কায়স্থদিগের সহিত ইহাদের কলহও ঘটিয়াছে। শূদ্রগণ প্রভুর বাটীর ভৃত্যের কাজ করিবার জন্য যে জমি ভোগ করিত, তাহা নান্‌কার বা চাকরান্ নামে অভিহিত হয়। এই শ্রেণীর লোকদিগের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে একটী কাজ এই ছিল যে, বিবাহ সময়ে মুখ-চন্দ্রিকা অর্থাৎ বরকন্যার পরস্পর মুখ দর্শন কালে উভয়কে আসনসহ ঊর্দ্ধে উঠাইতে হইত। ইহাকে পূর্ব্বাঞ্চলে পাটধরা বলে। এই পাটধরা কার্য্য শূদ্রগণ এক্ষণে অতি হীন ও অপমানজনক বলিয়া মনে করে এবং কেহই ইহা করিতে চায় না। এজন্য এবং জমির মালিকের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায় অনেক শূদ্র নান্‌কার জমি হইতে উৎখাত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের সেটেল-মেণ্টে অনেক প্রজা আপন আপন জমি নান্‌-কার লিখিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রজা ও মালিকে বিবাদ হইতেছে এবং অনেকে স্বেচ্ছা-ক্রমে নিজ নিজ নান্‌কার জমি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে।

সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ বা অন্ন কষ্টের সময় অথবা ঋণগ্রস্ত হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আপনাদিগকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিত এবং জাবজ্জীবন পুরুষানুক্রমে গোলামী অর্থাৎ দাসত্ব করিতে অঙ্গীকার করিয়া আত্মবিক্রয়পত্র লিখিয়া দিত। ইহার দুইখণ্ড কীটদষ্ট পত্র ও তাহার প্রতিলিপি এই স্থানে প্রদত্ত হইল। ইহাতে দেশের কিরূপ দুরবস্থা ছিল এবং সমাজ কিরূপ হৃদয়হীন ছিল, তাহা দৃষ্ট হইবে। ইহার একখানিতে মাত্র ১১ এগারটী টাকার জন্য মুচিরাম নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যা, মোট ৬ জন, অপর খানিতে বাসিরাম নামক একব্যক্তি ২১৲ টাকা পাইয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ ৫ জন যাবজ্জীবন ও পুরুষা-নুক্রমে দাসত্ব করিতে অঙ্গীকার করিয়া আত্মবিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। প্রথম পত্রখানি ১৯৩ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। উভয় পত্রই ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্বের সময় লিখিত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা সেই সময়ের হস্তলিপির আকারও দৃষ্ট হইবে এবং ভাষারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রথম পত্র।

প্রতিলিপি

৭ই আদি কির্দ্দ সকলমঙ্গলালয়

শ্রীজয়কৃষ্ণ গুহ সুচরিতেষু লিখিতং

শ্রীমুচিরাম চঙ্গ তস্য স্ত্রী শ্রীমতিতপী তস্য পুত্র শ্রীপঞ্চাচঙ্গ ও শ্রীবারুচঙ্গ ও শ্রীরঞ্জিত-চঙ্গ কন্যা শ্রীমতি কালিন্দিবালা আপ্ত (আত্ম) বিক্রয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা সপরিবারে অন্নরিণ (ঋণ) উপহতি (?) ক্রেমে নগদ মূল্য তোমার স্থানে ১১ এগার রূপাইয়া পায়া স্বইচ্ছা পূর্ব্বক আপ্ত বিক্রি হইলাম। তোমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে আমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিব। এহি করারে আত্ম বিক্রয় পত্র দিলাম। ইতি সন ১১৩৪ চৌত্রিষ তেরিখ ১৬ ফাল্গুণ। এই পত্রের অ পর পৃষ্ঠায় স্বাক্ষীদিগের নাম।

(অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীদিগের নাম)

নিসানসহি

শ্রীমুচিরাম চঙ্গ

শ্রীমতি তপী

শ্রীপঞ্চা চঙ্গ

শ্রীবারু বঙ্গ ও শ্রীরঞ্জিত চঙ্গ

শ্রীমতি কালিচঙ্গ।

ইআদিকীর্দ্দ শ্রীশোভারাম গুহ সুচরিতেষু লিখিতং শ্রীবাসিবার শূদ্র ওলদে সাছুরাম শূদ্র ইরফে দেবাই শূদ্র তস্য স্ত্রী শ্রীমতি মাধবী তস্য পুত্র শ্রীরামধন শূদ্র ও শ্রীসদারাম শূদ্র তস্য ভগ্নি শ্রীমতি রতনি কওলা আপ্ত বিক্রি পত্র-মিদং কার্য্যঞ্চআগে আমরা সকলে মহাদুর্ব্বিক্ষে অন্নরিণ উপহতি ক্রেমে আপন আপন সহ ইচ্ছা-পূর্ব্বক তোমার স্থানে নগদ মূল্য পুরওজন দহ-মাসি ২১৲ একৈস রূপাইয়া দস্তবদস্ত পাইআ আপ্ত বিক্রয় হইলাম তোমা পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে দান বিক্রির অধিকারি হইআ নফরি দাস্ততা করাইবা আমার পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে নফরি দাস্ততা করিব এহি করারে আপ্ত বিক্রিয় পত্র দিলাম ইতি সন ১১৬১ এগারসও একসাইট তেরিখ ২৫ ফাল্গুণ রোজ শুক্রবার

জায় জিনিস

আরকট ১১৲

দহমাসি ১০৲

২১৲ এহি একৈশ রূপাইয়া পাইলাম ইতি

নিসানসই

শ্রীসদারাম শূদ্র

শ্রীরামধন শূদ্র

শ্রীমতি মাধবি

শ্রীবাসিরাম শূদ্র

শ্রীমতি রতনি

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

পোলাও—অষ্টম উচ্ছ্বাস।

কুন্দ শুভ্র সিংহ কেশর,
তাও করিলে লালে লাল!
সাবাস তোমায় ষণ্ড কুমার,
সাবাস তোমায় নন্দলাল।

জগতের
এমনি নিয়ম এমনি নিয়ম
কেউ বা ভেঙ্গে দিচ্ছে মরম,
কেউ বা পুনঃ ভাঙ্গা মনে,
লাগায়ে প্রলেপ সযতনে,

কেউ বা আবার খোঁচার উপর,
লাগিয়ে দেয় খোঁচা,
কেউ বা বলে দরদ ছলে
রক্ত ওর মোছা।
নির্দ্দয়তা সুয়ো রাণী
সতীন ওর করুণা,
বুড়ীর মত ধিকিয়ে চলে,
যদিও স্বভাব তরুণা;
ধিঙ্গী এবার চূড়ায় বসে,
জাঁক কচ্ছে আপনার,
কীর্ত্তি কত হচ্ছে হত
কাল অঙ্গ বসুধার।
আলগামুখী আশা ছুঁড়ী
কাণের কাছে বক্‌বকায়,
সোণার আলোর স্বপ্নদিয়ে
নিরাশ মনে খুব চেতায়।
ধীরে চল মলয় বা'
বাঘে ছুলে আঠার ঘা,
হিঃ হিঃ হিঃ হা হা হাঃ
বাঘে ছুলে আঠার ঘা।
কেতন বর্ণ হল কেমন
মাছরাঙা,
দণ্ড খানায় ঘুণ ধরেছে
বুক ভাঙা!
ম্যারাথন থার্ম্মোপলি,
হয়ে গেছে ছাই,
যদুপতি যদুপতি
যদুপতি নাই।
The Spirit of contentment
নিত্য অভাব তরে,
আর বুঝি গো তিষ্ঠোয় না
আমা সবা ঘরে।
সত্য নাই সত্য নাই,
দুনিয়া যেন মিথ্যে,
মিষ্টি যা' তা' চলে গেছে
সবই যেন তিক্তে।
ঈশার ভাষা গীতার গাঁথা
চৈতন্যের শিখরিণী,
বুদ্ধের সেই গহিন গাহন
মেকনের ভক্তি চিনি,
এসব যেন যাচ্ছে ডুবে
পাপের কুয়াসায়।
হৃদয় যেন পাষাণ হেন
ভোগের পিপাসায়,
স্বাধীন ভাবে বল্‌ব কি গো
ভাষার মাঝে gag,
Neck-tie আর পর্‌ব কবে
গলার উপর ঘ্যাগ।
সোণার দাঁড়ে বসে আছি,
সোণার শিকল পায়,
বনের পাখী অবাক্ চোখে
খাঁচার পানে চায়।
শ্রাবণ মেঘের বরণ কাল,
রূপ লেগেছে তমালে,
মনের মাঝে গুমোট বাঁধা,
মেঘটা কে গো সাজালে।
ও মেঘেতে বিজলী খেলে,
শত কামান গাজে,
এ মেঘেতে শব্দহীন
নীরবতা বাজে।
শিরায় শিরায় কাঁপন ওঠে,
রক্ত করে জল,
নয়ন কোণে অশ্রু এসে,
করে টলমল!!
ফন্ ফন্ ফন্ হৃদয়-যন্ত্র,
হচ্ছে আলোড়িত,
রাশি কাল ধোঁয়া,
হতেছে নির্গত।

ঘুমের মাঝে ছায়ার মত,
ছায়ার দেশের প্রাণী যত,
অতি তীব্র ইঙ্গিতেতে;
কি যেন সব বল্‌ছে মেতে,
রক্ত তারা খেতে চায়,
পাগল-পারা চিত্তে ধায়,
লুট্‌তে বলে ছুট্‌তে বলে,
মাথ্‌তে বলে রুধির,
খেতে বলে পিতে বলে
তীব্র রুদ্র মদির।
ভেঙে ফেলে গড়্‌তে বলে
নূতন গড়া,
দর্পে আর পৈশাচ্যে
ডুব্‌ছে ধরা।
ধান গাছে ধান ফলে
নারকেল গাছে মুছি,
খুব ওড়াও ভাই ছোকা দিয়ে
টাট্‌কা টাট্‌কা লুচি।
এত বড় পুকুরেতে বুঝি মাছ নাই,
আর ত শুনিনে সেই গুপ্‌ গাপ্‌ ঘাই,
মণ্টেগু ফেলিল জাল, বাঙ্গালী-গৌরব,
পড়িল তাহার মাঝে প্রাচীন রাঘব;
বুড়ো বুড়ো মাছ গুলো সব প'ল ধরা,
এখন কি করা যায় বিপুলাচ ধরা!
আনিবাসনায় কাণী করিল দুর্জ্জন,
গরমেতে জল ঢালা নরমে নরম,
Politics মাতোয়ারা কেষ্ট বিষ্টু সব,
কেঁদে কেঁদে ক্ষুধার্ত্তেরা হতেছে নীরব,
প্রাণের "প্রফুল্ল" দেখ, হয়ে মর্ম্মাহত,
দরিদ্রের তরে আজ কাঁদিছে নিয়ত।
সর্ব্বাধিকারীর শ্লেষ শ্লেষ্মায় ভরা,
বড় হ'তে ইচ্ছা ব'লে বাত কড়া কড়া।
কাঠিন্য গর্ব্বের কণা সদা মাথা খাড়া,
হেসে কুটি কুটি যত বিনয়ের পাড়া।
কোথা সে ভারতবর্ষ চারুতায় ভরা,
কোথা তার প্রাচুর্য্যের অমৃতের সরা?
ওই ম্যালেরিয়া যেন, রাক্ষসী পুতনা,
লোল-জিহ্বা, রক্তাম্বরা, ঘূর্ণিত নয়না।
শিশুর লাবণ্য হ'রে যুবতী-যৌবন,
শক্তিধর-শক্তি হরি' করে আলিঙ্গন,
দয়া নাই পথ্য নাই সূর্য্যের নন্দন
দিন রাত করিতেছে দারিদ্র্য মোচন।
কোথা ভারতের রাজা, রাজার গৌরব,
আময়ে প্রকৃতিবর্গ হতেছে নীরব।
অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, পীড়ার তাড়নে
অভিভূত হ'য়ে সব মরিছে মরমে!
Ladyর জুতা কিনে এনে
পরাও ললনায়,
(আর) গলায় দিয়ে Neck-tie যাদু
পূরাও বাসনায়।
জুঁই শেফালি টগর বেলা
উঠিয়ে ফেলে দিয়ে,
বাগান কর মনের মত
ম্যাগ্‌নোলিয়া নিয়ে;
ঘোম্‌টা ঘোচাও সিঁদুর মোচাও,
স্বাধীনভাবে প্রেম কর,
Nation যদি হ'তে চাও
ফিরিঙ্গি এ নাম ধর।
চাপে পড়ে সমাজটা যে
হয়ে পড়ছে চ্যাপ্‌টা,
(এখন) মাথার মাঝে গুঁজ্‌তে হবে
হ্যাট্‌টা কিম্বা ক্যাপ্‌টা।
রোগটা যে কি হচ্ছেনা ঠিক
বোকা Dr. Merryman,
দর্শনি যা ল'য়ে যান,
গুন্ গুনিয়ে গেয়ে গান;
গিলে দেওয়া লম্বা কোঁচার
রেওয়াজ টাকি হবে রদ,

সবাই আমরা আওড়াব কি
Nasty nasty ড্যামের গদ ?
কুমার তাহার ঘুরিয়েছে ভাই
চাকাখানা।
সরা হবে কি কলসী হবে
নাইক জানা।
আমরা হ'তে চাচ্ছি কি ?
আমরা হ'তে যাচ্ছি কি ?
আমরা কেমন হলে কেমন হব,
বুঝতে পারছি কি ?
আমরা স্রোতের জলে ভাসতে জানি,
জানিনাক উজোতে,
ঠাণ্ডা হ'য়ে কর্‌তেছি বাস
চুনার পুরীর কুজোতে।
মনের চিতায় লক্ লক্ করি
আগুন জ্বলে,
মনে হয় যেন স্বস্তি নাইক,
জগতী তলে।
শিক্ষিত দেশ শিক্ষিত দেশ
শিক্ষিত মোরা কোন্‌খানে,
Monumental liar গুলা
সমাজ বেদীর মাঝখানে
[সন্তি]

আমরা
Democrat নই Theocrat নই
পুরোদমে Epicurean,
জোঁক জামাইয়ের মাকে বলি
মাঝে মাঝে 'dear বেয়ান'
ওগো মহালক্ষ্মি ওগো ইংরাজের ভাষা,
এত ভজনায় তবু মিটালেনা আশা।
লইলে না উপচার rafty হ'য়ে র'লে,
ভক্ত বলে দয়া করে না তুলিলে কোলে।
অর্থগৃধ্নু Brutusএর ঘোর প্রলোভন,
Nickleby সুন্দরীর কৌতুক মোহন,
Quad quack আর Kick the বকেটে,
পূর্ণ করি রাখিলাম মনের পকেটে।
Cockles of the heart আরও কত কি যে,
শিখা'লাম শিষ্যদলে শিখিলাম নিজে।
এবে ভাসিতেছি সদা নিরাকার নীরে,
মিটিলনা বিন্দু আশা র'লাম তিমিরে।

(ওরে) ম্যানচেষ্টার কি গুণ করেছে
তাঁতী মাকু ভাঙ্গে,
মাঝির জালে মাছ পড়ে না
চড় পড়েছে গাঙ্গে।
গোঁজ গাঁজ ঢিবে ঢাবা
নরদ তক্তি শানা,
এপং দেপং গন্ধ পুষ্পং
লাক ফণাফণ্ ফণা—
তাঁতীর মাকু আর চলে না
পেট ভরেনা ফ্যানে,
এমন দুর্দ্দিন দেখিনি ত
সত্যি বলছি জ্ঞানে।
তাঁতী গেছে, কুমার গেছে,
কামার কর্‌ছে ধুক্‌ধুক্,
Councilএর মেম্বর হ'তে
নেতার ফুলে উঠ্‌ছে বুক,
শক্তি চাই চিন্তা চাই
চাই আপনার জোর,
দেহি দেহি বলে আর
ফেলিস নারে লোর।

আমাদের
Energy ত বেতো ঘোড়া
আমরা এক্কা গাড়ী,
ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে
আমরা কিগো পারি ?
Ruskin পড়া, Plato পড়া
লম্বা টাইটেল ধারী,

Artএর কথায় রাধাকমল
দেখালে এলেম ভারী.
ইনি
Van Laar কি Angelo তাই
সমজান দুষ্কর,
[এর] ভাষার যেন প্রতি অঙ্গে
বেড়াচ্ছে পুষ্কর।
ইচ্ছা করে আসাম হ'তে
কমল মধু আনি,
কমল সখায় করাই পান
ক্ষীরের সঙ্গে ছানি।
মুস্কিল আসান নবী মুস্কিল আসান
পড়ে শুনে যাদুবৃন্দে হতেছে পাষাণ।
শরতের কিরুরাণী রবির বিণোদা
জগতের কাব্যবনে যুগল মন্দার।
অশরীরী নৈরাশ্যেরে করিল শরীরী,
যে যে শিল্পী, মহামতি Rembrandt হতে
তাদের কৌশল, [কোন মতে] নহে নিন্দনীয়,
উভয়ের তুলি যেন কোন্ মন্ত্র বলে,
বিধাতার বর্ণপাত্র করিয়া পরশ,
আঁকিয়াছে দুইজনে যুগল রতন,
গ্রাম যদি ভেঙ্গে যায় ভেঙ্গে যাক্ গ্রাম,
নায়েগেরা জলোৎসব, তথাপি সুন্দর !
শ্রাবণের লীলাময়ী 'কিরণ তটিনী'
উপেন্দ্র হৃদয়ে, সিন্ধু ভাবিয়া যখন
ছুটে গেল আলিঙ্গিতে, হল অবজ্ঞাত,
প্রেম সে পেলনা কোথা, দয়িত তাহার,
গ্রন্থকীট, Metaphysic মত্ত পানে ভোর।
যুবতীর অতি তীব্র ভোগ লালসায়,
তার সেই নিদারুণ তপ্ত পিপাসায়,
একবিন্দু প্রেমবারি দিত যদি ঢেলে
হে সংযমী, "কিরণ" কি সংযমের ডোরে
আপনারে বন্ধনিতে পারিত না তবে ?
পদপৃষ্ঠ ভুজঙ্গীর ফণা প্রসারণ
স্বভাবের দত্ত বৃত্তি—নিসর্গ সরল।
সান্ত এ জগতীতল, প্রেমের মানুষ,
হৃদয়ে ছুটাতে তার অনন্তে সে চায়,
উল্কা যদি হ'ত "কিরু" গগন-বিহারী,
চন্দ্র সূর্য্য, বধু আদি গ্রহপণে তবে,
ভয়ে অভিভূত করি উদ্ভ্রান্ত নৈরাশ্যে
ছুটিতে সে চিরদিন গগনের বুকে।
সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার তরে,
ঐ প্রবাসীর নেতা ধীরোদাত্ত রাম,
করিছেন ধীরভাবে গম্ভীর ক্রোকান ;
ওর শিষ্য হ'তে চাও করিনা নিষেধ,
Realism নিয়ে ওরা করুন বসতি,
সাহিত্য যা Romanceরে কোলে টেনে লবে।

Realism
Independent বিপিনের বস্তুতন্ত্র ভাই,
লোহা পেটা হাতুড়ীর ঠক্ ঠক্ ধ্বনি।
ভাবমাখা উন্মাদনা কোবিদনয়নে
ইন্দ্র ধনু সম সুধা করে সদা দান ;
Man lives on idea, ভাবের উচ্ছ্বাসে,
সব ভুলে মন তার দেয় সন্তরণ,
শুনিয়াছ লোক মুখে সমুদ্র মন্থন ;
নিজ হৃদয়েরে ওই করিয়া মন্থিত,
বিনোদিণী সুধা মাখা তুলিয়া গরল,
মুক্ত হস্তে পাঠকেরে করিতেছে দান।
হৃদয় যেন গাইতে চায়
বেলুর মত গলাতে,
মজে যেন রইতে চায়
উদক বাদ্য কলাতে।
সাহিত্যটা যা খাঁটি জিনিষ
সরল প্রাণের কথা,
কান্তিময়ী পেলব ইহা
নব বসন্তের মাধবীলতা।

ওই গণিকা গণিকা সাপিনী
ওই গণিকা গণিকা নাগিনী,
নীতির নন্দন ওদের ক্রন্দন
শুনিতে করুন মানা,
প্রকৃত মানুষ মলিবসতায়
রবেনা হইয়া কাণা।
পাপ করেছ ডুবুক পাপে
কাছে যেতে ভয় কর,
এমনি তেজাল moral লইয়ে
ধর্ম্মবীর নাম ধর!
নবীন নবায়মান
কত্তে চাও এই প্রাণ,
শরতের সাবিত্রীরে কর বিলোকন।
কোথায় রসের খনি
শচীন্দ্র কমল মণি,
এ যে পোকরাজ আর গলিত কাঞ্চন,
এমন পরের তরে
যে নারীর অশ্রু ঝরে,
কুন্তী হ'তে এসাবিত্রী' নহে কি সুন্দর?
সেই ত সুন্দরতম
চিত্ত যার নিরুপম,
জীবন্ত করুণা যথা ছোট নিরন্তর,
ভোগেতে নাহিক তৃষা
জানেনা বোঝেনা মৃষা,
সংযমে আবদ্ধ প্রেম উজ্জ্বল কাঞ্চন।
ইচ্ছা করে কণ্ঠে তার,
দোলাইয়া পুষ্পহার,
চেয়ে থাকি ভক্তি ভরে সারাটি জীবন।
কার্‌লাইল্‌কে কাত্ করা ওই,
রবি বাবুর 'কথিকা.'
তাজমহলের প্রাচীর গুলির,
রত্নময়ী লতিকা।

বীণার ভাষায় বীণার গান
ভাষ্য যদি থাকিত,
পরীর দেশের সমজিয়ে ভাব
সর্ব্বচিত্ত নাচিত।

* * * *

Penal code গো Penal code,
তোর ভাষা কেমন আঁটা,
দোষের মধ্যে প্রতি অঙ্গে,*
সিয়াকুলের কাঁটা।
শুক বলে আমার ডিপ্‌টী
[ঐ] Penal code এর রাজা,
ডকের উপর খাড়া হসেই
পারেন দিতে সাজা।
শারী বলে আমার munsif,
অতি শান্ত ধীর।
নথির সঙ্গে নড়েন যখন
হারকিউলিশ বীর।
শুক বলে আমার ডিপটী,
T. A. আনেন যখন,
গৃহের রাণী স্মিতমুখে,
করেন আলাপন
কিছু করিতে চয়ন।
আরো শোন আমার ডিপ্‌টী
Subdivisionএর চাঁই।
পূজ্য তিনি মান্য তিনি
গণ্য সর্ব্ব ঠাঁই।
শারী বলে আমার munsif
রামের জিনিষ শ্যামকে দ্যান,
[আর] Uphold, uphold, Subjudice
বীরত্বের করেন গান।
সুতোবাচ—
শুন শুক শুন শারী কর অবধান,

* বঙ্গবাসী সম্পাদক যাহাকে মনে করিতেছেন, তিনি আমার লক্ষ্য ন'ন।

দোহাকার বিবাদের হ'ক অবসান,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যে ডিপুটী প্রধান।
Hobby horse'পরে এর সদা অবস্থান।
এঁর চোখে নাহি ভায় আলোর জলুষ,
বিশ্বে যেন কিছু নাই ব্যতীত কলুষ,
পদমর্য্যাদার গীতি শুনায় স্বপন,
বিনয়ের মলমলে গর্ব আচ্ছাদন।
Code খানি মহাঅস্ত্র বিধাতার দান,
পাপের বিশাল বুক হয় খানখান,
পুলিশ ডেপুটী নয়, ডেপুটী পুলিশ,
Logic মরিয়া যায় বিষাদে হরিষ,
কলিকালে তোষামোদ জন্মেছে বিস্তর,
[এরা] সাক্ষাতে ডিপুটীগান গাহে নিরন্তর।
Theology, geology যত লজি আছে,
নূতন কিছুই নহে এ প্রাণীর কাছে,
নীল, সাদা, পীত, রাঙা আছে বর্ণ নানা,
জেঁকো, ডেঁপো, চোকা, রোখা, তোম
তানা নানা,
আর নহে ক্রমে মাল হইতেছে কড়া
ভয় হয় পাছে হাতে কেহ দেয় দড়া।
নির্ভয়ে মুনসেফ্ চিত্র করি বিচিত্রিত
এ চিত্র আঁকিতে চিত্ত নাহি হয় ভীত।
নথি ঘাঁটা Maine পড়া বিতস্তি হৃদয়,
তবু তারে বলা যায় সাধু মহাশয়,
কর্পূর উপিয়া যায় পরশি পবনে,
[এর] বিবেক কর্পূর উপে কার্য্যের পেষণে,
Robbing Peter এই বাক্য জ্ঞানময়
যেই জপে, তার হয় মঙ্গল নিশ্চয়।
নাজিরের মনচোরা উঁচুদরের কামলা,
Often connives at the Violation
by his আমলা।

Blotting paper কালি চোষে,
Office চোষে কাকের তাই;
[হেথা] মশা, মাছি, টিকটিকিরও
ইহার হাতে রক্ষা নাই।
[ওরে] দেশটা হ'লকি হ'লকি হ'লকি,
Integrity কোন খানে,
ভরা কিস্তি ডুব্‌ছে যে ভাই
কর্ম্মনাশার মাঝখানে।
রামের পোলা কুশ হ'য়েছিল,
খেঁকীর বাচ্চা খেঁকী,
দস্তা দিয়ে গড়াও টাকা
নাম হবে তার মেকী।
ছুঁচোর গায়ে সুবাশ ঢেলে
দোষ লুকাব কত,
দেশের দশা ভাব্‌তে ভাব্‌তে
শির হয়ে যায় নত।
অনুরাগের তপ্তানলে
বার করিয়ে প্রেমের ক্বাথ,
বাপের বিয়ে দিচ্ছে ভীষ্ম
ভাই ভগ্নী ক'রে সাথ।
শুকনো প্রেমে ভেজা হাসি,
বুড়োর মুখে শোভেরে,
মন ভোমরা ঘুরে বেড়ায়;
খুদে বধূর লোভেরে।*
প্রেমের যেন কষ্টি-পাথর
কাঁচা বাগানের দীনেশে,
বাল্য বিয়ের গুণ গাহিল
বুড়ো প্রেমের আবেশে।
মুখের হাসি সবাই হাসে,
হাস্‌তে চোখে কজন পারে?
বাল্য বিয়ের কালী কীর্ত্তন
বেশ গেয়েছিস্ আবার গারে।

* বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয় যাহা ভাবিতেছেন, তাহা নহে।

গৌরী জানি ছিলে ভায়া
তখন কেমন ক'রে বল,
পূর্ব্ব রাগের দোলানিতে
উঠ্‌ত কেঁপে প্রাণ কমল ?
কত জলিয়ার প্রেম চণ্ডীদাস গান
শুনাইতে বালিকায় হ'য়ে প্রেমবান্।
অবাক নয়নে বালা চাহিয়া চাহিয়া
আলিসে বালিসে শেষে পড়িত ঢুলিয়া।
স্বপনে সে পুতুলের দিত যত্নে বিয়ে ;
ভাবিত সে দায়ীতার অকরুণ হিয়ে ;
পূর্ব্বরাগ আর রসোদ্গার ভাই
ওগুলো সর জল্পনা,
প্রেমটা ছিল ওষুধ খাওয়া,
ঠিক্ বল্‌ছি ভাই গল্প না।
কলাবৌ কলাবৌ কলাবৌ আছিল,
ঘোম্‌টা ছিল অর্দ্ধহাত,
অনেক সরিলে গল্প কর্ত্তো
'দিদি মায়ের পোরের ভাত।'
কঙ্কাবতী লতা আমার,
শুন্‌তে কত কাণ পেতে,
সরল প্রাণের হিল্লোল গীতি
শুনিয়া উঠ্‌তো প্রাণ মেতে।
Old fool—Old fool
আর কেন কর ভুল,
পুরাতন কথাগুলি তুলিয়ে ;
চুপ্ কর—পথ ছাড়।
ভস্মে পুরাতনে ঢালো
বিবেকেরে তোল সখা জাগিয়ে।
বৈরাগ্য ছেয়েছে দেশ,
স্বভাবে সবাই মেষ,
আত্মশক্তি নাহি খেলে পরাণে
মর্য্যাদা হ'তেছে চূর্ণ
পশুত্বে ঘিরিছে তূর্ণ
মানুষের বর্ণ নাহি বয়ানে।

শঙ্করের মত গুলো সব
দূরে ফেলো দিয়ে,
কর্ম্ম নিয়ে খেলা কর
(যদি) থাক্‌তে চাও জীয়ে।
জীবন নিয়ে বেঁচে যদি
থাক্‌তে চাও ভবে,
মরণটারে আপন ক'রে
নিতে হবে তবে।
মরণ ভয়ে জীবন যাদের
লুকায় গুহার মাঝে,
হায়রে তাদের কাঙ্গাল জীবন
বিজড়িত লাজে।
ভিক্ষার ঝুলি দাও দাও বুলি
লুটায়ে পড়ে ল্যাজ নাড়া
তবু কম্বকর্ণ নিদ্রামগ্ন
ক্রন্দনে নাহি দেয় সাড়া।
লাঠি ধ'রে যতদিন
ভবের হাটে চল্‌বি,
খিদের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে
এমনি ভাবে মর্‌বি।
জীবনটারে জীইয়ে নিয়ে
খেলার মাঠে চল,
পদ ভরে কাঁপবে ধরা
কর্ব্বে টলমল।
Diplomacy—Diplomacy
তার মাঝেতে ন্যায়পরতা,
শুকিয়ে গেছে মুখের হাসি
তাইতে এমন সঙ্কুচিতা।
আমরা যাদের মি লউস্ বলি
দেখ্‌লে তাদের সঙ্ঘ,
হাত নেড়ে নেড়ে, মুখ নেড়ে নেড়ে,
দেখালে কতই রঙ্গ।
Carsonএরই ভ্রাতৃভাবে
কুর্দ্দনেতে ন্যায় ঝরা,

বিশ্ব হ'তে লুপ্ত সুধা
মন গুলো সব বিষভরা।
সুখের জন্যে যে দেশেতে
মানুষ মানুষ খায়,
যে দেশেতে আবাল বৃদ্ধ
ম্যাঘন্ পূজা চায়।
সেই দেশের idealism
বহুৎ বহুৎ আচ্ছী,
আর কাজ নাই ভেবেই রে বাপ
ভয়ে খাবি খাচ্চি।
Dyer Dyer—রং মেখেছে
নহেকো উহা কালীর রেখা,
দেড়শো বছর পরে ওহো
আমরা শিখ্‌লাম চরম শেখা।

চলহ সখা সবাই মেলি,
বিধির কাছে যাই,
গোঁসাই বলেন মীছার বিচার
বিধি-বিধানে নাই।
সুখের ঘরে রহগো শুয়ে
ঠাকুর জী—
কাণ কেটেছ বেশ করেছ
ভাবনা কি ?
মানুষ ছিলাম হাঁটায়ে বুকে
করে তুল্লে dodgeম,
Carsonএরই শক্তি থাক্‌লে
পেতে প্রভো শিরস্ত্রাণ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

ব্রণ-বিজ্ঞান।

(ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে পঠিত)

প্রদাহিত স্থানে পূঁজ উৎপন্ন হইয়া কোন গঠনা বলীর মধ্যে জমা হইলে তাহাকে ব্রণ বলে। পূঁজের চারিদিকে শৈল্পিক ঝিল্লির একটী আবরণ এবং তাহার চারিধারে সুস্থ মাংসাঙ্কুরের প্রাচীর বিদ্যমান থাকে।

ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধিকোষ ও মর্ম্ম, এই আট স্থানের দোষে এক বা পরস্পরের আশ্রয়ে ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই সব স্থানের মধ্যে ত্বক ভেদ করিয়া যে সব ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহা সুখসাধ্য ; অবশিষ্ট স্থানোৎপন্ন ব্রণ বিশেষতঃ যাহার আকার অস্বাভাবিক অর্থাৎ গোল নহে, তাহা কষ্টসাধ্য। ব্রণ দুই প্রকার—সদ্য ও পুরাতন। তন্মধ্যে পুরাতন ব্রণ পুরাতন প্রদাহ স্থানে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

সদ্য-ব্রণ—সদ্য ব্রণ ছয় প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও আগন্তুক। ইহার মধ্যে বাতজ ব্রণ বিষমভাবে ও বিলম্বে কোন স্থানে সত্বর ও আগন্তুক ও রক্তজ ব্রণ পিত্তজ ব্রণ সদৃশ পাকিয়া থাকে।

লক্ষণ—বাতজ ব্রণে নানাপ্রকার উদ্বেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু কোনটাই বেশী সময় স্থায়ী হয় না। সচরাচর ছেদন, ভেদন, তাড়ন, অকুঞ্চন, শেলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পর্শ শক্তির অভাব এবং ছাই, কপোত, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পিত্তজ ব্রণ, নীল, পীত, হরিৎ, কৃষ্ণ, রক্ত, কপিল বা পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট হয় ; বিশেষতঃ ব্রণ পাকিবার সময়, শরীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়, এবং গলিয়া

গেলে ক্ষতে ক্ষারদগ্ধবৎ জ্বালা পোড়া বিদ্যমান থাকে।

কফজ ব্রণ—চুলকানীযুক্ত ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট শীতল ও স্নিগ্ধ শ্বেত ও পাণ্ডুবর্ণ, এবং স্তব্ধ ভাবযুক্ত। সান্নিপাতিক ব্রণে এই তিন প্রকার ব্রণের লক্ষণাবলি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয়, এবং বর্ণ ও বেদনাদির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয়, ভয়ানক জ্বালাপোড়া বিদ্যমান থাকে, রোগী অল্প সময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই ব্রণ দেখিলেই সহজে অনুমান করা যায়।

রক্ত জন্য ব্রণে পিত্তজ ব্রণের লক্ষণাবলিই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

স্রাব—ব্রণের আশ্রয় স্থানের মধ্যে এক ব্রণ উৎপন্ন হইলে, কাচা মাংসের গন্ধ বিশিষ্ট ঈষৎ পীতবর্ণ জলের মত পূঁজ নিঃসৃত হয়। মাংস মধ্যে ব্রণ জন্মিলে ঘৃতের ন্যায় ঘন শাদা পিচ্ছিল পূঁজ নিঃসৃত হয়। শিরাগত ব্রণ হইলে অস্ত্র করা মাত্রই অত্যন্ত রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, অথবা জলনালীর জলনির্গমনের মতন লালা বা শ্লেষ্মা সদৃশ পিচ্ছিল কৃষ্ণবর্ণ পূঁজ ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষধারে নির্গত হইতে থাকে। স্নায়ুগত ব্রণ হইলে স্নিগ্ধ ঘন রক্ত মিশ্রিত পূঁজ বাহির হয়। অস্থিগত ব্রণ হইলে অস্থি অসার হইয়া পড়ে, এবং ঝিনুক-ধোয়া জলের মত স্নিগ্ধ স্রাব বা রক্ত মজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হয়। সন্ধিগত ব্রণ ভাল রকম উত্থিত হয় না বা টিপিলে তাহা হইতে বিশেষ কোন স্রাব হয় না, কিন্তু গমন, আকুঞ্চন, প্রসারণ দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোষদেশগত ব্রণ হইলে তাহা হইতে রক্তসূত্র পুরীষ, পাতলা পূঁজ রস নিঃসৃত হয়। মর্ম্মদেশগত ব্রণ হইলে সেই মর্ম্ম যে জাতীয়, স্রাবও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

ইহাই স্রাবের সাধারণ নিয়ম, কিন্তু বাতাদি দোষের প্রকার ভেদে স্রাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে। বাতজ ব্রণ হইলে স্রাব কিছু ঠাণ্ডা ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে। দধিমণ্ড, ক্ষার, জল বা মাংস ধৌত জলের ক্ষত স্রাবের বর্ণ হইবে।

পিত্তজন্য ব্রণ হইলে স্রাব গরম এবং গোমেদ, গোমূত্র, ছাই অথবা শাদা বর্ণ বিশিষ্ট, কষায় বা মধুর রসযুক্ত। কফ জন্য রস হইলে স্রাব শীতল এবং নবনীত, মজ্জা, চাউলের গুঁড়া বা বরাহচর্ব্বি সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। কিন্তু কোন স্থলে হিরাকষ বা নারিকেল জল সদৃশ স্রাবও নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রক্তজন্য বর্ণ হইলে পিত্তজ ব্রণবৎ স্রাব হয়, অধিকন্তু আমিষ গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক ব্রণ হইলে স্রাব গরম এবং নানা বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তবে কাজী, যকৃৎ, মুগের যুষ, কাকুড়ের রস সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট স্রাবই সচরাচর হইয়া থাকে।

সাধ্য, অসাধ্য, দোষ-দূষ্য ও স্থানের প্রকার ভেদে চিকিৎসাকালে এই সব ব্রণ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা সুখসাধ্য, কষ্টসাধ্য, অসাধ্য ও যাজ্য। যথাকালে প্রতিকার না হইলে সুখসাধ্য ব্রণও অসাধ্য হয়, অথবা রীতিমত চিকিৎসা হইলে অসাধ্য ব্রণও অনেক স্থলে আরাম হইয়া থাকে। রোগী যুবা, দৃঢ়, শরীর ক্লেশসহিষ্ণু ও বলবান হইলে হস্ত, পদ, ললাট, গণ্ড, স্কন্ধ, স্ফিক (পাছা) ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ ও মুখ মধ্যে জাতব্রণ সুখসাধ্য।

রোগী বৃদ্ধ বা কৃশ, ভীরু, অল্প প্রাণ হইলে এবং উপস্থ-কর্ণ, কোষ, উদর, সন্ধি, চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপাঙ্গ, জঠর, সেচনী, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষ, বগল, স্তন ও অস্থিজাত ব্রণ কষ্টসাধ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

ভগবদ্গীতা

(খ) জ্ঞানযোগ *।

[১] **জ্ঞান** অনন্ত ও পরম পবিত্র জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর নাই (৪-৩৮)। যে জ্ঞান দ্বারা তুমি সকল প্রাণীকে তোমাতে অভিন্নরূপে দেখিতে পার এবং সকল প্রাণীই ঈশ্বরে অভিন্নরূপে অবস্থিত, ইহা জানিতে পার; পৃথক পৃথক সর্ব্বভূতে একই ঈশ্বর অবিভক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পার,-তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, বিশুদ্ধজ্ঞান (৪-৩৫॥১৮-২০)। এই জ্ঞান অশেষ মঙ্গলের আকর। এই জ্ঞান মানুষে মনুষ্যত্ব প্রদান করে, চরিত্র গঠনে সহায়তা করে, ভেদাভেদ জ্ঞান দূর করে, আপন পরভাব বিদূরীত করে, হিংসা বিদ্বেষ অপসারিত করে। সমুদয় বসুধাকে আপন ও আত্মীয় করিয়া তুলে; লোকহিতে, দেশহিতে নিযুক্ত করে। তাই বলিয়া অন্য অনন্ত জ্ঞান উপেক্ষার বিষয় নহে। যতই জ্ঞানলাভ করিবে, ততই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিবে, ততই ইন্দ্রিয় সংযমের উপকারিতা বুঝিতে পারিবে, দেশ-হিতসাধনে রত হইতে পারিবে। বুঝিতে পারিবে, বুদ্ধি যার বল তার। শ্রেণী বিশেষের উন্নতিতে কোন দেশ উন্নত হয় নাই, হইবে না। এইজন্য সর্ব্বসাধারণের, স্ত্রীপুরুষ অভেদে, জাতি বর্ণ অবিচারে জ্ঞান আহরণ করা উচিত।†

[২] **সমদর্শী** হও। জ্ঞানীমাত্রেই সমদর্শী। একই ঈশ্বর সকলের মধ্যে অবিভক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন (১৮-২০)। যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দেখিয়া থাকেন (১৩-২৭)। সমদর্শী পুরুষ স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন (৬-২৯)। এই জ্ঞানই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জনক। জ্ঞানীগণ বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো হস্তি, কুকুর, চণ্ডাল —সকলকেই সমান জ্ঞান করেন (৫-১৮)। মৃত্তিকা, প্রস্তর, সুবর্ণে যাঁহার সমান দৃষ্টি; শত্রু মিত্র, সাধু ও অসাধুর প্রতি যাঁহার তুল্য ভাব, সকল প্রাণীর উপর যাঁহার সমভাব, তিনিই সংসার জয় করিয়াছেন, তাঁহার মন সতত ঈশ্বর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ (৬-৮॥৫-১৯)। এইরূপ মহাত্মা প্রিয়বস্তু লাভে উৎফুল্ল হন না; অপ্রিয় ঘটিলেও বিচলিত হন না (৫-২০)। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, কাহাকেও নীচ ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন না। উর্দ্ধে উঠিলে যেমন উচ্চ নীচ পৃথিবী পৃষ্ঠ সব সমান দেখায়

* গীতার প্রথম ৬ অধ্যায় কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ৬ অধ্যায় ভক্তিযোগ এবং শেষ ৬ অধ্যায় জ্ঞানযোগ। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞান নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এজন্য আমরা কর্ম্মযোগের পর জ্ঞানযোগ ও শেষে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করিতেছি।

† ইহারা সকলেই গীতা পাঠে ও শ্রবণে অধিকারী। গীতা মাহাত্ম্য ৭০। বেদের রহস্য জ্ঞান। পূর্ব্বে বেদ জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্য চারিবর্ণই বেদ শ্রবণ করিতে পারিত। শান্তিপর্ব্ব ৩৪৭—৪৯।

ধর্ম্ম জীবনেও তেমনি যাঁহারা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্নজাতি সকলই সমান জ্ঞান হয়।

[৩] বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ হও। যিনি স্বীয় আত্মায় সমস্ত নরনারীকে দর্শন করেন এবং সমুদয় নরনারীতে স্বীয় আত্মা দেখেন, (৬-২৯), তিনি কি বিশ্বপ্রেমে, দেশ-প্রেমে মত্ত না হইয়া থাকিতে পারেন? ফলত সকলকেই আপনা হইতে অভেদ জ্ঞান করিবে (৫-৭)। সকলের সুখকে তোমার সুখ, সকলের দুঃখকে তোমার দুঃখ বলিয়া মনে করিবে (৬-৩২)। সকলকেই আপনার ন্যায় ভাল বাসিবে।* সমদর্শিতা হইতে ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব হইতে দেশ-প্রেম, দেশ প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর সকল নরনারীতেই সমভাবে বর্ত্তমান, এই সত্য শুধু জানিলে হইবে না, বুঝিলে হইবে না; জীবনে ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। সকল নরনারীই যেন অব্যক্ত ঈশ্বরের ব্যক্ত মূর্ত্তি, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তবেত অপরের ক্ষতি করিয়া নিজ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে। তবেত প্রেমে পূর্ণ হইতে পারিবে, সকলের হিতানুষ্ঠানে রত থাকিতে পারিবে।

[৪] তোমার নিজের সুখ দুঃখ দ্বারা তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্থির করিতে চাহিতেছ, যদি সকলেই উহা করে, নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে কি কোন সমাজ স্থায়ী হইতে পারে? কোন দেশ উন্নত হইতে পারে?

[৫] আবার, তুমি যাহাকে সুখ দুঃখ ভাবিতেছ, তাহা আদৌ সুখ দুঃখই নহে। আলস্য, নিদ্রা, ভ্রম ও প্রমাদ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রকৃত সুখ নহে (১৮-৩৯)। বাহ্যপদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলে যেমন শীত গ্রীষ্ম বোধ হয়; তেমনি রূপ, রস, স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত চক্ষু, জিহ্বা ও ত্বকাদি ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলে সুখ দুঃখ অনুভূত হয়। অতএব শীত গ্রীষ্ম বোধের ন্যায়, বাহ্য বিষয় জনিত সুখ দুঃখ বোধও ক্ষণস্থায়ী (২-১৪)। রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ক্ষণস্থায়ী। কাযেই তাহারা ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মনের মধ্যে যে সুখ দুঃখ উৎপন্ন করে, তাহাও ক্ষণস্থায়ী। সেই ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অপসৃত হইলেই তজ্জনিত সুখেরও শেষ হয়, তখন দুঃখের উদয় হয়। তবেই ইন্দ্রিয় জনিত সুখ, কেবল দুঃখের কারণ মাত্র (৫-২২)। রূপ রসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ সংযুক্ত হইলে যে সুখবোধ হয়, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য বোধ হয়, কিন্তু পরে বিষে পরিণত হয় (১৮-৩৮)। লোকে মোহ বা অজ্ঞানতা বশতই তাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, আর তাহার অনুসরণ করে। মন যদি ইন্দ্রিয়গণকে অনুকুল বা প্রতিকুল বিষয়ে প্রেরণ না করে, তাহা হইলে সুখদুঃখের বোধ আদৌ উৎপন্ন হইতেই পারেনা। অতএব এই অলীক দুঃখের ভয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিরত হইবে কেন? অসার সুখের স্বপ্ন দেখিয়াই বা অকর্ত্তব্য কার্য্য করিবে কেন? যিনি সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, তিনি কখনও মৃত্যুকে ভয় করেন না (২-১৫)।

[৬] দুঃখ জ্ঞানীকে বিচলিত করিতে পারে না। কারণ জ্ঞানীগণ বিচার বুদ্ধি দ্বারা, দুঃখ কি, দুঃখ কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং কিরূপেই বা যায়, তাহা বুঝিতে পারেন এবং দুঃখ দূরের উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। সুতরাং সহস্র সহস্র দুঃখের বিষয়, শত শত ভয়ের ব্যাপার একমাত্র অজ্ঞানীকেই উদ্বিগ্ন করে। মূর্খই ভয়ে কাতর হয়, দুঃখে অভিভূত হয়। মৃতের জন্য বা নষ্ট বিষয়ের জন্য দুঃখ করিলে, মৃত বা নষ্ট-জনিত যে দুঃখ, তদতিরিক্ত আর এক দুঃখকে আনয়ন করা হয়, এক দুঃখ দ্বারা অন্যদুঃখ বৃদ্ধি করা হয়। তাহাতে দুঃখের লাঘব হয় না, বৃদ্ধি হয়। **দুঃখের বিষয় চিন্তা না করাই দুঃখ দূরের একমাত্র উপায়।** তদ্ভিন্ন দুঃখ-দূরের আর উপায় নাই। দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে জ্ঞানীগণ জোর করিয়া মনকে অন্য বিষয়ে নিযুক্ত রাখেন, দুঃখ কিছুই করিতে পারেনা। সতত সৎচিন্তা, সদালাপ সৎসঙ্গ, সৎ গ্রন্থ পাঠ ও সৎকার্য্য সাধন যেমন চিত্তশুদ্ধির উপায়; তেমনি দুঃখ দূরেরও উপায়*।

[৭] সকলই চেষ্টার উপর নির্ভর করে। চেষ্টা দ্বারা দুঃখ নাশ হয়, চেষ্টা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হয় (১৮-৩৬) অভ্যাস কর, চেষ্টা কর, মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ দুঃখে বিচলিত হইবেনা। অভ্যাস বশতঃই আমাদের মুখমণ্ডল শীতগ্রীষ্মাদি সুখদুঃখ অনুভব করে না। অভ্যাস করিলেই মনও সতত, সকল অবস্থায়, স্থির থাকিবে, কখনও বিচলিত হইবে না।

[৮] আত্মপ্রসাদই প্রকৃত সুখ। তাহা বাহিরের বিষয় সাপেক্ষ নহে, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী নহে। তোমার চরিত্র—কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে, মহোজ্জ্বল হইলে, তোমার হৃদয় কন্দর হইতে এক বিমল সুখের উৎস উত্থিত হইবে, তখন আত্মা দ্বারায় আত্মাতেই অনুপম আনন্দ অনুভব করিবে (২-৫৫)। তখন আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি, আত্মাতেই আনন্দ হইবে (৩-১৭)। এই আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অগ্রে বিষতুল্য বোধ হয়, শেষে অমৃতবৎ জ্ঞান হয়। এই আত্মপ্রসাদ জনিত সুখই প্রকৃত সুখ (১৮-৩৭)। অভ্যাস দ্বারা এই সুখকে বৃদ্ধি করা যায় এবং দুঃখকে নাশ করা যায় (১৮-৩৬)। এই আত্মপ্রসাদ যাঁহার আছে; তিনি প্রিয়জন বিয়োগ ভয়ে বিষণ্ণ হন না, বিপদে বিচলিত হন না, পাপে প্রবৃত্ত হন না।

[৯] লোক কিরূপে পাপে প্রবৃত্ত হয়। জগতে যত বিষয় আছে, তাহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। আমরা চক্ষুদ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, কর্ণ দ্বারা শব্দ ও ত্বক দ্বারা স্পর্শ অনুভব করি। এই চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণও ত্বক আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ইহারা এবং মন, বুদ্ধিও আত্মা এই আটটী আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়। আমাদের যে কোন প্রকার জ্ঞান জন্মে, উহা তাহাদেরই সাহায্যে জন্মে। কোন একটী ইন্দ্রিয়, আর মন, বুদ্ধিও আত্মা এই চারিটী কোন এক বিষয়ে সমকালে বর্ত্তমান না থাকিলে, সেই বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতে পারেনা। মন একটী ইন্দ্রিয়কে রূপ রসাদি তাহার নিজের বিষয়ে প্রেরণ করে। পরে সেই বিষয়ের বুদ্ধি বা

* গীতা ৫—৭॥ শান্তিপর্ব্ব ৬৬—৩৬॥২১৪—৩০॥ ৩২৬—২৯।

* অনেকে প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন, গীতা পকেটে করিয়া বেড়ান, কিন্তু গীতার মর্ম্মানুসারে চরিত্র গঠন করেন না। আর জাপগণ গীতা পাঠ করেন না, কিন্তু গীতানুযায়ী চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন। তাঁহারা পিতা পুত্র স্বামী প্রভৃতির মৃত্যুতে শোকে অধীর হন না, আবার স্বদেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দান করেন। এ সম্বন্ধে মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'নব্যজাপান' দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান আত্মায় উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর, তাহা মনের মধ্যে যত প্রকার কুপ্রবৃত্তির উদয় করে, তাহারা ছয় ভাগে বিভক্ত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। তাহারা মানুষের ঘোর শত্রু বলিয়া বড় রিপু নামে পরিচিত। চক্ষু কর্ণাদির সাহায্যে রূপ, শব্দাদির বিষয় জ্ঞান আত্মায় উৎপন্ন হইলে যদি উহা অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাতে সুখ বোধ হয়; যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে তাহা দুঃখ বোধ হয় (৩-৩৪)। যদি তাহাতে সুখ বোধ হয় তাহা হইলে রূপ শব্দাদি সেই বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়। সেই চিন্তা হইতে সেই বিষয়ের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে সেই—রূপ শব্দাদি বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। এই বিষয় ভোগের ইচ্ছাকে কাম বলে। এই কাম লোভকে উৎপন্ন করে। লোভ বাধা প্রাপ্ত হইলেই ক্রোধকে উৎপাদন করে। ক্রোধ হইলে মোহ বা অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মোহ হইলে কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোন্‌টী অকর্ত্তব্য, তাহার স্মৃতি নষ্ট হয়। স্মৃতি নষ্ট হইলেই বুদ্ধিনাশ হয়। তখন লোকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কুকার্য্যে রত হয়, পাপে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করে (২-৬২।৬৩)।

[১০] পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় আছে। তাহা কি?

(১) প্রথমে কামকে সংযত করিবে। ধুম যেমন অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে, ধুলি যেমন দর্পণকে ঢাকিয়া রাখে, কামও তেমনি জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে (৩-৩৮)। মনে ভোগ বাসনার উদয় হইলে, তাহা হিতাহিত জ্ঞানকে ঢাকিয়া ফেলে। লোকে ভোগবাসনায় বিচলিত হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। এই কাম অতিশয় প্রবল রিপু (৩-৩৭)। তাহা লোকের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে পরাজিত করিয়া, জ্ঞান হরণ করিয়া লোককে বিপথগামী করে (৩-৪০)। লোকে সুখভোগের লালসায় সকল প্রকার কুকার্য্যই করে। অতএব মনের মধ্যে যত প্রকার অবৈধ সুখভোগের বাসনা উদিত হইবে, সে সকলকে তখনই সংযত করিবে (২-৫৫)। সুখভোগের জন্য মনে যাহাই উদিত হইবে, তাহাই কদাচ করিবে না। **কিরূপে এই কামকে বশীভূত করা যায়?** (ক) রূপ রসাদি বিষয় ভোগজনিত সুখ প্রথমে অমৃত বলিয়া বোধ হয়। ইহাই মোহ। কিন্তু শেষে তাহা বিষ বলিয়া প্রমাণিত হয় (১৮—৩৮)। ইহাই জ্ঞান। সেজন্য সতত রূপ রসাদি বিষয়ের দোষ দর্শন করিবে। তাহা হইলে জ্ঞান প্রবল থাকিবে, মোহকে দমন করিয়া রাখিবে। ইহাই কামজয়ের সর্ব্বপ্রধান উপায় (৩—৪৩)। (খ) ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি বশীভূত থাকিলে কাম প্রবল হইতে পারে না (৩—৪০।৪১)। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিতে হইবে। মনই ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয়ে প্রেরণ করে। মন বশে থাকিলে, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণও বশে থাকে। যেই কুদৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে পড়ে, সেই যদি মন চক্ষুকে অন্যদিকে লইতে পারে; তাহা হইলে বিপদ কাটিয়া যায়। এইরূপ মনের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিলে, তাহাদের বিষয় যে—রূপ ও শব্দাদি তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে না, সুতরাং মনের মধ্যে কামক্রোধাদি ষড়রিপুকেও উৎপন্ন করিতে পারে না।

রিপুগণ এইরূপে উত্তেজিত না হইলে মানুষও কখনও অন্যায় কার্য্য করিতে পারে না। (গ) কাম ও বস্তু অনন্ত ও তাহা যতই ভোগ করা যায়, ততই নিত্য নূতন কাম্যবস্তু ভোগ করিতে বাসনা, ঘৃতাহুতি অনলের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সে বাসনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, সুতরাং সুখেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইহা স্পষ্ট বুঝিলে কাম শান্ত হয়। নিবৃত্তিই কামজয়ের উপায়; নিবৃত্তিতেই তৃপ্তি, লোভে নহে, ভোগে নহে। (ঘ) কুদৃশ্য, কুসঙ্গীত, কুপাঠ্য, কুআলাপ, কুচিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিবে। তাহারাই কামের সহায়। এইরূপে কামকে সংযত করিতে পারিলে তাহা আর লোভকে উৎপন্ন করিতে পারে না। লোভ না হইলে ক্রোধও হয় না। ক্রোধ না হইলে মোহও হয় না। মোহ না হইলে মদ মাৎসর্য্যও জন্মিতে পারে না। পাপের পথেও প্রবৃত্ত করিতে পারে না।

(২) কামের পরে যদি লোভের উদয় হয়, তবে উহাকে দমন করিবে। কি উপায়ে লোভকে দমন করা যায়? (ক) সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবে। (খ) লোভের অন্ত নাই, যতই লোভের বশবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই নিত্য নূতন লোভ আসিয়া জুটে, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। ইহা বুঝিলে লোভ দমন হয়। (গ) যত পার, তোমার অভাব কমাইতে চেষ্টা করিবে। অপরের দেখাদেখি বিলাস বৃদ্ধি করিবে না। (ঘ) লোভের বিষয় উপস্থিত হইলেই ভাবিবে, এই লোভে পড়িলে তোমার কি পরিণাম হইবে, লোভ পরিত্যাগ করিলেই বা কি উপকার হইবে। এইরূপ বিচার-বুদ্ধি থাকিলে লোভ প্রবল হইতে পারে না। (ঙ) লোভের দ্বারা যে সুখের উদয় হয়, তাহার আদি আছে, অন্ত আছে, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী। তাহার শেষ হইলেই দুঃখের উদয় হয়। জ্ঞান-বলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে লোভ বিচলিত করিতে পারে না। (চ) প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিলে, যেই উহা তুলিতে লোভ হয়, সেই যদি মনে কর যে সেই পদ্মবনে সর্প আছে, কুম্ভীর আছে, তাহা হইলে সেই লোভ তখনই অদৃশ্য হয়। এমন লোভের বিষয় কি আছে, যাহার পশ্চাতে ভয়ঙ্কর বিপদ, বিষম দুঃখ লুকাইয়া নাই? মৎস্য যেমন খাদ্যের লোভে লৌহ বড়িশ গ্রাস করিয়া প্রাণ হারায়, মানুষও তেমনি লোভে পড়িয়া যাহা পায়, তাহাই গ্রাস করিয়া আজীবন দুঃখ পায়। (ছ) যখনই মনে লোভাদির উদয় হইবে, তখনই মনকে অন্য বিশুদ্ধ বিষয়ে লইয়া যাইবে। সৎচিন্তা, সদালাপ, সৎসংসর্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সৎকার্য্য লোভ দমনের উপায়। (জ) কখনও অলস ভাবে বসিয়া থাকিও না, কখনও মনকে শূন্য রাখিও না। সতত কার্য্য করিবে। কার্য্য না থাকিলে সৎচিন্তা করিবে। (ক) ঈশ্বরই সকল নরনারীতে বর্ত্তমান (১৮—২০)। ঈশ্বরই রমণীর সৌন্দর্য্য (১০—৩৪)। অতএব রমণীর মাধুর্য্য, ফুলের সৌন্দর্য্য, অপরের ঐশ্বর্য্য দেখিলে, সে সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিবে। (ঞ) তোমাতেও ঈশ্বর বর্ত্তমান। তুমিও ঈশ্বরের অংশ। তুমি নীচ নহ, নিকৃষ্ট নহ। তোমার দেহ ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে লোভাদি কোন রিপুই প্রবল হইতে পারে না।

৩। লোভের পর যদি ক্রোধের উদয় হয়, তবে তাহাকে শান্ত করিবে। (ক) ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে দমন

করিবে। (খ) ক্রোধের উত্তেজনাকারী বিষয় বা ব্যক্তি হউক সতত দূরে থাকিবে। (গ) ক্রোধ অন্তে স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। (ঘ) কাম, লোভ ও অহঙ্কারকে দূরে রাখিতে পারিলে ক্রোধও দূরীভূত হয়। (ঙ) যাহাতে কোন কারণে ক্রোধের উদয় না হয়, সর্ব্বদা এইরূপ সতর্ক থাকিবে। ক্রোধ অতি প্রবল রিপু (৩—৩৭)। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটীই নরকের দ্বার, অধঃপতনের পথ। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেই মানুষ উন্নতির পথে ধাবিত হয় (১৬—২১।২২)। যিনি দুর্জ্জেয় কাম ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, প্রকৃত সুখী (৫—২৩)।

(৪) যদি ক্রোধের পর মোহ উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে জ্ঞান দ্বারা দূর করিবে। মোহই সকল পাপের মূল। মোহ হইলেই লোকে ন্যায় অন্যায় নির্ণয় করিতে পারে না, কুকার্য্যকে আর কুকার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। তখন কুকার্য্য করিয়া বসে।

(৫) মদ বা অহঙ্কার অবশ্য পরিত্যজ্য। আত্মপরীক্ষা ও আত্মদোষ দর্শন এবং গুণীগণের গুণ হৃদয়ঙ্গম করা অহঙ্কার দূর করিবার উপায়।

(৬) মাৎসর্য্য বা পরশ্রীকাতরতা অহঙ্কার হইতে পুষ্টিলাভ করে, প্রেম হইতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে মনে করে, আমিই সকল গুণের আধার, সেই অপরে কোন গুণ দেখিলে সহ্য করিতে পারে না, পরস্ত্রীতে কাতর হয়, ঈর্ষায় পূর্ণ হয়, পরনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়। সে যদি সকলকে ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মাৎসর্য্য দূর হইয়া যায়। কোন কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে হইলে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত যে সৎপ্রবৃত্তি, তাহাকে বর্দ্ধিত করিবে। তাহা হইলে সেই সৎপ্রবৃত্তি কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিবে।

(৭) এই ষড়্‌রিপুর তাড়নায় মানুষ ভ্রান্ত হইতেছে, যাহা অকর্ত্তব্য তাহাই কর্ত্তব্য ভাবিয়া করিতেছে, আর দুঃখ দুর্দ্দশায় বিধ্বস্ত হইতেছে। যদিও দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ এমনই প্রবল যে বিবেকবান ব্যক্তির মনকেও বলপূর্ব্বক পরাজিত করে (২—৬০), তথাপি তাঁহারা মনের দ্বারা, চেষ্টা দ্বারা, সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখেন (২—৬১) কখনও ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হন না। কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শরীর মধ্যে সংযত করিয়া রাখে, তাঁহারাও তেমনি রূপ রসাদি বিষয় হইতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখেন (২—৫৮)। দীর্ঘ উপবাসে বা কঠিন পীড়ায় যাঁহাদের শক্তি নষ্ট হয়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মন বিষয় ভোগবাসনায় পূর্ণ থাকে। কিন্তু জ্ঞানীগণ, শ্রেষ্ঠ কি, কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিয়া, সামর্থ্যসত্ত্বেও রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখেন (২—৫৯)। অতএব রূপ, শব্দাদি বিষয় হইতে চক্ষু, কর্ণ-আদি ইন্দ্রিয়গণকে অবশ্য সংযত করিবে (২—৬৮)। যাহার মন বশীভূত নহে, ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে, তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। ঝটিকা সমুদ্র মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র নৌকাকে যেমন অনায়াসে উড়াইয়া লইয়া চলে, সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল মন ও উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গণ লোককেও এক প্রকার বিষয় ভোগ হইতে অন্য প্রকার বিষয় ভোগে উড়াইয়া লইয়া চলে ও বুদ্ধি হরণ করে (২—৬৭)। যাহার মন ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে, তাহার বুদ্ধি

নাই; যাহার বুদ্ধি নাই, সে হিতাহিত চিন্তা করিতে পারে না। যে সে চিন্তা করিতে পারে না, তাহার শান্তি নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখও নাই (২—৬৬)। নানা দিক্ দেশান্তর হইতে বহু নদ নদী আসিয়া সুগভীর সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেও, সমুদ্র যেমন স্থির ও শান্ত থাকে, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের মনের মধ্যে রূপরসাদি বিষয় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। এইরূপ মহাত্মারাই প্রকৃত শান্তির অধিকারী। যিনি ভোগবাসনায় অস্থির, তিনি সে শান্তি কোথায় পাইবেন (২—৭০)? অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে, সর্ব্বাগ্রে আত্মা দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির করিবে। পরে সেই বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা হিতাহিত বিচার, বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত করিবে। তৎপরে মনের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিবে। তাহা হইলে ষড়রিপু বশীভূত হইবে। ষড়রিপু বশীভূত হইলে, পাপের প্রবৃত্তিও পলায়ন করিবে। আবার যদি কেহ পূর্ব্বে পাপে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ইন্দ্রিয়গণকে ও রিপুগণকে বশীভূত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে।*

(৮) ইন্দ্রিয়গণকে একেবারে বিনষ্ট করিতে হইবে না, তাহা হইলে সংসার চলিতে পারে না, ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সমাজ রক্ষা হয় না। মনকে বশীভূত করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে মনের অধীন করিয়া, অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিবে (২—৬৪)। ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া সৎপথে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিয়া, সংসারে থাকিয়া বিষয় ভোগ করিবে। যে বিষয় মনকে উন্নত করে, দেশোপকারে নিযুক্ত করে, দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে প্রবৃত্ত করে, সে বিষয় অবশ্য ভোগ করিবে, সে বিষয়ে মনপ্রাণ অবশ্য অর্পণ করিবে। ক্ষমতা সত্ত্বেও যিনি তাহা না করেন, তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা জনিত অধর্ম্মে পতিত হন, পাপাচারীর পাপের ভাগী হন। কিন্তু সাবধান, মনে যেন বিকার প্রাপ্ত না হয়। মনকে স্থির, ধীর ও প্রশান্ত রাখিয়া, কাম ক্রোধের অতীত হইয়া, একমাত্র কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহা করিবে। কিন্তু কদাচ অবৈধ বিষয় ভোগ করিবেনা, অবৈধ উপায়েও নহে। যাহা অবনতির সহায়, অধঃপতনের কারণ, তাহা হইতে সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে দূরে থাকিবে।

এইরূপ জ্ঞানীই প্রকৃত জ্ঞান-যোগী। এইরূপ আদর্শ জীবন গঠন করিবার জন্য ভক্তিরও একান্ত আবশ্যক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

* কুরঙ্গ—মাতঙ্গ—পতঙ্গ—ভৃঙ্গ—মীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। এক প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ? (গরুড় পুরাণ)। হরিণ ব্যাধের বংশীধ্বনিতে ভুলিয়া—একমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বিনষ্ট হয়। বন্য হস্তী পালিত হস্তিনীর শরীর স্পর্শ সুখে লোভ করিয়া একমাত্র ত্বগেন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বন্দী হয়, মৃতপ্রায় হয়। পতঙ্গ অগ্নির সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া একমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পুড়িয়া মরে। ভৃঙ্গ পদ্মগন্ধে মুগ্ধ হইয়া একমাত্র নাসিকাইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পদ্মে প্রবেশ করে, সন্ধ্যাকালে পদ্ম মুদিত হইয়া তাহাকে বন্দী ও বিনষ্ট করে। মৎস্য একমাত্র জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া লৌহ বড়িসা গ্রাস করিয়া পঞ্চত্ব পায়। হায়, হরিণ, হস্তী, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মৎস্য এই পঞ্চপ্রাণী এক একটী ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বিনষ্ট হয়, যে ব্যক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দাস, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সেবায় রত, সে কেন না বিনষ্ট হইবে?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

উত্তররামচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে বনদেবতা বাসন্তী ও অধ্বগবেশা আত্রেয়ীর মিলন। বাসন্তী সীতার প্রাণ-প্রিয়তমা সখী পঞ্চবটী বাসের বিশ্রম্ভসাক্ষী সহচারিণী। আত্রেয়ী পুরাণ ব্রহ্মবাদী বাল্মীকির শিষ্যা স্বয়ং ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মজ্ঞা নারী। বাসন্তী রসময়ী সত্ত্ব-গুণময়ী প্রবৃত্তি। আত্রেয়ী শান্তিময়ী সুকোমলা নিবৃত্তি। বাসন্তীকে দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতিরাণীর জীবন্ত প্রতিমা মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে। আত্রেয়ীকে দেখিলে মনে হয় সংযত ব্রহ্মচারিনীর পবিত্র স্ত্রী আকৃতি ধরিয়া পৃথিবীতলে সঞ্চারিনী হইয়াছে।

উভয়ের মিলন স্বাভাবিকই বড় সুন্দর। আত্রেয়ী বাল্মীকি আশ্রমের কথা, নবদূর্ব্বা দলশ্যাম যমজ শিশুর কথা পাড়িলেন। তাহাদের কৃষ্ণ ঈষদারক্ত নয়ন আরক্তিম পল্লবনিভ ওষ্ঠাধর, মৃণাল শুভ্র ললাট, ভ্রমর কৃষ্ণ কাকপক্ষ আর আজন্ম সিদ্ধ জৃম্ভকাস্ত্র বিজ্ঞান আমাদের মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিল। আত্রেয়ী উপনীত প্রদীপ্ত প্রজ্ঞ ক্ষত্রিয় কুমার দ্বয়ের সহিত আপনার সহাধ্যয়নযোগের প্রসঙ্গ তুলিলেন; জানাইলেন যে সে অধ্যয়ন যোগ আর থাকে না। মহর্ষি রামায়ণ প্রণয়নেই ব্যস্ত রামায়ণের অধ্যাপনায় ও স্বর শিক্ষায় মহর্ষির অতীব আগ্রহ এই দুইটী কারণে তথায় পাঠের বড়ই বিঘ্ন। তজ্জন্য আত্রেয়ী বাল্মীকি আশ্রম ত্যাগ করিয়া, কত বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া, কত গিরিনদী পার হইয়া অগস্ত্যের আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। পথিমধ্যে বনদেবতা বাসন্তীর সহিত সাক্ষাৎ।

আত্রেয়ীকে পথশ্রমে ক্লান্তা, রৌদ্রতাপে তাপিতা দেখিয়া বনদেবতা বাসন্তী ফল-কুসুমার্ঘ্যদ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিলেন; "এই বন যথেচ্ছ ভোগ করুন আজ আমার সুদিবস "এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। তরুচ্ছায়া আসন, স্বচ্ছবারি পাদ্য ফলমূল ভোজ্য, মধুর বাণী ভোজনদক্ষিণা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল; বাসন্তীর এই আতিথেয়তা বিনয় মধুর নম্র ব্যবহার, স্বভাবতঃ কল্যাণময়ী প্রকৃতি, নিদাঘ ক্লান্তা আত্রেয়ীর নিকট তরুচ্ছায়া শীতল বারিও ফল মূল অপেক্ষা উপভোগ্য বোধ হইল। বাসন্তী স্নেহে মন্দাকিনী, পবিত্রতায় গোমুখী, মাধুর্য্যে অপরাজিতা সরমে বনযূথিকা। তার বর্ণ চম্পকের মত, তার আলাপ স্বর্গসঙ্গীতের মত, ব্যবহার অমৃতের মত। বাসন্তীর আত্রেয়ী সহ মিলনেও কথোপকথনে জানিতে পারা গেল—যমজ শিশু দুইটী সীতার, লবকুশ তাহাদের নাম, বাল্মীকি আশ্রমে তাহাদের শিক্ষা। আরও জানিতে পারা গেল—সীতা বিসর্জ্জন দিয়া সীতাবল্লভ রামচন্দ্র সীতারই সুবর্ণময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকেই সহধর্ম্মচারিনীরূপে পার্শ্বে রাখিয়া অশ্ব মেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। পরিশেষে ধূমপায়ী তপস্যারত শূদ্রমুনির তপশ্চরণ ফলে ব্রাহ্মণ-বালকের অকাল মৃত্যু, এই দৈববাণীর ফলে অযোধ্যাপতি তাহার অন্বেষণার্থ দণ্ডকারণ্যে সমাগত হইতেছেন ইহা জানাইয়া দিয়া আত্রেয়ী চলিয়া গেল।

দণ্ডধারীরূপে রামচন্দ্র পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে সমাগত। সম্মুখে ধূমপ শূদ্র কুলতিলক শম্বুক মুনি তপস্যারত।

কি তার কঠোর তপস্যা? করুণাময় রামচন্দ্র সদয়োদ্যত খড়্গ হস্তে শাসনকর্ত্তৃরূপে দণ্ডায়মান। রামচন্দ্রের কুসুমসুকুমার উদারপ্রাণ দণ্ড দিতে চাহে না, দৃঢ়বদ্ধমুষ্টি হস্ত হইতে তরবারি আদৌ উঠিতে চাহে না। প্রাণ বলিতেছে, "যেন এ দণ্ড নহে; হত্যা।" প্রাণ যাহাই বলুক, এ কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য। নিজের ধারণা ও বিবেচনার উপর কার্য্য করা রাজার পক্ষে সকল সময়ে সম্ভব নহে। সে অধিকার তাঁর কোথায়? তিনি রাজা, দেশের দণ্ডমুক্তের কর্ত্তা। প্রজা সাধারণের তিনিই যে প্রতিনিধি। শাস্ত্র দেশাচারের তিনিই যে রক্ষক। দেশের শাস্ত্র যাহা বলে, আচার যাহার পোষকতা করে, দৈববাণী যার সমর্থন করে—তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার ক্ষমতা রাজার থাকিতে পারে না। নিজের বিবেক, নিজের সহানুভূতি, নিজের ধারণা, নিজের দুর্ব্বলতার জন্য প্রজার মুখের দিকে তাকাইবেন না? তাই করুণাময় জগৎপতি শম্বুকের সম্মুখে সদয়োদ্যত খড়্গ হইয়া বলিতেছেন—

"রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্।
রামস্য গাত্রমসি দুর্ব্বহগর্ভখিন্ন—
সীতাপ্রবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে?"

রে দক্ষিণ হস্ত, মৃত ব্রাহ্মণ বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য এই শূদ্রমণির উপর অস্ত্রক্ষেপ কর। তুমি রামের গাত্র, দুর্ব্বহগর্ভভারখিন্না সীতার নির্ব্বাসনে নিপুণ তোমার আবার করুণা কোথায়? সীতা বিসর্জ্জনের মত এই শম্বুকমুনি বধ করিতেও রামের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। সীতা বিসর্জ্জন যে বৃত্তির কার্য্য, শম্বুক বধও সেই একই বৃত্তির জন্য। দুইই কঠোর কর্ত্তব্যপালন। দুইই প্রজানুরঞ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। দুইই লোকারাধনা ব্রতপালনের জন্য আত্মবলি। দুইটীর একটি স্থায়ী, অপরটী ক্ষণিক। দয়াল রামচন্দ্র কোনরূপে অস্ত্রাঘাত করিয়া (কথঞ্চিৎ প্রহৃত্য) গভীর মর্ম্ম বেদনায় বলিয়া উঠিলেন, "কৃতং রামসদৃশং কর্ম্ম অপি জীবেৎ স ব্রাহ্মণপুত্রঃ।" রামসদৃশ কার্য্যও করা হইল; এক্ষণে ব্রাহ্মণকুমার বাঁচিবে ত? এ অস্ত্রাঘাত শম্বূকের দেহের উপরই পড়িয়াছিল; কিন্তু রামচন্দ্রের পড়িল ব্যথা কাতর চিত্তের উপর।

এ স্থলে শূদ্রমুনির তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণ বালকের অকালমৃত্যু, তাহার শিরশ্ছেদেই অকালমৃত্যুর নিবারণ—এই দৈববাণীর উপর অবশ্য রামচন্দ্রের বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু এই নৃশংস কার্য্যের ফল এত শুভ—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার কোমলার্দ্র চিত্ত, উদারপ্রাণ প্রস্তুত ছিল না, তাহা বোঝা যায়।

শূদ্রমুনির পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গেল। শম্বূকও তৎক্ষণাৎ দিব্যদেহ লাভ করিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে দেখা দিলেন। ব্রাহ্মণ-শিশুর জীবনলাভের সংবাদ দিয়া আপনার এই পরম সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া শম্বূক রামচন্দ্রের ব্যথিত ও সংশোয়িতচিত্ত শীতল ও আশ্বস্ত করিলেন। রামচন্দ্র শম্বূককে আপনার গভীর আনন্দ, প্রগাঢ় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া আনন্দময় পবিত্র বৈরাজ লোকে গমন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। রামচন্দ্রের কৃপাই এই সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ, শম্বূকের এ বিশ্বাস ছিল। এরূপ গভীর বিশ্বাস না থাকিলে কি শূদ্র শম্বূক এক জন্মেই যুক্ত হ'তে পারে? দেশের নিয়ম ও শাস্ত্রের আদেশের বিরুদ্ধে রাজদণ্ড উপেক্ষা করিয়া তপস্যারত হওয়ায় শম্বূকের

অসামান্য তপস্যানুরাগ ছিল জানিতে পারা যায়।

চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্যের প্রতি রামের দৃষ্টি পতিত হইল। সেই প্রীতিবিশ্রম্ভ সাক্ষী ভূতপূর্ব্ব খরালয় জন্মস্থান দণ্ডকারণ্য। একদিকে স্নিগ্ধশ্যাম, অপরদিকে ভীষণ বিস্তার কর্কশ ভূমিভাগ। স্থানে স্থানে নির্ঝরের ঝঙ্কৃতরবে দিক্‌সমূহ মুখর! কোথায় পুণ্যক্ষেত্র আশ্রম, কোথাও গিরিনদী বন উপবন স্ফুট দৃশ্যমান।

উত্তররামচরিতের দ্বিতীয়াঙ্কের স্বাভাবিক প্রকৃতি বর্ণনায় ভবভূতির আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির বিকাশ। আদিরসে ভবভূতি কালিদাসের নিম্নে হইতে পারেন, কিন্তু রৌদ্র, বীভৎস, বিস্ময় ও ভয়ানক রসে ভবভূতির স্থান কালিদাসের ঊর্দ্ধে—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। "মধুরে কালিদাস, উৎকটে ভবভূতি" ইহা সূক্ষ্ম সমালোচকের বাণী।

উত্তররামচরিতে দ্বিতীয়াঙ্কের প্রকৃতি বর্ণনার সহিত রামচন্দ্রের মনোবৃত্তি যেন এক সুরে বাঁধা আছে। প্রাকৃতিক বর্ণনা ও রামচন্দ্রের মনোভাবের এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বাস্তবিকই বড়ই উপভোগের জিনিষ। রামের মনোবৃত্তির ত্রিতন্ত্রীতে যখন যে সুর উঠিয়াছে, প্রকৃতি বর্ণনার তারে তারে সেই সুরের ঝঙ্কার শোনা গিয়াছে। রামের হৃদয়বীণায় যখন যে রাগিণী বাজা আবশ্যক হইয়াছে, প্রকৃতির যন্ত্রে ঠিক সেই রাগিণীর ঝঙ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামের মনোবৃত্তিই বাহ্যপ্রকৃতির আকারে প্রতিভাসিত অথবা রামের মনোবৃত্তির রাগেই বাহ্যপ্রকৃতি অনুরঞ্জিত। রামের প্রকৃতি আর এই বাহ্যপ্রকৃতি যেন বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মত পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট। আমাদের দর্শনেও বলে, অন্তঃ প্রকৃতিই বাহ্য প্রকৃতির আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অথবা অন্তঃ প্রকৃতির সুপষ্ট ছায়াপাত বাহ্যপ্রকৃতির অবশ্যই পড়িতে দেখা যায়। চিন্তার এই দিক্ এ স্থলেও খাটিবে না কেন?

রামের প্রকৃতিই বাহ্যপ্রকৃতির আকারে অভিব্যক্ত, ইহা সূক্ষ্মচিন্তা। রামের প্রকৃতি আর বাহ্যপ্রকৃতি একভাবাপন্ন—ইহা সরল চিন্তা। রামের প্রকৃতির চিত্র আর গিরি নদী বন উপবনের চিত্র একই প্রকার। একই সুর, একই ঝঙ্কার, একই অর্থ।

স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণা ভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখর ককুভো ঝাঙ্কৃতৈ র্নির্ঝরাণাং
এতে তী শ্রমগিরি সরিদ্‌গর্ত্তকাভাবমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিততুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

রামের হৃদয়ের পানে তাকাও; দেখিবে, এক ধারে স্নিগ্ধ ও শ্যাম; কি সুন্দর, কি নয়নরঞ্জন দৃশ্য! অপর ধার ভীষণ বিস্তার, কর্কশ, কি কঠোর মর্ম্মন্তুদ ছবি! রামের হৃদয় স্বভাবতঃ শীতল ও রমণীয়; কিন্তু এক্ষণে স্বহস্তকৃত সীতা নির্ব্বাসন জন্য দুঃখ শোকে সে হৃদয় মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে, যত দূর লক্ষ্য কর, কেবল তপ্ত বালুকারাশি এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছে, জল নাই, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, শৈবাল কিছু নাই। উঃ সে কি ভীষণ! মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহিয়া সহিয়া রামের কোমল বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, প্রস্তরের মত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উঃ সে কি রুক্ষ কর্কশ! একদিকে হৃদয়ে পুণ্যক্ষেত্রের স্বচ্ছ পবিত্রতা, আশ্রমের শান্তি বিরাজিত, অপর দিকে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের দৃঢ়তা আপনার পদে দণ্ডায়মান। হৃদয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা ক্ষীণা প্রবাহিনী অস্ফুট কুলু কুলু নিনাদিতা।

কত গর্ত্ত গভীর ক্ষতের মত, কত দুঃখ কান্তারের মত অবস্থিত।

দণ্ডকারণ্য অভিশপ্ত ভূভাগ অথচ তাহা জনস্থানও বটে। রামচন্দ্রের হৃদয় সীতা নির্ব্বাসন দোষে অভিশপ্তবৎ অথচ কর্ত্তব্য পালনেও সংযমে আশ্রমবৎ। দণ্ডকারণ্যের একদিকে সর্ব্বভূতলোমহর্ষণ উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদকুল। আর তাহাদের শ্রবণবিদারী গর্জ্জনে প্রকাণ্ড গিরিগহ্বর কি ভীতিপ্রদ! এমনই গিরিগহ্বর সমেত দীর্ঘ অরণ্যানী দক্ষিণ দিকে ব্যাপিয়া একটা স্বতন্ত্র পৃথিবীর মত অবস্থিত। রামের হৃদয়েও দেখ—সর্ব্বলোক লোমহর্ষণ উন্মত্ত শোকের কি প্রচণ্ড কোলাহল! কি মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ধ্বনি! ঐ কোলাহল, ঐ হাহাকার-পরিপূরিত অতলস্পর্শ যন্ত্রণার গহ্বর সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত।

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ড
সত্ত্বস্বনা
স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর ঘোষভুজগ শ্বাস
প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎ স্বল্পান্তসো যা স্বয়ং
তৃষ্যাদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদ দ্রবঃ পীয়তে॥

দণ্ডকারণ্যের এক স্থান পক্ষিকুজনরহিত স্তিমিত ভাবাপন্ন, অপর স্থান প্রচণ্ড বনজন্তুর কোলাহলে মুখরিত। রামের হৃদয়ের এক পার্শ্ব নিঃশব্দমৌন, স্তিমিত, অপর পার্শ্ব যন্ত্রণার কোলাহলে শব্দিত। দণ্ডকারণ্যে স্বচ্ছন্দসুপ্ত বিস্তৃতফণ সর্পকুলের নিশ্বাস বায়ু যোগে অগ্নি হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে; রামের অন্তরেও মন্দীভূত সীতা বিরহবহ্নি দণ্ডকারণ্য দর্শনে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। আলবালের এক কোণে অল্পমাত্র জল চিক চিক করিয়া শোভা পাইতেছে। কৃকলাসগুলি স্বচ্ছন্দ অবস্থিত অজগরের দেহনিষ্যন্দ স্বেদবারি তৃষ্ণাভরে আকণ্ঠ পান করিয়া লইতেছে। রামের হৃদয়াভ্যন্তরে কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্মের ও প্রজানুরঞ্জন ব্রতের স্বচ্ছসলিলধারা ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। রামচন্দ্রের উত্তপ্ত স্বেদধারাও অন্তর্নিহিত শোকতাপের কৃকলাসগুলি মুহূর্ত্তেই নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিতেছে।

তার পর রামচন্দ্র ভূতপূর্ব্ব খরালয়ে জনস্থান অনেকদিনের পর বাষ্পাবরুদ্ধনয়নের অশ্রু পতনোদ্গমের অন্তরালে দেখিয়া লইতে লাগিলেন। পূর্ব্বদৃষ্ট অতীত বৃত্তান্তগুলি প্রত্যক্ষের মত চিত্তে সুস্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল, স্মৃতি অনুভবের আকারে দেখা দিল যে স্থানগুলি বৈদেহীর বড় প্রিয় ছিল, সেই স্থানগুলি রামচন্দ্রের কাছে আজ বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। পরম রমণীয় মধুস্যন্দী উপবনের শ্যামল যৌবনশ্রী রাক্ষসী মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। সুখের সময়ে যার শোভায় শ্রান্ত মন হৃষ্ট, ক্ষুধিত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত, পরিশ্রান্ত দেহ স্নিগ্ধ হইত; আজ দুঃখের সময়ে সেই শোভাই মনকে তিক্ত, ইন্দ্রিয়কে বিভ্রান্ত, দেহকে বিফল করিয়া ফেলিল। সেই ফল পুষ্পময় প্রমোদকানন, সেই ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণী, সেই হংসমালাধ্যুষিত নদীতীর রামকে কোন অজ্ঞেয়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। সেই প্রীতিবিশ্রম্ভ সাক্ষী শয়নীয় শিলাতল, সেই সীতাকরবর্দ্ধিত ময়ূরশিশুকরিপোত, হরিণ শাবক রামের দেহ ইন্দ্রিয় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মনে পড়িল, সেই সীতাসহ সুখকর ভ্রমণ, সীতাসহ সেই বিস্রম্ভ অবস্থান, সীতাসহ সেই অবিদিত গতযামা রাত্রি পোহান।

সেই কষ্টকর স্থানগুলি সীতার প্রিয়

স্মৃতিচিহ্নগুলি আর দেখার প্রয়োজন নাই। তাই শম্বুক "তদলমেভির্দুরাসদৈঃ" বলিয়া প্রশান্ত গম্ভীর মধ্যমারণ্যকের কথা পাড়িলেন। যার মদমত্ত প্রান্তভাগ ময়ূরের কণ্ঠচ্ছবির মত কোমল চিক্কণ; যার তরুতল নীলবহুলছায়ায় নিবিড় সুখস্পর্শ, যার ক্রোড়দেশ অসম্ভ্রান্ত বিবিধ মৃগকুলসঞ্চারে রমণীয়—সেই মধ্যমারণ্যকের দিকে রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই শম্বুক সীতাবিরহ দুঃখ প্রশমনের উপায় বলিয়া বুঝিল! রামের হৃদয় বর্ত্তমানে দুর্ব্বল, ব্যথাকাতর ও মোহসমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সে হৃদয়ে প্রশান্ত গম্ভীরভাব আনয়ন করিতে পারিলে অনেকটা সুখশান্তি লাভ হইতে পারে, শম্বুকের এই ধারণা জন্মিল।

রামের একদিক্ যেমন কুসুমের মত কোমল। অপরদিক্ তেমনই বজ্রের মত কঠোর ছিল। একদিকে নির্ঝরিণী কুলুকুলুরবে তরতরভাবে বহিয়া যাইতেছে, অপরদিকে দাবাগ্নি হু হু করিয়া প্রখরবেগে জ্বলিতেছে। নরপতি রামচন্দ্রে দৃঢ়তা, সংযম, চিত্তজয়, সহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যপালন। সীতাপতি রামচন্দ্রে দুর্ব্বলতা, মোহ, অধৈর্য্য, যন্ত্রণা ও মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন।

মধ্যমারণ্যের বেতস লতা কুসুমসুরভি-শীতল স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিণীর স্ফীত তরঙ্গ রামের হৃদয়ে বহাইয়া, শিশিরকটুকষায় গজপ্রিয় শল্লকীর প্রস্রুত গন্ধ রামের অন্তরে ছুটাইয়া শম্বুক অগস্ত্য আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

শম্বুক চলিয়া গেল। রামের হৃদয়ে প্রবাহিণীর কুলুকুলুধ্বনি বড় বেশীক্ষণ শোনা গেল না, শল্লকীর সে শীতমধুর গন্ধ বেশী সময় সে অন্তরে-স্থায়ী হইল না। রাম শোকমাত্র দ্বিতীয় হইয়া সে স্থানে রহিলেন।

তখন রাম সেই সেই পাহাড়ের উপর বেড়াইতে লাগিলেন, যেখানে সীতার পালিত পুত্র ময়ূরের দল আজিও তেমনই বেড়াইয়া বেড়ায়। সেই সেই বনস্থলীর উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন—যে স্থানে সীতার সযত্নপোষিত মত্ত হরিণের দল আজিও সেই মত গর্ব্বিত পদক্ষেপে ছুটাছুটি করে। সেই আমঞ্জু বঞ্জুললতা—সেই অবিরলনীল নিচুল তরুশ্রেণী—সেই চিরপরিচিত কেতকসুরভি সরিৎতট রাম সস্পৃহলোচনে দেখিতে লাগিলেন। সেই প্রস্রবণগিরি—যাহা দূর হইতে মেঘমালার মত; সেই গোদাবরী নদী যাহা দাক্ষিণাত্যের সুবর্ণময়ী কাঞ্চীর মত; সেই উত্তুঙ্গশিখর—যাহা পরার্থে ত্যক্তজীবিত মহাত্মা জটায়ুর আবাসস্থল; সেই সকল স্থান রাম ভাল করিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সুখে দুঃখে ঘেরা—সেই স্মৃতিরাগে রঞ্জিত করা—সেই শয়নে স্বপনে ভ্রমণে উপবেশনে নিত্যসঙ্গী বনস্থলী। রাম আপনার বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গেলেন—অতীতের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া আপনাকে ভুলিয়া গেলেন।

কি সুন্দর রমণীয় বনভাগ! আর কিবা সুন্দর গোদাবরীর জলে সেই বনভাগের শ্যামল তরুচ্ছায়ার প্রতিফলন! কে যেন সেই গোদাবরীর স্বচ্ছজলে শ্যামল তরুশ্রেণীর শ্রী বিছাইয়া দিয়া গিয়াছে। প্রতিফলিত ছায়াগুলি কোন ইন্দ্রজালিকের করস্পর্শে সত্যকারের তরুবীথিকা বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেই বনভাগের তরুশ্রেণীর পত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন পক্ষিকুঞ্জের কূজনইবা কি শ্রুতিসুভাগ! কে বলে বনভাগ জড়, মৌন ও নির্জ্জীব! যার অমন অস্ফুট শ্রুতিসুভাগ কলধ্বনি—সে কি জড়? যাহা হইতে অমন

সুস্বর সঙ্গীতের উদ্ভব—সে কি মৌন? যার প্রাণ স্পন্দন দুঃখিত; স্তিমিত প্রাণে সুখ ও চাঞ্চল্যতা আনিয়া দেয়, সে কি নির্জ্জীব?

সেই পঞ্চবটী—বহুদিনের বিবিধ বিস্রম্ভসাক্ষী, সেই বাসন্তী—সীতার প্রাণ প্রিয়তমা সখী বনের অধিদেবতা; রামের এই অবস্থা বিপর্য্যাসের কালে কিরূপে ইহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেন—রাম ভাবিয়াই আকুল। যাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া একদিন নন্দনের অদ্ভুল সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছিলেন, আজ এক সুরে শ্মশানের হরি হরি ধ্বনি কেমন করিয়া করিবেন?

রামের মর্ম্মস্থল কৃতকার্য্যের অনুশোচনায় বিদীর্ণ হইতেছিল। উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার ক্ষীণ পঞ্জরগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। ইতস্ততঃ প্রসৃতগ্রস্ত কেশকলাপে পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানি মেঘে ঢাকা পড়িতেছিল; বোধ হইতেছিল, অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত যন্ত্রণার কালিমারাশি যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। রাম নিজের হৃদয়ের তলদেশে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন চিরসন্তাপজ তীব্র বিষরস আজ অকস্মাৎ তাঁহার মর্ম্মস্থলে সঞ্চারিত হইয়া পড়িল; তীক্ষ্ণ শল্যখণ্ড হঠাৎ প্রবল বেগে দেহের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গেল; দৃঢ়রুদ্ধমুখ ব্রণ আজ মুহূর্ত্তের মধ্যেই ফাটিয়া উঠিল। ঘনীভূত শোক আজ তাঁহাকে বিবশ ও মূর্চ্ছিত করিয়া দিতে লাগিল।

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ
ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং প্রচয়তি।

পূর্ব্বে যেখানে স্রোত বহিত, এখন সেখানে নদীর পুলিন দেখা যাইতেছে। বৃক্ষ সকলের ঘন সন্নিবেশ কোথাও বিরল, বিরলভাগ কোথাও নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। বহুকাল পরে দৃষ্ট এই বন অপর বন বলিয়াই প্রতীত হইতেছে; কেবল পর্ব্বতের স্থির সন্নিবেশ দেখিয়াই বোঝা যাইতেছে যে, এই সেই বন। বাস্তবিক রামের অন্তঃপ্রকৃতি এখানে বাহ্য প্রকৃতি আকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। রামের অন্তঃ প্রকৃতি আর এই বনস্থলীর দৃশ্য একই রূপ শোভা পাইতেছে। রামের অন্তরে যেখানে প্রণয়ের প্রবাহ ছুটিত, এখন সেখানে বিরহের চড়া পড়িয়াছে, যেখানে মিলনের সুখ রাগিণী বাজিত, এখন সেখানে কারুণ্যের শোক সঙ্গীত তান ছুটিতেছে। সুখ শোকে, মিলন বিরহে পরিণত। রামের সবই বিপর্য্যস্ত। রামকে আর চেনা যায় না, যেন সে রাম আর নাই। কেবল সৌম্য গম্ভীর অনুভাব সৌভাগ্য পর্ব্বতের মত অবিচল আছে, তাই সেই রাম বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। লাবণ্যময়ী মুক্তাফল-তরলা ছায়া যেমন শকুন্তলার ক্ষীণপাণ্ডু দেহ ত্যাগ করে নাই, এই অনুভাব-সৌভাগ্য তদ্রূপ রামের বিপর্য্যস্ত দুর্ব্বল শরীর ছাড়িয়া যায় নাই।

রাম আর নয়ন মেলিয়া পঞ্চবটী দেখিতে পারেন না, পঞ্চবটী দর্শনে আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারেন না, পঞ্চবটী ছাড়িতে পারিলে যেন তিনি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। তথাপি পঞ্চবটীর স্নেহ-চুম্বকের মত তাঁহার লৌহসম কঠোর হৃদয় এমনই আকৃষ্ট করিতেছে যে, ছাড়িয়া যাইতেও তিনি পারেন না। কি অব্যক্ত যাতনাময় আকর্ষণের মোহে তিনি চালিত হইতেছেন, কি

অজ্ঞেয় দুঃখময় স্রোতের টানে তিনি ভাসিয়া যাইতেছেন। সীতার সহিত এতদিন নিজের গৃহের মত যেখানে আনন্দে দিন কাটিয়া গিয়াছিল, যাহার কথা লইয়া অযোধ্যায় কত রজনী সুখে দুঃখে পোহাইয়াছিল সেই পঞ্চবটীকে সম্ভাষণ না করিয়া অকৃতজ্ঞের মত চলিয়া যাইতেও রামের মন সরে না। কি সঙ্কটময় অবস্থা!

আজ তিনি যে পতিগত-প্রাণা সীতাকে করিশুণ্ডচ্ছিন্না লতিকার মত সবলে আশ্রয়-চ্যুতা করিয়া অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি যে সীতার সেই মৃণালকল্প অঙ্গলতিকাকে হিংস্রশ্বাপদের মুখে তৃণগ্রাসের মত অবহেলায় ফেলিয়া দিয়াছেন, আজ তিনি যে বিশ্বস্তা গৃহ শকুন্তিকাকে ব্যাধের ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া কসাইয়ের মত কার্য্য করিয়াছেন। কোন মুখে তিনি পঞ্চবটীর কাছে মুখ দেখাইবেন; ছায়ার মত অনুগামিনী স্বতঃ পবিত্রা জানকীর উপর সেই নিন্দিত নির্ব্বাসন-দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আজ তাহার কি উত্তর দিবেন? সীতার যে ভালবাসা রামের হৃদয় আলোকময় করিয়া দিত, পঞ্চবটীর তাবৎ প্রাণীতে ছড়াইয়া পড়িত, আজ তাহার এমন বিপরিণাম—এ কি বলিবার!

রামের হৃদয়-সাগরে মন্থন আরম্ভ হইল। এখনই যে হলাহল উঠিবে। উপায় কি? সে হলাহল হইতে রামের দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ কে রক্ষা করিবে? যে সঞ্জীবন মন্ত্র এই হলাহল নিবারণের উপায়, যে নীলকণ্ঠ এই বিষ জীর্ণ করিতে সক্ষম—তাহা কোথায়? কাজেই তখনই শম্বূক অগস্ত্যাশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহর্ষি অগস্ত্য দেবের শুভাদেশ পুণ্যময় কবচের মত বহিয়া আনিলেন। স্নেহময়ী বৎসলা অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা বিমানাবতরণের মাঙ্গল্য সম্ভার হস্তে লইয়া ঋষিবৃন্দের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন। যে অগস্ত্যদেবের একটী একটি গণ্ডূষে সপ্তসিন্ধু নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছিল, যাঁহার একটী আদেশে বিন্ধ্যের গগনস্পর্শী শির চিরদিনের মত নত হইয়া পড়িয়াছিল, যাঁহার একটী অভিসম্পাতে ইন্দ্রত্বপদে সমাসীন নহুষকে সর্পরূপে ধরাতলে পতিত হইতে হইয়াছিল, সেই মহর্ষি অগস্ত্যদেবের আদেশ। রামচন্দ্রের মোহ, দুর্ব্বলতা অধৈর্য্য ও দুঃখ শোক সবই অপগত হইয়া গেল। "ভগবতি পঞ্চবটি গুরুজনের অনুরোধে এই অতিক্রম মার্জ্জনা করুন" বলিয়া অযোধ্যানাথ অগস্ত্য-আশ্রম অভিমুখে ফিরিবার উপক্রম করিলেন।

এইবার মায়ের কাছে সন্তানকে যাইতে হইবে, অগস্ত্যদেবের কল্যাণময় আশীর্ব্বাদ মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে, পুণ্যপূত আশ্রমের মধ্যে রক্ষাকর্ত্তা রাজাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কাজেই আপনাকে ভালরূপে সামলাইয়া লওয়া আবশ্যক। কোনরূপ দুঃখ শোক অধৈর্য্য দুর্ব্বলতা লইয়া প্রবেশ করা চলিবে না। তখন ক্রৌঞ্চাঞ্চ গিরির মত স্ব মহিমোন্নত ও স্থির হইতে পারিলে তবেই আশ্রমে মায়ের ক্রোড়ে যাওয়া ঘটিবে। হইলও তাই। পেচককুলের ফুৎকার রবে ভীত বায়সকুল বংশগুচ্ছের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল। ময়ূরের কুজনরবে উদ্বেজিত সর্পকুল পুরাতন চন্দনতরুর কোটরে যাইয়া আশ্রয় লইল। এদিকেও সত্ত্বগুণের উদয়ে রজস্তমোভাব মিলাইয়া গেল। সংযমের বাতাসে শোক-দুঃখের ধূলিকণা দূর আকাশের গায়ে উড়িয়া গেল। শান্তির আবির্ভাব, ভক্তির উদয়ে অশান্তি ও সংসার মোহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। তখন রামচন্দ্রের ইক্ষাকু কুলপ্রদীপ অযোধ্যানাথের চিত্তকুহরে গোদাবরীর গদ গদ রবের মত আনন্দের প্রবাহের কলকল ধ্বনি শ্রুত হইল। সংযম ও মোহ, সহিষ্ণুতা ও দুঃখ, চিত্তবল ও দুর্ব্বলতার কিয়ৎকালব্যাপী সংঘর্ষের ফলে এক অপূর্ব্ব তরঙ্গের উদ্ভব হইল। সেই শোক-কাতর প্রাণের মধ্যে দেখিতে দেখিতে পবিত্র সরিৎসঙ্গম দেখা দিল। রামচন্দ্রের অন্তঃ প্রকৃতি কি সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল। অপূর্ব্ব সাদৃশ্য সার্থক হইয়া পড়িল।

রামচন্দ্র অগস্ত্যাশ্রমে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ।

মহারাজ আদিশূর অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশীয় নৃপতি বিগ্রহ পালকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা নাই। এই স্মরণীয় ঘটনার সহিতই বঙ্গের সমগ্র ভাবী কালের উন্নতি ও সভ্যতা ঘনিষ্ঠরূপে বিজড়িত ছিল। মহারাজ আদিশূর বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন না করিলে হয় ত বঙ্গদেশ আচারহীন ও মানসিক উৎকর্ষ-বিবর্জ্জিত বর্ব্বরতার লীলাভূমি হইয়া যাইত। এইরূপ ঘটনা বিশেষ দ্বারাই এক একটী জাতির বা এক একটী দেশের ভাবীগঠনের বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কোন ঘটনাই পৃথিবীকে অনাবিল মধু কিম্বা কেবলমাত্র বিষ প্রদান করে না। বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন বঙ্গদেশকে জ্ঞান ও সভ্যতায় বিভূষিত করিয়াছে সত্য; তথাপি কোন কোন বিষয়ে দুই এক বিন্দু বিষও উদ্গীরণ করিতে বিরত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথাটী প্রকট করিবার প্রয়াস মাত্র।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ-রাজ-দুহিতা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন। মহারাণী চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ব্রত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ আহূত হইয়া মহারাণী সমীপে নীত হন।

নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্র তিলক
শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা
সৎ পুণ্যাশ্রয় কান্যকুব্জ বসতেঃ
কন্যাচ পুণ্যার্থিনী।
পত্নী গাঢ়তম প্রতাপ নিবহখ্যাতাদি শূরস্য চ
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা
চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
ও ত্রাদাবগতঃ কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূত স্তত্র বিপ্রো রজত-কৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিল্য-কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃত-কৌশিক-
কৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চ গোত্র ধরা মরাঃ॥"

হতভাগ্য বঙ্গদেশে তখন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না। মহারাণী এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-কৃত দেবকার্য্যে প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না।

চন্দ্রমুখী উবাচ। গায়ত বেদং পূরয়তেদং
মদ্ব্তমগ্নিং জ্বালয়ত।
বরুণাবাহণ পূর্ব্বকং কুম্ভাগতং
কুরুতাবনী দেবাঃ॥
বিপ্রাঃ উচুঃ। বয়ং নৈব জানীমহে বেদ
বাণী মিদানী দ্বিজস্যোত্তবোন শ্রুতোহগ্নিঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা নরপতি র্যোষা বচনমব্রোচৎ
বহুতর রোষা।
ব্রাহ্মণ হীনে দেশে বাসং কিমিহ করিষ্যে
পিতুরভিলাষঃ॥
—বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী।

সুতরাং মহারাজ আদিশূর মহারাণীর ইচ্ছা ক্রমে (১) তাঁহার পিত্রালয় কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও দক্ষ নামক পাঁচজন বৈদবিৎ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। (খ্রীষ্টীয় ৭৭৯-৭৮২ অব্দে বিশ্বকোষ।)

আদিশূরঃ প্রশৃচ্ছ। কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা
বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥
পুরোহিত উবাচ। কান্যকুব্জ স্থিতা বিপ্রা
সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥
—বংশীবদন-বিদ্যারত্ন।

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের বঙ্গদেশে আগমনের কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। (২)

উপরি উক্ত ব্রাহ্মণগণের আগমনের কারণ সম্বন্ধে কেহ বলেন, মহারাজ আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, তাই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার মানসে কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, গৌড়দেশে অতি বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই নিবারণের জন্য যজ্ঞ করেন। গৌড়দেশে অনাবৃষ্টিহেতু দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তাহার নিবারণকল্পে আদিশূর যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু বেদহীন বঙ্গদেশে যাজনাদি ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হইলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। মহারাজ আদিশূর হস্তে স্বর্গ পাইলেন; মহা সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহাদিগকে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই বঙ্গের ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ। তাঁহারা এদেশে স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গার পবিত্র তীরে শ্রুতি অধ্যয়ন এবং যোগাদি দ্বারা বঙ্গদেশকে ধন্য ও পবিত্র করিতে লাগিলেন। এইরূপে বাস করিতে করিতে বঙ্গদেশীয় প্রাচীন সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং এ দেশেও তাঁহাদের সন্তানসন্ততি

(১) ব্রিটনের হিদেনরাজ এলফ্লাধিপতি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কেণ্টরাজ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনার জন্য শ্বশুরের রাজ্য হইতে ধর্ম্মযাজক আনিয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রটেষ্টেণ্ট রাজগণ ক্যাথলিক রাজকুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপন আপন মতে উপাসনা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। মোগল বাদশাহগণও হিন্দু বেগমগণের হিন্দু আচার রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন।

(২) দেবীবর ঘটকের মতে—
"ক্ষিতিশ স্তিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগত গৌড়মণ্ডলম্॥"
সাধারণ কুলজ্ঞগণের মতে—
"নারায়ণস্ত শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎসো ধরাধরো জ্ঞেয়ো ভরদ্বাজস্ত গৌতমঃ॥"
বারেন্দ্র কুলপঞ্জী মতে—
নারায়ণ, ধরাধর, সুষেণ, গৌতম এবং পরাশর।
কুলরাম গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলেন—
"শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রেচ শ্রীহর্ষো-হর্ষ-বর্দ্ধনঃ।
বেদ-গর্ভোঽপি সাবর্ণে যথা বেদ প্রসিদ্ধকঃ।"

দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।(১) গৌড়-ব্রাহ্মণ।

মহারাজ আদিশূর পঞ্চবিপ্রকে সংসার-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন সত্য। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণের স্বদেশেও পত্নীপুত্র বর্ত্তমান ছিল। ব্রাহ্মণগণ অভিমানের মাথায় আঘাত পাইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পত্নীপুত্রের কথা ভাবিবার অবসর পান নাই। কিন্তু যখন একে একে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের কাজ হইল, তখন বঙ্গদেশীয় সন্তানগণ জ্যেষ্ঠ পুত্র না হওয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকারী হইতেন না। কান্যকুব্জবাসী সন্তানগণই পিতৃশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিতেন। ইহাতে এক নূতন বিপদের সৃষ্টি হইল। একেই কান্যকুব্জের সামাজিকগণ এ দেশাগত ব্রাহ্মণগণের প্রতি পূর্ব্ব ঘটনার জন্যই সাতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন; তাহাতে সমাজচ্যুত পতিত পিতার শ্রাদ্ধ করায় তাঁহাদের সন্তানগণকেও সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহারাও বঙ্গাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজা প্রথমাজাতগণকে গঙ্গার পশ্চিমতীরে রাঢ়দেশে এবং শেষাগতগণকে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে বারেন্দ্রভূমে যথাযোগ্য আশ্রয় প্রদান করিলেন। দেশভেদে তাঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। (গৌড় ব্রাহ্মণ) (২)

(১) তে পঞ্চ বিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং
স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চেতেন পূজিতা গতা যথাদেশ
মিতাশ্বযানৈঃ॥

(২) ততস্তে এমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্।
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়া কান্যকুব্জ নিবাসিনং।
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধে
কৃতঞ্চ তৈঃ।
গৌড়ংগতা মাগধবর্ত্মনা বোঽপ্যমাজ্য যাজ্যং
কৃতকস্তএব।
যদীচ্ছ তাস্মাক মুপস্থি ভোজ্যং তদা কুরুধ্বং
খলু পাপ নিষ্পৃতিং॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তেন তেজস্বিনো দ্বিজাঃ
বেদবেদাঙ্গ বেত্তৃনাম্ পাপ স্পর্শ ন মাদৃশাম্॥
নাপি কিঞ্চিং করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজাবয়ং।
* * * *
তত স্তেজস্বিনঃ ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
পুনর্গতা গৌড়দেশমাদিশূর নৃপান্তিকম্॥
* * * *
ততো রাজা সুসম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিগান্তরে।
গত্বাং ন ব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলি রজষত॥

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণাগ্রামবাসিনঃ।
ন ভুক্তং ন গৃহীতং তদন্নং দানঞ্চতৈ দ্বিজৈঃ॥
ততোঽব মানিতাঃ বিপ্রাঃ সদারাঃ সহ
পুত্রকাঃ।
আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্নুপায় মুপলক্ষিতাঃ॥
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তং প্রার্থিতা
স্তথা।
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জলৈঃ
বাচ্যে নিশম্য নৃপতে রুচুস্তে দ্বিজশত্তমা।
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্র ভ্রাতৃভিঃ
সহ।
শ্রুত্বৈতন্নৃপতিঃ প্রাহ্ঃ রাজধানী সমীপতা॥
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ
গ্রামাং স্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্
মনোহরাণ॥
ততস্তে স্ববলং স্তত্র পুত্র দারাদিভি র্যুতাঃ।
বৈমাত্র ভ্রাতর স্তেষাং রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ।
মাতুলাশ্রয় বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয় বর্দ্ধিতাঃ।
মাতুলৈঃ রূপনীতাস্তু ছান্দগা সম্ভবস্তথা।
সুনীতাশ্চৈব বিদ্যাংশঃ গৌড়রাজনমস্কৃতাঃ॥
রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ পুত্রদারাদিভি র্যুতাং।
স পত্নী বিদ্বেষ বশাৎ পরস্পরং লৌকত্র
বাসঃ নচ ভক্ষ্যভোজ্যং।
বিভাগ মাসাস্থ তথা বিবর্দ্ধিতাঃ
পুত্রাদিভির্ব্রহ্মসুতা যথার্থয়ঃ॥

পবিত্রীকৃত মেতদ্ধিপ্রাগালভ্য কুলং মম।
কিয়ৎকালং দ্বিজাগ্র্যাণাং ভবতাং সঙ্গতো মম
শ্রুতাধ্যয়ন যোগাচ্চ দেশ যাতু পবিত্রতাম্।
গঙ্গায়ানাতিদূরেস্মিন্ প্রদেশে বহু ধান্যকে॥
বসন্ত বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্য-সন্নিভাঃ।
উপায়তঃ কালতশ্চ বিবাদে শীথিলে তদা॥
যদিচ্ছথ স্বদেশায় গমনং যাস্যথ ধ্রুবম্॥
রুরুচে বিপ্রমুখ্যেভ্যো নৃপতেঃ সুমৃতঃ বচঃ।
স্থিতেষু তেষু বিপ্রেষু রাজা পুনরমন্ত্রয়ৎ॥
যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ।
ছান্দগা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতি-মন্ত্রবিশারদাঃ॥
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তু বিপ্র মুখ্যেভ্য এব তে।
এতেষাং নিগড়স্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেস্মম কীর্ত্তিরক্ষয়া।
কান্যকুব্জ দ্বিজাগ্র্যাণাং বংশঃ অস্মিন্ স্থাপিতে
ময়া॥

নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যা সপ্তশতী দ্বিজাঃ।
রাঢ়ায়াং বহু ধান্যায়াং শ্বশুরালয়ে সন্নিধৌ।
নিবাশঃ রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ॥
সদৃশান্ জনয়ামাণুস্তাণু পুত্রান্ কুমারিকাঃ।
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপান্তরং যথা॥

কিন্তু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এমত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণগণ প্রথমেই সস্ত্রীক বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

কোলাঞ্চ দেশতঃ পঞ্চবিপ্রা জ্ঞান তপো যুক্তাঃ
মহারাজাদি শূরেণ সমানীতাঃ॥
সপত্নীকাঃ হরিমিশ্র।
সস্ত্রীকান্ শাস্ত্রসংযুক্তান্ আনীতান্ গামমান্
দ্বিজন্।
পঞ্চ গোত্র সমুৎপন্নান্ পূজয়েচ্চ যথাবিধি॥
রাঢ়ীয় ঘটকগণের প্রমাণ।
সদারাশ্চ সপুত্রাশ্চ সগুণাশ্চ সম ব্রতাঃ
বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

সস্ত্রীকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজন সহিতাঃ সাগ্নয়ঃ
কান্তি মন্তঃ।
বাচস্পতি মিশ্র।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ পুনরায় সস্ত্রীক স্বদেশে ফিরিয়া গেলে তথায় প্রত্যাখ্যাত হন। সুতরাং বঙ্গদেশে আসিয়া মহারাজ আদিশূরের আশ্রয়ে বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুত্র কন্যা জন্মিলে পরস্পর আদান-প্রদান করিবার জন্য সংসার ও পরিবারের বিস্তার ঘটিতে লাগিল। কিন্তু মগধাধিপতি ধর্ম্মপাল পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া গৌড়-সিংহাসন হরণ করিলেন। বারেন্দ্রভূমে পালরাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হইলে আদিশূর-তনয় হৃতরাজ্য ভূশূর রাঢ় দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময়ে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বারেন্দ্রভূমে বৌদ্ধ-প্রতাপের অধীন হইয়া থাকিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা ভূশূরের অনুগামী হইলেন। তাঁহারাই রাঢ়ী সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং যাঁহারা পূর্ব্ববাস বারেন্দ্রভূম পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহারা বারেন্দ্র আখ্যা পাইলেন।

ভূশূরেণচ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ।
নাম্নাপি দেশ ভেদৈস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র সাংশতী॥
বংশীবদন বিদ্যারত্ন।

এইরূপে বহুবৎসর গত হইল। এতদ্দেশীয় প্রাচীন সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের নিকট নবাগতগণ কন্যা গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কদাচিৎ তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। কণৌজীগণের সহিত যাহারা কথিতরূপ যৌন সম্বন্ধে বদ্ধ হইতেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। এবম্বিধ দানাদান স্থাপনের জন্য কণৌজীগণের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা বঙ্গীয়

সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণকে উচ্চাসনে তুলিতে থাকিলেও, অন্যদিক দিয়া তাহাদের এক মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছিল। কণৌজীগণ বিবাহের জন্য যেমন স্বজাতীয় কন্যা পাইতেছিলেন, তেমনি বঙ্গীয়গণও কুল, মান ও শীলের প্রলোভনে নিজ নিজ কন্যাগণকে কণৌজীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছিলেন। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং কণৌজীগণ বহু বিবাহে আদৌ কুণ্ঠিত ছিলেন না। ওদিকে কিন্তু বঙ্গীয় সপ্তশতীগণ পাত্রীর অভাবে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া নির্ব্বংশ হইতেছিলেন। আর যাঁহারা কনৌজীগণের সংশ্রবে আসিতে পারিতেন না, তাঁহারা বাঙ্গালায় পতিতের পর্য্যায়ে পড়িয়া যাইতেন। বিশেষতঃ দেখা যায় যে, সভ্যতায় নিম্ন স্তরে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা অধিক। সে কারণ সপ্তশতী কুলে যে কন্যার অনটন ছিল, তাহা বোধাতীত নহে!

পূর্ব্বোক্ত কণৌজী বঙ্গীয়ে যে যৌন সম্বন্ধ, তাহাকে এক প্রকার অসবর্ণ বিবাহ বলা যাইতে পারে। যদিও ভারতে অসবর্ণ বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না, তথাপি অনুমান হয়, তাহা সভ্যতার পরিণতির সহিত ধীরে ধীরে তিরোধান করিতেছিল। ভারতের প্রচলিত অসবর্ণ বিবাহে উচ্চবর্ণ অধস্তন বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতেন, কিন্তু আপনাদের কন্যা কখনই নিম্ন বর্ণের হস্তে সমর্পণ করিতেন না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিলেও, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কন্যা গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অসবর্ণ বিবাহে সম্বন্ধ বর্ণগণ পরস্পর সমান অধিকার ও সমান আচার লাভ না করিতে পারিলে, তাহা জাতীয় স্থায়িত্বের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। নিম্নবর্ণ উক্ত বিবাহে আপনাদিগকে সম্মানিত ও বর্দ্ধিত-গৌরব মনে করিলেও, তাঁহাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। কাজেই স্থায়িত্বের সংঘর্ষে তাহারা টিকিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে একের পক্ষে (অর্থাৎ এক বর্ণের পক্ষে) শক্তি সঞ্চয়দ্বারা স্থায়িত্বের নবীকরণ সম্ভব হয় সত্য; কিন্তু অপরের পক্ষে লাভের অঙ্ক সম্পূর্ণ শূন্য। বোধ হয়, এই প্রচ্ছন্ন অনিষ্টের বিষয় অবগত হইয়াই পরবর্ত্তীকালের সামাজিকগণ ইহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

আদিশূরের রাজত্বকাল হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৩৫০ বৎসর কাল ধরিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ আভ্যন্তরিণ সমাজ-সংস্কার চলিতেছিল। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে বিশেষ কোন বিভেদ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত কণৌজাগতগণের যৌন সম্বন্ধ চলিতে চলিতে ব্রাহ্মণগণ যেন কথঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছিলেন। রাঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুল দুর্নীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বৈদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্য কুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেন বৈ॥
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাহভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রোত্র ধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং পশ্যতি বৈ কুলম্॥
কূর্ম্মপুরাণ।

কুকর্ম্মের অবজ্ঞা ও সৎকর্ম্মের পুরস্কার দ্বারা সমাজের দোষ সংশোধন করা আবশ্যক বিবেচনায় ভূশূর-তনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর বা ধরাশূর স্বীয় রাজ্যের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করিলেন। এবং কুলীনগণকে ৫৬ খানি গ্রাম প্রদান করিলেন।

"ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরন্য সুতেন চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞি সং জ্ঞানি তেষাং স্থান
বিনির্ণয়াৎ॥"
বংশীবদন বিদ্যারত্ন।

বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তখনও কোন কুলমর্য্যাদাবিধি প্রদত্ত হয় নাই। শূর বংশীয় শেষ রাজা অযুশূর অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ-ত্যাগ করিলে বিজয় সেন গৌড় বিজয় করেন। এই বিজয় সেণের পুত্রই প্রথিত-যশা বল্লালসেন।

সেন বংশীয় মহারাজ বল্লালসেন রাজ্যের এবং সমাজের উন্নতি-সাধনে মনোযোগী ছিলেণ। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর রাঢ়ীয় সমাজের ন্যায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজেও প্রভূত দোষ দেখিতে পাইলেন। সুতরাং সমাজকে সাধুজন-সম্মত আকার প্রদানে যত্নশীল হইলেন। (১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি গণনায় রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমে যথাক্রমে ৭৫০ ও ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহারাজ বারেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৫০ জন মগধে, ৬০ জন ভোট দেশে, ৬০ জন রভঙ্গ দেশে, ৪০ উৎকলে এবং ৪০ জন মোড়ঙ্গ দেশে প্রেরণ করিয়া মাত্র ১০০ জনকে বারেন্দ্র ভূমে রাখিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে কেন বিদেশে প্রেরণ করেন নাই, তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। তবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য যে বল্লালের কীর্ত্তি নহে, একথা সত্য। (১)

বল্লালসেন ১০০ ব্রাহ্মণকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন—কুলীন ও শ্রোত্রীয়।

জন্মনা ব্রাহ্মণঃজ্ঞেয় সংস্কারৈঃ দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রেত্রীয় লক্ষণম্॥

১০০ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন সিদ্ধ শ্রোত্রীয় এবং অবশিষ্ট ৮৪ জন কষ্ট শ্রোত্রীয়। বারেন্দ্রকুলে যে ১০০ ঘর গাঞী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার অধিকাংশই এই সময়ে হইয়াছিল। তবে কেহ কেহ পরেও গাঞী হইয়াছিলেন

বিপ্রান্ একশত গৃহ বারেন্দ্রান্ গাঞি
সংযুক্তান্।
কৃত্বা বল্লাল সেনেন চক্র গুণ বিচারণম্॥
লঘুভারত।

তখন নয়টী গুণ থাকা কুলীন পদবীলাভের যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যাহার এই নয়টি গুণ ছিল, তিনিই কুলীন, এই রাজসম্মান এবং সমাজ সম্মানলাভ করিতেন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থ দর্শনম্।
নিষ্ঠাশক্তিঃ (১) তপো দানং নবধা
কুললক্ষনম্॥

এ রাজ-সম্মান সাধারণ রাজ-সম্মান নহে। বর্ত্তমান সময়ের Knighthood বা Raibahadurship হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আবহমানকাল হইতেই ভারতে কোন ব্যক্তিগত উপাধি বা সম্মান প্রদত্ত হইলে তাহা বংশানুগত হইয়া দাঁড়াইত। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

(১) রাঢ়ী কুলজ্ঞগণের মধ্যে "শান্তি" স্থলে "আবৃত্তি" পাঠ প্রচলিত।

(১) বরেন্দ্রেতু তদা সার্দ্ধ ত্রিশতান্য
প্রজন্মণাম্।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাস্তোধিশতানিচ॥
বারেন্দ্রবাসি বিপ্রাণাং মধ্যে চৈক শত দ্বিজাঃ।
বরেন্দ্র রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশৎ বারেন্দ্রাণাম্ দ্বিজন্মনাম।
পঞ্চাশৎ মগধে ষষ্টি ভোটে ষষ্টিঃ রভঙ্গকে॥
চত্বারিংশৎ উৎকলেচ মৌড়ঙ্গে হপি তথাষ্টকাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লানেন মহাত্মনা॥
বরেন্দ্রকুলপঞ্জী।

অবশ্যই প্রথম প্রথম গুণ বিচার দ্বারাই কৌলীন্য বিচার হইত। কিন্তু কালক্রমে এ সম্মান বংশ বিশেষের উপর স্থায়ীভাবে সম্বদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হোক, এই কৌলীন্য-প্রথা পরবর্ত্তী কালের যাবতীয় উন্নতি বা অবনতির সোপান স্বরূপ হইয়াছিল। বল্লালের কুল-বন্ধনের বহুবর্ষ পর রাঢ়ীকুলে দেবীবর ঘটক এবং বারেন্দ্রকুলে উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ীর (১) আবির্ভাব হয়। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নবগুণ যখন সম্পূর্ণ তিরোধান করিয়াছিলেন, তখন গুণহীন কৌলীন্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য দেবীবর মেল বন্ধন করিলেন এবং উদয়ণ করণ প্রথার প্রচার করিলেন।

প্রতিভাশালী উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ী স্বয়ং কুলীন ছিলেন। তখন কুলীন শ্রোত্রীদের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদানে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছিলনা। শ্রোত্রীয়গণও কুলীন কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু উদয়ণ ভাদুড়ী কুলীনের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মানসে কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত করেন। "গুণহীনে কৌলীন্যং কথং সংস্থাপ্যতে" এই কার্য্যে উদয়ণ তিনজন প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। উদয়ণের সামাজিক নিয়মে শ্রোত্রীয়ের পক্ষে কুলীন কন্যা গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হয়।

(১) উদয়াণাচার্য্য ভাদুড়ী ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কুলবন্ধন করেন। এই উদয়ণাচার্য্যই প্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলী নামক গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার পিতা বৃহস্পতি আচার্য্য বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। তৎদৃষ্টে উদয়ণ বৌদ্ধ আচার্য্যগণের সহিত তমুল বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে বৌদ্ধযুক্তি সম্পুর্ণরূপে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাতত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং পিত্রাবমাননার প্রতিশোধ লয়েন।

কুলীনেরও শ্রোত্রীয় কন্যা গ্রহণে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়।

উদয়ণের নিয়মগুলির মধ্যে প্রথম, যাহারা কুলীন সমাজে থাকিবার অভিলাষী, তাহাদিগকে পরস্পর একটী করিয়া কুলজ করণ করিতে হইবে। অর্থাৎ কন্যা বা ভগিনীগণকে পিতার মৃত্যুর পর কুলীনঘরে বিবাহ দিয়া করণ করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই এই করণের অধিকারী এবং পিতা বর্ত্তমানে এ করণ হইতে পারে না। দ্বিতীয়, পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা-কুলীনগণের বিবাহকালীন একটী আদানপ্রদান বিষয়ক করণ করিতে হইত। স্বগোত্রে এই করণ হইতে পারেনা এবং কন্যা বা ভগিনী না থাকিলেও এ করণ প্রথা চলিতে পারেনা। পূর্ব্বে এই নিয়মের অধীনে যাঁহাদের কন্যা বা ভগিনী না থাকিত, তাঁহাদের ভাগ্যে পত্নীলাভ ঘটিয়া উঠিত না। এই নিয়মের কঠোরতা অবলোকন করিয়া তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ কুশমঞ্চ পাত্র বা কন্যার সহিত প্রকৃত পাত্র কন্যার করণ করিবার নিয়ম প্রচলিত করেন।

বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃস আচার্য্যপদমাপ্তবান্।
বৌদ্ধাচার্য্য জিমণিনা বিচার রণ মূদ্ধনি॥
বিজিতোহবমানিতশ্চ বনং গত্বা মমারচ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভূবি বিখ্যাত মঙ্গলঃ॥
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধ বিধ্বংশ হেতয়ে।
খ্যাত উদয়ণাচার্য্যো বভূব শঙ্করা যথা॥
সন্দেশ পিতৃনাশস্য তথাপিতৃপরাভবম্।
বৌদ্ধনাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্ঞান মন্যুনা॥
ওতঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান জিত্বা
বিচারতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলীম॥
স এব উদয়াণাচার্য্যো বৌদ্ধ বিধ্বংশ
কৌতকী।

তৃতীয়,পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুসারে কুলীনগণ শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু উদয়ণ-প্রবর্ত্তিত নিয়মে কোন কুলীন শ্রোত্রীয়ের কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহাকে সেই সঙ্গে একটী করিয়া কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। আর শ্রোত্রীয়ের পক্ষে কুলীনের কন্যা গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইল।

এই নিয়ম তিনটীর মাত্র দ্বিতীয়টী পূর্ব্বরূপ শোধিত আকারে এখনও বর্ত্তমান আছে। অপর দুইটী বিলুপ্ত হইয়াছে।

কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় আমাদের হিন্দুসমাজেও যথেষ্ট দোষগুণ আছে। ইহার কোনটীই অকারণে উদ্ভূত হয় নাই। উদণাচার্য্য প্রণীত কুলীন বিষয়ক নিয়মগুলি শতৈঃআগত ধ্বংসের মুখ হইতে কুলীনকে রক্ষা করিয়াছে। হয়ত তিনি ঐ নিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত না করিলে বাঙ্গালার মাটী হইতে কুলীন শ্রোত্রিয়ের পার্থক্য এতদিন উঠিয়া যাইত? সকল ব্রাহ্মণই এক সাম্যের পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথমে নিয়ম দুইটীর দ্বারা কুলীনগণের পার্থক্য চিরদিনের জন্য দৃঢ় হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতের যত "পঠি",মত না ও "থাক" গঠনের ক্ষেত্র রচিত হইয়াছিল। কুলীনগণ ইচ্ছা করেন নাই, কেহই এমত ইচ্ছা করে না যে, তাঁহাদের এতদিনের সাধনার সম্মান নষ্ট হইয়া যাইবে। আর তাঁহারা সমস্ত ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইবেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা যথার্থ গুণসম্পন্ন নিষ্ঠাবান কুলীন, তাঁহারা আচারহীন কুলীন বা শ্রোত্রীয়গণকে আপন পর্য্যায়ে স্থান দিবেন কেন? যাঁহারা স্খলিতপচার, তাঁহারা উন্নতির চেষ্টা করুন, সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সমাজে গৃহীত হইবেন; কিন্তু অমিতাচারী হইলে তিনি সমাজের সম্মানের অধিকারী হইবেন কেন? মানুষের দোষ স্বভাবগত; সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া বাস করিলে কত প্রকার প্রবৃত্তি বিকৃতি, চরিত্রহানি প্রভৃতি দোষ আসিয়া সাধুগণ-আচরিত পথ হইতে মানুষকে স্খলিত করে। কিন্তু সমাজ বিনা আপত্তিতে তাহা সহ্য করিবে কেন? যাহারা আপন ত্রুটী স্বীকার করিয়া শোধরাইবার চেষ্টা করে, সমাজ অবশ্যই তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে। অভিমানের তাড়নায় অনেকেই এরূপ ত্রুটি স্বীকারের হীনতায় সম্মত হয় না। তাহাদের দল প্রবল হইলে তাহারা স্বতন্ত্র সমাজ বাঁধিবেনা কেন? এইরূপে বারেন্দ্র কুলীনের "পঠি" "থাক" ও "মতে"র সৃষ্টি হইয়াছে। বারেন্দ্রকুলে কাপোৎপত্তিও এই প্রকারে ঘটিয়াছিল।

উদয়ণের নিয়ম কুলীন সন্তানগণের বিবাহ কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সুসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কন্যার পিতা কন্যার বিবাহ দিতেছে, কিন্তু বরের পিতার কন্যা থাকিলে আবার কাহার দ্বারস্থ হইবে? সুতরাং উভয় পক্ষই যদি এক অনুষ্ঠানে দুইটী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহাতে

কুল্লুক ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরং তথা ॥
মঙ্গলো সেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধ
বংশজয়।
কুল গৌরব রক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষু চ।
করণং পরিবর্ত্তঞ্চ তিলকং শ্রোত্রীয়েষু চ ॥
ভাদুড়ী বংশাবলী।

মন্বর্থ মুক্তাবলী প্রণেতা কুল্লুক ভট্ট, ময়ূর ভট্ট এবং মঙ্গল ওঝা, এই তিনজন ব্যক্তি উদয়ণের সহায়তাকারী ছিলেন।

ক্ষতি কি? এ নিয়মে পুত্র কন্যার বিবাহের চিন্তায় মানুষকে বিবশ এবং অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে না। কেহই কাহারও নিকট দাসের ন্যায় অপরাধী হইয়া থাকে না। বাধ্যতা ও সৌজন্য দ্বারা উভয় পক্ষ সমানভাবে বদ্ধ। কিন্তু ইহাতে যে অসুবিধা ছিল, তাহা রাজা কংসনারায়ণ কুশময় কন্যা ও পাত্রের করণ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া দূর করিয়াছিলেন।

তৃতীয় নিয়মটীই সংস্কারক প্রবরের প্রতিভার বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ যখন সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই সময় হইতেই এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কন্যা গ্রহণ করিতেন। বল্লালসেনের সময় কুলীন শ্রোত্রীয় শ্রেণী ভাগ হইলেও শ্রোত্রীয় কন্যা কুলীন পাত্রের বিবাহ যোগ্যা ছিল। এ প্রথায় হস্তক্ষেপ না হয়, অথচ কুলীনকুলের ভাবী অনিষ্টের কোন আশঙ্কা না থাকে—এই উদ্দেশ্যেই নিয়মটী প্রচলিত করা হইয়াছিল। শ্রোত্রীয়গণ চিরানুসৃত নিয়মে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান দ্বারা ধন্য হইয়া "সিদ্ধি" লাভ করেন এবং কন্যাদায়ের চিন্তাকে অপেক্ষাকৃত লঘু জ্ঞান করেন। কারণ এরূপ করিলে আর তাহাদের পাত্রাভাব থাকিবে না। কিন্তু অপরদিকে কুলীনগণের এক বিপদের সম্ভাবনা। সকল পাত্রই শ্রোত্রীয়ের গৃহে বিবাহ করিলে কুলীনগণের নিজ কন্যার বিবাহের উপায় কি? তাই উদায়ণাচার্য্য এখানে একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন; তিনি ব্যবস্থা করিলেন যে, প্রত্যেক শ্রোত্রীয় কন্যা-গ্রহণকারীকে এক একটী কুলীনের কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে। এই নিয়মে কুলীনগণ উপস্থিত পাত্রাভাবজনিত কন্যাদায়ের সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে; কিন্তু এক সময়ে যে 'বহুবিবাহ' বঙ্গদেশ উৎসন্ন করিতে বসিয়াছিল, তাহার অঙ্কুর এখানেই সূচিত হয়। খ্রীষ্টীয় সভ্যতার প্রভাবে ও কালমাহাত্ম্যে বঙ্গের 'বহুবিবাহ' প্রশমিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুলীনের কন্যা বিবাহে বিড়ম্বনার আর অবধি নাই। বাধ্যতামূলক বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই উদয়ণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তব আকার পরিগ্রহ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এ নিয়মটীর যে অন্য উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা নহে। পত্নীর প্রভাবেই সংসার গঠিত হয়। শ্রোত্রীয়ের কন্যা কুলীন-গৃহে আসিবে; কুলীনের চিরশ্লাঘ্য আচার নীতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যদি কুলীন সপত্নী থাকে, সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কুলীনের মেয়ে সে যে 'বড় ঘরের' মেয়ে, তাহার প্রভাবে শ্রোত্রীয়ের মেয়ে মাথা তুলিতে পারিবে না। সুতরাং শ্রোত্রীয়ের কন্যা কুলীন সংসারে প্রবেশহেতু যে আচারহীনতা, তাহা এইরূপে নিবারিত হইবে; কুলীনের যে শীলমান, তাহাই স্থায়ীভাবে থাকিবে। উদয়ণ একথাও ভাবিয়া থাকিবেন।

এখানেই শ্রোত্রীয়গণ একটু প্রবঞ্চিত হইলেন। তাঁহারা আপনার সামাজিক দীনতা নিবন্ধন উদয়ণ-প্রবর্ত্তিত নিয়মের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন নাই। সে কারণ তাঁহারা "তিলকধারণের" অধিকার পাইয়াই তুষ্ট ছিলেন এবং উদয়ণকে বরং সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রোত্রীয়ের মধ্যেও অসংখ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কেহই উদয়ণ-প্রবর্ত্তিত নিয়মের প্রচ্ছন্নবিষ অনুভব করিতে পারেন নাই। নচেৎ এই নির্ব্রাহ্মণকর নিয়মের প্রতিকূলে কেহ না কেহ অবশ্যই দণ্ডায়মান হইতেন। মমতাহীন অসবর্ণ

বিবাহ যে অনিষ্টকর, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই কারণেই শ্রোত্রীয় কুমারের জন্য ব্রাহ্মণ সমাজে চিরকালই পাত্রীর অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে। বহু শ্রোত্রীয় শুধু পাত্রীর অভাবে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া চরিত্রহীন জীবনযাপন করিয়াছে, এবং পরিশেষে নির্বংশ হইয়া পৃথিবীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। শ্রোত্রীয়গণের মধ্যে একান্ত অসহায় এবং দরিদ্রের কন্যাই শ্রোত্রীয়ের গৃহে গমন করিত; আবার সঙ্গতিশালী শ্রোত্রীয়কে বরপণের পরিবর্ত্তে কন্যা ক্রয় করিতে হইত। অসমর্থ পক্ষে নির্বংশই দেশাচার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ৯২ জন শ্রোত্রীয়ের বংশধর ৮০০ শত বৎসরের বৃদ্ধিতেও ৮ জন কুলীনের সন্তানের সমান হইবে কিনা সন্দেহ। এই ত উদয়ণের সমাজ-সংস্কার।

বর্ত্তমানে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে যে সমরায়োজন চলিতেছে; অসবর্ণ ক্ষমতাহীন ব্রাহ্মণ-বিবাহই এ পণ-প্রথার কারণ। কুলীণের উক্তরূপ সমাদরই বঙ্গের ব্রাহ্মণ-সমাজে পণ-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে। এবং এই পণপ্রথা যে বর্ত্তমানে অসম্ভব পরিণতি লাভ করিয়াছে, কুলীণের তথা উদয়ণের নিয়মই তাহার একমাত্র কারণ। শ্রোত্রীয়ের কন্যা হীন গৃহের কন্যা—"ছোটলোকের মেয়ে" এবং এই ছোটলোকের মেয়েরা ননদ শাশুড়ীর ঘর করিতে আসে। মানুষের জীবনে ভুল, প্রমাদ, আবাল্য ত্রুটি বড় একটা বেশী আশ্চর্য্যের কথা নয়। বালিকা-বধূ একটা ভুল প্রমাদ করিল, তাহাতে সে আবার ছোটলোকের মেয়ে! তাহার আর মার্জ্জনা কোথায়? ঠিক এইরূপ স্থলেই ননদ-শাশুড়ী-গঞ্জনা সমাজে প্রবেশ লাভ করিল। তেলে জলে মিশ খাওয়ান' বড়ই কঠিন কথা। এ ক্ষেত্রে ননদিনীকে 'রায়বাঘিনী' এবং শাশুড়ীকে 'বৌকাটকী' হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। জনকজননীর হৃদয় কন্যার নিপীড়ন দর্শনে বিগলিত হইল না কেন? প্রতিকারের অন্য উপায় নাই। 'পণ' 'তত্ত্ব' 'ননদ পোটকা' দিয়া শাশুড়ী ননদের মন গলাইয়া দিলে যদি কন্যার দুঃখের ও যন্ত্রণার লাঘব হয়। কর্ণৌজীগণ বঙ্গদেশে আসিলেন; বঙ্গদেশের কন্যা গ্রহণ করিলেন। কোথায় হিন্দুস্থান আর কোথায় বঙ্গদেশ? একের আচার অন্যের মনঃপুত হইবে কেন? জননী ভগিনী স্ত্রী বুদ্ধির বশীভূত। তাহারা আপনাদের অনুরূপ আচার, ব্যবহার বসন ভূষণ, কথাবার্ত্তা না দেখিলে নবাগতার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে কেন? শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি দশ জনের সংসার। পুত্রকে সংসারে থাকিতে হইলে পুত্রবধূকেও সমস্ত পীড়ন ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে। বাঙ্গালার সংসারে ননদ শাশুড়ীর গঞ্জনায় কথা যে একটী প্রবাদ বাক্যের মত আছে, তাহা বোধ হয় এইরূপে সৃষ্ট হয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও স্বাধীনচেতা ইংরাজগণ পর্য্যন্ত যদি ভারতবর্ষীয়গণের পাণিগ্রহণ করে, তবে তাহাদের নিগ্রহের পরিসীমা থাকেনা এবং সন্তানগণকে ফিরিঙ্গি আখ্যা প্রাপ্ত হইতে হয়, তখন বঙ্গে প্রথমাগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও এরূপ ঘটিলে, তাহাতে বিচিত্রতার কিছুই নাই।

অনুমান হয়, আমাদের দেশে অষ্টমে গৌরীদানের ব্যবস্থা থাকিলেও উদয়ণের বাধ্যতা-মূলক বিবাহ-নীতিই বাল্য বিবাহকে সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছিল। পুণ্যের প্রত্যাশা অপেক্ষা বাধ্যতাই বাল্যবিবাহের সহায়তা করে। তাই আমরা প্রথমেই



লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক।

U. RAY & SONS, CALCUTTA

duty," a life which was the type of "the one, pure, sacred, and efficacious virtue, sacrifice; halo that crowns and sanctifies the human soul."

His body was carried across the Appenines to Genoa in a species of triumphal procession, and eighty thousand of his countrymen followed the remains of him whom, but a few months before, while the noble heart still beat warm with love towards them, they had allowed to be arbitrarily imprisoned by the King, who unworthily wears the crown of that Italy, which, but for Mazzini, would have remained "a mere geographical expression"

* * * *

"Here, symbolised, is the history of Mazzini; the history of the Martyrs of humanity from the days of Jessus to our own."

ম্যাট্‌সিনির সংক্ষিপ্ত জীবনী-লেখকের উপরোক্ত কথাগুলি এমন এক পুণ্যশ্লোক মহাত্মার প্রতি প্রযুজ্য, যাহার তুলনা এই ভারতে আর কুত্রাপি মেলে নাই। তিনি এদেশের অমর-সন্তান লোকমান্য মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক। বিগত ৩১শে জুলাই, শনিবার, ১৯২০, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৭, রাত্রি, ১২টা ৪০ মিনিটের সময় দেহ রক্ষা করিয়া তিনি ভারতবর্ষের প্রাণে মহা শোকপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার তুলনা, এই ভারতে, কেবল তিনিই।

২৩শে জুলাই তিলকের জন্ম দিন ছিল। গত ২৩শে জুলাই শুক্রবার তিনি ৬৬ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, সেইদিনে তাঁহার জন্মোৎসব সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে কোলেবা লইয়া গিয়াছিলেন। উৎসবান্তে তিনি বোম্বাই পৌঁছিয়া সর্দ্দার-গৃহ নামক হোটেলে গমন করেন এবং জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। বোম্বাইর সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলেন, তাঁহার নিমোনিয়া হইয়াছে, হৃদযন্ত্রও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। গত পূর্ব্ব সোমবার ২৬শে জুলাই রোগাক্রমণের তৃতীয় দিনেই চিকিৎসকগণ বলেন, শ্বাসযন্ত্রের সমুদয় স্থানে শ্লেষ্মা জন্মিয়াছে, জীবনের আশা নাই। শুক্রবার দিন তাঁহার অবস্থা একটু ভাল হইল। তিনি সংজ্ঞাশূন্য ও ঘোর বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেদিন একটুকু জ্ঞান হইল। রাত্রিতেও নিদ্রা হইল। শনিবার প্রাতে তারযোগে এই সংবাদ প্রেরিত হইল, তিলকের জীবনের আশা হইয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তিলকের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। শনিবার অপরাহ্ণে নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিল। রাত্রি ৯টার সময় তিনি ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিলেন, রাত্রি ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল।

গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনির মৃতদেহের প্রতি ইতালীর জনসাধারণ যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল, মহাত্মা তিলকের প্রতিও ভারতের নরনারী সে প্রকার সম্মানপ্রদর্শন করিয়া "বীরপূজার" মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা মহা গৌরব অনুভব করিতেছি। মহাত্মা শিবনাথের মৃতদেহের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের নরনারী যে সম্মান দেখাইতে পারেন নাই, এবং বিদ্যাসাগরের প্রতি কলিকাতার নরনারী যে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারেন নাই, তিলকের প্রতি সে সম্মান

প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বাস্তবিকই আমরা গৌরবে স্ফীত হইয়াছি। ক্ষুদ্র-চেতা ষ্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক যে বিষই উদ্গীরণ করুন না কেন, ম্যাজিষ্ট্রেট বা দাসত্ব-গৌরবমণ্ডিত কোন কোন স্কুলের হেড মাষ্টার ও কলেজের প্রিন্সিপালগণ তিলক-শ্রাদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রদের প্রতি কঠোর বিধান করিলেও, মহাত্মা তিলক এদেশের এমন একজন অমর সন্তান, যাঁহাকে পরিম্লান করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর অত্যাচারিত ইতালীর ম্যাট্‌সিনি বিংশ শতাব্দীর ভারতের নিষ্পেষিত তিলকে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন। ধন্য জীবন, ধন্য স্বার্থত্যাগ, ধন্য দেশানুরাগ। তিলক স্বার্থত্যাগ ও দেশানুরাগের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।

তাঁহার দেশানুরাগে কুটিলতা ছিল না তাঁহার মতে জটিলতা ছিল না, তাঁহার আচার ব্যবহারে আবিলতা ছিল না। তিনি সদা উজ্জ্বল, সদা সরল, সদা অকপট দেশনায়ক ছিলেন।

দেশের সেবা করিতে করিতে তাঁহাকে যে কি কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা অল্পবিধ পরিমাণে সকলেই জানেন, আমরা সংক্ষেপে "সঞ্জীবনী" হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ম্যাট্‌সিনির ন্যায় বাল্য হইতেই স্বদেশানুরাগে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আজীবন তাহারই সেবা করিয়াছিলেন, ভয়ভ্রান্তিতে কখনও লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। অষ্ট্রিয়া যেমন ম্যাট্‌সিনির ভয়ে কম্পিত, তিলকের ভয়েও তেমনি গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হইতেন। বুঝি বা সেইজন্যই তাঁহাকে "Father of unrest বলা হইয়াছে।

"দুর্জ্জয় শক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পৃথিবী সে শক্তির বেগ সহিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে। ভারতে লাঞ্ছিত লোকের সংখ্যা কম নহে, কিন্তু তিলকের মত লাঞ্ছনা আর কাহারও সহিতে হয় নাই।

১৮৮০ কি ৮১ খ্রীঃ মিঃ আগরকর ও মিঃ তিলক মহারাষ্ট্রী ভাষায় "কেশরী" ও ইংরেজী ভাষায় "মারহাট্টা" নামক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। মিঃ চিপলঙ্কার নামক একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার 'আর্য্য-ভূষণ' নামক এক মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই যন্ত্রে ঐ দুই সংবাদ পত্র মুদ্রিত হইত। সংবাদ পত্রের তিনজন পরিচালকই যুবক, তিনজনই স্বদেশপ্রেমিক, তিনজনই নির্ভীক। সে সময়ে কোলহাপুরের মহারাজা শিবাজিরাও নাবালক। কোলহাপুর রাজ্য গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন, মিঃ বার্ডে নামক এক ব্যক্তি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যের কারবারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। কেশরী ও মারহাট্টায় কারবারীর দুষ্ক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কারবারী মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। মোকদ্দমা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চিপলঙ্কার ধরাধাম হইতে প্রস্থান করেন। তিলক ও আগরকরের ৪ মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হয়। তিলকের বয়স তখন ২৫ কি ২৬ বৎসর। এই বয়সেই কারাবাসের ক্লেশ ভোগ করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার ১৬ বৎসর পর তাঁর দ্বিতীয়বার কারাদণ্ড হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারহাট্টাদের প্রাণহীন জীবনে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিবার জন্য শিবাজি উৎসব আরম্ভ করেন। শিবাজি রায়গড়ে যেদিন রাজ উপাধি গ্রহণ

করেন, সেই দিনই উৎসব আরম্ভ হয়। উৎসবের সময় প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা, হৃদয় উন্মাদক সঙ্গীত হইয়াছিল—সহস্র লোকের প্রাণে জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। ১৩ই জুন উৎসব হইল, ১৮ই জুন উৎসবের বিবরণ ও সঙ্গীত কেশরীতিতে প্রকাশিত হয়। তখন বোম্বাই ও পুণাতে প্লেগ আরম্ভ হওয়ায় প্লেগাক্রান্ত নরনারীকে আটকখানায় বদ্ধ করিয়া রাখা হইতেছে, সর্ব্বত্র মহা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। র‍্যাণ্ড ও লেফ্‌টেনাণ্ট আয়ার্ষ্ট প্লেগ সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ২২শে জুন কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে হত্যা করে। গভর্ণমেণ্টের মনে এই ধারণা হইল যে, কেশরীতে যে সঙ্গীত ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া কোন ব্যক্তি র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে হত্যা করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। মিঃ তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে দেড় বৎসরের জন্য কারাগারে গমন করেন। সেই সময় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কয়েক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ গিউকে তিলকের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বোম্বাই পাঠাইয়াছিলেন। কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল হইয়াছিল, কিন্তু আপীলে কোন ফল হইল না। তখন ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ও উইলিয়ম হণ্টার জীবিত ছিলেন। তাঁহারা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। মহারাণীর দয়ায় ১৮৯৮ খ্রীঃ ৬ই সেপ্টেম্বর প্রায় এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিলক মুক্তিলাভ করেন। তিলক যখন জেল হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর, এক বৎসরকাল কারাক্লেশ ভোগ করাতে তাঁহাকে ৫০ বৎসের বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

তৃতীয়বার তাঁহার কেন কারাদণ্ড হইয়াছিল, এখন তাহাই বলিতেছি। পুণাতে শ্রী বাবা মহারাজ নামক এক ধনী ও বনিয়াদি সর্দ্দার ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে মিঃ তিলককে তাঁহার সম্পত্তির একজিকিউটারের পদে নিযুক্ত করেন। বাবা মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তাই মহারাজ তিলকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁহার অর্থ তসরূপ করিয়াছেন।

১৯০১ খ্রীঃ তিলকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, জেলার জজ মিঃ এষ্টন জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতির জন্য তিলককে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লেমেণ্টসের বিচারে তিলকের আঠার মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেসন জজ মিঃ লুকাস বলেন, তিলক কোন অসদুপায় অবলম্বন করেন নাই, তবু তিনি দণ্ড রহিত করিলেন না, কেবল ১৮ মাসের স্থলে ৬ মাসের কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন। হাইকোর্টে আপীল হইল, আপীলের ফলে তিলক মুক্তি পাইলেন। মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু প্রায় ৪ বৎসরকাল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

ইহার পর ৪ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে ভীষণ আন্দোলন হইতেছিল। বোমার আঘাতে মজঃফরপুরের দুইজন ইংরেজ মহিলা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। খুদিরাম বসুর তজ্জন্য ফাঁসী হয়। কেশরীতে সেই সময় কতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবর্ণমেণ্টের ধারণা হইল যে, কেশরী

বোমা মারার সমর্থন করিতেছেন। তিলক ধৃত হইলেন। ১৩ই জুলাই হাইকোর্টে তাঁহার মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। তিলক উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ২১ ঘণ্টা কাল আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া বক্তৃতা করেন। অষ্টমদিনে জজ মিঃ দাবর জুরীকে মোকদ্দমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। ৭ জন ইংরেজ ও ২ জন পার্শী জুরীর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের ৭ জন তিলককে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। পার্শী জজ মিঃ দাবর তিলকের ৬ বৎসরের দ্বীপান্তর বাসদণ্ড ও ১০০০ টাকা জরিমানা করিলেন। গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া দ্বীপান্তর বাসদণ্ডের পরিবর্ত্তে ৬ বৎসর কাল তাঁহাকে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয়ের কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে হুকুম দিলেন, জরিমানা মাপ হইল। তিনি বিনা শ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ ৬ বৎসরের কারাবাসান্তে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে তিলক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তিলক ক্রমে ৪ বার দণ্ডিত হইলেন, তবু তাঁহার নিগ্রহের অন্ত হইল না। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নানা স্থানে গমন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ বক্তৃতাগুলি রাজদ্রোহ উত্তেজক বলিয়া মনে করিলেন। পুনার ম্যাজিষ্ট্রেট জুলাই মাসে তিলকের উপর এই পরোয়ানা জারী করিলেন,—তুমি তোমার সচ্চরিত্রতার জন্য জামীন দিবে না কেন, তাহার কারণ দর্শিত। তিনি পরোয়ানা জারী করিলেন, তিনিই জজরূপে এই হুকুম দিলেন যে তিলককে ৪০ হাজার টাকা জামীন স্বরূপ জমা দিতে হইবে। তিলক ৪০ হাজার টাকা জমা দিলেন। হাইকোর্ট এই নির্দ্ধারণ করিলেন, তিলকের বক্তৃতাগুলি রাজদ্রোহকর নয়। সুতরাং জমার টাকা তিলক ফিরাইয়া পাইলেন। হাইকোর্টের বিচারে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নির্দ্দোষ মনে করিলেন না।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসেই গবর্ণমেণ্ট ভারত-রক্ষা-আইনের বিধান অনুসারে তাঁহার উপর এই পরোয়ানা জারী করিলেন যে, তিনি পঞ্জাব ও দিল্লী যাইতে পারিবেন না। যে দিন এই পরোয়ানা জারী করা হয়, সে দিন তাঁহার একষষ্টিতম জন্মোৎসব ছিল। সে দিন এক দিকে গবর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল, অপর দিকে তাঁহার বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা ও অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন।

অতঃপর ষষ্ঠ লাঞ্ছনার কথা বলিয়া তাঁহার জীবনের দুঃখের কাহিনী শেষ করিতেছি।

স্যর ভেলেণ্টাইন চিরল লণ্ডনের টাইমস্ সংবাদ পত্রের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি এমন ক্ষমতাশালী, যখন ভারতবর্ষে আইসেন, তখনই বড় লাট ছোট লাটদের বাড়ীতে অবস্থিতি করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সার ভেলেণ্টাইন তাঁহার একখানি পুস্তকে তিলককে রাজদ্রোহী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। তিলক তাঁহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের আদালতে মান হানির নালীস করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার জন্য তাঁহার প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু পরিণাম ফল কি হইয়াছিল? সার ভেলেণ্টাইন কোন অপরাধ করেন নাই, ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছিল।"

স্বদেশ-সেবার জন্য এমন নির্য্যাতন

এদেশে আর কেহ সহ্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। যেমন মাটসিনি, তেমনিই তিনি দেশের জন্য জীবনটাকে তিল তিল করিয়া বলি দিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তিনি অন্যান্য নেতাদের ন্যায় শত প্রলোভনেও ফিরেন নাই। ফিরিয়া দাঁড়াইলে আজ তিনি লাট-গিরির সম্মান ও কত উপাধি পাইতেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র দেশের দরিদ্রদিগের ভাগ্যের সহিত আপন ভাগ্য সংযুক্ত করিয়া আজীবন কেবল নির্য্যাতন সহ্য করিয়াই গিয়াছেন। নব-রাজতন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক, ম্যাটসিনি প্লুরিসিতে জীবন পরিত্যাগ করিলেন; নব-রাজতন্ত্র-নিয়ম-নিগড়ে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক তিলক নিমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। যেমন বাল্যে প্রেমের দীক্ষায়, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে নির্য্যাতনে ও আত্মসমর্পণে, তেমনি শেষ জীবনে উভয়ের তিরোধানের মধ্যে সাদৃশ দেখিয়া আমরা বিহ্বল হইয়াছি। তাঁহাকে দমন করিতে দেশের কতকত কুলাঙ্গার চরদিগকেও নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত আপন লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন নাই। এই জন্যই ভারতের লোকেরা তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। এরূপ ভালবাসা এদেশে আর কেহ পাইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি ইংরাজি ভাষায় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাহার খাতিরে স্বধর্ম্ম ও নিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি উকীল হইয়াও অর্থ-লোলুপতার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ ব্যবসা করেন নাই। তিনি ভারতীয় দর্শনাদি ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও তাহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন নাই। তিনি সুবক্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকেও জীবনের একমাত্র ব্রত করেন নাই। ম্যাটসিনির ন্যায় কলম তাঁহার হাতে ছিল এক দুর্জ্জয় শক্তি, যাহা তাঁহাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছিল। তাঁহার কলম অগ্নিবর্ষণ করিত সকলকে তাহা দগ্ধ করিত, কিন্তু তাহাও তদীয় জীবনের একমাত্র বিশেষত্ব নয়। তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় প্রদেশে অনুপ্রবেশ করিয়া এক দুর্জ্জয় চরিত্র-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই যেন ইন্দ্রজিৎ-দস্যু-বধের এদেশে কারণ হইয়াছে। ভেলেণ্টাইন চিরোল ইংলণ্ডের যে রাজতন্ত্রের প্রকট মূর্ত্তি, তাহা তিলক না বুঝিয়াই বিচারপ্রার্থী হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন! ভেলেণ্টাইন বা ম্যাজিষ্ট্রেট ইমান্থুয়ল বা ষ্টেটস্‌ম্যানের এত অন্তর্জ্জালা কেন, শুনিতে চাও কি? তাঁহারা এ দেশের ইন্দ্রজিতের প্রতিনিধি। এরূপ প্রতিনিধি এদেশবাসীদের মধ্যেও অনেক আছে। লক্ষ্মণের সংযমপূত গভীর সাধনা যেমন এদেশে মেঘনাদকে বিনষ্ট করিয়াছিল, তেমনি কত দস্যু তিলকের সংযমে জর্জ্জরিত হইয়াছে। ঐ শক্তির নিকট সহস্র সহস্র মেঘনাথ-বধ হইবেই হইবে।

বোম্বের কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এক সময় কলিকাতার কোন একজন বক্তার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "শুনিয়াছি, বাঙ্গালীরা বেশ বক্তৃতা বলিতে পারে, কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা কিছুই নয়।" এক বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে, একালে, রামমোহন রায়ের পরে, কলিকাতায় কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না। বোম্বের রানাডে, দাদা ভাই নরোজি, গোখলে, মেটা, পরাঞ্জপে, তাতা প্রভৃতির তুলনা দিতে পারি, বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালায় এরূপ লোক দেখি না। গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ

হইয়া আজীবন বাঙ্গালী নেতা আপন সাধনা-পথে চলিতে পারিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালায় বড় বিরল। ধুক্কি মাথায় দিয়া সাহেব সাজা সোজা, চুরুট মুখে দিয়া ফিরিঙ্গি হওয়া সহজ, অপিচ অসংখ্য উপাধি পুচ্ছে বাঁধিয়া ময়ূরের ন্যায় শোভিত হওয়াও সহজ, কিন্তু জেনেরেল বুথের ন্যায় আজীবন লক্ষ্য পথে চলা, বা ম্যাটসিনির ন্যায় আজীবন দেশের জন্য কষ্ট, নির্ব্বাসন ও নির্য্যাতন সহ্য করা তত সহজ নয়। এইজন্যই মহাত্মা তিলক এদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বেদবেদান্ত, তিনি যে পথে চলিয়াছেন, তাহাই নীতি। তাঁহার দেশ-সেবা তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার রাজনীতি তাঁহার ধর্ম্ম, তিনি যাহা করিতেন, ধর্ম্মানুপ্রাণনেই করিতেন। ধর্ম্ম ভিন্ন তিনি কিছুই জানিতেন না। তদীয় চরিত্রের অমানুষিক শক্তির তেজে এক শ্রেণীর লোকের বদন ঝলসিয়া গিয়াছিল, তাই তাহাদের এত অন্তর্জ্জালা। তাঁহার সমতুল্য শক্তি এদেশে আর কাহারও নাই।

তাঁহাকে লোকেরা আদর করিয়া "তিলক মহারাজ" বলিয়া ডাকিত। তাহা শুধু গীতার ভাষ্য বা আরটিক প্রদেশের গভীর গবেষণাময় তত্ত্বনিরূপণের জন্য নয়, তাহা কেবল, তাঁহার প্রতিভা বা বুদ্ধির প্রাখর্য্যের জন্য নয়। তাহা তদীয় বিশেষত্বময়, আত্মত্যাগময় এমন এক জিনিস, তাহা মানুষকে স্বতঃই রাজ উপাধিতে ভূষিত করে। মহাত্মা রামমোহন রায় স্ব-উত্থিত রাজা, খ্রীষ্ট স্ব-উত্থিত মহারাজা, শ্রীচৈতন্য স্ব-উত্থিত মহারাজা। তিনি স্বদেশের সেবার সময় আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন, নিজের যশ মানের কুহক তাঁহার চরিত্রের ত্রিসীমায় পৌঁছিতে পারিত না, তিনি আত্মত্যাগী সংযমপূত মহাতেজেই এদেশের মহারাজা। তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম স্বদেশ-নেতা আর নাই। এই মহারাজা নামকরণেই এই নেতৃত্বের পরিচায়ক। সত্যই তিনি মানব-প্রাণে আপনার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা গণতন্ত্রের রাজার রাজা মহারাজা বলিয়া কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। বোম্বে, নরোজি-মেটা-গোখলে-তিলক-পরাঞ্জপে রূপ দেশানুরাগের প্রোজ্জ্বল পঞ্চপ্রদীপ লইয়া চিরদিন নব্য-ভারতের উদ্বোধনের আরতি করিতে থাক, তোমাকেও আমরা কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। ধন্য তিলক, ধন্য বোম্বে, ধন্য মারহাট্টা-জাতি।

জীবন-কথা।

"১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরিতে বালগঙ্গাধর তিলকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক প্রথমে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; পরে তিনি পুণার শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি-ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিলক পুণার ডেকান কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সেখান হইতে অনার্স লইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৯ খ্রীঃ তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরীক্ষায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

কিছুতেই সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিবেন না সঙ্কল্প করিয়া বালগঙ্গাধর তিলক কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া ১৮৮০ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারি পুনায় 'নিউইংলিশ ইস্কুল নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গে সঙ্গে "কেশরী" এবং

"মারহাট্টা" নামক সংবাদপত্রও তাঁহাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

"কেশরী" এবং "মারহাট্টা" উভয় পত্রেই কোলাপুরের রাজার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। কোলাপুর রাজ্যের কারবারী এজন্য মাণহানির মোকদ্দমা রুজু করেন। বিচারে তিলকের এবং তাঁহার সহযোগী আগরকরের চারি মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড বিহিত হয়। এই বিচার ও দণ্ডের ফলে, দণ্ডিত দুইজনের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বাড়িয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যোদ্দম আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই সময়ে সহবাস-সম্মতি আইন লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তিলক এই আইনের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রজার সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বিদেশী গবরমেণ্ট আইন বাঁধিয়া দিবেন, তিনি ইহার ঘোর বিরোধী। এই সময়েই তিনি বিদ্যালয়ে আইন পড়াইবার জন্য একটী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। হাইকোর্টের ও জেলা কোর্টের উকীল তৈয়ারী করাই উদ্দেশ্য।

১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ মহারাষ্ট্র দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। দুর্ভিক্ষের এমন তীব্রতা এদেশে আর কখনও অনুভূত হয় নাই। তিলক এই পীড়িত প্রজাপুঞ্জের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার স্বাভাবিক উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া আত্ম-নিয়োগ করেন। তিনি গবরমেণ্টকে দুর্ভিক্ষ আইন অনুসারে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে বলেন এবং পুনায় সুলভ খাদ্যশস্যের দোকান খুলিয়া দেন। প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য একটী প্লেগ-হিন্দু-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি রোগীদের কাছে কাছে থাকিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তাহারই যত্নে সেবায় অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছিল। প্লেগ প্রতিষেধের জন্য গবরমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার অসুবিধার কথা তিলক লেখালেখি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ ১৫ই জুন তারিখের "কেশরী" পত্রে শিবাজী উৎসব সম্বন্ধে এক বিবরণ প্রকাশিত হয়। ২২শে জুন কে বা কাহারা মিঃ র‍্যাণ্ডকে এবং লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্টকে খুন করে। গবরমেণ্ট সন্দেহ করেন,—এই হত্যাকাণ্ডের সহিত 'কেশরী'র ঐ প্রবন্ধের একটা সম্বন্ধ আছে। এই সন্দেহক্রমেই গবরমেণ্ট তিলককে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন। যথাকালে হাইকোর্টে বিচার আরম্ভ হয়। বহুকষ্টে তিলক জামিনে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পাঁচজন ইউরোপীয়, একজন ইহুদী, দুইজন হিন্দু এবং একজন পার্শী জুরি লইয়া জজ এই মোকর্দ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। ছয় জন ইউরোপীয় তাঁহাকে দোষী এবং তিন জন ভারতীয় তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ফলে, তিলকের রাজদ্রোহের অপরাধে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। প্রিভিকাউন্সিলে ইহার বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছিল। মিঃ এস্কুইথ তিলকের পক্ষে এই মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। পরে, প্রফেসর ম্যাক্সমুলার এবং উইলিয়ম হণ্টার তিলক একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতি করুণা করিবার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন করেন। অনেক লেখালেখির পরে, গবর্ণমেণ্টের

বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া, লিখিয়া কিম্বা কোন কাজ করিয়া অসন্তোষ উৎপাদন করিবেন না, এইরূপ সত্ত্বে সম্মতি জানাইয়া তিলক অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

রাজদ্রোহের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের পরেও তিলক স্বচ্ছন্দ হইতে পারেন নাই। ইহার পরেই তিনি তাই-মহারাজের মোকদ্দমায় পড়েন। তাই-মহারাজের স্বামী তিলকের বন্ধু ছিলেন। তিনি এক উইল করিয়া তিলককে তাহার এক্‌জিকিউটার করিয়া যান। তিলক বিশেষ যত্নের সহিত কাজ করিয়া তাঁহার বন্ধুর বিশৃঙ্খল সম্পত্তির শৃঙ্খলা-সাধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহার শত্রুরা তাই-মহারাজকে বুঝাইয়া দেয় যে, তিলক যাহা করিতেছেন, তাহা তাই মহারাজের স্বার্থের প্রতিকূল। ফলে, পুনারজেলা-জজ মিঃ এষ্টনের আদালতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই মোকদ্দমা রুজু হয়। ১৯০৪খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। দীর্ঘকাল বিচারের পর স্পেসাল মাজিষ্টর মিঃ ক্লেমণ্টস্ তিলককে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার আঠার মাস কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ করেন। সেসন জজের নিকট আপীলে দণ্ড কমিয়া ছয় মাস হয়। হাইকোর্টে পুনরায় আপীল হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারে তিলক নির্দ্দোষ বলিয়া বেকসুর খালাস পান।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার তিলক মোকদ্দমার জড়িত হন। মজঃফরপুরে বোমা বিভ্রাটের ফলে দুইজন ইংরেজ-রমণী নিহত হইয়াছিল। চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এদেশী এবং এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহ বিপ্লববাদীদের নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এদেশী সংবাদপত্র সমূহ বলেন,—দমন-নীতি প্রয়োগ করা আর উচিত নহে; কিন্তু এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র সমূহ দমন-নীতিই প্রয়োগ করিতে গবরমেণ্টকে উপদেশ দেন। এই সময়ে তিলকের "কেশরী" সংবাদপত্রে এই রাজদ্রোহিতা সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব প্রবন্ধে নির্ভীকভাবে সকল অবস্থার আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছিল,—বোমা ব্যবহার খুবই খারাপ বটে, কিন্তু গবরমেণ্ট দমন নীতি অনুসরণ করিয়া অবস্থাটী আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। এখন দমন-নীতি পরিত্যাগ করিয়া গবরমেণ্টের প্রজাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু গবরমেণ্টের ধারণা হয়,—এই সব প্রবন্ধে বোমা ব্যবহারের সমর্থন করা হইয়াছে। ফলে, হঠাৎ তিলক গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে জেলে রাখা হয়। তিলক ঐ সব প্রবন্ধের লেখক নহেন, তথাপি তিনি সাহসিকতার সহিত ইহার সকল দায়িত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাকে কিছুতেই জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই। ইহাতে জেলে থাকার কষ্ট ত হইয়াছিলই, তাহা ছাড়া তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইতেও পারেন নাই। ১৩ই জুলাই হাইকোর্টে বিচার আরম্ভ হয়। সাতজন ইউরোপীয় এবং দুইজন পার্শী জুরি লইয়া জজ বিচারে বসেন। প্রবন্ধগুলি মহারাষ্ট্রভাষায় লিখিত, জজ এবং জুরি উভয়েই ইহার কিছুই বুঝেন না। তিলক নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; মোকদ্দমার তৃতীয় দিনে অপরাহ্ণে তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন; অষ্টম দিনের অর্দ্ধেক সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা চলিয়াছিল। তিলক জেলের মধ্যে থাকিয়া প্রস্তুত হইবার পক্ষে কোনরূপ সুবিধা পান নাই। তথাপি তিনি যে ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতই তাঁহার অসা-

ধারণ শক্তির পরিচায়ক। এডভোকেট জেনারেল মিঃ ব্রান্সন সেইদিন ইহার উত্তরে পাণ্টা-বক্তৃতা করেন, তিনি শ্লেষের ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে সৌজন্য-বর্জ্জিত; কিন্তু তিলক কখনও সৌজন্য ত্যাগ করেন নাই। মিঃ ব্রান্সন ৫টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। জজ বলেন,—রাত্রি পর্য্যন্ত এজলাস করিয়া এই দিনই মোকদ্দমা শেষ করিতে হইবে। পরলোকগত মিঃ ডাভার জজ ছিলেন। তিনিও তিলকের প্রতিকূল ভাবে মোকদ্দমা গুছাইয়া দেন। রাত্রি ৮টার সময় জুরিরা পরামর্শ করিতে উঠেন। রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটের সময় তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বলেন,—সাতজনের মতে তিলক দোষী; দুইজনের মতে নির্দ্দোষ। তিলকের ছয় বৎসর দ্বীপান্তর এবং এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হয়। তিলকের দণ্ড হইয়াছে শুনিয়া বোম্বাইর লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। দোকান পাট বন্দ হয়, মজুরেরা কাজ কর্ম্ম বন্ধ করে; কোথাও কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামাও হইয়াছিল। কিন্তু তিলক নিজে নিরুৎসাহ হন নাই! জুরিদের মন্তব্য শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, জুরিদের সিদ্ধান্ত শুনিয়াও আমি বলিতেছি, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সকলেরই উপরওয়ালা একজন আছেন, তাঁহার নির্দ্দেশেই সকল কাজ হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছায় হয়ত এমন হইতে পারে যে আমি স্বাধীন থাকিলে আমার গৃহীত এই কাজ যতটা সাফল্য লাভ করিত, আমার নির্য্যাতনে তাহার অপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করিবে।" তিলক ছয় বৎসর কাল মান্দালয় জেলে আবদ্ধ ছিলেন। এই জেলে অবস্থান কালে তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে গীতা পাঠ করিতেন। ১৯১৪ খ্রীঃ তিলক অব্যাহতি লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। মহারাষ্ট্রের জন-সাধারণ এই সময় বহুদিনের পর গৃহ-প্রত্যাগত পিতার সম্মুখে পুত্রের মত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

১৯১৬ খ্রীঃ মে এবং জুন মাসে তিলক বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বড় বড় সভায় মারাঠী ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। স্বায়ত্ত-শাসন-সমস্যাই এই সব বক্তৃতার মূল বিষয়। এই সময় জন-সাধারণের উপর তিলকের প্রভূত প্রভুত্বের পরিচয় পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা তিলকের নিকট হইতে ভালভাবে থাকিবার জন্য ৪০০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকার জামিন লইবেন স্থির করেন। তিলকের উপর ঐ মর্ম্মে নোটিশ জারি হয়। পুণার মাজিষ্টর ঐ নোটিশ জারি করিয়াছিলেন এবং এক পুরাতন পদ্ধতিক্রমে নিজেই জজের অধিকার লইয়া নিজের হুকুম বাহাল রাখিয়াছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টে আপীল হয়। এবারও বোম্বাই হাইকোর্ট বৃটিশ ন্যায়-বিচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। জজেরা সিদ্ধান্ত করেন,—তিলকের বক্তৃতা যতই তীব্র হউক, তাহা বর্ত্তমান স্বায়ত্ত-শাসনপদ্ধতির সমালোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহা গবরমেণ্টের সমালোচনা আদৌ নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, তিলক একস্থানেও বৃটিশ গবরমেণ্টকে আক্রমণ করেন নাই, বৃটিশ সংশ্রব রাখারও প্রতিবাদ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে পারে না। জজেরা এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, বক্তৃতার দুই এক স্থানের দুই একটা কথা ধরিয়া বিচার করিলে ঠিক হইবে না; সমগ্র বক্তৃতা এক করিয়া পড়িয়া দেখিতে হইবে, তাহার ভাববত কোন দোষ আছে কিনা। ফলে, তিলককে জামিনের টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়।

আইনের আমলে আমলা-তন্ত্র তখন অন্য উপায়ে তাঁহাকে আটক করিতে চেষ্টা করে। হাইকোর্ট হইতে রেহাই লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-রক্ষা-আইন অনুসারে তিলকের উপর পঞ্জাব ও দিল্লী প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তবে, মিঃ মণ্টেগুর সহিত তিলক যখন দেখা করিতে চাহেন, তখন তাঁহাকে ভারত-গবরমেণ্ট দিল্লী প্রবেশে অনুমতি দিয়াছিলেন।

যেদিন পুণার ম্যাজিষ্টর উল্লিখিত নোটিশ জারি করেন, সেই দিন তিলকের ৬১ বাৎসরিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ সমারোহের আয়োজন হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ এই দিন তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দিয়া অভিনন্দিত করে।" বঙ্গবাসী।

দক্ষিণ-ভ্রমণ।

(১০৭ পৃষ্ঠার পর)

রামেশ্বর ষ্টেসন ছাড়িয়াই পাম্বাম ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বদিবসে যে বন্ধুটী আমার লগেজ ইত্যাদি লইয়া পাণ্ডার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিলাম, তিনি ষ্টেসনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে যে প্রকার সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। গাড়ী ছাড়িয়াই সমুদ্রের পুলের উপর উঠিল। গত কল্য সাধ মিটাইয়া সমুদ্রের ও তদুপরিস্থ পুলের শোভা দেখিতে পাই নাই, সেইজন্য অদ্য ভাল করিয়া দেখিব মনে করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও সাধ মিটাইয়া দেখিতে পারিলামনা। দেখিতে না দেখিতে গাড়ী সমুদ্রের অপরপারে উপস্থিত হইল। মনে ভাবিলাম, হায় রে! এ জীবনে আর কখন এই দৃশ্য দেখিতে পাইব না, কিন্তু ইহার শোভা দেখিয়া একটুও সাধ মিটিল না। এসংসারে এই প্রকারেই কোন সাধ মিটে নাই। সেই জন্যই কবি বলিয়াছেন "সাধ কখন মিটে না ভাই সাধে পড়ুক বাজ।" বাল্যকালে কত সাধ করিয়াছিলাম, যৌবনে সংসার ধর্ম্ম করিয়া মনের সাধ মিটাইব, কিন্তু তাহা ঘটে নাই। যৌবনে সংসার-ধর্ম্ম পাতাইয়া বসিতে না বসিতে স্ত্রীপুত্র লইয়া কত খেজালত ভোগ করিলাম। একদিনের জন্যও শান্তি পাইলাম না, নিজেরও স্ত্রীপুত্রদের পেটের চিন্তায় অস্থির হইয়া কত কষ্টই না ভোগ করিলাম। তৎপর সন্তানগুলি একটু বড় হইতে না হইতে সহধর্ম্মিণী ত্যাগ করিয়া গেলেন। যে খেজালতগুলি দুই জনে খাটিয়াও মিটাইতে পারিতাম না, তাহা নিজের স্কন্ধে পতিত হওয়ায় কত যে কষ্ট পাইলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও কিন্তু সাধ মিটাইবার আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না, মনে করিলাম, সন্তানগুলি বড় হইয়া রোজগার করিতে শিখিলে আমি সাধ পুরাইব, তাহাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া মনের সাধে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, কিন্তু তাহাও ঘটিল না। এক এক জন এক এক প্রকৃতি ধারণ করিয়ে

লাগিল। তাহাদিগকে লইয়া সংসারে শান্তিতে থাকিতে পারিব, এরূপ আশা ছাড়িয়া দিয়া নিজে কষ্ট ত্যাগ করিয়া ভজন সাধন করিবার জন্য স্থির সংকল্প করিলাম। সুবিধাও বেশ ঘটিল, কিন্তু ভজন সাধন একটুও হইল না। নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে পুত্র-কন্যাদিগের ভাবনাই ভাবিতে থাকি। জপ ছাড়িয়া ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, হৃদয়কন্দরে ভগবানকে বসাইব, তথায় পুত্র কন্যাগণ বসিয়া রহিয়াছে, ভগবানের রূপ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বাহিরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সাধকের ভাণ করিয়া সন্তানদিগকে ধ্যান করিতেছি। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহাদের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বহুকাল হইতে যে সাধ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা আর মিটিল না। এখন মনে হয়, সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়া ভজন সাধন করিলে বোধ হয় সাধ মিটিত। অনেক বন্ধুগণ ও গুরুজন এই প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সংসারে নানা প্রকার অশান্তির মধ্যে থাকিতে হয়। সংসারে থাকিলেই ঝগড়া, হিংসা দ্বেষ, মামলা মকর্দ্দমা ইত্যাদিতে জড়িত হইতে হয়। যে কঠিন মন একটী বস্তুতে স্থির রাখিতে অক্ষম, তাহা এতগুলি বিষয়ে জড়িত রাখিয়া ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। তাই সদা সর্ব্বদাই ভাবি, কি করিব, কোথায় যাইব। আর ত দিন বাকী নাই। শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়া থাকি, এই জীবনে যাহাদের আত্মজ্ঞান জন্মিল না, তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য। এমন বুঝিতে পারিতেছি, ভগবানের কৃপা না হইলে কাহারও কোন সাধ মিটে না।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া খেয়াল বশতঃ অপ্রাসঙ্গিক কয়েকটী কথা লিখিলাম। ভরসা করি, পাঠকগণ বিরক্ত না হইয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনেকগুলি ভদ্র লোক ছিলাম—প্রত্যেক কামরায় তিনজন থাকিবার নিয়ম, কিন্তু একটী কামরাতে দুই-জন বিশিষ্ট মাদ্রাজি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং বেশভূষা দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহারা বিশেষ ধনী লোক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য বেতনভোগী একজন ফিরিঙ্গির নিকটও তাঁহাদের বসিবার ক্ষমতাও নাই। একটী ষ্টেশনে একজন ফিরিঙ্গি—বোধ হইল Traffic Inspector or Audit Inspector হইবেন, গাড়ীর নিকট আসিয়া বসিবার স্থান না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী হইলে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীতে যাইতেন। কিন্তু তথায় না যাইয়া সঙ্গীয় চাপরাশীকে ঐ ভদ্রলোক দুইটীকে নামাইয়া দিতে হুকুম করিলেন। হুকুম তামিল হইল, ভদ্রলোক দুইটী বিনা বাক্য-ব্যয়ে নামিয়া অন্য কামরায় গমন করিলেন। সাহেব গাড়ীতে উঠিয়া শয়ন করিলেন। ভদ্রলোক দুইটীর নিরীহ ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এক আধ ঘণ্টার জন্য গাড়ীতে উঠিয়া একটু বসিবার স্থানের জন্য সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়া নিজের দুঃখ কষ্ট নিজে আনয়ন করাটা একেবারেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। গাড়ী সাহেবদের, দেশ সাহেবদের, শাসনও তাহাদের, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে নামিয়া যাওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাপারটী চক্ষে দেখিয়া কবির কথা মনে পড়িল,—

"নিজবাস ভূমে পরবাসী হ'লে"
"পরদাস খতে নিজ নাম দিলে"

দেশের অবস্থা, নিজেদের পরাধীনতা ইত্যাদি মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে মাদুরা পৌঁছিলাম। এই স্থানটী ভ্রমণকারীর পক্ষে বিশেষ দর্শনীয়—বেলা প্রায় দুইটার সময় তথায় নামিলাম। আমার সঙ্গে কেহ নাই, তথায় অন্য কোন সহযাত্রীও পাইলাম না, সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম-গৃহে উপস্থিত হইলাম। তথায় নিজের লগেজ ইত্যাদি রক্ষা করিয়া একাই সহর দেখিতে যাইবার মতলব করিতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আমার Guide হইতে পারেন কিনা। মনে ভাবিলাম, অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বাহির হইলে হয় ত বিপদও ঘটিতে পারে। আবার ভাবিলাম, বিপদই বা কিসের? যে জন্য পথে, ঘাটে লোকের বিপদ ঘটে, সেই বিপদের কারণ অর্থ আমার নিকট নাই, সুতরাং সাহস করিয়া যুবকের সঙ্গে বাহির হইলাম।

তিনি প্রথমেই আমাকে রাজবাটী দেখাইতে লইয়া চলিলেন। এই স্থানকে পূর্ব্বে পাণ্ডরাজ্য বলিত। পাণ্ডরাজ বংশের জনৈক রাজা ত্রিরমুলি এই রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। ইহা দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম, এ প্রকার সুন্দর অট্টালিকা এদেশে আর নাই, সমস্ত গৃহটী খিলান দ্বারা প্রস্তুত, বীম বরগা কাষ্ঠের কোন কার্য্য আদৌ নাই। সমস্ত বাড়ীটী সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বাহিরে বিস্তৃত আঙ্গিনায় পূর্ব্বে নাকি অষ্ট প্রহর নৃত্য গীত হইত এবং দ্বিতলের বহুবিধ সুন্দর সুন্দর গৃহে উপবেশন করিয়া রাজা এবং রমণীগণ উহা দর্শন শ্রবণ করিতেন। এক্ষণে এই স্থানে ইংরেজের কাছারী বসিতেছে। সুতরাং বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও নিয়মিত ভাবে মেরামত থাকায় পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না।

ভিতরে অন্দর মহল। রাণীগণ এই স্থানে থাকিতেন। ইহার আঙ্গিনাটী একটী পুকুরের মত। Guide মহাশয় বলিলেন, এই স্থানটী জল দ্বারা পূর্ণ থাকিত এবং রমণীগণ তথায় মনের সুখে অবগাহন ও জলক্রীড়া করিতেন। রাণীদিগের বাসগৃহগুলি এক্ষণে কাছারীর আফিসে পরিণত হইয়াছে। রাজা ত্রিরমুলি এই অট্টালিকাটী ১৬২৩-১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত করেন। Guide মহাশয় বলিলেন, তিনি নাকি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যেই জন্য প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। এই বিষয়টী কোন ইতিহাসে আছে কিনা জ্ঞাত নহি।

মাদুরা সহরকে পূর্ব্বে বীরনারায়ণপুর ও পাণ্ডরাজ্যের রাজধানী বলিত। এই স্থানেই সন্ন্যাসীপ্রবর যমুনাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নাথমুনির পৌত্র। বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় পিতামহ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, পরে পাণ্ডরাজের সভাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কোনাহলকে পরাস্ত করিয়া অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হন। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসহকারে হঠাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, তিনি শ্রীরামানুজের গুরুগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

রাজবাটী দর্শন করিয়া প্রায় ১॥ মাইল দূরে একটী পুষ্করিণী দেখিতে গেলাম। এই পুষ্করিণীর চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান।

মধ্য গৃহে একটী দ্বীপের উপর সুন্দর একটী মন্দির ও নানাবিধ বৃক্ষশোভিত বাগান আছে। পুষ্করিণীটী দীর্ঘ প্রস্থেও বেশ বড়, কিন্তু জল ভাল নহে। ইহার জল পান করা ত দূরের কথা, অন্যান্য কার্য্যেও ব্যবহার হইতে পারে না। তথায় হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দেখিতে রওনা হইলাম। মন্দিরের সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। তথায় বাজার বসিয়াছে এবং নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। গাইড মহাশয়ের উপদেশ মত তথায় পূজা উপকরণ দ্রব্যগুলি ক্রয় করিলাম। সে সমস্ত বেশী কিছুই নহে. একটী নারিকেল, একটু কর্পূর, ফুল, চন্দন, সিন্দুর প্রভৃতি। গাইড মহাশয় তামিল ভাষায় আর একজনকে ডাকিয়া সঙ্গে লইলেন। একজন আমার আগে আগে চলিতে লাগিলেন, অন্য জন পিছনে থাকিলেন। মন্দিরের ভিতর একটী ছোট গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটী পুষ্করিণী দেখিলাম, গাইড মহাশয় বলিলেন, এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিলে শত জন্মের পাপ নাশ হয়। আমি ইতিপূর্ব্বেই রামেশ্বর কোটিতীর্থে স্নান করিয়া কোটি জন্মের পাপ ধৌত করিয়া আসিয়াছি। সেই স্থান হইতে সবে মাত্র আট দিন আসিয়াছি, সুতরাং এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে আমার এত পাপ সঞ্চয় হয় নাই, যাহাতে আমার এই দুর্গন্ধময় জলে স্নান করিয়া পাপ নাশ করিতে হইবে। পুষ্করিণী অতিক্রম করিয়া একটী ভয়ানক অন্ধকারময় স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে আসিবামাত্র গাইড মহাশয় আমার হস্তধারণ করিলেন এবং আমি ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। আমার হঠাৎ মনে হইল, ইহারা দুইজনে এক্ষণে আমাকে কষ্ট দিয়া যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবে, সেইজন্য অন্ধকারময় স্থানে লইয়া আসিয়াছে। যথাসর্ব্বস্বের মধ্যে আমার হাতে মোট তিনটী টাকা ছিল। মনে হইল, সমস্তই উহাদিগকে ফেলিয়া দিয়া এক্ষণে ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু ফিরিয়াই বা উহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই কৈ? আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া গাইডকে বলিলাম, "আমার ঠাকুর দেখিবার প্রয়োজন নাই, আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চল। আমার বড়ই ভয় হইতেছে।" আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই স্থানটী অত্যন্ত অন্ধকার এবং আপনার অপরিচিত, পাছে আপনি পড়িয়া যান, এই জন্য হাত ধরিয়াছি। আপনার প্রতি আমরা কোন প্রকার অত্যাচার করিব না, আপনি নির্ভয়ে চলুন, ঐ সম্মুখে মীনাক্ষীদেবী দর্শন করুন।" তাহার কথায় বুঝিলাম, আমার ভয় নাই, সুতরাং তাহার হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুই তিনটী প্রকোষ্ঠ পার হইয়া এবং নাটমন্দিরের মধ্য দিয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানটীও ঘোর অন্ধকার, কিন্তু অনেকগুলি দ্বীপ জ্বলিতেছে, সুতরাং দেবীকে দেখিতে কষ্ট হইল না। পরে বুঝিলাম, সঙ্গে যে লোকটীকে আনিয়াছে, সেই ঐ স্থানের পুরোহিত। আমার হস্ত হইতে পূজার দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তামিল ভাষায় পূজা সমাধা করিয়া দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। আমি-কিঞ্চিৎ প্রদান করিলে তিনি ভগবৎ পাদুকা চিহ্নিত মুকুট শঠকোপা আমার মস্তকে ধারণ করিলেন এবং নারিকেল প্রসাদ দিলেন। শক্ত নারিকেলটী আমার ন্যায় দন্তবিহীন লোকের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং উহার সমস্তটাই গাইড মহাশয় গ্রহণ করিলেন।

এখন আমার ভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে অন্যান্য স্থান দেখাইবার জন্য গাইডকে অনুরোধ করিলাম. তিনি নানা স্থান দেখাইয়া অবশেষে একটী স্থানে উপস্থিত করিলেন, দেখিলাম, তথায় অনেক স্ত্রীপুরুষের জনতা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৪।৫টী অল্প বয়স্কা ঘোর কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোক উপবেশন করিয়া ক্রমাগত মস্তক দুলাইতেছে। মস্তকের আলুলায়িত দীর্ঘ কেশগুলি চারিদিকে হেলিয়া-দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে, তামিল ভাষায় কি কথা হইতেছে, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিকে পুরুষ লোকের সংখ্যাই বেশী, তাহারা ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চহাস্য করিতেছে। গাইডকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পূর্ব্বোক্ত মন্দিরাভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণীতে অবগাহনের পর ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের উপর দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। নিকটস্থ পুরুষগণ নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেছে এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিতেছে। অনেক পুরুষলোকও উক্ত পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেছে, কিন্তু মজা এই যে, তাহাদের উপর দেবীর আবির্ভাব হয় না। এই যে দেবীর আবির্ভাব বা বারনামা, ইহা কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সংকীর্ত্তন স্থলে বা কালী পূজা ও শিবপূজা স্থলে প্রায়ই এই প্রকার ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে ইহাও দেখিয়াছি, কোন কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ লোকের উপর বার মাসই প্রতি সপ্তাহে এই প্রকার দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে স্থায়ীরূপে বারমাস বসিয়া গিয়াছে এবং বহুদূর হইতে শত শত লোক তথায় গমন করিয়া নানাবিধ পূজা দিয়া থাকে। এই প্রকার বেশ দুই পয়সা রোজগারও হইতেছে। সম্প্রতি কোন গ্রামে হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একটী বাঁশ বনের মধ্যে একটী কায়স্থ যুবকের উপর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই বাঁশতলাতেই বসিয়া মাথা দুলাইতে লাগিলেন এবং ভক্তগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

যে মহাত্মাগণ তত্ত্ব বিষয় মীমাংসা করিতে নিযুক্ত, তাঁহারা এ বিষয় একটা মীমাংসা করিলে মন্দ হয়না। ভারতের সর্ব্বত্রই একই প্রকার অবস্থা ঘটিবার কারণ কি? এ সম্বন্ধে আমাদের পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদিতে কিছু লিখিত আছে কিনা জানিবার বাসনা। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, সুতরাং আর অধিকক্ষণ মন্দিরের মধ্যে অবস্থিতি করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া নাটমন্দির হইতে বাহির হইলাম। প্রথম যে সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবার তাহার বিপরীত অন্য দরজায় উপস্থিত হইয়া উহার নির্ম্মাণ-কার্য্যটী একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলাম। দরজাটী বেশ উচ্চ এবং সমস্তই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রস্তরগুলি অবশ্য বহু দূর দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। প্রস্তরগুলি কাটিয়া নানাবিধ ঐতিহাসিক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেইগুলিকে স্তরে স্তরে স্থাপিত করিয়া নানা কৌশলে দরজার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রাচীরগুলি অতি উচ্চ এবং তাহার উপরেও স্থানে স্থানে নানা প্রকার মূর্ত্তি বিশিষ্ট প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া ষ্টেসনের দিকে আসিবার সময় সদর বড় রাস্তার উপর মহা ধুমধাম ও নানাবিধ বাদ্য ও আলোকাদি

সহ একটী শোভা-যাত্রা দেখিতে পাইয়া দ্রুত-পদে উহার নিকট পৌছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, একটী বড় লোকের বিবাহের মিছিল যাইতেছে। নানাবিধ পুষ্পপতাকা ও গ্যাসের আলো দ্বারা সজ্জিত বিমানোপরি বর দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া গাইডকে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কালে তিনি আমাকে উহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং মিছিল মধ্যস্থিত লোকদিগকে স্পর্শ করিলে পুনরায় অবগাহন করিতে হইবে, তাহাও বলিলেন। শেষে বুঝিলাম, ঐ বিমানে একটী মৃত দেহ। উহাকে সৎকার করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। মৃতদেহটী অস্পৃশ্য জাতির, সুতরাং মিছিলস্থ সমস্ত লোকই অস্পৃশ্য। এই প্রকার নিম্ন জাতির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের একটী মজ্জাগত সংস্কার বা দোষ। এখন দেখিতে পাইতেছি, স্থানে স্থানে বড় বড় হিন্দুগণ বড় বড় সভা করিয়া এই সংস্কারটী উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কোন কালেই এই চেষ্টা ফলবতী হইবে না। আমরা যে মুহূর্ত্তে এই ভারতের মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি, মাতৃস্তন্যের দুগ্ধ দ্বারা আমাদিগকে ঐ সমস্ত জাতিকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। আমরা বড় হইয়া ইংরেজের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এবং নানাবিধ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভা করিয়া মুখে বলিতেছি বটে, অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শনীয় করিতে হইবে' কিন্তু অন্তরের সহিত উহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি, তাহাদের প্রতি কৃপা দেখান, উহা কেবলই ফাকা কথা এবং ইংরেজের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু যে ইংরেজ সসাগরা ধরার আধিপত্য করিতেছে, তিনি যে ইহা বুঝিতে পারেন না, এমন মনে করা নিতান্তই বাতুলতা। ভারতের সংস্কারক মহাত্মাগণ একটু বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ভারতবর্ষ হইতে একটু একটু করিয়া যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মতিরোহিত হইতেছিল, আবার পুনরুত্থানকারীগণের চেষ্টায় সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছে।

রাস্তার দুই ধারে অনেক তন্তুবায়ের গৃহ এবং বস্ত্রবয়ন দেখিতে পাইলাম। বিলাতী সূতার দ্বারা অতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, সূতাগুলি এমন সুন্দরভাবে মার্জ্জিত হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে রেসম বলিয়া ভ্রম হয়। আমার বোধ হয়, ভারতে যদি অতি সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করা যায়, তবে আমাদের দেশের তন্তুবায়গণ তাঁতের বস্ত্র দ্বারাই ভারতের কাপড়ের অভাব দূর করিতে পারে। সূতা পাইলে কলে যে পরিমাণ বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতে বিস্তর তন্তুবায় এবং জোলা আছে।

সন্ধ্যার সময় ষ্টেসনে পৌছিলাম, রাত্রি ১২টার সময় ট্রেন পাইব, সুতরাং এ যাবৎ-কাল ষ্টেশনের বিশ্রাম-গৃহে অবস্থিতি করিতে হইল। তথাকার হোটেলে চারি আনা পয়সা দিয়া আহার করিলাম। ইহার বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ পূর্ব্বেই এক প্রকার লেখা হইয়াছে। আহারের পর একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা অসম্ভব। মশার উপদ্রবে সমস্ত সময়টা উপবেশন করিয়া কাটাইতে হইল। বিশ্রাম-গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া রুমাল দ্বারা মশককুলের সহিত সংগ্রাম

করিতেছি, এমন সময়ে একজন ফিরিঙ্গি-Guard একজন তামিল দেশীয় বাবুর সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন এবং গৃহমধ্যস্থিত একখানি আরাম-চেয়ার লইয়া আমার নিকট হইতে একটু দূরে উপবেশন করিয়া পকেট হইতে একটী সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া আরামপূর্ব্বক ধুমপান করিতে লাগিলেন। বন্ধুটীও একখানি চেয়ার লইয়া তাহার নিকট উপবেশন করিলেন এবং তিনিও একটি সিগারেট লইয়া আরাম করিতে লাগিলেন। সাহেবটী একটু পরে উক্ত বাবুটীর সহিত বেশ গল্প জুড়িয়া দিলেন এবং সেই গল্প শ্রবণ করিয়া আমারও বেশ সময়ও কাটিয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় সাহেব বাহাদুর স্বস্থানে গমন করিলেন এবং আমিও রাত্রি ১২টার সময় ট্রেণে উঠিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় Trichinopati নামিয়া টেপাকুলম সহরে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলাম এবং যথাসময়ে আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া বাঙ্গালায় যাত্রা করিলাম।

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার,

ভারতপূজ্য মহাত্মা তিলকের তিরোধানে।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

একি শুনি অকস্মাৎ শতকোটি বজ্রাঘাত সম
অন্তাহত ভারত-"তিলক" !—
নিস্পন্দ হৃদয়গতি ! মর্ম্মে মর্ম্মে পশিল নির্ম্মম
বিষদিগ্ধ সুতীক্ষ্ণ শায়ক।
যুগসন্ধিক্ষণে যবে ভারতের দুর্দ্দিন তিমিরে
দিব্যদ্যুতি বিকাশ-উন্মুখ,
জ্যোতিঃর বিগ্রহদেব অতর্কিতে
অস্তমিত ধীরে
শূন্য করি জননীর বুক !
কালি রাজ্য অভিষেক, রঘুবংশচূড়ামণি আজ
বনবাসে করিলা গমন !—
চূর্ণ হিমাদ্রির শৃঙ্গ ! মুকুট বিচ্যুত সুররাজ !
হৃত কৃষ্ণ কৌস্তভ রতন !
সদাগতি গতিহারা ! স্তম্ভিত উদ্বেল পারাবার
জগতের অশ্রুরাশি ভারতে আজিকে একাকার।
মহারাষ্ট্রকুলপতি শিবাজীর পূর্ণ-অবতার !
শ্রীগীতার জীয়ন্ত মূরতি !
দৃপ্ত রাজরোষ তোমা গ্রাসিবারে চাহি বারংবার
করে গেছে নিঃশব্দে আরতি !
তুমি সত্য অগ্নিহোত্রী, অন্তরের পূত যজ্ঞাগারে
দেশভক্তি-হোমানল জ্বালি'
কঠোর তপস্যা একি নিত্য একা সাধিলে
সংসারে,
মনোপ্রাণ-হবিঃধারা ঢালি !
হে নিষ্কাম কর্ম্মযোগি ! হে মহর্ষি স্বরাজমন্ত্রের !
স্বার্থত্যাগি ! দেশহিত ব্রত !
তোমার 'কেশরী" সদা দুঃখদৈন্য হেরি ভারতের
গর্জ্জিয়াছে কেশরীর মত !
আজি যজ্ঞে পূর্ণাহুতি ! দধিচির অস্থিদান শেষ
বজ্র কি উঠেছে গড়ি জয়শক্তি করিয়া উন্মেষ !
হা দেব ! দুরাশা ঘোর ! এখনো যে
তমিস্রা রজনী,
দিকে দিকে রয়েছে ঘেরিয়া,—
অন্যায় ও অনাচারে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ধ্বনি
উঠিতেছে ভারত বেড়িয়া !
কোথা ঐক্য, কোথা সখ্য, ধর্ম্মে কর্ম্মে
কোথা সমন্বয়,
লক্ষ্য কোথা উদগ্র অটল ;—
স্বার্থ ও অর্থের মোহে কলুষিত এখনো হৃদয়
আত্মনিষ্ঠা এখনো চঞ্চল !
হে বীর ! হে মহারথি ! অভিশপ্ত
ভারত-সন্তান
এখনো যে লুণ্ঠিত ধূলায়,—
অভিজ্ঞান-শঙ্খ ত্যজি তুমি কোথা করিছ
প্রয়াণ
কে আনিবে স্বরগ-সুধায় !

আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে আজ উঠে থরথরি-
হে লোকেন্দ্র! যুগগুরু! ক্ষাত্রবীর্য্য অবমান
স্মরি!
হে পূজার্হ! জননেতা! আর্য্যরবি!
পুরুষ সপ্তম!
নিরুদ্দেশ পথের পথিক!
দেশ ভ্রাতাগণে কর আশীর্ব্বাদ আজি নিরুপম
লক্ষ্যে সদা রহিতে নির্ভীক!
তোমারি পদাঙ্ক ধরি জ্ঞানে কর্ম্মে হতে
বীর্য্যবান
দীক্ষা দান কর আজি সবে;—
জাগ্রত বিশ্বের মাঝে এ ভারত করুক উত্থান
তব সিদ্ধ সাধনা-গৌরবে!
তব পুণ্যবলে দেব! অস্ত হোক্ অন্ধকার রাতি
ভস্ম হোক্ যত হিংসা দ্বেষ;—
অশরীরী আত্মা তব ভারতের কোটি হৃদি গাঁথি
পূজার্ঘ্যে করুক্ সমাবেশ!
হে অমর! পরন্তপ! অজ্ঞাত রাজ্যের
অধিবাসি!
লভ চির শান্তি সুখ মাতৃ আস্যে হেরি পুনঃ
হাসি!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সঙ্গণিকা।

(২০)

দুঃখের সহিত ঘোষণা করিতেছি, দেশ-মান্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ফরিদপুরের রাজেন্দ্র-কলেজের বাকী চাঁদার জন্য বরিশালের জমীদার শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল ও চৌদ্দরশীর জমীদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়দিগের নামে আদালতে নালিশ করিয়াছেন। অন্য উপায়ে ইহার মীমাংসা হইলে আমরা সুখী হইতাম। দেশ-নায়কের ইহাতে কলঙ্ক হইবে।

(২১)

৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সেরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম, মীজাফর গ্রন্থ ও নবযুগ ও মহম্মদীর জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। দেখিতেছি, নবভাবে নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে মহাঘটার নব নির্ব্বাচন আসিতেছে। বায়ু কোন্ দিকে বহিতেছে? নব্যভারত, তোমার চক্ষে জল পড়ে কি?

(২২)

১৯২০—সেপটেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা নগরীর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জাতীয় মহাসমিতির অতিরিক্ত অধিবেশন কংগ্রেস বসিবে। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় মহাশয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জন (Non-co-operation) প্রস্তাব গৃহীত হইবে কি না, ইহাই প্রধান বিচার্য্য। কেহ কেহ বলেন, যখন তুর্কী-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তখন আর এ সব গোলে কাজ কি? অপিচ কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সহযোগিতা-বর্জ্জন (non-co-operation) প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কলিকাতা মডারেট দুর্গ, যাহাতে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, তৎপক্ষে সহায়তা করিবেন। কি হইবে, আমরা জানি না। দুই দলই ভিখারী, এত কাজ থাকিতেও কেহ কিছু করিবে না, কেবল ভিক্ষা চাহিবে। এক দল পা চাটিয়া, অন্য দল চোখ রাঙ্গাইয়া ভিক্ষা চাহিবে। দুই দলেই কিছু কিছু সত্য আছে। তবে আমাদের বিশ্বাস, স্বার্থচিন্তা, পদ-লালসা ও উপাধির পিপাসা এদেশে না কমিলে কিছুতেই কিছু হইবে না? প্রকৃত মনুষ্যত্ব

কোথায়? ফাঁকা উপাধির পশ্চাতে এত লোক ছুটাছুটি করে কেন? যত কিছু বল না কেন, ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে! হায় রে উপাধির পিপাসা ও পদগৌরব? লালসা!

(২৩)

ষ্টেটস্‌ম্যান-বর্জ্জনের কথা আবার উঠিয়াছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ইমামুয়েলের স্কুল শাসন ও কোন কোন হেড মাষ্টারের ছাত্র-নিগ্রহের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন উঠিয়াছে কি? সেই শিক্ষকগণ কোন্ ধাতুর লোক, যাঁহারা তিলকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের ন্যায় সৎকাজের জন্য ছাত্রপীড়ন করিয়াছেন? এদেশে প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকিলে, এত গালাগালির পরও কি ষ্টেটস্‌ম্যান চলিত? এটর্ণিদের একতায় ব্রাহ্মন শাসিত হইয়াছিলেন যে দেশে, সেই দেশে সুদীর্ঘকালেও ষ্টেটস্‌ম্যান শাসিত হয় নাই, এ কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই নাই। সহরে সহরে উদার ও বিবেচক ডেলিনিউসের কাটতি দেখিবে না, কাটতি দেখিবে, ষ্টেটস্‌ম্যানের কলঙ্কের উপর কলঙ্ক—এইরূপ রাশি রাশি কলঙ্ক ভারতকে মসীম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

(২৪)

দিনাজপুরের ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত ভুবন-মোহন কর মহাশয় পীড়িত হইয়া ভবানীপুর শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীটে পুণ্যশোক অন্নদা-বাবুর বাড়ীতে আছেন। অন্নদা বাবু তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন, আর ধন্য হইতেছেন, ভবানীপুর ১৫ নং পদ্মপুকুর রোডের ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, এল-এম-এস মহাশয়। দেবেন্দ্রনাথ, ১৯০৪ খ্রীঃ মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জ্জন ছিলেন, ১৯০৫ খ্রীঃ মেয়ো হাঁসপাতালে, ১৯০৮ খ্রীঃ বাঁকীপুর মেডিকেল স্কুলে এবং ১৯১০ খ্রীঃ কাউন্সৌলিতে রিসার্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎপরে ১৯১১-১৮ পর্য্যন্ত কটক মেডিকেল স্কুলে ভৈষজ্য এবং নিদানের শিক্ষক ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ভবানীপুরে আছেন। কটকে তাঁহার যে প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছিলাম, এবার তাহার চরম নিদর্শন পাইলাম। সে অমায়িকতাগুণে তিনি দেশপূজ্য, তাহার সহিত তিনি এবার ঋষি-সেবা ও চিকিৎসানৈপুণ্যের দ্বারা সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বের এক মুখে প্রশংসা করা যায় না। বিধাতা এহেন ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুণ।

(২৫)

৺চন্দ্রশেখর সেন—"বিগত ২রা আষাঢ় ১৩২৭, বুধবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির সুপরিচিত সদস্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় চন্দ্রশেখর বাবুর বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা দীর্ঘায়ু বলা যায়। কিন্তু মৃত্যুর সময়েও সেন মহাশয়ের কার্য্য সমাধা হয় নাই। সেন মহাশয়ের যখন প্রায় ৩৫ বৎসর বয়স, তখন তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। সে সময় তিনি আজীমগঞ্জে ডাক্তারী ব্যবসায় করিতেন। ইউরোপে প্রায় ৫ বৎসর থাকিয়া এবং নানা দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে তিনি নিজের চেষ্টায় এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া এদেশে প্রত্যাগত হন এবং প্রথমতঃ কিছু দিন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া পরে অনেক বৎসর বাঁকুড়াতে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কার্য্য তাঁহার প্রকৃতির অনুকূল ছিল না, সেজন্য তাহাতে তিনি বেশ পসার করিতে পারেন নাই। শেষ জীবনে তিনি কার্য্য

হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং প্রধানতঃ ধর্ম্ম চর্চ্চায় ও ধর্ম্ম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা যৌবন হইতেই ছিল। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু সে ধর্ম্মের গণ্ডী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে যোগদান করেন এবং শেষ জীবন ইহার আশ্রয়েই শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা বিষয়ে তিনি নানা স্থানে বহু বক্তৃতা করিতেন। এই সকল বক্তৃতার সরল ভাষায় ও সরল ব্যাখ্যানে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ উপকৃত হইত। কর্ম্মবাদ হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিভূমি স্বরূপ। থিওসফিক্যাল গ্রন্থেও ইহার বহু আলোচনা আছে। কর্ম্ম সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর বাবু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কর্ম্মতত্ত্বে তাঁহাকে ঘুণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জীবনের শেষ কাজ "কর্ম্মপ্রসঙ্গ" গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ আজ প্রায় এক পক্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ কতকটা লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাসের আশঙ্কা হয়, চন্দ্রশেখর বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে কর্ম্মপ্রসঙ্গের দ্বিতীয় ভাগের সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'ভূ-প্রদক্ষিণ' নাম দিয়া প্রকাশিত করেন। সে সময় এ গ্রন্থের খুব আদর হইয়াছিল। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে "কলিযুগ"। সেন মহাশয় তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির কর্ম্মঠ ও উৎসাহী সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতা "আনন্দ লজে"র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যও একজন সুলেখক ও সেবক হারাইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু সর্ব্বদা নিজকে 'সেবকাধম' বলিতেন। তাঁহার জীবনের কাহিনীতে দেখা যায় যে, তিনি অধম নহেন, উত্তম সেবক ছিলেন।"

ব্রহ্মবিদ্যা।

সাধু চন্দ্রশেখর নব্যভারতের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন; তিনি নব্যভারতে ধারাবাহিকরূপে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা নব্যভারতের অমূল্য সম্পত্তি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ভালবাসাও সদ্ভাব চিরদিন আমাদিগকে সজীব রাখিয়াছে। তিনি অগ্রে যাইবেন, আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে আমাদিগের নিকট বহু পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১২ খানি এখানে তুলিয়া দিলাম। এই পত্রকখানি তদীয় জীবনের ছায়ায় চিত্রিত। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে প্রাণে বেদনা পাইয়াছি, তাহা আমাদিগকে অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

(১)

ক্রিষ্টিয়ানা, ২৭শে জুলাই, ১৮৯১ খ্রীঃ।

শ্রীচরণেষু,

এই কার্ডখানি নর্থকেপে মধ্যরাত্রির ঘনীভূত সূর্য্যকিরণে দগ্ধ। পথ হইতে অনেকগুলি পাঠাইয়াছি। আপনাকে একখানি পাঠাই, রাখিবেন, চিহ্নস্বরূপ।

মহাতীর্থযাত্রা প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি। বড় তাড়াতাড়ি, কাজেই অনেক কথা উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, প্রাপ্তমাত্র যত শীঘ্র পারেন প্রকাশ করিবেন, কারণ অনেকে বিশেষ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন।

জীবনে যদি ঘুমন্ত ভারতের পাঁচজনকেও জাগাইয়া মরিতে পারি, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। আর একটী প্রবন্ধ পারিত এইখান হইতেই পাঠাইব।

চিরকাল ভিতরে একটা অগ্নি জ্বলিতেছে, কিন্তু ইউরোপে যখন যখন পর্য্যটন করি, বিশেষ এইবার, ধুধু করিয়া জ্বলিতেছে যে, শারীরিক মহাক্লান্তি, নিদ্রা হয় না; কেবলই ছুটিতে ইচ্ছা করে। মানসিক কার্য্য দ্বারা শরীর খুব খারাপ, তবু চিন্তা ব্যতীত থাকা যায় না। শেষে স্থির করিয়াছি, এইরূপ ভাবনা চিন্তা করিতে করিতে যতদিন এদেহ রাখিতে পারি; ইহার হাত এড়াইবার উপায় নাই এখান হইতে রুশিয়া রওনা হইব।

ভৃত্য শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

(২)

প্রাগ-জুবিলি একজিবিসন, ৯-৮-৯১

শ্রীচরণেষু,

বোহেমিয়ার রাজধানী এই প্রাগনগরে রাজাভিষেক উপলক্ষে প্রথম প্রদর্শনী হয়, ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, ১৭৯১ খ্রীঃ অঃ উহা হয়, তাহারই শত বার্ষিক একজিবিসন এই বর্ত্তমানপ্রদর্শনী। মন্দ হয় নাই, কলিকাতাপেক্ষা অনেক কাণ্ড বেশী, কোন কোন কাণ্ডে হঠাৎ ভ্রম হয় যেন পুনরায় পারিস মহামেলা। বোধ হয় লণ্ডন না পঁহুছিয়া প্রবন্ধাদি লেখা হইবে না। লাইপজিক ড্রেসডেন দেখিয়া পরে বিয়েনা যাইব। আপনি পত্রাদি লণ্ডনেই দিবেন, সেপেম্বর মাসের প্রথমেই সেখানে পঁহুছিব। বিয়েনায় সমস্ত পত্র পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছি।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৩)

কনষ্টাণ্টিনোপল, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৯১।

শ্রীচরণেষু,

ক্রমে কোথায় আসিয়াছি, পোষ্টকার্ডের দশা দেখিয়া পরিচয় পাইবেন, বাজারের অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু স্থান অতি মনোরম, Golden Horn, Bosphorus, Mormora প্রভৃতির দৃশ্যের সহিত পেরা, ইস্তাম্বুল, স্কুটারি, হাইদারপাশা, মারমোরায় একদ্বীপ প্রভৃতির সৌন্দর্য্য টাওয়ারের উপর হইতে এবং Golden Horn হইতে দুই ধারের দৃশ্য অতি চমৎকার, পৃথিবীর এক প্রধান দৃশ্যের মধ্যে পরিব্রাজকগণের এক বিশেষ আকর্ষণ "Constantinopla from Golden Horn" বলিতে বলিতে পর্য্যটকগণের জিহ্বায় লাল পড়ে। পৌঁছিয়াই পারের হাইদারপাশায় গিয়া কয় ঘণ্টা থাকিয়া মাতার ক্রোড় সম্ভোগ করিয়া আসিলাম, দীন দুঃখী হইলে কি হয়, তবু মা। মায়ের কেলা বড় মিষ্ট। এবারকার পর্য্যটনের শেষ ভাগে এক বড় মজা দেখিলাম, ইউরোপ কেমনে ক্রমে ক্রমে আসিয়া হইল, দেখিলাম, তাই গ্রীস হইয়া যাইবার ইচ্ছা আছে যে, আবার আসিয়া ক্রমে কিরূপে ইউরোপ হইল, দেখিতে দেখিতে যাইব। এ সকল কেবল বিধাতার কৃপায় ও আপনাদের চরণাশীর্ব্বাদে ঘটিতেছে। দয়াল হরির নিকট বিয়েনাতে খুব কাঁদিয়াছিলাম, বলের জন্য, নতুবা ক্লান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। ভয়ানক পরিশ্রম, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল ঘোরা।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৪)

শ্রীচরণেষু,

এথেন্স, ২৮-৮-১৮৯১

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে এখানে। পূর্ব্বে দেশের আর কেহ এখানে আসিয়াছিলেন কি না, জানিনা। কিন্তু একবার দেখিয়া যাওয়া অনেক ইউরোপযাত্রীর বিশেষ কর্ত্তব্য। এখানকার পূর্ব্বকীর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

পাইরিউক হইতে এখানে আসিতে হয়, সেখানেও অনেক দেখিবার আছে। সব কিন্তু, খুব নিকটে নিকটে গাইড দ্বারা ৬।৭ ঘণ্টায় দেখা হয়। এখান হইতে কোরিন্থ যাইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৫)

Hamburg Germany, ২৪-১৮-৯১

শ্রীচরণেষু

লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, ডেনমার্ক টুকু হইলে স্পেন পোর্ত্তুগাল ছাড়া এ দিকটা সব হয় তাই চলিলাম কোপেনহাগেনাভিমুখে, অদ্যই লুবেক যাইব। শুইডারজি পার হইয়া Harbingen, Gromingen ও Bremen হইয়া এখানে। এ পথে আসিয়া বিশেষ লাভ হইয়াছে। Gromingen Bibliothekএ মার্টিন লুথারের হাতের marginal notes শুদ্ধ একখানি Erasmus প্রণীত Bible আছে, তাহার মলাটে লুথার পাঠান্তে লিখিয়াছেন, লাটিন ভাষায়, "যদি জীবিত থাকি, তোমার বিড়ম্বনার কারণ হইব, আর যদি মরি তোমার যম হইব হে পোপ।" এদেশে এক পোপ একলুথার ঠাণ্ডা করেন, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে পথে ঘাটে অসংখ্য পোপ সুতরাং অসংখ্য লুথার চাই, ঐরূপ প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কাজ হয় না।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৬)

নাপোলি-Naples 5-9, 1891.

শ্রীচরণেষু

আথেন্স, কোরিন্থ, এফ্রো অর্থাৎ প্রাচীন কোরিন্থ বন্দর ও করফু দ্বীপ হইয়া পুরাতন বন্ধু ব্রিণ্ডিসি দিয়া এখানে। আর দুইবার এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু বিসুবিয়স শিখরে উঠা হয় নাই। এবার তাহাই সারিলাম। শিখরদেশে যে কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। craterএর পরে দাঁড়াইলে বোধ হয় পৃথিবী ধ্বংস করিবার জন্য বিধাতা এইখান হইতে বিনাশ আরম্ভ করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার খেলা। এস্থান এক বিশেষ তীর্থ। শিখরদেশে প্রধান active crater ছাড়া বাঁঝরার মত বহু স্থান ফুটা হইয়া অনবরত গন্ধক বাষ্প উঠিতেছে, কোন্ স্থান কখন নামিয়া যাইবে, কে জানে। এখান হইতে রোমে যাইব।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৭)

কোপনহাগন ডেনমার্ক

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১

শ্রীচরণেষু,

আজ কয়দিন এখানে। প্রথম দিন সমুদ্রতীরে বসিয়া এই গানটী স্বতই হৃদয়ে রচিত হয়, গানটী বারম্বার গাইয়া বড় সুখ পাই।

বলি মন্ তোরে, বলি মন্ তোরে,
আমার কথা শোন্।
যদি না শুনিস্ বিপদ্ হবে অনুক্ষণ ॥
এই সংসারের সার হরি, ভবভয় দুঃখহারী,
ভুলিস্ না, ভুলিস্ না রে তাঁর শ্রীচরণ।
আর একটী সার কথা, বলে রাখিরে হেথা,
সকল ধর্ম্মের সার জীবে দয়া মানব সেবন্ ॥
যদি শুনিস্ এই কয়টী কথা, কভু না পাবি ব্যথা,
পরম্ সুখে কাটাবি এই দুর্লভ জীবন্ ॥
শেষে অন্তিমে হরি বলে, (যাবি) ভবপারেতে চলে,
চিরসুখ শান্তির সেই নিকেতন্ ॥

আর অদ্য জগদীশ্বর বাবুর চৈতন্য জীবনী নব্যভারতে পাঠ করিয়া অজস্র প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করত বিপুল আনন্দ উপভোগ করিলাম। যখনই নব্যভারতে চৈতন্যজীবনী

পাঠ করিয়াছি, তখনই কাঁদিয়াছি (লণ্ডনে) কিন্তু প্রবাসের প্রবাসে আজ প্রথম। রাইন তীরে অন্যান্য অংশ পাঠ করি, ওটা পাঠ করি নাই। এইজন্য নব্যভারত এত চাই, কিন্তু আপনি যে বিষয়ে নির্দ্দয়। আর একদিন আমষ্টারডামের পারে একগ্রামে নির্জ্জন গোচারণের মাঠে উচ্চকণ্ঠে "দয়াল হরির কৃপা হলে পাষাণ ভাসে সলিলে "এই কয়টী কথা বারম্বার গাইয়া খুব সুখ পাইয়াছিলাম, কারণ ইউরোপে আসিয়া অবধি নির্জ্জনে চীৎকার করিয়া হরিনাম হয় নাই। দাদা-মহাশয়, বিধাতার কৃপা বহু প্রকারে ভোগ করিলাম, কিন্তু তাঁহার নামগানের অধিকার রূপ কৃপাপেক্ষা কৃপা দেখি না। কি বলিব, আমি পামর নরাধম, এ রসনা যে হরিনাম উচ্চারণ করিতে পায়. এই পরম সৌভাগ্য। প্রাণের অনেক কথা আছে, চরণে কাঁদিয় বলিব। এখান হইতে পরশ্ব Edinburgh, সেখানে ২দিন থাকিয়া লণ্ডন যাইব। Christiana হইয়া যাইব, এখানে ভ্রমণ আরম্ভ ঐখানেই শেষ। Spain, Portugal বাকী রহিল, তাঁর ইচ্ছা। বকেয়া নব্যভারত,যাহাতে পত্রাদি প্রকাশ হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পাঠাইবেন।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৮)

Octo, 1891, London.

আমি কল্য এখানে পৌঁছিয়াছি। আপনার পত্র ও বিদ্যাসাগর-নব্যভারত পাইলাম। মহাপুরুষের জন্য যে দেশশুদ্ধ লোক শোক প্রকাশ করিয়াছে, ইহা শুভলক্ষণ, সন্দেহ কি, Feeling of admiration এমনি করিয়া ক্রমে বাড়িলেই আবার উঠিতে পারিব, আশা হয়।

আপনাকে Continent হইতে কয়বার লিখিয়াছি, পুনরায় এখান হইতে লিখিতেছি। Paris Universal Exhibitionএর বৃত্তান্তের পর প্রদর্শনীর বাহিরের বাস্তীলাদির বিবরণ, Middle Temple রাজভোগ ও আমার পত্র যে কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠাইয়া দিবেন। পারিসের বিষয় শেষ করিতে পারিতেছি না, উহা না পাইলে।

আপনি একবার বিলাত আসিলে বড় ভাল হয়। আমার আর ৪ মাস দেরি আছে। এবার বোধ হয়, হয় না। Chicago Great World's Fair 1893 চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে, যদি দুইজনে একত্রে আসা যায়। এবার বিস্তর নোট করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মাথায় করিয়া আনিতে হইয়াছে। এ দেশে ত বেশ নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছি, দেশে গিয়া শরীর মন কি অবস্থায় পড়িবে, জানিবে। Continentএ কয় মাস খুব দেখিলাম, সর্ব্বত্র হোটেলগুলিতে জামাই আদর যেন কতকালের পরিচিত বন্ধু সকল, ইহারই নাম সভ্যতা। সাক্ষাতে অনেক বলিবার আছে, ইউরোপীয়দের সঙ্গে সমান তাল না ঠুকিতে পারিলে আমাদের ধ্বংস। এবারকার এই সমস্যা, এ যুগের এই বিধান।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(৯)

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২।

শ্রীচরণেষু

পর্য্যটনের পর লণ্ডনে আসিয়া ঘাড় তুলিবার অবকাশ ছিলনা। দ্বিতীয় কথা আমি মনে করিয়াছি, আপনি হয়ত আমার উপর রাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, রাগ অনেক দিন থাকিতে পারে না। স্পেন ও পোর্টুগাল দুইটী ইউরোপীয় দেশ বাকী ছিল, তাহা সারিয়া মরক্কো যাইব, তারপর আমেরিকা, হোনোলুলু জাপান চীন হইতে দেশে পঁহুছিব, এইরূপ মনে করিয়াছি, মালিক ভগবান। পথ হইতে যথা নিয়মে পত্রাদি দিব, তজ্জন্য ভাবনা নাই। এক কথা আপনাকে বলি নাই, কতকগুলি কঠোর সত্য কথা বলার জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাত্মারা বড়ই চটিয়া-

ছিলেন, যদি ঈশ্বর তাঁহাদের হাতধরা হইতেন, এতদিনে ভস্ম হইয়া যাইতাম। তাহা নাকি নয়, তাই দয়াময়ের দয়া আজও সম্ভোগ করিয়া চলিতেছি। লিসবন অতি রমণীয় স্থান, যত দেখিতেছি, ততই প্রীত হইতেছি।

VIGo (Spain) হইতে এখানে কলা আসিয়াছি।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(১০)

Niagara Falls. America,
29-3-92

প্রণাম নিবেদন মেতৎ

আটলান্টিকের ভয়ঙ্কর তুফানের মধ্য দিয়া পারে পঁহুছিয়াছি। মায়ের সাগর-রূপের ভীমা মূর্ত্তির ভীষণ লহরীর মধ্যে অতি মনোহর ছবি দেখিলাম। তুমুল তুফান চতুর্দ্দিকে নীল পর্ব্বত রাজি ফেনরূপ তুষার মস্তকে যেন বিরাজমান, মধ্যস্থলে আমাদের জাহাজে একবার একাত, একবার ওকাত, ডেকের উপর দিয়া ঢেউয়ের স্রোত চলিতেছে; এদৃশ্য মানবজীবনে দেখিবার জিনিস, অন্ততঃ একবার। তাঁহার কৃপায় এখানে পঁহুছিয়া তাঁহার শক্তিময় রূপের নাএগারা লীলাও অতি বিচিত্র দেখিলাম। Gib হইতে প্রবন্ধ ও পত্র পাঠাইয়াছি। পরে আর আর সংবাদ।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(১১)

Tangier. Morocco.
Africa, 29-2-92

Europe সারা হইল, "গোয়াডালকুইবার তীরে বসিয়া Guadalquiver তীরে Seville হইতে আপনাকে এক দীর্ঘ পত্র নব্যভারতের জন্য লিখি, পরে তাহা যে কোথায় গোলমাল হয়, আর পাইতেছি না। শেষটুকু বাকী ছিল, বলিয়া Gibralterএ ডাকে দিব, মনে করি। শেষে কাদিস (Cadiz) হইতে জাহাজে উঠিতে নৌকায়, তার পর জাহাজে তিনদিন ঝড়ের জন্য ফিরিয়া গিয়া পথে অপেক্ষা, তার পর Trafalgarএ ও তাহার পর প্রলয় তুফান, নানা বিভ্রাটে জিনিসপত্র সমস্ত ভিজিয়া একপ্রকার নষ্ট, কাগজপত্র একেবারে নাশ বলিলেই হয়। Cadiz to Tangier শেষে সাহারার খেজুর খাইয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম। এত ভয়ানক পথ জানিতাম না। স্থলতানী ডাকঘরের অভাব, English, French and Spanish তিন রকম ডাক। দৈবের উপর লোকের, Spanish and Moorদের অত্যাচার বড় কম না।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর।

(১২)

HONGKONG, 28-4-92

শ্রীচরণেষু

ভূপ্রদক্ষিণ প্রায় সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছি। জাপান হইতে Canton, Malac যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত গ্রীষ্ম আর পারি না, এদিকে ক্লান্তও হইয়া পড়িয়াছি। ৩০ সে এখান হইতে রওনা, পরে সিঙ্গাপুর পিনাঙ্গ হইয়া ১৫ মে নাগাদ দেশে পঁহুছিব। দয়াময়ের অপার করুণা, আমাদের অপরাধের সীমা আছে, তাঁহার দয়ার অন্ত নাই। ধন্য ধন্য তাঁহার কৃপা। বাস্তবিক পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইলেন। জিব্রলটার হইতে পত্র লিখিয়াছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর।

(২৩)

বঙ্গের গৌরব লর্ড সিংহ বেহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর হইয়াছেন, ঘোষিত হইয়াছে। ডেলি-নিউজ বলেন, "What is a gain to the admin stration is a loss to the nation." একথা সত্য। নূতন-নির্ব্বাচনে সিবিলিয়ানদের প্রভুত্ব কমিবে, যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। কেন না, লর্ড সিংহ বাদে অন্যান্য গবর্ণরগণ সকলই সিবিলিয়ান। তবে লেপটেনেণ্ট গভর্ণর স্থলে কেবল গভর্ণর পদ পাইলেন, এই মাত্র পার্থক্য। দুই দশজন দেশীয় লোক উচ্চ কর্ম্ম পাইলেই দেশ স্বর্গে পরিণত হইবে না। সফি, শর্ম্মা ও শত্রুর বড়লাট সভার মন্ত্রীত্ব পাওয়ায় বুঝা যাইতেছে, দলের লোক ভিন্ন অন্যকে নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক নহেন। লর্ড সিংহকেও গভর্ণমেণ্ট দলের লোক বলিয়া মনে করেন। জলে জল মিশিলে, তেলে তেল মিশিলে দেশের যে কি উপকার হইবে, আমরা তাহা বুঝিতেছি না। তবে গৌরব বটে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

বিষ্ণুপদ—শেষ।

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

ভেড়াঘাটের অহ্লন দেবীর লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চেদীশ্বর কর্ণদেব পাণ্ড্য, মুরল, কলিঙ্গ, ফের, হূণ প্রভৃতি বঙ্গাধিপতিগণকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ দেবের কর্ণবেল লিপি এই কথা বিশেষভাবে সমর্থন করে এবং চেদীলিপি হইতে আমরা সবিশেষ অবগত হই যে, কর্ণদেব গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য যে মহীপাল দেব তাঁহার রাজ্যকালের নবমবর্ষে কুরটপল্লিকা নামক গ্রামটী কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মা নামক কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই গ্রাম গোকালিক মণ্ডলে কোটীশ্বর বিষয়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া ঐ প্রশস্তিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। মদনপাল দেবের মনহলি লিপির দ্বারা ইহা অবিসম্বাদীরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, "কোটীশ্বর বিষয়" উত্তর বঙ্গে অবস্থিত ছিল; ইহার দিনাজপুর জেলার মধ্যে অবস্থিতি, আশ্চর্য্য নহে। বিহার হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী তেতারাঁওয়ায় উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তির অংসদেশে এক লিপিতে মহীপাল দেবের নাম পরিদৃষ্ট হয়।* ইহা মহীপাল দেবের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

মহীপাল দেবের স্বর্গারোহণের পর, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নয়পাল দেব রাজ্যারোহণ করেন; সম্ভবত তিনি ১০২৫ ও ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ৺বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলেন যে, ১০০০ হইতে ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি রাজ্যারোহণ করেন। নয়পালদেবকে পরবর্ত্তী কয়েকটী সংস্কৃত ও ভাষা পুস্তকে "নারায়ণ পাল" দেব বলিয়া উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। নয়পাল দেবের রাজত্ব বারাণসী ও তীরভুক্তির চ্যুতির পর সংকীর্ণ আকার ধারণ করিয়াছিল এবং উত্তর-ভারতের চেদীশ্বর গাঙ্গেয়দেব ও তৎপুত্র কর্ণদেব অনেকটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। ৺বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্ব প্রথমে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন যে, নয়পাল ও কর্ণদেবের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে নয়পাল দেবই বিশেষরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। নয়পালদেবের রাজত্বকাল ১৫ বৎসরের অধিক সময় স্থায়ী হয় নাই; ইঁহারই রাজত্বকাল মধ্যে দুইটী লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রথমটী "কৃষ্ণদ্বারিকা" লিপি। তাহা পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং দ্বিতীয়টী মদনপুর ৺পরমেশ্বর দয়াল বিষ্ণুপদ মন্দিরের সীমার মধ্যস্থ ৺নরসিংহ দেবের মন্দিরের ভিতরে আবিষ্কৃত করেন।*

* Ind, Ant. Vol. 14 p 105 Note 17.

* J. A. S. B. pt I (1900) p 191. Note I.

P. A. S. B. (1902) p. 66-67.

(২) কৃষ্ণদ্বারিকা লিপির নোট P. A. S.B. (1902) p 66-67 দেখ।

কৃষ্ণদ্বারিকা লিপি পাঠে জানা যায় যে, নয়পাল দেবের শাসনকালের পঞ্চদশবর্ষ মধ্যে শূদ্রক পুত্র বিশ্বাদিত্য নামক কোন নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্তান দ্বারা বিষ্ণুর মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই বিশ্বাদিত্য পরিতোষের পৌত্র ছিলেন এবং এই লিপির রচনা সহদেব নামক একজন শালিহোত্রজ্ঞের দ্বারা এবং ভাস্কর্য্য কার্য্য অধীপ—সোমপুত্র সত্তরোমের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই মন্দির সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাঃ ক্যানিংহ্যাম ও মেজর কীটো বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই লিপি পরে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা অনেকস্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও পাঠোদ্ধার করা দুরূহ নহে।*

এই লিপি একখণ্ড প্রস্তরের উপর গয়ার "দক্ষিণ দরোয়াজা" মহল্লার সন্নিকট "কৃষ্ণ দ্বারিকা" দেব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ দিকের গেটের দেওয়ালে আঁটা আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রায় একশত বা একশত দুই বৎসর পূর্ব্বে ৺দামোদরলাল ধোকড়ী নামক কোন বিশিষ্ট গয়ালী ৺কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবালয়ে ব্যবহৃত মাল মশলা প্রাচীন কোন মন্দিরের ভগ্নাবশে হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গয়া মাহাত্ম্যে বা বায়ুপুরাণে যে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি বিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই মন্দিরের প্রাচীন সংস্করণকে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। ইহা কদাচ বৌদ্ধ যুগের জিনিষ নহে। প্রাচীন জনপ্রবাদ ও পুরাকালের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া আমরা অবগত হইয়াছি যে, এই স্থানে যে একটী প্রাচীন ৺কৃষ্ণ ও ৺মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই ভগ্নাবশেষের উপর বর্ত্তমান মন্দিরটী গয়ালী ব্রাহ্মণটী নিজ নাম সংকীর্ত্তনের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই লিপি সম্বন্ধে জেনারেল ক্যানিংহ্যাম তৃতীয় ভাগ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া পুস্তকের ৩২নং প্লেটে ইহার প্রতিলিপি প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সভ্য জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত করেন। তাহার পর ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণীতে ডাঃ রাজেন্দ্রলালা মিত্র উল্লেখ করিলেও সম্যক্ পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। ১৯০০ সালের ৬৯ ভাগ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রথম অংশের ১৯০ পৃষ্ঠায় মদ্বন্ধু ও গয়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী যথাযথ পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। এই লিপি ১৮ পংক্তিতে কুটিল অক্ষরে লিখিত। এই লিপি ২১টি ভিন্ন ২ ছন্দে রচিত শ্লোকে শেষ হইয়াছে। এই প্রশস্তিতে এক মহাদ্বিজ পরিতোষের পৌত্র এবং শূদ্রকের পুত্র বিশ্বাদিত্যের দ্বারা ৺জনার্দ্দন ভগবানের মন্দির নির্ম্মাণের বিষয় সূচিত হইয়াছে। বাজি বিদ্যাবিশারদ অর্থাৎ "ভেট্" সহদেব দ্বারা এই প্রশস্তি রচিত এবং অধীপ সোমের পুত্র সত্যসোমের দ্বারা খোদিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা নয়পাল দেবের রাজ্যকালের পঞ্চদশ বৎসরে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়। নয়পাল দেব মহীপাল দেবের পুত্র এবং মগধরাজ

* J A S B 1900 pt-I p 184.

ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এবং ৺রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস-সম্পাদিত "টিবেটান ক্রনিক্‌লস্" আদি পুস্তক পাঠে আমরা সম্যকাবগত হই যে, এই মহারাজ নয়পাল দেব বঙ্গের গৌরব আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের (অতীব) সমসাময়িক ভূপতি ছিলেন এবং নয়পাল দেবের রাজ্যারোহণ কাল আমার মনে হয় যে, ১০৩০ ও ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হইবে। অতএব এই প্রশস্তি সম্ভবতঃ ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অবিসম্বাদীরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই লিপি পরে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ উন্নিদ্রনীল কমলাকরকায় কান্তিঃ স্বর্ণাভিরাম রুচির দ্যুতিপীত বাসাঃ। উদ্ভাসয়মান ইব কংসালয়া ঘনৌঘৌ বিষ্ণুঃ প্রিয়াদ্বয়বরেণ যুনক্তু যুষ্মান্॥(১)

২। ব্যানির্ম্মায় সমস্ত বস্তু সুখিনো বিপ্রান্ প্রজানাম্ পতির্যাম অধ্যাষ্ট ইব আত্মানৈব পরিতো মূর্ত্তি প্রপঞ্চম্ দধৎ। উত্তুঙ্গে; শরদভ্র শুভ্র শুচিভিঃ সৌধায়িকৃত অলঙ্কীর্ত্তির্ম্মোক্ষদ্বারং অনর্গলং জ ৩। গতি সা শ্রীমদ্ গয়া গীয়তে॥(২) বেদাভ্যাস পরায়ণ দ্বিজগণ উদ্গীর্ণ উগ্র পাঠ ক্রমাদ্ উচ্চৈরুচ্চারিতধ্বনী ব্যতিকরৈযত্নাবধার্য্য গিরাঃ। কিঞ্চ আযস্রিত হোমধূম-পটল ধ্বান্ত আবৃতৌ সাম্প্রতং ধর্ম্মো।

৪। যত্র মহাভয়াদর্হবকলেঃ কালস্য সমতিষ্ঠতে॥

অত্যাদৃতৈর্গুণরূপৈ ন রুনীল পদ্মনিশ্ছদ্ম সদ্মনিশতাং সুকৃতাভিমর্ষে।(৩) নিহার হার শরদিন্দু বিবুদ্ধ কুন্দ সন্দোহসুন্দর মহাদ্বিপ রাজ বংশে॥ ৪

৫। (১) অজাত লক্ষ্ম দ্বিজরাজ শেখরঃ সমন্ততো ভূবিবিভূতি ভূষণঃ বভূধবন্যো গিরিরাজ পুত্রিকা প্রিয়োপমৃয় পরিতোষ সজ্জকঃ॥ অনন্য সামান্য দিগন্তমন্দিরৈঃ ত্রিবর্গ সংসর্গি গুণাশ্রয়ৈর্জগৎ, শরৎশুদ্ধাধ্যাম গভস্তিতস্করৈঃ সমন্ততোযস্যযশোভিরাবৃতম্॥

৬। বংশস্থবিন। পরের শ্লোকও তাহাই।

দ্বিজবরবিনতানন্দননিরম্যঘটিকাঃ সমাশ্রিতো লক্ষ্ম্যা, তস্যতদনু তনুজন্মা মুরারিলুর ইব শূদ্রকো ভূতঃ॥* (৭)

৭। দুরোদ্যাতা শরৎ শুধানিধি শুদ্ধ কুন্দাভিরামচ্ছবিচ্ছায়ৈশ্ছন্নম্ অভূদ্যশোভিরভিতো যস্য ত্রিলোকীতলং। কর্পূরৈরিব পূরিতং মলয়জক্ষোদৈরিব আলেপিতং ক্ষুব্ধ ক্ষীরপয়োধিতুঙ্গলহরী লেহৈরিব আপ্লাবিতং॥† (৮)

৮। সত্যং ধর্ম্মসুতে স্থিরত্বং অচলে গাম্ভীর্য্যং অম্ভোনিধৌ বহ্বাশ্চর্য্যগুণাঃ মতিঃ সুরগুরৌ তেজস্বিতা ভাস্বতি। এতে সন্তি গুণাঃ পৃথক পরম

জিগীষা রসৈর্বিশ্বাদিত্যং অজীজনৎ সুতং অ

৯। সা বেভিঃ সমস্তৈঃ শ্রিতং॥ (৯) যস্তাপান্ত করঃ

শুদ্ধা নিধিরিব আপূর্ণঃ কলানাং গণৈর্যস্তুঙ্গাভ্যুদয়াশ্রিতো রবিরিব প্রৌঢ়ঃ প্রতাপোদয়ঃ। প্রত্যন্তকরং আভিবাঞ্ছিত ফল। যস্য প্রদানশ্রিভিঃ শ্লিষ্টো

১০। জঙ্গম কল্প বৃক্ষ ইব যো যাতঃ

১। বসন্ত তিলক।
২। শার্দ্দূল বিক্রিড়িতং।
৩। বসন্ত তিলক।

* আর্য্যা
† শার্দ্দূল বিক্রিড়িতং। ইহার পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকও এই ছন্দে রচিত।

সমস্তার্থিনাম্ ॥(১০) দোর্দ্দণ্ডদ্বয় চণ্ড বিক্রম কাশাদিগ্বাজি শৌর্য্যাদ্ভূতঃ ক্রীড়োন্মুলিত বৈরিবর্গ বিপিনঃ প্রৌঢ় প্রতাপারুণঃ বারি আলিসু যথাব্ধি রাপদিতথা প্রব্য

১১। ক্ত ধৈর্য্যক্রমঃ কিঞ্চ প্রাকৃত সর্ব্ব গর্ব্ববিমুখঃ সম্পৎ স্নানল্পাস্বপি ॥(১১)

শ্রীয্যান্যয়ব্যাসঙ্গো বিশদৃশ সমাচার বিকালো জনোমদ্যেনেব স্খলন্মুপহসঞ্চ ভজতে ইয়ং সা যস্য শ্রীঃসমুচিত বি

১২। লাসাভ্যুদয়িনী (১) যথার্থালঙ্করাঃ সমধিক জনানন্দ বিষয়ঃ ॥(১২) যস্যা-কৃত্রিম মেদুরাশ্রিত মহি পর্য্যন্ত সম্বাদিভি র্নৃত্যারম্ভ বিজৃম্ভনোদ্ধতভূজৈ রুদ্গীয়মানা জনৈঃ সানন্দোৎফুল্লকম্ বি

১৩। মানমস কৃদ্দেবৈর্বিলম্বাম্বরে শ্লাঘা ঘুর্ণীত মূর্দ্ধাভির্নিপাতিতৈঃ কীর্ত্তিঃ সমা (২) কর্ণ্য তে ॥(১৩)

সাভ্যসূয় পরিতোষ লেশতো ভিক্ষিতানি শনকৈঃ সকটাক্ষং যস্য বিদ্বিড্ অনুকুলকুলানি প্রাপ্নুবন্তি নিধ (১)

১৪। নানি ধনানি ॥ ১৪) নিনাদন্তি-দন্তি-বর হন্তি যানি কুচিতানি তানি চ দুরুন্নয়া নি অতিমন্দ মন্দগতি গহ্বরাসু নিবসন্তি সন্তি গিরিকন্দরাসু (২) ॥(১৫) সন্ততেন ততেন তেজসা দুর্ন্নয়স্য নয়স্য বিদ্বি

১৫। ষাং। আকুলানি কুলানি হর্গমাদু-র্গতানি গতানি দুর্গমং (৩) ॥(১৬) সপ্তাম্বুরাশি বিশরৎ শ্লথমেখলায়াযস্যা বভূবঃ কতি ন ভূমিভূজো বভূবুঃ। সিদ্ধিং নকস্যচিদগাৎ যদনল্পকল্পৈস্তেনাত্রা কীর্ত্তণ মকা।

১৬। রি জনার্দ্দনস্য (৪) ॥(১৭)

কৈলাশাচলশৃঙ্গসম্ভ্রমং অধঃকুর্ব্বৎ প্ররূঢ়ো-দয় প্রালেয় দ্যুতিকুন্দসুন্দরযশপুঞ্জোপ মেয়াকৃতি। যত্রোত্তুঙ্গশিখাগ্রসঙ্গতশরচ্চন্দ্রাং শুশুভ্রশ্রিভির্মুঞ্চন্নূতনমঞ্জরীরিব পতা ॥১৭ কা ভির্নভো রাজতে (১) ॥১৮ বাজি বৈদ্য সহদেব নিরুক্তিঃ তৎপ্রসরিস্তিয়মস্তুনিতান্তং প্রেম সৌহৃদসুখৈকধরিত্রী সজ্জনস্য হৃদয়ে রমনীব (২) ॥(১৯) শ্রীমতোঽধীপ সোমস্যাত্ম-জেনর্জ্জিতং যস্য।

১৮। উৎকীর্ণ কর্ম্মণি শ্রীমৎ সত্যসোম শিল্পিনা (৩) ॥ (২০)

সমস্ত ভূমণ্ডল রাজ্য ভারমবিভ্রতি শ্রীনয় পাল দেব বিলিখ্যমানে দশপঞ্চ শঙ্খ্য সম্বৎসরে সিদ্ধি মগাচচ কীর্ত্তি (৪) ॥ (২১)

এই পরবর্ত্তী নৃসিংহ দেবায়তনে প্রাপ্ত নয়পাল দেবের লিপি পাঠে জানা যায় যে, ইহা ৺গদাধরের মন্দির নির্ম্মাণ ও তৎনির্ম্মাতার নাম ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ-গণের বিবরণ বিশেষরূপে লোকসমক্ষে উদ্গীত করিয়াছে। বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মাণের কাল এই লিপি হইতে প্রকটিত হয়। ইহা নৃসিংহদেবের মন্দিরের অভ্যন্তরে মদ্বন্ধু ৺পরমেশ্বর দয়াল কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৺নৃসিংহদেবের মন্দির ৺গদাধরের মন্দিরের পিছনেই অবস্থিত এবং উভয় মন্দিরই রাণী

(১) শিখরিনী
(২) শার্দ্দূল বিক্রিড়িতম্
১। প্রথমচরণ রথোদ্ধতা ; দ্বিতীয় চরণ স্বাগতা।
২। জনতি।
৩। অক্ষরাবতি।

৪। বসন্ততিলক।
১। শার্দ্দূল বিক্রিড়িত।
২। স্বাগতা।
৩। অনুষ্টুভ।
৪। উপযাতি।

অহল্যাদেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, বর্ত্তমান বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। ৺গদাধরের এবং ৺নৃসিংহদেবের বর্ত্তমান মন্দির সম্ভবতঃ বিশ্বরূপ নির্ম্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ মাল মসলা ইষ্টক প্রস্তরাদি লইয়া গঠিত বলিয়া আমার অনুমান কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের মত মনে হয়।*

নৃসিংহদেব-লিপি।

১। (১) ওঁ লক্ষ্মী-শশ্চির ঞ্জয়তি বারিনি-ধেরনেক মন্থাকুলাদধিগতা পুরুষোত্তমস্য। স্নিহ্যত্তিরোবলিত সম্মদ ঘূর্ণমান নেত্রাব লোকন নিরস্ত সমস্ত বিঘ্নাঃ ॥

২। সেঽয়ম্ ব্রহ্মপুরী গয়েতি জগতি খ্যাতা দ্বয়ম্বেধসা স্থাতুম্ ব্রহ্মবিদাম্পুরী। ব ঘটিত মোক্ষস্য সৌখ্যস্য চ ব্রূমহঃ কিঞ্চ ভবন্তি যত্র পিতরঃ প্রেতা

৩। লয়াবাসিনঃ পাদস্পৃষ্টজলপ্রদান বিধিনা নাকাঙ্গনা নায়কাঃ অস্যাম্ বভূব পুরি বক্রগতির্দ্বিজিহ্বঃ। সম্রাড ভুজঙ্গ রিপুবচ্যুত পাদসেবী। যো ৪। নাম বিষ্ণুরথ বৎ দ্বিজরাজবর্য্যঃ প্রীত্যা সতাঞ্চ পরিতোষ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ তস্মাদ্ বিধেরিব বভূব সনৎকুমারঃ শ্রীশূদ্রকো বিমল বুদ্ধির নেকবিদ্যঃ।

৫। ভূয়োপি যেন বিধিনৈব কৃতা গায়েয়ম্ বাহোর্বলেম সুচিরং পরিপালিতা চ ॥ তস্মাদ্যায়ত সুতঃ সুতবদ্দ্বিজানাং যোঽভূৎ সুবিস্ময় রসা বহকর্ত্তক ৬ শ্চ ॥

বিশ্বাপকারক নিরাকৃত যেবতীর্ণঃ শ্রীবিশ্বরূপ ইতি কীর্ত্তিত বিশ্বরূপঃ ॥ (৩) যং প্রাপ্যচার্থি জনবৃন্দমকল্পদানমাবির্ভবৎ পুলক-জালমনন্ত মোদং। স্ফীতিস্ফুরদ্ধন কৃতার্থ তয়া দুরাপ চিন্তামণি গ্রহণকম্ নকদাপি দদ্ধৌ ॥ যেনা সুরারি চরিতেন মহোদয়েন যান্তিরসা তলমিবাবনি ৮। রুদ্ধতেয়ং শ্রীমদ্ গয়া কলিমল দ্বিজরাজ পক্ষ সংক্ষোজকাম্প ততনু ভুজবিক্রমেণ ॥ যশ্চৈ বিশুদ্ধ চরিতায় নিসর্গ সৌর্য্য রাশি প্রিয়ায় বি

৯। নয়ামল ভূষণায় আবাল্যতঃ প্রভৃতি দেব মনুষ্য লোকো বদ্ধাঞ্জলি শ্চিরতরং স্ফুহয়াঞ্চকার ॥

তেনেমাঞ্চ গদাধরাদি নিলয়ব্যাজেন তাঃ কীর্ত্তিঃ স্বেতাশোরিবরশ্ময়ঃ সুঘটিতাঃ সন্তাপশান্তৈ সদা যত্রাম্ভোনিধিবীচিবদ্দশ দিশাং প্রক্ষালনৈ কচ্ছতাং পাতাল প্রতি বাসিঘোর তিমির প্রদ্ধং স। দীপার্হব ॥ এতাঃসন্তু গয়াপুরী সুতরুনী ভূষাবলী কীর্ত্তয়ো যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌচ গগনং শ্রীবিশ্বরূপাহ্বয়ঃ কর্ত্তাসাঞ্চ তথাপুরাণ পুরুষাং রাজ্ঞোপিধিকৃত্য সদ্যেনাকস্মিক বিস্ময়ৈক রসিকো মুহুর্মুচ্ছিতঃ।(৪) দাক্ষিণ্যা দুপরুদ্ধেন প্রীতিস্তিমিত চেতসা। ১৩ প্রশস্তি রোষা বিহিতা বৈদ্যঃ শ্রীবজ্রপাণিনা ॥ বিজ্ঞান কৌশলোল্লাস বাতনৈপুনকর্ম্মণা প্রশস্তি রেষা লিখিতা (৫) সর্ব্বানন্দেন ধীমতা ॥ ক্ষীরাম্ভোনিধিমথ ১৪। লাখ-নিত্যণালঙ্কৃতীয়াত্তুবো ভর্ত্তুঃ শ্রীনয়পাল দেবনৃপতে রাজ্যশ্রিয়ঃ বিভ্রতঃ সবৃত্তেতরসৈব পঞ্চদশমে রাজ্যস্য সম্বৎসরে, কীর্ত্তিঃ সিদ্ধিমুপগতা ভগবতঃ ১৫ শ্রীমদ্ গদাধারিণঃ ॥

* Proc A. S. B 1902 pp 66-67.

(১) বসন্ত জ্ঞেয়ং বসন্ত তিলকং তভজা জগৌগঃ।
(২) ইন্দ্রবজ্রা।

(৩) বসন্ত তিলক।
(৪) অনুষ্টুভ।
(৫) শার্দ্দূল বিক্রিড়িত।

এইখানে বলা আবশ্যক যে, নয়পাল দেবের আত্মীয় স্বজনের বিষয় ইতিহাস বা প্রস্তরলিপি আদি অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালদেব তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনাধিরোহণ করেন। আমার মনে হয় যে, গয়া নগরে যাবতীয় লিপি অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নয়পাল দেবের রাজ্যকাল কৃষ্ণদ্বারিকা এবং গদাধর লিপি উৎকীর্ণ কালের বড় বেশী দিন পরস্পর্যান্ত থাকে নাই এবং ১০৪৬ ও ১০৫০ সালের মধ্যেই শেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চক্রদত্তের টীকা হইতে আমরা অবগত হই যে, চক্র পাণিদত্ত তাঁহার সূপকারও রন্ধনশালা পরিদর্শক ছিলেন। (১) রাজ্যারোহণ করিয়া তৃতীয় বিগ্রহ পালদেব তাঁহার পিতৃ শত্রু চেদীশ্বর কর্ণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। বিগ্রহপাল দেবের প্রথম রাজ্য কাল বহু ঘটনাযুক্ত যুদ্ধ বিগ্রহে পরিপূরিত; এক দিকে তিনি চন্দেলারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার দ্বারায় আক্রমিত, অপরদিকে চেদীশ্বর কর্ণ দ্বারা নিগৃহীত, অন্য দিকে মালব রাজ উদয়াদিত্যের দ্বারা বিধ্বস্তীকৃত এবং অপরদিকে আনাহলওয়াররাজ ভীমসেন কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইলেও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের উচ্চ শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারত করকবলায়ত্বীভূত করিতে বিস্মৃত হন নাই। পালরাজের সহিত শেষ যুদ্ধে সম্রাট কর্ণদেব সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া সন্ধির জন্য প্রার্থী হইলে স্বীয় অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা যৌবনশ্রীকে পালরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া অব্যাহতি পান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত "রামপাল চরিত" পাঠে আমরা ইহা সবিশেষ অবগত হইতে পারিয়াছি। কর্ণদেব ও তাঁহার পুত্র প্রায় শত বৎসর রাজদণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পরিচালন করেন। বিগ্রহপাল দেব কেবল মাত্র ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অধিককাল রাজদণ্ড পরিচালন করিতে থাকিলে, বোধ হয়, পাল রাজ্য আরও কিছু অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিত, কিন্তু ভগবানের তাহা ঈপ্সিত নহে বলিয়া আন্তর্গণিক বিবাদ, তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে আত্মকলহ, সামন্ত চক্রের স্বাধীন হইবার স্বতই চেষ্টা ও কূটনীতিজাল বিশাল পাল রাজত্বকে ক্রমশঃ অন্তঃসার-শূন্য করিতেছিল। পাল রাজ্যের অবনতি-স্রোত এই সময় হইতেই আরম্ভ হয় এবং এই অধোগতি কোনরূপেই বারিত করা যাইতে পারে নাই। যে সকল দেশ ও রাজ্য এই সময় বিশাল পাল রাজত্ব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, কোন পরবর্ত্তী পাল নৃপতি সেইগুলি পুনর্বিজয় বা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন নাই; কাজেই পাল রাজত্ব ক্রমশই শনৈঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

বিগ্রহপাল দেবের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ লিপিগুলির মধ্যে দিনাজপুরের অন্তর্গত আমগাছীতে প্রাপ্ত তাম্রানুশাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কিন্তু ইহার বিষয় আমার বলিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। তাহার পর গয়ানগরের মধ্যে মাড়নপুর গ্রামের অন্তর্গত অক্ষয়বট তীর্থের মধ্যে প্রাপ্ত "অক্ষয় বট" লিপি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই

(১) কায়স্থ পত্রিকা—১৩২৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দেখ, ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কৃত "চক্রপাণি দত্ত" নামক পুস্তক দেখ।

লিপি পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্যকালের পঞ্চমবর্ষে ৺বটেশ্বর লিঙ্গ এবং ৺প্রপিতামহেশ্বর শিব লিঙ্গদ্বয় নির্ম্মাণের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে। কানিংহাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টের তৃতীয় ভাগে এই লিপি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। প্রপিতামহেশ্বর শিব লিঙ্গ খর্পর গয়া শ্রাদ্ধের অন্তর্গত এক বেদী হইতেছে। বহু হিন্দু এইখানে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন। এই লিপি স্থানে স্থানে নষ্ট হওয়ায় শুদ্ধরূপে উদ্ধৃত করা গেল না। যতদূর পারিয়াছি, মূল হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

অক্ষয়বট লিপি।

১। ওঁ ওঁ নমঃ শিবায়॥ গয়াভাণ্ডাগারং নিরবধিজগদ্দোষ বিজয়ি স্ফুরদুজ্জ্বজ্ঞানজ্যোতিঃপ্রসরনিহতধ্বান্তনিচয়ং কিমপ্যন্তঃ শান্তম্ সহজসুখ পীযুষ লহরী। .....

২। রুদ্রায়মস্মোহরতু বঃ॥ আসদ্ধারা কলঙ্কান্ প্রতি বপুষইব ব্রাহ্মণান্ অজ্জল্পা, স্বর্গদ্বারাধিরোহামৃতপদসুখপ্রাপ্তয়ে প্রেত্যভাওঃ। সাক্ষাৎ সংসার ভূষাব।.....

৩। শ্রীমদ্ ভূমিং শশ্বৎ ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীনিলয়মিব পুরীম্ শ্রীগয়ামেবচক্রে॥ (১) গয়ায়ামেতস্যাং পুরি সকল সৌন্দর্য্য নিলয়ে দ্বিজাতীনাং মান্যোদ্বিজবাদ সরোজাত.....

৪। ম কেয়া পরম পরিতোষস্য জননাদ্ অভূদ্বংশ্যা শ্রীমান্ স খলু পরিতোষাহ্বয় ইতি॥ তস্মাদ্ভূজ্জলনধেরিব শীতরশ্মিঃ শ্রীশূদ্রকোবিমলকান্তিরনন্তলক্ষ্মীঃ।

৫। কণ্ঠশ্রবাভিরামং, আনন্দিতানি যশসা ভুবণান্তরাণি॥ (২) আসাদ্য-

১। শার্দ্দুল বিক্রিড়িত।
২। ইন্দ্রবজ্রা।

মরবাজরাজ্যপদবীং দেবীভিরাক্রীড়িতম্ দিব্যাঙ্গৈরুপগীয়মানচরিতং নন্দীশ্বরাদ্যৈর্বৃতঃ। মনঙ্গদর্পদলনোদ্যতৈরেকমোদং বপুঃ। .....

৬। স্তি কৌতুকরসাং মর্ত্ত্যোহবতীর্ণ স্ততো, জাতোদেবকুণার মূর্ত্তিরসমঃ শ্রীবিশ্বরূপাহ্বয়॥ যো বিশ্ববন্ত সমস্তবৈরিনিবহঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলঃ সৌজন্যস্য নিদান। .....

৭। ম কেজিদ্রুমঃ সাদ্রানন্দ ময়ো নিসর্গমধুর ব্যাহাররত্নাকরো দীনানাথবিপন্নচারণগণত্রাণায়চিন্তামণিঃ॥ গণ্ডস্থলে মৃগমদা মলপত্রভঙ্গান্ বৈবরং।.....

৮। লেখনীভিঃ অদ্যাপি যস্যসুরকিন্নরগীনাংমায়াং দেব্যঃ শীলাসু বিজয়স্তুতিমালিখন্তি॥ (৩) ধর্ম্মেণোৎসবসিতং মুদাবিহসিতং সংলোকমর্য্যাদয়া ত্রৈগ্যা বিস্ফুরিতং।.....

৯। ত্রিভির্জ্জৃম্ভিতং। যস্মিনা স্বামিনি সর্ব্বতঃ সমুদয়ে তেপ্যর্থিনঃ সাহসম্ সাক্রানন্দময়া স্বদৈন্যবিরহান্নত্যন্তি পূর্ণাশয়াঃ॥ নোচ্চৈশ্চণ্ডকরোনচাপি বিগত।.....

১০। তেনাস্তম্ যাতি যদাত্মভিঃ প্রতিহতোনাস্যৈরপূর্ণোভবঃ। জিহ্বাগ্রেণবিনাগসঃ প্রতিমুহুর্ত্তাপস্থিরানগ্রহীন্ নৈবাসঙ্গদিগন্ধরৈকনিরতো যো বিশ্বরূপঃ। .....

১১। মরাধিপোপিচকিতো ব্রহ্মাপি যদ্বিস্মিতোদেবো বিষ্ণুরপি স্ফুটং বিহসিতো রুদ্রোপিরোমাঞ্চিতঃ। উদ্দাম প্রসরৎপ্রসন্নবহুলে যৎকীর্ত্তিকল্লোলিনী গম্ভীরান্তসি-মজ্জ।.....

১২। পি সম্বোধিত॥ যর্দ্দুগমম্ সরতি দুরতরং দুরীপং যচ্চেতসা। যং লব্ধ.....ত.....আসীৎ। সহস্র .....

৩। বসন্ত তিলক।

শ্রীমবিরাহন চতুর্দ্দিগ্যামারম্ভরাম ইতি যঃ স্ফুটতামুপেতঃ॥ অস্যাং ভু।.....

১৩। পা ধর্ম্মেণ মর্য্যাদয় রাজ্য শ্রীভির লক্ষ্ণতাঃ পুনরমীভোগৈকদা শ্রীবির্ম্মাবিধে (?) এষ কীর্ত্তন কথা গীয়।.....

১৪। কীর্ত্তি.....ত্বাং বিস্ময়কর..... আপি শৌর্য্যাদসৌ.....ন্ত নি..... শ্রীরপি..... সিদ্ধি.....পুনরী-দৃশী ..... ভবতিকিং শ্রীবিশ্বরূপোদ্ধতরেখেব প্রতৈপ।.....

১৫। যত্তে আদ্ভুতা। অস্যৈব..... প্রপিতা মহস্য মহতীমস্থাপ্যকীর্ত্তিং..... ততঃ সাধিতঃ। উদ্ধতার্থি নিসর্গধর্ম্ম নিরতো যো।.....

১৬। ... .সিদ্ধিমনয়ৎ তামেব কীর্ত্তিং পুনঃ। কিং ব্রূমঃ.....যস্যাসাধুগুণস্য নাস্তিমহতঃ। কিন্ন।.....

১৭। রাশিঃসুবিশৃতবয়োচেনাকস্মিক বিস্ময়েন মুখরালোকঃ কর্ত্তুরগ্রি নিবসনঃ, স্ফুরদ্ধারাগারম্ বিসৃজ।.....

১৮। ব্যাম্বর সঞ্চর তৃপ্তিবর্হুনোজ। প্রশমনং সুরাভাণ্ডং জলদঃ॥ কনকেশ্বর জলদঃ শ্রীবিশ্বরূপাবরো।..... .....

১৯। তা সদাচরৌসুবিধিতঃ শ্রীসৎকুলা সর্ব্বশ সৎকুলাদৃতোহক্ষয় বত্রেচো দেয়ো-বটেশাহ্বয়॥ ইত্যাদ্যাস্মনোনুরূপ রচনা-রর্ত্তা।..... ম।.....

২০। জ্ঞাং চষঃ। যেনাত্যদ্ভুত বিক্রমেণ তরসা শ্রীমদ্গয়ামণ্ডলে আসন্সারমুদগ্রধর্ম্ম বিজয়স্তম্ভাইবো রোপিতঃ॥ তেনাই..... .....

২১। ল বিষমম্ নীরাহাবতারান্তুতং॥ কীর্ত্তিঃ শ্বেতগভস্তিহস্তরচিতে ইতি রাজতাং দেবস্য প্রপিতামহস্য শ্রীই..... .....

২২। তি নামধেয়। সত্ত্বেব ধ্বনিনঃ কিম্বা বাহু ব্রূমহে। কিংত্বিদৃগ্ যদি কীর্ত্তনম্ ভগবতঃ —কেনাপি নিষ্পাদিত শ্রীবিশ্বা বি ....

২৩। যঃ স্বত্বপমোক্ষ (?)।—যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ সুরসরিদ্ধাত্রী নভোমণ্ডলম্। কর্ত্তুং কীর্ত্তিকদম্ব (?) স বিজয়ী শ্রীবিশ্ব রূপাহ্বয়ে.....

২৪। গণিতু মালঙ্কায়িতো ভগবান্ ভর্ত্তুবিগ্রহপালদেব নৃপতে রাজ্যশ্রিয়ং বিভ্রতঃ। সম্প্রাপ্তে তরসৈব পঞ্চ গণিতে রাজ্যস্য সম্বৎসরে .....

২৫। বিশ্বাদিত্য গুণোৎক্ষেপ প্রীতি স্তিমিত চেতসা

.....

২৬। প্রশস্তি বিহিতাচৈষা বৈদ্য শ্রীধর্ম্মপাণিনা।

এইখানে বলা আবশ্যক যে, ৺গদাধর দেবের মূর্ত্তির নিম্নে যে একটী লিপি দৃষ্ট হয়, তাহা এই রাজার রাজ্যকালে উৎকীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ইহা প্রায় অধিকাংশই চুণ বালিতে ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা অপসারণ করিলে সমগ্র গয়াবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়ে তীব্র আঘাত লাগিবে বলিয়া সম্পূর্ণ লিপিটী উদ্ধার করা যাইতে পারিল না। এই লিপির লিখন প্রণালী ৺প্রপিতামহেশ্বরের "অক্ষয় বট" লিপির অনুরূপ বলিয়া ইহা বিগ্রহপাল দেবের সময়ে উৎকীর্ণ বলিয়া আরোপিত হইয়া থাকে। এই লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

গদাধর লিপি।

১। ওঁনমো মার্ত্তণ্ডায়॥ জাগর্ত্তি যস্মিন্ দিতে প্রযাতি চাস্তস্তশেতে জনতা সমস্তা। ত্রৈলোক্য দীপং তমনন্ত মূর্ত্তি। মব্যাহতা ভংশরণং প্রযাত॥ (১)

২। সেয়ম্ ব্রহ্মপুরী গয়েতি জগতি খ্যাতা স্বয়ং বেধসা স্থাতুং ব্রহ্মবিদাং পুরীব ঘটিতা মোক্ষস্য সোখা স্ত চ।

৩। ব্রূমহ কিঞ্চ ভবন্তি যত্র পিতরঃ প্রেতালয়া বাসিনঃ পাদস্পৃষ্ট জল প্রদান বিধিনা নাকাঙ্গনা নায়কাঃ॥ অস্যাম্ব

৪। ভুব পুরি বক্রগতি দ্বিজিহ্বঃ। সম্রাট ভুজঙ্গরিপুরচ্যুতি পাদসেবী। যো নাম বিষ্ণু রথবৎ দ্বিজরাজবর্য্য প্রীত্যা সতাঞ্চ পরিতোষ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥ তস্মাদ্ বিধেবিব বভূব *

(১) ইন্দ্রবজ্রা।

* এই সকল লিপি পাঠে বিগ্রহ পাল দেবের আত্মীয় পরিজনগণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিগ্রহপাল দেবের তিন পুত্রের বিষয় আমরা ঐতিহাসিক গবেষণায় জানিতে পারি। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় সুরপাল এবং দ্বিতীয় মহিপাল দেব, মথন দেব ও সুবর্ণ দেবের ভগ্নী রাষ্ট্র কূট রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র হইতেছেন এবং ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রামপাল দেব, যাঁহার যশোভাতি ও কীর্ত্তিকলাপ সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত কাব্য অদ্যাবধি জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিতেছে। চেদীশ্বর সম্রাট কর্ণদেবের কন্যা যৌবন-শ্রীর গর্ভজাত সন্তান হইতেছেন। রাম পালদেবের তিনপুত্র রাজ্যপাল দেব, (পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন) কুমারপাল দেব এবং মদন পাল দেবের পুত্র তৃতীয় গোপাল দেবের সময় হইতেই বিশাল পাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের চরম সীমায় পঁহুছিয়াছিল। ইহাদিগের বিষয় সামান্য ২।৪ কথা পরে বিবৃত করিব।

তৃতীয় বিগ্রহ পালদেবের স্বর্গাধিরোহণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেব সিংহাসনে উপবিষ্ট হন; কিন্তু তাঁহার অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা রাজ কার্য্যে শৈথিল্য মাৎস্য ন্যায়ে প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জ ও সমগ্র সামন্তচক্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পাঠক এই সময়কায় জ্বলন্ত ইতিহাস রামচরিতে পাঠ করিতে পারেন।

পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গবেষণা এই লিপিটীকে গোবিন্দপাল দেবের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ বলিয়া স্থির করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিয়াছি।

মহিপাল দেব তাঁহার প্রাচীন বা নব্য-মন্ত্রি সম্প্রদায়ের সৎপরামর্শ, সামন্ত চক্রে সদুপদেশ, গণনায়ক ও গোষ্ঠীপতিদের সহানুভূতিসূচক নীতি বাক্য এবং প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক আবেদনাদি আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া সদাই সন্দিগ্ধ মনে খললোকের সাহচর্য্যে দিন যাপন করিতেন। কবি বিল্‌হণের বিক্রমাঙ্কদেব চরিত নামক সুন্দর পুস্তক পাঠে আমরা এই সময়ের সমসাময়িক অনেক কথা জানিতে পারি। কোন কোন কূটাভিসন্ধির লোক রাজার কর্ণে এই মিথ্যাপবাদ প্রবেশ করাইয়া দেয় যে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদ্বয় তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবে; মহীপাল দেব সন্দিগ্ধচেতা লোক ছিলেন, তাহা আগেই বলেছি; তিনি তাঁহাদের কারারুদ্ধ করেন। এই সকল ঘটনা "রামপাল চরিত" নামক পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। এই সময়ে সমস্ত চক্রের অন্যতম মাহিষ্যরাজ দিব্ব্যোকের অধিনায়কত্বে সমগ্র বরেন্দ্রী স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া মাহিষ্য ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা সমগ্র জগৎ সমক্ষে

তারস্বরে প্রচারিত করিল। মহীপাল দেব এই ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী, সামন্ত চক্রের শাসন মানসে সামান্য সৈন্য লইয়া প্রয়াস করিলেন বটে, কিন্তু বীরবর দিব্বোকের সুশিক্ষিত অস্ত্র ও শস্ত্রবিশারদ বিপুল বাহিনীর সমক্ষে মগধরাজ-শক্তি পরাজয় স্বীকার করিল; মহীপাল দেব স্বীয় রক্তে তর্পণ করিয়াও পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং যুদ্ধে হত হইলেন। মহীপাল দেবের মৃত্যুর পর রামপাল দেব কারামুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পাল বংশের বন্ধু ও পোষক ও সহকারী প্রজা ও মন্ত্রীবৃন্দ মহীপাল দেবের ভ্রাতা দ্বিতীয় সুরপাল দেবকে সিংহাসনাধিরূঢ় করাইলেন এবং এই ঘটনা আমরা মদনপাল দেবের মনহলি লিপি হইতে জানিতে পারি। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার রামপাল-চরিতে দ্বিতীয় সুরপাল দেবের রাজ্যারোহণের কথা সম্ভবতঃ অনবধান বশতঃ আদৌ উল্লেখ করেন নাই। মনহলি লিপিতে প্রথম গোপাল হইতে মদনপাল দেব পর্য্যন্ত যাবতীয় পাল রাজগণের তালিকা আমরা পর পর দেখিতে পাই। সুরপাল দেব কবে রাজ্যারোহণ করেন এবং কবেই বা তিনি রামপাল দেব কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত ও হত হন, তাহার সময় ও কালের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস আমাদের সমক্ষে অতীতের রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া জলন্ত চিত্রে প্রদর্শন করিতেছে যে, কেবল বিলাত বা ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক ভাই বা খুড়া তাঁহার সমকক্ষ ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিভৃতে হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণে কণ্টক দূর করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন নহে, সুদূর বৌদ্ধ যুগেও এরূপ অভিনয় এই বঙ্গের ও মগধের ইতিহাসে সে দৃশ্য বহুপূর্ব্বে অভিনীত হইয়া গিয়াছে, তাহা পরে দ্রষ্টব্য।

যাহা হৌক, জগতের ইতিহাস ঘটনা-বলীর পুনরাবৃত্তি জ্ঞাপন করে, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন; মহীপাল দেব শেষ জীবনে আওরঙ্গজীবের মত এমন উচ্ছৃঙ্খল ও সন্দিগ্ধচেতা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের কোমল প্রাণে অশেষ যাতনা ও কারাক্লেশে ব্যথিত করিতে বিরত হন নাই। এদিকে মাহিষ্য রাজ-দিব্বোক ভগবানের নিয়মানুসারে কাল গ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতারুদ্যোক বরেন্দ্রীর সিংহাসাধিরোহণ করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র ভীম ঐ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ভীম স্বীয় রাজ্য বহিঃ শত্রু হস্ত হইতে রক্ষার জন্য যে বিশাল জাঙ্গাল প্রস্তুত করান, তাহা অদ্যাবধি অতীত মাহিষ্য রাজের কীর্ত্তি জগৎ সমক্ষে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে; "ভীমের ডমর বা ভীমের জাঙ্গাল" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মদ্বন্ধু বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'ভ্রান্তি বিজয়" পুস্তকের ২৭৮ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় সুন্দররূপ বর্ণনা করিয়াছেন; ইহার সুন্দর বর্ণনা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কৃত "রামপাল-চরিত কাব্যে" লিখিত আছে।*

* বাবু প্রভাসচন্দ্র সেন কৃত বগুড়ার ইতিহাস পৃ ৩৪-৩৭।

সুরপাল দেবের পরে রামপাল দেব মগধ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতৃ শত্রুগণের হস্ত হইতে সামন্ত চক্রের সাহায্যে বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন এবং গঙ্গানন্দ ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলে "রামাবতী" নামক নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বহুকাল যাবৎ রাজত্ব করেন। এই রামাবতীর ভগ্নাবশেষ, ও তৎসংলগ্ন স্থানগুলিতে প্রাচীন পাল রাজাগণের নামের স্মৃতি "ভীম সাগর," "রুদাইপুর" "ভীমের ডামর," "হরিপুর" আদি নামে রাখিয়া অতীতের বিস্মৃতি গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই সকল জলন্ত ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করিলে বেশ অবগত হওয়া যায় যে, অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ গৌড়ীয়-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ পরিচালিত সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শক্র-সংহারকারী নানাসাগর মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী প্রবল পরাক্রান্ত পাল নরপালগণের গৌরব মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন-ময়ুখমালার আচট্টল-গান্ধার সহ সমূহ আর্য্যাবর্ত্ত শাসিত হইয়া আলোকিত হইয়াছিল। রামপালচরিত পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, রামপাল দেবের রাজধানী রামাবতীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়াইয়া উত্তরে বরাবর গাঙ্গনইর কূলে ভীমের লীলাও কীর্ত্তি নিকেতনের বিগত স্মৃতিসমূহ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। রামপালের মহাবিহারের ৩ ক্রোশ উত্তরে ভীমের জাঙ্গালের উভয় পার্শ্বে "কীচক" নামক গ্রাম। সম্ভবত এইখানে গঙ্গানদীর তীরে মহাশ্মশানে ভীম ও যুদ্ধে নিহত ভীমের আত্মীয় স্বজনকে দাহ ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। জন প্রবাদ এই মাহিষ্যরাজ ভীমপালকে নির্দ্দেশ না করিয়া মহাভারতীয় মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সহিত "কীচক" গ্রামের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়, গঙ্গানদীর অপর পারে হরিপুর ভীম সুহৃদ্ হরির ক্ষীণ স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত ইতিহাসের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। "কীচক" গ্রামের ২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে "রুদাইপুর" গ্রাম ভীম পিতা রুদোকের স্মৃতি মানবের মনে জাগরুক করিয়া দিতেছে।* পথিক বগুড়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলার মধ্যে অতীত বৌদ্ধ ভাবাপন্ন মাহিষ্য-পাল রাজগণের এই সকল কীর্ত্তি মেখলা পরিদর্শন করিয়া কৃতিকৃতার্থ হইতে পারেন। যেমন ব্যাস বা বাল্মীকির মন দুর্য্যোধন বা রাবণের পক্ষপাতী ছিল না, সেইরূপ সন্ধ্যাকর নন্দীর সহানুভূতি স্বতই ভীমের দিকে তদীয় কাব্যে প্রকটিত হইয়াছে।

আর একটী কথা এইখানে বলা বিশেষ আবশ্যক যে, আজ কাল এই বিংশ শতাব্দীর অসাধারণ ধীশক্তি ও বিজ্ঞানালোচনার দিনে নৌশক্তির সাহচর্য্যে যেমন ইংরাজরাজ সভ্য জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এবং দৃপ্ত রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেইরূপ সুদূর অতীত বৌদ্ধযুগে পালরাজগণের অক্ষুণ্ণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাঁহাদের অর্ণবযান বলে বলীয়ান, তাহা মহারাজ রঘুর সময় হইতেই বিদিত না হইলেও, কবি কালিদাসের সময় হইতে সুনিশ্চিত বটে ত। তাই বাঙ্গালী মাহিষ্য রাজগণের নৌ-সৈন্যের এত বিক্রম দেখিয়া কবি বলিয়াছেন:—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ সাধনোদ্যতান্"। "যুক্তি কল্পতরু" গ্রন্থ হইতে আমরা বিভিন্ন জাতীয় কাষ্ঠ ও নৌকার নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকি। খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপাল দেবের তাম্র শাসন এ কথার সার্থকতা ও দৃঢ় প্রমাণ

* ভ্রান্তি বিজয় ২৭৮—২৮৯ পৃ দ্রষ্টব্য।

প্রয়োগ করিতেছে। ক্ষত্রিয় শক্তির সহিত বৈশ্য শক্তি মিলিত হইয়া গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের ন্যায় বঙ্গে এই অতীত বৌদ্ধ যুগে পাল নরপতিগণ পবিত্র ভাব আনিয়াছিলেন বলিয়া মণি কাঞ্চন সংযোগে বঙ্গদেশ সেই সময়ে অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল, পিতৃ-শক্তির বলেই এই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-অদ্বেষী মাহিষ্য পাল রাজগণ স্বাধীনভাবে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আসমুদ্র-হিমালয় পর্ব্বত পাদচুম্বী বিশাল জনপদ সমূহে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন এবং ইহাদেরই অর্ণবপোত "সদর্পে ভ্রমিত ভারত সাগরময়"॥ ইহা রূপ কথা নয়। ঐতিহাসিক সত্য। মদ্বন্ধু অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কৃত "Indian Shipping" গ্রন্থ তাহা সত্য জগৎ সমক্ষে রুদ্ধ প্রকোষ্ঠের দ্বার অর্গল-মুক্ত করিয়াছে !!!

ক্ষত্রিয় শোণিত ধমনীতে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই এই দীন হীন বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে নিগৃহীত ও পদদলিত মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় জাতি,সেই অতীত বৌদ্ধ যুগের পাল নরপতিগণের জাতি বীর বাহিনী লইয়া ভারত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া যব ও বালী দ্বীপে স্বাধীন মাহিষ্য উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; মাতৃশক্তির বলেই তাঁহারা বঙ্গের ভূমি অগণিত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর কেন, সমগ্র সভ্য জগতের অন্ন সংস্থান করিতেছে ; বৈশ্য শক্তির প্রভাবেই এই জাতি বাণিজ্য ব্যপদেশে চীন জাপান রোম মিশর, এমন কি, সুদূর আমেরিকা ও মেক্‌সিকো প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একমাত্র কর্ণধার হইয়াছিল, ভারতের অমূল্য পণ্য সম্ভার ঢালিয়া দিয়া স্বদেশ মাতৃকার গৌরব বিকীর্ণ করিয়াছিল, এবং ভারত জননীকে তৎকালিক সভ্য জগতে বরেণ্য করিয়াছিল, সেই পাল রাজগণ লুপ্ত শ্রী, লুপ্তগৌরব, অস্তিত্বহীন এবং তাঁহাদের সেই বিশাল ২৪ লক্ষের মাহিষ্য জাতি কুম্ভকর্ণী নিদ্রায় অভিভূত, সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত, পদদলিত ও নিগৃহীত !!! এই অতীত বৌদ্ধ যুগে ক্ষত্রিয় শক্তি বৈশ্য শক্তির সহিত সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া কি জলযুদ্ধে, কি স্থলযুদ্ধে, কি শৌর্য্যে কি বীর্য্যে, মাহিষ্য-গণ বঙ্গদেশকে অজেয় করিয়া রাখিয়াছিল ; স্বীয় গুরু গৌড়ীয়-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত শিক্ষা ও দীক্ষায় বিশ্ব বিজয়িনী শক্তি লাভ করিয়া সভ্য জগৎকে চমকিত করিয়া-ছিল। বর্ণাশ্রমের গুরু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদেই তাঁহারা রাজন্য শক্তি লাভ করিয়া জগতে পূজ্য ও বরেণ্য হইয়াছিলেন, শতমুখে সে শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে কেবল বিপক্ষ কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পশ্চাৎ-পদ হন নাই, এমন নহে আজও মহামহো-পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাধাকুমুদ মুখো-পাধ্যায় প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের বহু বিপশ্চিৎ আচার্য্য বিদ্বজ্জন ও সুধীবৃন্দ বরং অকপটহৃদয়ে সেই কীর্ত্তি গাথা জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আদর্শ উদারতার পরিচয় দিয়া ধন্যবাদাহ হইয়াছেন !!!

যে জাতি ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত সম্রাট দীল্লির সাহান সাহ মোগল বাদশাহ-গণকে এবং বঙ্গের পাঠান শক্তিকে স্বতই উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণ বাঙ্গালাকে স্বাধীন রাখিয়া ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, যাঁহাদের সুশাসন-আতপত্র-ছায়ায় বাঙ্গালী-বহু শত বৎসর সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, যাঁহাদের শিল্প, কারুকার্য্য, কলাবিদ্যালব্ধ বাণিজ্য সম্ভার দুর্ম্মূল্যে ভিনিষ, আদ্রিয়া-

নোপোল ও আরব উপকূলস্থ নগরে এমন কি সুদূর মিশরের হাটে বিকাইত, যে জাতি ঐ ভারতের তামস যুগ মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব ও সভ্যতা বিনিময়ের একমাত্র কর্ণধার ছিল, তাঁহাদের সন্তান সন্ততির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী বর্ত্তমান যুগের সভ্য বাঙ্গালীর উচ্চ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকে সামাজিক নির্য্যাতন করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? বড় সৌভাগ্য বলেই আজ ন্যায়বান ইংরাজ রাজের শান্তিময়ী শাসনাধীনে আমরা বাস করিতেছি যে, এই কৃষক জাতির অদ্যাবধি অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাদের চীৎকার রাজার কর্ণে পহুঁছিতেছে, তাহাদের চিরপোষিত কৃষির উন্নতির ব্যবস্থার দিকে রাজার দৃষ্টি পড়িতেছে। যে সময়ে বৌদ্ধ ভারতে হিন্দু স্বাধীন রাজন্যবর্গের বিজয় বৈজয়ন্তী সদর্পে জলে স্থলে উড্ডীন হইতেছিল, যে মধ্য যুগে ভারতের গুণ গরিমা, ন্যায় দর্শন, কলা, শিল্প ভাস্কর্য্য, চিত্র বিদ্যাদি শিক্ষা করিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, দন্তশীরপুর, নালন্দা, উরুবিল্ল আদি স্থানে সমবেত হইতেন, যে সময়ে বিহার প্রান্তীয় দেশের স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় সমূহে মনুষ্য ও পশুকুলের অসূয়া, ব্যাধি ও দুঃখ নিবারণের জন্য স্বতই ভিক্ষু ও ক্ষপণকগণ সচেষ্টিত থাকিতেন, যে সময়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে ভীম, রুদ্রক ও দিব্বোকের এই মাহিষ্য জাতি যে মেষপালবৎ শান্তভাবে কেবল মাথায় ঘাম পায়ে ফেলিয়া শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রচণ্ড প্রতাপ ও তীক্ষ্ণ আতপ তাপ উপেক্ষা করিয়া, অন্নের জন্য কেবল মাত্র ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনে রত থাকিত, এমত নহে ; ইহাদের প্রাচীন রাজন্যবর্গের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বলদৃপ্ত তাম্রলিপ্ত, সুজামুঠা, ময়না-তুরকা, কুতুব পুর, বালিসীতা, প্রভৃতি স্থানে পরিচালিত হইত, তাহা গদাধরের কুলজী ও গোবর্দ্ধণের কারিকা আমাদের দৃষ্টি সমক্ষে রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

রামপাল দেবের স্বর্গারোহণের পর ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কুমারপাল দেব মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুমার পাল দেবের সিংহাসনাধিরোহণের অত্যল্প কাল পর হইতে বিশাল পাল সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার ফলে এক এক করিয়া সুহ্ম বা আসাম প্রদেশে তিঙ্গ্যদেব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে উৎকল রাজ অনন্ত বর্ম্মার অধিনায়কত্বে স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতেছিল ; কিন্তু রামপাল দেবের প্রধান মন্ত্রী তপনভেজা গৌড়ীয়-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত যোগ দেবের পুত্র, বৈদ্য-দেবের সৎপরামর্শের গুণে সম্রাট বঙ্গে প্রাধান্য ও আধিপত্য পুনঃ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈদ্যদেব সুহ্ম বা কামরূপ প্রদেশে তিঙ্গ্যদেবকে পরাজিত করিয়া পালপ্রাধান্য পুনঃ স্থাপন করিতে পারিয়া-ছিলেন। কুমারপাল দেবের রাজ্যকাল কত দিন স্থায়ী হইয়াছিল এবং তিনি কবে পরলোক গমন করেন, তাহার কোন নিদর্শন অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই ; তবে ইহা নিশ্চিত যে, ২।৩ বৎসর কাল মাত্র তাঁহার রাজ্যকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিশু পুত্র তৃতীয় গোপালদেব মগধ সাম্রাজ্যের কর্ণধাররূপে বরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই তিনি তাঁহার পিতৃব্য মদনপাল দেবের দ্বারা গুপ্ত ঘাতকের হস্তে জীবন

বিসর্জ্জন দিলে মগধ সিংহাসনে তিনিই এক মাত্র কর্ণধার হইলেন। ইংলণ্ডের পরবর্ত্তী ইতিহাসে বালক রাজা পঞ্চম এডোয়ার্ডকে হত্যা করিয়া তদীয় পিতৃব্য তৃতীয় রিচার্ড যেমন সিংহাসনারোহণের পথ কণ্টক বিমুক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ, বহু প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ ভারতের ইতিহাস এই ঘটনার পূর্ব্বাভিনয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা পাঠকগণের নিকট অবিদিত নাই !!! কানৌলীর তাম্রানুশাসনে বৈদ্যদেব মদনপাল দেবের নাম আদৌ উল্লেখ করেন নাই। মদনপাল ১১ বৎসর রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্য কালের শেষ দিকে গৃহ বিবাদ, আন্তর্গণিক যুদ্ধ বিগ্রহে ও অপর অশান্তি প্রযুক্ত তাঁহাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে মাত্র তাঁহার আধিপত্য স্থায়ী ছিল। ইহার রাজ্যকালের অষ্টম বৎসরে মানহালি দানফলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।* মদনপাল দেব বঙ্গেশ্বর বিজয়সেনের দ্বারায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গ হইতে বিতাড়িত হন। মদনপাল দেবের রাজত্বকালের ৪টী মাত্র প্রশস্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা মদনপাল দেবের পরলোকগমনের পর তাঁহার বংশস্থ গোবিন্দ পাল নামধেয় কোন রাজাকে মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। ইনি পাল বংশের শেষ রাজা। ইহার রাজ্য কালের চতুর্দ্দশ বৎসরে (১১৭৫ খ্রীঃ অঃ) উৎকীর্ণ "গদাধর" লিপি আমরা গয়ায় দেখিতে পাই। তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। গোবিন্দপাল দেব নালন্দার আসন্ন প্রদেশে তাঁহার রাজ্যকালের শেষ সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বাবুর প্রমণাদি সমূহ দেখিলে বেশ বোধ হয়।* যাহা হোক, হতশ্রী নষ্টরাজ্য ও হৃতগৌরব হইলেও সমগ্র মগধ রাজ্যের রাজদণ্ড ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিচালনা করেন, কিন্তু তাহার পর বিহার প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌহান, গহড়-ওয়াল, পাল এবং সেন রাজ্যগুলি বক্তিয়ার খিলিজীর দ্বারা অধিকৃত এবং ধ্বংশীভূত হয়। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মনের, বিষ্ণুপুর টাড়োয়া, উদ্দণ্ডপুর, দন্তশীরপুর, গুণমতী, গুণেরী, উরুবিল্ল, মন্দারগিরি, প্রবরগিরি প্রভৃতি স্থানের মঠ পুস্তকাগার ও পশু হাঁসপাতালগুলি তিনি অর্থলোভে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ এবং বহুমূল্য পুস্তক, পুথী ও বাসস্থান গুলিকে নষ্ট করেন। ইহা জাতিয় বা দেশ-গত হানি নহে; ইহা মানব জাতীর পক্ষে মহা অসূয়াপাত বলিতে হইবে। উদীয়মান শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল বটে, শশাঙ্কদেব অশিতি সহস্র বৌদ্ধ শ্রমণগণকে হত্যা করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছিলেন বটে, বহু পলায়িত শ্রমণ বর্ত্তমান ভুমিহার ব্রাহ্মণ (বাভন) জাতিতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ লাভ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে পরিপাক পাইয়াছে বটে এবং যদিও বহু বৌদ্ধ-ভিক্ষু শ্রমণ প্রাণভয়ে পালাইয়া হূণ, খশ, গথ, আদি জাতিতে মিশিয়া বর্ত্তমান জার্ম্মানি

* J. A. S. B. 1900 Pt. I p 93. Epi. Ind vol. I. p 306-30) Ind. Ant. Vol. XIV p 103

* I A S. R. Vol iii p 121 No 7.

Catalogue of Buddhist Sans-Mss. in the Cambrige University Library Intro. p. iii, p 190, 188.

J. A. S. B. (No.) Vol Viii (1876) p 3; Ibid Vol Vii p. 757.

দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জর্ম্মাণ অভিধায় পরিচিত হইতেছে বটে, কিন্তু এই মুসলমান-বিজেতা বক্তিয়ার খিলজীকৃত অনিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বড়, গুরুতর এবং মনুষ্য জাতির উন্নতি-রোধক ও সভ্যতা-বিনষ্টক বলিয়া সদাই কথিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এবং মিঃ রেভার্টিকৃত তাবাকৎই নাসিরী পুস্তকের অনুবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, মুসলমান যোদ্ধা বক্তীয়ার খিলিজী উত্তর ভারত জয় করিয়া কানৌজ কালিঞ্জর মথুরা লুণ্ঠন করিয়া বিহার প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং ধন লাভের আশায় বিহার প্রদেশের যাবতীয় বৌদ্ধ কীর্ত্তি সকল নষ্ট ও ধ্বংশ করেন। ধন প্রাপ্তি আশা ব্যর্থ হইলে তিনিও তাঁহার উদ্ধত সৈন্যমণ্ডলী যাবতীয় মঠগুলি ধূলিসাৎ করে,পুস্তকাদি পোড়াইয়া নষ্ট করে এবং বহু ভিক্ষু ক্ষপণক, শ্রমণ ও ছাত্রগণকে নষ্ট ও হত্যা করে; কেহ কেহ ভয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, কেহ বা প্রাণ লইয়া নেপালাদি নিরাপদ দেশে পলায়ন করে এবং যাহারা তাহা পরিল না, ভুমিহার হইয়া হিন্দুসমাজে পরিপাক পাইল বলিয়া আমার মনে হয়। পালরাজগণের ইতিহাস শেষ করিয়া একটী প্রশ্ন স্বতই হিন্দু মাত্রের হৃদয়ে উদয় হয় যে, এই গয়ার বিষ্ণুপদ তীর্থ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া বিধি খাঁটি হিন্দু যুগের জিনিষ, না বৌদ্ধ যুগের পরগাছা পরবর্ত্তী কালের "পর গাছা" যেমন ডাঃ ক্যানিংহাম, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মানবী-গণ বলিয়াছেন?

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ রামায়ণ,মহাভারত, বায়ু পুরাণাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ইতপূর্ব্বে আমি "গয়ার প্রাচীনত্ব" অধ্যায়ে কতক আলোচনা করিয়াছি এবং ইহা হিন্দুর শাস্ত্রের মতে ঠিক যে, "গয়াতীর্থ" বৌদ্ধ যুগের শত সহস্র সংস্র বৎসরের প্রাচীনতম হিন্দু তীর্থ। ভগবান রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অম্বরীষ, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান প্রভৃতি যখন গয়ায় আসিয়া পিণ্ড দান ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে নিদর্শন পাওয়া যায়, তখন কিরূপে বলিব, ইহা বৌদ্ধ যুগের সৃষ্টি? আমার বিশ্বাস যে, ইহা হিন্দুর স্বতন্ত্র জিনিস। হিন্দু ধর্ম্মের বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর প্রাধান্যের কালে এই অলীক গল্পটির সৃষ্টি বলিয়া আমার মনে হয়। পাদ পূজার নিদর্শন হিন্দু শাস্ত্রের বহু স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৺রাজেন্দ্র লালের মত এ সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

প্রণতি।

১

বরণীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা বিভু।
সর্ব্বভূত সৃষ্টিকর্ত্তা তেজোময় প্রভু॥
তুমিই মঙ্গলদাতা মঙ্গল-আঁধার।
তোমার উদ্দেশে দেব কোটী নমস্কার॥

২

সর্ব্বত্র বিরাজমান লিপ্ত কিন্তু নও।
মঙ্গলার্হ! তর্কের অতীত তুমি হও॥
আত্মারূপে পরাৎপর সর্ব্বভূতে স্থিতি।
তেজোময় বিশ্বরূপে তোমাকে প্রণতি॥

৩

বাঙ্ মনের অগোচর তুমি হে অব্যক্ত।
স্ব ইচ্ছায় স্বেচ্ছাময় কভু হও ব্যক্ত॥
অদ্বিতীয় সারাৎসার ভব-কর্ণধার।
তেজোময় ব্রহ্ম! মম কোটী নমস্কার॥

৪

রজঃ সত্ত্ব তমোভেদে সৃষ্টি স্থিতি লয়।
সকলি ঘটিছে দেব তোমার ইচ্ছায়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তিনগুণ দৃষ্ট।
অন্য অন্য দেবগণ তব অংশে সৃষ্ট॥
সকলের আদি বীজি পুরুষ রতন।
নমো তেজোময় দেব পরমাত্মা ধন॥

৫

ইচ্ছায় প্রকাশমান কভু থাক গুপ্ত।
ভাগ্যবানে দেখে রূপ অন্যে থাকে সুপ্ত॥
বেদের অতীত তুমি তেজের আধার
তোমার উদ্দেশে মম কোটী নমস্কার॥

৬

সর্ব্বজীবে আত্মারূপী তুমি ভগবান।
পদ্ম পাত্রে বারি সম কর অবস্থান॥
বিচক্ষণ মহাত্মারা তবরূপ জানে।
প্রণতি হে তেজোময়! করে অকিঞ্চনে॥

৭

ইন্দ্রিয় অতীত পুনঃ গোচরবৎ ভাস।
অসাক্ষী হয়েও সাক্ষীরূপেতে প্রকাশ॥
সাকারের মত হও হয়ে নিরাকার।
তেজ-রূপ জগৎপতে! কোটী নমস্কার॥

৮

চরণবিহীন তবু তুমি সর্ব্বগামী।
হস্ত্যাস্য-বিহীন ভুঞ্জ সর্ব্ব বস্তু তুমি॥
কর্ম্মাতীত মও কিন্তু কর্ম্মের আধার।
তেজোময়! তবোদ্দেশে কোটী নমস্কার॥

৯

বেদে নিরুপিত রূপ ভজে সাধুজনে।
বেদাতীত রূপ তব অশক্ত বর্ণনে॥
বেদাতীত তেজরূপ বিশ্বের আধার।
তোমার উদ্দেশে দেব কোটী নমস্কার॥

১০

জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা বেদের জনক।
বিষ্ণু যে পালনকর্ত্তা রুদ্র সে নাশক॥
তাঁরাও অক্ষম তব রূপ বর্ণিবারে।
তোমার অব্যক্ত রূপ কে বর্ণিতে পারে?
তেজোময় জগৎপতে অগতির গতি।
তোমার উদ্দেশে দেব! অসংখ্য প্রণতি॥

১১

রক্ষণীয় জীবে ধর্ম্ম করেন রক্ষণ।
বিনাশ্যে নাশেন শিব করেন ক্ষপণ॥
অবশ্য-সম্ভাবী শুভাশুভ ফলদাতা।
তোমারই আজ্ঞায় হন ব্রহ্মা সে বিধাতা॥
তুমিই হে আদি পিতা বিশ্বের আধার।
তেজোময়! তবোদ্দেশে প্রণতি আমার॥

১২

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তব সেবা করি।
আধিপত্য লভেছেন সবার উপরি॥
তব ভক্তোপরি কিন্তু নাহি অধিকার।
তেজোময় বিভু লহ মম নমস্কার॥

১৩

বিশ্বের স্বরূপ এই পৃথিবী মাঝারে।
তোমার আজ্ঞায় রত বিষয় ব্যাপারে॥
কত কত ক্ষুদ্র জীব সেবক তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেবা সংখ্যা করে তার?
প্রযোজক সকলের তুমি বিশ্বপতি।
জ্যোতির্ম্ময় তবোদ্দেশে অসংখ্য প্রণতি॥

১৪

পরমাণু সমষ্টি এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড।
তোমার ইচ্ছায় ঘটে এ সকল কাণ্ড॥
তুমিই সে পরমাণু সৃষ্টির কারণ।
বর্ণিতে তোমার রূপ শক্ত কোন্ জন?
তেজ-পুঞ্জময় বিভু সর্ব্ব সারাৎসার।
তোমার উদ্দেশে কোটী প্রণাম আমার॥

১৫

কলামাত্র হন তব বিষ্ণু অবতার।
শুনি এক লোম কূপে ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার॥
অতএব তব রূপ কে বর্ণিতে পারে?
ভাগ্যবান পারে তুমি দয়া কর যারে॥
সৎ-চিৎ-আনন্দ তুমি অখিলের সার।
তেজোময় জগৎপতে! করি নমস্কার॥

১৬

জ্ঞানবান সাধু যাঁরা জ্যোতি করি ধ্যান।
বিমল আনন্দ তাঁরা অচিরেই পান॥
দাস্য ধর্ম্মে রত ভক্ত যাচে অন্য ধন।
তেজ চিন্তা ত্যজি চাহে পূজিতে চরণ॥
কমনীয় রূপ, করে দেখিতে বাসনা।
পূজিবারে দাও পদ পূরাও কামনা॥

১৭

জ্ঞানী চাহে জানিবারে তোমার স্বরূপ।
সেহেতু ভজনা করে জ্যোতির্ম্ময় রূপ॥
শ্রীপদ পূজিতে ভক্ত চাহে অনুক্ষণ।
অপরূপ মূর্ত্তি তব করিতে দর্শন॥

১৮

তব কাছে যেতে দুটী পথ ভক্তি-জ্ঞান।
কোনটীই চিনি না যে, অভক্ত অজ্ঞান॥
যেই ভাবে দেখা দেবে দেখিব তেমতি।
তোমার উদ্দেশে দেব! অসংখ্য প্রণতি॥

১৯

গিরিজার প্রাণধন! অগতির গতি।
মুছাও চক্ষের ধাঁধাঁ ঘুচাও দুর্গতি॥
অকিঞ্চন অভাজন আমি হীনমতি।
তব কৃপা বিনা নাথ নাহি অন্য গতি॥
দয়া করে দয়াময় দাও হে সুমতি।
তোমার উদ্দেশে দেব অসংখ্য প্রণতি॥

শ্রীগিরিজাভূষণ রায় (কবিরাজ)।

ভগবদ্গীতা।

[গ] ভক্তি-যোগ*।

[১] ভক্তি কি? ঈশ্বরে একান্ত আনুরক্তির নাম ভক্তি। জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার উপায় নাই। তবেই ভক্তি জ্ঞান-সাপেক্ষ। জ্ঞান আবার কর্ম্মসাপেক্ষ। তবেই ভক্তি—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সাহায্য-সাপেক্ষ। জ্ঞানের পরে যে ভক্তি হয়, তাহাই প্রকৃত ভক্তি, পরাভক্তি।

[২] ঈশ্বর এই বিশ্বের স্রষ্ঠা, পাতা ও বিলয়কর্ত্তা (৯—১৮॥ ১৩—১৬)। একই ঈশ্বরকে জ্ঞানীরা ব্রহ্ম, যোগীরা পরমাত্মা ও ভক্তেরা ভগবান বলেন। তাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থিতি করিয়াছে, তাঁহাতেই আবার বিলীন হইবে। ঈশ্বর জন্মবিহীন ও অবিনশ্বর (৭—২৫)।

* মহর্ষি গোতম-প্রণীত ন্যায়দর্শন এবং মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনের মতে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা—এই কয়প্রকারের নিত্য বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমানছিল। পরে পার্থিব পরমাণুগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এই বিশালবিশ্ব উৎপন্ন করিয়াছে। মহর্ষি কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণান্বিত। এই তিনটী গুণের সাম্য অবস্থায় প্রলয়, আর অসমান অবস্থায় সৃষ্টির আরম্ভ। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হয়, তেমনি এই ত্রিগুণের বিকার দ্বারা এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্য, পূর্ব্ব মীমাংসা, চার্ব্বাক দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন ঈশ্বর মানেন না। বেদান্ত দর্শনের মতে নির্গুণ পরব্রহ্মই এই বিশ্বের মূল কারণ। এখানে আপত্তি এই যে, যাহা নাই, তাহা হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না, নির্গুণ হইতে গুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। বেদান্তের উত্তর এই, এই বিশ্ব অসত্য, মায়ামাত্র। যেমন শক্তিতে রজত ভ্রম হয়, রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সেইরূপ, এই বিশ্বের ভ্রমও উৎপন্ন হইতেছে। একমাত্র পরব্রহ্মই মূল ও সত্য। তাঁহাতে সতত পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যের আরোপ হইতেছে মাত্র। প্রমথনাথ তর্কভূষণপ্রণীত মায়াবাদ পৃঃ ৯-১১। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের হিন্দুদর্শন প্রথমবর্ষ পৃঃ ৭৪।১১৪ এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত গীতায় ঈশ্বরবাদ দ্রষ্টব্য। এখন গীতার মত দেখা যাক।

তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান (৮—২২)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণ, নিয়ন্তা, বিধাতা, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও অচিন্ত্য (৮—৯)। তিনি চরাচর বিশ্ব সংসারের ও সকল জীবের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি দূরেও আছেন, নিকটেও আছেন। কিন্তু তিনি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না (১৩—১৫)। সমস্ত জীবই তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে এবং তিনিও সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন (৮—২২)। কিন্তু সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না (৮—২০)। সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আকাশ যেমন সকল পদার্থে বিদ্যমান থাকিলেও কিছুতেই লিপ্ত হয় না, ঈশ্বরও তেমনি দেহে থাকিয়াও দেহের সহিত লিপ্ত হন না (১৩—৩২)। ঈশ্বর কাহারও কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব ও সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন না। লোকের নিজ নিজ স্বভাবই সে সমুদয়ের প্রবর্ত্তক (৫—১৪)। ঈশ্বর কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না, কাহারও পাপ পুণ্যের ভাগী হন না (৫—১৫)। কিন্তু সূত্র যেমন ফুলের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া ফুলের মালার শৃঙ্খলা রক্ষা করে, ঈশ্বরও তেমনি এই বিশাল বিশ্বের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া তাহার শৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়াছেন (৭—৭)।

[৩] অজ্ঞান অন্ধ জড় প্রকৃতি বা পরমাণু এই বিশ্বের স্রষ্টা হইতে পারে না। কারণ এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই স্রষ্টার অপরিসীম জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। একই কোন মহাজ্ঞানবান, সর্ব্বশক্তিমান ইহার স্রষ্টা। ঈশ্বরই সকলের আদি কারণ। ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না (১০—৩৯)। প্রকৃতিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যও যে অন্য শক্তির প্রয়োজন। ঈশ্বরই প্রকৃতিকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ঈশ্বরই প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি করেন। (৯—১০ ॥ ১৪—৩)। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি (১৩—১৯)। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যাদি ও সুখ দুঃখ মোহাদি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় (১৩—১৯)। প্রকৃতি কার্য্যের কারণ এবং পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের কারণ (১৩—২০)।

[৪] ঈশ্বর আরাধনার কোন বিশেষ বিধি নাই। যে যে ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করুক না কেন, সে তাহাতেই ফল পাইবে,—যদি কায়মনোবাক্যে ভক্তি সহকারে তাহার আরাধনা করিতে পারে (৯—২৯)। মোহান্ধ মানব ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে (১৬-১০) তাহা উচিত নহে। কারণ যাহারা দেবতার উপাসনা করে, তাহারা দেবতাকে পায়, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহারা তাহাকেই পায় (৯—২৫)। ঈশ্বরই সকলের লক্ষ্য। তিনি নিত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অব্যক্ত। ইহা মূর্খলোকে না বুঝিয়া তাহাকে শরীরধারী মনুষ্য বলিয়া মনে করে (৭—২৪)। তিনি যে জন্মবিহীন ও অবিনশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না (৭—২৫)। সকলেই ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া, মুক্তিলাভ করিতে পারে। অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্যমনে ঈশ্বরের আরাধনা করে, তাহা হইলে সেও সাধু হইতে পারে (৯—৩০)। কারণ মুক্তি বা আত্মোন্নতি সাধনা-সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি সত্যই আত্মোন্নতি করিতে ব্যাকুল হইয়াছে, সকল শক্তি, সকল সাধনা সেইজন্য নিযুক্ত করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। ধর্ম্মের বহু দ্বার, ধর্ম্মজীবন লাভের বহু উপায়। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিলে, ধর্ম্ম জীবন লাভের জন্য সাধনা করিলে, তাহা কদাচ নিষ্ফল হয় না*। সকলে সকল ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণাগত হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে (১৮—৬৬)। যে সত্যই তাহার শরণাগত হইয়াছে, তাহার রিপুগণ পরাজিত হইয়াছে, কায়মনোবাক্যে তাহারই প্রিয়কার্য্য সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। সে দেশ-হিতে নিযুক্ত হইয়াছে। সকল ধর্ম্মের সকল সাধনই এই মহোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার উপায় মাত্র। যে গন্তব্য স্থলে পঁহুছিয়াছে, তাহার আর বাহনের প্রয়োজন কি? যে মলয়ানিল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আর তালবৃন্তের আবশ্যক কি?

[৫] ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন কর। এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার রূপ, সকল নর-নারীই তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রকাশ। ইহা হৃদয়ে উপলব্ধি কর। ঈশ্বর এই বিশ্বের সর্ব্বত্র, সকল বস্তুতে, সকল নর-নারীতে সমভাবে বিরাজ করিয়াছেন, ইহা দিব্য চক্ষুতে দেখ। ইহা দেখিয়া, ইহা বুঝিয়া ভক্তিরসে বিহ্বল হও। যিনি ঈশ্বরকে সকল পদার্থে দর্শন করেন এবং সকল পদার্থ ঈশ্বরে দর্শন করেন, ঈশ্বর কখনও তাঁহার অদৃশ্য হন না এবং তিনিও ঈশ্বরের অদৃশ্য হন না (৬—৩০)।

[৬] বিশ্বসেবা কর, সকলের হিত সাধন কর। যিনি ঈশ্বরের এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আর আপন পর নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল জ্ঞান নাই। সকলেই তাঁহার আপন ও আত্মীয়। কারণ তিনি সকলই ঈশ্বরময় দেখেন। ঈশ্বরে ভক্তি হইলেই সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট হয় (১৮—৫৪) প্রাণ উদার ও উচ্চ হয়। তিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া সকলের হিতসাধন করেন এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করেন (১২—৪)। তুমিও দেশহিতকর কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিবে (১৮—৪৬)। লোক-সেবাই ঈশ্বর-সেবার উপায়*। যিনি সকলের হিত সাধন করেন, তিনি ঈশ্বরের কর্ম্ম করেন (১১—৫৫ ॥ ১২—৩।৪)। যাহারা লোক-হিত সাধন-তৎপর, তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না (৬—৪০)। সকলের হিত সাধনে ব্রত মহাত্মারা ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হন (৫—২৫)। মনুষ্যই ঈশ্বর-পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিমা। তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক, যিনি সত্য সত্যই সর্ব্বসাধারণের প্রেমিক। ঈশ্বর চিন্তার জন্য বনে গমন করিতে হইবে না। তাহা হইলে মনুষ্য সকলের হিত সাধন করিতে পারিবে না। তাহাই প্রধান কথা। তোমার মনকে সতত সকল অবস্থায় ঈশ্বরের দিকে রাখিয়া দেশোপকার সাধন করিবে। এক হাতে ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিবে, অন্য হাতে দেশোন্নতির জন্য রাত্রিদিন পরিশ্রম করিবে। তাহা হইলেই দুর্লভ মানব-জীবন সার্থক হইবে।

[৭] ঈশ্বর করুণাময়, মঙ্গলময়। তিনিই সকলকে পালন করিতেছেন। যাহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, সে বিশ্বাস করে, শোক দুঃখ যাহা কিছু আসিতেছে, সকলই করুণাময় ঈশ্বর মঙ্গল সাধনের জন্যই প্রেরণ করিতেছেন, মনুষ্যকে পোড়াইয়া স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ করিতেছেন। তবে তুমি কেন আত্মীয় নাশ-জনিত শোক-ভয়ে ভীত হইতেছ?

শান্তিপর্ব্ব ১৭৪—২।

গীতা ৬—৩১। ১২—৪। ১৮—৪৬। শান্তি পাঠ ২৬২—২৫।

[৮] যোগ অভ্যাস করিবে। তাহাতে শরীর বলশালী ও নিরোগী হইবে। রিপুগণ বিজীত হইবে, মনের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সাধিত হইবে।

[৯] সন্ন্যাসী ও ত্যাগী কে? জটাধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, কর্ম্ম-ত্যাগ করিলেই ত্যাগী হয় না, যিনি কার্য্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু লোক হিতার্থে, দেশহিতার্থে সতত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী। আর যিনি সতত কর্ম্ম করেন, কিন্তু স্বীয় কর্ম্মফল ভোগে বাসনা করেন না, তিনিই ত্যাগী (১৮—২)। এই রূপ ত্যাগী সন্ন্যাসীই সকলের আদর্শ।

[১০] জ্ঞানহীন কর্ম্ম কুকর্ম্মে পরিণত হয়। ভক্তিহীন কর্ম্ম দেশে স্বেচ্ছাচারিতা বিস্তার করে। কর্ম্মহীন জ্ঞান দুঃখপ্রদ (৫—৬)। তাহা কোন কর্ম্মেই আসে না। অর্দ্ধ অশেষ মঙ্গলের নিদান হইলেও, মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলে যেমন কোন উপকারে আসে না, জ্ঞানও তেমনি, অশেষ কল্যাণের আকর হইলেও, উদরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কোন ফল হয় না। ভক্তিহীন জ্ঞান নাস্তিকতা আনয়ন করে। জ্ঞানহীন ভক্তি কুধর্ম্মের মূল, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের জননী। জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ [৭—১৭]। কর্ম্মহীন ভক্তি কোন কার্য্যেই আসে না। ঊর্দ্ধবাহু, উলঙ্গ, উদাসীন দ্বারা কোন মঙ্গলই সাধিত হয় না।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ন্যায়; প্রম, লৌহ ও স্বর্ণের ন্যায়; কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি দেশের অশেষ মঙ্গলের নিদান। এজন্য এই তিনের সমকালে, সমভাবে অনুশীলন করিবে (৩—৪ ॥ ২—৫১ ॥ ১৮—৫৬)। কারণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম, না করাই অধর্ম্ম। সে কর্ত্তব্য সুচারুরূপে করিতে হইলে নিষ্কাম হওয়া চাহি। নিষ্কাম হইতে চাহিলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া চাহি, জিতেন্দ্রিয় হইতে চাহিলে জ্ঞান চাহি, ভক্তি চাহি। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, ইহাদের একটীর অতিবৃদ্ধিতে অন্যটী যেন নষ্ট না হয়। এই তিনের দ্বারাই আত্মোন্নতি করিতে হইবে, এই তিনের সাহায্যেই দেশোন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই তিনের তুল্য অনুশীলনেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মুক্তি হইবে, সকল কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

[১১] প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয় ধর্ম্মই চাহি, একই জীবনে, একই সময়ে চাহি। আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতির জন্য উভয়েরই একান্তপ্রয়োজন। মনোরথে দুইটী অশ্বসংযোজিত করিয়া সংসারের পথে ধাবিত হইবে। প্রবৃত্তি যখন তোমার নিজের সুখের পথে,স্বার্থসাধনের পথে লইতে চাহিবে,তখন নিবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া প্রবৃত্তিকে সংযত করিবে। আবার নিবৃত্তি যখন সকলের হিত-সাধনের পথে, দেশোপকারের পথে লইতে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিবে, তখন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া, নিবৃত্তিকে সংযত করিয়া, দেশোপকারের পথে ধাবিত হইবে। এইরূপে দুইটী অশ্বের রথে আরোহণ করিয়া আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতি করিতে করিতে মহা সুখে জীবন পথে অগ্রসর হইবে। *

[১২] কেন এত শোক তাপ, বিবাদ বিসম্বাদ? রিপুগণের পরাধীনতাই তাহার কারণ, প্রথমে মোহ তোমাকে

* বুদ্ধদেব জ্ঞান, কর্ম্ম ও নীতির উৎকৃষ্ট আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, কোন প্রকার পাপকর্ম্ম না করা, কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা। এবং আপন চিত্তকে নির্ম্মাণ করা—ইহাই বুদ্ধদেবের অনুশাসন। চারুচন্দ্র বসুর অনুবাদিত ধর্ম্মপদ পৃঃ ১৮০। ১০০।

অজ্ঞানান্ধ করিয়াছে, তৎপরে তাহার অনুচরগণ, প্রবল রিপুগণ, ছলে বলে কৌশলে তোমাকে পরাজিত করিয়া অধঃপাতিত করিয়াছে। এখন তোমার সেই নষ্ট রাজ্য স্বরাজ্য বা শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় অধিকার করিতে হইবে। প্রথমে মোহ নাশ কর। তাহা হইলে জানিতে পারিবে, তুমি কে? তোমার ক্ষমতা কি? তোমার কর্ত্তব্য কি? তখন আর বৃথা বিলাপে বা সুখবিলাসে মন যাইবে না। রিপুগণকে পরাজিত করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া, আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতি করিতে ব্যাকুল হইবে। বুঝিতে-পারিবে সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্ব প্রকার পরাধীনতাই দুঃখ এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতাই সুখ। জানিতে পারিবে, যিনি রিপুগণকে জয় করিয়াছেন, তিনি পৃথিবী জয় করিয়াছেন। রিপুজয়ই মুক্তির মূল। তখন রিপুগণের হস্ত হইতে স্বাধীন হইয়া, শোক তাপ, বিবাদ বিসম্বাদ হইতে মুক্ত হইবে। তখন সর্ব্বত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। পৃথিবী সুখের নিকেতন হইবে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে এই অভীষ্ট লাভের জন্য রিপুগণের সহিত যে সংগ্রাম, তাহাই পবিত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। আর এই বিষম সংগ্রামে যিনি স্বীয় মনোরথে ঈশ্বরকে, সাধারণের মঙ্গলকে সারথি করিয়াছেন, একমাত্র তদ্দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন, তিনিই জগৎ-জয়ী হইবেন, কৃতকার্য্য হইবেন, মুক্তি লাভ করিবেন। অতএব তোমার নিজের সুখ দুঃখ দ্বারা তোমার কর্ত্তব্য স্থির করিও না; লোকহিত দ্বারা, দেশোপকারদ্বারা তোমার কর্ত্তব্য স্থির কর। তাহা হইলেই মোহ-মুক্ত হইতে পারিবে।

তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ, তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হইয়াছে।" এই বলিয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পুনরায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। ভীষণ, লোমহর্ষণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব।

কতিপয় ব্রাহ্মণ-জমিদার-নেতা যাহাই বলুন না কেন, উত্তর বঙ্গের ভবিষ্যৎ ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব। যাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ নহেন, তাঁহারা জানেন, যে উত্তর বঙ্গে বৈষ্ণবসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুসংখ্যা কমিতেছে, বৈষ্ণবসংখ্যা বাড়িতেছে, হিন্দুর বিপদই বৈষ্ণবের সম্পদ।

১। যেখানে এক পরিবারে অনেক সংখ্যক বিধবা থাকে, এবং প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে না পরিয়া বিপন্ন হয়, যে হিন্দু তাহার বিপদের কারণ, সেও তাহাকে উৎপীড়ন করে, তখন তাহার উপায় হয় মুসলমান, না হয় বৈষ্ণব হওয়া, হিন্দু ধর্ম্মে নিষ্ঠা থাকিলে বৈষ্ণব হইতেই ইচ্ছা করে।

২। যেখানে পুরুষের বিবাহ জুটে না, অন্য জাতীয় পাত্রীতে আসক্ত, অর্থাৎ ঠিক পেটেল মহোদয়ের বিলের যোগ্য যাহারা, সেখানে তাহারা বৈষ্ণব।

৩। একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষের এক নীচ জাতীয়া উপপত্নী গর্ভে যদি সন্তান হয়, আর সন্তান নষ্ট করিতে কোন বাধা থাকে, তবে তাহারা হয়, মুসলমান না হয় বৈষ্ণব হইবে। বগুড়ায় এরূপ মুসলমান ও বৈষ্ণব অনেক আছে।

৪। ঘোষবংশীয় একজন জমিদারের কর্ম্মচারীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, সেখানে কায়স্থ নাই, মুসলমান ও বৈষ্ণব,তিনি অন্ত্যেষ্টির সুবিচারজন্য ভেক লইলেন, শেষে বাঁচিয়া উঠিয়া বৈষ্ণব রহিয়া গেলেন।

৫। এক গ্রামে একঘর সম্ভ্রান্ত হিন্দু

আছেন, আর কোন জাতি নাই, বৈষ্ণব আছে, তাহার উঠা বসা সমাজ প্রাপ্তির জন্য তিনি বৈষ্ণব হয়েন।

এইরূপ আদম সুখারী দেখিলে বুঝা যাইবে, যে বৈষ্ণব ও মুসলমান হিন্দু সমাজের বিপদে উপায়, safety valve, এজন্য দুই সম্প্রদায়ই বাড়িতেছে। যে মুসলমান হয়, সে সমাজ মধ্যে অচিরে মিশিয়া যায় ও বুদবুদের ন্যায় সমুদ্র মধ্যে মিশিয়া যায়, আর হিন্দুর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না। বৈষ্ণব হইলে তেমন সমান পায় না। হিন্দুরাও তাহাকে ত্যাগ করেন, সুতরাং সেই পতিত হিন্দু বৈষ্ণব হইয়া গেল। হিন্দুর চাকর হিন্দুর গায়ক, হিন্দুর জলচল ভৃত্য হইয়া দাড়ায়।

আগে বৈষ্ণবেরা ভিক্ষা বৃত্তি করিত, কিন্তু এক্ষণ মেঠাইওয়ালা, দোকানদার, কামার, কুমার অনেকে ব্যবসা পূর্ব্ববৎ চালাইতেছে, কেবল নামে বৈষ্ণব হইয়াছে। যাহাদের জল-চল ছিল, না তাহাদের জল চল হইতেছে, সুতরাং নীচজন বৈষ্ণবরূপে উন্নীত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য দেব মনেও করিতে পারেন নাই যে, নিম্ন হিন্দু সমাজ, যাহাদের জন্য তাঁহার প্রাণ কান্দিত, তাহারা তাহার সম্প্রদায় পুষ্ট করিবে, কিন্তু এক্ষণে তাহা হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ কেহই মনে করিতে পারেন নাই যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুব্রাহ্ম হইবে, কিন্তু শতাব্দীর পরে, শতাব্দীর অন্তে দেখা যাইবে, যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থেরা ব্রাহ্ম হইবে। শূদ্র ও ব্যবসায়ীর দল বৈষ্ণব হইল, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আর প্রভুত্ব করিবারস্থান রহিল না, ক্রমে বিবাহাদি অসুবিধা হইল। সুতরাং জাতিভেদের বন্ধন আর রাখা যায় না, আর বর্ণাশ্রম চলে না, তখন হয় মুসলমান, না হয় বৈষ্ণব, না হয় ব্রাহ্ম, এই তিনের এক হইবেন।

আমার বিশ্বাস, ভিখারী, নীতিহীন সমাজ-হীন দরিদ্র বৈষ্ণব তাহাদের লক্ষ্য হইবে না, মুসলমান হইতেও তাহারা রাজি হইবেন না, কারণ ইহাদের বিবাহ প্রণালীর হীনভাব, সুতরাং জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু দত্তত্রেয় শিব গুরু নারদের যে উপাস্য ব্রহ্ম, এবং তাহাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ও উন্নত, অথচ জাতিভেদ-বিহীন এই ব্রাহ্মসমাজই তাহাদের লক্ষ্য হইবে। যেমন বিলাত-ফেরত ব্রাহ্ম, যেমন বিদেশগামী সমাজ-হীন ব্রাহ্ম যেমন ব্রাহ্মসমাজে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, তেমনি, এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্ম না হইয়া আর উপায় নাই। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দল সন্ন্যাস অবলম্বী, তাহাদের প্রতি ভক্তি থাকিলেও সমস্ত জাতি সন্ন্যাসী হইবে না। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী।

আমি দুই দিনের কি দুই বৎসরের কথা বলিতেছি না, আমি দেখিতেছি ১০০ কি দুই শত বৎসর পরে বঙ্গদেশে দুই জাতি থাকিবে, ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব। সকল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু পতিতপাবন বৈষ্ণব সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আর যাহারা ভারতের এই পবিত্র গৌরবের পক্ষপাতী, পবিত্র ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুরাগী উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ-যুক্ত, তাহারা অচিরে এই ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতত্বের বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

রায় যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ বাহাদুর।

মৃত্যু—৫ই ফাল্গুন; ১৩২৬। মেহেরপুর।

হে আদর্শ পান্থবর, যোগেন্দ্রকুমার,
সমাপ্ত হইল তব ভ্রমণ এবার।
সেই যে পথের মাঝে দিয়েছিলে দেখা,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসিমুখে, সেই চিত্রলেখা
মুছিবে না, যতদিন এ বিপুল ভবে
ধূলিমাখা পথশ্রান্তি শান্ত নাহি হবে।
এ পথের আনাগোনা—দিবারাত্রি ঘিরি
মানবের দেখাশুনা নিয়া: ঘুড়ি' ফিরি'
কাছাকাছি পাশাপাশি চ'লে যেতে হয়,
অশ্রান্ত প্রবাহ মাঝে বিশ্বে সমুদয়।
—অনন্ত জ্যোতিষ্ক চলে, চলে গ্রহগণ
চলিতেছে দিবারাত্রি চন্দ্রমা তপন,
আকাশ বাতাস চলে, চলে জল-স্থল,
মহাচক্রে বিঘূর্ণিত বিশ্ব-ভূমণ্ডল।
—দ্রুতগতি তাদের পথ পারি না বুঝিতে
অন্ধকারে ডুবে আঁখি সে পন্থা খুঁজিতে।
—পথমাঝে দাঁড়াইয়া নগণ্য পথিক
চাহে কা'র মুখ-পানে বুঝে না তা' ঠিক;
আপন গরবে আত্ম সমুন্নত শিরে
চলে যায় কত জন, চাহে না ত ফিরে
কোন দিকে, দুর্ব্বল পড়িয়া থাকে পাশে।
—লতিকার জয়মাল্য পুষ্পিত বিলাসে,
কি মদিরা, কি আনন্দ, কি মাধুরী আছে—
সাগর সঙ্গীতে কি যে মহিমা বিরাজে
কি গরিমা চন্দ্রমার অপূর্ব্ব বৈভবে,
তপনের কি মাধুরী কনক-শৈশবে;
কে করে তা নিরীক্ষণ আকুল লোচনে!
যে দেখে চাহিয়া তাহা, দীন আর্ত্তজনে
আগুলিয়া বক্ষে যেবা লয়, প্রাণপণে
ঢেলে দিয়া সর্ব্বস্ব অনন্ত যতনে
করি অন্বেষণ—আপনারে ভুলি' গিয়া,
যে হইবে আগুয়ান আত্ম বিলাইয়া,
সে জন মহৎ ধন্য—পদপ্রান্তে তার
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া করে প্রীতি নমস্কার।
—হে বন্ধু বিদেশী, এ প্রবাসে, এই পথে
কত চিহ্ন আছে তার পরতে পরতে।
প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কিম্বা সে পবিত্র রেখা
চিরদিন হেম-চিত্রে রবে দীপ্ত লেখা।
—আমরা কাঁদিয়া উঠি স্মরিয়া তোমায়,
"বড় আপনার জন" চলে গেলে হায়!
—কাঁদে "শাখা পরিষৎ" সাহিত্যিক দল,
কাঁদে ধর্ম্মসভা, কাঁদে দরিদ্র দুর্ব্বল,
কাঁদে বরিশালবাসী। কাঁদিছে সঙ্গিনী
প্রাণ-প্রিয়া তব দেবী সরোজিনী*
বরিশালে—শ্মশান শয্যায়!—একবার,
এস হেথা একবার!—সুযাত্রা তোমার
যেথায় করিলে শেষ—পুণ্য হরি নামে
মিশেছ অতুল প্রেমে যে পবিত্র ধামে,
নিয়ে এস সে দেশের মহাযাত্রীদল,
প্রেমের প্রবাহ আনি ভাসাও সকল।
—তিতিয়া গৈরিকবাস স্রোত বহি ধূলে
সাজিবে মরুভূ খানি বিকশিত ফুলে;
অসংখ্য মৃদঙ্গ বাজি, বাজি করতাল,
হুঙ্কারে কাঁপিবে সর্ব্ব আকাশ পাতাল!
এস তুমি হে যোগেন্দ্র, আন মহা রোল,
নবদ্বীপ চন্দ্রনাথে—'বোল হরি বোল'।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

* মৃত্যু—বরিশাল, ১৩২৩।১৭ই শ্রাবণ। সমাধি-স্তম্ভের প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে।

"তোমারি দেওয়া নিধি
তোমারি কেড়ে নেওয়া।"

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কেনরে কাঁদিস্ প্রাণ স্মরিয়ে তাঁহার নাম
জীবনে নয়নে যারে হের না কখন ;
কেন বজ্রাঘাত সম হৃদয়ে বাজিল মম
শুনি যবে অকস্মাৎ তব তিরোধান। ১।
সুদূর প্রবাসে থাকি নয়নে নাহি নিরখি
কেনরে আকৃষ্ট প্রাণ কে বলিবে হায়!
কেন যে আপন মানি ছুটিত পরাণখানি
তোমার সমীপে বল জানিনাত তায়। ২।
গোকুলে বাঁশী বাজিলে ছুটিত বালক দলে
অথবা উৎকর্ণ হয়ে শুনিত সে ধ্বনি
হে রামেন্দ্র! সেই মত শুনে কীর্ত্তিধ্বনি শত
অলক্ষে আকৃষ্ট হোত এ ক্ষুদ্র পরাণে। ৩।
বঙ্গভাষা সেবা তরে দিলে প্রাণ অকাতরে
ব্যোমকেশ সহযোগী ব্যোমেতে মিলন!
শুভ্র জ্যোতি চন্দ্রমার সমখ্যাতি যে তোমার
বঙ্গাকাশে সদা নিত্য দ্যুতিরে তেমন।৪।
সাহিত্য মন্দির নব বঙ্গ কীর্ত্তিস্তম্ভ তব
অক্ষয় রাখিবে তোমা ওহে কর্ম্মবীর!
স্মরিয়ে তোমার নাম সাহিত্য সেবকগণ
দুঃখে কষ্টে সেবাকার্য্যে হবেনা অস্থির। ৫

সুপবিত্র শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম তুমি লভেছিলে
সেই মত কার্য্য তুমি সাধিলে ভূতলে
ত্যাগ রূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিলে শরীর যন্ত্রে
আত্মত্যাগ মহাশিক্ষা সবে প্রদানিলে। ৬।
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরি চলি গেলে কর্ম্ম করি
সফল জনম তব বঙ্গে হয়েছিল
রামেন্দ্র সুন্দর নাম! হে ত্রিবেদী গুণধাম
পুণ্যবান পিতামাতা তব রেখেছিল। ৭।
জনমিলে মৃত্যু হয় নাহিক ইথে সংশয়
বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম এই ভবে
ধন্য জন্ম তার হয় ধন্য যারে লোকে কয়
যাহার অভাব পরে লোক অনুভবে। ৮।
মৃত্যুরূপ মুক্তিদ্বারে পশেছে অমৃতাগারে
সাহিত্য কানন যথা সদা শোভাকরে।
নিরাপদে সেইস্থানে সেবো আকাঙ্ক্ষিত ধনে
আশীষবর্ষণ কোরো আমা সব প'রে। ৯।
জন্ম মৃত্যু জরাময় মানব জীবন হয়
মুক্ত হয়ে এবে শান্তি লভ সে স্বরগে।
জগদীশে নতি করি কহি অঞ্জলি পূরি,
দীন হীন আজ—এই ভিক্ষা মাগে। ১০।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

কে তুমি ?

শোক দুঃখ তাপ ভারে ভারাক্রান্ত এ হৃদয়
মায়ামোহ অশান্তিতে যবে অন্ধকারময়,
কে তুমি হৃদয়ে এস পরিয়া উজল সাজ,
শান্তির আলোক জ্বেলে আঁধার হৃদয়মাঝ ?১
জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ভুলিয়া হায়
আত্ম সুখ লয়ে যবে হৃদয় বিব্রত রয়
সংসার-পাথার হ'তে কে তুমি গো প্রেমময়
কোলে তুলে সম্মুখেতে দেখাও কর্ত্তব্যচয় ? ২
প্রতারিত পরিশ্রান্ত যবে এ হৃদয় আর
সহিতে পারে না দেব সংসারের গুরুভার
ধৈর্য্য শান্তি সাথে লয়ে হৃদয় দুয়ারে এসে
তৃপত কর এ হৃদি কে তুমি সুহৃদ্ বেশে ? ৩

কে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়ে জাগ্রত থাকি,
কুপথ অশান্তি হ'তে সতত টানিয়া রাখি
পূরিছ অপূর্ণ হিয়া প্রেম-ভক্তি-শান্তিধনে
সরস করিছ আর তব কৃপা-বরিষণে ? ৪
কাহার কৃপায় হস্ত প্রসারিত সাথে সাথে
কাহার প্রশান্ত মূর্ত্তি উজ্জ্বল জীবন-পথে ?
সততই প্রেমময় জীবনসখা হে তুমি—
কেমনে চিনিব তোমা ?
অগম্য অচিন্ত্য তুমি। ৫

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

তিলোত্তমা ও আয়েষা।

তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রণয়ের দুই আদর্শ মূর্ত্তি। দুইই সুন্দর, দুইই কাঙ্ক্ষিত। তিলোত্তমা সরস্বতীর মত মৃদু স্রোতা। আয়েষা যমুনার মত স্রোতস্বতী। তিলোত্তমা পদ্মশ্রী। আয়েষা রাজলক্ষ্মী। প্রথমটী স্ফুটনোন্মুখা নবমল্লিকা। দ্বিতীয়টী পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদল। একটী পূর্ণচন্দ্রের বিমল প্রভা, অন্যটী বালসূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি। এটী স্বপ্নের ফুল। ওটী আরাধনার ফল। এ আবেশ। ও সুখ। শিরীষসুকুমারা তিলোত্তমা দেখিবার জিনিষ, আদরের বস্তু। জ্যোতির্ম্ময়ী আয়েষা স্পর্শের সামগ্রী, ভোগের মূর্ত্তি। তিলোত্তমা বুদ্বুদের মত ফুটে। আয়েষা উৎসের মত ছুটে।

তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা নামটী সার্থক। বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিল তিল আহরণে এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণ। কবির সৃষ্ট এ মূর্ত্তিখানি স্বর্গের অপ্সরা-স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। সৌন্দর্য্যের মানসী মূর্ত্তি মর্ত্ত্যের অধিবাসিনী হইয়া যেন নামিয়া আসিয়াছে ; ইহার অঙ্গে পারিজাতের অম্লান সৌরভ, নয়নের নন্দন নিকুঞ্জের শ্যাম শোভা, বাক্যে ত্রিতন্ত্রীর মৃদুল ঝঙ্কার। আর প্রেমে অমৃতের মধুর আস্বাদ। ইহার ছায়াতরল মৌন সৌন্দর্য্য এ পৃথিবীর নহে।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে তিলোত্তমা সমধিকলজ্জাবতী, প্রথমাবতীর্ণ যৌবন মদন-বিকারা মুগ্ধা নায়িকা।

প্রথমাবতীর্ণ যৌবন মদন বিকারা রতৌ বামা।

কাঙ্ক্ষিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিক লজ্জাবতী মুগ্ধা। (সাহিত্য সর্পণ, ৩য়)

তিলোত্তমা ষোড়শী, প্রথম যৌবনাবির্ভাবে রমনীয়া, মুগ্ধকরী। ভাবে সারল্যে কিশোরী। বুদ্ধিতে বালিকা। আর অভিমানে অতি মৃদু। প্রণয়ে নিরভিমানিনী।

প্রণয়ে নিরভিমানিনী সংসারে বড় দুর্লভ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেস্‌দিমনা চরিত্রটী নিরভিমানিতার আদর্শ চিত্র। পিতার অভিশাপের জ্বলন্ত দাহে সে কোমল কুসুম অকালে শুকাইয়া গেল। আর তিলোত্তমা মরণের কোল থেকে ফিরিয়া আসিল। নিরভিমানিতা আদর্শ প্রেমের লক্ষণ, ইহা কবির উক্তি। প্রেমাস্পদের মুখ যেখানে কাঙ্ক্ষিত, আপনার স্বার্থ যেখানে বিসর্জ্জিত, সেই খানেই প্রণয়ের নিরভিমানিতা। সংসারে ইহা স্বাভাবিক নহে। আত্মদানই সেখানে আত্ম বিসর্জ্জন বা আত্মত্যাগ।

অভিমান সাধারণত প্রণয়েরই লক্ষণ। ইহারও দ্বিবিধ আদর্শ, দুইটী দিক্। এক, ভ্রমর। অপর শ্রীরাধা।* প্রণয় যেখানে যত প্রবল, অভিমানও সেখানে তত অধিক। প্রণয়ী তেমন ভালবাসিল না, তেমন আদর করিল না, সে আত্মহারা ভাব দেখাইল না, অমনই অভিমান। মতে মত মিলিল না, আচরণে ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইল, অমনই অভিমান। অন্যাসক্তি, সেত সহ্যের অতীত।

* অর্চ্চনায় ১৩২০।২১।২২ সালে। শ্রীরাধা নব্যভারতে ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ।

তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার মত নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল পরিমলময় বলিয়া তাহার প্রেমও চন্দ্রকিরণের মত শীতল, কোমল ও মনোরম। তাই সে প্রেমে মাধুর্য্য আছে কিন্তু দাহ নাই, আবেশ আছে কিন্তু উন্মত্ততা নাই। মগ্ন প্রেমের বিপুল আত্মবিস্মরণ কালিদাসের শকুন্তলার স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়।

তিলোত্তমা একাধারে বালিকা, কিশোরী, নবীনা যুবতী। প্রকৃতি কোমলা আর সরলা। শিক্ষা, সংসর্গে ও গ্রন্থপাঠে সে কোমলতা, সে সরলতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বয়সের ধর্ম্মে যৌবনসুলভ চাতুর্য্য, কুটিলতা ও আবিলতা দেখা যায় নাই। দেহে যৌবনের শ্যাম শোভা পুষ্পিত, মুখখানি কিন্তু বালিকার মত নির্ম্মল ও সুকুমার। প্রকৃতির কোমলতায় অভিজ্ঞান শকুন্তলে অনসূয়া বৃত্রসংহারে ইন্দুবালা, বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী অনুরূপচিত্র, সরমে কুণ্ঠিত, ভয়ে জড়সড় মিলন সুখে বিবশ, প্রণয়ে নিরভিমান—এ চিত্র বিশ্বে কয়খানি মেলে?

প্রথমাবতীর্ণ যৌবন মদনবিকারা, নবপ্রণয়বতী মুগ্ধা তিলোত্তমার প্রেমে সংযমের আশা করাই বৃথা। প্রথম দর্শনে যে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাইয়াছিল, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া একেবারে প্রাণমন নিবেদন করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, ক্ষণেকের মিলনে আত্মহারা হইয়া অদর্শনের আশঙ্কায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল, প্রণয়-নৈরাশ্যে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া তবুও সেই জগৎসিংহের ধ্যানে নিমগ্না ছিল। তার কাছে চিত্তবলের বা চিত্ত-সংযমের আশা কোথায়? হৃদয়ের টানে, ভাবের স্রোতে গা ভাসাইয়া বহিয়া যাওয়াই একজাতীয় প্রকৃতির ধর্ম্ম। তিলোত্তমা সেই নারী মাত্র।

তিলোত্তমার নূতন প্রেম কতকটা রূপজ, কতকটা বা অহেতুক। কবিগণ রূপজ ভালবাসাকে মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর অহেতুক প্রণয় ভবভূতির ভাষায় চক্ষুরাগ বা তারামৈত্রিক নামে অভিহিত হইয়াছে। সংযমানভ্যস্তা, কোমলহৃদয়া ভাবময়ী বলিয়াই তিলোত্তমা তাই প্রথম প্রণয়েই এমত বিহ্বলা, এরূপ অধীরা হইয়া পড়িয়াছে।

তিলোত্তমার রূপালোক বালেন্দু জ্যোতির মত সুবিমল, সুমধুর ও সুশীতল। সে রূপালোকে প্রেমের খেলা বেশ চলে, আমোদ ভালই জমে, হৃদয়ের আঁধার একেবারে দূরে যায়, কিন্তু তাহাতে সংসারের বড় কার্য্য হয় না, জীবন-সংগ্রামে যথার্থ সঙ্গিনীর উপকার পাওয়া যায় না। তাহার চক্ষু শান্ত, স্থির। সে চক্ষুতে যৌবন-সুলভ চাপল্য, চাতুর্য্য ছিল না। বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিত কটাক্ষ" খেলিত না। হাব ভাব, বিলাস, বিভ্রম ও ভ্রূভঙ্গী দেখা যাইত না। তাহা সায়াহ্ণ আকাশে নক্ষত্রের মত সুন্দর। সে দৃষ্টিতে সরল স্নেহ যেন ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত, স্বর্গের অমৃত গলিয়া গলিয়া ক্ষরিত। তার গতি স্থির, কিন্তু গজেন্দ্র গতির সহিত তুলনীয় নহে। সে তন্বী, গজেন্দ্রগমনা নহে। সে সুকুমার পবিত্রহৃদয় গঙ্গাজলের সহিতই উপমিত। ভালবাসার দাগ কোমল হৃদয় পাইয়া তাহাতে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। মদনের শর কোমল বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকার মত আমূল প্রোথিত হইয়া পড়িল।

এত সরলা—ভালবাসিবার পূর্ব্বে কোন বিচারই করিল না। এমত বালিকা—লতা পাতা লিখিতে বলিয়া জগৎসিংহের নাম লিখিয়াছে বলিয়া ভয়ে চোর হইয়া গেল। নূতন প্রণয়ে বিভোরা গীতগোবিন্দ পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া গিয়া পুস্তক ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিলোত্তমার প্রাণ বড় দুর্ব্বল, ভয়াতুর। মোগল আক্রমণ সংবাদেই চীৎকার করিয়া পালঙ্কের উপর একেবারেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা। বড় ভাবময়ী সে। তাই বীণার ঝঙ্কারের মত প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্নই হইল, কিন্তু ভেরীধ্বনির মত বীরের উৎসাহ বর্দ্ধন করিল না। যুদ্ধের শেষে শান্তির মত, শ্রমাবসানে বিশ্রান্তির মত সে প্রিয়া হইল, কিন্তু জীবনের প্রকৃত কর্ম্মরূপা, বীরত্বের প্রত্যক্ষ সহায়রূপা হইতে পারিল না। রাজপুতনার ক্ষত্রিয় কন্যা বাঙ্গালার জলবাতাসের গুণে বাঙ্গালীর মেয়ের মত হইয়া আসিল।

আয়েষা।

আয়েষা স্থিরা, ধীরা, সংযতহৃদয়া ও মহীয়সী নারী। বেহেস্তার রাণী মূর্ত্তি ধরিয়া যেন ধরায় অবতীর্ণা। মুখে দেবীর করুণা, ভঙ্গীতে সম্রাজ্ঞীর ভাব। সেই উন্নত আকার, সেই সুপরিপুষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সেই নব সূর্য্যকরোজ্জ্বল বর্ণ আর সেই মহিমাময় পদবিন্যাস সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত।

অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনে আয়েষা "মধ্যা" শ্রেণীর নায়িকা। প্ররূঢ়খর যৌবনা ঈষৎ প্রগল্‌ভ বচনা, মধ্যম ব্রীড়িতা নারীই মধ্যা নায়িকা। তিলোত্তমা নব প্রস্ফুটিতা, আয়েষা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা। দ্বাবিংশতি বৎসরের আয়েষা পূর্ণ-যৌবনা। বাক্য বীণাধ্বনিবৎ সুস্পষ্ট, কিন্তু স্থান বিশেষে ঈষৎ প্রগল্‌ভ। না নির্লজ্জা, না-সমধিক লজ্জাবতী আয়েষা।

আয়েষার সৌন্দর্য্য "নবকরিফুল্লদল নলিনীর ন্যায় সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্র-প্রদীপ্ত কোমল অথচ উজ্জ্বল। তাহার রূপ ভুবনমনোমোহন, পূর্ব্বাহ্ণের সূর্য্যরশ্মির মত প্রদীপ্ত, প্রভাময়, যাহাতে পড়ে, তাহাই যেন হাসিতে থাকে। রাজ্যোদ্যানের বসোরা গোলাপ। ধ্যানলভ্যা আরাধ্যা মূর্ত্তি। প্রথম দর্শনেই জগৎসিংহের নিকট দেবকন্যাবৎ প্রতীয়মানা। জগৎসিংহ তাহার বায়ুকম্পিত নীলোৎপল-দলতুল্য কটাক্ষের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। তার লীলাময় মধুর পদবিন্যাস, "বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল হাসি" আর লাবণ্যময় গ্রীবাভঙ্গী তাহাকে অলোকসামান্য বিশেষত্বের অধিকারিণী করিয়া তুলিয়াছে। তাহার অন্তঃকরণ কুসুমের মত কোমল, আবার কদাচিৎ প্রয়োজন বোধে বজ্রবৎ কঠোর। তরুর মত সহিষ্ণু, স্বভাবতঃ করুণাময়ী আঘাত প্রাপ্তে ক্বচিৎ সহিষ্ণু, প্রখর জ্বালাময়ী।

আয়েষা জগৎসিংহকে প্রথম দর্শনেই তিলোত্তমার মত ভালবাসিয়া ফেলে নাই। এ ভালবাসা একদিনে একক্ষণে জন্মে না। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া আপন প্রভাব বিস্তার করে। ছদ্মবেশে গোপনে প্রবেশ করিয়া শেষে অকস্মাৎ আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া দেয়। বন্দী রাজপুত্রের প্রতি সমবেদনা, মুমূর্ষুর প্রতি করুণা, ব্যথিতের উপর সান্ত্বনাই ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হয়। আয়েষা জানিত. পীড়িতকে সেবা করা, ব্যথিতকে সান্ত্বনা দেওয়া নারীর ধর্ম্ম। ওসমানের অনুরোধও পরিচর্য্যার ভার গ্রহণের অন্যতম হেতু। করুণায় সমবেদনায় তাহার নারীহৃদয় দিনে দিনে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। সুপুরুষসংস্পর্শে দেবকান্তি রাজ-

পুত্রের সাহচর্য্যে সেই দ্রবীভাব অনুরাগে পরিণত হইল। মৃত্যুর কোলে শুইয়া জগৎসিংহ যখন আয়েষাকে সান্ত্বনার মত আকড়াইয়া ধরিত, তখন তাহার চক্ষুদুটী জলে ভরিয়া যাইত। বড় আগ্রহে ব্যথাকাতর রাজপুত্র যখন আয়েষার করদুটী গ্রহণ করিত, তখন তার নারীহৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত। যৌবনের বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিয়া মাথা খাড়া দিত। আয়েষা তাহার বিস্ফারিত তৃষাতুর দৃষ্টি দ্বারা পলে পলে রাত্রিদিন রাজকুমারের রূপমদিরা পান করিতে লাগিল। তাহার মন সেই মদিরা পানে ভিতরে ভিতরে বিহ্বল হইয়া উঠিল। স্নানের সময় উত্তীর্ণ না হইলে স্নান করিতে যাওয়া ঘটিত না। মাতার নিকট আহ্বান না আসিলে পীড়িতের সান্নিধ্য ত্যাগ করা হইত না।

আয়েষা প্রতিদানের আশা না করিয়া ভালবাসিয়াছিল। জানিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ত আর সে ভালবাসে নাই। নতুবা যেখানে মিলনের আশা নাই, সেখানে বুদ্ধিমতী হইয়া কেন সে ভালবাসিবে? আয়েষা সাধ করিয়া ত আর সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয় নাই।

আয়েষা ভাবময়ী অথচ কর্ম্মময়ী। বীণার ঝঙ্কারের মত সে যেমন কণ্ঠে থাকিবার যোগ্যা, ভেরীধ্বনির মত তেমনই বীরের উৎসাহ বর্দ্ধয়ত্রী। যুদ্ধাবসানে শান্তি, যুদ্ধাবির্ভাবে উত্তেজনা। গৃহে গৃহলক্ষ্মী, যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী।

তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা পিতৃগৃহে নবমল্লিকার মত মন্দবায়ু হিল্লোলে বিধূত হইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, আর আজ সে কতলুখাঁর গৃহে বন্দিনী। নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ হইতে ভূতলশায়িত লতার দশায় উপনিতা। মুখের সে জ্যোৎস্নামধুর হাসি বিলুপ্ত, চক্ষুর সে ধীর প্রশান্ত দৃষ্টি নৈরাশ্যভারে অবনমিত, বিষাদ-প্রতিমা কোমলপ্রাণা বালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যায় অবসন্ন ভাবে শায়িতা।

দুঃখে পড়িলে মানুষের অনেক শিক্ষা জন্মে। দুঃখশোক মানুষকে নূতন করিয়া গড়ে। তিলোত্তমা আর সে হাস্যময়ী বালিকা নাই, লজ্জাশীলা নবপ্রণয়িনী নহে। দেখিলে বোধ হয়, যেন দশ বৎসর বয়স বৃদ্ধি পাইয়াছে। কতলুখাঁর জন্মোৎসবে যোগ দিবার জন্য বিমলা বেশবিন্যাস করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে উপস্থিতা। সে সাজসজ্জা তিলোত্তমার সহ্য হইল না। কহিল, "তবে মা এ সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল। আমার চক্ষুশূল হইয়াছে।" তিলোত্তমার এ করুণ ছবি কুমারসম্ভবের রতির অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়—

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে ষ সখা দীপ ইব
নীলাহতঃ।
অহমন্য দশের পশ্য মামবিসহ্যব্যবসেন
ধূমিতাং॥ (৪র্থ সর্গ)

বিমলা আজ প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্পা, তাই রূপের ফাঁদ পাতিয়াছে। সে আজ নবাবকে সেই ফাঁদে ফেলিয়া পতিহত্যার প্রতিশোধ দিয়া স্বর্গগত পতির তৃপ্তিসাধন করিবে। বিমলা তিলোত্তমাকে ওস্মান্-প্রদত্ত মুক্তি-চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয়টী দিয়া তৎসাহায্যে এ রাক্ষসীপুরী ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামীর কুটীরে যাইবার পরামর্শ দিয়া গেল। আশমানী অভিরামস্বামীর প্রেরিত হইয়া নবাবান্তঃপুরে নূতন পরিচায়িকারূপে

প্রবেশ করিয়াছে, সেই আশমানী দ্বারাই বিমলার সহিত অভিরামস্বামীর সংবাদ আদান প্রদানের কার্য্য চলিত।

তিলোত্তমার বড় সাধ, জানিয়া লয় যে রাজপুত্র কি অবস্থায় আছেন। (বিমাতা) মায়ের কাছে প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইল, "জগৎসিংহ দুর্গমধ্যে এবং শারারিক ভাল আছেন।" এখন তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইয়া ভাবিতে বসিল, "রাজপুত্র আমার জন্য কারাগারে বন্দী। কেমন সে কারাগার! আচ্ছা, এ অঙ্গুরী দ্বারা তাঁহার উদ্ধারের কৌশল করা হয় না? একবার তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে না?"

তিলোত্তমা অঙ্গুরী লইয়া, গা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়—তবু চলিতে লাগিল। প্রহরীর "কোথায় লইয়া যাইব" এই প্রশ্নের উত্তরে কোনরূপে অর্দ্ধস্ফুট "জগৎসিংহ" এই কথাটী মাত্র উচ্চারণ করিল। তৎপরে প্রহরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা মত কারাগার দ্বারে আসিয়া পৌছিল। পা আর সরে না। কপাটে মাথাটী রক্ষা করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার মনে করিল "ফিরিয়া যাই" কিন্তু ফিরিতেও পা উঠে না। তখন তিলোত্তমার "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। (কুমারসম্ভব সর্গ শেষ)

তারপর জগৎসিংহের নয়নে নয়ন মিলিল, তিলোত্তমা বেতস লতার মত কাঁপিয়া উঠিয়া সম্মুখ ঢলিয়া পড়িবার মত হইল। জগৎসিংহ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। অমনই তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। 'বীরেন্দ্রসিংহের" কন্যা এই নিষ্প্রণয় সম্বোধনে "এখানে কি অভিপ্রায়ে"? এই সোবহেল ব্যবহারে তিলোত্তমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কক্ষ, প্রাচীর, শয্যা, প্রদীপ যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তিলোত্তমার বাক্‌শক্তি তখন বিলুপ্ত, ইন্দ্রিয় অসাড়, চিত্ত বিমূঢ়। সে কথার উত্তর দিবে কি? এযে স্বপ্নের অগোচর। তারপর শুনিল, "তুমি ফিরিয়া যাও, পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হও", তখন আর ভ্রম রহিল না। বৃক্ষচ্যুত পল্লীবৎ নিঃসঙ্গ হইয়া সে স্বর্ণপ্রতিম ভূতলে পতিত হইল।

ভবভূতির সীতা পতি কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়া দুঃখ শোক সম্বরণে অসমর্থা হইয়া সজ্ঞানে ধরণীগর্ভে ঝাঁপ দেন। আর তিলোত্তমা মানসিক বেদনায় বিগত-চেতনা হইয়া সজ্ঞানে ধরণীবক্ষে লুটাইয়া পড়ে। ভবভূতির সীতা, কালিদাসের শকুন্তলা, কোন উপায়ে অবসন্ন প্রাণটী ধরিয়া রাখিয়াছিল; তিলোত্তমা কিন্তু সে দুঃখশোক সহ্য করিয়া কোনমতেই প্রাণকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। জগৎসিংহের প্রণয়বারিসেচনে সে নিদাঘতপ্তা বল্লরী ধীরে ধীরে বাঁচিয়া উঠিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপটী বিন্দু বিন্দু তৈল সঞ্চারে আবার হাসিয়া উঠিল। প্রণয় অনেক সময়ে মৃতসঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় দেয়। কুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন শুনিয়া তিলোত্তমা কি করিল?

শুধু নিমীলিত নয়নপদ্ম উন্মীলিত করিয়া এক দৃষ্টে জগৎসিংহের প্রতি চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি কোমল কেবল স্নেহব্যঞ্জক। তিরস্করণভিলাষের চিহ্নমাত্র-বর্জ্জিত।

তিলোত্তমা ভালবাসার ক্রীড়নী। তাহার প্রেমপ্রতিম মুখখানি সংসারের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা ভুলাইয়া দেয়। কর্ম্মজগতে সে কর্ম্মময়ী হইয়া আইসে নাই। কবিতার রাণী, স্বপ্নের ছবি, হৃদয়ের বিশ্রামরূপা। ধনাঢ্য

গৃহে থাকিয়া সহচরিদের সাহায্যে তিলোত্তমার সরলবুদ্ধি কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বুদ্ধিতে আয়েষার নিকট সে বালিকা মাত্র। আয়েষা যখন বহুমূল্য অলঙ্কারে তিলোত্তমাকে মনোমত সাজাইয়া বলিয়াছিল "তুমি যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁর চরণরেণুর তুল্য নহে।" এ কথার ভিতর তিলোত্তমা আদৌ প্রবেশ করিতে পারিল না। আমার—তোমার "সাররত্ন" বলিতে বলিতে যখন আয়েষার কণ্ঠরোধ হইল, নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, তখনও তিলোত্তমা কিছুই বুঝিল না; সমদুঃখিনীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল মাত্র "কাঁদিতেছ কেন?" তারপর দরদরধারে নয়ন বারিস্রোত বহিতে লাগিল। তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে আয়েষা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; তবুও তিলোত্তমার চিত্তে কোন সংশয়ের রেখাটুকুও পড়িল না। এমত সরল অন্তঃকরণ পাওয়া বহু তপস্যার ফল। খেলার পুতুলের মত তিলোত্তমাকে দিয়া মিলনের খেলাই চলে—তাই তিলোত্তমা সংযম ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি হইল না। সংযম ও সহিষ্ণুতার বলে আয়েষার মত বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। জগৎসিংহকে পতিরূপে পাইয়া তিলোত্তমা কৃতার্থ হইল।

"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা"

আয়েষা।

আয়েষা কোমলা ও তেজস্বিনী। বালসূর্য্য-প্রভা আবার কার্য্যক্ষেত্রে নৈদাঘসূর্য্য-রশ্মি। কারাগারে আয়েষা যখন কোনরূপ দ্বিধাসঙ্কোচ না করিয়া স্নেহময়ী রমণীর মত মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমাকে কোলে তুলিয়া লইল, প্রেমময়ী নারীর ন্যায় কোমলকরপল্লবে রাজপুত্রের করপল্লব গ্রহণ করিল, রাজপুত্রের ব্যথা দর্শনে কাতরা হইয়া দরদরধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল—সে কোমলমূর্ত্তি। করপল্লবে উষ্ণ ব্যাধির বিন্দুপাত অনুভব করিয়া জগৎসিংহ যখন সবিস্ময়ে আয়েষাকে কহিল "তুমি কাঁদিতেছ আয়েষা?" তখন আয়েষা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। ধীরে ধীরে গোলাপফুলটী নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া ফেলিল মাত্র। এ প্রেমিকা মূর্ত্তি। আপনি স্থলে এই তুমি সম্বোধনে আয়েষা বুঝিল। জগৎসিংহ তাহাকে কত আপনার ভাবিয়াছে। আয়েষা ইষ্টদেবী ভবানীর মত জগৎসিংহকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করিল। তাহাকে বিপদে ফেলিয়া জগৎসিংহ মুক্তি চাহে না—দেখিয়া আয়েষার চক্ষে দরদরবারি ধারা বহিল—এ করুণাময়ী দেবী মূর্ত্তি।

আয়েষা স্নেহময়ী ভগিনীর মত ওস্মানকে স্নেহ করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে বিবাহ করিবে, এমত ইচ্ছা সে পোষণ করে নাই। ওসমান যে তাহাকে প্রণয়িনীর চক্ষে দেখে, সেই মত ভালবাসে, তাহা আয়েষা জানিত। আয়েষা যখন জগৎসিংহের হাতখানি আকুল আগ্রহে ধরে দরদর ধারায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়—তখনই তাহার প্রেম কতকটা ব্যক্ত হইয়া উঠে। তিলোত্তমাকে অগ্রে হৃদয়দান না করিলে আয়েষার আকর্ষণে জগৎসিংহ অবশ্যই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। আয়েষা যদি জগৎসিংহের ভালবাসা লাভ করিত, তাহাদের মিলনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিষম বাধা না থাকিত—তাহা হইলে আয়েষার প্রেম এমত নিঃস্বার্থ হইতে পারিত না।

আয়েষার অশ্রু তখনও শুকায় নাই, এমন সময়ে কারাগারে কাহার ছায়া পড়িল। ওস-

মান স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ক্রোধ-কম্পিতস্বরে কহিল "নবাবপুত্রি, এ উত্তম।"

ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া আয়েষার মুখ রক্তবর্ণ হইল। কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির স্বরে উত্তর দিল "কি উত্তম ওসমান?"

"নিশীথে একাকিনী বন্দী-সহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম!" আয়েষার কর্ণে কে যেন তপ্ত সলিল ঢালিয়া দিল। এ তিরস্কার তাহার পবিত্র চিত্তে সহ্য হইল না। এ হিংস্র বাণী তাহাকে উত্তেজিতা করিয়া তুলিল। প্রত্যেক বিশেষণটী এক একটী তীক্ষ্ণশরের মত তাহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল।

"আমার কাজ উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।" ওসমানের ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, ব্যঙ্গস্বরে কহিল "আর আমিই যদি জিজ্ঞাসা করি!" আয়েষার বিশাললোচন তখন আরও বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখপদ্ম আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। স্বর গর্ব্বিত ও গম্ভীর হইয়া আসিল, তখন তেজস্বিনী মূর্ত্তি।

তেজস্বিনী নারী মস্তকের একদেশ হেলাইয়া তরঙ্গান্দোলিত শৈবালদলবৎ হৃদয় উৎকম্পিত করিয়া ওসমানকে কহিল "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

সেই মুহূর্ত্তে কক্ষ মধ্যে যেন বজ্রপতন হইল। আয়েষার নীরব রোদনের কারণ জগৎসিংহের চক্ষে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। তিল তিল করিয়া অনেকদিনের অনেক ব্যবহার অনেক কথা স্মৃতিপথে আসিল। ওস্মান অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছিল বলিয়া আয়েষার ভিতরকার সুপ্ত তেজ জাগিয়া উঠিল। সতীত্বের উপর আঘাতের মত বড় আঘাত মেয়েমানুষের আর নাই। নারী-সম্মানে ঘা লাগিয়াছে, নারী-হৃদয় মাথা খাড়া দিয়া উঠিল। উত্তেজনার বশে তাহার রুদ্ধ ভালবাসা প্রকাশ হইল। ভাবের মূর্ত্তি ভাষায় ফুটিয়া উঠিল। আয়েষার চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার সেই জ্বালাময়ী মূর্ত্তি ক্রমশঃ কোমলভাব ধারণ করিল। আয়েষা অশ্রু মুছিল। যে আয়েষা, সেই আয়েষাই হইল। কেবল একটী জলোচ্ছাস নদীর উপর দিয়া বহিয়া গেল। মাত্র একটী ভূমিকম্প ধরার আপাদ মস্তক টলাইয়া দিয়া গেল, প্রবল ঝটিকাবসানে প্রকৃতির মত কক্ষের অবস্থা নিথরভাব ধারণ করিল।

ওসমান কথা কহিবে কি? তাহার মনের সংশয় যে সত্য হইবে, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। যে আশা-লতিকার মূলে এতদিন জলসেচন করিয়া আসিয়াছে, আজ যে তাহা সমূহ উৎপাটিত হইয়া যাইবে, ইহা কে জানিত? আয়েষা স্নেহময়ী ভগিনীর মত ওসমানকে সান্ত্বনার কথা বলিয়া দাসীর ফিরিয়া আসা অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। ওসমান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রেই সুরাপানোন্মত্ত কতলুখাঁর বক্ষে আমূল ছুরিকা বসাইয়া দিয়া বিমলা পতিহত্যার প্রতিশোধ দিল। সাংঘাতিক আহত হইয়া নবাব সেই কক্ষে পতিত হইল।

মুমূর্ষু পিতার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া আয়েষা নিঃশব্দে উপবিষ্টা। নয়নাশ্রুধারায় মুখখানি পরিপ্লাবিত। সে মূর্ত্তি স্থির গম্ভীর নিঃস্পন্দ। জগৎসিংহও আহূত হইয়া সেখানে উপস্থিত। সন্ধির প্রার্থনায় জগৎসিংহ কতকটা সম্মত হইলে নবাবের মুখ, মৃত্যু-পীড়িত মুখ প্রদীপ্ত হইল। সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তেও আয়েষার কি সংযমের পরাকাষ্ঠা

দেখা গেল। পিতার কাণে কাণে আয়েষা কি বলিয়া দিল, অমনই সেই মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে নবাব "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা সাধ্বী তুমি দেখিও" ইহা বলিয়া গেল। আয়েষার নাম মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে নবাবের নির্জ্জীব মস্তক ভূমে লুটাইয়া পড়িল. আয়েষা মূর্চ্ছিতা হইল না, কেবল শোকভার-স্তম্ভিতা হইয়া বসিয়া রহিল।

এইবার জগৎসিংহের ফিরিবার পালা। যাইবার সময় আয়েষার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়াও তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না। ওসমানের হৃদয়ের আগুন আরও জলিয়া উঠিবে, সে বিষম বেদনা পাইবে, তাই আয়েষা পাষাণীর মত সাক্ষাৎ না করার কষ্ট সহ্য করিল। আত্ম-ধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া যে সে সাক্ষাত করিল না, তাহা নহে। তবে বারান্তরে সাক্ষাতের প্রত্যাশা আর সে করিতে পারে না; কারণ "নারীহৃদয় দুর্দ্দমনীয়,অধিক সাহস অনুচিত," এ আশঙ্কাও ছিল। তবে এই প্রদেশে যদি জগৎসিংহ বিবাহ করেন, তবে যেন আয়েষাকে সংবাদ দেওয়া হয়, এইমাত্র অনুরোধ করিয়া রাখিল।

বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিতা হইয়া আয়েষা তিলোত্তমার জন্য অন্যজনদুর্লভ হীরকাদি-খচিত রত্নালঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া, রাখিয়াছিল। মনোমত সাজাইয়া তিলোত্তমার মুখখানি ধরিয়া এ সরল প্রেমপ্রতিমমুখখানি দেখিলে প্রাণেশ্বর মনপীড়া পাইবেন না, ভাবিয়া আশ্বস্তা হইল। "যখন বিধাতা অন্যরূপ ঘটাইলেন না, তখন ইহার দ্বারা তিনি সুখী হউন।" আয়েষা এই প্রার্থনাই করিল। অন্যরূপ, জগৎসিংহ-আয়েষা মিলন বাকী।

পূর্ব্বে নবাবপুত্রী বন্দীরাজপুত্রকে তুমি সম্বোধন করিত। আর আজ জগৎসিংহের সে প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী দাসী হইয়া কেমন করিয়া তুমি সম্বোধন করিবে? জগৎসিংহ আপনি ছাড়িয়া তুমি ধরিল। আয়েষা তুমি স্থলে আপনি আরম্ভ করিল।

আয়েষা সংযমে, সহিষ্ণুতায় এবং স্বার্থ-ত্যাগে আদর্শ। তবু সে হৃদয়ে নারী; রক্ত-মাংসে গড়া মানবী। "আমার—তোমার সার-রত্ন" বলিতে গিয়া তাই তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। এত বড় আত্মবলি দিতে যাইয়া যার প্রাণ একেবারে কাতর না হয়, সে কেমন নারী! কেমন তার হৃদয়! প্রেমিকা যুবতী ব্যর্থ জীবনভাবে নৈরাশ্য বেদনার চাপে পীড়িতা হইয়া যদি নাই কাঁদিল; তবে তাহার নারীত্ব, তাহার হৃদয়বত্তাই যে পরিস্ফুট হয় না। সে ত আর পাষাণ-নির্ম্মিতা নহে যে, তাহার সান্ধ্য-সমীরণ-কম্পিত নীলোৎপলদল-বৎ চক্ষু অশ্রুভরে একটু টলমল করিবে না? তৃষাতুর বিশুষ্ক অধর প্রণয়বারি পান লালসায় ক্ষণেকের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে না?

নিরাশপ্রণয়িনী হইয়া আয়েষা সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। তিলোত্তমাকে বঞ্চিত করিয়া, প্রাণেশ্বরের ধর্ম্মলোপ করাইয়া নিজের সুখ-ভোগ বা স্বার্থসিদ্ধি সে চাহে না, ওসমানের হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে বলিয়া সে সাক্ষাৎ পর্য্যন্তই করিল না। প্রলোভনের বস্তু বলিয়া (একবার সকল যন্ত্রণা জুড়াইবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছিল) গরলাধার অঙ্গুরিয়টী পর্য্যন্ত জলে ফেলিয়া দিল।

প্রলোভন জয়ই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সংযম, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগই মানবকে দেবত্বে উন্নীত করে। প্রলোভন জয়ের একদিক্‌কার আদর্শ প্রতাপ, অপরদিক্‌কার আদর্শ আয়েষা। প্রতাপ দেবতা, আয়েষা দেবী। প্রতাপ

শৈবলিনীর প্রণয়-যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার মঙ্গলের জন্য তাহারই কথায় প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিল, প্রতাপ দেবতা। আর আয়েষা দুর্ব্বল-হৃদয়া নারী হইয়া স্মৃতি মাত্র সম্বল করিয়া তাহারই ধ্যানে সন্ন্যাসিনী-জীবন কাটাইয়া দিল—আয়েষা দেবী। প্রতাপ কঠিনচেতা বীর হইয়াও রূপসীকে, যে কারণেই হউক, বিবাহ করিয়া (সাধারণ চক্ষুতে) সংসার পাতাইল। আয়েষা কোনদিনই বিবাহের কল্পনা পর্য্যন্ত মনে স্থান দিল না। একদিকে,—জগৎসিংহের স্মৃতি আয়েষার জীবনের বন্ধনা। সেই স্মৃতিই তাহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা এখন প্রলোভনের বস্তু। অন্যদিকে, শৈবলিনী প্রতাপের গুরুপত্নী; কাজেই সে স্মৃতি তাহার জীবনের বিষম বেদনা। সে স্মৃতি বিষের মত সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত, রক্তের অণু পরমাণুতে সঞ্চারিত; অথচ সেই স্মৃতিতে তার অধিকার নাই। সে স্মৃতি মহাপাপ। দুইজনে দুই দিকে বড়।

রিপুজয়ে, প্রলোভন জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে আমরাও বলি, সে স্বর্গ আয়েষা তোমার। আয়েষা, তোমার এই নিঃস্বার্থ প্রেমের পুরস্কার পরলোকে পাইবে। ইহ-লোকে যতদিন বঙ্গসাহিত্যের জীবন, ততদিন তোমার যশ জনে জনে কীর্ত্তন করিবে। আশীর্ব্বাদ কর দেবি, যেন ভারতের নরনারী তোমার মত সংযম ও স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারে।

(সাহিত্যসভায় পঠিত)

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

স্বর্গীয় রামকানাই দত্ত।

শ্রদ্ধাভাজন ৺রামকানাই দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য অদ্য আমরা এইস্থানে সমবেত হইয়াছি। কি ভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা যায়, তাহা বিবেচনা করার পূর্ব্বে ও করার জন্য তাঁহার জীবনের ধারা কোন প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইবে। রাম কানাইবাবু ১২৫৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে জন্ম গ্রহণ করেন ও শৈশবে পিতৃহারা হন। তাঁহার মাতৃদেবী জীবনী-শক্তির একটী সূক্ষ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া অদ্যাপি মরজগতে রহিয়াছেন। মাতার প্রতি রামকানাই বাবুর অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। মায়ের সামান্য সামান্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি সর্ব্বদা উদ্গ্রীব থাকিতেন এবং তৎসম্বন্ধে বিত্তশাঠ্য করাত দূরের কথা, বরং সময়ে সময়ে নিজ আয়ের অতিরিক্ত খরচ করিতেন। রামকানাই বাবুর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, জীবলীলা সাঙ্গ করার পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃদেবীর ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া যান, কিন্তু ভগবান তাঁহার সেই সাধ পূর্ণ করেন নাই।

রামকানাই বাবু প্রণীত "আনন্দগীতা" তাঁহার কৃতজ্ঞ-চিত্ততার অন্যতর নিদর্শন। উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি শ্রীমদাচার্য্য আনন্দ স্বামী মহাশয়কে তাঁহার প্রতিপালক ও শিক্ষাদাতাগুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামকানাই বাবু বর্ত্তমান যুগের ইউনিভারসিটি-প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, কিম্বা তিনি স্কুলে কি অন্যত্র রীতিমত সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করারও সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। অথচ হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি

যে মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন,তাহা বর্ত্তমান যুগের অতি উচ্চ শিক্ষিত ও উদার-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মীমাংসার অনুরূপ দেখিয়া সময় সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আনন্দগীতা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আচার্য্য উর্ব্বর ক্ষেত্রেই শস্যবপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপাতেই রামকানাই বাবু দুর্বোধ্য ধর্ম্মতত্ত্বগুলি অতি সহজে আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঋণ-শোধ।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ একসময়ে এই পৃথিবীকে ঋণশোধের স্থান মনে করিতেন এবং আমাদের জীবন গ্রহণ ও জীবন-ধারণজনিত ঋণকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ।

ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং পাঠ কর্ম্মনা
সপ্তত্যা পিতৃঋণঞ্চ শোধায়িত্বা পরিব্রজেৎ।

দেবঋণ জিনিষটা কি, বুঝা আজকাল একটু কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেব শব্দের ভাবার্থের সঙ্গে যোগ করিয়া দেবঋণের অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—যে সকল শক্তি প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়া জগতে ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ। আমাদের দেশের মত কৃষিজীবির দেশে বৃষ্টি এক অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। বৃষ্টির অভাব হইলে শস্য জন্মেনা, অত্যধিক হইলে শস্য নষ্ট হয়, সমতা থাকিলে প্রচুর শস্য জন্মে। যে শক্তি প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়া এই বৃষ্টির ক্ষমতা সাধন কি অক্ষমতা উৎপাদন করিতেছে, তাহার সন্তোষ বিধান করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্য বোধে বৃষ্টির সমতা সাধনার্থ যজ্ঞদ্বারা তৎপ্রতিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করা হইত। কালক্রমে যাগ যজ্ঞে মানুষের বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িল এবং হিন্দুজাতীয় জীবনে এমন সময় আসিল, যখন তাঁহারা মনে করিলেন যে, সকল দেবশক্তির এক মূল আধার এবং আধারভূত সেই মূলকে তৃপ্ত করার জন্য যাগযজ্ঞের কোনও আবশ্যকতা নাই, ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞ বিনাই তাঁহার তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে দেবঋণের বোঝা অনেকটা লাঘব হইয়াছে, কিন্তু তৎস্থলে আমরা অন্য আর একটা ঋণ মানিয়া নিতেছি। তাহা দেশ-ঋণ। শ্রীমদ্ আনন্দস্বামীর বচন উদ্ধৃত করিয়া রামকানাই বাবু বলিতেছেন ঃ—

"পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ঋষিঋণ যত,
করিলে আগেতে শোধ হইবে উন্নত।
তার পর দেশঋণ করি পরিশোধ,
হইলে অঋণী তুমি পাইবে প্রবোধ।
এসেছ বিশ্বেতে কাজ করিতে সাধন,
অবিরত সেবাব্রত কর দিয়া মন।"

উদ্ধৃতস্থলে যদিও পিতৃঋণের সঙ্গে মাতৃঋণ যোগ করা হইয়াছে, এই দুই শব্দের ব্যবহার দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রকারদের পিতৃঋণ শব্দে যাহা বুঝাইত,তদধিক কিছু বুঝাইতেছে না। পিতৃঋণ শোধ করিতে হইলে পিতা, মাতা ও পিতৃমাতৃস্থানীয়দের সেবা ও প্রতিপালন করিতে হয়। সন্তান উৎপাদন ও তাহাদের লালন পালন ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্ব্বশেষে সন্তানগণকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া যাইতে হয় যেন জীবনের যে আদর্শ আমরা পিতৃপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারা ঐ আদর্শ মলিন না করিয়া বা তাহা উজ্জ্বলতর করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে। রামকানাই বাবুর মাতৃভক্তির বিষয় আপনাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সন্তানবাৎসল্য সহজসাধ্য, কিন্তু মাতৃভক্তি তেমন সহজসাধ্য নহে। রামকানাই বাবুর মত মাতৃভক্ত সন্তান যে নিজে সন্তানবৎসল হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি নিজ সন্তানগণের ও জামাতাদের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ও নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। যদি তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া চলিতে না পারে, তবে তাহা রামকানাই বাবুর দুর্ভাগ্যের ফল মনে করিব, তাহা তাঁহার নিজ ত্রুটি কি কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতার ফল নহে।

দেশ-ঋণ।

আমরা যে ত্রিবিধ ঋণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তন্মধ্যে এক প্রকার ঋণ পরিশোধ করিয়া উঠাই অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। পিতৃঋণশোধের ব্যাপার বরং অনেকটা সহজ, দেশঋণ শোধ করার চেষ্টা তত সহজ নহে। অনেককে দেখিয়াছি, নিজ আত্মীয় স্বজনগণের সঙ্গে যখন ব্যবহার করেন, তখন বেশ মানুষ, কিন্তু একটু বাহিরের মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলেই অন্যরূপ হইয়া উঠেন। অবশ্য আমি স্বীকার করি রে, অনেক সময় কার্য্যক্ষেত্রে বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে এমন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় যে তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মসংযম করা কঠিন হইয়া উঠে। এইরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেও যিনি অবিচলিত থাকিতে পারেন,যিনি মানুষের কৃত অন্যায়ব্যবহারকে তাহাদের অজ্ঞতার ফল মনে করিয়া তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই দেশ সেবা করার যোগ্য ব্যক্তি। এই ভাবের দ্বারা চালিত হইতেন বলিয়াই রামকানাইবাবুর প্রকৃতি অতি মিষ্ট। তাঁহাকে কাহারও প্রতি রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। রামকানাই বাবুর দেশসেবা ব্রতের প্রথম ফল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এড্ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন-স্থাপন। উচ্চশিক্ষার পথ সুগম ও প্রশস্ত করার জন্য তিনি যখন মনে করিলেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে দ্বিতীয় একটী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, তিনি তৎক্ষণাৎ এখানকার কয়েকটী বন্ধুর সাহায্য লইয়া এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তখন দুইটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় চলিবে কিনা, এই বিষয়ে ঘোর মতদ্বৈধ ছিল এবং এড্ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন স্থাপন সময়ে ও তাহার কিছুকাল পরে উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে বহুবিধ বাধা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। রামকানাইবাবু নির্ভীকতার সহিত ঐ সকল বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন ও পশ্চাৎ জয়যুক্ত হইয়াছেন।

রামকানাই বাবু নিজ জাতিকে অতি উচ্চ আসনে সমাসীন দেখিতে ইচ্ছা করিতেন এবং জাতীয় অধঃপতনের জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'সন্তান" নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন "যে ভারত, বেদ দর্শন প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্বের ভূরি২ গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ ছিল, সেই ভারত আজ পরকীয় তত্ত্বে তত্ত্ববান, পরকীয় জ্ঞানে জ্ঞানবান,চর্ব্বিত চর্ব্বণ ব্যতীত (ভাব) প্রকাশে অসমর্থ। ইহা অপেক্ষা দুর্গতি ও অবনতি আর কি হইতে পারে, জানি না। নিষ্ঠাবান,ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর চরণ-রেণু গ্রহণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিতেছি, এখনো গতি ফিরিলে কল্যাণের আশা আছে। গতি ফিরাইবেন কি?"

রামকানাইবাবু জানিতেন যে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন জাতি কখনও উন্নত হয় নাই ও হইতে পারে না, তাই সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তিনি নিজ দেশবাসীকে সত্যনিষ্ঠ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন ও তাহাদের সমক্ষে আগ্রহসহকারে মহাত্মা বুদ্ধদেবের শেষ কয়টী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ধরিয়া দিয়াছেন "যাহার জন্ম

হয়, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সত্যই মৃত্যুকে জয় করিয়া নিত্যকাল বিদ্যমান থাকে, তোমরা যত্ন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পালন করিবে।" এই সত্যনিষ্ঠার ফলেই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতীয় জীবন সংগঠনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যৎসামান্য নহে। তাই তিনি বুদ্ধদেবের জীবনীর সমালোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, "যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে ভারতবর্ষ একদিন উন্নতির চূড়ায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে ধর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধনে মানে, ক্ষমতায় সমুন্নত হইয়া, ভারতমাতা একদিন জগতের পূজ্যা হইতে পারিয়াছিলেন, মাতৃভূমিকে যাঁহারা ভালবাসেন, মাতৃভূমির যাঁহারা হিতকামনা করেন এবং মাতৃভূমিকে যাঁহারা পুনরায় উন্নতির শিখর দেশে দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনাপরায়ণ হইবেন।" জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধনের জন্য রামকানাই বাবু কেবল আমাদিগকে আমাদের নিজ জাতীয় মহাপুরুষগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই বিরত হইতে বলেন নাই, তিনি সকল দেশের সকল সাধুমহাপুরুষগণের শরণাপন্ন হইতে এবং প্রত্যেকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেই অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা খ্রীষ্টের জীবনের আদর্শ দেশবাসীর সমক্ষে ধরিয়াছেন এবং খ্রীষ্টীয় জাতির উন্নতির মূল কারণ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বচনাবলি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, "তাঁহার (খ্রীষ্টের) যোগ ক্রিয়াশীল ও পরহিতকর ছিল। ইহা কেবল ধ্যান ও নির্ব্বাণ-যোগ ছিলনা। এ যোগ ঈশ্বর ও মানব, উভয়ের সহিতই যুক্ত ছিল।" অন্যত্র বলিতেছেন— "তাই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ইউরোপে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মই ইউরোপের উন্নতির কারণ। সেই উন্নতির বশেই আজ ইউরোপে নরবলির প্রথা শিশুবধ, নিষ্ঠুরতা, পোপের স্বর্গে গমনের টিকিটদান প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা রহিত হইয়াছে, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইয়াছে, দরিদ্রের সাহায্য ও শিক্ষাদান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি ও নীতি জ্ঞানের বিস্তৃতি হইয়াছে। তাই যীশু জগৎগুরু।"

ঋষি-ঋণ।

পাঠকার্য্যদ্বারা ঋষিঋণ শোধ করাই হিন্দু শাস্ত্রকারদের অভিমত। পাঠকার্য্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, উভয় বিভাগকেই বুঝিতে হইবে। অধ্যয়ন করিয়া ঋষিদের প্রচারিত সত্য জানিতে হইবে ও তাহা অন্যকে শিখাইতে হইবে। যেখানে যে সত্য সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহা করিয়া রামকানাই বাবু ঐ সকল গ্রহণ জন্য দেশবাসীদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামকানাইবাবু অতি উদার সার্ব্বভৌমিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও পোষণ করিতেন। তিনি জৈন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক ঋষভদেবের জীবনী সমালোচনায় বলিতেছেন—"জৈনধর্ম্ম বহুপুরাতন উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। এই উদার পরম পবিত্র ধর্ম্ম-বিটপির ছায়াতে উপবেশন করিলে প্রাণ শীতল হয়, হৃদয় স্বর্গীয় আনন্দরসে প্লাবিত হয়, সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধি দূরে প্রস্থান করে। আনন্দগীতায় বলিতেছেন ঃ—

"সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় আছে যেইখানে।
প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব পাবে সেইখানে॥
সর্ব্বতত্ত্ব লাভ করি যেই মহাজন।
দেয় ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা—তিনি প্রিয়জন॥
ধর্ম্মালোক পেয়ে লোক কৃপাতে তাঁহার।
সাধন-সোপানে উঠে নাশি অন্ধকার॥"

ধর্ম্মলাভের জন্য সংসারত্যাগী যোগী হইতে হইবে, রামকানাই বাবু ঐ মত পরিহার করিয়া গৃহী হইয়াই ধর্ম্মলাভ করার চেষ্টা করা উচিত, এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দগীতায় দেহ ও আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"দেহ আত্মা ব্রহ্মভূত একবস্তু চমৎকার।
দেখেনা পৃথক তাহা সিদ্ধঋষি যোগাচার॥
সামঞ্জস্য রক্ষা করি ব্রহ্মের বিধান ধরি
করিতেছে বিশ্বকার্য্য দেহ আত্মা অনিবার
ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন দেহ আত্মা নহে ভিন্ন
করিতেছ শান্তিযোগে একত্রে নিত্য বিহার।"

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

"ইন্দ্রিয়ে গঠিত কায়া ইন্দ্রিয় ভাণ্ডার,
থাকেনা ইন্দ্রিয় বিনা অস্তিত্ব তাহার।
জলের অভাবে যথা বাঁচেনাকো মীন,
বায়ুর অভাবে যথা ভুজঙ্গম ক্ষীণ।
সেরূপ ইন্দ্রিয় বিনা বাঁচেনা মানব,
থাকেনা ভুবন মাঝে কিছুই গৌরব।
ইন্দ্রিয় সেবাতে মিলে অতীন্দ্রিয় যোগ,
বিশ্বাসী মানব করে প্রেমানন্দ ভোগ।
ইন্দ্রিয় বিনাশ ক্রিয়া বটে বিপরীত,
ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় জানিও নিশ্চিত।"

কর্ম্মদ্বারাই ধর্ম্মলাভ করা যায়, রামকানাই বাবু এইমত পোষণ করিতেন। কর্ম্ম সম্বন্ধে আনন্দগীতায় তাঁহার উপদেশ এই ঃ—

"কর্ম্ম কর উচ্চ নীচ না করিয়া জ্ঞান,
লিখনী লাঙ্গল বটে একই সমান।
কর্ম্ম কর গলগ্রহ থেকোনা কাহারো,
পরপ্রত্যাশায় শিরে ঝাঁটা দুটা মারো।
কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর কর্ম্মীর সন্তান,
আকাশে পেতোনা স্বর হইবে কল্যাণ।
বুনিবে যেমন বীজ ফলিবে তেমন,
কর কর্ম্ম হবে ধর্ম্ম—পাইবে রতন।
ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা করি হইলে পতন,
রবে না উত্থানশক্তি হারাবে জীবন।
কর্ম্ম কর লক্ষ্যস্থির করিয়া ত্বরায়
হইবে উন্নত তুমি অবশ্য ধরায়।
হও যদি ক্রীতদাস, অলস, বিলাসী,
করিবে তোমাকে গ্রাস দরিদ্রতা আসি।"

অন্যকে যেমন উপদেশ দিয়াছেন, নিজ জীবনেও তদ্রূপ কর্ম্মের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে পরিমাণ কাজ জীবনে করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে এত কাজ করার অবসর কর্ম্মপুরুষগণ কোথায় প্রাপ্ত হন, ঐ চিরন্তন প্রশ্নই মনে উদিত হয়। ঐ প্রশ্নের উত্তরও রামকানাই বাবু তাঁহার আনন্দগীতায় দিয়া গিয়াছেন। তাহা এই ঃ—

"ভেবো না অন্য ভাবনা পরমেশ্বর বই,
চাইও না অন্য দিকে নীচে মাটী বই।
ভরিওনা পেট কভু না হলে ক্ষুধিত,
বিলাইতে হরি নাম হও না কুণ্ঠিত।
বলিওনা মিথ্যা কথা রাখিও নিয়ম,
করিও সর্ব্বদা যত্নে ইন্দ্রিয়-সংযম।
আলস্য করিও ত্যাগ, রাখিও শরীর,
ভাল হয়ে ভাল কর সাজি ধর্ম্মবীর।
পরচর্চ্চা বিষসম করিয়া বর্জ্জন
করিবে নিখিল জীবে প্রেম বিতরণ।"

স্মৃতি-রক্ষা।

আমরা রামকানাইবাবুর জীবনের যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম, তাহা হইতে আপনারা দেখিবেন যে, রামকানাই বাবুর শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। নিজে বহুপরিশ্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া ঐ জ্ঞান সাধারণ্যে বিতরণ করিয়াই তিনি আনন্দভোগ করিতেন। আপনারা যদি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের সেই ব্যবস্থা শিক্ষার বিস্তার-কল্পে বিনিয়োগ করাই সঙ্গত হইবে।

শ্রীরমণীমোহন দত্ত।

শিশু।

কত সুকোমল-কোরক-কমনীয়-
হাস্য-স্ফুরিত অধর ;—
কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে তাহে, নিরমল-
তনু-ভাস্বর।
কত প্রীতিগাথা, কত গীতি পূর্ণ,
সুরভি-স্নাত মলয়ে,—
ঐ সূক্ষ্ম রশ্মি ফুটে উঠে মৃদু আঁধার
সংসার-নিলয়ে।
ফুল্ল প্রসূন-কচি-পর্ণ-পূট, সিঞ্চিত-
মধু-চন্দ্রিমা ;
ফুল্লার বিন্দ গোলাপী-আননে, প্রকাশিছে
কিবা মহিমা!
মাতৃস্তন্যে তাই, ক্ষীর সুধা-ধারা স্নেহে
নিষিক্ত করি,—
ওহে কৃপাসিন্ধো! করুণাভাণ্ডার
দিয়াছ হৃদয়ে পূরি।
মেদুর-রুচির কনক মঞ্জির, যেন
কত মনলোভা ;—
নাচিয়া নাচায়ে, হাসিয়া হাসায়ে,
ফুটায়েছ হাস্যপ্রভা।
সুষমা দিয়াছে অঙ্গ আভরণ
কোকিল দিয়াছে কাকলী ;—
গোলাপ দিয়াছে পাপড়ি খসায়ে,
প্রসূন দিয়াছে অঞ্জলি ;—
তপন দিয়াছে নব ঊষারাগ
চাঁদ দেছে স্নিগ্ধ জ্যোতি ;—
অম্বর দিয়াছে নীল নয়নে,
মিটি মিটি তারা দুটী ;—
স্বপন দিয়াছে সুকোমল ক্রোড়,
নিদ্রা দিয়াছে শান্তি ;—
ধরণী দিয়াছে শ্যাম শষ্প শোভা,
প্রকৃতিভাণ্ডার লুটি।
মলয় মৃদুল পরশি গায়,
শ্রান্তি স্বেদধারা মুছায়ে দেয় ;—
ভ্রমর মোহন মধুর গুঞ্জনে,
কাণে কাণে কয় কথা ,—
কোমল বাঁশরী বিনায়ে বিনায়ে
নিদ্দারিয়া স্বর-সুধা,—
সে অস্ফুটন্ত আধ আধস্বরে,
মিশায় ললিত গাথা।
ক্রোড়ে দিয়ে তুমি সে চান্দ বয়ান,
বেন্ধে দিয়ে স্নেহ ডোরে,—
ওহে দয়াময়! মানবে বেন্ধেছ,
কঠিন মোহ নিগড়ে ॥

শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত।

পরলোকগত মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে পরলোকগত মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির নাম দিয়াছেন "নরদেব শিবচন্দ্র দেবের ও তৎসহধর্ম্মিণীর জীবনালেখ্য।" পুস্তকের নামে "নরদেব" কথা না থাকিলেও জীবনালেখ্য খানি পাঠ করিয়া, তিনি যে নরশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সদাশয় কুসংস্কারবিহীন অজাতশত্রু ও দয়ালু শিবচন্দ্র দেব দেশের মঙ্গলের জন্য যে কত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে জানা যায়। তিনি স্বয়ং নেতা হইয়া

কেবলমাত্র সত্যের অনুরোধে কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবস্থত নূতন দল বাঁধিয়া নিজ উদার মতের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিনয়ী, ধীর ও শান্তস্বভাব লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কোনও প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, হিন্দু কলেজের প্রথম শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে দুইটী মানুষ আবাল্য ভাল মানুষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁহার দীর্ঘজীবন-ব্যাপী অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও পরবর্ত্তীকালে বৈবাহিক স্বর্গীয় শিবচন্দ্রদেব। নব্যশিক্ষার ফলে যে যুবকদল ঊণ-মার্গগামী হইয়া সে সময়ের সমাজ ও প্রবীণগণকে বিব্রত ও বিপন্ন করিয়াছিলেন, প্যারীচাঁদ ও শিবচন্দ্র সেই সুহৃদ্মণ্ডলী-ভুক্ত হইয়াও কালা পাহাড়ের মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। ইহারা শান্ত প্রকৃতি ও স্থিরবুদ্ধি-বিশিষ্ট ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী ব্রাহ্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কবি কালিদাস লিখিয়াছিলেন, "মনৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব গতিঃ।" আমরা রঘুবংশের এই শ্লোকার্দ্ধ স্মরণ করিয়া শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার "Education in Bengal" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য যুবকেরা দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া পল্লীস্থ দরিদ্র বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এইরূপ একটী বিদ্যালয় মিত্র মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিদ্যালয়ে শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ সিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, কালাচাঁদ শেট ও রাজকৃষ্ণ মিত্র শিক্ষকতা করিতেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা কেহই কোনও পারিশ্রমিক না লইয়া অবৈতনিকভাবে কার্য্য করিতেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বঙ্গসমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে "সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ (Association of friends for the promotion of social improvement) সমিতি স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই সভার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি ও স্বয়ং কিশোরীচাঁদ ও অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক ছিলেন। শিবচন্দ্রদেব মহাশয় এই সভার ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদের ডায়েরী পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে, প্রথম বিধবা-বিবাহে দেব মহাশয় কিশোরীচাঁদের সহিত উপস্থিত ছিলেন। মৌলিক ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রচার করা সভার আর একটী অনুষ্ঠান ছিল। এতদর্থে এক সব-কমিটি নিয়োজিত ছিল। দেব মহাশয় এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ এপ্রিল তারিখে কলিকাতার টাউনহলে এক বিরাট সভা আহূত হয়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর ফৌজদারী বিচারালয়ের মোকর্দ্দমা কেবল সুপ্রীম কোর্টেই হইত, মফঃস্বল ফৌজদারী বিচারালয়ে এই সমুদায় বিচার হইতে পারে কিনা, এতৎ সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা হয়। হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত ৯ই এপ্রিল তারিখে এই সভার বিবরণীতে আমরা শিবচন্দ্র দেবের নাম দেখিতে পাই। তিনি একটী প্রস্তাবের পোষকতা করেন। বোধ হয়, এই সভাতে তাঁহার যোগ ছিল বলিয়া পুস্তকে লিখিত ৮০ পৃষ্ঠার ঘটনাটী

ঘটিয়াছিল। এতৎবিষয়ে হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজে ১৮৫৭ খ্রীঃ জুন মাসের ৪ তারিখে বর্ণিত আছে।

শিশুপালন পুস্তক সম্বন্ধে বর্ণকুলার লিটরেচার সোসাইটি কমিটী ২৮ আগষ্ট ১৮৫৬ খ্রীঃ অধিবেশনে রেভেরেণ্ড জে লং বলিয়াছিলেন যে, ডাক্তার জে আর বেডফোর্ড সাহেব স্বয়ং শিবচন্দ্র দেবের জে কুম্ব সাহেবের প্রণীত Treatise of infancy পুস্তকের অনুবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, এবং তিনি স্বয়ং অনুবাদের ভাষা ও পুস্তকের তত্ত্বগুলি পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছেন। (হরকরা ১ সেপেম্বর, ১৮৫৬)। গ্রন্থকার শিশুপালন পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগের সমালোচনা হিন্দুপেট্রিয়ট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমভাগের সমালোচনা ৩০ সেপেম্বর ১৮৫৮ তারিখের পেট্রিয়টে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাও উল্লেখ-যোগ্য।

বিখ্যাত অধ্যাত্মবিদ ডাক্তার জে, এম, পিবলস (Doctor G. M. Peebles) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি কেশবচন্দ্র সেন, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সহোদরগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার Around the world পুস্তকে Oriental spiritualist শির্ষক প্রবন্ধে তিনি শিবচন্দ্রদেবের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"Shib Chandra Deb. another devoted spiritualist introduced by Peary Chand Mitra, presented us a neat volume that he had receutly published upon spiritualism. It contains liberal extracts from American authors; in fact the works of Davis, Tuttle, Sargent, Denton, Edmonds and others are well known in India. This gentleman had also translated a large portion of my book "Seers of the ages" into the Bengali language and they are now being circulated as tracts in India. Expressing regret that I had not a copy of the "Seers" to tender him in turn for his valuable volume, smiling he said, "I have read the Seers of the Ages and others of your latter works, quite a number of which have reached our country from Mr. Burn's Publishing House in London." (5th Edition, Page 234).

"আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার দীর্ঘজীবন-ব্যাপী অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ নবেম্বর তারিখে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইলে দেব মহাশয় তাঁহার পৌত্র ও নিজ দৌহিত্র প্রকাশচন্দ্রকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ঃ—

Konnagore,
26th November 1883.

My dear Prokas,

I feel great sorrow for the death of your venerable grandfather. In him I have lost a most kind and valuable friend. I will ever remember the various kind offices which he did me during his long and useful career. Convey to your father and the rest of the dear family my sincere condolence. Considering the long suffering which my friend had to undergo during his protracted illness, I think we should be thankful to the merciful Father for relieving him from all the troubles incidental to earthly life. May God grant peace to his spirit and consolation to his bereaved family. Believe me.

Yours very affectionately,
Shib Chandra Deb.

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ জানুয়ারি তারিখে ডাক্তার প্রকাশচন্দ্রের পরলোকগতে বিজয়লাল দত্ত কর্ত্তৃক শোকগাথা ১৩১৯ চৈত্রসংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য সময় সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুস্তক প্রণেতাদিগকে পারিতোষিক দিতেন। পুস্তক নির্ব্বাচন ভার এক সমিতির হস্তে অর্পণ করা হইত। শিবচন্দ্রদেব মহাশয় ঐসকল সমিতির সভ্য প্রায়ই হইবেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদপত্রে আমরা এইরূপ এক কমিটিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবের নাম দেখিতে পাই।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের ৫ই তারিখে দেশপূজ্য ভারতবিখ্যাতবাসী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস আদেশ হইয়াছিল। দেশের লোকেরা এই শোকে কাতর হইয়া সহানুভূতি দেখাইয়া ১৬ মে তারিখে বিডন ষ্ট্রীটে নেশান্যাল থিয়েটারে এক বিরাট সভা আহূত করিয়াছিলেন। ২১ মে তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদ পত্রে আমরা অবগত যে, প্রথম প্রস্তাবটী রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পোষকতা ও শিবচন্দ্র দেব সমর্থন করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যুর পর ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ তারিখে এক শোকসভা আহূত হইয়াছিল। শিবচন্দ্র দেব মহাশয় ঐ সভায় একটী প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।

শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র।

ভারতবাসীর উপনিবেশ।

(অমূল্যবিদ্যাভূষণের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)।

বর্ত্তমানমাসের (ভাদ্রের) "ভারতীতে" "ভারতবাসীর উপনিবেশ" শীর্ষক আলোচনায় শ্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যাভূষণের আত্মস্থরিতা দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের মত যে সে ব্যক্তিতো তাঁহার চক্ষেই লাগেনা; তাঁহার নিকট Cyclopaedia of India সঙ্কলয়িতা ও বিশ্বকোষকার নগণ্য ঐতিহাসিক এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Phayre ও বিজয়চন্দ্র-মজুমদার গঞ্জিকা সেবী। যাঁহার এখনও গুরুমহাশয়ের নিকট ইতিহাসের শিক্ষানবিশী চলিতেছে এবং যাঁহার ইতিহাস রচনা এখনও গুরুমহাশয়ের দ্বারা সংশোধিত হইতেছে তাঁহার পক্ষে এরূপ বড় বড় কথা না বলিলেই বোধ হয় ভাল হইত। তিনি যে কবে এবং কাহার দ্বারা ঐতিহাসিকের নবাবীপদে বরিত হইয়াছেন, তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। ঐতিহাসিক হঠাৎ নবাব মহাশয় আমার প্রতিবাদ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধেই মাত্র ইহার আলোচনা করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার প্রথমেই কর্ত্তব্য।

তিনি প্রথমেই নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হই-

লেও আমি কোথায় "কনিকানগরীকে স্বর্ণগ্রাম মনে করিয়াছি তাহা উল্লেখ করিয়া আমার ঐতিহাসিক গবেষণার উপর বিদ্রূপ-বর্ষণ করিয়া আমোদ ভোগ করিয়াছেন। আমার ঐতিহাসিক গবেষণা অদ্ভুত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার যে ঐতিহাসিকগবেষণায় রুক্মাঙ্গদ জয়পালের রূপান্তর বলিয়া কল্পিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উহা কখনই অধিক অদ্ভুত নহে। যিনি "ত্রিবেণী পত্রিকায় ত্রিপুরা নামের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া স্বয়ং ত্রিপুরার পীঠস্থানে গমনও তথ্যাদি সংগ্রহ করা সত্ত্বেও, ত্রিপুরার পীঠেশ্বরীর কোনও উল্লেখ না করিয়াই, এসিয়াটিক সোসাইটী লাইব্রেরী ও ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী কেটলগের ঝুড়ি ঝুড়ি পুথির নামের দ্বারা অনাবশ্যকরূপে প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণকরতঃ ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং যিনি তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের জন্য 'ত্রিবেণী' সম্পাদকের নিকট হইতে হাতে হাতেই, বিনা বাক্যব্যয়ে যথেষ্ট নগদ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইলেও তাহা এত শীঘ্র হজম করিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন, ঐতিহাসিক গবেষণার বড়াই তিনি না করিলে আর কে করিবে?

নওগাঙে হস্তিনাপুর নামে স্থান থাকা সম্বন্ধে নওগাঙ, ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের কথা উল্লেখ করিয়া বিদ্যাভূষণ বড়ই আস্ফালন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে পাদটীকায় অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক বহুপ্রমাণের নির্দ্দেশ থাকিলেও এই প্রমাণটীর কোনও নির্দ্দেশ দেখাযায় না। তাহাতে ইহা যে পরবর্ত্তী আবিষ্কার তাহাই কি বুঝায় না? এবং কোনও নির্দ্দেশ না থাকাতেই যে, আমাদের প্রশ্নের কারণ হইয়াছে তাহাও কি বুঝায়না?

শিলালিপির প্রতিলিপির কথা লিখায় বিদ্যাভূষণ বড় গলা করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে বরাত দেওয়া থাকিলেও প্রথম শিলালিপির বরাতটীরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় শিলালিপি সম্বন্ধে প্রবন্ধে কোনও কোনও বরাত্ না থাকিলেও তৎসম্বন্ধে কোন বক্তব্যই করেন নাই তাঁহার এইরূপ পাশ কাটানভাবের কথা হইতে মূল শিলালিপি দুরাস্তাং, শিলালিপির উল্লেখও ইংরেজী অনুবাদব্যতীত প্রতিলিপি পর্য্যন্তও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কিন তদ্বিষয়ে আমাদের এখনও গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। বর্ম্মায় হস্তিনাপুর রাজ্য স্থাপনের সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদের পাশ্চাত্য সাফাই বাতিল করিতে যাইয়া,বিশেষ আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাফাই তিনি বাতিল করিতে পাইয়াছেন কি? একজনের পরিবর্ত্তে বরঞ্চ তিনি অন্যজনকে মানিয়াছেন। সাফাইর সম্বন্ধে যাহাই হউক, হস্তিনাপুর স্থাপনের সময় তাঁহারই মতে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ না ধরিয়া খৃষ্টাব্দ ধরিলেও, যে গোল থাকিয়া যায়। তাঁহার নিজেরই লিখিত বৃত্তান্তে হস্তিনাপুর রাজ্যধ্বংসের পর ভূকাম ও অরিমর্দ্দনপুর ধ্বংসের সময় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ বিবেচিত হইয়াছে ও তাহার সমর্থক প্রমাণ Burmese inscription of the Pou A. D. Daung Pagoda 1774 উদ্ধৃত হইয়াছে! পরবর্ত্তী ভূকামও অরিমর্দ্দনপুর ধ্বংসের সময় কি করিয়া খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে পারে? ইহাই আমরা পূর্ব্বেও জিজ্ঞাসা

* এই প্রত্যুত্তরটী "ভারতীতে" প্রকাশার্থই প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতী কার্য্যাধ্যক্ষ প্রকাশ না করিয়া প্রতি প্রেরণ করায় "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইল। লেখক।

করিয়াছিলাম। কিন্তু বিদ্যাভূষণ ইহাতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠার সময় গঞ্জিকা সেবনের ফলেই যেন খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে পারে কিন্তু ভূকাম ও অরিমর্দ্দনপুর ধ্বংসের সময়তো শিলালিপির দ্বারাই প্রমাণিত 'প্রোমে' রাজধানী পরিবর্ত্তনের কথাতো বিদ্যাভূষণের নিজেরই দ্বারা দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদিত। তবে কি এই খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত তাঁহার গঞ্জিকা সেবনেরই ফল! অতঃপর এই কথা বলিলে বোধ হয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন যে তাঁহার গর্ব্বিত মস্ত ঐতিহাসিক বিদ্যা খরচ করিয়া দেখাইলেও হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠার সময় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও যে "তিমিরে" ছিলাম এখনও সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছি।

হস্তিনাপুর স্থাপনের সময় খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অবধারণ গঞ্জিকাসেবনের ফল হইতে পারে; কিন্তু হস্তিনাপুরে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত চন্দ্রবংশীয় দ্রুহ্যস্তানদিগের যোগসম্পাদন কেবল গঞ্জিকা সেবনে কুলায় না ইহাতে "কমলাকান্তেরই" ন্যায় অহিফেন সেবনেরই প্রয়োজন হয়।

গোপালের পুত্র জয়পাল, ইহা আমরা লিখিয়াছি বটে। জয়পালকে গোপালের বংশোদ্ভূত বলায় এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন সম্পর্কর নির্দ্দেশ না করায় অথচ ইহাঁদের মধ্যে অন্য কোনও রাজার নাম উল্লিখিত না হওয়ায় জয়পালকে গোপালের পুত্র বলিয়া মনে করা কতটা স্বাভাবিক হয় পাঠকবর্গই বিচার করিয়া দেখিবেন।

অব্দ সম্বন্ধে সে ধাঁধাঁর কথা আমি লিখিয়াছিলাম তাহার উত্তরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় গুপ্তাব্দের ভুল "ভারতী" সম্পাদকের! ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া কোনমতে একদিক্ রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অপরদিকে খৃষ্টাব্দের সম্পর্কে আমাদের ধাঁধাঁ যে এখনও পূর্ব্ববৎই রহিয়া গিয়াছে।

আমার আলোচনা ধীরভাবে পাঠ করিলে, পাঠকগণ অবশ্যই দেখতে পাইবেন যে, বিদ্যাভূষণ আমার আলোচনার কেবল শাখা পল্লব লইয়াই নাড়া চাড়া করিয়াছেন, মূল বিষয়ের ধার দিয়াও যান নাই। অবান্তর বিষয় সকল লইয়া এইরূপে বাগ্‌জাল বিস্তার করায় তাঁহার কালি, কাগজ সময় ও শক্তির কোন অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই তিনি মনে করেন না।

আমাদের মূল জিজ্ঞাস্যগুলির কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার প্রকাশ্যমান ইতিহাসে এইগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য ঐতিহাসিক রত্নরাজি, যদি প্রকাশ করিতেই তিনি না চাহেন, তবে প্রবন্ধটী লিখিবারই তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল? তাঁহার অপূর্ব্ব ইতিহাস যে প্রকাশ হইতেছে তাহা জাহির করিয়া সকলের তাক লাগাইয়া দেওয়াই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রকাশ করিলে তাঁহার যত্নের মূল্য পাছে কমিয়া যায় এই ভয়েই তিনি এইগুলি এখন সিকায় তুলিয়া রাখাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্যমান ইতিহাসের পূর্ব্বাভাসরূপ প্রবন্ধে যে হেঁয়ালী রচনার পূর্ব্বসূচনা দেখিতে পাইয়াছি তাহাতে তাঁহার প্রকাশ্যমান ইতিহাসে সে বৃহদাকার হেঁয়ালী বিরচিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে আমাদের আর বাকীনাই।

বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধের

শেষে "এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। পরে আলোচিত হইবে।" এইরূপ লেখা থাকিলেও আমরা কেন তাঁহার নিকট "সমগ্র মহাভারতের ফর্দ্দ চাহিলাম তাহা তিনি রহস্য মনে করেন। তাঁহার প্রবন্ধ আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর দুই মাস গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তো তাঁহার অনেক কথার কোন কথাই বাহির হইল না। প্রতিবাদকরা সত্ত্বেও তো প্রত্যুত্তরে বহু কথা লিখিত হইলেও সেই সমস্ত "অনেক কথা" অপ্রকাশ্যই রহিয়া গেল। অথচ "এসম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করিনা" লিখিয়া তিনি একেবারে নিরস্তই হইয়া গেলেন। ইহাও কি রহস্য নহে?

মহাভারতের ফর্দ্দ চাহিয়াছি বলিয়া বিদ্যাভূষণ যেন বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি তো "মহাভারতই" লিখিতেছেন তবে মহাভারতের ফর্দ্দ চাহিলে দোষ কি? ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস লিখিবার জন্য ডষ্ট্র কট গেজেটিয়ার ঘাঁটিলেই চলিবেনা, ইহার জন্য মহাভারতে দেখিবারও প্রয়োজন হইবে।

গোপালের নাম রাজমালায় নাম থাকিলেও তাঁহার নামান্তর বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানেন বলিয়া আমাদিগকে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক পরম রহস্য সুতরাং ইহা তিনি ব্যক্ত করিবেন না। কারণ রূপান্তর ও নামান্তরের রহস্য দ্বারাই তিনি তাঁহার ইতিহাসের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেছেন। এই রহস্য এত শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়া তাঁহার ইতিহাসের সাধের ইন্দ্রজাল ভেদ হইয়া গেলে, তাঁহার ইতিহাসের উপায় কি হইবে এবং নিজেরই বা উপায় কি হইবে?

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
আগরতলা ত্রিপুর।

সঙ্গিনিকা।

২৭)

আমরা নিম্নলিখিত পত্রে ঋষিকল্প ভুবনমোহন কর মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার জীবনের কথা পরে বিবৃত করিব।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গভীর শোক-সন্তপ্তচিত্তে জানাইতেছি যে, ঋষিকল্প দেবচরিত্র, দুস্থ ও গরীবের মা-বাপ পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় গতকল্য (১৯শে ভাদ্র) অপরাহ্ণ ২—৭ মিনিটের সময় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে সমস্ত লোক হাহাকার করিতেছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জজসাহেব সমস্ত আফিস আদালতের কার্য্য বন্ধ করিয়াছিলেন। ২০।২২ জন অস্ত্রধারী পুলিশ শবানুগমন করিয়াছিল। তাঁহার গৃহ হইতে শ্মশান ন্যূনাধিক ৪ হাজার লোক শবানুগমন করিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র নির্ব্বিশেষে তাঁহার শব বহন করিয়াছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শ্মশানাভিমুখে শবমহ শ্মশান বন্ধুগণ অগ্রসর হইলেন। রাস্তার দুইধারে সহরবাসীগণ বিষণ্ণচিত্তে সমবেত হইয়া শেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কুলবধূগণ স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। এ শ্মশানযাত্রা নয়, শোভাযাত্রা হইয়াছিল। হরিনাম ও ব্রহ্মনাম লইতে লইতে শবানুগামীগণ ৩ ঘণ্টা-

কাল সহরের বিভিন্নস্থান পর্য্যটন করতঃ শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। এই মহাপুরুষের তিরোধানে দিনাজপুরবাসীগণ গভীর শোকে আচ্ছন্ন আছে। আপনি ভাদ্র মাসের নব্যভারতে পণ্ডিত মহাশয় বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য এখানকার চিকিৎসকগণও পণ্ডিত মহাশয়ের সেবা করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছেন। শুশ্রূষাকারী শুশ্রূষাকারিণীগণ কৃতার্থ হইয়াছেন, বহু সম্পন্ন গৃহস্থের বধূগণ পণ্ডিত মহাশয়ের শেষ পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের একটী প্রধানকীর্ত্তি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়। যাহাতে তাঁহার এইকীর্ত্তি রক্ষিত হয়, সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিবেদন ইতি—বিনীত নিবেদক—শ্রীকেদারনাথ সন।

(২৮)

MRS. NAIDU'S ALLEGATIONS.

Mr. Montagu's Reply.

London, Aug. 28.

In connection with Sir W. Joynson Hicks' question in the House of Commons with regard to Mrs. Naidu's allegation of the stripping and flogging of Indian women, Mr. Montagu has sent a letter to Sir W. Joynson-Hicks stating that the Viceroy reports that the women mentioned are prostitutes of wandering criminal tribes. Safardahs and Pernas, who have settled at Amritsar for the purpose of prostitution The charges made are absolutely false and have been made as a revenge against officers who gave evidence before the tribunals and participated in the recovery of property stolen from the National Bank by Mirasis and Pornas. "Reuter".

আমরা উপরোক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমরা যত দূর জানি, ভদ্রমহিলাদিগের প্রতিই অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল। ১৯শে ভাদ্রের বঙ্গবাসীতে পুনঃ তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। মানুষের কতদূর অধোগতি হইতে পারে উপরোক্ত মন্তব্য তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ছদ্মবেশী সুসভ্য জাতি এতদিনে ধরা পড়িয়াছেন। যদি বেশ্যাই হয়, তবু কি তাহারা বেত্রাঘাতের যোগ্য? তোমরা না এতদিন মহিলা-সম্মানের দাবী করিতে? প্রকাশ্য পত্রিকায় এরূপ মন্তব্য কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ভাবিতেও পারিতেছি না। আমরা জানি উপরোক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইবে এবং ঐ মন্তব্য যে মিথ্যা, তাহাও প্রমাণিত হইবে। আমরা কেবল ভাবিতেছি, গর্ব্বিত জাতির এত দূর অধোগতি হইয়াছে! হায় রে হায়!

(২৯)

জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশন।

পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতায় এবার কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। আয়োজন খুবই হইয়াছিল জনতাও খুব হইয়াছিল, তবে নরমপন্থীরা সকলে যোগ দেন নাই। দিবেন কেন, তাঁহারা যশমানের ফিকিরে ঘুরিতেছেন। ফিকিরে ঘুরিতেছেন অনেকেই। শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি, অনেক মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে। সকল স্বধর্ম্ম সংরক্ষণের আটঘাট বাঁধিয়া সহযোগিতাবর্জ্জন প্রস্তাববাদীর নেতাদের প্রতিবাদ প্রস্তাব স্বত্ত্বেও গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ কাজ হইবে কিনা, গভীর সন্দেহের বিষয়। একা গান্ধী কি করিবেন?

তিনিও ত মাড়োয়ারীর মমতা ছাড়িতে পারিতেছেন না! দুই কুল রাখিয়া এ জগতে কেহই উন্নতি করিতে পারেন নাই, কেহই পারিবে না। এই বিশেষ অধিবেশনের এক বিশেষত্ব এই, এবার মাসিক পত্রিকার সম্পাদকদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়াছি,স্থানের অভাবে এইরূপ কাজ হইয়াছে। ১৫০৬০ লোকের স্থান হইতে পারে, তদুপরি আর ৬০।৭০ জন লোকের স্থান হয় না!! উদ্ধৃত কম্প্লিমেণ্টারি টিকিটেরও তাঁহারা যোগ্য নহে? বোঝার উপর শাক আঁটী চলে না, ইহা আমাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। তবে বণিকবৃত্তির কথা, লাভ লোকসানের কথা স্বতন্ত্র। লাভের জন্য কংগ্রেস হইলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহারা বলেন, বণিকবৃত্তি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়। তবে কেন এরূপ বিচার হইল? সুরেন্দ্রনাথ বৈকুণ্ঠনাথের আমলে ত এরূপ না। গত বারেও বৈকুণ্ঠনাথের আমলে আমরা টিকিট পাইয়াছিলাম, তবে এবার কেন এরূপ হইল? বালখিল্যদের উত্তাপ বড় বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া কি? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?

(৩০)

এ দেশকে জাগাইবে কে? তুমিও না, সেও না, কোন বালখিল্যও না, কোন চরিত্রহীন নবনেতাও নাই, এ শোকে জাগাইবে শুধু সাহিত্য ও ধর্ম্ম। জানিও, এ জগতের সকল উত্থান-সাহিত্য ও ধর্ম্মের অভিব্যক্তিতে। শরীরের রক্ত জল করিয়া, কঠোর তপস্যা করিয়া যাঁহারা দেশকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই নিত্য উপেক্ষিত।

তাঁহাদের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, মস্তক রাখিবার উপাদান নাই, জলবৃষ্টি নিবারণের গৃহ নাই, পায়ে পাদুকা নাই। আছে কি? আছে কেবল চক্ষের জল, হৃদয়ে কামনা-আগুন এবং সর্ব্বাঙ্গে দেশানুরাগের জ্বলন্ত চিতা। সংসার দাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া তাঁহারা অঙ্গার হইয়া যাইতেছেন, কেহ সাহায্য করিবার নাই! অভাবের তাড়নায় অস্থির এবং অবসন্ন হইতেছেন, কোন সহানুভূতি নাই!! অত্যাচার, নিষ্পেষণ ও ভ্রুভঙ্গিতে নিষ্পেষিত হইয়া পড়িতেছেন, কোন সান্ত্বনা নাই! এ হেন ব্যক্তিগণের দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রতিনিয়ত আকাশে দেশের কল্যাণ কামনায় উত্থিত হইতেছে, কিন্তু সংসারে কেহ দেখিবার, শুনিবার, অনিবারসহানুভূতি প্রকাশ করিবার নাই। "ছিন্ন কন্থা বার মাস পথের কাঙ্গাল হরিদাস, অকিঞ্চন দীন।" কংগ্রেস নাকি জাতীয় যজ্ঞ, সেখানে সকলের ঠাঁই মিলিল, কিন্তু এই এক শ্রেণীর নিত্য-উপেক্ষিত লোকদিগের মিলিল না। বলত, তোমার এত সাধের কংগ্রেসকে আমরা সকলে আদর করিব কি করিয়া?

তোমরা দল বাঁধিতেছ, দেশোদ্ধার করিবে, কিন্তু কই তোমাদের নিষ্ঠা, চরিত্র, স্বার্থত্যাগ? একটু স্বার্থত্যাগ করিলেই তোমরা দমিয়া যাও, একটু মানের হানি হইলেই চমকিয়া উঠ, একটু কিছু করিতে বলিলেই ভ্রুকুঞ্চিত কর, অথচ তোমরা দেশোদ্ধার করিবে? আগে চরিত্রে অটল হও, স্বার্থত্যাগে সিদ্ধ হও,পরোপকারে মুক্তহস্ত হও, তবে আসিও। নিজে কিছু যে না করিতে পারে, শুধু উচ্চ ভিক্ষাবৃত্তিদানে তাহার দ্বারা কিছু হয় নাই, কিছু হইবে না। ভিক্ষাবৃত্তিতে সে কিছুই করিতে পারিবে না? তোমাদের সহযোগিতা কে চায়? কেহ চায় না, তবুও তাহা বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ কেন? শুধু মায়ামরীচিকার ঘুরিয়া মরিতেছে, কুলকিনারা কিছুইপাইলে না। কেন এত অহঙ্কার বল ত? হায় দর্পহারী ভগবান আছেন তিনি অবহেলিত আমাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তোমাদের দর্প খর্ব্ব করিবেনই করিবেন! আমরা আর কখনও তোমাদের দ্বারস্থ হইব না।

(৩১)

আমরা এনিবেসাণ্টের লাঞ্ছনা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমরা লাল মুখ দেখিয়া প্রমত্ত হও, "গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লোটাও" তোমাদের হাবভাব দেখিলে আমাদের হাসি পায়। এবার মহাত্মা চক্রবর্ত্তী সাহসের সহিত বলিলেন, "তাঁহারা শুধু লুণ্ঠনের জন্যই আসিয়াছে" একথা শুনিয়াছ কি? এতদিন আমাদের কথা কাণে ধরে নাই, এবার ধরিবে কি? তাঁহারা সর্ব্বদাই জাতির

মর্য্যাদা, দলের দাবী রাখিতে তৎপর, এবার পঞ্জাবের বিচার-বিভ্রাট ও হোয়াইট-ওয়াস করার কথার মর্ম্ম বুঝিয়াছ কি? ডায়ারের জন্য নরনারী যেরূপ চাঁদা দিতেছে, তাহাতেও বুঝিতে পার নাই? বুঝিয়া থাক যদি সংযত হইয়া নির্ব্বাক হইয়া যাও, লাল মুখের ত্রিসীমায়ও যাইও না। আর যদি তাহা না পার, আহ্বান করিয়া শেষে "সেম সেম" বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে যাইও না। আহ্বানও করিবে, এবং অপমানও করিবে, ইহা অসহ্য। শুধু করতালি দিলে বা "সেম সেম" বলিলেই দেশোদ্ধার হয় না। চাই সংযম, চাই নিষ্ঠা, চাই ঐকান্তিকতা, চাই ধৈর্য্য চাই বীর্য্য, চাই মন্ত্রগুপ্তি, চাই স্বার্থত্যাগ, চাই কঠোর সাধনা। শুধু নাচানাচি বা মাতামাতিতে কি হইবে? ম্যাট্‌সিনি গারিবল্ডি কি করিয়া গিয়াছেন, ঐ শোন, ঐ শোন!

(৩২)

সহযোগিতা বর্জ্জনের কোন আশা নাই, অনুষ্ঠানেই তাহা বুঝা যাইতেছে। উপাধি পরিত্যাগের কথা তাহাও সর্ব্বত্র হইবে না। হইলেই বা কি? উপাধি বর্জ্জনে গভর্ণমেণ্টের কি ক্ষতিলাভ হইবে? গভর্ণমেণ্টের আদালত, স্কুল, কলেজ, লাটসভাও বন্ধ হইবে না, হইলে সকলের খরচ চলিবে কেন? ৭ দিন সব বন্ধ রাখিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যায়, কিন্তু ৭ দিনের মায়া বিষম মায়া, কে এত স্বার্থত্যাগ করিবে? বাঙ্গালার সকল নেতারই এক বাণী, সুতরাং আশা নাই। একসাইস ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ করাও সোজা কথা নয়, কেশবচন্দ্র, প্যারীচরণ পারেন নাই, তোমরা পারিবে কি? তোমরা নিজেরাও কি মদ্যপানের মমতা ছাড়িতে পারিয়াছ? বিশেষতঃ জনসাধারণের মধ্যে মদ্যপান যেরূপ বাড়িতেছে, স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বন্ধ না করিলে বন্ধ হইবার নয়। গভর্ণমেণ্টের ঋণ বিভাগ বন্ধ করিবার প্রস্তাব ও কার্য্যকরী হইবে না, কেন না, কেশোরাম-পোদ্দারেরা থাকিতে গভর্ণমেণ্টের ভাবনা কি? দেখ না, মিউনিসান বোর্ডের মামলা উঠিল, কিন্তু অনেকেই ঘুষ দিয়া রক্ষা পাইলেন! গভর্ণমেণ্ট এক শ্রেণীকে রক্ষা করিবেনই করিবেন। সৈন্যবিভাগ বন্ধ করিতে পারিলে সব মিটিয়া যায়, কিন্তু লাজপত-রায়দিগের সে ক্ষমতা নাই! সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন আশা নাই। বিদেশীয় দ্রব্যাদি বর্জ্জনের কথা? তাহা ত অসম্ভব ব্যাপার এ দেশের শিল্পাকুল ধ্বংস হইয়াছে, কে সব যোগাইবে? আঙ্গুল কাটিয়া তাঁতিকুলকে যাঁহারা নষ্ট করিল, চাঁদা দিয়া চিনির কারখানা যাঁহারা নষ্ট করিল, তাঁহাদের মায়া ছাড়া সোজা নয়। তাঁহাদের বাণীতে মধুবর্ষণ, আচরণে সুধাকর্ষণ, হরি হরি, তাঁহাদের দ্বারা যায় কি? সুতরাং কোন আশা নাই। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, মধ্য হইতে বাঙ্গালা নির্লজ্জতার অভিনয় করিলেন। এখনও তাঁহাদের ভিক্ষাবৃত্তিরও নেশা ঘুচিল না।

(৩৩)

পরলোকগত কুমার বসন্তকুমার।

রাজসাহী জেলার স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার বসন্তকুমার রায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কুমার বসন্তকুমার তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অকাল মৃত্যুর দুঃসহ শোকে যৌবনারম্ভেই সংসার ধর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছিলেন। অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া রাজকুমারেরা চারি ভ্রাতা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে বাল্য এবং ছাত্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন;—এই ছাত্রজীবনেই বসন্তকুমার বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও চরিত্রের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় শ্রীমন্ত ঘরের আদরের দুলালগণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য না হইলেও, দুঃসাধ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ এম এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত যতগুলি পরীক্ষা আছে, তাহার সকলগুলিতে তিনি কায়ক্লেশে কেবল মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা নহে, কোনও পরীক্ষাতে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানের নিম্নে আর তাঁহাকে যাইতে হয় নাই। বি-এ পরীক্ষায় সাহিত্য এবং দর্শনে 'ডবল অনার্স' লইয়াও অনায়াসে তিনি পার হইয়া গিয়াছেন; সর্ব্বাপেক্ষা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

নীরস যে ব্যবহার শাস্ত্র, তাহার পরীক্ষাতেও তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বান্ধব মণ্ডলী এবং আত্মীয়স্বজন যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেবলমাত্র পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিবার জন্য বসন্তকুমারের একান্ত পক্ষপাতী হন নাই;—যৌবনারম্ভে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান হইয়াও তিনি যে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, ইহা অনেকের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলেও হয়ত বা নিতান্ত অসাধ্য নহে; কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং সুস্থ সুন্দর সবল ও নীরোগ এই রাজনন্দন, দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সঙ্গসুখ হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হইয়াও, নিজের চরিত্রের নির্ম্মলতা যেরূপ ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে কেবল তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুগণ কেন, আপামর সাধারণ সকলকেই একান্তভাবে তাঁহার গুণমুগ্ধ হইতে হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিভব, যৌবন ও প্রভুত্ব—ইহার একটিতেই যে অনর্থ উৎপাদন করে ইহা শাস্ত্র-বচন, এবং সকলগুলি একাধারে বিদ্যমান থাকিলে, উৎসন্নের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় ইহাও মহাজনেরই পরম সত্য, অভ্রান্ত ও অস্খলিত বাণী। কিন্তু বসন্তকুমারের জীবনে ইহার সকলগুলির একত্র সম্মিলন অমৃত উৎপাদন করিয়াছিল। বাইশ বৎসরের উন্মুখ যৌবন, মোহময় সংসারের অদম্য প্রলোভন এবং অফুরন্ত কুবের ভাণ্ডার—ইহারা কেহই বসন্তকুমারকে তাঁহার যোগী-জীবনের কণ্টকময় কঠোর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

স্ত্রীবিয়োগের মরণাশৌচের দিন হইতে বসন্তকুমার যে হবিষ্যান্ন আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বদেশে বিদেশে, রোগে স্বাস্থ্যে, কোন স্থানে বা অবস্থাতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি একদিনের জন্যও করেন নাই। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ 'ক্যান্সার' ব্যাধি যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন চিকিৎসকের আদেশেও তাঁহার ভোজ্য ভোজনাদি যাবতীয় কার্য্যের কোন ব্যতিক্রম তিনি ঘটিতে দেন নাই। ফলতঃ ইন্দ্রিয়-দমন, আচার নিষ্ঠা, ধর্ম্মে আস্থা, কর্ম্মফল ও অদৃষ্টে বিশ্বাস এবং দয়া দাক্ষিণ্য পরহিতৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার চরিত্রকে সত্য সত্যই মাধুর্য্য মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে সংযম এবং ইন্দ্রিয়-দমনের শক্তি দেখিয়া, তাঁহাকে পুরোণোক্ত ভারতীয় ঋষিগণের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। সময় ও অবস্থাবিশেষে মুনির মনও টলিয়াছে, ঋষি চিত্তও চঞ্চল হইয়াছে, যোগিজনেও যোগপথভ্রষ্ট হইয়াছেন. কিন্তু ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষব্যাপী বসন্তের জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই. বারেকের জন্যও তাঁহার পদস্খলন হইতে পারে নাই।

বসন্ত তাঁহার জীবনবসন্তেই প্রিয়জনের বিয়োগবেদনায় একান্ত কাতর হইয়া সংসার-ধর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও আভিজাত্যের বলে তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা সংসারের অপরাপর কর্ম্মে যে স্থান অধিকার করিয়া যে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার যোগী-হৃদয়ে দেশপ্রীতি এবং পরহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি যে কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার একান্ত আপনার জন ব্যতীত অপরে জানিতে পারে নাই। এম-এ. বি-এল পাশ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তিনি সংসার হইতে সুদূরে সরিয়া নিভৃত পল্লী-নিকেতনে নিতান্ত নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্বীয় জীবিকার জন্য অতি সামান্য অর্থেরই প্রয়োজন হইত। তাঁহার বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির উপস্বত্বের অধিকাংশ যাহা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজসাহী কলেজের Chair fo A riculture এর জন্য সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বিপত্নীক নিঃসঙ্গ জীবনের রোগে স্বাস্থ্যে সুসময়ে অসময়ে যাহারা এই রাজকুমারের সেবা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুকালে কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিয়া যান নাই—সকলকেই যথাযোগ্য দান করিয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ পঁচিশ হাজার টাকা পর্য্যন্তও দানরূপে তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে। মানসী—ভাদ্র ১৩২৭।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

ময়ূরভঞ্জ রাজবংশ।

উড়িষ্যা।

উড়িষ্যা বিভাগের রাজ্য সমূহের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় করদরাজ্য। প্রাচানকালে এই স্থানে নিবিড় অরণ্য থাকায় "রুড়িখণ্ড" নামে পরিচত ছিল। এই রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলা, পশ্চিমে কেওঞ্জর রাজ্য, উত্তরে সিংভূম ও মেদিনীপুর জেলা এবং দক্ষিণে বালেশ্বর জেলা ও নীলগিরি রাজ্য। ইহার পরিমাণ ৪২৪৩ বর্গ-মাইল। কুচ-বিহার রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিন গুণ এবং দুইটী ব্রিটীশ জেলার সমান। ১৯১১ খৃঃ এই রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ। রাজধানী বারিপদ ব্যতীত প্রায় চারি সহস্র গ্রাম আছে। প্রতি বৎসর সার্ব্বভৌম ব্রিটীশরাজকে রাজস্ব স্বরূপ সম্মানের জন্য ১০০১৲ টাকা "নজর" দিতে হয়; জমিদারগণের ন্যায় ভূরাজস্ব দিতে হয় না। পূর্ব্বে এই নজর কয়েক কাহন কড়িমাত্র ছিল। ব্রিটীশ রাজ্যের প্রবর্ত্তিত শাসন নীতির আদর্শে ময়ূরভঞ্জের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। রাজধানীতে একটী এবং মহকুমায় তিনটী জেলখানা আছে। বারিপদ রাজধানীতে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় এবং রাজ্যমধ্যে ৩১৪টি স্কুল আছে। ডাক বিভাগের অধীনে ৭টি পোষ্টাফিস এবং ৬টি ঔষধালয় আছে। রাজস্ব ৩১০১৭৬৲।

স্থানীয় ঐতিহাসিকগণের মতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরের ক্ষত্রিয় মহারাজের বংশীয় জয় সিংহ নামক জনৈক আত্মীয় তাঁহার আসন্নপ্রসবা পত্নীসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে পুরুষোত্তম যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে পত্নীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি পত্নীকে তথায় রাখিয়া একাকী গমন করেন। অনন্তর তিনি প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, তদীয় পত্নী একটি সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

আদি ভঞ্জদেব—কালক্রমে সেই পুত্র স্থানীয় ময়ূরধ্বজ নামক জনৈক নরপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আদিভঞ্জ, আদিপুরে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যের নাম ময়ূরভঞ্জ এবং রাজবংশের উপাধি "ভঞ্জ" হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ ভঞ্জ—১৫৭২ খৃঃ এই বংশোদ্ভব রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ বারিপদ নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। তিনি তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বহু তীর্থযাত্রী উহা দেখিতে গিয়া থাকেন। রাজা বৈদ্যনাথের নামানুসারে ঐ বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ জিউ হইয়াছে। রুড়েখণ্ডের শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ জিউ হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ দেবতা।

যদুনাথ ভঞ্জ—১৮০৩ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উড়িষ্যা, বরার প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ জয় করিয়া হায়দ্রা-

যাদের নিজাম বাহাদুরের সহিত বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় তৎকালীন রাজা, মহারাষ্ট্রীয়দিগের করদরাজরূপে পরিণত হন। অতঃপর ১৮২৯ খৃঃ রাজা যদুনাথ ভঞ্জদেব বাহাদুর ব্রিটীশ রাজের সহিত একটি সন্ধি করেন; তদ্দ্বারা তিনি প্রবল প্রতাপ ব্রিটীশ রাজের অধীনে করদ-রাজ্য পরিচালনে স্বীকৃত হন।

শ্রীনাথ ভঞ্জ—অতঃপর শ্রীনাথ ভঞ্জদেব প্রতিনিধি হন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের আয় কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া রাজ্যের নানা-প্রকার উন্নতি এবং বহুবিধ দেশ-হিতকর কার্য্য করেন। তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ—আদি ভঞ্জ দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশে স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া যান। তিনি প্রথমে ইংরাজরাজ্যের শাসন প্রণালীর অনুকরণে স্বরাজ্য পরিচালনার চেষ্টা করেন এবং নানাপ্রকার লোক হিতকর বিষয়ের অব-তারণা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রথমতঃ "মহা-রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজের মধ্যম ভ্রাতা স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র ভঞ্জ দেব ছোট রায় সাহেব বাহাদুর মিষ্ট ও স্নেহ-শীল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ভঞ্জ দেব বড়লাল সাহেব বাহাদুর বর্ত্তমান আছেন। মহারাজার তৃতীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় রাউত রায় সাহেব বাহাদুরের বিধবাপত্নী এবং লালসাহেব শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভঞ্জ দেব ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ভঞ্জ দেব নামে দুইটী সুযোগ্য পুত্র বিদ্যমান আছেন। ১৮৮২ খ্রীঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব পত্নীসহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর, শুরগুজার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি তিনটী পুত্র ও কয়েকটী কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়া ছিলেন। জেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব দশম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে উত্তরাধি-কারীসূত্রে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। মহা-রাজের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র ভঞ্জ দেব হরিচন্দন মরদরাজ, নিকটবর্ত্তী নীলগিরি রাজ্যে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়া উক্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদামচন্দ্র ভঞ্জ দেব রাউৎ রায় সাহেব গৃহে থাকিয়া পারিবারিক বিভাগ পরি-দর্শন করেন। মহারাজের কন্যাদ্বয় সিং-ভুম—পোড়াহাটের রাজার সহিত এবং বারপল্লীর রাজার সহিত বিবাহিতা হইয়া ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ—মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর ১৮৭২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বারিপদ রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় দশম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে রাজ্য প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে এচ পি ওয়াইলি সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হন। দেওয়ান স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঘোষাল মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিয়া নানাবিষয়ে রাজ্যের উন্নতিসাধন করেন। তৎকালে মহারাজকুমার বাহাদুর কটক কলেজে বিদ্যা শিক্ষারম্ভ করেন। অতঃপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে

অধ্যয়ন করিয়া যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বি, এ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; কিন্তু অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অকালে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি পিতামহী ও খুল্লতাত মহাশয়ের স্নেহে প্রতিপালিত হন। ১৮৯২ খ্রীঃ মহারাজ কুমার রাজ্য ভার স্বহস্তে প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর ম্যানেজারের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। তখন তাঁহার শিক্ষক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর "এম, এ, বি, এল, মহাশয় জুডিশিয়াল সেক্রেটারী, অতঃপর দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার যত্নে ফৌজদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি বিভাগের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর মহাশয় দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার সুযোগ্য সহ-কারী শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু বি, এল, মহাশয় ষ্টেট জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। অধুনা মোহিনীমোহন রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশরাজের প্রবর্ত্তিত শাসন নীতির আদর্শে ময়ূরভঞ্জের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। অন্যান্য করদরাজ্য অপেক্ষা মহারাজের শাসন ক্ষমতা অধিক ছিল। একজন প্রধান দেওয়ান এবং তিন জন সহকারী রাজ্য শাসন কার্য্যে মহারাজকে সহায়তা করিতেন। এত-দ্ব্যতীত মহারাজের এক জন প্রধান জজ, একজন সব জজ এবং দুইজন মুন্সেফ আছেন, তাঁহারা বিচার বিভাগের কর্ম্মচারী। দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্-টারী, পুলিস, বনবিভাগ, জরিপবিভাগ ও সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি বিভাগ স্থাপিত করিয়া মহারাজ, রাজ্যের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের হাইকোর্টের ন্যায় মহারাজ একটি "জুডিশিয়াল কমিটী" প্রতিষ্ঠা করেন। চারিজন সাধারণ ও চারিজন অতিরিক্ত সভ্য এবং মহারাজ সভাপতিযুক্ত একটি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করেন। দেওয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, জজ ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট, এই সভার সাধারণ সভ্য। মহারাজ, মাজিষ্ট্রেটের হস্ত হইতে পুলিশকে স্বতন্ত্র করেন এবং পুলিশের অধীনে রীতিমত পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করেন। রাজধানীতে নূতন সুন্দর রাজ-পথ, ভিক্টোরিয়া ডায়মণ্ড জুবিলী নামক সাধারণের জন্য সুন্দর পুস্তকাগার, ময়ূর ভঞ্জ কুষ্ঠাশ্রম, স্বর্গীয়া মহারাণী লক্ষ্মীকুমারীর নামে ধর্ম্মশালা, বারিপদ অনাথ আশ্রম, বারিপদ এনট্রান্স, স্কুল প্রভৃতি মহা-রাজের লোকহিতৈষিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজধানীতে মিউনিসিপ্যালিটী এবং রাজপথে আলোক স্তম্ভ মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীর চতু-র্দ্দিকে রাস্তা এবং রূপসা হইতে বারিপদ পর্য্যন্ত ত্রিশ মাইল রেলপথ তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবে। রাজ্যের শিল্পোন্নতি মহারাজের জীবনের ব্রত ছিল; তদ্বিষয়ে তিনি নানারূপ উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজ ইউরোপ, চীন, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া শিল্প ও কলাবিদ্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঁহার রাজ্যের খনিসমূহের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে মহারাজ এক নূতন উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মহারাজ স্বয়ং সুদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন

করিতেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজা যদুনাথ ভঞ্জ দেবের সময় রাজ্যের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় ছিল। তৎপরে শ্রীনাথ ভঞ্জ দেবের সময়ে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেবের সময় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। অনন্তর মহারাজ যখন স্বয়ং রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন ম্যানেজার ওয়াইল সাহেব ও দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঘোষাল প্রভৃতির কার্য্য দক্ষতা গুণে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা আয় হয়। অতঃপর মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের সময় রাজ্যের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। মহারাজ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উৎকল সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দর্শন বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের সহবাসে থাকিতে ও গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রজার ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অকাতরে বহু অর্থব্যয় করিতেন। প্রজারঞ্জনই তাঁহার একমাত্র বিলাসের সামগ্রী ছিল। তিনি দাম্ভিক ও ধর্ম্মধ্বজী ছিলেন না। মহারাজ কোন দিন হিন্দুত্ব অস্বীকার বা তৎপ্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রে অনেক সময় অকপট হরিভক্তি পরিলক্ষিত হইত। ধর্ম্ম সাহিত্য ও চিন্তায় তাঁহার গভীর অভিনিবেশ ছিল। ইতিহাস পুরাণ, বিজ্ঞান প্রভৃতি ও কার্য্যকারী বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। শীকারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। মহারাজ সদ্‌গুণ সম্পন্ন কর্ম্মবীর, প্রজাবৎসল আত্মীয় স্বজন প্রতিপালক, পরোপকারী, ধার্ম্মিক, নিরহঙ্কারী, ও আড়ম্বর শূন্য ছিলেন কর্ম্মচারীদের প্রতি মহারাজ স্নেহশীল ছিলেন।

মহারাজ একজন আদর্শ নরপতি ছিলেন। তিনি ময়ূরভঞ্জের নিষ্ঠাবান হিন্দু রাজবংশীয়; কিন্তু তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বংশ গত অনুসারে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তৎপরে ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারী স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে লর্ড কর্জ্জনের দিল্লী দরবারে শ্রীরামচন্দ্র "মহারাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃঃ ২৪শে জুন বর্ত্তমান ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্ম তিথি উপলক্ষে তিনি উত্তরাধিকারক্রমে "মহারাজা" উপাধিসনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৯১১ খৃঃ ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভিষেক সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাত গমন করেন। বিলাতে তৎকালে অবস্থান সময়ে মহারাজের এক কন্যার নামকরণ উৎসব হয়; সেই তনয়ার নাম "মেরী" হইয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধির পত্নী লেডী মিণ্টো মহোদয়া রাজকুমারীর "ধর্ম্ম-মাতা" হন। মহারাজ কয়েক জন আত্মীয় স্বজন ও ইংরাজ সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজ্যের এক নিবিড় জঙ্গলে শীকার করিতে গিয়াছিলেন। মহারাজের জনৈক আত্মীয় তাঁহাকে ভ্রমক্রমে গুলি করিয়াছিলেন; তাহাতে আহত হইয়া মহারাজ শয্যাশায়ী হন। কলিকাতা আলিপুরের বজবজ রোডে মহারাজের প্রাসাদে তাঁহার চিকিৎসা হয়—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেব, শ্রীযুক্ত সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার প্রভৃতি চিকিৎসা করেন; কিন্তু নিয়তির শাসনে জীবনের মধ্যাহ্নে মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব ১৯১২ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী জগতের রঙ্গভূমি হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কালীঘাটের কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটে গঙ্গাতীরে সৎকার হইয়াছিল। ছোট লাটের একজন এডিকং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপে ঐ দিবস মহারাজের সৎকার সময়ে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এবং ময়ূরভঞ্জ ও কুচবিহারের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সৎকার সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

মানভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোট কাশীপুরের লোকান্তরিত মহারাজ নীলমণি সিংহ দেও বাহাদুরের পৌত্রী লক্ষ্মীকুমারী দেবীর সহিত ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহারাজের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। সেই রাণীর গর্ভে পূর্ণচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র নামক দুইটী পুত্র এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল কন্যাটির বসন্ত রোগে বিয়োগ হয়। অতঃপর স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই রাজ্ঞীর গর্ভজাত একটী কন্যা এবং পুত্র শ্রীযুক্ত ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র বর্ত্তমান আছেন। রাণীমাতা এক্ষণে মাসিক পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হইতেছেন।

জেষ্ঠ পুত্র মহারাজ কুমার শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর। ১৯১২ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী কুমার বাহাদুর রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছেন। নাবালক অবস্থায় একজন সিবিলিয়ান্ সাহেব ম্যানেজার গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত হইয়া রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, অধিকন্তু একজন পলিটীক্যাল এজেণ্টও আছেন। জ্যেষ্ঠ কুমারদ্বয় রাজপুতনার অন্তর্গত আজমীঢ়ের সামন্ত রাজকুমারদিগের কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত আগষ্ট মাসে ময়ূরভঞ্জের নাবালক মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এখন তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে সুযশে পিতৃরাজ্য সুশাসন করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গল করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

মাতৃ-পূজা।

কাল বিবর্ত্তনে ভারতের প্রাচ্য ভাব ম্লান হইয়াও কিন্তু তাহার চির সৌন্দর্য্যের এখনও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ছয়টী ঋতু বর্ত্তমান—সৌগন্ধবাহী মলয় মারুতের স্নিগ্ধ সান্ত্বনার বিরাম নাই। আর্য্য ঋষিদিগের সাধন কেন্দ্র সকল এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। পূত-সলিলা তুঙ্গ তরঙ্গিণী সমূহ নানা দুর্ঘটনায় ক্ষীণ শক্তি হইয়াও প্রবাহিতা হইতেছে। হিমাচল, নীলাচল, ওঙ্কারনাথ, নৈমিষারণ্য, কাশী গয়া, বৃন্দাবন

প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে কোথাও বেদ পাঠ, কোথাও বা সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, গীতা, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, কোথাও বা যোগতত্ত্বের গভীর ব্যাখ্যা, কোথাও বা হরিনামামৃত পান করিয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনে বিভোর।

এই পবিত্র প্রাচ্য ভারতে আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও বিজ্ঞান রসায়ন নানা শাস্ত্রের জ্বলন্ত ভাব প্রতীচ্য ভাবের সংমিশ্রণে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সময় বা কালের পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির যুগপৎ ভাবান্তর বুঝা যায় না। এই শরৎকালও নির্ম্মল জ্যোতিঃ সম্পন্ন ও চির সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত নহে। ঐ দেখুন, ঘন বারি-বিধৌতিত দিবাকরের কর নিকরে পৃথিবী যেন শুভ্র পরিচ্ছদে আহ্লাদিত। আহা! ঐ আকাশেরই বা দিবা দীপ্তি শোভা কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আবার রজতনিভ নিন্দিত শরচ্চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে রজনীরও শ্রী সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। জ্যোৎস্না প্রবাহিনী নভোমণ্ডলে সুধাংশু সুধা-প্রয়াসী চকোর-কুল অনুকূল ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া মধুর কণ্ঠে দিবা-তাপিতগণকে যেন তৃপ্তি দান করিতেছে। এই সময় ভারতবাসী নর নারীর আনন্দের সীমা নাই। প্রত্যেক গৃহে মাতৃ পূজার আয়োজন—ষষ্ঠ্যাদি কল্পে উদ্বোধনের নিমিত্ত স্মৃতির ঘন উত্তেজনায় ঘট স্থাপন। কেহ ঘটে, কেহ চিত্রপটে, কেহ বা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ অর্চ্চনা বন্দনা করিতেছেন। বস্তুতঃই ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই জগজ্জননীর আরাধনায় উন্মত্ত। এই শারদীয় মহাশক্তি পূজায় কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি গৌর, সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ মতের গণ্ডি-রেখা সমূহ মুছিয়া দিয়া এক প্রাণতার সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত!

এখন মাতৃ পূজার কথা! মায়ের আরাধনাও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, তিনটী ভাবে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রথমটী আধ্যাত্মিক নিষ্কলঙ্ক নিত্যভাবে, দ্বিতীয়টী হিংসা-বর্জ্জিত বিশুদ্ধভাবে, তৃতীয়টী হিংসা-জড়িত নির্ম্মমভাবে ব্যবস্থা। বস্তুতঃই বৈষ্ণবগণ পবিত্র উপকরণে অর্থাৎ ধূপদীপ নৈবিদ্যাদি দ্বারা মায়ের পূজা বন্দনা করেন। শাক্তগণ ছাগাদি পশু বলিরবিধানে উহাদের রুধিরদানে মাতৃপূজার উৎকৃষ্ট উপকরণ এবং ভোগোপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যাদির আয়োজনেও ত্রুটী করেন না। যাহা হউক, সম্প্রদায় বিশেষে মত ও পদ্ধতির যাহা নিয়ম আছে, তাহাই সকলে পালন করিতে বাধ্য। এখানে হিংসা বা অহিংসা সম্বন্ধে বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তবে একটু মনে মলিনতা আসিয়া পড়িতেছে যে, তিনি বিশ্বমাতা তিনি কি এই পশু রুধিরের জন্য লালায়িত? কখনই ইহা সম্ভব নহে। যদি রক্তপান করিতেই ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে লবণ সমুদ্রই বা কেন?—উহা রক্ত সমুদ্রই থাকিত! যাহা হউক, শাস্ত্রে যখন সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই ত্রিবিধ পূজার বিধি দেখা যায়, তখন ইহার ভিতরের গূঢ় তত্ত্ব অনুশীলন করিতে গেলে, ভীষণ যুক্তি তর্কের তরঙ্গে পড়িতে হয়। অতঃপর যাহার যে বিশ্বাস, তিনি তাহাই করুন। মূলকথাটী ত আনন্দ সম্ভোগ! যে ভাবেই হউক না—একটু প্রাণে শান্তি পাইলেই যথেষ্ট। পিণাক পটহ বাদ্যধ্বনিতেই হউক, আর যাত্রা থিয়েটার প্রমোদজনক ব্যাপারই হউক, যে কোন উদ্যমই চলুক না—ইহার উদ্দেশ্য তো মাতৃ পূজা বটে। বিশেষতঃ জগজ্জননী জগদ্দুর্গতি হরণ করেন বলিয়া এই উৎসব দুর্গোৎসব নামে অভিহিত হইয়াছে। হায়! দুঃখের কথা এই যে,

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তিনদিন পর আনন্দময়ী মা সকল প্রকার আনন্দ উৎসাহ লইয়া চলিয়া যান। দশমীর দিন বিজয়া অর্থাৎ মায়ের বিসর্জ্জন

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্রো দেব মহেশ্বরঃ।
সম বৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥

মায়ের সুসজ্জিত প্রতিমা তুঙ্গ তরঙ্গিণীর অতল তলে নিমজ্জিত হইল। জয় কোলাহল উৎসাহ উদ্যম ধূমধাম সকলি মিটিয়া গেল। মণ্ডপ গৃহটী যেন শ্মশানে পরিণত। ভক্ত সন্তানগণ হৃদয়ভেদী দুঃখানল দহন যাতনায় যারপর নাই সন্তাপগ্রস্ত হইলেন। এক বৎসরের জন্য মায়ের আগমন পথ চাহিয়া রহিলেন। কবে মা আবার আসিবেন, ইহা প্রাণের চিন্তা। এখানে বোধ হয়, এ সঙ্গীতটী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ঠেকা।

কেমনে বাঁচি মা বল ক'রে তোমায় বিসর্জ্জন।
প্রাণে না থাকিলে তুমি প্রাণ কি থাকে কখন?
প'ড়ে অন্ধকারে নরে, কল্পনায় খেলা করে
তাই ত এভাব ধ'রে, নিত্যভাবে অচেতন।
যাও আবার এস চ'লে, একথা মা কারে বলে
বলি চলি কার বলে, প্রতি পল প্রতিক্ষণ।
গগন ভুবন চয়, স্বরূপে মগন রয়,
কিরূপে সম্ভব হয়, জলে স্থলে বিচরণ?
তোমা বিনা এ হৃদয়, শ্মশান বা মরুময়।
সকলই ত বৃথা হয়, শব যে দেহ তখন।

এই ত রাজসিক ও তামসিক ভাবে মাতৃ পূজা। এখন সাত্ত্বিক পূজার বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা নিষ্ফল প্রযত্ন নহে। মাদৃশ নীরস শুষ্ক প্রাণ হইতে যদি নিত্য পূজার আবেগে স্বর্গীয় প্রেমাশ্রু এক বিন্দুও পড়ে, তবে নিরাশার কথা নহে। পরদুঃখকাতর ঋষিরা মহাশক্তির সাত্ত্বিক আরাধনার নিমিত্ত ও যথেষ্ট উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল সিদ্ধ মন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হইয়া প্রক্ষিপ্ত ছায়ায় প্রচ্ছন্ন থাকিলেও বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু হইলে সাত্ত্বিকতত্ত্বে বঞ্চিত হইতে হয় না। উদ্বোধন অর্থাৎ জাগ্রত হইবার জন্য ভক্তের অন্তর পটে বিশেষভাবে নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানবগণ ঐশ্বর্য্য লিপ্সার আতিশয্য বশতঃ অধীর হইয়া সাত্ত্বিক পূজা অতি কঠোর ও অসম্ভব মনে করেন এবং প্রমোদ মিশ্রিত রাজসিক ও তামসিক পূজা পদ্ধতির অনুশীলনেই একান্ত অনুরক্ত। সুতরাং সাত্ত্বিক তত্ত্বের বিষয় সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। তাই বলিতেছি, ভারত সন্তানগণ কি পরস্পর জাগিবেন না। আসুন, সকলে একপ্রাণতার মহামন্ত্রে মহাশক্তির আরাধনায় ঘট স্থাপনা করি। জগতের প্রত্যেক নরনারী আপনাপন হৃদয় ঘটটী ব্রহ্মসিন্ধুর অতল তলে ডুবাইয়া দিয়া মাতৃ পূজার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। হৃদয়ঘট হইতে নিশ্চয়ই মায়ের সান্ত্বনা বাক্য শুনিতে পাইব। এই ত পূজা আরম্ভ হইল। অখণ্ড চিন্ময়ীরূপে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি সকল অদৃশ্য হইয়া গেল। মাতৃদেবীর নিত্য-স্থিতিত্বের আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। বহির্জ্জগতের বাহ্যভাবের বস্তু সমূহ অসীম জ্যোতিঃ মণ্ডলে ডুবিয়া গেল। নিত্যযুক্ত ভক্ত তখন অপার্থিব শ্রুতিতে মাভৈঃ শব্দে আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইলেন। চকিৎ মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের আলো ফুটিয়া উঠিল—ভক্ত তখন জাগিলেন। হৃদয়াকাশে চিন্ময়ী মহাশক্তির আরাধনায় বাহ্য বস্তুর কোন প্রয়োজন নাই। মায়ের পূজায়

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য কিছু চাইনে, ছাগ মহিষাদি পশু বলি ও দুন্দুভি প্রভৃতির বাদ্যও চাইনে, তবে চাই কি? চাই স্বর্গীয় সুধা সুরভি গন্ধ, চাই জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিঃ, চাই প্রাণ মন জীবন, এই ত্রিসত্তার একীভূত শক্তির নৈবেদ্য, আর চাই প্রীতি পুষ্প, ভক্তি চন্দন অনিবার্য্য উদ্যম নিবন্ধন এটিও আবশ্যক, অবিশ্রান্ত অনাহত ভেরী ধ্বনি। আর চাই প্রকৃত পশু বলি। বস্তুতঃই পশু বৃত্তি সমূহকে বলি দিতে হইবে। বিশেষতঃ দম্ভ দ্বেষ অহঙ্কার ইহাদিগেরও বিনাশ সাধন আবশ্যক। এজন্য পাশব বৃত্তির তিরোধান অতীব সাধু সঙ্কল্প কেননা, উহা দ্বারা মানব প্রকৃতি কলুষিত হইলে, হিতাহিত জ্ঞান কিছু থাকে না। অনায়াসে লোক-নিন্দিত অতি ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারে। অতএব পাশব প্রবৃত্তিই পশু নামে অভিহিত, উহাকে বলি দিলে তখনই বিশ্বজননী দুর্দ্দান্ত মোহ-মহিষটীকে অব্যর্থ শক্তি শেল প্রয়োগ দ্বারা বধ করিয়া অশরীরি মহিষ-মর্দ্দিনী নামে মহাশক্তিরূপে প্রকাশ হন।* এবং অমিয় বাৎসল্য ও সান্ত্বনা বাক্যে ভক্তকে মুগ্ধ করেন। ভক্ত তখন আত্মহারা হইয়া যান। তাঁহার আর পার্থিব ভোগ বাসনা কিছুমাত্র মনে হয় না। বহির্জগতের বাহ্য পূজার প্রতি ততটা অনুরাগ থাকে না। ঐ সময় বাহ্যোদ্যমাদি সফল প্রযত্ন নহে, ইহা প্রাণে উদয় হয়—

"উত্তম ব্রহ্ম সদ্ভাবৌ ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জহ ধমোভাব বহি পূজাহধমাধমাঃ॥

ভক্ত যোগী, সকামজনিত বাহ্য ভাবের ঊর্দ্ধে উন্নিত হইলে, তিনি কেনই বা আর সময় পাত করিবেন। আধ্যাত্মিক পূজার প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সমূহের জন্য তখন বড় আকুল হইয়া পড়েন। ঐ আকুল উৎকণ্ঠাই তো অনুকূল অবস্থায় আসিয়া শুভ সঙ্কল্পটীকে এমনই সুদৃঢ় করেন যে, একমাত্র নিত্যভাব ভিন্ন ভাবিবার বিষয় আর কিছু থাকে না। বস্তুতঃই জগতত্ত্বের কোন অংশ স্বর্গীয় মহত্তত্ত্বের সহিত ঐক্য হইতে সক্ষম হয় না। শুভ সাধুভাবের আবির্ভাবে, শমদম তিতিক্ষা নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ইহারা সাত্ত্বিক ভাব হইতে পূজার উপকরণ সমূহ বহন করিতে আরম্ভ করে। ভক্ত তখন অনায়াস-লব্ধ পূজা সম্ভার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন এবং শক্তি পূজার নিত্য পদ্ধতির গূঢ় তত্ত্ব সমূহ অল্প সময়েই বুঝিতে পারেন। তখনই তত্ত্ব জ্ঞানের আলোকে মহামণ্ডলের পথ পরিষ্কার দেখিয়া ভক্ত প্রাণ এতই অধীর হয় যে, মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব সহ্য করিতে অসমর্থ। [illegible] মাতৃ পূজার স্তোত্র পাঠ—

নমস্তস্যৈ মহাশক্তি [illegible] ভকতবৎসলে
পামরে পরম শান্তি দেহি মে সর্ব্বমঙ্গলে।
জড়িত বিষয় ঘোরে ব্যথিত পাপ-কল্মষে
ত্রাহি মে চিন্ময়ী দেবী বাসনা বিষম বিষে।
ত্রিতাপ দহন তাপে তাপিত ভুবনেশ্বরী
যোগ শক্তি পরাভক্তি দেহী শক্তি শুভঙ্করী।
অনাদ্যা ভুবনারাধ্যা বিতর করুণা কণা
নীরস জীবনা ধারে সম্ভবে সত্য সাধনা।
সংসার নিবিড়ারণ্য মোহ তিমির সংবৃত,
শত্রুসঙ্কুল সংগ্রামে ভয়ে শোণিত শোষিত।
বন্ধুর দুর্গম পান্থে দেহি জ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময়ী
ত্বৎকৃপা কেবলং মাত্র সঙ্কটে ভরসা অয়ি।
কামাদি শ্বাপদ সিংহ বিচরে ভীম গর্জ্জনে,
নিস্তার নিখিল মাতা অতি ভীত দীনজনে।

* এইরূপে মাতৃ পূজার মহিষাসুর বধ হইয়াছিল।

ভারত বহু ধর্ম্মের আশ্রয়ে ও বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও মাতৃ পূজায় এক-প্রাণ, একহৃদয়। বলিতে কি, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই মহাশক্তির পূজার আনন্দ উচ্ছ্বাসে বাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই উন্মত্ত। প্রত্যেক নরনারীর প্রাণের ভিতরে এমন একটী মধুর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় যে, অতি অল্প বয়স্ক বালকেও মা মা বলিয়া পূজার পুষ্পাদি চয়ন জন্য ব্যাকুল। বাস্তবিকই এই মহা মহোৎসবে ধনী দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ আতুর সকলের জীবনেই মাতৃ পূজার মহা তরঙ্গ অনিবার্য্য। কিন্তু হায়! এই উৎসব যদি চির সম্ভোগের আধার পাইত, তাহা হইলে কখনই ধর্ম্মভাবের ঐক্য বন্ধন শিথিল হইয়া যাইত না। আবার নিরাশারও কথা নহে। এখনও ভারতে অনেক নিত্য তত্ত্বদর্শী ভক্ত যোগী আছেন, তাঁহারা বস্তুতঃই জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃ পূজায় প্রাণ, মন, জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, চিন্ময়ী মৃণ্ময়ীর পূজা অর্চ্চনা যখন চিরপ্রসিদ্ধ আছে, তখন উহার মধ্যে কোনটীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মৃণ্ময়ী মাতৃ পূজা রাজসিক ও তামসিক ভাবে বিজড়িত। তজ্জন্য পূর্ণ শক্তি পূজার আশা সুদূরপরাহত। এ বিষয় বাসুদেব মুখ-নিঃসৃত মহাযোগশাস্ত্র গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক গুণত্রয়ের বিশেষভাবে মীমাংসা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে তিনটী মাত্র শ্লোক এই স্থানেই উদ্ধৃত হইল। অবশ্যই মহাশাস্ত্র গীতার মহামন্ত্র শ্রবণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নহে। অল্পেই সুধীগণ পূজার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবেন।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয় মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি
সাত্ত্বিকম্॥'
১৮ অঃ ২০ গীতা।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজ সমুদাহৃতম্॥২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তায় সমুচ্যতে॥২৫

এই গুণত্রয়ের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের পূজাই শ্রেষ্ঠ। কেননা ইহার ভিতরে কোন প্রকার মলিনতা বা বাহ্যাড়ম্বর কিছুই নাই। যোগশাস্ত্র গীতারও মন্ত্রাভাসে চিন্ময়ী মাতৃ-পূজারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যোগী, ভক্ত, সাধক সকলেই এই মীমাংসায় বাধ্য। তবে ভক্তির উচ্ছাস তরঙ্গে পড়িয়া কল্পনা কল্পে স্থূল দৃষ্টির প্রখরতাই প্রবল হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সত্য বস্তুর চিন্তা বা তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া, এটি সহজ নহে। সাত্ত্বিক সিদ্ধ যোগী, ভাবমগ্ন ভক্ত, উচ্চ সাধক তান্ত্রিক ভিন্ন বিচারবিৎ পণ্ডিত দ্বারা উহার আশা করা নিরাশারই কথা। এটি অবশ্যই বলিব যে, যাহার যতটুকু সাধন শক্তি—তিনি সেইটুকু লইয়াই আরাধনা করুন। কিন্তু ঐ অভ্যাসটী যেন শোণিত গত না হইয়া পড়ে। ঋষিরা স্থূল যোগাভ্যাসেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন সত্য। উহা প্রথম সোপান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও পরিত্যজ্য। ঐ সাধনাভ্যাসটীকে জলৌকার ন্যায় পরিত্যাগ করিতেই হইবে। এই কারণেই প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ এই তিনটী সাধনের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। অতঃপর যিনি যে ভাব ধরিয়াই চলুন, পরিশেষে মহাভাবের মহামণ্ডলে উপনীত হইতে পারিলেই তো ঐ চিন্ময়ী মহাশক্তি

মা ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইবেন না। মৃৎ পদার্থ জাত যে কিছু সমস্তই কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এখন দেখুন, অখণ্ড চৈতন্যময়ীর জ্যোতিঃ মণ্ডলেই তো মহাযোগ অর্থাৎ মহামিলন। এইখানেই মহাশক্তির পূজার ভক্ত যোগীগণ সিদ্ধিলাভ করেন। এবং জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হন। এই স্থানটী কোথায়? ঐ যে সমাধিস্থ যোগীদিগের হৃদয়! আহা! যোগসিদ্ধ যোগীর হৃদয়াকাশের প্রসারও যে অনন্ত ঐ মহামণ্ডলের জ্যোতিঃ হইতেই তো মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র, গীতা, উপনিষদ্ বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি ও যোগ শাস্ত্র সকল বাহির হইয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত ছায়ায় মহত্তত্ত্ব সকল দেখিতে পাই না। এহং গ্রহণ করিতেও সক্ষম নহি। বাহ্য-ভাবের তরঙ্গাঘাতে হৃদয়াকাশে মায়ের অরূপে স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত। অনেকেই বলেন যে, নিরাকারে ধারণাই অসম্ভব—দর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? এখানে এই কথাটি অসার মনে করিবেন না। সহজেই বুঝুন, আপনি বিদেশে চাকুরী করিতেছেন। হঠাৎ শুনিলেন, আপনার মাতৃদেবী মৃত্যু শয্যায় শায়িত; আর থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতগামী বাষ্পীয় যানে অতি সত্বরে গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তুলসী তলায় মাতার শব শরীর। তখন মাতৃ-দর্শন বিরহ-শোকে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন। হায়! হায়! পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে আসিলেই মায়ের দর্শন পাইতাম। কেন? মাতৃদেবীর শরীরের তো কোন ব্যত্যয় হয় নাই। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সকলই তো আছে। তবে কেন মায়ের জন্য আক্ষেপ করিতেছেন? তাই বলিতেছি, মা যখন দেহটি ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন তখন কি কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন? তবেই দেখুন, মায়েতেও মা ছিলেন। যে মা দেহটী ছাড়িয়া গেলেন, তাঁর কি কোন আকার ছিল? সর্ব্বব্যাপিনী বিশ্ব-জননী সকলের মধ্যেই স্থিতি করিতেছেন। ভ্রান্তির আবরণে আমরা দেখিতে পাই না।

এখন নিরাকারে রূপ দর্শনের ধারণা সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। সিদ্ধ যোগীরা অখণ্ডভাবে হৃদয়েই ধারণা করিয়া থাকেন। এ বিষয় অতি সংক্ষেপে দুটীমাত্র কথা বলিতেছি। সুধীগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আপনি ঐ অসীম শূন্য দেখিতে-ছেন। উহার হস্ত পদাদি বিশিষ্ট কোন আকার নাই। তথাপি উহাকে অখণ্ড ভাবে ও বস্তুরূপে বুঝিতেছেন।* আরও দেখুন, আপনার হৃদয়ে আনন্দ আসিল, তাহারও কোন পার্থিব আকার দেখা যায় না। কিন্তু ঐ আনন্দকে কি আপনি আনন্দময়ীরূপে দর্শন করিলেন না? উপ-নিষদ্ কি বলিতেছেন। যোগীগণ জীবনা-ধারেই অরূপে রূপের ধারণা এবং চিন্ময়ী মাতৃ দর্শন করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক একটু বাহ্য তৃপ্তির প্রতি বীত-রাগ জন্মিলে স্বাভাবিক ভাবে জ্যোতিঃ মণ্ডল হইতে তড়িচ্ছটার ন্যায় মায়ের স্ব-রূপ ভাব ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকে! তখনই হৃদয় হইতে অনাহত দুন্দুভি বাজিয়া উঠে। স্বর্গীয় অমৃতধারায় মোহসন্তপ্ত শুষ্ক প্রাণ জুড়াইয়া যায়। বহির্ভাব বহির্পূজাদির উল্লাস তরঙ্গের প্রবল শক্তি আর থাকে না। অতি নিশ্চয় সত্য যে, অন্তশ্চক্ষুতে মহাশক্তির

* ঋষিরা এইভাবেই নিরাকার শূন্যকে খিত্যাদি তত্ত্বমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

দর্শন হৃদয়েই হইয়া থাকে। বহিশ্চক্ষু মেলিয়া রহিলে ও কিছু দৃষ্ট হয় না। পার্থিব শ্রুতিও বধির অপার্থিব শ্রুতিতে প্রাণমুগ্ধ মধুর সান্ত্বনা বাক্যে যে একেবারে অধীর করিয়া ফেলে। কে বলে যে নিরাকারে ধারণা ও দর্শন হয় না? এটী নিশ্চেষ্ট মানবগণের সম্পূর্ণ ঔদাস্য ও নৈরাশ্যের কথা। এখন প্রার্থনা—

মা! আর প্রার্থনা কি করিব। তুমি তা আমি জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে! বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল অবস্থায় রক্ষা করিয়াছ। তোমার কৃপার দান, দুর্ব্বহ দুঃখ সম্ভার বহন-ভার, অতি আনন্দের বিষয় বলিয়া, ব্যথিত হই নাই। দরিদ্রতার নিষ্পেষণে বরং সময়ে সময়ে কষ্ট যন্ত্রণার ভিতরেও সেবা ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছ। কিন্তু আমি তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। তবুও অতি অধম অকৃতজ্ঞ সন্তান সত্ত্বেও তোমার বাৎসল্য ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। আমি যাহা প্রয়োজন বলিয়া মনেও করি নাই, তাহাও দিয়াছ। আমার অভাব যখন আমি বুঝি না, তুমিই তো পূর্ণ করিয়া দাও, তখন আর চাহিবার কি আছে মা! তবে প্রাণের এই একটী আকাঙ্ক্ষা যে, তোমার অভেদ কৃপার গুণে কোন সময়েও সাত্ত্বিক তত্ত্বের আভাস কিছু পাইয়া থাকি, তাহাই জগতের বিষয়-বিলাস-সুখ নিরত ভাই ভগিনীদিগকে দিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সেবা করিতে পারি। তাঁহারা যেন তোমাকে আনন্দময়ীরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তোমার যে সকলেরই প্রতি স্নেহ বাৎসল্য অক্ষুণ্ণ—করুণার সীমা নাই। তবে আর অভাব কি?—এই মরুময় হৃদয়টা তোমাকে দিতে পারিলে, তুমি ত কখনই শূন্য হৃদয় রাখ না। আর এই চাই মা, শোক দুঃখ সন্তাপিত নিরাশ শুষ্ক জীবনে যাহারা সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করিতেছেন, তাহাদিগকে শান্তি দাও। আমাদের সকল ইচ্ছা তোমার অনন্ত ইচ্ছায় মিশিয়া যাক্। আমার বলিতে আর যেন কিছু না থাকে। প্রাণ মন জীবন এই ইচ্ছা-যোগে একীভূত হইলেই ত জীবন্মুক্ত—তাই প্রার্থনা করিতেছি, চিন্ময়ী মাতৃরূপে প্রকাশিত হও। জগৎ তোমার নিত্য পূজায় পরিতৃপ্ত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

তাজমহল।

সেদিন, আমার একজন আপনার লোক আমাকে লইয়া, অভিনব দিল্লীর রাজধানীর আড়ম্বর পূর্ণ ভিত্তি দেখাইলেন; যাহা গঠিত হইলে ভারতে আর এক মহান কীর্ত্তি স্তম্ভ থাকিয়া যাইবে। পরদিন আগরার তাজ-মহল দেখিতে গেলাম।

আট বিষয়ে স্থাপত্য বিষয়ে কত লেখক পৃথিবীর নানা ভাষায় তাজমহলের কত বর্ণনা

করিয়াছেন, আমি তাহা করিব না। কিন্তু তাজমহলের পরিপার্শ্বিক দৃশ্য, শীর্ণকায়া যমুনার উপরে একান্ত বিশাল ধরণীর অলঙ্কার তাজমহল, আমার প্রাণে যে চিন্তা ধারা ঢালিয়া দিল, তাহাই কিছু বলিব।

সাজাহান, ওপারে ক্ষুদ্র একটী হর্ম্ম্যে বসিয়া তাজমহল নির্ম্মাণ দেখিতেছেন। এক মাত্র সহধর্ম্মিনী মমতাজ মহলের নিকট প্রাশা খেলিতে২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাজবিবি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি মরিলে তুমি আমার জন্য কি করিবে? তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি যেমন ধরণীর অলঙ্কার, তেমনি এমন একটী জিনিস প্রস্তুত করিব, যাহা ধরণীর অলঙ্কার। সাজাহান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট, সাজাহান ঋষি, তিনি এই আমোদ কালীন প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন না। রাজকোষে অগাধ টাকা। তাঁহার মহান উদার হৃদয়, ক্ষুদ্র ২ কারণে লোকের সর্ব্বনাশের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ করেন নাই।

রাজ্যে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজিত। এই শান্তিময় রাজ্যে শান্তি প্রয়াসী নরপতি, এই জগতের অলঙ্কার বিচিত্র সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সাজাহান চলিয়া গিয়াছেন, শত শত বৎসর চলিয়াছে, তাজবিবি চলিয়া গিয়াছেন, শত শত আক্রমণকারী ভারতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু কাল ও অত্যাচারী দস্যুগণের আক্রমণ অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির রঙ্গভূমি আগ্রাবনে এই বিশাল সুন্দর হর্ম্ম্য জগতের প্রশংসা আকর্ষণ করিয়া জগতের একটী প্রধান আশ্চর্য্য সৌধ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাজমহলের উন্নত বারাণ্ডায় বসিয়া ভাবিলাম, একবার হায়,সাজাহান,হায় সাজাহান,বলিয়া ক্রন্দন করি যে,তুমি চলিয়া গিয়াছ, তোমার প্রিয় পত্নী তাজবিবি চলিয়া গিয়াছেন, তাজমহলের এক অন্ধকার গৃহে তুমি ও প্রাণ প্রিয়া পত্নী সমাহিত রহিয়াছ। সেই মৃত প্রস্তর রাশির মধ্যে তোমরা মৃত, সাড়ে তিন হস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ। সকলেই মৃত। এই বিশাল হর্ম্ম্যের অসীম কারুকার্য্য বলিয়া দিতেছে মৃতের সমাধি। আর সাজাহান আসিবে না। আর মমতাজমহল আসিবে না। সে শৌর্য্য নির্ম্মাতা শিল্পীগণও আসিবে না, সেই রাজৈশ্বর্য্য সম্পদ, বিপুল অর্থপূর্ণ ভাণ্ডার আর আসিবে না। আজি যমুনার তটভূমি নীরব, আজি তাজমহল তোমার নহে, ভারতের লুপ্ত সমৃদ্ধির নীরব সাক্ষী, ভারতের মহত্ত্ব, ভারতের কীর্ত্তি সকলেই অতীত সকলই নীরব। তাজমহল, তুমি মৃতের সমাধি, মৃত প্রস্তর ভূষণ লইয়া মৃত ঐশ্বর্য্যের গৌরব স্বরূপ তুমি মৃত। যমুনার নীল বারি, কত মৃতের অভ্যুদয় দেখিল, বিলীন দেখিল। কত মহা পুরুষের শ্মশান ভস্ম নীরবে ইহার দেহে মিশাইল। শেষে জীবিতেরাও মৃত হইল। কি হইলে, তাজমহল আজিও তুমি জীবিত থাকিবে? আজি আমাদের তাজমহল বলিয়া মনে করিতে পারিতাম? যদি এই মনোহর বনে সৌধের সহিত তোমাদের অক্ষয় কীর্ত্তি বিরাজিত হইত! মোগল চলিয়া গিয়াছে, হিন্দু রাজগণ,বৌদ্ধ রাজগণ, মুসলমান রাজগণ বিলীন হইয়াছেন। যেমন অতীত কাল শত শত সমাধিসহ নানা অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষী প্রদান করিতেছে। তেমনি অদৃশ্য ভবিষ্যৎ কত ঐশ্বর্য্যের মৃত্যু, রাজবংশের বিলোপ, রাজ পুরুষের অন্তর্দ্ধান গর্ভে লইয়া আমাদের নিকট সমুত্থিত হইবে। আর ও কত তাজমহল আসিবে, যাইবে,

তাজমহল, কি হইলে তুমি স্থায়ী হও। কি হইলে তোমার নব জীবন হয়?

যদি যখন শাহজাহানের রোগ আসিল, তখন পুত্রদিগকে না ডাকিয়া যদি প্রকৃতিপুঞ্জকে আহ্বান করিতেন,যদি রাজ্য শাসনের জন্য এক মণ্ডলী স্থাপন করিয়া যাইতেন, যাহা যুগ যুগান্তরে নব নব ভাব গ্রহণ নব সজ্জায় সজ্জিত হইত। পুত্রগণের দুঃখের জন্য, তাঁহার কান্দিতে হইত না। রাজ্যের অমঙ্গলের জন্য, ব্যস্ত হইতে হইত না। এখানেই খাস, খানান, মন্ত্রীবর, সেনাপতি দেশ নায়কগণ বিরাজ করিত। নূতন নূতন সৌধ এইখানে বিহার করিত। নব পর্য্যায়ে নব নব দৃশ্য আগমন করিত। নব নব উন্নতি স্রোত রাজনৈতিক ধারা এখানে প্রবাহিত হইত। এখান হইতে ওয়াসিংটন জন্মিত ম্যাটসিনি জন্মিত, সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা নাম ধ্বনিত হইত।

সে সময়ে যদি সমস্ত সাম্রাজ্য আমি একক সম্ভোগ করিব, সমস্ত ভারতবাসিকে আমার মত মতন গঠন করিব? এই স্বার্থপরতা একজনের প্রাণে না আসিয়া চারি ভ্রাতা রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রকৃতি পুঞ্জের শাসন বিধান করিতেন, তবে এই তাজমহল, দিল্লীর দুর্গ, জুম্মা মসজিদ, সেকেন্দ্রা সকলের মনে ভারতও স্থায়ী হইত।

ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, ভবিষ্যৎ দেখে না, যেজন্য জীবনে মহাপাপ সঞ্চার করিয়া নিজের ভোগের জন্য সমস্ত জগৎ রাখিয়া পুত্রগণকেও দিব না, সেইজন্য এই বিপুল সাম্রাজ্য কালে পর পদদলিত হইয়া বংশ শেষ হইল, সাম্রাজ্য ধ্বংশ হইল এবং এই বিপুল গৌরববাহী সৌধ, মৃতের সমাধিতে পরিণত হইল। জগতে যত রাজরাজ্যেশ্বর আসিয়াছেন, সমাধি অথবা স্তূপ, মিনার অথবা স্তম্ভ তাহাদের নাম স্মরণ করাইতেছে। মৃত প্রস্তর মৃতের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। অথবা মহতী কীর্ত্তি মহাভারত বা রামায়ণে জীবন্ত ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে, সকলেই কালের করাল মূর্ত্তি প্রকটিত করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে জীবন্ত তিনি; শব, মৃত্যুও যাহাকে বিস্মৃত হইতে পারে না। ধর্ম্মক্ষেত্রের কথা বলি না। কারণ কত মন্দির কত মসজিদ গির্জ্জা। ব্রহ্ম ও ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, তথায় কাশর ঘণ্টা স্তোত্র বা সঙ্গীত আজীবন প্রবাহিত হইতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে মৃত্যু নিবারণ করা কাহার সাধ্য? কারণ ধন সম্পদই মৃত্যুকে আকর্ষণ করে, সাম্রাজ্য শত শত্রুকে আহ্বান করে। এখানে যদি সম্রাটগণ প্রকৃতিপুঞ্জকে প্রজাতন্ত্র প্রদান করিতেন, তবে এক তাজমহলের পরিবর্ত্তে শত শত তাজমহল তাহাদের কীর্ত্তি গরিমা ঘোষণা করিত। ক্ষুদ্র দৃষ্টি স্বার্থান্ধ বাসনা মহত্ত্বের কত অন্তরায়। মৃত্যু, বাসনা কামনা স্বার্থ পরতার সঙ্গেই প্রবাহিত হয়। শত শত নৃপতির বিলুপ্ত কীর্ত্তি বিলুপ্ত কাহিনী তাহা প্রচার করিতেছে। তাহা মৃতের কাহিনী অতি সুন্দর হইলেও জীবনপ্রদ নহে। মৃত সাজাহানকে কোন কথা বলা বৃথা, কিন্তু প্রথমে যাহা বলিয়াছি, সেই সব দিল্লীর নূতন সৌধ যাহা, তাজমহল, কুতুব মিনার ও অন্যান্য নৃপতিগণের কীর্ত্তির অনুকরণ করিতেছে, কালে তাহাও কি রাজা জর্জ অথবা রাজ প্রতিনিধির মৃত সমাধি হইয়া বিরাজ করিবে না? যাহাতে

তাহা না হয় সে উপায় তাহাদের হাতে বর্ত্তমান আছে এজন্যই এত কথা লিখিলাম। সমর সভায় শান্তি সংস্থাপনের জন্য প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নাম মহাশক্তিরূপে বিরাজিত। দিনিপেকদিগের অদৃষ্ট আকাশে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের সুন্দর পতাকা পর পর ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এই দিল্লীর নব নির্ম্মিত সৌধ কি ভারতবাসীর চির আকাঙ্ক্ষিত স্বায়ত্ত শাসনের সাহায্য করিবে না? মৃতের মন্দির না হইয়া ইহা ভারতীর শত শত জনপদের প্রতিনিধিগণকে ইংলণ্ডের সাহায্যে মহাভারতীয় প্রজাতন্ত্র সমিতি গঠন করিয়া উক্ত মহাত্মাগণের নাম জগতে চিরস্মরণীয় করিতে পারিবে না? তাজমহল কান্দিতেছে, সেকেন্দ্রা কান্দিতেছে, কুতুবমিনার প্রথু রাজের রাজসভা কান্দিতেছে। কিন্তু একদিন এই নব সৌধ হাসিবে। আয়র্লণ্ড শত চেষ্টা করিয়া পায় নাই; পরে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া আজি জগতে ধন্য হইল। ভারতের এদিন যদি ইহারা না দেন, নবজাগরণ ও ভারতের নবজীবন তাহা নিশ্চয়ই আনিবে, ও সৌধ নিশ্চয়ই সেদিন দেখিয়া হাসিবে। কিন্তু সে হাসি যদি আমাদের রাজা ও রাজপ্রতিনিধি আনয়নে সাহচর্য্য করেন, প্রেমের স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইবে। শীতল মারুত বহিবে, সুন্দর জাতীয় তরণী মনোহর পবনে পাল তুলিয়া শূন্য পথে অগ্রসর হইবে! সকল লোকে বলিবে। ধন্য রাজা, ধন্য রাজ প্রতিনিধি।

নতুবা তাহা তাজমহলের ন্যায় ঘনীভূত কবিতার মত মৃতভাবে বিরাজ করিবে। অথবা বিপ্লব ঝটিকা একদিন কত শোকাবহ ঘটনা আনয়ন করিবে; ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে!

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

কবি গোবিন্দ-সখা।

যখন অঙ্গ অবসন্ন ছিল তোমার বাতে।
শক্তি-হীন ছিল চরণ বল ছিল না হাতে।
গোবিন্দ দাস তখনো যে এসে তোমার ঘরে,
বিষাদ ভরা প্রাণের কথা বলেছে কাতরে।
তুমিই ছিলে তাহার বন্ধু ছিলে বাহুর বল,
বুঝতে তাহার প্রাণের ব্যথা মুছতে
আঁখি জল।

বাতের ব্যথায় জীবন যে যায় শুয়ে শয্যাপরে,
তবু তুমি দিবানিশি ভাবছ কবির তরে।
তোমার মত স্নেহ এত কেউত করে নাই,
তুমিই ছিলে জীবন সখা তুমিই ছিলে ভাই।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে দাস গোবিন্দের তরে,
যোগায়েছ তাহার অন্ন, এমন কেবা করে?
তোমার শিরে থাকবে সদাই বিভুর করুণ
হাত,

করবে তোমার দীর্ঘ জীবন বিধির আশীর্ব্বাদ
গোবিন্দদাস স্বর্গে গেছে বিশ্বে সে আজ নাই,
তোমায় পেলে কবির বিষাদ একটু
ভুলে যাই।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

---

* কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন মরণের বন্ধু ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত কামিনী কুমার সেন এ , ব , , এল, প্রভৃতি।

ময়ূরভঞ্জে ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার এক রাজকুমারের উড়িষ্যায় এবং ময়ূরভঞ্জে অবস্থান বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু জগন্নাথ মহাপ্রভুর অনুগ্রহে বাঙ্গালীগণ অনেক সময়ে উড়িষ্যায় আগমন করিয়াছেন। ত্রিপুর রাজ কল্যাণ মাণিক্য উড়িষ্যা হইতে বৌদিক ব্রাহ্মণ লইয়া যান, ইহাদের অনেকে এখন ও শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায় বাস করেন। বঙ্গ রাজ হরিবর্ম্ম দেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যশোহরের বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, দায়ুদ খাঁ কেরানীর সঙ্গে উড়িষ্যা আগমন করেন। আমার বোধ হয়, এই সময়ে অপর দুইজন রাজপুত্রের উড়িষ্যায় শুভাগমন হয় এবং ইহারা উৎকলের বিপ্লবে কোন কোন পক্ষে সাহায্য করিয়া যুদ্ধাদি করেন। এই দুইজন রাজপুত্র রাজা বসন্ত মাণিক ও কুতবশাহী ফেরোজ সাহা। রাজা বসন্ত মাণিক সম্ভবতঃ ত্রিপুর রাজ বিজয় মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কুতবসাহী ফেরোজ সাহার নাম কুতবসাহী রাজ তালিকায় পাওয়া গেল না। ইহারা গোলকুণ্ডার রাজত্ব করিতেন এবং সম্ভবতঃ ইনিও বসন্ত মাণিক্যের ন্যায় পলাতক রাজকুমার ও এজন্য উভয়ের বিশেষ প্রণয় হয়। ফেরোজ সাহ উড়িষ্যায় গতাসু হন ও বসন্ত মাণিক তাঁহার স্মরণার্থ একটী স্তম্ভে লিপি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই এই ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত শরডিহা পরগণায় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এক খণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর এখন ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বাড়িপদার মিউজিয়মে আছে। শিলা লিপিতে উপরে নাগরী ভাষায় ও নাগরী অক্ষরে ও নিম্নে উড়িয়া অক্ষরে ও উড়িয়া ভাষায় লিপি খোদিত আছে। লিপিটীর অর্থ এই ঃ—সম্বৎ ১৬৪৫ শাকে ১৫০৯ সন ৯৯৪ সময় জ্যেষ্ঠ সুদি পূর্ণিমা ১৫ গুরু বাসরে শ্রীকুতব শাহী ফিরোজ সাহা মহা নিষ্কৃতং। শ্রীরাজা শ্রীরাজা বসন্তজী মানিক বন্দে গো (সেলাম) আমি এই প্রস্তর তোরণে রাখিলাম যদি কেহ তোপ দ্বারা বা অন্যরূপে ইহাকে ভাঙ্গেন বা স্থানান্তর করেন তিনি মুসলমান হইলে শূকর বধের পাপী ও হিন্দু হইলে গো ব্রাহ্মণ বধের পাপী হইবেন।

এই লিপির সন ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ। ত্রিপুর রাজ বিজয় মাণিক্য ১৫৩৫ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ইহার দুই পুত্র ছিল জেষ্ঠ্যের নাম অজ্ঞাত কনিষ্ঠ অনন্ত মাণিক রাজা হইয়াছিলেন। উক্ত আছে যে একজন জ্যোতিষ গণিয়া বলিয়াছিলেন যে কনিষ্ঠ রাজ পুত্র রাজা হইবেন, এজন্য জ্যেষ্ঠকে উড়িষ্যায় নির্ব্বাসিত করা হয়। নাম ও ঘটনার সাদৃশ্য দৃষ্টে বোধ হয় যে নির্ব্বাসিত রাজকুমারই এই বসন্ত মাণিক্য। সম্ভবতঃ ইনি উড়িষ্যার কোন রাজবংশে বিবাহ করিয়া এদেশে ভব লীলা শেষ করেন। কুতব সাহী ফিরোজ সাহা ও রাজ্যলাভ দুরাশা দেখিয়া গজপতি রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও অবশেষে উড়িষ্যায় সমাধিস্থ হন তাহারই স্মরণ চিহ্ন এই প্রস্তর লিপি। প্রস্তর খণ্ডের কোন ফটো লওয়া যায় নাই তবে পাঠোদ্ধার হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জ সম্বন্ধে বাহ্যতঃ সম্পর্কশূন্য হেতু এখানে সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। আশা করি ত্রিপুরার কোন ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কিছু অবগত থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু।

কলেরায় কালীপূজা।

সেবার হয়নি কোথাও ধান
দুর্ভিক্ষ এলো দেশে।
গরীবের দল গণিল প্রমাদ,
ধনী কাটে কাল হেঁসে।
(শেষে) বিসূচিকা দিল দেখা
নরনারীগণ মরিতে লাগিল,
হাহাকার স্বরে গগন ভরিল,
ধনিগণ হৃদে ভয় দেখা দিল
শুকাল হাসির রেখা।
পণ্ডিতগণ করিল যুক্তি
পূজিতে হইবে মাকে ;
জমীদার গৃহে মণ্ডলগণে
পেয়াদা আনিল ডেকে।
(সবে) জমীদার বলে ধীরে—
পুরোহিত মোরে ব'লেছেন আজি,
সবে মিলে যদি শ্যামা মাকে পূজি,
স্বপ্নে নাকি তিনি হয়েছেন রাজী
যাবেন চলিয়া দূরে"।
মণ্ডলগণ ত্বরায় সকলি
জানাল' সবার কাছে
মায়েরে তুষিতে দিল দীনগণ
যায় যে পয়সা আছে।
(এক) শুভ শনিবার রাতে
মহা সমারোহে হ'ল পাঁঠা বলি
ভক্তগণ নিল মা'র পদ ধূলি
প্রসাদও কেহ ত্যজিল না ভুলি ;
বাড়ী গেল সবে প্রীতে।
দীনের পূজায় দীন দয়াময়ী
হ'ল না তথাপি তুষ্টা
পূজায় কি যেন হয়েছিল ভুল
তাই হল মাতা রুষ্টা।
(ক্রমে) বেড়ে গেল হাহাকার
যে যেথা মরিল সেথা সে রহিল,
শিবাদি সবার আনন্দ বাড়িল
পুরোহিত শেষে বসুধা ছাড়িল ;
কাঁপে সদা জমীদার।
হঠাৎ তাঁহার সৌধে একদা
উঠিল কাঁদার রোল,
সুধাল' দ্বারীরে ভিখারী নবীন
"কিসের গো এত গোল ?"
(ধীরে) দ্বারবান কহে "ভাই !
রবিতে রবিতে আটদিন পরে
বড় খোকা বাবু গিয়েছে সরে,
পরিজন সহ হাহাকার স্বরে
কাঁদিছেন বাবু তাই।"
বাবুর নিকট এসেছিল সে
একদা ওষুধ তরে
বলেছিল বাবু "গরীবের ছেলে
বিনা ওষুধেই সারে।
(আজ) নবীন ভাবিছে মনে,
"ভাবিতাম হায় প্রাণের দুলালে
ওষুধ অভাবে নিয়ে গেছে কালে
কেন ম'ল' তবে বাবুর এ ছেলে
হাজার ওষুধ দানে !
মূর্খ আমরা কখন কি যেন
করেছি ভীষণ দোষ
তাই জননীর সন্তান প্রতি
হয়েছে এমন রোষ।"
পরদিন জমীদার—
ত্যজিয়া প্রভাতে পল্লী বাটিকে
প্রবেশ করিয়া শিবিকার মুকে
চলিবার কালে কলিকাতা মুখে
পথে শেষ হ'ল তাঁর।
যেমন যাদের দেব আরাধনা
তেমনি তাদের ফল
সোণার পল্লী হয়েছে শ্মশান
সুখী শৃগালের দল।
(হায়) এই কি পূজার ফল ?
এযে নয় পূজা এযে অনাচার
এতে বাড়ে মার কলঙ্ক অপার
ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানে পূজ সবে তাঁর
শুকাবে নয়ন জল।
ধূপ দীপ পাঁঠা নাহি প্রয়োজন
মাতা চায় শুধু জ্ঞান,
মাতা চাহে শুধু কর্ম্মের মাঝে
স্বার্থ বিহীন ধ্যান ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাট্টাদার।

জগৎ চেত্য কি চিন্ময়?

যে জগৎরূপ কমলের মূলীভূত মৃণাল মায়া বা অবিদ্যা,—সুখ দুঃখ জ্ঞান যে কমলের কেশর স্বরূপ, যাহা "একরূপ" মনোরূপ সমুদ্রেই প্রস্ফুটিত হয়, সে জগৎ চেত্য কি চিন্ময়? হায়! এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? মানুষ ভ্রম প্রমাদের দাস, মোহান্ধকারের ঘন তিমির তাহার আত্মবিলোকন শক্তির অবরোধক। মানুষের সাধ্য কি এ সমস্যার সমীকরণ করে! তবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নির্ণায়ক ঋষিদের ব্যবস্থাকে অভ্রান্ত মনে করতঃ—অনুকূল তর্কের সহিত বিচারের আশ্রয় গ্রহণে যা'র যতটুকু তৃপ্তি হয়, তাহাই যথেষ্ট। অতএব বিচারের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। বিচার দ্বারা শাস্ত্রের সার ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। পরন্তু অবগত হওয়া যায় যে :—

যাহা জানিবার বিষয় হয়,—তাহার নাম জ্ঞেয়; যাহা দেখিবার বিষয় হয়,—তাহার নাম দৃশ্য; যাহা ধারণের বিষয় হয়,—তাহার নাম ধ্যেয়;—তদ্রূপ যাহা চেতনের বিষয় হয়,—তাহার নাম চেত্য বা চেতা। যেমন জ্ঞেয় থাকিলে জ্ঞাতা, দৃশ্য থাকিলে দ্রষ্টা, ধ্যেয় থাকিলে ধ্যাতার বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী;—তদ্রূপ চেত্য বা চেতা থাকিলে চেতয়িতার বিদ্যমানতাও শঙ্কারহিত। আবার জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা থাকিলেই জ্ঞান,—দৃশ্য ও দ্রষ্টা থাকিলেই দর্শন,—ধ্যেয় ও ধ্যাতা থাকিলেই ধ্যানের বিদ্যমানতা যেমন অনিবার্য্য;—তদ্রূপ চেত্য ও চেতয়িতা থাকিলে চেতনের অস্তিত্বও অপরিহার্য্য।

আবার অন্য পক্ষে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারে না, দৃশ্য ও দ্রষ্টার অভাবে দর্শন থাকিতে পারে না, ধ্যেয় ও ধ্যাতার অভাবে ধ্যান থাকিতে পারে না,—ইহা যেমন সর্ব্ব-সম্মত,—তদ্রূপ চেত্য ও চেতয়িতা না থাকিলে চেতনের অস্তিত্বও অসম্ভব;—ইহাও একরূপ অভ্রান্ত। তবেই দেখা গেল, যতদিন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব, ততদিনই জ্ঞানের জ্ঞানত্ব;—যতদিন দৃশ্য দ্রষ্টার অবস্থিতি—ততদিনই দর্শনের দর্শনত্ব; যতদিন ধ্যেয় ও ধ্যাতার বিদ্যমানতা, ততদিনই ধ্যানের ধ্যানত্ব। তদ্রূপ যতদিন চেত্য ও চেতয়িতার অস্তিত্ব,—ততদিনই চেতনের চেতনত্ব।

যেমন "ধনী সুখী"। এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে ধনবান্ পুরুষ,—অর্থাৎ ধনী; আর বিধেয় হইতেছে ধন। যে কালে ধন থাকে, সেই কালেই তাহার (ধনবান পুরুষের) নাম ধনী হয়। ধনী বা ধনবান পুরুষও সে সময়ে ধনের সুখত্ব অনুভব করে বা সুখী থাকে। ধন না থাকিলে সে পুরুষ ধনী হয় না। ধনের সুখও অনুভব করে না। পরন্তু তাহার নাম ধনীও হয় না। অভিপ্রায় এই যে, উদ্দেশ্য বস্তু "ধনবান পুরুষ"—বিধেয় বস্তু "ধনের" সহিত সংযুক্ত না হইলে যেমন তাহার নাম ধনী হয় না এবং সে ধনের সুখত্ব অনুভব করে না,—তদ্রূপ চেত্য ও চেতয়িতা না থাকিলে চেতন বস্তুরও নাম "চৈতন্য" হয় না; পরন্তু—"চেতনের" চেতনত্বও অনুভবে আসে না।

অতএব, চেতন হইতেছে উদ্দেশ্য;—আর চেত্য—চেত্যয়িতা হইতেছে বিধেয়। এই উদ্দেশ্য বস্তুর যখন বিধেয় বস্তুর সহিত অন্বয় হয়,—অর্থাৎ চেতন বস্তুর যখন চেত্য-চেতয়িতার সহিত সংযোগ হয়, তখন তাহার নাম "চৈতন্য" হয়। অন্বয়ের পূর্ব্বে উদ্দেশ্য বস্তু চেতনের কোন রূপ নামের সংজ্ঞা থাকে না; যেমন ধন না থাকিলে ধনী নাম হয় না। অন্বয়ের পূর্ব্বাবস্থা নাম সংজ্ঞা বিহীন হইলে,—সেই অবস্থা বা ভাবকে আর "উদ্দেশ্য" "চেতন" ইত্যাদি নামের সংজ্ঞায় আনা যায় না। অর্থাৎ সে বস্তুর সে ভাব তখন উদ্দেশ্য, চেতন, চৈতন্য,—পক্ষান্তরে রাম, হরি, কৃষ্ণ,—অথবা কালী, তারা, মহাবিদ্যা ইত্যাদি কোন কিছু শব্দ বাচ্য হয় না। তবেই দেখা গেল, অন্বয়ের পূর্ব্বে উদ্দেশ্য বস্তু চেতনের যে ভাব, তাহা কোন-রূপ শব্দ বাচ্যে আসে না। তখন সে ভাব অনন্ত-প্রয়োজন-বিশিষ্ট, অনুপম ও শাশ্বত।

"এখানেই যত গোল"। ঐ যে অনন্ত-প্রয়োজন-বিশিষ্ট, নাম সংজ্ঞা শূন্য উদ্দেশ্য বস্তু—"চেতন"—বিধেয় বস্তু "চেত্য-চেতয়িতার" সহিত অন্বয় যুক্ত হয়,—অর্থাৎ "সম্বন্ধ যুক্ত হয়" তাহার মূলীভূত কারণ—"অন্বয়"। অন্বয়ই সেই পরম বস্তুর পরম ভাব ভাঙ্গিয়া শব্দ বাচ্যে নানাবিধ প্রয়োজন বিশিষ্ট করে। তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে সেই "উদ্দেশ্য" পরম বস্তু কখন নাম সংজ্ঞা-শূন্য, কখন নাম সংজ্ঞা যুক্ত ইত্যাদিতে "মিশ্র পদার্থবৎ" বিনাশশীল হইয়া পড়েন। এই জন্য ঐ অন্বয়কে মিথ্যাত্ব বলা হয় কারণ,—পরম বস্তু চেতন, যিনি অক্ষয়, অপরিণামী ও সনাতন,—যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া বিরাট বিশ্বরূপে স্বীয় পূর্ণতার পরিচয় প্রদান করেন; তিনি "মিশ্র পদার্থবৎ" বিনাশশীল বস্তু নহেন। তাঁহার আজ এক ভাবে এক নাম, কাল ভিন্ন ভাবে অন্য নাম; এইরূপ আজ একভাবে নাম উপাধি শূন্য, কাল অন্য ভাবে নাম উপাধি যুক্ত,—কখন হইতে পারে না; বাঞ্ছনীয়ও নহে। কিন্তু অন্বয় সেই পরম ভাবকে ভিন্ন ভেদ করতঃ—দুই দুই ভাবে দ্বৈতত্বের উপপত্তি আনিয়া দেয়। কাজেই জীবের "অন্বয়ের বিপর্য্যাস শক্তিতেই" উপস্থিত ভ্রম "অন্বয়ের বিপর্য্যাস শক্তিতেই" উপস্থিত হয়। ধন, পুত্র, দারাদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধি, আমি, জগৎ ও ঈশ্বরে বিভিন্ন ভ্রান্তি,—সনাতন বেদে অভক্তি ইত্যাদি সকল অনর্থই ক্রম পরম্পরায় দেখা দেয়। এই জন্য ঐ অন্বয়ের আর একটী নাম মায়া বা অবিদ্যা। অভিপ্রায় এই যে,—যে কালে যে সময়ে উল্লিখিত নাম সংজ্ঞা শূন্য পরম উদ্দেশ্য বস্তু "চেতন," বিধেয় বস্তু "চেত্য-চেতয়িতার" সহিত অন্বিত হইয়া,—নানাবিধ নামের সংজ্ঞায় শব্দবাচ্যে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়;—ঠিক সেই কালে সেই সময়ে ঐ নানাত্ব ভাব,—নাম সংজ্ঞাশূন্য, ভাবাভাবের অতীত, পরম স্থানের প্রতিপাদক হইয়া মিথ্যাত্ব মধ্যে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ঐ মিথ্যার নামই মায়া, অবিদ্যা, ভ্রম, অজ্ঞান ইত্যাদি। সর্ব্ববাদী সম্মত ন্যায়ও ঠিক ঐ কথাই বলেন;—অর্থাৎ যদ্দেশাবচ্ছেদে যৎ-কালাবচ্ছেদে যাহার সত্ত্ব,—তদ্দেশাবচ্ছেদে তৎকালাবচ্ছেদে তাহার অসত্ত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয়। তবেই দেখা গেল, উদ্দেশ্য বস্তু বিধেয় বস্তুর সহিত অন্বিত হইলে, সেই অন্বয়কে মিথ্যাত্ব বলা হয়; সেই মিথ্যা দ্রব্যই মায়া, অবিদ্যা, ভ্রম ইত্যাদি।

অতঃপর স্থির চিত্তে প্রণিধানের বিষয়

আসিয়া পড়িল। অন্বয় যদ্যপি মিথ্যা, মায়া, অবিদ্যা বা ভ্রম ইত্যাদি শব্দ বাচ্য হয়; তাহা হইলে অন্বয়ের পূর্ব্বাবস্থায় এ সকল কিছুই থাকে না, বলিতে হয়। সুতরাং সে অবস্থা বা সে ভাব—অনাশ্রয়, অপ্রমেয়, অনাবিল। শ্রুতি সেই ভাবকেই "বাঙ্মনোহতীত গোচরম্"—"নিষ্কলং"—ইত্যাদি বলিয়াছেন। তবেই জানা গেল, সে ভাব বাক্য মনের অতীত। তাহার স্বরূপ কেহ বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে পারে না, মনেও ধারণা করিতে পারে না; তাহা সনাতন, নিশ্চল, অচ্যুত। বোধ সৌকর্য্যার্থ আমরা এবম্ভূত পরম ভাবকে "উদ্দেশ্য"—"চেতন" ইত্যাদি নামের সংজ্ঞায় ব্যবহার দশায় আনিয়াছি মাত্র।

ভাল কথা। অন্বয় যখন মিথ্যা, মায়া, ভ্রম ইত্যাদি বস্তু স্বরূপ সাব্যস্ত হইতেছে,—তখন এই মিথ্যার সহিত উল্লিখিত পরম উদ্দেশ্য, পরম সত্য, সনাতন ভাবের কোনরূপ সম্বন্ধ বা সমানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না। যেহেতু সমান সমান বস্তুর সহিত সমান বস্তুরই সম্বন্ধ বা মিলন অবশ্যম্ভাবী হয়। অসমান বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, মিলন বা সমানাধি-করণ্য কস্মিন কালেও সম্ভবপর নহে। যেমন আলোকের সহিত অন্ধকার, আতপের সহিত ছায়ার মিলন বা সমানাধিকরণ্য কোন কালেও সম্ভবযোগ্য নহে। এরূপ হইলে,—অর্থাৎ উদ্দেশ্য পরম বস্তু চেতনের সহিত "অন্বয়ের" কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে বা পরম বস্তু চেতন, "অন্বয়"-সম্বন্ধ রহিত হইলে,—অন্বয় নামান্তর মায়া বা অবিদ্যার অভাবে"—সেই উদ্দেশ্য বস্তুর পরম ভাব শব্দ বাচ্যে "বহুরূপে" নানা প্রয়োজন বিশিষ্ট হইতে পারে না। পরন্তু চেত্য-চেতয়িতা, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, দৃশ্য-দ্রষ্টা ইত্যাদি ভেদমূলক বাক্য সন্দর্ভ বিভ্রম, "যাহা অন্বয়ের সাহচর্য্যেই উৎপন্ন হয়,"—আর থাকিতে পারে না। কারণ, "অন্বয়, "নামান্তর মায়া বা অবিদ্যাই"—উদ্দেশ্য পরম বস্তু চেতনের অন্বয় ভাব ভাঙ্গিয়া দ্বয়স্থ করিয়া তুলে। জীব, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে দ্বৈত দৃশ্য জাল দর্শনেই মোহিত হইয়া যায়। তুরুহ আত্মতত্ত্ব তখন আর হৃদয়ে স্থান পায় না। এবম্ভূত অন্বয়—অর্থাৎ "মায়ার" সম্বন্ধ যদ্যপি রহিত হয়,—তাহা হইলে চেত্য-চেতয়িতা, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, দৃশ্য-দ্রষ্টা ইত্যাদি ভাব কদাচ থাকিতে পারে না। পরন্তু পৃথিব্যাদি ভূত পঞ্চও থাকে না, দৃশ্য ভাবও থাকে না, বিরাট দেহও থাকে না;—কেবল "সেই পরম উদ্দেশ্য"—এক অনির্ব্বচনীয় অতিঘন চিন্মাত্রই স্বতঃ সম্ভূত হইয়া জগদ্রূপে দেদীপ্যমান থাকেন। এইরূপ উপলব্ধির কার্য্যকারিণী শক্তি সহজেই প্রতিপত্তি লাভ করে। সুতরাং তখন স্বতঃই প্রতিপন্ন হইয়া যায় যে, "জগৎ চেত্য নহে,—চিন্ময়"।

যদি বল,—উদ্দেশ্য পরম বস্তু চেতন যদ্যপি "অন্বয়" সম্বন্ধ শূন্য হন,—তবে তুমি, আমি, স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর ইত্যাদিতে পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি কোথা হইতে কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদির ভেদোপলব্ধিই বা কোথা হইতে প্রতীতি-গোচর হয়? পার্থিব বস্তুর বিভিন্ন গুণ ক্রিয়া কেনই বা প্রত্যক্ষ-গোচর হয়? সত্য যেমন একটী বস্তু, তদ্রূপ মিথ্যাও একটী বস্তু বা পদার্থ বটে; অতএব মিথ্যা বস্তু বিশেষ অন্বয়ের অবস্থিতিই বা কোথায়? এই সকল সমস্যার সমীকরণ না হইলে,—"উদ্দেশ্য পরম বস্তু চেতনের সহিত অন্বয়ের

কোনরূপ সম্বন্ধ নাই,"—এই বাক্যের গৌরব-প্রসক্তি অব্যাহত থাকে না।

ভাল কথা। কিন্তু উল্লিখিত সমস্যার ভ্রমশূন্য সমীকরণ সুদূরপরাহত। কারণ, প্রতি প্রশ্নের উত্তরে যদ্যপি বলি "হাঁ,"—তাহা হইলে একটী "না"-এর বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী হয়। আবার যদ্যপি "না"—বলি,—তাহাতেও "হাঁ"এর বিদ্যমানতা অনিবার্য্য হয়;—যেহেতু 'হাঁ' ও 'না' অখণ্ডাকার বস্তু বিশেষ। যেমন ভাব-অভাব, সত্য—মিথ্যা, ভাল—মন্দ, সু—কু ইত্যাদি এক—অখণ্ডাকার বস্তু স্বরূপ। তবেই দেখা গেল, হাঁ—না, ঠিক—বেঠিক, প্রকৃত—অপ্রকৃত, অভ্রান্ত—ভ্রান্ত,—এই সকলের অতীত স্থানে না যাইলে, কোন সমস্যার ভ্রমশূন্য সমীকরণ "যাহাকে প্র-মা জ্ঞান বলা যায়"—অসম্ভব। কিন্তু হাঁ—না, প্রকৃত—অপ্রকৃত, সত্য—মিথ্যা, ইহাদের অতীত যে স্থান,—সেখানে মন, বাক্য ও কর্ম্মের কোন অধিকার থাকে না। কাজেই সেই পরম স্থানে যাইলে, আর প্রশ্ন বা সমস্যার সমীকরণ করিবার অবকাশও থাকে না। এই জন্যই বলিতেছি, উল্লিখিত সমস্যার ভ্রমশূন্য সমীকরণ সুদূরপরাহত। জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, আজ পর্য্যন্ত জগতের অন্তর্ভুক্ত কোন কেহই যে ঐ সকল প্রশ্নের সমীকরণে প্রমাত্ব লাভ করিয়াছেন,"—এরূপ কথা স্বীকার করিতে হইলে বাস্তবিকই ইতস্ততঃ করিতে হয়। এই জন্যই প্রথমে বলিয়াছি যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নির্ণায়ক মহর্ষিদের ব্যবস্থাকে অভ্রান্ত মনে করতঃ অনুকূল তর্কের সহিত বিচারের আশ্রয় গ্রহণে যার যতটুকু তৃপ্তি হয়, তাহাই যথেষ্ট। অতএব বেদাদি শাস্ত্রের সার ভাব দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা এইরূপ, যথা—

ঐ অন্বয়—"নামান্তর মায়া, অবিদ্যা, ভ্রম ইত্যাদি"—সামান্য বা উপেক্ষনীয় নহে। উহার বিশ্ব-বিমোহন শক্তির এমনই চমৎকারিত্ব যে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, অশুচিকে শুচি করে, অসত্যকে সত্য করে। এই জন্য উহার একটী নাম "মায়া"। পরম বস্তুর সহিত "পূর্ণ" সদ্ভাবের শক্তি না থাকায়, উহার একটী নাম "অবিদ্যা"। ভ্রমশূন্য "প্রমা জ্ঞান" নহে বলিয়া উহার একটী নাম "ভ্রম"। এইরূপ বহুরূপে উনি বহুরূপী। উনি আজ কালকার নহেন। যে অনাদি অনন্ত কাল হইতে উল্লিখিত পরম উদ্দেশ্য পরম বস্তু সিদ্ধ হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই অলক্ষিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া ব্যবহার দশায় আসিয়াছেন। সেই দিন হইতে "উদ্দেশ্য" চেতন বস্তুর চৈতন্য বা চেতনত্বের সহিত, চেত্য—চেতয়িতা, জ্ঞেয়—জ্ঞাতা, দৃশ্য—দ্রষ্টা ইত্যাদি ভেদ প্রখ্যাপক বাক্য বিভ্রম দ্বারা, বিরাট বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। আমি, তুমি ইত্যাদির ভেদাভেদ, তুচ্ছ বিষয় সম্পত্তিতে মদীয়ত্ব জ্ঞান, সেই দিন হইতে অনাদি কাল প্রায় এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। সেই দিন হইতে ঐ অন্বয়—"নামান্তর মায়া,"—জলে তরঙ্গ, পুষ্পে সৌরভ, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি ইত্যাদির ন্যায়,—"পূর্ণ চৈতন্য—পূর্ণ ব্রহ্ম" উদ্দেশ্য বস্তুতে নিত্য অবস্থিত। অতএব অন্বয়—অর্থাৎ "মায়া" সৃষ্ট বস্তু নহে। উহার উৎপত্তি স্বতঃ সম্ভূত ও অনিবার্য্য। যেমন অগ্নির প্রকাশে দাহিকা শক্তি, পুষ্পের ফুটন্তাবস্থায় সৌরভের প্রকাশ স্বতঃ সম্ভূত ও অনিবারণীয়। এই অনিবার্য্য প্রকাশ-ধর্ম্মী অন্বয়, নিজে অনিত্য ও নশ্বর,—তথাপি সত্য ও সারবান্ রূপে প্রতিভাত হয়। উহার শক্তি সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত। কেবল মাত্র প্রমা জ্ঞানেই—"আতপ সংস্পর্শে ছায়ার ন্যায়"—উহার সারত্ব লোপ পায়।

জগৎ ঐ অন্বয়ের বিপর্য্যাস শক্তি বিশেষ। অন্বয়ের অভাবে জগৎ থাকে না, আর জগৎ থাকিলে অন্বয়ের অবস্থিতিও লোপ হয় না। অর্থাৎ "অন্বয় ও জগৎ" অখণ্ডাকার বস্তু বিশেষ; একটীর অভাবে অপরটীর বিদ্যমানতা অসম্ভব। অভিপ্রায় এই যে,—অন্বয়ের অবস্থিতিও অনাদি অনন্ত কাল আছে,—আর জগতের অস্তিত্বও অনাদি অনন্ত কাল আছে। তাহাকে মায়াই বল, আর অবিদ্যাই বল,—অথবা ভ্রমই বল, আর অজ্ঞানই বল,—কিম্বা মিথ্যাই বল, আর অনিত্যই বল; একবারে উড়াইবার নহে। যেহেতু ভাব রূপে প্রতীয়মান হয়। সৎস্বরূপও বলা যায় না;—যেহেতু জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। অসৎ পদার্থও হইতে পারে না; যেহেতু উপলব্ধিজনিত জ্ঞান নিবারিত হইবার নহে। সুতরাং সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব পদার্থ হইতে অত্যন্ত যে বস্তু,—সেই অনুপলভ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব, ভাব বা নিয়ামকত্বই,—অন্বয়, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি উপাধির বিষয়ীভূত হয়। উপাধিশূন্য পদার্থই শান্ত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও অদ্বিতীয়। তাঁহার মহিমায় এই নাম রূপ জগতের সত্তা বোধ হয় বা জগতোন্মেষক বিকাশ সমুত্থিত হয়। অতএব যাহার উপাধি আছে বা যে বস্তু কোন না কোন নামে বা গুণে জড়িত আছে, সে বস্তু সেই বিকাশময় অবস্থার উন্মেষ মাত্র। সেই বিকাশময় অবস্থাই সূক্ষ্ম, মধ্য, স্থূল বা সত্ত্ব, রজঃ, তম,—এই ত্রিবিধ কল্পনায়—জগৎ আখ্যায় আখ্যায়িত হয়; ইহাকেই মায়া, অবিদ্যা, ভ্রম, অন্বয় ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

শ্রুতি বলেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—অর্থাৎ পূর্ণ পর ব্রহ্ম পরমেশ্বর (ইন্দ্র) মায়া দ্বারা—অর্থাৎ মায়া কল্পিত বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া "পুরুরূপ"—অর্থাৎ বহু আকারে প্রকাশিত হয়েন। অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনা এবং শ্রুতি তাৎপর্য্যের সারভাব দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জগৎ নামক বস্তুটী, অন্বয়—নামান্তর মায়াই বিপর্য্যাস শক্তিবিশেষ। এই অন্বয় রূপী মায়াই—সংসার রূপ বিশাল সমুদ্রের বিশালতা বর্দ্ধিত করি। অনাদি অনন্তকাল স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর, জীব, জন্তু, প্রাণী মণ্ডলীরূপ প্রবাহ ছুটাইতেছে। তুমি, আমি ইত্যাদির ভেদোপলব্ধি,—বস্তুর বিভিন্ন গুণ ক্রিয়া,—সত্য পদার্থে মিথ্যাত্ব জ্ঞান,—এ সকল মায়ারই প্রহেলিকা মাত্র। মায়ার শক্তি চমৎকারিত্বেই জীবের আত্মজ্ঞান প্রতিহত,—অনন্ত সত্যবস্তু লুক্কায়িত,—আর অহমিকার প্রভাব অব্যাহত। এই মায়ার অপর পারেই,—অর্থাৎ মায়ারূপ সংসার-সমুদ্রের পর পারেই উপাধিশূন্য পরম উদ্দেশ্য পরম বস্তু "পূর্ণ চৈতন্য বা পূর্ণ ব্রহ্মের" পরম পদ।

ঐ পরম পদের আশ্রয়ে দাঁড়াইলে বা একমাত্র আশ্রয়ণীয় বোধে তাঁহার স্বরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে,—চেত্য—চেতয়িতা, জ্ঞেয়—জ্ঞাতা, দৃশ্য—দ্রষ্টা ইত্যাদির সকল খেলাই অন্ত হইয়া যায়। পরন্তু

তখন সহজেই বোধগম্য হইয়া যায় যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ,—একমাত্র অচিন্ত্যরূপী, অপ্রবুদ্ধ, সচ্চিদানন্দময় পরম উদ্দেশ্য পরম বস্তুর প্রাতিভাসিক মনোবিলাস মাত্র। মনোবিলাস ক্ষয় পাইলেই, "ব্রহ্মৈব সর্ব্বং"—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"ইত্যেকমেবং পরংব্রহ্ম বিভাতি"। সুতরাং তখন আর বুঝাইতে হয় না যে, "জগৎ চেত্য নহে—চিন্ময়"।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

প্রাচীন ভারতে জাতি বিভাগের উৎপত্তি ও তাহার প্রসার। (শেষ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতএব দ্বাদশ মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

"ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণজাতিঃ অস্য পূর্ব্বোক্তস্য বিরাট পুরুষস্য বিরাট নাম্নঃ আদি মানবস্য মুখং ইব আসীৎ ইতি শেষঃ। যথা দেহেষু মুখমেব উত্তমাঙ্গতয়া শ্রেষ্ঠতমং তথা বর্ণেষু ব্রাহ্মণ এব শ্রেষ্ঠতম আসীৎ তেন মুখেন সহ তস্য উপমা প্রদত্তা। অস্য বিরাট পুরুষস্য বাহু বাহুদ্বয়ং কিম্ভূতাং? বাহুদ্বয়ং রাজন্য কৃতঃ। যথা বাহুবলেন সর্ব্বং সুরক্ষিতং ভবতি তথা রাজন্যোঃ দেশস্য রক্ষকা আসন তেন উৎপ্রেক্ষাচ্ছলেন নিগদিতং বাহুরেব রাজন্য ক্ষত্রিয়ঃ কৃতঃ জাতঃ। অস্য বিরাট পুরুষস্য যদ্ যৌ উরূ উরূদ্বয়ং তৎ তৌ এব বৈশ্য বণিক কৃষকস্ত্র। যথা লোকঃ উরূ নির্ভরেণ দণ্ডায়তে গমনগমনাদিকঞ্চ করোতেব্য তথা বৈশ্যজাতিরপি কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষাদিনা সমাজস্য জীবিকা নির্ব্বাহং সম্পাদয়তি তেন উরূভ্যাং সহ বৈশ্য জাতি স্তুলনী কৃতা। যথা অন্যেষু পদদ্বয়ং এব নিকৃষ্টং জঘন্যং তথা বর্ণেষ্বপি বিদ্যাবত্তাদিরাহিত্যাৎ শূদ্রোজাতি নিকৃষ্টা এব তেন হেতুনা বিরাট পুরুষস্য পদ্ভ্যাংসহ শূদ্রোজাতিরূপমিতা ন পুন বিরাট পুরুষস্য পদ্ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভূতা এব কদ্যাপি মুখ নাসিকাদিভ্যঃ কাচিৎ বর্ণঃ কাচিৎ জাতি বা ন উৎপদ্যতে এব নৈতৎ সম্ভবত্যেব চ যুক্তি বিরুদ্ধত্বাৎ।

'অতএব পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' ইত্যত্র পদ্ভ্যাং পাদৌ (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ—ব্যতরো বহুল মিতি পাণিনিঃ)।

শূদ্রঃ শূদ্রজাতি অজায়ত অভূৎ। নিকৃষ্টাঙ্গ পাদদ্বয়বৎ শূদ্রজাতিরপি সমাজে অপকর্ষং গতা ইতি ভাব। সর্ব্বে মানবা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদয়ঃ আদিমানবাৎ বিরাট পুরুষাৎ সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বে তস্য এব অন্তরবংশাঃ তেন মুখাদিভিঃ সহ সর্ব্বজাতিনামুপমা প্রদত্ত ইতি তাৎপর্য্যং।"

উপরিদ্ধৃত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। ইহা হইতেই আপনারা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি ১১শ মন্ত্রের উত্তর দানকালে রূপকচ্ছলে (allegorically) ১২শ মন্ত্র উত্তর দিয়াছেন।

বর্ণ বা জাতি সর্ব্বব্যাপী মহান ঈশ্বরের মুখাদিপ্রভব ইহা যুক্তি ও বিবেকের ঘোর পরিপন্থী। পরম ন্যায়বান ভূমা পরমেশ্বর আমাদের সাধারণ পিতা ও পালয়িতা। তাঁহার

রাজ্যে পক্ষপাত নাই ও কৃষ্ণ ও শুক্লভেদে মুখাপেক্ষা নাই। তিনি তাঁহার সন্ততি মনুষ্যগণকে কেন চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিবেন? "আকৃতি গ্রহণাজাতি" যাহাদের আকার একরূপ তাহারা একজাতীয় পদার্থ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে কি দৈহিক যন্ত্রাদির ও শোণিতের বা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোন পার্থক্য আছে?

অবশ্য এ জগতে পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র এবং রাজা ও প্রজা এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব পদার্থগুলি বিরাজমান রহিয়াছে। যে দিন সকল মানুষ সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই দিন হয় ত আসিবে আসিবে করিয়া আর আসিবে না। ইলবার্ট বিলের ন্যায় অর্দ্ধপথে রাথাচক্রে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। তবে পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা এই পদার্থগুলি জন্মগত নহে, পরন্তু গুণ ও কর্ম্মগত। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "জাতি মাত্রেণ কিং কশ্চিৎ পূজ্যতেঽনৃততেঽপি বা ব্যবহারং পরিজ্ঞায় পূজ্যতেঽনৃততে থবা। যাহা হউক, মহোচ্চ সাধনের জন্যই প্রাচীন ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই কল্যাণকর প্রথার সদুদ্দেশ্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ইহাতে আমরা যে লাভবান হইতে পারি নাই, পরন্তু ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছি তাহা মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশদাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন—

Caste reserved some preveleges for priests and some preveleges to warriors, in ancient times but never divided and dis-united the Aryan people * * * They felt that they were one nation and one race, received the same religious instructions, possessed the same literature and traditions, ate and drank together intermarried and held social communion in all respects and were proud to call themselves the Aryan race against the conquered aboriginies. Caste in modern times has cut up the Aryan people into scores of communities has opened the gulf of race distinctions amongst the different communities, has interdicted marriages and social communion amongst them, has starved the sons of the ancient Vaisyas,—the entire body of the people,—of religious knowledge and literature, and has degraded them to the rank of Sudras."

—*History of Ancient India*
page 169 and 170.

মহাত্মা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উক্তি যথার্থ কি না তাহা দেশের প্রকৃত হিতৈষী ও সমাজতত্ত্বজ্ঞগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা সংক্ষেপে প্রাচীন ভারতের গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে জাতি বিভাগ প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলাম।

শ্রীললিতমোহন রায়।

উদ্ভিদের চেতনাশক্তি।

সৃষ্টপদার্থ শৃঙ্খলে, উদ্ভিদ্, চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত; সুতরাং উদ্ভিদের যে কিছু চেতনা আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়; তবে ঐ চেতনার পরিমাণ এত অল্প যে তাহা আমাদের চিন্তার অগোচর না হইলেও স্থূল বুদ্ধির অগোচর বটে। ডাক্তার, সার, জগদীশচন্দ্র বসু F. R. S. মহোদয়ের, এই বিষয়ে, আবিষ্কৃত তত্ত্বের মৌলিকত্ব পৃথিবীর সুসভ্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন কালে, জীবহিংসা বর্জ্জনাভিপ্রায়ে, তজ্জন্য অনেক মুনি তপস্বী বৃক্ষের স্খলিত পত্র ও ভূতলে পতিত নীবার ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিতেন। যদিও উদ্ভিদের চেতনা থাকা তাঁহারা জানিতেন, তথাপি তাহা সাধারণ লোকের বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ডাক্তার সার্ জে, সী, বসু মহোদয়ের বহু অধ্যবসায় ও চিন্তা দ্বারা যে সকল যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যে ঐ বিষয়টী লোকের বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াছে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও স্পন্দন এত অল্প যে তাহা সহজে বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। সার্ বসু, পূর্ব্বে যে একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তদ্দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও স্পন্দন ১০ সহস্র গুণ বৃদ্ধি ও আপনাপনি অঙ্কিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু তৎপর কতকগুলি 'লিভার' (lever = ঢেঁকিকল) পরম্পরার সুকৌশল-সম্পন্ন সংস্থান দ্বারা ঐ যন্ত্রের শক্তি তিনি এই পরিমাণ বৃদ্ধি করেন যে,তদ্দ্বারা ঐ স্পন্দন অঙ্কনের দ্রুততা স্পন্দনের ১০ কোটী গুণ বৃদ্ধি পায়। এই যন্ত্রের নাম, তিনি "ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ্" Magnetic Crescograph = শরীরবৃদ্ধি মাপলিপিকারক চৌম্বকিক যন্ত্র) রাখিয়াছেন। ইহার সাহায্যে, বিখ্যাত "ডার্বী"-ঘোড়দৌড় বাজি-বিজয়ী দ্রুততম অশ্বের গতির তুলনায়, শাম্বুকের মন্দ গতিও, মেঘের বিজলীবৎ বোধ হয়। একটী শাম্বুকের মন্দগতি যদি ১০ কোটী গুণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে এক ঘণ্টা কাল মধ্যে শাম্বুক ৪ বার পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে। তিনি ঐ যন্ত্রের শক্তির মাত্রা কমাইয়া, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, কি অনুভূতির উপর, নানা প্রকার উত্তেজক দ্রব্যের ক্রিয়া আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ইহাও সত্য বটে, যে অতি অল্প সংখ্যক স্থলে ঐ যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও, সাধারণ প্রাকৃতিক উত্তেজনার ক্রিয়াজ্ঞাপক স্পন্দন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলার, গোয়ালন্দ মহকুমার রাজবাড়ী ষ্টেশানের ৫ মাইল দক্ষিণ বাঘিয়া এরেণ্ডা নামক গ্রামে একটী খর্জ্জুরবৃক্ষ প্রদোষকালে মস্তক অবনত করত উষাকালে মস্তক উত্থিত করিত; বৃক্ষটী যেন কোনও শাপভ্রষ্ট সূর্য্যোপাসক সাধক, পাপক্ষয়জন্য অবনীতলে বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে নানা স্থান হইতে লোকসমাগম হইতে লাগিল; তাহাদের অনেকে ঐ গাছের পূজা দিতে ও মানসিক দ্রব্য উপহার দিতে লাগিল! ডাক্তার বসুর নিকট এই সংবাদ পৌঁছায়, অনেক চেষ্টার পর তিনি ঐ গাছের মালিক সেবাইতকে বাধ্য করিয়া, তাঁহার যন্ত্রটী, একটী সুদীর্ঘ সূত্র দ্বারা, ঐ বৃক্ষের কাণ্ডের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দেন। বৃক্ষটী বহুদিন পূর্ব্বে ঝড়ে হেলিয়া পড়ে এবং তদবস্থায়ই থাকে। ডাক্তার বসু দেখিতে পান, বৃক্ষটী এক গজ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া ঐরূপ উঠা নামা করে; এবং ঐ গতির বল মাত্রা এই পরিমাণ ছিল যে, তদ্দ্বারা একটী মনুষ্যকে মৃত্তিকা (= ভূপৃষ্ঠ) হইতে উত্তোলিত করিতে পারা যায়। তিনি আরও দেখেন যে, বৃক্ষটী ঐরূপ উপর নীচ করায় যে একটী বৃত্তাংশের পরিধি রেখা অঙ্কিত হয়, তাহার সঙ্গে দৈনিক তাপাঙ্কের কল্পিত বক্র রেখার (curve of the daily temperature) প্রায় মিল হয়।

ডাক্তার বসুর আবিষ্কারের মূলতত্ত্ব এই যে, সমস্ত উদ্ভিদেরই চেতনাজনিত অনুভূতি-শক্তি আছে এবং তাহা তাঁহার উদ্ভাবিত জটিল যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদেরাও নিদ্রা যায়; একই উত্তেজক দ্রব্য প্রয়োগে, মধ্যাহ্নকাল অপেক্ষা, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে, তাহাদের স্পন্দন অল্প দৃষ্ট হয়; শীতকালে তাহারা বাড়ে না, মূষিকের ন্যায় নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে। উগ্র উত্তেজক দ্রব্যের ক্রিয়ায়, স্নায়বিক অবসাদ জন্মাইয়া, ইহাদের জীবনীশক্তি খর্ব্ব করিতে, কখন বা উত্তেজিত করিতেও দেখা যায়। প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রেমের রসায়নবৎ পরিবর্ত্তকগুণে যেরূপ উৎফুল্ল হয়, বার্দ্ধক্যোন্মুখ ক্ষয়ের অবস্থায়, উত্তেজক দ্রব্য প্রয়োগে, উদ্ভিদেরও তদ্রূপ পুনর্নবযৌবন প্রাপ্তিবৎ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইহাতে অনেকের মনেই চ্যবনপ্রাসের কথা উদয় হইতে পারে। এইরূপ, যে সকল বিষ কোনও উদ্ভিদের পক্ষে প্রাণনাশক, তাহা পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগে, তাহার জীবনীশক্তির উত্তেজনা করে এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ, কীটাদি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য শরীরে সুরাসারের ক্রিয়াও প্রায় তদ্রূপ লক্ষিত হয়। উদ্ভিদের স্বাস্থ্য বা শারীরিক অবস্থানুসারে, একই বিষের সমান মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখা যায়। ডাক্তার বসু, দুই প্রস্থ নূতন চারা উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা করেন; কৃত্রিম উপায়ে, এক প্রস্থের সজীবতা স্বাভাবিক অবস্থার উপর বৃদ্ধি, ও অপর প্রস্থের সজীবতা স্বাভাবিক অবস্থার নীচে হ্রাস করিয়া, তিনি উভয় প্রস্থে, একমাত্রা পাতলা বিষ প্রয়োগ করেন; তাহাতে তিনি দেখিতে পান যে, দুর্ব্বল প্রস্থ শীঘ্রই মরিয়া গেল, কিন্তু সতেজ প্রস্থ বৃদ্ধি পাইল।

এইরূপ, দেখা যায়, একজনের খাদ্য, অপর ব্যক্তির পক্ষে বিষ-স্বরূপ। তিনি, সুরাসার বাষ্পে আস্তে আস্তে, লজ্জাবতী লতার মত্ততা জন্মাইয়া দেখেন যে, তাহার আচরণ, মদ্যপায়ী মাতাল মনুষ্যের আচরণ অপেক্ষা কোনও অংশে বিভিন্ন নয়। যদিও ইহা মাতালের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া মাটিতে গড়াগড়ি যায় না, তথাপি তাঁহার স্পন্দন-জ্ঞাপক যন্ত্রের সাহায্যে মত্ততার অবস্থা অঙ্কন দ্বারা লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ঐ মত্ততা প্রকাশ পায়। ঐ মত্ততার অবস্থায় কখন স্ফূর্ত্তি এবং কখন অনুতাপসূচক অবসাদ ভাব ক্রমান্বয়ে পর পর লক্ষিত হয়; টাটকা বিশুদ্ধ বায়ুর ঝাপ্টা প্রদানে, ইহা পুনর্ব্বার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যাবস্থা ধারণ করে।

ডাক্তার বসুর উক্ত "ম্যাগ্‌নেটিক্ ক্রেস্কোগ্রাফ্" যন্ত্রের সাহায্যে, উদ্ভিদ্ বৃদ্ধি

এক ইঞ্চের ১০ কোটী ভাগের ৪ ভাগ পর্য্যন্ত, এক সেকেণ্ড কালের একশত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও ন্যূন সময়ের মধ্যে ধরিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি স্থির করিয়াছেন যে, বেদনাদায়ক উত্তেজনা জন্মানে; বৃদ্ধি স্থগিত করে, বা বৃদ্ধির বিলম্ব সংঘটন করে; কঠিন আঘাতে, উদ্ভিদের বৃদ্ধির মাত্রা অর্দ্ধেকে পরিণত হয়; এবং ঐ আঘাতের ঝোঁক সংবরণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে তাহার একঘণ্টা সময় লাগে। একটা আল্‌পিন্ কি সূচের খোঁচায় উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিমাণ এক তৃতীয় অংশে পরিণত করে এবং ঐ ক্ষতযুক্ত উদ্ভিদ্ অনেক সময় যাবৎ অবসন্ন থাকে, কারণ, আমাদের ন্যায় উদ্ভিদেরও স্নায়বিক অনুভূতির যন্ত্র আছে। আসন্ন-মৃত্যু প্রাণীগণ যেরূপ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে ও তাহাদের শরীরে খেঁচুনী উপস্থিত হয়, ডাক্তার বসুর পরীক্ষায়, উদ্ভিদেরও মৃত্যু সময়ে সেইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। একটী উদ্ভিদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর তাপাঙ্ক বৃদ্ধি করিলে, ঐ উত্তাপ বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াদ্বারা, ডাক্তার বসুর যন্ত্রে অঙ্কিত বক্র রেখাটীর উচ্চতাও কিছু সময় জন্য বৃদ্ধি পায় এবং তৎপর ১৪০ ফাঃ তাপাঙ্ক না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঐ উচ্চতা হ্রাস হইয়া নামিয়া পড়ে এবং তৎপর তাহা হঠাৎ ঊর্দ্ধদিকে উঠে; তখন উদ্ভিদ্‌টী প্রকৃতপক্ষে প্রাণত্যাগ করে এবং তখন কোনও রূপ উত্তেজনা প্রয়োগেও তাহার স্পন্দন পাওয়া যায় না। ডাক্তার বসু, একটী "গ্লাস্ কেস্" মধ্যে অতি যত্নের সহিত একটী লজ্জাবতী লতাকে রাখেন, যে বাহিরের কোনও আঘাত তাহার গাত্রে না লাগে; তাহাতে ঐ উদ্ভিদ্‌টী হৃষ্ট পুষ্ট, বর্দ্ধিষ্ণু ও সুশ্রী হয় কিন্তু তাহাতে কোনও উত্তেজনারই ক্রিয়া লক্ষিত হয় না এবং তাহার স্পন্দনও পাওয়া যায়না; যত্নের সহিত সুরক্ষিত হওয়ায়, ইহা অবশাঙ্গ হইয়াছিল, যেন মেদ বৃদ্ধি হেতু স্থূলকায় মনুষ্যের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। ডাক্তার বসু, ইহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রদান করিয়া, অবশেষে ইহাকে পূর্ব্ববৎ চট্‌পটিয়া করেন।

ডাক্তার বসুর, তাঁহার কলিকাতাস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের (Science Institute) কয়েকটী প্রাচীন বৃক্ষকে, প্রথমতঃ সংজ্ঞাহারক দ্রব্য (anœsthetics) প্রয়োগে বেদনাবোধ শক্তিহীন করিয়া, সমূলে উৎপাটন করত স্থানান্তরে রোপণ করেন; তাহাতে ঐ বৃক্ষগুলি নূতন স্থানে লাগিয়া যায়। উদ্ভিদকে একস্থান হইতে উঠাইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে প্রধান প্রতিবন্ধক এই যে, স্থানান্তরকরণে তাহা যে স্নায়বিক আঘাত প্রাপ্ত হয়, অনেক সময়ে তাহার চোট্ সংবরণ করিতে না পারায় মরিয়া যায়, কারণ প্রাণীগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও স্নায়বিক বেদনা আছে।

ডাক্তার বসুর আবিষ্কার দ্বারা কৃষি-কার্য্যেরও যথেষ্ট উপকার হইবে। যেমন কোনও খাদ্য শস্যের ফসলের উপর কোন্ সার কিরূপ কার্য্য করে তাহা পরীক্ষার্থ ফসল সংগ্রহ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময় মধ্যেই জানা যাইবে। ডাক্তার বসু এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে সকল দ্রব্য অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের পক্ষে বিষ স্বরূপ হয়, তাহারাই আবার অল্প মাত্রায় প্রয়োগে বলকারক দ্রব্যের ন্যায় কার্য্য করে। যখন, দ্রব্যগুণে কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের নিদ্রাকর্ষণ করা যায়, তখন উদ্ভিদ

কোনও অস্বাভাবিক প্রতিকূল অবস্থা সংঘটন হওয়া বুঝিতে পারে এবং শরৎ কালের পরিবর্ত্তে গ্রীষ্ম কালেই ইহার পত্র সকল ঝরিয়া পড়িতে থাকে। ঐ নিদ্রাকর্ষক দ্রব্য প্রয়োগে উদ্ভিদ সংজ্ঞাহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং তাহা অভ্যাসে পরিণত না হইলে, ঐরূপ অবস্থা ঘটে, কারণ, ঐরূপ নিদ্রালুতার ভাব অল্পকাল স্থায়ী হওয়ায়, উদ্ভিদ্ শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার দ্বারা, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

যে সকল প্রাণী দীর্ঘকাল অচেতন অবস্থায় জীবিত থাকিতে পারে, তাহাদিগকে বিষাক্ত দ্রব্য মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলেও তাহারা মরে না। সেই রূপ দ্রব্যগুণে সংজ্ঞাহীন করা বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলেও তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় না। বরফে জমাট একটী "লাল মাছ"কে (Gold fish) জীবিত অবস্থায় যেরূপ পৃথিবী পর্য্যটন করাইয়া আনা যায়, সেই রূপ মৃৎপিণ্ডে শিকড়াবৃত উদ্ভিদকেও মাঠ হইতে বাগানে লইয়া যাইয়া রোপণ করা যাইতে পারে। উদ্ভিদের তন্তুজাল সকল (tissues) প্রাণীগণের হৃৎপিণ্ডের ন্যায় কার্য্য করে। উত্তেজক দ্রব্য প্রয়োগে আসন্নমৃত্যু উদ্ভিদকে পুনঃ সঞ্জীবিত করা, ও তন্দ্রায় তন্দ্রালু করা যায়।

ডাক্তার বসু বলেন, "অনুভূতিশক্তির মাত্রা নির্ণয় করিতে বাহ্যিক আঘাতের ন্যায়, ইচ্ছাশক্তির আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার (stimulus) ক্রিয়াও প্রধান একটী ধর্ত্তব্য বিষয় এবং তজ্জন্য, স্নায়ুর (nerve) আভ্যন্তরীন্ আণবিক্ সংস্থিতিকে আয়ত্তাধীন করিলে, যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকৃতি অনেক পরিমাণ পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। বাহ্য প্রকৃতি অত্যধিক মাত্রায় অনুভূতির নিয়ন্ত্রী নয় এবং মনুষ্যও এখন আর ভাগ্যের হস্তে খেলার পুতুল নয়। পূর্ব্বে যে সকল অস্পষ্ট বার্ত্তা (message) অননুভূত ভাবে মনুষ্যের নিকট দিয়া চলিয়া যাইত, সেই সকল এখন ধৃত করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে; কিম্বা, মনুষ্য বাহ্য জগৎ হইতে নিজকে অন্তর্জগতে, অর্থাৎ তাহার নিজের ভিতরে লইয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে, বহির্জগতের কোলাহল ও দ্বন্দ্ব পূর্ণ ভাব সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না।"

ডাক্তার বসুর এই সকল পরীক্ষায়, আমাদিগকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অঙ্কিত চিহ্নিত সীমান্ত রাজ্যে উপনীত করে। ইহার দ্বারা এই গুহ্য রহস্যও প্রকাশ পাইতেছে যে, সমস্ত প্রাণই এক, এবং সেই একই বিশ্বপ্রাণের প্রবাহোর্ম্মি নানা আকার ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত ধাবমান হইতেছে।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও তাহাই বলেন;—"সর্ব্বমিদং খলু ব্রহ্ম" এবং ব্রহ্ম চৈতন্যময়। "লর্ড্ কেল্‌ভিন্" (Lord Kelvin) বিজ্ঞান শাস্ত্র মন্থন করিয়া স্থির করিলেন "Matter is the vortex of energy" (শক্তির আবর্ত্তনচক্রের বিকাশই জড় পদার্থ)। আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের "energy" প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদের "শক্তি"। অনেক দার্শনিকগণ শক্তিকে "প্রকৃতি" এবং ব্রহ্মকে "পুরুষ" বলেন। আবার, এই নির্ব্বিকার পুরুষের সৃষ্টির ইচ্ছাকেই—বিকৃতিকেই—পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিনী "প্রকৃতি" আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং

দেখা যায়, এক চৈতন্যময় পুরুষই একমাত্র সত্তা ও প্রাণ এবং অদ্বৈত জড়বাদের কোনও ভিত্তি নাই।

এখন "ক্রেস্কোগ্রাফে"র বিষয় সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধটী শেষ করা যাইবে।

মোম মার্জিত একটী সূতা দ্বারা একটী পত্র কি পল্লব বাঁধিয়া সেই সূত্রের অপর প্রান্ত একটী লম্বা চুম্বক সূচের এক প্রান্তে সংযুক্ত থাকে। ঐ সূচটী এরূপ ভাবে ধৃত থাকে যে, ঐ সূত্রটী না থাকিলে সূচের ঐ প্রান্তটী পড়িয়া যাইত। ঐ সূচের অপর প্রান্তে খাড়া ভাবে দুইটী চুম্বক আছে; ঐ চুম্বক সূচী কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হওয়ামাত্রই চুম্বক দুইটী ঘুরিতে থাকে। চুম্বক দুইটীর পশ্চাৎ ভাগে এক খণ্ড ক্ষুদ্র আয়না আছে; ঐ আয়নায় আলোকরশ্মি পতিত হইলে, সেই রশ্মি, 'ম্যাজিক্ ল্যাণ্টারণে"র (Magic Lantern = ছায়াবাজি) "লেন্স" (lens) (কুব্জপৃষ্ঠ কাচখণ্ড) বৎ একটী লেন্সের ভিতর দিয়া একটী পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত হয়।

যখন উদ্ভিদ্ বৃদ্ধি পায়, তখন ঐ সূচটী পড়িয়া যায়। উদ্ভিদ্ বৃদ্ধির ঐ গতি এত অল্প যে, অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ দ্বারা তাহা অনুভব করা যাইতে না পারিলেও তদ্দ্বারা ঐ ক্ষুদ্র চুম্বক এপাশ ওপাশ দুলিতে থাকে এবং তাহাতে চুম্বকের পশ্চাৎ ভাগস্থ আয়নাও আলোড়িত হইতে থাকে; তখন সেই পর্দ্দার দিকে তাকাইলে দেখা যায়, একবিন্দু আলোক পর্দ্দার উপর একবার এদিক আরবার ওদিক দুলিতেছে এবং ঐ গতিশীল আলোকবিন্দুই উদ্ভিদ্ বৃদ্ধি গতি-জ্ঞাপক। *

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার।

উদ্বোধন।

(১)

এ কি রে জড়তা মহাপাপ প্রায়
আসিয়া ঘিরেছে এই বাঙলায়,
জাগে না উঠে না কেহ রে ভাই!
সকলেই হেরি ঘুমে অচেতন,
শুয়ে শুয়ে শুধু হেরিছে স্বপন,
এতই অকর্ম্মা, বলিতে নাই!

(২)

ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙেনা তাদের
ঘুমায়ে অসাড় হইয়াছে ঢের,
অনন্ত শয্যায় তারা কি রবে?
বাণিজ্যের আলো দীপ্ত দিবাকর,
ওই দেখ জ্বলে বঙ্গের ভিতর,
ওই দেখ ঘুরে বণিক সবে;

(৩)

ওই দেখ তারা গায় স্বার্থ-গান,
তালে তালে নাচি ধরিতেছে তান,
ওই দেখ তারা দিতেছে প্রাণ,
স্বার্থের লাগিয়া নাহি করে ভয়,
ব্যাঘ্র সর্প মুখে অগ্রগামী হয়,
স্বার্থেতে জড়িত তাদের মান;

* মন্তব্য। ডাক্তার, সার্ জে. সী. বসু, F. R. S. সম্প্রতি বিলাতে যে সকল বক্তৃতা দেন তাহার সমালোচনা তথাকার কোনও কোনও পত্রিকায় বাহির হয়; সেই সমালোচনা এদেশেও ঐ সকল পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হয় এবং তাহা অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। সুতরাং "তিন নকলে আসল খাস্তা" হওয়া অসম্ভব নয়; তৎপর, অনুবাদ দ্বারা জটিল বিষয়ের সরলতা সম্পাদনও সহজ ব্যাপার নয়।—লেখক।

(৪)

স্বার্থ-উপদেশ দেয় সর্ব্বক্ষণ,
কর্ণে ছাড়ি দেয় স্বার্থ-মন্ত্র-ধন,
চক্ষু ফুটাইয়া দেখায় সবে;
তবুত বঙ্গের হ'লনা হ'লনা,
জ্ঞানের উদয় স্বার্থের চেতনা,
তবেরে আবার কখন হবে?

(৫)

তারা কারো পানে নাহি চায় আর,
স্বার্থেতে ছেয়েছে বঙ্গের আগার,
স্বার্থে আত্ম-বলি দিতেছে সবে;
স্বার্থের মন্দির প্রকাণ্ড ব্যাপার,
শূন্য ভেদি চূড়া উঠেছে তাহার,
স্বার্থের বিজয় সদাই ভবে;

(৬)

স্বার্থ স্বার্থ করি বিদেশীর দল,
জাহাজ ভাসায়ে, এসেছে সকল,
ঘুরিছে সবাই পাগল হয়ে;
কোথা সোণা রূপা কোথা ধান চাল,
তন্ন তন্ন করি সকাল বিকাল,
সংগ্রহ করিছে সন্ধান লয়ে;

(৭)

নাহিক তাদের শ্রমের বিরাম,
গ্রামে গ্রামে ধায় ঘুরে অবিরাম,
খুদ কুঁড়া কিছু ছাড়েনা তারা;
খুঁটিয়া খুঁটিয়া আনিছে সকল,
গ্রামের বাসিন্দা হইয়া বিকল,
ঘুমায়ে হয়েছে আপন-হারা;

(৮)

কল কারখানা করিয়া সৃজন,
আমাদের তুলা করিয়া গ্রহণ,
পাকাইয়া সূতা গঠিছে তায়;
তাহাতে কাপড় করিছে বয়ন,
বাঙ্গালী করিছে লজ্জা নিবারণ,
হাঁ করিয়া বস্ত্র চাহিছে হায়!

(৯)

আমাদের পাট কলে কলে যায়,
লাখ লাখ থলে হইতেছে তায়,
বাণিজ্য জিনিস বোঝাই করে।
এদেশের বহু দ্রব্য আছে যত,
জাহাজে জাহাজে যায় অবিরত,
শূন্য করি হায় বাঙালী ঘরে!

(১০)

আমাদের দ্রব্য লয়ে গিয়ে হায়,
আমাদের দিয়ে মূল্য লয় তায়,
আমরা এমনি অসাড় হায়!
আমরা মানুষ হব কি কখন,
আমাদের ঘুম ভাঙেনা যখন,
জীবন মোদের মৃত্যুর প্রায়!

(১১)

মোদের হাত পা দিয়াছেন বিধি,
তবে কেন ভুলি স্বদেশের নিধি,
কেন না করিব যতন তাই?
আপনার হাতে কেন না গড়িব
দেশের জিনিস দেশেতে রাখিব,
উঠ উঠ তাই সকল ভাই।

(১২)

ব্রহ্মচর্য্য তাই কররে আশ্রয়,
হ'ক পূর্ব্ব কথা স্মৃতিতে উদয়,
কি ছিলাম মোরা হইলাম কি?
পরের প্রত্যাশী হয়েছি এখন,
হারায়েছি সেই স্বাধীনতা ধন,
কি বলিব আর মোদেরে ছি ছি!

(১৩)

ব্রহ্মচর্য্য ভাই কররে আশ্রয়
শিক্ষায় কঠিন হ'ক রে হৃদয়
চরিত্র গঠন কর হে সকলে,
হও রে সরল মনে হ'ক বল,
আলস্য ত্যজিয়া দাঁড়াও সকল,
পরিচয় দাও আর্য্যবংশ বলে।

(১৪)

নীরব থেক না থেকনাক আর,
চারি দিকে স্রোত বহে অনিবার,
উন্নতির ভেরী বাজাও জোরে ;
বাঙালী জাতের দাও পরিচয়,
কারো চেয়ে ভবে কভু কম নয়,
তবে কেন সব আছ হে মরে ?

(১৫)

উঠ উঠ ভাই বঙ্গবাসিগণ,
বঙ্গে হ'ক আজ মহা জাগরণ,
হাসুক সে বঙ্গ প্রাণের হাসি ;
চৌদিকে ছুটুক উন্নতির ঢেউ,
মলিন মুখেতে থেক নাক কেউ,
জ্বলুক আলোক আঁধার নাশি !

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

মহাপুরুষই মহাপুরুষকে চেনেন।

"The great only know the great. In spite of differences in their ways and advances, they all unite in a centre common in the sphere of their life." মহৎ মহৎকে চেনেন। তাঁহাদের সাধন ও অনুসরণীয় পথে ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহারা জীবনের এক সাধারণ কেন্দ্র ভূমিতে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েন। দেশ, কাল ও পাত্র অতিক্রম করিয়া উচ্চ সাধক ও মহাজনদিগের এই শোণিত-গত সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। কোথায় জন্ম গ্রহণ করিলেন মহর্ষি ঈশা, আর কত দিন পরে মার্কিন ভূমি হইতে এমার্সন (Emerson) বলিয়া গেলেন "Jesus Christ belonged to the true race of prophets". মহর্ষি ঈশা যে চক্ষে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন মুষাকে (Moses) দেখিয়া বলিয়াছিলেন "I feel respect for Moses and the prophets" এমার্সনের ভিতরেও সেই দৃষ্টির আভাস পড়িয়াছিল। সাধু চ্যানিং এর (Channing) ধর্ম্ম মন্দিরের জনৈক শ্রোতা ও উপাসক এমার্সনকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "That young man will make another Channing". সত্যই সেই শ্রোতার ভবিষ্যদ্বাণী সাধু এমার্সনের জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা এমার্সন তাঁহার জীবনের সাধনের পথে ভাবী মহাজন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে "I look for the new Teacher, that shall follow those shining laws, that he shall see them come full cycle ; shall see there rounding complete grace ; shall see the world to be the mirror of the soul ; shall see the identity of the law of gravitation with purity of heart ; and shall show that the Ought, that Duty, is one thing with science, with Beauty and with Joy" পঞ্চ শতাব্দী পরেও জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীঈশা বুদ্ধকে চিনিয়াছিলেন এবং সেই নির্ব্বাণের ভূমিতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "not my but thy will be done" তাই বলিতেছি যে দেশ, কাল, পাত্র ভেদ করিয়া সাধক ও মহাজনগণ এক জন আর এক জনের ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম সমাজেও এই পরিপূর্ত্তি ও পরিস্ফুরণ প্রত্যেক উদারচেতা ব্রাহ্মকে স্বীকার করিতে হইবে। মহাত্মা রাজা রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজে ক্রম-বিকাশের তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে এই পরিস্ফুরণ তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। যেমন Old Testament হইতে New Testament আসিয়া পড়িয়াছিল, অথচ একের সহিত অপরের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেইরূপ মহাত্মা রাজা রামমোহন হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মও সেই সম্বন্ধ সূত্রের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মত-রাজ্যের ভিতর ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও "তিনে-এক ও একে তিন" এইরূপ সম্বন্ধই চলিয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মহাজন সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, জানি না সেরূপ ভাবে তাঁহাদের সে সম্বন্ধ কোথাও বিবৃত হইয়াছে কি না। এই শোণিত-গত ও বংশানুক্রমিক সম্বন্ধের উপরেই কেশবচন্দ্র রামমোহনকে পিতামহ ও দেবেন্দ্রনাথকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি ঈশা যে সম্বন্ধ মুষার ভিতর দেখিয়া বলিলেন যে "I feel respect for Moses and prophets" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তাহাই দেখিলেন। বিবাদ আমাদের নিকট, তাঁহাদের ভিতর ছিল না। আমরা এক জনকে স্বীকার করিতে গিয়া অন্যকে অস্বীকার করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, "একে তিন তিনে এক"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকেও সেই ভাবে দেখিয়াছিলেন। পিতা যেমন পুত্রের নামকরণ করিয়া থাকেন, পিতা দেবেন্দ্রনাথও কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" নাম দিয়াছিলেন। মহর্ষি বলিয়াছিলেন যে, "কেশব সম্মুখে না থাকিলে আমার উপাসনা খুলে না"। কি মধুর সম্বন্ধ! কেশবচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অনুভব করিয়া মহর্ষি এক সময়ে তাঁহার পত্র বিশেষের মধ্যে লিখিয়াছিলেন যে "আমি তোমার মত পবিত্র লোক বঙ্গদেশে দেখি নাই।" কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ রামমোহন লাইব্রেরীতে মহর্ষিদেবের তৈল-চিত্র উন্মোচনের দিনে আমাদের ভক্তি-ভাজন মাননীয় উদারচেতা প্রাচীন ব্রাহ্ম সার্ কে, জি, গুপ্ত মহাশয় মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের মধুর সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া যে প্রাণস্পর্শী কথা বলিয়াছেন, তাহা কাহার নয় হৃদয়কে স্পর্শ করিবে? গুপ্ত মহাশয় এক স্মৃতি সভার বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছিলেন "But he (maharshi) was soon to be joined by a young co-adjutor whose burning zeal, intence enthusiasm and deep fervour brought a fresh succession of strength to the Brahmo Samaj. This young man was no other than Keshab Chandra Sen whom the Maharshi soon after gave the title of Brahmanonda" * * * under the Maharshi's wise and sympathetic guidance and the Bramhanond's bold leadership, the movement spread in all directions."

হায়! আমাদের সে স্মৃতি এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে যে, মহর্ষি দেব তাঁহার প্রিয় ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পর, একদিন রাত্রি শেষে নিস্তব্ধ উষায় সকলের অজ্ঞাতসারে কমল কুটীরের সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রিয় কেশবের সমাধির পার্শ্বে বসিয়াছিলেন! তাই বলিতেছি, বিবাদ আমাদের কাছে, তাঁহাদের ভিতর ছিল না। "The jewellers know the jewels" যহুরীই যহর চিনিয়া থাকে। বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তির পথে বিবাদ নাই। বিবাদ মানবীয়—মিলন স্বর্গীয়।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

মায়ে-পোয়ে।

(সমালোচনা)

যার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নাই, তার সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক পাতানো চলে। শাদার উপরে সব রঙই ফলানো যাইতে পারে। তাই সে চির রহস্যময়ের সঙ্গে মানুষ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নানা সম্পর্ক স্থাপন করে।

উপনিষদ্ যাহাকে "বামনী" "ভামনী" ও "সংযদ্‌বাম" কহিয়াছেন তাহার সঙ্গে রস যখন বেশি জমায়েৎ হইয়া উঠে মানুষ তখনই তাঁহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ অনুভব করে। এই অনুভূতিটাকে বেশি করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে একটা সম্পর্কে পরিণত করে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সম্বন্ধটাকে মাতা পুত্রের ভাবের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার "মায়ে-পোয়ে।"

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"মা লিখাইয়াছেন, আমি লিখিয়াছি।" এই খানেই তো কবিত্বের চরম এবং সমালোচনার শেষ! তাঁহার লেখনী সার্থক হউক।

ব্রাহ্ম সমাজের ভিতর এমন কেহ থাকিতে পারেন, যাঁহার কাছে এই "মায়ে-পোয়ে" একটা সাকার উপাসনার চরম—অর্থাৎ প্রায় প্রতিমা পূজার কাছাকাছি বলিয়া মনে হইতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তির জন্য বলা যাইতে পারে যে তিনি যেন এই পুস্তকখানির "সন্ধ্যায়" পরিচ্ছেদটী মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন। যেখানে লেখক কহিয়াছেন—"মায়ের খোঁজে এসে যে এমন শোভা দেখতে পাব, তা কে জান্‌তো? এত শোভা তো দেখ্‌ছি, কিন্তু মায়ের অরূপ রূপের যে শোভা দেখেছি তার কাছে এত শোভাও কিছুই নয়।" বৈদিক ঋষিগণ প্রথমতঃ সুন্দর জগতের যাহা কিছু মনোরম দেখিতে লাগিলেন, তাহাকেই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন "এই সেই!" দেখিতে দেখিতে অবশেষে উপলব্ধি করিলেন যে "নেদং যদিদমুপাসতে" এই জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই চির সুন্দরকে চিনিতে হইবে, এই জাগতিক ব্যক্তিগণের সহিত যত রকম সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে আনন্দময়ের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ। নতুবা সেই অচিন্ত্য অপার অগম্যকে কি করিয়া বুঝিব?

এই "মায়ে-পোয়ে" ভাবের ধারার ভিতরে দেখিতে পাই "জ্বালা" আছে, "অভিমান" আছে, "আত্ম সমর্পন" আছে। অবশেষে সকল "আনন্দে" পর্য্যবসিত। সাধকের জীবন কত বিচিত্র ভাবের মধ্য দিয়াই না অগ্রসর হয়। ভাষা তাহাকে আর কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে?

যাহার জীবনে অরূপের রূপ-জ্যোতির সন্ধান মিলিল না—তার কিছু দেখাই হইল না। চির সুন্দরকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে বলিয়াই জগৎ সুন্দর। যে ইহাকেই চরম ভাবিল, সে বড়ই ঠকিল। যে বালক খেলানা পাইয়া তাহাতেই মজিল, তাহার আর মায়ের কোলে যাওয়া হইল কৈ?

স্তর পরম্পরাক্রমে উক্ত ভাবগুলিকে সরল ভাষায় ফুটাইয়া তোলাই এই পুস্তিকার বিশেষত্ব। এই মর্ম্মোত্থিত ভাবগুলি যেন সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত, সাধনার সাংচর্য্যে শুভ্রোজ্জ্বল, এবং অনুভূতির আবেগে কম্পিত—একখানি ক্ষুদ্র গদ্যকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ব্রণ-বিজ্ঞান—শেষ।

ব্রণ বিসর্পিত হইলে বা সফেন পূঁজ-রক্ত বাহির হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বাতকুণ্ডলী, অষ্ঠীলা, দন্তবেষ, উপকুশ, কণ্ঠ, মান্থ, উরুক্ষত, ব্রণগ্রন্থি ও মূত্রাশয়, পাকাশয়, আমাশয় ও ফুস্‌ফুস্-জাত ব্রণ বাপ্য, অর্থাৎ সহজে প্রাণ নাশক হয় না, কিন্তু চিকিৎসায় আরাম হয় না। যে ব্রণ কঠিন গোশৃঙ্গবৎ উন্নত, দূষিত রুধির বা পাতলা পিচ্ছল আইর ধোয়া জলের মত স্রাব-যুক্ত স্নায়ুজাল-সমন্বিত (অর্ব্বুদ) সেই ব্রণ অসাধ্য। ক্ষীণমাংস ব্যক্তির অধিক পূঁজ ও রক্তবাহী ব্রণ হইলে বা ব্রণের চারিদিকে শোথ ও মাংসের বুদবুদ দেখিলে বা অরুচি, অপাক, শ্বাস, কাশ, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে ব্রণ অসাধ্য। মস্তকে বা কণ্ঠে শব্দবাহী ব্রণ হইলে ব্রণ অসাধ্য। মস্তকের হাড় ভাঙ্গিয়া মগজ দৃষ্ট হইলে এবং সঙ্গে কাশ ও শ্বাস-কৃচ্ছতা ঘটিলে ব্রণ অসাধ্য। পাকাশয় হইতে তুষধোয়া জল এবং আমাশয় হইতে কলাইর জল ও রক্তাশয় হইতে ক্ষার জলবৎ স্রাব হইলে ব্রণ অসাধ্য।

পাকা পক—সচরাচর প্রদাহের পচ্যমান অবস্থা আরম্ভ হইলে তিন দিন মধ্যেই পূঁজ উৎপন্ন হয়। প্রদাহের মধ্যের গলন কার্য্য শেষ হইলেই ব্রণ সুপক্ক হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এই সময়ে প্রদাহের লক্ষণাবলী কমিয়া যাইবে। অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলে মধ্যে পূঁজের ঢেউ অনুভব হইবে। এই অবস্থায়ই অস্ত্র করিয়া কিসা করিতে হয়। নচেৎ পূঁজ ব্রণ প্রাচীরের শুদ্ধ মাংস ধ্বংস করিয়া পূঁজও গহ্বরের আকার বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, তাহা হইলে অস্ত্রের পর ক্ষত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হইয়া থাকে, অধিকন্তু ব্রণের উপরিভাগের চামড়া পাতলা হইয়া যায় এবং শেষে এই পাতলা চামড়া নীচের মাংসের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহে না।

দ্বিতীয়তঃ—পূঁজের স্বাভাবিক গতি নিম্ন দিকে। কাজেই নিম্নগতি হইয়া কোন এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া সেখানেও একটী গর্ত্ত (কেভীটী) উৎপাদন করে এবং উপরের মুখ দ্বারা সামান্য পূঁজ বাহির হইয়া অবশিষ্ট পূঁজ উক্ত গর্ত্তেই আবদ্ধ থাকে। তখন সেখানেও অস্ত্র করিয়া পূঁজ নিঃসরণের পথ সরল করিয়া দিতে হয়। আর যদি যথাকালে এই পূঁজ নিঃসরণের বন্দোবস্ত না হয়, তবে সেখান হইতে অন্যত্র গতি হইয়া নালী বৃদ্ধি করিতে থাকে। অথবা পূঁজ জমা থাকায় পূঁজের উত্তেজনায় রোগীর জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং কালে এই জ্বরই ক্ষয়কারী জ্বররূপে পরিণত হইয়া রোগী ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে, এবং উপসর্গাদি বৃদ্ধি পাইয়া রোগী মৃত্যুমুখেও পতিত হয়।

তৃতীয়তঃ—প্রদাহের নিকটবর্ত্তী যদি কোন স্বাভাবিক গহ্বর বা মূত্রাশয় (কিড্‌নি) ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা আক্রান্ত হইবার একান্তই সম্ভাবনা; হইলে, ব্যারাম কষ্টসাধ্য হয়, অনেক স্থলে অসাধ্যও ও হইয়া পড়ে। অস্থি সন্ধি আক্রান্ত হইলে অস্থি বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে এবং এই অস্থি প্রায়ই আর স্বাভাবিক হয় না।

চতুর্থতঃ—যদি কোন রক্তবাহী শিরা বা শিরা-

মর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তবে পূঁজে ঐ শিরা ধ্বংস করিয়া দেওয়ায়, অস্ত্রের পর হঠাৎ এমত রক্তস্রাব হইতে থাকে যে, রোগী ২।১ দণ্ড মধ্যেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অতএব যথা নির্দ্দিষ্ট কালেই ব্রণ বিদারণ পূর্ব্বক পূঁজ বাহির করিয়া দেওয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। রোগী, বালক অসহিষ্ণু ও ভীরু হইলে, ভেদক ঔষধ দ্বারা ব্রণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া পূঁজ বাহির করিয়া সোলা বা পলিতা দ্বারা মুখ বড় করিয়া চিকিৎসা করিবে। অনেক অজ্ঞ বৈদ্য এই প্রকার রোগীকে ঔষধ দ্বারা ব্রণ ফাটাইয়া দিবে বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া নানা প্রকার চাতুরী দ্বারা অযথা ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট ও অর্থ শোষণ করে। ইহারা প্রকৃতই কুবৈদ্য। ভেদক ঔষধ ব্যতীত এমত ঔষধ নাই, যাহাতে ব্রণ ফাটিতে পারে। তবে বিলম্বে স্বতঃই পূঁজ বৃদ্ধি হইয়া ব্রণের উপরের চামড়া পাতলা হইয়া যায় এবং পূঁজের চাপে আপনা হইতেই ব্রণ ফাটিয়া যায়। অপর পক্ষে অনেক বৈদ্য প্রদাহের পচ্যমান অবস্থাই পাকা ভ্রমে অথবা রক্তজ ব্রণের রক্তের তরঙ্গকেই পূঁজের ঢেউ মনে করিয়া অস্ত্রোপচার (অপারেশন্) শেষ করিয়া থাকেন। ইহা পক্ক ব্রণকে ত্যাগ করা অপেক্ষাও বিপজ্জনক। পক্ক ব্রণ ত্যাগ করিলে অবশ্য পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিয়া রোগী মারাও যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কিন্তু কাঁচা ব্রণ কাটিলে প্রায় সর্ব্বত্রই অল্লাধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রদাহের আক্রমণ অবস্থায় তাহার উপরে অস্ত্রের উত্তেজনা হওয়ায় প্রদাহ আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অনর্থক কতগুলি রক্ত বাহির হইয়া যাওয়াতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ব্রণ যদি বাত অথবা পিত্তজ বা সান্নিপাতিক হয়, অথবা রোগী যদি বাত পিত্ত প্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, তবে—ব্রণ সাঘাতিকভাবে বিসর্পিত হইয়া পড়ে। রোগীর মধুমেহ, শর্করা মেহ বা নিরক্তাবস্থা থাকিলে অস্ত্রোপচারই রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়। অপক্ক ব্রণ অস্ত্র করিলে ব্রণ বিসর্পিত হউক বা না হউক প্রদাহের যে বিস্তৃতি ঘটিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই, এবং সচরাচর এই স্থলেই প্রায় নালী দেখা যায়।

অস্ত্র চিকিৎসা। অস্ত্র ক্রিয়া আট প্রকার। (শুশ্রুতদেব) যে রোগে যে ক্রিয়া আচরণীয়, তাহা সেই সেই রোগ বর্ণনকালে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। ব্রণ চিকিৎসায় ভেদক ও বিস্রাব্য ক্রিয়াই আচরণীয়। অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে ন্যাকরা, গরম জল, শীতল জল, কষায় দ্রব্যের জল, তূলা ঔষধ, যন্ত্রতন্ত্র, সলাকা সংগ্রহ করিয়া রোগী পশ্চিম মুখে ও চিকিৎসক পূর্ব্ব মুখে অবস্থান করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক অস্থি ধমনি ও মর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথা নিয়মে অস্ত্র করিবে।

ভেদক ক্রিয়া—ব্রণে যদি পুঁজ উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, বিশেষতঃ ফুসফুস, উদর, গহ্বর বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি বড় জাতীয় ব্রণ বা যে ব্রণের চারিদিকের প্রাচীর অনুভব হয় না সেই সব স্থলে বোমা যন্ত্র দ্বারা ব্রণ ভেদ করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। বোমা ঠিক সরলভাবে ধরিয়া তাহার ফাটা দিক নিজের দিকে রাখিয়া, ব্রণের যে স্থান পাতলা বলিয়া অনুমান হইবে সেই স্থলে বোমা বসাইয়া দিবে। বোমা ব্রণ গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে একটুকু জোরে সম্মুখের দিকে চাপা দিলেই ব্রণ-বস্তু বোমার ফাঁক দিয়া বাহির হইবে। মধ্য হইতে রক্ত বা মাংস ধোয়া জলবৎপদার্থ বা চালিতার বিজল সদৃশ পূঁজ বাহির হইলে কখনও ব্রণে অস্ত্র করিবে না। সে দিবস পরিত্যাগ করিয়া ২।৪ দিবস ব্রণ পাকান পুলটীশ, প্রলেপ দিয়া পুনরায় অস্ত্র করিবে। আর সুস্থ অথবা দূষিত পূঁজ দোষের প্রকোপ অনুসারে যে বর্ণেরই বাহির হউক না কেন অস্ত্র করিবে।

বিস্রাব্য ক্রিয়া—ক্ষিপ্র-হস্ততাই অস্ত্র চিকিৎসকের প্রধান গুণ। অতএব অতি ক্ষিপ্রতার সহিত চিকিৎসক ব্রণ প্রাচীর বিদীর্ণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে "হোগলপাতি" যন্ত্রের ফলক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা জোরের সহিত ধারণ করিয়া মাংসপেশীর লম্বালম্বি ভাবে, ব্রণ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এবং উক্ত অস্ত্র দক্ষিণে কিম্বা বামে চাপ দিয়া ধরিলে অস্ত্রের পার্শ্ব দিয়া পূঁজ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রণ প্রাচীর কাটা সমীচীন নহে। উক্ত প্রকারে পূঁজ বাহির হইলে ভিষক আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে ব্রণ প্রাচীর কাটিয়া দিবে। এই সময়ে ব্রণের পার্শ্বস্থ অথবা নিম্ন প্রাচীর আহত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রণ প্রাচীর আহত হইলে নূতন প্রবাহ আরম্ভ হইবে, অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া রোগী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। আধুনিক চিকিৎসকগণের এদিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া অনেক কুফল ঘটিয়া থাকে।

প্রবিষ্ট হোগলপাতি দ্বারা ব্রণ প্রাচীর উপরে ও নিম্ন দিকে কর্ত্তিত হইলে, অর্জ্জুনী অথবা কনিষ্ঠা অঙ্গুলি ব্রণ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অঙ্গুলি না গেলে সলাকা প্রবেশ করাইয়া দেখিতে হইবে, কোন্ দিকে গহ্বরের পরিমাণ বেশী আছে, (এই সময়েও ব্রণ প্রাচীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে) এবং যেদিকে গহ্বর বেশী আছে সেই দিকে এমতভাবে কাটিয়া দিতে হইবে যেন অস্ত্র মুখ ঢালু হয়, তবেই ব্রণের মধ্যস্থ পূঁজ রক্ত স্বাভাবিক নিয়মে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে। ব্রণের উপরিভাগের যে যায়গা পাতলা হইয়া যায় বা টোব ধরিয়া উঠে, সেই স্থলেই গহ্বরে ঢালু দিক ইহাই সাধারণ নিয়ম, এবং সেই স্থলেই প্রবল অস্ত্র প্রবেশ করাইতে হয়; কিন্তু পাতজ ব্রণে সচরাচরই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। বায়ুর শক্তিতে হয়তো ব্রণ গহ্বরের উপর দিক টোব ধরিয়া উঠিয়াছে, অথবা একাধিক স্থল এই প্রকারে টোব এবং তাহার মধ্যে পুরু-মাংসপেশীর প্রাচীর বিদ্যমান আছে; কিন্তু যে স্থলে অস্ত্র হইলে ঢালু হইতে পারে, যে স্থল ভয়ানক পুরু অস্ত্র করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইবে, অথবা শিরা বা মর্ম্মাদি আহত হইবার একান্তই সম্ভব এই প্রকার স্থলে; যে যে স্থলে টোব ধরিয়াছে সেই সেই স্থলে, অস্ত্র করিয়া সলাকা দিয়া দেখিতে হইবে, কোন দিকে ব্রণের গহ্বর বিদ্যমান আছে; এবং যদি এই অস্ত্রে ঢালু না হইয়া থাকে, তবে সলাকার মাথায় হোগলপাতি বা এরসেম লেনচেট দ্বারা বা বোমা যন্ত্র দ্বারা নিম্ন প্রাচীর গাত্রে সরু ছিদ্র করিয়া দিয়া পলিতা বা রবারের নল দ্বারা পূঁজ বাহির করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ইহা ভিষকের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। ফোটকের একাধিক স্থলে অস্ত্র করা আবশ্যক হইলে প্রত্যেক অস্ত্রই মাংসপেশীর লম্বালম্বি ভাবেই করিতে হইবে। আড়াআড়ি ভাবে কখনও কোন স্থলে অস্ত্র করা কর্ত্তব্য নহে, করিলে মাংসপেশী

কাটিয়া যাইতে পারে, অথবা শিরা বা স্নায়ু কাটিয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা ক্ষতে তীব্র যন্ত্রণা হইতে পারে। অধিকন্তু ক্ষত সকালে পুরিয়া উঠে না. একটী উন্নত মাংস পিণ্ড জন্মিয়া থাকে। অস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অতি লঘু হস্তে চাপ দিয়া পূঁজ বাহির করিয়া দিবে। পূঁজ বাহির করিতে জোরে চাপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। রোগী দুর্ব্বল, বা অধিক দিনের ব্রণ বা বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ আদি অধিক পূঁজ বিশিষ্ট ব্রণের পূঁজ প্রথম দিনে সম্পূর্ণ নিঃসৃত করা কর্ত্তব্য নহে। করিলে রোগীর শরীরের রক্তের গতি সেই দিকে হইয়া রক্তাশয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। সেইরূপ পুরাতন বড় ব্রণে পূঁজ এক কালীন সকল বাহির করিয়া দিলে রোগী ক্ষয়কাশে পরে আক্রান্ত হইবার একান্তই সম্ভব, এবং এই অবস্থায় এই প্রকারে জ্বর হইলে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। যথা রীতি পূঁজ বাহির করিয়া একখণ্ড পাতলা ন্যাকরা আবশ্যক মতে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে করিয়া ক্ষতের মুখে সলাদ্বারা ছিপির মতন করিয়া রাখিবে। ন্যাকরা যাহাতে ব্রণ গহ্বর মধ্যে বেশী না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গহ্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ন্যাকরা দিলে পূঁজের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায় ও অনেক স্থলে নূতন করিয়া প্রদাহ আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ অস্ত্রের পর দিবসই, প্রকৃতির শক্তিতে ব্রণ গহ্বরে চারিদিকের সুস্থ মাংস দ্বারা ব্রণ গহ্বর অনেক পূর্ণ হইয়া যায়। ন্যাকরা মধ্যে দিলে, এই মাংস আর বৃদ্ধি হইতে পারে না, বরং ধ্বংস হইয়া যায়।

রক্তস্রাব—অস্ত্রের মুখে পাতলা ন্যাকরাই ব্যবহার কর্ত্তব্য, কেন না পাতলা ন্যাকরায় রক্তাদি যে প্রকার বন্ধ হয় মোটা বা মাড়াদি সংযুক্ত ন্যাকরায় তত সহজে বন্ধ হয় না। আর যদি হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ কোন ধমনী বা শিরাছিন্ন হইয়া যায় তবে প্রথম ন্যাকরাদ্বারা জোরে চাপ দিয়াই বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু না হ'লে জারিত লৌহ, হিরাকষ, ফটকিরী চূর্ণ ইত্যাদি সঙ্কোচক ঔষধ ন্যাকরায় মাখিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে; এবং উক্ত ঔষধের জলদ্বারা সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিবে। ছাগল্যাদির পাতা, বিষল্যা করণীর পাতা, দুর্ব্বার মাইজ ইত্যাদি যে সব গ্রাম্য রক্ত-রোধক ঔষধ প্রচলিত আছে তাহাতে ও এইসব স্থলে ভাল কাজ হইয়া থাকে। চীৎকার দিলেও বেশ ফল হয়। ন্যাকরার চাপ দিয়া জলপটী পুরু করিয়া বাঁধিয়া রক্ত বন্ধ করিতে পারিলে, ভাল হয়, রক্তরোধক সকল ঔষধই উত্তেজক, রোগীর বায়ু চড়া করিয়া দেয়। কিন্তু একটুকু মোটা জাতীয় শিরা অথবা ধমনী যদি ছিন্ন হইয়া যায়, তবে এইসব ঔষধে প্রায়ই রক্ত বন্ধ হয় না। সেই স্থলে শিরা ছিন্ন হইলে ক্ষতের নিম্ন দিকে এবং ধমনী ছিন্ন হইলে ক্ষতের উপরের দিকে জোরে একটী বন্ধন দিয়া দিতে হইবে। সূক্ষ্ম ধারে পিচকারীর মত ছিটিয়া রক্ত বাহির হইলে শিরা এবং দোমাইয়া বোকনা বোকনা রক্ত বাহির হইলে ধমনী ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এইপ্রকার বন্ধন দিলেও যদি কোন কাজ না করে তবে ধমনী বা শিরার মুখ পাইলে তাহা বাঁধিয়া দিবে, আর যদি সঙ্কুচিত হইয়া মাংস পেশীর মধ্যে বসিয়া যায় তবে যে স্থল দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে তথায় গ্রেণ দুই কাওয়াইনের তুলা লাগাইয়া দিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। যদি সে স্থলে

ও না হয় তবে উত্তপ্ত লৌহ সলাকা দ্বারাই দগ্ধ করিয়া দিবে।

ব্যাণ্ডেজ—অস্ত্রের পর জলপটীই বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। এনটীসেপটীকের বন্ধন প্রণালী সর্ব্বত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। সুস্থ ও সবল ও নির্দ্দোষ শরীর না হইলে বা রোগী রক্তদুষ্টি গরমী, মধুমেহ, কুষ্ঠআদি বিষে দূষিত হইলে এই প্রণালীতে কোনই কাজ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই ব্যয় সাধ্য চিকিৎসা ভারতের প্রকৃতির ও দরিদ্র পল্লীর সম্পূর্ণই অনুপযোগী। সেই কারণেই আয়ুর্ব্বেদে পূর্ব্ব বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালী সমর্থন করিয়া গিয়াছে, এবং তাহাই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

তবে এনটীসেপটীক চিকিৎসা প্রণালী ও আয়ুর্ব্বেদের প্রথম সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া দেখা যায়। যাহা হউক অস্ত্রের পর পূঁজরক্ত বন্ধ হইয়া গেলে, ক্ষতোপরি পুরু গদি দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিতে হইবে। এবং ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহা জল দ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পর দিবস ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া কাঁচা মলমের পটী দিতে হইবে। যদি অস্ত্র কালীন প্রাচীরাদি আহত হইয়া থাকে তবে দোষের প্রকোপ বশতঃ প্রদাহ না কমিয়া চারিদিকের লাল ভাব বিদ্যমান থাকে এবং ব্রণ গহ্বর সঙ্কুচিত হইয়া না যায়, আবশ্যক বোধে দুই তিন দিনও জলপটী রাখা যাইতে পারে, বা তোকমা, তিল, বেতাগাদি ব্রণ সঙ্কোচক পুলটীশ আদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে সচরাচর প্রায় সর্ব্বদাই এই স্থলে কাঁচা মলমের পটীতেই বিশেষ ফল দর্শে। পুলটীশ আদি দিতে হইলে ক্ষত মুখের ন্যাকরা বাহির করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু কাঁচা মলমের পটী দিলে অস্ত্র মুখের ন্যাকরা ফেলিয়া দিতে হইবে এবং মলমের পটীমাত্র কাটামুখ ও প্রদাহিত স্থানের উপর বসাইয়া দিতে হইবে. মধ্যে পুরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এনটিসেপটীক ভাবের চিকিৎসায় সকল স্থলেরই মলম বা ঔষধের পটীর উপর পান বা কলার পাতা ব্যবহার করিতে হইবে। এই প্রকারে প্রদাহ কমিয়া ব্রণ গর্ত্ত সঙ্কুচিত হইতে থাকিলে, কাটা মুখের ন্যাকরা ফেলিয়া দিয়া কষায় জল দ্বারা (নিম, বট) ধৌত করিয়া প্রত্যহ দুই বেলা ঔষধ দিতে হইবে। ধোয়ার সময় ফিট্‌কারী তুঁত ইত্যাদ দ্বারা ক্ষতের মধ্যে জোরে জল দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ন্যাকরায় করিয়া জল দিবে এবং অতি সন্তর্পণে ভিজা ন্যাকরা দিয়া ক্ষতের মধ্যের রক্ত পূঁজ পুছিয়া ফেলিবে। উৎপন্ন মাংস-অঙ্কুর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রণে সামান্য পূঁজ আদি থাকিলে এক বেলা ব্যাণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করিলে ও চলিতে পারে। অপর পক্ষে পূঁজের মাত্রা বেশী হইলে দুই তিন বারও ব্যাণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অস্ত্রের পর দুই তিন দিবস কাঁচা মলমের পটী, পরে ক্ষতে পচা থাকিলে কাইট মলম, ঘায়ের তৈল, এবং সুস্থ হইয়া উঠিলে গোল ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এ বিষয় বিস্তারিত ক্ষত রোগ বর্ণনকালে লিখিত হইবে। এই প্রকার চিকিৎসায় ব্রণ পুরিয়া না উঠিলে নালী ঘায়ের চিকিৎসা অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে।

ব্রণ রোগীর কর্ত্তব্য—দিবা নিদ্রা, গম্যা স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ, দীর্ঘ সময় উপবেশন বা শয়ন, মাদক দ্রব্য সেবন বা অনিষ্ট চিন্তা, রাত্রি জাগরণ, যান বাহনে গম নিষিদ্ধ।—

পথ্য—রোগী দুর্ব্বল হইলে, উত্তেজক ঔষধ, দুগ্ধ, মাংস মৎস, ডাইল ভাত ইত্যাদি বলকারক খাদ্য পথ্য। রোগ পুরাতন হইলে পুষ্টিকরও বলকারক খাদ্য ও তৈলাক্ত খাদ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। গমের ছাতু পিষ্টক, গরম জল বিশেষ উপকারক। উত্তেজনা জন্য জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও স্নান, আহার স্বাভাবিক অবস্থার মতই করিতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

চাঁদসীর চিকিৎসা।

বন্ধন প্রণালী।

বন্ধন অস্ত্র-চিকিৎসার বিশেষ অঙ্গ। উপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ না হইলে ক্ষত আরাম হইবে না অথবা হইলেও দীর্ঘ সময় লাগিবে। স্থান-বিশেষে বন্ধনের প্রকার ভেদ আছে। এ বিষয় বিস্তারিত শুশ্রুত ও অপরাপর শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই এইস্থলে সে বিষয় বর্ণন করা হইল না। বন্ধন দুইপ্রকার। শুষ্ক ও আর্দ্র।

শুষ্কবন্ধন—আগন্তুক ক্ষতে, বা কোন হীন অঙ্গ পূরণ মানসে একস্থানের চামড়া বা মাংস অপর স্থলে সংযোগ করিতে হইলে বা ক্ষতের পূঁজ ক্লেদ দূর হইয়া শুষ্ক আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় শুষ্ক বন্ধন আবশ্যক। অন্যত্র এই-প্রকার বন্ধনে বিপরীত ফল দর্শে। শুষ্ক বন্ধনে যদি ক্ষতে পূঁজ ক্লেদ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে বিপরীত ফল হয়। বন্ধনের মধ্যে পূঁজ জমিয়া শুষ্ক মাংস অঙ্কুর ধ্বংস করিয়া খোনাইয়া যায়। সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষে এই বন্ধন সম্ভব হয় নচেৎ যাহাদের শারিরীক কোষ সকল ব্যাধির বিষে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেই সব স্থলে আর্দ্র ব্যাণ্ডেজই উপকারী। শুষ্ক বন্ধনে একমাত্র "গোল" ঔষধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোল ঘসিয়া ক্ষত উপর ন্যাকড়ায় মাখিয়া অথবা সুধু প্রলেপ দিয়া পরিষ্কার ধোনা তুলা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। দিবসে মাত্র একবার এই প্রকার ব্যাণ্ডেজ করিতে হইবে। শুষ্ক ব্যাণ্ডেজ যত কম পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ক্ষত রোগের চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ উপায়। বিশেষতঃ শুষ্ক ব্যাণ্ডেজ অপরিষ্কার থাকিলে বিপরীত ফল দর্শে। ব্যাণ্ডেজের পূর্ব্বে পচন নিবারক ঔষধ দ্বারা অথবা কষায় জল দ্বারা ক্ষত ও ক্ষতের চারি-দিকে, যতদূর ব্যাণ্ডেজের মধ্যে বদ্ধ থাকিবে, তত দূর উত্তম করিয়া ধুইয়া পুছিয়া, পরিষ্কার করিয়া বন্ধন করিতে হইবে। ক্ষতের এই প্রকার বিশুদ্ধতা সর্ব্বত্র রক্ষা সম্ভবপর নহে; কাজেই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এইপ্রকার বন্ধন একপ্রকার পরিত্যাগই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিয়া যদি শুষ্ক বন্ধন করা যায়, তবে একমাত্র বন্ধন দ্বারাই অনেক ক্ষত আরাম হইতে পারে। শুষ্ক বন্ধনে বন্ধন পরিবর্ত্তন করিলেই ন্যাকরা তুলা ইত্যাদি বন্ধনের তাবৎ উপকরণ পরি-বর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বদিনের তুলা অথবা ব্যাণ্ডেজ আদি ব্যবহার করিলে শুষ্ক

বন্ধনের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে না। কাজেই ফল ও আশা প্রদ হইবে না। বর্ষা অপেক্ষা শীত ঋতুতেই এই বন্ধন কার্য্যকারী হয়।

আর্দ্র বন্ধন—এই বন্ধনও শুষ্ক বন্ধনেরই অনুরূপ ভাবে প্রভেদ এই যে, ঔষধের ন্যাকড়ার উপর একখণ্ড কলাপাতা অথবা পানদ্বারা ক্ষত আবৃত করিয়া দিতে হয় এবং তুলার পরিবর্ত্তে ন্যাকরার গদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীত গ্রীষ্ম সকল সময়ে সকল অব-স্থায়ই ইহা সমান কার্য্যকরী; অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত যথোপযুক্ত বন্ধন হইলে উভয় বন্ধনের ফলই একপ্রকার হইয়া থাকে। অধিকন্তু বন্ধন প্রণালী মতন না হইয়া যদৃচ্ছা বন্ধন, করিলেও ফল যে প্রকারই হউক কিন্তু কোন অপকারের আশঙ্কা থাকে না। শুষ্ক বন্ধন অভিজ্ঞ লোক ব্যতীত অসম্ভব। কিন্তু আর্দ্র বন্ধন রোগী বা রোগীর আত্মীয়স্বজন যে কেহই করিলেও ক্ষতি নাই। ড্রেসিং ফি অথবা কটন বেণ্ডেজের মূল্য হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। উহার সংস্থানে অসমর্থ বাঙ্গালীর ইহা বড় কম সুবিধার বিষয় নহে।

জলপটী—তুলা অথবা ন্যাকড়ার গদি জলে ভিজাইয়া ক্ষতোপরি দিয়া বন্ধন করিয়া রাখা এবং সেই পটী পুনঃ পুনঃ জল দিয়া ভিজাইয়া রাখার নাম জলপটী। অস্ত্র ক্রিয়ার পর একদিন ইহা অবশ্যই ব্যবহার্য্য। জল-পটী ক্ষত চিকিৎসার একটী ভাল উপায়। একমাত্র জলপটী দ্বারাই সকল ক্ষত চিকিৎসা হইতে পারে। এই প্রকার করিতে হইলে পরিষ্কার ধোনা তুলার গদি জলে ভিজাইয়া ক্ষত উপর লাগাইয়া বেণ্ডেজ করিয়া রাখিতে হয়। এবং বেণ্ডেজ না ভিজাইয়া বেণ্ডেজটী খুলিয়া, তুলার গদিকে দিবসে ৩।৪ বার বা ততোধিক বার ভিজাইয়া দিতে হয়। বেণ্ডেজ সুদ্ধ ভিজাইলে অনেক সময় একটি দুর্গন্ধ হয়, তাহাতে ক্ষতে বিপরীত ফল ফলে। ক্ষতের অবস্থা অনুসারে কাঁচা যলম, গোল ইত্যাদি ঔষধ দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জলপটী ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। তবে সর্ব্বদা বেণ্ডেজ খোলা এবং তুলার গদি ভিজাইয়া দেওয়া অসুবিধাজনক বলিয়া এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র করা সম্ভব নহে বলিয়া সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় না। অনেক স্থলে, ঔষধ প্রলেপ আদি হার মানিয়া যায়, সেইস্থলে জলপটী বিশেষ উপকারক।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়—বেণ্ডেজ মুক্ত রাখা আবশ্যক, শক্ত হইলে রক্তের উপযুক্ত সর-বরাহ হইতে পারে না, কাজেই ক্ষত পুরিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়। অথবা সজোর বেণ্ডেজের জন্য রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গেলে ক্ষত পচন আরম্ভ হইতে পারে। বিশেষতঃ নিরক্ত রোগীর বা রোগের সান্নিপাতিক আক্রমণে রক্ত চলাচল বন্ধ হইলে ক্ষত প্রায়ই পচনে পরিণত হয়। অপর পক্ষে বন্ধন [illegible] হইলে, রসাধিক্য বশতঃ ক্ষতে জলীয় [illegible] উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক বন্ধনেই তুলা অথবা ন্যাকড়ার গদি দিতে হইবে।

তবে যে স্থলে বাতের প্রকোপ অথবা শৌতাধিক্য আছে, সেইস্থলেই মাত্র তুলার গদি ব্যবহার্য্য—নচেৎ সর্ব্বত্রই ন্যাকড়ার গদি কার্য্যকারী। বিশেষতঃ নিম্ন গতি পূঁজ অথবা খোলানো চামড়া বা মাংস থাকিলে ন্যাকড়ার গদি অবশ্যই [illegible] হইবে।

ক্ষত ধৌত করিবার মানসে পিচ্‌কারি ব্যবহার করিবে না, একান্ত যদি করিতে হয়, তবে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পিচ্‌-কারীর জলের বেগে ক্ষতে উত্তেজনা না হয়, অথবা মাংস অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া রক্ত বাহির না হয়।

DAMAGED.

ঔষধ প্রয়োগকালেও সলাকার খোচা লাগিয়া ক্ষতে কোন প্রকার উত্তেজনা না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মোটের উপর বেণ্ডেজকালে রোগী কোনপ্রকার যন্ত্রণা না পায় তাহাই করিতে হইবে। শুষ্ক বন্ধনের ঔষধের ন্যাকড় পূর্ব্বে জল দ্বারা উত্তমরূপ ভিজাইয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ উক্ত ন্যাকড়া তুলিবার কালে ক্ষত হইতে রক্ত স্রাব হইবে। এইপ্রকার রক্তস্রাব প্রকৃতই দোষনীয়। ঔষধ দোভাজ ন্যাকড়ায় মাখিয়া মাত্র ক্ষতের উপর দিয়া রাখিতে হইবে। কখনও মধ্যে পূরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে পূঁজ রস সম্যক নিঃসৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষত বা নালী যদি কিছু দীর্ঘ সময়ে রক্ষা করা দরকার হয় তবেই ঔষধের ন্যাকড়া নালী বা ক্ষতে শক্ত করি। পূরিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নচেৎ ঐ ভাবে ঔষধ দিলে বিপরীত ফল দর্শিবে। পূঁজের পরিমাণের অনুপাত অনুসারে বেণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পূঁজের পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে ২।৩ বার ব্যাণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করিবে। নচেৎ আরোগ্যোন্মুখ শুষ্ক ক্ষতে একবারই ব্যাণ্ডেজ করিবে। শুষ্ক ব্যাণ্ডেজ ২।৩ দিন ও রাখিতে পারা যায়। (বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

ভ্রমর।

আমি এসেছি আমারে ঢাকিতে,
সোহাগ পরাণ মাখিতে।
আজিকে তোমার ফুটিয়াছে ফুল,
সৌরভে মোর পরাণ আকুল,
তাই আসিয়াছি ফুটাইতে হুল,
তোমার কমল কলিতে;
এতদিন বড় সয়েছি যাতনা,
সকাল সন্ধ্যা কত আনাগোনা,
কিছুতে তোমার ঘুমটি ভাঙেনা,
পারিনি [illegible],
কত যে ছন্দে গাহিয়াছি গাথা,
নেড়ে নেড়ে দিছি তব নব পাতা,
কিছুতে পারিনি ফোটাতে;
আপন গরবে ছিলে গরবিনী,
এমন তো আর কোথাও দেখিনি,
কত মধু আছে না জানি—না জানি
তোমার কাঁটার বোঁটাতে।
আমি গো পিয়াসী দাও দাও মোরে,
ঢেকে লও তব পাঁপড়ীর আড়ে,
তোমার পরাগ সোহাগের ভরে
মেখে দাও মম তনুতে;
যা কিছু আমার—তুমি লও সব,
চুপ হোক্ মোর গুণ গুণ রব,
করে দাও মোরে নিথর নীরব
তোমার রেণুর অণুতে।

—দরবেশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পূর্ব্বতন প্যাটেল বিলের শিক্ষা।

প্রবন্ধারম্ভেই বক্তব্য, আমরা প্যাটেল বিলের সপক্ষেও ছিলাম না, বিপক্ষেও নহি। আমরা আন্তরিকতার পক্ষে। প্যাটেলবিলের ভাব যদি কতকগুলা সুবিধাবাদীর আপাত-মনোরম বিষয় হয়,মৌখিক বক্তার আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে এহ বিল পাশ হইলেও মাকালফল মাত্র হইয়া থাকিত, তাহাতে আমাদের অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

আমরা সভা সমিতিতে যোগ দিয়া যতটা বুঝিয়া ছিলাম, তাহাতে ইহাই বোধ হয় যে, কোন দলই তেমন প্রাণ হইতে, ব্যথার সহিত এই প্যাটেল বিলকে সমর্থন বা বর্জ্জন করেন নাই, কেবল দলাদলি ও গালাগালি করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালীর যাহা চিরন্তন স্বভাব, তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দুরা বলিলেন—হিন্দুধর্ম্ম গেল গেল! ব্রাহ্মরা ভাবিলেন, এইবার একাকার করিবার একটা মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এইবার ভারত উদ্ধারের প্রকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত হইল! আরে মূর্খ, হিন্দুধর্ম্ম কি যায়! গরু খাইয়া যখন হিন্দুধর্ম্ম যাইতেছে না ভরার মেয়ে বিবাহ করিয়া যখন হিন্দুধর্ম্ম যায় নাই, তখন প্যাটেল বিলে হিন্দুধর্ম্ম যাইবে? হিন্দুধর্ম্ম যাইবে না, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ আর একরূপান্তর ধারণ করিবে! চীনেরা টিকি ফেলিয়াছে বলিয়া কি চীনধর্ম্ম ও চীনসমাজ ধরাতল হইতে মুছিয়া গিয়াছে? তেমনি এই ভারতবর্ষ পৈতা ফেলিয়া দিলেও ব্রাহ্মণ মুছিয়া যাইবে না। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ তখন আর এক নবকলেবর ধারণ করিবে। এখন একমাত্র পৈতাই ত তোমার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়, একমাত্র জাতিভেদই ত তোমার হিন্দুত্বের পরিচয়? এমন পৈতা, এমন জাতিভেদ না থাকিলেই কি নয়, যাহার কোন অর্থ নাই! কোথায় সে কৌলিন্যের গুণ, অথচ তুমি কুলীন, দুশ্চরিত্রতায় তুমি জর্জ্জরিভূত, অথচ মোহান্তের আসনে সমাসীন! ভণ্ডামি অথচ গোঁড়ামি কি শোভা পায়? হে হিন্দু, হে ব্রাহ্মণ, এমন অপকর্ষ লাভ আর কোন জাতি করে নাই যেমন তুমি করিয়াছ, তোমার মত মর্কট ত জগতে আর দেখিতে পাই না। এতটা অভাবনীয় পতন আর কোন জাতির ও ঘটে নাই! কেন? তুমি অত্যাচারের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছ। হোক না কেন ব্রাহ্মণ, আর হউক না কেন ইংরাজ, সমর ভারতবর্ষে যিনিই ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে অত্যাচারী হইবেন তিনিই অধঃপতিত হইবেন। এই কর্ম্মভূমিতে ভোগ কখনও সহ্য হয় না—অত্যাচার সহ্য হয় না—সাধক ভিন্ন এই ভূমিতে ভণ্ডের স্থান নাই। যাঁহারা ত্যাগী, যাঁহারা সংযমী যাঁহারা আপনাকে ভুলিয়া অপরকে ভালবাসিতে জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই জন্য এই ভূমি বিধাতৃ রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে! ব্রাহ্মণ এই ভূমির সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সেই ব্রাহ্মণ যখন কুটিল হইল,ঘৃণা করিতে শিখিল, অমনি বিধাতার অভিসম্পাৎ তখনই বর্ষিত হইল; যখনই ব্রাহ্মণ চুরি করিয়া পার পাইয়া

যাইতে লাগিল তাঁহার সাত খুন মাপ হইতে লাগিল, আর শূদ্র শত শত অত্যাচার সহ্য করিয়া ভগবানের দিকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, তখনই ভূভারহারী ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার ন্যায়ের আসন কাঁপিয়া উঠিল। তাহার ফলে, আজ ব্রাহ্মণ কি না দুর্দ্দশার নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছে! ভারতবর্ষকে এমন ভাবে পরাধীন বোধ করি ইংরাজও করিতে পারেন নাই, এমন ভাবে মাথায় পা বুঝি ইংরাজও তুলিয়া দিতে পারে নাই। তুমি অনাচারী, অত্যাচারী ব্যসনাসক্ত, অথচ পৈতার বলে আমার মাথায় পা তুলিয়া দিবার সময় গুরু-ঠাকুর! ভারতবাসীর চক্ষু ক্রমশঃই ফুটিতেছে, বিংশ শতাব্দির অই সর্ব্বতটপ্লাবী-স্বাধীনতা গঙ্গা আসিয়া আমাদিগকে কি এক স্নেহশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। আজ কি তোমার এ অন্যায় আব্দার কেহ সহ্য করিতে পারিবে, আর কি পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে পারিবে? তাই চারিদিক হইতে তোমার অসার বাঁধন খুলিবার পালা চলিয়াছে। তোমার আত্ম-সংশোধনের জন্য ভগবান তোমাকে যথেষ্ট সময় দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাই, তুমি ত কিছুই করিতে পারিলে না; তুমি ভারতবর্ষের আপনার লোক হইয়াও, ভারতবাসীকে পর করিয়া রাখিয়াছ, তোমারই স্বদেশজাত পতিত ভাই গুলিকে তুমি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ। তোমার এমনি জাতিভেদ যে শূদ্রের ছায়া মাড়াইলে তোমাকে এই বিংশ শতাব্দীর দিনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অথচ তুমি বিজেতার জুতার তলায় আপনার মস্তক অবনত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নও! এই ভণ্ডামি আর বড় অধিক দিন এই নিরীহ ভারতের ভায় বুদ্ধি করিতে পারবেনা। পরাধীনতাকে নাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তোমার দর্প দম্ভকে কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। স্বায়ত্বশাসন যদি আরম্ভ হয়, তবে তোমাকে শাসন করিয়াই হইবে! তোমার অভিমানকে যেদিন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কালের কবলে ফেলিয়া দিতে এদেশ সক্ষম হইবে, সেদিন হইতেই এ জাতির নবজীবনের সূচনা। এই নবভাব তোমাকেই সর্ব্বাগ্রে সায়েস্তা, করিতে আসিতেছে—তোমার গুরুগিরি তোমার পৌরহিত্যে বাধা দিতে আসিতেছে। ভারতের শ্রাদ্ধ শান্তি আর তোমাকে তেমন করিয়া করিতে দিবে না। তোমার মন্ত্র তন্ত্রের আবশ্যকতা আর থাকিবে না। এই মহার্ঘের দিনে তোমার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই ভারবহ হইয়া পড়িতেছে; তুমি ধুইয়া মুছিয়া গেলেই যেন আমরা শান্তি পাই।

আবার নবভাবে, নব তেজে ব্রাহ্মণ জাগিয়া উঠুক! ব্রাহ্মণ কি কেবল তুমি? ব্রাহ্মণ যে এই ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রতি পরমাণু—প্রতিপদরেণু! প্রতি সৃষ্টির কণায় কণায় আমি যে ব্রাহ্মণত্বের মহাবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না! এই দেশের মানুষকে ছোট করিতে হইলে, যে আপনারই মাথা হেঁট হয়! অগ্রজন্মা কেবল তুমি নও, এই ভারতবর্ষের কীটানুকীট পর্য্যন্ত অগ্রজন্মা। এই দুর্লভ ভূমিতে যেই জন্মায় সেই সার্থক হইয়া যায়। এই মহা বৃন্দাবনের বানর হইতেও যে সুখ! কত তপস্যা করিলে তবে এই মাটিতে সামান্য কীট হইয়া জন্মাইবার অধিকার পায়—এদেশে জন্মাইবার ও কি একটা গৌরব নাই? মনুষ্য জন্ম ত দূরের কথা. এই কর্ম্মভূমির আঁস্তাকুড়ের

অতি একান্তে জন্মিয়াও যে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার! এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলাম কই, ভাবিতে শিখিলাম কই?

"ভেদের ভিতরে মাগো রেখনা ভারতে আর
একসূত্রে বাঁধ এই জাতির হৃদয় হার
চতুর্ব্বর্ণ এক হয়ে, যাক্ যুগ স্রোতে বয়ে
শুধু শ্যামবর্ণ তোর জাগে যেন অনিবার
যে দিকে ফিরাই আঁখি শ্যামরূপ যেন দেখি
অভেদপ্রতিমা শ্যামা, করে দে মা একাকার॥"

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমি সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিতে ছিলাম, তখন এই ভাবের বহু গান আমার প্রাণ হইতে উত্থিত হইয়া ছিল। ভিতরে বাহিরে অত্যাচার আমরা যত ভোগ করিয়াছি, ভিতরে বাহিরে কপটতা আমরা যত সহ্য করিয়াছি, এমন বোধ হয় কোন জাতিই করে নাই! সমগ্র দেশটার যেখানেই গিয়াছি, আতিথ্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু কেবলি ভেদ, কেবলি ব্যবধান দেখিয়া, ভবিষ্যতের আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া, নিরুপায় হইয়া দেশমাতৃকার শরণাপন্ন হইয়াছি! ডাকার মত ডাকিতে পারিলে দেশ-জননী সাড়া দিয়া থাকেন। মা নীরবে থাকিতে পারিলেন কই? প্যাটেলবিলকে আমি জাতীয়তার সাড়া বলিয়া মনে করি।

"আজ মহাজাতিরূপে দেখাদেও জননি গো
বিরাট সহস্র শীর্ষ পুরুষ হইয়ে জাগো
এস মা জনমভূমি, জননী জননী তুমি
উজলি ঠগো পুনঃ ভারত ভবিষ্য ভাগ্য॥" * *

মা এই দীন সন্তানের কাতরোক্তিতে যে কর্ণপাত করিয়াছেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এই নব্যভারতেই আমি "ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ" ও "মানবোৎকর্ষ বিজ্ঞান" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে প্যাটেল বিলের অনেক সমস্যা বহুপূর্ব্বেই সমাধান করিয়া রাখিয়াছিলাম। সে সব কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবল একটি কথা আমি বলিতে চাই যে, এই জাতীয়তার সাড়ায় আমরা যে সাড়া দিতেছি তাহা কি আন্তরিক? বাস্তবিকই কি আমরা মায়ের ডাক—বিরাট জাতীয়তার আহ্বান উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি—ইহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধা আমাদিগের কতটুকু? না কেবলি মৌখিকতা লইয়া আজ আমরা উপস্থিত, ইহাই বিবেচ্য! যাঁহারা প্যাটেল-বিলের সপক্ষে ঢক্কানিনাদ করিয়াছেন, বাস্তবিকই কি তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন না সাময়িক উত্তেজনায় বশে কেবল বক্তৃতার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। তবে সুখের বিষয়, এ কেবল বাঙ্গালীর ব্যাপার নয়, সমগ্র ভারতবাসীর ব্যাপার। তাহা না হইলে কেবল বাঙ্গালীর নিকট সেই সুফলের আশা করা বৃথা।

প্যাটেলবিলের গুরুতর দিকটা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? এই বিল কেবল কতক গুলা সুবিধাবাদীর আত্ম তৃপ্তিতে পর্য্যবসিত হইলে ইহার দ্বারা ভারতবাসীর অকল্যাণ ও নৈতিক অবনতি ঘটিবে। কিন্তু তাহা না হইয়া ইহা যদি ত্যাগ স্বীকার ও জাতীয়তা গঠনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ হয়, তবেই মঙ্গল ও ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ।

যাঁহারা প্যাটেলবিলের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন তাহারা কার্য্যতঃ কিন্তু প্যাটেলবিল হইতে সরিয়া পড়িয়া থাকেন। উদারভাবাপন্ন হইয়ও নিজের বেলায় জাতিভেদের পাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছেন, ব্রাহ্ম হইয়াও কন্যার বিবাহকালে ব্রাহ্মণপাত্র খুঁজিতেছেন। বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করিতে

ইতস্ততঃ করিতেছেন। বলিয়াছি ত প্যাটেল-বিলের সুবিধাবাদ আনিয়া ফেলিলে,ভারতের বিরাট জাতীয়তা পণ্ড হইয়া যাইবে। এই বিলের ভাবকে সার্থক করিতে হইলে যথার্থ ত্যাগীর প্রয়োজন। যে দিক দিয়াই যাও, যে অনুষ্ঠানই গ্রহণ কর,ত্যাগ ভিন্ন কল্যাণ নাই। সর্ব্ব কার্য্যের মূলে এই ত্যাগ।

এই ত্যাগ—এই পরকে, অবনতকে তুলিয়া ধরিবার জন্য উন্নতের আত্মদান পূরা ভারতে,পূর্ণ মাত্রায় ছিল বলিয়াই, ভারত শীর্ষ স্থানে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল! পরাশর কেন সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জমদগ্ন্য কেন রেণুকার গর্ভে পরশুরামকে জন্ম দিয়াছিলেন, ভীষ্ম কেন রাজ্য ছাড়িয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কেন বাশিষ্ঠ অক্ষমালাকে বরণ করিয়াছিলেন? ইহার মূলে ছিল কেবল শুভ উদ্দেশ্য। পুরাকালে মন্দকে তুলিয়া ধরিবার জন্য ভালকে আত্মত্যাগ করিতে হইত। আজ যদি আমরা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নাচ জাতির ভিতর অর্থের লোভে, রূপের মোহে বিবাহ করিতে যাই তবে এই জাতীয়তার অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই পণ্ড হইবে। আর যদি ধর্ম্ম ভাবিয়া, কর্ত্তব্য ভাবিয়া—ভগবানের বিরাট উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বোপরি মহা জাতীয়তাকে স্মরণ করিয়া, জাতি ভেদের মূলে কুঠার আঘাত করিতে অসবর্ণ বিবাহ করি,তাহার ফল নিশ্চয়ই শুভ হইবে।

আমি এই প্রবন্ধে কোনরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিতে চাহি না। আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্র এক মহাসাগর বিশেষ! এমন তট নাই, এমন বিষয় নাই যাহা এই সাগর প্লাবিত করে নাই, আশ্রয় দেয় নাই, সমর্থন করে নাই, স্পর্শ করে নাই। কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিলে সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলকেই হার মানিতে হইবে। তাহা ছাড়িয়া বরং আমি দেশকালপাত্র লইয়া এই আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের আবশ্যকতা আছে কিনা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে আমাদিগের বর্ত্তমান লক্ষ্য কি? ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে আমরা কিরূপ উপাদানে গঠিত করিতে চাই? এতকাল কিসের জন্য তোমরা সাধনা করিয়া আসিতেছ? যদি বাস্তবিকই তোমাদের বিন্দুমাত্রও আন্তরিকতা থাকিত,তাহা হইলে আজ এই বৃথা কলহে ও কোলাহলে সময় ক্ষেপন করিতে পারিতে না। তোমাদিগের ব্যবহারে চিন্তাশীল মাত্রেই নীরব এবং নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন। আরও গুঁতা, আর জুতা না হইলে ত তোমাদিগের জাতীয় মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না? আরও নিষ্পেষণ আরও নির্য্যাতন ব্যতীত তোমাদের গোঁড়ামি ও ততোধিক ভণ্ডামি ত যাইবার নহে! একদিকে বিধাতার চাপ, অন্যদিকে বিজাতির চাপ যদি তোমাদিগের কোন কালে চৈতন্য সঞ্চার করিতে পারে। বাহির হইতে তাড়া না পড়িলে, ভিতর হইতে তোমরা সাড়া দিবার জাতি নহ, কারণ,পরাধীনতা যে তোমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে!

সমগ্র ভারতবাসীকে একতার হারে গ্রথিত করিতে হইবে ;সমগ্র ভারতবাসীকে ব্রাহ্মণ করিতে হইবে—সমগ্র ভারতবাসিকে একটা সুমহান্ গৌরবে এবং গর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আজ আভিজাত্য কেবল তোমার একচেটিয়া অধিকার নহে। আজ আভিজাত্য সকলকার, সকলকেই আজ ব্রাহ্মণত্বে বরিত করিতে হইবে। আজ আর কেহ ঘৃণ্য, কেহ ছোট নহে। আজ সকলেই আমরা বিরাট

জাতীয়তা স্বরূপিনী মহীয়সী, গরীয়সী জননী-জন্মভূমির সন্তান! এই গৌরবে বুক না ফুলাইলে কি কোন দিনও আমরা উঠিতে পারিব? হে নিদ্রিত, হে অসাড়, উঠ জাগ, আবার অগ্রসর হও,আবার জগতকে দেখাও তুমি মর নাই,শুধু ঘুমাইয়াছিলে—নব সৃষ্টির জন্য তপস্যায় নিমগ্ন ছিলে! জগৎ আজ তোমারই মহা উদ্বোধনের অপেক্ষা করিতেছে! হে ভস্মাচ্ছাদিত বৈশ্বানর, এই মহাদুর্দ্দিনেও তোমার এক একটি স্ফুলিঙ্গ যে দিকে গিয়া পড়িয়াছে, সেই দিকেই জগৎ আলোকিত হইয়াছে; বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

প্রতিভার অন্বেষণ এবং পতিতের উত্তোলন, আজ এই কর্ম্মদ্বয়কে আমাদিগের প্রত্যেকের মহা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই মহা দায়িত্ব ভারগ্রহণের জন্য আজ আমরা সকলেই কি প্রস্তুত? যিনি এই দুইটা বিষয় বাদ দিয়া দেশহিতৈষী সাজিতে যান, তিনি ভণ্ড! প্রতিভাকে চাপা দিয়া এবং পতিতকে পশ্চাতে ফেলিয়া, যিনি জাতীয়তার স্বপ্ন দেখেন, তিনি দেশকে বঞ্চিত করিতেছেন মাত্র! ভারতবাসির প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য যদি এই দুইটা বিষয় না হয়, তবে ভবিষ্য ভারতের উত্থান সুদূর পরাহত। আজ বড়কে ছোট হইয়া ছোটকে বড় করিতে হইবে—এই আত্মত্যাগ দেখাইতে না পারিলে ভারতবাসির কল্যাণ নাই।

এই জন্যই বুঝি পুরাভারতের দশম প্রজাপতি যযাতি, শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর অপেক্ষা কম ভাল বাসিতেন না—এবং এই জন্যই বুঝি যদু অপেক্ষা পুরু যযাতির অধিকতর স্নেহের পাত্র হইয়াছিল! ছোটকে বড় করিবার জন্য, বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্য দিবার জন্য ভীষ্মের ভিখারী সাজিবার কি আগ্রহ—কি আত্মদান! এক সময়ে ত্যাগই ভারতবাসীর ভূষণ ছিল, অপমানই ব্রাহ্মণের ভূষণ ছিল—আর এখন অভিমান ও অহঙ্কারই এজাতির ভূষণ হইয়াছে। কই অসবর্ণবিবাহের ফল বলিয়া পুরু, বিচিত্রবীর্য্য প্রভৃতি ত পতিত হন নাই? বেদব্যাস, পরশুরাম প্রভৃতি গুণহীন এবং মানুষের বিচারেও ত ক্ষীণ হন নাই!

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিল—কোন বংশানুক্রমের বলে? প্রহ্লাদ যখন গর্ভাবস্থায় ছিল,তখন নারদ হরি-কথা শুনাইতেন। তাহাতে প্রতিবেশ প্রভাবেরই জয় ঘোষিত হইতেছে, বংশানুক্রমের নহে। ভাল বাপ মায়ের মন্দ ছেলে হয় কেন? খারাপ বাপমার ভাল ছেলেই বা জন্মায় কেন? এই সমস্যার কোন দিনও সমাধান করিতে পারি নাই—এই প্রশ্নটা আমাকে চিরদিনই ব্যথিত করিয়া আসিয়াছে। মনুষ্য জন্মের একটা উদ্দেশ্য আছে। মনুষ্য জন্ম ত গরু ঘোড়ার উৎপাদনের ব্যাপার নহে, এই জন্মে দৈহিক-প্রভাব অপেক্ষা মানসিক প্রভাব অগ্রে। মন লইয়াই মানুষ, মানুষ মনে জন্মায়! মনেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। মানুষ এক জীবনেই বহুবার জন্মায় একই জীবনে যতগুলি সংসর্গ আমরা লাভ করি, ততবার জন্মাই। আজ যাহা আছি, কাল তাহা নাই। আমরা একই জীবনে মরি ও অনেক বার, জন্মাইও অনেকবার। এইরূপ জনম মরণের ঘাত প্রতিঘাতে অতি বৃদ্ধ মানব শিশু জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া পরিবর্দ্ধিত। এই গভীর কথা যদি আমরা তলাইয়া ভাবিতাম, তাহা হইলে এমন মহাদেশে জন্মাইবার

সৌভাগ্য পাইয়াও আমরা এইরূপ উত্থান শক্তিহীন ও পরমুখাপেক্ষী কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিব কেন?

আমাদিগের যদি সত্য সত্যই দেশের জন্য প্রাণ কাঁদিত, তাহা হইলে প্যাটেল-বিল লইয়া বিজাতির দ্বারে "পাশ করগো" বলিয়া হত্যা দিতে হইত কেন? আমরা নিজেরাই কবে ইহার বিরাট উপকার উপলব্ধি করিয়া বিরাট জাতীয়তার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতাম। প্যাটেলবিল পাশ হইলেই যে উদ্দেশ্য সফল হইত, ভারত উদ্ধার হইত, এ বিশ্বাস আমার নাই। আজ অর্দ্ধ শতাব্দির উপর হইতে চলিল বিধবা বিবাহ বিল পাশ হইয়াছে, অথচ বেশ্যার দল গুহু করিয়া বাড়িতেছে কেন? বিধবা বিবাহ কেবল নামমাত্র আছে, কাজে কিছুই হইতেছে না। তেমনি এই প্যাটেল বিলে যদি পতিতকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা না থাকে, ত্যাগ স্বীকার না থাকে এই প্রকার বিল পাশ হইলেও ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে অবস্থান করিবে। আজ ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দ, মহাকবি হেমচন্দ্র যদি জীবিত থাকিতেন, তাঁহারা প্যাটেলবিলকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তোমাদিগের বাঙ্গালীত্ব ও হিন্দুত্ব বিবেকানন্দ ও হেমচন্দ্রকে লইয়া যতটা, ততটা ভাটপাড়ার মাঠাকরুণাশরোমণি-দিগকে লইয়া নহে। আমরা বিবেকানন্দ হেম চন্দ্রকে যেভাবে মস্তকে রাখি ততটা শিরোমণি মহাশয় সকলে নহে। কেন এমন হয়? কেন শিরোমণিগণ আর হিন্দু বাঙ্গালীর মস্তকে স্থান পান না? তাহার প্রথম কারণ, হিন্দুর চক্ষু ক্রমশঃই প্রসারিত হইতেছে আর গুরুগিরি করিয়া দমবাজীতে শিষ্যকে রাজী করিতে পারিবে না। আর প্রতারণা করিয়া প্রকৃত হিন্দু মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে পারিবে না। তুমি বিধান মানিয়া চল না, অথচ বিধান দিতে ওস্তাদ! তুমি বেশ্যার কর্ণে মন্ত্র দিয়া সমাজে আসন পাও, যবণীর চুম্বন গ্রহণ করিয়াও তোমার জাতি যায় না, পংক্তি ভোজনে স্থান পাও, তাহাতে সমাজ, ধর্ম্ম তোমার টলে না, আর যত পাপ, যত স্পর্শ দোষ নিরীহ শূদ্রের বেলায়। আজীবনকাল বেশ্যালয়ে অতিবাহিত করিয়া যখন তোমার জাতি যায় না, ধর্ম্ম ঠিক থাকে, তখন অসবর্ণ বিবাহে জাতি যাইবে, ধর্ম্মই বা যাইবে কেন? তোমার জাতি আছে কি যে, জাতি যাইবে? আবার নূতন করিয়া জাতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে প্রতিষ্ঠার বনীয়াদ—মহা সমন্বয়ের উপর—অভেদ ভারতের বিরাট সংহতি শক্তির উপর। আবার বাছাই করিতে হইবে। এখন কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, চেহারা দেখিলে ধরা যায় কি? ব্যবহারেও ধরা যায় না। এখন বর্ণসঙ্কর সকলেই। জন্মাতে ভাবের ঘরে চুরি চলে, পৈতা পরিলেই এখনও এদেশে পদধূলি গ্রহণ করে, কিন্তু কর্ম্মে যে ধরা পড়িয়া যাও—কর্ম্মে যে পদে পদে তুমি পতিত হইতেছ, কর্ম্মে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমাকে চেনা যায় না। কর্ম্মে তুমি বর্ণসঙ্কর। আমরা গুণ এবং কর্ম্মের পক্ষপাতী, ভারতবর্ষকে আবার নূতন করিয়া গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিতে হইবে। তাহাতে শূদ্রের ভিতরে যাহারা উন্নত তাহাদিগকে তুলিয়া ধরিতে হইবে, ব্রাহ্মণের ভিতরে যাহারা অবনত হইয়া পার পাইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে নামাইয়া দিতে হইবে। শূদ্র যদি বাস্তবিকই উন্নত চরিত্রের হয়, তাহার কন্যা বা পুত্রকে ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণ করিয়া লইতে দোষ কি? ইহাতে অনুলোম প্রতিলোম নাই। শিক্ষা এবং সচ্চরিত্র অনুলোম প্রতিলোমকে এক করিয়া-দেয়।

আমরা ব্রাহ্মণ শূদ্র বুঝিনা, আমরা চাই ভিতরের গুণ, ভিতরের বিকাশ, আমরা চাই আত্মার সৌন্দর্য্য—অন্তরের পবিত্রতা। যিনি প্রকৃত গুণে গুণবান্ তিনিই আমাদিগের পূজ্য। কাহাকে নিন্দা করি, কাহাকেই বা বন্দনা করি—নারায়ণ যে সর্ব্বত্র। ইচ্ছা করিলে তিনি চণ্ডাল বংশেও জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। কেমন করিয়া জোলার বংশে মহাভাবুকের সৃষ্টি হয়, পরমহংসদেব কতই বা পণ্ডিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন—বিদ্যা বুদ্ধি তাঁহার কি ছিল, কতই বা জাতিভেদ মানিতেন, কিন্তু অমনটি আর দেখাও দেখি। সাধনার বলে যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই ব্রাহ্মণ। তাহা না হইয়া কেবল মুখস-পরা, খোলস-ধরা ব্রাহ্মণ হইয়া আর চক্ষুষ্মান ভারতবাসীকে ভুলাইতে পারিবে না। সম্পর্ক গুণে গুণে, সম্পর্ক সমানে সমানে! ব্রাহ্মণ শূদ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য ত সকলের শরীরেই রহিয়াছে। ঘৃণা করিবে কাহাকে —আপনার হস্তপদকে কি ঘৃণা করিতে পারি। আমিই যে সর্ব্বগুণাধার! সকলকে লইয়াই যে আমার জীবন-যাত্রা। সত্ত্ব-তম রজ গুণের কোনটাই যে আমার উপেক্ষার সামগ্রী নহে। তম ও রজ যে সত্ত্বেরই আশ্রয়। সেই আশ্রয়-রক্ষার আমরা কি কোন চিন্তা করিতেছি? হায়, যে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া আজ মাথা বাঁচাইয়া রাখিয়াছি সেই আশ্রয়েই আমরা পদাঘাত করিয়া আনন্দ অনুভব করি। যদি নিজে উন্নত হইতে চাও আপনাকে উন্নত কর ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের ত্যাগ স্বীকারের উপরেই জাতীয় উত্থান। বুদ্ধিদাতা এবং ধনদাতার স্বার্থপরতাই জগতের দুঃখের হেতু। কেন ইউরোপ আজ ছিন্নমস্তা, কেন ভারতবাসী আজ হীন হইতে ও হীন? তাহার কারণ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য—Minister এবং Capitalist দিগের হৃদয়হীন স্বার্থপরতা। আজ জগতের সর্ব্বত্রই শ্রম এবং আশ্রয় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহারা ও ত মানুষ—জীবন্ত মানুষ-জড় পিণ্ড নহে। তাহারা আজ বুদ্ধি ও ধনকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য ভীম ভৈরব রবে অগ্রসর। এমন কি চিরপরাধীন ভারতবর্ষ ও আজ সেই মন্ত্রে অগ্রসর। অতি আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড়েরও চেতনা হয়—নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ ও জাগিয়া উঠে।

আজ সেই দিন; সেই কাল। যখন—

কালের বিধানে গেছে ব্যবধান
কেবা কার প্রভু কেইবা দাস,
বিশ্বের কাজে সবে এক সাজে
মিলিয়াছে ভাই ভাইয়ের পাশ;
আজ ধনীর শীর্ষ উন্নত ভূমে
অভিজাত যত পদতল চুমে
বঞ্চিত যারা ছিল চির-ঘুমে
জাগিছে লইয়া নূতন আশ।
ঘরে ঘরে আজ কর্ম্মীর জয়
বিলাসীর দিন আর কভু নয়
পতিত যাহারা উঠিছে তাহারা
প্রভুর দর্প করিতে নাশ
আজ জাগিছে কর্ম্মী, সমান ধর্ম্মী
নহে কেহ প্রভু না হবে দাস।
শ্বেত ও কৃষ্ণ নাহি রবে ভেদ
শূদ্র ব্রাহ্মণ ঘুচে যাবে খেদ
সমান বর্ণ সমান ধর্ম্ম
সমান কর্ম্ম সমান বাস।

BLEED THROUGH.

আজ—

প্রবল যাহারা লভিছে তাহারা
জনগণ পদে মরণ ত্রাস।

এই সঙ্গীত শুধু আমার মতন অকিঞ্চনজনের কণ্ঠ হইতেই উত্থিত নহে—ইহাই নবযুগের নব জগতের নব অভিপ্রেরণা!

জাগ শ্রমী, জাগ শিল্পী, জাগ এই মহা জীবন সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হইয়া জাগ—তোমাদিগের নীরব ক্রন্দনে বিধাতার আসন টলিয়াছে—দর্পদম্ভের অভিনয়ের শেষাঙ্কে আমরা আজ উপনীত! দেখ দর্শক দেখ, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখ, আজ তোমাদিগেরই জন্য জীবন কি নবভাবে জাগ্রত! কি নব আশায় উন্মাদিত,আজ দর্পদম্ভী মানুষ বুঝিয়াছে—Man is a name of honour for a king. যাহা স্বপ্ন, তাহা বিধাতার নির্ম্মম কশাঘাতে, জীবন-মরণের মহা অগ্নি পরীক্ষায় সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে! প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় ভয়ঙ্কর। বিধাতার রক্তচক্ষু ব্যতীত, এই মহা সমন্বয়ের আর উপায় ছিল না—স্বার্থপর মানুষ কি অল্পে ছাড়ে, দেখিয়া সংশোধিত হয়, চাপে না পড়িলে? হিন্দু যে যায়। এই বিরাট জাতিটা যে কত রকমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে, হিন্দুতে হিন্দুতে কত বিরোধ—কত দ্বেষ-হিংসা—তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই আশা ভরসা ছাড়িয়া দিতে হয়। সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া কোথায়ও ত একতা খুঁজিয়া পাইলাম না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি প্যাটেলবিলের গূঢ় মর্ম্ম হেমচন্দ্রের সেই মহা স্বপ্নকে সফল করিবার প্রধান উপায় স্বরূপ হউক।

একবার সবে জাতিভেদ ভুলে
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা!

কবির এই স্বপ্ন ভারতবাসী অসবর্ণ বিবাহে সার্থক করিয়া দিক্। কোনদিন শুধু আইন পাস হইলে, সে স্বপ্ন কতটুকু সার্থক হইবে বলিতে পারি না—এই বিবাহে সমগ্র ভারতবাসির যদি একাগ্র প্রাণ ও সহানুভূতি না থাকে। প্রতিভার অন্বেষণ ও পতিতের উত্তোলনের জন্য, সর্ব্বোপরি জাতীয়তা স্বরূপিণী জননী জন্মভূমির মহা একতা সাধনের জন্য হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দু ও মুসলমানে আজ অগ্রসর হও, এবং এক অখণ্ড পরিবারে গঠিত হও। প্যাটেলবিলের মর্ম্ম চিরন্তন হউক, সার্থক হউক!

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত ও তাঁহার তেমনই বহু যত্ন ছিল। বরমায় আমার জননী বিনোদিনী দেবীর স্মৃতিমন্দির, বরমা উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, টাউনে আমার মাতামহ ডাক্তার খাস্তগির মহাশয় যিনি চট্টগ্রামে সর্ব্ব প্রথমে স্ত্রীজনের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যিনি আমার মাসীমা স্বর্গীয়া কুমুদিনীদেবীকে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নীতা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে অলঙ্কৃতা করিয়া শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম আসনে আসীন করিয়া বঙ্গদেশকে বিশেষ ভাবে চট্টগ্রামকে, চট্টগ্রামের নারীসমাজকে আনন্দ ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহারই প্রতি আমার বাবার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, ডাক্তার খাস্তগির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,নরনারী নির্ব্বিশেষে শিক্ষা প্রচারে বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সময় সময় তাঁহার মুখে এমনও শুনা যাইত যে চট্টগ্রামের একটী কলেজ এদেশের বালকগণের শিক্ষাদানের স্থানের সংকুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, আর একটী কলেজ হইলে ভাল হইত, মনে হয় তাঁহার প্রাণে এই আকাঙ্খা টুকুও ছিল।

অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি কি রাজনীতি সকল বিষয়ের মধ্যেই তিনি গভীর অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বীয় ব্যবসায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার দিনে চট্টগ্রামের দেশনায়ক রূপে তিনি এদেশকে যেমন নিরাপদ রাখিতে পারিয়াছেন ও রাজশক্তির সম্মান অটুট রাখিতে ও সম্মান দিতে পারিয়াছেন, অন্যত্র তেমন নয়। ময়মনসিংহ কনফারেন্সে সভাপতি রূপে ও বিগত বরিশাল বিপ্লবে তিনি যেরূপ সৎসাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গদেশবাসীগণের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় বটে।

ঢাকায় পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মকনফারেন্সে সভাপতিরূপে তাঁহার ধর্ম্মনীতিজ্ঞতার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহে তিনি সভাপতি ও মেম্বর ছিলেন (১) চট্টগ্রাম এসোসিয়েসন্ (২) চট্টগ্রাম হিতসাধন মণ্ডলী (৩) উকিল বার্ এসোসিয়েসন্ (৪) সেণ্টাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক (৫) চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ (৬) সেনা সংঘটন সমিতি (৭) যাত্রামোহন ইন্‌সটি-টিউসন্ (৮) কার্পাস সমিতি (৯) বরমা ব্রাহ্মসমাজ (১০) বরমা হিতসাধনমণ্ডলী (১১) বরমা চেরিটেবল্ ডিসপেনসরি (১২) বরমা ব্রাহ্মিমেনকা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়(১৩)বরমা বিনোদিনীবালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি এবং চট্টগ্রাম কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্য ও ডিসট্রিক্টবোর্ডের শিক্ষা বিভাগের মেম্বার ছিলেন। এইরূপে আমার বাবা নানা গুণে বিভূষিত হইয়াও নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি দেশের নেতা ছিলেন, রাজদরবারে উচ্চ ব্যবসায়ী ছিলেন লাট কাউন্‌সিলের সদস্যরূপে উচ্চ রাজসম্মানলাভ করিয়াছিলেন।

তথাপি তাহার জন্য তিনি নিজে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই ভাব প্রকাশ করিতেন না, বরং ছোট বড় সকলের সঙ্গে সতত সমাদরে সসম্মান আচরণ করিতেন। নিজের সামান্য

দোষ ত্রুটীর জন্য কত দৈন্য প্রকাশ করিতেন এবং কাতরপ্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। এবং ক্ষমা করিতে ও তিনি খুব পারিতেন; অপরাধীর প্রতি তাঁহার ক্ষমার পরিমাণ ছিল না, সাধারণতঃ লোক ইহা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত।

পতিতকে তিনি ঘৃণা করিতেন না, দয়া করিতেন; পতিতের তিনি বন্ধু ছিলেন; পতিতের প্রাণ রক্ষা করিতে নিজে বিপন্ন হইতেন, পতিতকে সমাজে প্রচলিত করিতে অকাতরে শত নির্য্যাতন সহিয়া লইতেন।

সহিবার ক্ষমতা আমার বাবার খুব বেশী ছিল। বিশেষ বিপদে ও কখন তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখা যায় নাই। একবার জাবিনেতে তাঁহার ৫২০০০ টাকা বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু এইরূপ অর্থ হানিজনক বিশেষ বিপদেও তিনি অনন্য সাধারণ ধীরতা সহকারে আত্ম সম্বরণ করিয়াছিলেন, বরং এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে চট্টগ্রামের বিশেষ অভাব বোধে চট্টগ্রাম 'টাউনহল' প্রতিষ্ঠার জন্য অকুণ্ঠিতে অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতায় আমার ভগ্নি নলিনীর ও অব্যবহিত পরে আমার ভ্রাতা নীরেনের আকস্মিক মৃত্যু হয় এইরূপ গুণবতী কন্যা ও গুনবান পুত্রের মর্ম্মন্তুদ মৃত্যু সংবাদে ও তিনি বিশ্বাস ও ধৈর্য্য বিচ্যুত হন নাই। এই অবস্থায় তিনি প্রকাণ্ড জনসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আমার ভগ্নির স্মৃতি উজ্জ্বল করিবার উপলক্ষে চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে ১০০০ টাকা দান করিয়া নলিনী প্রচার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আমার বাবার অশেষ গুণ ছিল, তাঁহার নিকট গুণের আদর ছিল, গুণীর সম্মান ছিল, মানীগণের মান তিনি প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ছিল, সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। সকল সমাজের যাহা সত্য সৌন্দর্য্য তাহা তাঁহার গ্রহনীয় ছিল। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বলিয়া ইতর বিশেষ ছিল না।

বরমার যুবকগণকে লইয়া আমার বাবা সুহৃদ সমিতি সংস্থাপন ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন ও পূর্ণচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রতধারী কয়েক জন কর্ম্মী যুবকগণকে লইয়া ব্রতধারী সম্প্রদায় গঠন হিতসাধনীসভা বা হিতসাধন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সকল সভাসমিতির দ্বারা লাইব্রেরী সংস্থাপন, দরিদ্রগণের অন্নবস্ত্র কষ্ট দূরীকরণ, বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও সংস্কার দরিদ্রছাত্রগণের শিক্ষাদান কল্পে নৈশ বিদ্যালয় ও দরিদ্র ভাণ্ডার সংস্থাপন মামলা মোকদ্দমা মীমাংসার্থ শালিসী বোর্ড গঠিত হয় এবং গ্রামের পয়ঃপ্রণালী ও নালা পরিষ্কার, রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা করা, ইত্যাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, মহম্মদ সিরাজী, ডাক্তার আবদুল গফুর, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথবসু প্রভৃতি স্বদেশ সেবকগণকে আহ্বান করিয়া চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে নব জাগরণ উপস্থিত করিয়া

ছিলেন তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সমিতি ও সাহিত্য সম্মিলনী ও পূর্ব্ববাংলা ব্রাহ্ম সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়। দেশের ভাবনা আমার বাবার খুব প্রবল ছিল। দেশের দশের হিতের জন্য স্কুল, ডাকঘর, নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার খানা নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহা পরে যাত্রামোহন দাতব্য-চিকিৎসালয় নামে খোলা হইয়াছে। পথ, ঘাট, নদী, নালা সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। দেশের লোকের কষ্ট দেখিয়া নদীতে সিঁড়ি, তীরে বিশ্রাম ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, মৃত্যু শয্যায় ও এদেশের কথা ভাবিয়াছেন, দীন, দুঃখী, আশ্রিতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সকল কার্য্যের সঙ্গেই দেশসেবক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ও রমেশচন্দ্র সেন নিত্যযুক্ত ছিলেন।

অতিথি অভ্যাগতের সেবা সম্মান আমার বাবা অতি যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করিতেন; দেশী, বিদেশী, ধনী, নির্ধন, দরিদ্র, কাজে অকাজে আমার বাবার কাছে আতিথ্য সমাদর লাভ করিয়া পরম পরিতোষ প্রকাশ করিতেন।

এইরূপে আমার বাবা এদেশের সে দেশের, নানা দেশের, নানা কাজে চেষ্টায় চিন্তায় আজীবন কাটাইয়াছেন। ভগবৎ প্রেরিত পিতা আমাদের সংসারের নয়ন মুদ্রিত ক'রে, স্বর্গে নয়ন উন্মীলন করিয়াছেন। এবং আজ আমাদের সকলের প্রাণের ক্রন্দনের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলকে স্বর্গের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তাঁহার কার্য্য-সমাপন করিয়া তাঁহারই ইচ্ছায় জগতের সমস্ত জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শান্তিধামে স্বর্গধামে আনন্দের আরামের আসন লাভ করিয়াছেন।

পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের মর্ত্ত্যের অন্তরাল সরাইয়া দাও, আমরা তোমার মাঝে তাঁহার নিরাময় চিন্ময় আত্মার পরশন পাইয়া পরিতৃপ্ত হই, তিনি তোমাতেই শান্তিলাভ করুন।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

PAGE(S) MISSING.

চট্টল গৌরব যাত্রামোহন।

২। অন্যতম গুণগ্রাহীর অভিব্যক্তি।

স্বনামখ্যাত জন নায়ক যাত্রামোহন সেন আর পৃথিবীতে নাই। দরিদ্র জনক জননীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি নিজ প্রতিভা বলে নিজের জীবন এবং পরিবারকে উন্নত করিয়াছিলেন, জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত এবং ধনী করিয়াছিলেন। তিনি জন সাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আজীবন জন সাধারণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার অভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকাকুল। তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রাম তাঁহার অভাবে আজ অতি দীনা।

জন্ম ও শৈশব—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বরমা গ্রামে তাঁহার পিতা ব্রাহিরাম সেনের গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূত হইলে ও তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শৈশব এবং যৌবন দরিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষনের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা অতি সৎলোক ছিলেন। তাঁহার মাতার প্রশংসা তিনি সর্ব্বদা করিতেন। তিনি সরলা,সাধ্বী এবং ধর্ম্মভীরু নারী ছিলেন। এই সাধু প্রকৃতির দরিদ্র জনক জননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিত্রে সাধুতারই প্রভাব ছিল; ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্ব কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শিক্ষা—স্বগ্রামের পাঠশালায় গুরু-মহাশয়ের কৃপায় তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। নিজ গ্রামে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি মাতুলালয়ে থাকিয়া পটীয়া স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। তৎপর চট্টগ্রাম সহরেও মামার গৃহেই থাকিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চট্টগ্রাম কলেজ হইতে তৎকালের এল, এ, পরীক্ষাও পাস করেন। তখন এদেশে প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল না। সুতরাং কলিকাতা যাইয়া তাঁহাকে বি, এ এবং বি এল, পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে হয়। পিতা মাতা তাঁহার অধ্যয়নের কোন সাহায্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতুলেরও এমন সচ্ছল অবস্থা ছিল না যে তাঁহার কলিকাতার ব্যয়ভার অবাধে বহন করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে অন্যের সাহায্য ও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীলকমল সেন এই সময় অল্প বেতনে শিক্ষকতা করিতেন এবং যথা সাধ্য তাঁহার সাহায্য করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার বি এ পরীক্ষার কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করেন। এ সময়ে তিনি এত বিপন্ন হইয়াছিলেন যে হয় ত তাঁহার আর কলিকাতা যইয়া পরীক্ষা দেওয়া হইত না। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন এবং চরিত্র গুণে তাঁহার অধ্যাপকেরা তাঁহাকে খুব স্নেহ

করিতেন। তাঁহার কলেজের প্রিন্সিপাল পত্র লিখিয়া এবং অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গেলেন। এইরূপে নানা কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার শিক্ষা সম্পাদন করিয়া বি এল পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বিষয় কর্ম্ম—বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চট্টগ্রাম জজ আদালতে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ন্যূনাধিক ৪০বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন তখন ইংরেজী শিক্ষিত উকিল অল্পই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই তখন মুন্সেফ হইতে পারিতেন। এবং ক্রমে সবজজ এবং ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও হইবার সম্ভাবনাও ছিল। তাঁহার অনেক পরেও যাঁহারা এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই উচ্চ রাজকার্য্যে উন্নীত হইয়াছেন। কিন্তু রাজ সেবায় তাঁহার আগ্রহ ছিল না। আমরা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি, যে মাসে ৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেও, তিনি চাকরী গ্রহণ করিবেন না, সঙ্কল্প করিয়া ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে নিম্ন স্তরে থাকিতে দিলেনা। রাজ কর্ম্মচারী হইলে, তিনি যে যশ মান এবং অর্থ লাভ করিতে পারিতেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক তিনি, তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায়ে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবসায়ে তিনি এদেশে যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাহাতে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন; তাহাতেই যশঃ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সমব্যবসায়ীগণের নিকট তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিচারক মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ব্যবহার-শাস্ত্রে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, মোকর্দ্দমা পরিচালনে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি অধ্যয়ন শেষ করেন নাই। নূতন নূতন যত গ্রন্থ বাহির হইত তিনি সব ক্রয় করিতেন এবং অধ্যয়ন করিতেন। তাহাতেই তাঁহার কৃতকার্য্যতা। ভালরূপ অধ্যয়ন না করিয়া তিনি মোকর্দ্দমা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতেন না।

ব্যবসায়ে যে তিনি যে কেবল যশঃ মান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি অনেকের ধন, মান এবং জীবন রক্ষার সহায়তাও করিয়াছেন। কত সময়ে তিনি অর্থ গ্রহণ না করিয়াও লোকের সাহায্য করিতেন। এক উকিল বন্ধু সে দিন বলিলেন, তাঁহাদের এক মোকর্দ্দমায় তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহারা নিয়মিত ফিস দিতে প্রস্তুত ছিলেন। নিজে উকিল বলিয়া চক্ষু লজ্জাবশতঃ তিনি ফি গ্রহণ করিবেন না মনে করিয়া প্রথম দিন তাঁহারা মোকর্দ্দমার কাগজের মধ্যে ৫০ টাকার নোট দিয়াছিলেন। কিন্তু কাগজ পাঠ করিবার সময় নোট দেখিয়াই তিনি তখনই তাহা ফিরাইয়া পাঠাইলেন। আঠার দিন পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে এই মোকর্দ্দমা পরিচালন করিতে হইয়াছিল। নিয়মিত কি গ্রহণ করিলে তিনি হাজার টাকা পাইতেন কিন্তু এক পয়সাও গ্রহণ না করিয়া অথচ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া এই মোকর্দ্দমার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য—কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টেও ওকালতী করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার চট্টগ্রাম বিভাগের জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন সেখানেও তাঁহার সুনাম প্রকাশিত হইয়াছিল।

জনসাধারণের সেবা—কিন্তু ব্যবসায়ের কৃতকার্য্যতা এবং অর্থোপার্জ্জনে তাহার মহত্ব নয়। ওকালতী ব্যবসা করিয়া কত জনই ত অর্থ-সম্পদ লাভ করিয়াছেন। তাহাতে কিছু অসাধারণত্ব নাই। তিনি যে জন-সাধারণের সেবায় আত্মদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মহত্ব। দেশের কল্যাণ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া কলিকাতা যাওয়ায় পূর্ব্বে জনসাধারণের সেবার ভাব তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয় নাই। সম্ভবতঃ দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইয়া দেশের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে জাগিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হইয়াছিল। তখন দেশের কল্যাণ কামনা তাঁহার হৃদয়কে এত দৃঢ়তার সহিত অধিকার করিয়াছিল যে, নির্য্যাতনের ভয়, কিম্বা উপাধি লাভের প্রলোভন, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতার সময়, দেশের মেজিষ্ট্রেটের অনুরোধ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, তিনি আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কেবল তাহা নয়, এদেশে তিনি আন্দোলনের পরিচালক এবং জন সাধারণের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কি ব্যাকুলতার সহিত তিনি সাশ্রুনয়নে গ্রামে গ্রামে যাইয়া দেশের দুঃখের কথা জন সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন। যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার তখনকার হৃদয়ের ভাব এবং দেশপ্রীতি বুঝিতে পারিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইত তখনই তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত হইতেন। দেশের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ দান করিয়াছেন।

জনসাধারণের নেতৃত্ব—তিনি দেশের নেতা ছিলেন, জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে লাটসাহেবের কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্রাদেশিক সম্মিলনীয়া Provincial conference) এর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং জনসাধারণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনিও দেশের লোকের হিতের জন্য অনেক করিয়াছেন। যাঁহারা নেতা বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের অনেকের ন্যায় তিনিও, দেশের উন্নতির জন্য, আলোচনা আন্দোলন বক্তৃতা অনেক করিয়াছেন জনহিতকর কার্য্যে অসীম সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যাহা দেশের অহিতকর মনে করিয়াছেন, অবিচলিত ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল মুখের বক্তৃতায় বা জনসাধারণের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা তাঁহার লোকহিতৈষণা পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি দেশের জন্য নিজের অনেক অর্থও ব্যয় করিয়াছেন। জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তাঁহার স্বগ্রামের বালকদিগের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়। ইহার গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে তাঁহার ৪।৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় পিতামাতার নামে এই বিদ্যালয় স্থাপিত। ইহার নাম "ত্রাহি মেনকা ইন্‌ষ্টিটিউসন্"।

২। গ্রামের বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত "বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়" ইহারও গৃহাদি তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

৩। গ্রামে ডাকঘরের গৃহও তাঁহার অর্থেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪। বরকলের ঘাটে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী পান্থ নিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা পথিকদের বিশ্রামের জন্য নির্ম্মিত গৃহ।

৫। নিজগ্রামে তাঁহার মাতার শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির।

৬। বরমা ডিস্‌পেনসারী। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয় সেই দিনই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১১ শত টাকা নিজে দান করিয়া ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ড হইতে চেষ্টা করিয়া এই ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

৭। তদ্ব্যতীত তাঁহার নিজগ্রামে তিনি বিশটীর অধিক পুষ্করিনী খনন করিয়া গ্রামবাসী নরনারীর নির্ম্মল জল পানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮। তাঁহার নিজগ্রামে নির্ম্মিত বরমা ব্রাহ্মমন্দির সম্পূর্ণ তাঁহার অর্থে না হইলেও তাঁহার অর্থ এবং চেষ্টা ব্যতীত এই মন্দির সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ।

৯। তৎপরে চট্টগ্রাম সহরেও তিনি অনেক দান করিয়াছেন তাঁহারই দানের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান খাস্তগির উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে। সর্ব্বজন পরিচিত ডাঃ খাস্তগির কেবল চট্টগ্রামে নয় সমস্ত ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রথম এবং প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্থানীয় মধ্যইংরাজী বালিকাবিদ্যালয়কে প্রায় ৩ তিন হাজার টাকা মূল্যের গৃহ ও ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইহাই পরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

১০। চট্টগ্রাম টাউনহলের অভাব বহুদিন অনুভূত হইতেছে। কিন্তু তাহা নির্ম্মাণের সুযোগ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই টাউনহল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু এক সওদাগরে জামীন হইয়া তিনি বহু অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে বহু দিন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে শেষ জীবনে চারি হাজার টাকা মূল্যে জমী ক্রয় করিয়া টাউনহল নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল বটে কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে সম্পূর্ণ গৃহ তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

১১। চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থেও তিনি ৩০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে মন্দির সংলগ্ন গৃহ এবং ভূমি "নলিনী প্রচারাশ্রম" নাম দিয়া ব্রাহ্ম সমাজে দান করিয়াছেন। তাহার মূল্য প্রায় ২৮ শত টাকা হইয়াছে।

১২। J. M. sens Institute নামে স্থাপিত এই নগরের উচ্চ ইংরাজী স্কুল তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

এতগুলি জনহিতকর অনুষ্ঠান যাঁহা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে এমন লোক লোকহিতৈষী

বঙ্গদেশে অল্পই আছেন। চট্টগ্রামে তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই। দেশের বালক-বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম এবং নীতির প্রচার করিবার জন্য মন্দির সংস্থাপন, রুগ্নদিগকে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য ঔষধালয়ের ব্যবস্থা, গ্রামবাসীকে নির্ম্মল জল বিতরণ করিবার জন্য বহু পুষ্করিণী খনন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি ও সমাজ নীতির বিস্তার করিবার জন্য সভামণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি ধর্ম্ম এবং যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন ও দেশের নরনারীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন এবং পরম পিতার বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে অনেকস্থান খালি হইয়াছে অনেক অনুষ্ঠানে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যাত্রামোহনের ন্যায় আর কেহ এদেশে নাই। এদেশে বহু অর্থশালী লোক বর্ত্তমান আছেন কিন্তু জনহিতকর কার্য্যে দান করিবার মত, হৃদয়বান আর কাহাকেও দেখিতেছি না।

যাত্রামোহনের স্থানে আমরা এখন অন্য লোককে প্রতিষ্ঠিত করিব। কিন্তু তাঁহার ন্যায় দেশের সেবা করিতে কেহ প্রস্তুত কিনা জানিনা, তাঁহার ন্যায় ঘরের অর্থ পরের জন্য দান করিতে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশের স্বার্থ রক্ষা করিতে কেহ প্রস্তুত আছেন কিনা জানিনা।

ধর্ম্ম-জীবনের কথা—তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের দুইটি কথা না বলিলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থাকিবে। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামের কথা অনেকেই জানেন। প্রায় ৩২ বৎসর ধর্ম্মজীবনের পথে আমরা পরস্পর এক সঙ্গে চলিয়াছি। সুতরাং তাঁহার কথা বলিবার আমার কিঞ্চিৎ সুযোগ আছে। তাই আমি ইহার উল্লেখ করিতেছি।

যৌবনকালে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মতের স্থিরতা বা দৃঢ়তা ছিলনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের ধর্ম্ম বিশ্বাসে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া অনেকেই এদেশের প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সরল বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারেন না, অথচ জ্ঞানের অনুকূল ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম পিপাসারও তৃপ্তি হইতে পারে না। পুরাতনে বিশ্বাসহীনতা এবং নূতন পথ অন্বেষণে নিশ্চেষ্টতা প্রযুক্ত আজকাল ধর্ম্মে উদাসীনতাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। একসময় যাত্রামোহন বাবুর ধর্ম্মজীবনের এই অবস্থাই ছিল। দেশের পুরাতন আচার অনুষ্ঠানে তাহার আস্থা ছিলনা অথচ সমাজ রক্ষার জন্য তাহাই করিতে হইত। নিজের ভরায় মোদিত কোনও নূতন পথের অন্বেষণ তখন তিনি করেন নাই। সেই অবস্থাতে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ধর্ম্ম প্রচারার্থ চট্টগ্রামে আসিয়া যাত্রামোহনবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তখন তাঁহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁহার শ্বশুর স্বনামখ্যাত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়ের অনুরোধে তিনি উক্ত প্রচারক মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া নিজগৃহে রাখিয়াছিলেন। প্রচারক মহাশয় কিঞ্চিদধিক ৫মাস কাল তাঁহার গৃহে বাস করিয়া স্থানীয় (সাধারণ) ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া

বন্ধুর অকাল মৃত্যুতে

(১)

পিতৃশোকের অন্তর্দাহে জীবন আমার যাচ্ছে জ্বলে,
তাহার উপর নতুন করে একি গভীর জ্বালা!
প্রোজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আবার ঘৃত ঢালা!
হা ভগবান্ হৃদয় দিয়ে বড্ড ভালোবেসেছিলাম,
ভালোবাসার এই কি প্রতিফল!
ভালোবেসে নির্জ্জনে হায়, এমনি করে ফেল্‌বো
চোখের জল!
নাইকো সময় নাই অসময় তাহার সাথে সকল
সময়
নানান্ রকম গল্পগুজব দেশবিদেশের কথা!
ধর্ম্ম, সমাজ, রাজ্যনীতি, কত জাতির অধঃপতন
হিন্দুসমাজ, গান্ধীর কথা, বিরাট্ জাতীয়তা!
মাতৃভাষা, নবীন প্রাচীন সকল রকম কাব্য-
গাথা,
কাহার সাথে দিনরজনী কর্‌বো আলোচনা
আর কি তাকে দেখ্‌তে পাবো, কোথায় গেছে
কোন্ সুদূরে,
এই জীবনে কণ্ঠ তাহার, আর কি যাবে শোনা!

(২)

হোক্ না চির-পল্লীবাসী, দেশবিদেশের
রাখ্‌তো খবর,
অনেক কথাই তাহার ছিল জানা।
তাহার মত কাব্য পাঠক এই জীবনে কম
দেখেছি,
বাস্তবিকই কবির মত ছিল হৃদয়খানা!
পূর্ব্ববঙ্গের নিঃস্ব কাঙাল বীর্য্যবন্ত দাসকবিকে
প্রাণের চেয়ে বাস্‌তো বেশী ভালো।
তাঁর কবিতাই প্রথম তাহার জ্বাল্‌লো প্রাণে
আলো!
তারপরে সে ক্রমে ক্রমে ঠাকুর দত্ত রায়
বড়ালের
হৃদয় দিয়ে পড়্‌লো লেখাগুলি,
আকুল হয়ে আহার নিদ্রা ভুলি!
আলয় থেকে ক্রোশান্তরে, নিত্যি এসে আমার
গৃহে,
আমার সাথে পড়াশুনা নাগাদ দুপুর রাতি!
এমন পাঠক এমন শ্রোতা এই জীবনে আর
পাবোনা,
উদ্বেলিত শোকোচ্ছ্বাসে যায় যে ফেটে ছাতি!
তাহার সাথে দশটি বছর আগে আমার
হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা প্রথম পরিচয়!
আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে আমার মত ক্ষুদ্র
কবির,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা এবং কথার ভিতর দিয়ে,
কখন্ হলো হৃদয়-বিনিময়!
আঁধার রাত্রি, ঝড় ঝঞ্ঝা, মুহুর্মুহু বজ্রনিপাত,
বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা বাতাস, সর্পভীতি, শীত
এসবগুলি তুচ্ছ করে রাতদুপরে পড়ার পরে,
ক্রোশান্তরে আপন গৃহে যেতো সুনিশ্চিত।
পীড়াপীড়ি কর্‌লে কভু যাহা দিতাম খেতো
সুখে,
কিন্তু তবু রইতো না মোর গৃহে;
কারণ জিজ্ঞাস্ কর্‌লে পরে বল্‌তো ঈষৎ
মুচ্‌কি হেসে,
"কি জানি কেউ শুধায় পাছে—'কোথায়
ছিলে, কিহে?"
আমার চেয়ে অনেক বড়, দেখ্‌তে তবু আমার
মত,
মনে হতো বয়েস যেন ত্রিশ;
কালির মত বর্ণ কালো, তার ভিতরে এত
আলো!—

মূর্ত্তিমন্ত সাহস চোখে ভাস্‌ছে অহর্নিশ !

(৪)

গরীব ছিল, গরীব দুঃখীর বুঝ্‌তো প্রাণের সকল ব্যথা,
হৃদয় দিয়ে তাদের দুঃখ কর্‌তো অনুভব !
স্বাস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা নীতি মোটামুটি কর্‌তো প্রচার,
পল্লীবাসী ছেলেমেয়ে তাহার ছিল সব !
সারাজীবন চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম্য লোকের ব্যাগার খেটে,
জীবন কর্‌লো নাশ !
বিদ্যা এবং বুদ্ধি ছিল, কাঙাল বলে হয়নি কদর,
অর্থাভাবে মোক্তারীটা কর্‌লো না সে পাশ
টাকা কিম্বা শ্বশুর কিম্বা ভগ্নিপতির জোরে,
অনেক প্রভু দশের চক্ষে নিত্যি ধূলি দান্ !
তোষামুদি জান্‌তো না সে মোটেই,
এসব দিকে বিন্দুমাত্র ছিলনা তার ধ্যান !
লক্ষ্য ছিল পরোপকার, সংসারটাকে তুচ্ছ ভাবা,
সাধু-জীবন, কেবলমাত্র জ্ঞান !

(৫)

আমার মত অনাদৃতের তাহার কাছে কতই আদর,
কতই যেন গণ্যমান্য দশের পূজ্য আমি !
মস্ত বড় একটা যেন কেউ !
হা ভগবান্, বুঝতো না সে অদ্যাবধি আমার প্রাণে
দেশের ছাড়া বিশ্বপ্রেমের খেল্‌লো না তো ঢেউ !
অল্প সুখে অল্প দুখে হৃদয় আমার হাসে কাঁদে
অল্প নিয়েই মেতে আছে প্রাণ ;
সীমাবদ্ধ স্বদেশ সমাজ স্বজাতিদের দুঃখ ব্যথা
আমার হিয়ার পাচ্ছে বড় স্থান !
ক্ষুদ্রকে সে বিরাট্ ভেবে দিবসরাতি কর্‌তো পূজা,
আজকে তাহা বুঝি চোখের জলে !
রক্তমাংসের আত্মীয়তা তাহার সাথে নাই তো আমার,
তবু তাহার শোকে আমার পাষাণ হিয়া গলে।

(৬)

কাল্‌কে আবার আসবে বলে, রাত্রে সেদিন বলে গেলে,
দিনের পরে দিন যেতেছে আস্‌ছো না যে, ভাই।
তোমার প্রিয় 'চন্দন' 'এষা' 'আলেখ্য' ও 'অভ্র-আবীর'
তোমায় ছাড়া পড়তে নাহি চাই।
হা বন্ধু, ফিরে এস, ফিরে এস বন্ধু আমার,
কাহার সাথে সকল রকম করবো আলোচনা
এই জগতে ছুট্‌ছে সবাই টাকা পয়সার পিছে পিছে,
চাচ্ছে কেবল তামা চাঁদি সোনা।
সকাল বিকাল সন্ধ্যা নিশায়,
মিথ্যাকে তাই সত্য বানায়,
সারা জীবন পেটের চিন্তা করে ;
সুযোগ পেলেই পরের টাকায় বার্-ফুটানি করছে পরস্পরে।
বীর্য্যবন্তের পায়ের চাপে দুর্ব্বলের হাড় হচ্ছে গুড়া,
কেউ তো তাদের দরদ্ নাহি বোঝে !
'বাবুরা' সব বিরাট্ বিশাল নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলার,
টাকাকড়ি লুট্‌বার জন্যে কাছার কাপড় খোঁজে।
মূর্খ এসব বোবা মানুষ তোমার বড়ই প্রিয় ছিল,
তাদের দুঃখ ঘুচাও এসে, ভাই !

তোমার অভাব অহরহঃ তারাই জো, ভাই, বেশী বোঝে,
কাঁদ্‌ছে তারা সদা সর্ব্বদাই !
তাদের কাজে ব্যাগার দিতে আবার তুমি ফিরে এস,
ফিরে এস আবার "শালীহরে" !
তোমার পায়ের স্পর্শ পেতে পল্লীর মেঠো পথ সমুদায়,
কাঁদ্‌ছে মাঠের পরে !
রাতের আকাশ, উদ্‌লা বাতাস, বাড়ীর পূবের ফসল-ফলা মাঠ,
সত্যি, বন্ধু, নিত্যি তোমায় ডাকে !
ফিরে এস, বন্ধু আমার, ফিরে এস ফিরে এস,
আবার ফিরে এসে তুমি, তুষ্ট করো তোমার পল্লীমাকে !
এই জীবনে ভুল্‌বো না আর, ভুল্‌বো না আর তোমায় আমি,
কাঁদবে হৃদয় দুঃখে এবং সুখে ;
তোমার অভাব বজ্র হয়ে রইলো আমার বুকে !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

চট্টল গৌরব যাত্রামোহন।

১। শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত জীবনালেখ্য।

১৯১৯ সালের ২রা নভেম্বর আমাদের পক্ষে কি বিষম দুর্দ্দিন ! সে দিন আমাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার, সর্ব্বাপেক্ষা আরামের, আশ্রয়ের স্থল, আমাদের পিতৃ-দেবকে হারাইয়াছি। ১৯০৬ সালে, যখন মা আমাদের অপোগণ্ড ফেলিয়া চলিয়া যান, তখন এত দারুণ দুঃখ অনুভব করিবার মত হৃদয় আমাদের ছিল না। তথাপি, এক অনবদ্য তীব্র যন্ত্রনায় প্রাণের তন্ত্রী যখন অগ্নিময় হইয়া উঠিত, তখন আমার বাবার স্বর্গের স্নেহকরুণোজ্জ্বল সজল নয়নের দৃষ্টি আমাদের জীবনের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিত ; একদিনের জন্যও মাতৃবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিবার, ভাবিবার, বুঝিবার সময় সুযোগ বাবা আমাদিগকে দিতেন না। বাবা আমাদের মা ও বাবা দুইই ছিলেন, এতদিনে আমরা মা ও বাবা দুইই হারাইলাম। এতদিনে আমরা ভাই-বোন যথার্থ অসহায় হইয়া পড়িলাম, আমাদের স্বর্গের সুখের সাজানো কুসুম-কম-কানন কালের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা দুঃখের সাগরে ভাসিতে চলিলাম। আমাদের দুঃখ রাখিবার বুঝিবার জায়গা এজগতে এখন আর রহিল না।

আমার বাবা শুধু আমরা ভাইবোন কয়েকজনের পিতা ছিলেন তাহা নয়, আমার বাবার আকাশ জোড়া হৃদয়ের মাঝে, আমাদের সঙ্গে, আমার মাতৃভূমির ভ্রাতা ভগিনী সকলেরই স্থান ছিল। সকলের সুখে দুঃখে তিনি সহযুক্ত ছিলেন। দেশের দুঃখে দৈন্যে

রোগে শোকে আমার বাবার হৃদয়ে কান্না উঠিত; দেশের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য আমার বাবা স্বতঃই, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইতেন। অসহায়, অসম্পন্ন, নিরন্ন, বিপন্ন, ভ্রাতা ভগিনীগণ আমার বাবার কাছে স্থান পাইতেন। তাই বলিতেছি, আজ আমার মাতৃভূমি বাস্তবিক আমার সঙ্গে পিতৃহীন হইয়াছে। আমি সকলের গলা জড়াইয়া সকলের সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইয়া সকলের সঙ্গে আজ কাঁদিব, আমার কান্না আমার বাবার স্বর্গের চরণ চুম্বন করিবে, সেখানেই আমার সান্ত্বনা।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের ৩০শে জুলাই সন ১২৫৭ সালে ১৬ই শ্রাবণ পটিয়ার বরমা গ্রামে আমার পিতার জন্ম হয়। আমার পিতামহ ব্রাহিরাম সেনও পিতামহী মেনকা সুন্দরী। তাঁহাদের চারি পুত্র ও দুই কন্যা, আমার পিতা যাত্রা-মোহন সেন তাঁহাদের পঞ্চম সন্তান।

আমার পিতামহ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, তাই বাল্যকাল হইতে বাবাকে দুঃখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে হইয়াছিল। কত বাধা বিঘ্ন বুকে ঠেলিয়া, তাঁহাকে এই দুঃখময় সংসারে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, তাহা আমার ক্ষীণ ভাষায় বর্ণনার অতীত। সংসা-রের দারিদ্র্য পীড়িত জীবন স্বর্গের মহিয়সী প্রতিভা প্রভাবে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হয়, আমার বাবার জীবন তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

বাবার আটমাস বয়সের কালে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের থাবা বিষম জ্বলিয়া যায়,তাহার উপর জনৈক ভদ্র মহিলা অসাবধানতা প্রযুক্ত পায়ে মাড়াইয়া তাঁহাকে অসহনীয় কষ্টে পাতিত করেন; তাহাতে হাতের সমস্ত আঙ্গুল জড়াইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

শিশুদিগকে পঞ্চমবৎসরের কালে বিদ্যারম্ভের জন্য হাতে খড়ি দিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে; আমার বাবার হাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, লেখাপড়া হইবে না এই ভাবিয়া আমার পিতামহ তখন তাঁহাকে হাতে খড়ি দেন নাই।

আমার পিতামহ দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। সংসারের ধনে তিনি নির্ধন ছিলেন; ধর্ম্মধনে তিনি ধনী ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার ভক্তি ছিল, পরলোকে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন।

একদিন আমার পিতামহের বাড়ীতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে স্থানীয় পাঠশালার গুরুঠাকুর চৈতন্যচরণ সেন মহাশয় নিমন্ত্রণে আসিয়া আমার পিতামহের সঙ্গে বাবার লেখাপড়ার বিষয় আলাপ করেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার পিতামহ বাবার হাত নাই, লেখা-পড়া হইবে না ইত্যাদি তাঁহার মনোগত ভাব গুরুঠাকুরের নিকট ব্যক্ত করেন। গুরুঠাকুর মহাশয় খোঁড়া ছিলেন, বাবার হাত পোড়া ছিল, তাই যেন গুরুঠাকুর মহা-শয় সমবেদনার সঙ্গে বাবাকে ডাকিয়া লিখিতে পারিবেন কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য একটীরাঁশের ছিপ দিয়া মাটিতে লিখিতে দিলেন এবং তাহাতে যাহা দেখিলেন তাহাতে লিখিতে পারিবেন বলিয়াই তাঁহার প্রত্যয় হইল; নরম হাতের ক্ষিপ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। লেখাপড়া হইবে বলিয়া বাবাকে হাতে খড়ি দিতে আমার পিতা-মহকে অনুরোধ করিলেন। সেই খঞ্জ গুরুঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে আমার

পিতামহ ৬ বৎসরের কালে হাতে খড়ি দিয়া বাবাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। দেড় বৎসরে তাঁহার পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেল। অতঃপর নিকটবর্ত্তী সাতবাড়িয়া গ্রামে আমার জ্যেষ্ঠতাত নবচন্দ্র সেন মহা-শয়ের টোলে অধ্যয়ন করিয়া তাহা ও সাঙ্গ করিলেন। কিন্তু এ সামান্য নিস্তেজ গ্রাম্য টোলের পড়ায় প্রতিভাসম্পন্ন বালক হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আবেগ মিটিল না; বরং তাঁহার শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা অতীব বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহার মাতুল মহেশচন্দ্র দত্ত, বালক হৃদয়ের অভিপ্রায় অনুভব করিয়া, তাঁহাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভুর্ষি গ্রামে, আপন বাড়ীতে লইয়া গেলেন; মহেশবাবু অপুত্রক ছিলেন; বাবা মাতুল গৃহে পুত্ররূপে গৃহীত হইয়া মাতুল মাতুলানীর স্নেহ ও সেবায় প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু লেখাপড়ার সুবিধা না হওয়াতে সে সুখের মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। তৎপর আবার তাঁহার বড় মামা কৈলাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার বাড়ী লইয়া পঠীয়াএণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

সেইখানে ৮ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এণ্টান্সক্লাসে প্রমোশন পাইলে কৈলাসবাবু তাঁহাকে তাঁহার সহরের বাসায় আনিয়া চট্ট-গ্রাম এলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তথায় তাঁহার স্কুলের খরচ আমার বড় জ্যেঠামহাশয় নীলকমল সেন মহাশয়ই নির্ব্বাহ করিতেন। ভগবৎ কৃপায় ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১০ টাকার গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ১৮৭০ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর অর্থাভাবহেতু আর বি, এ, পড়া হইবে না সাব্যস্ত হইলে বাবা চাকরীর যোগাড়ে প্রবৃত্ত হন, তখন চট্টগ্রামসহরে ম্যালেরিয়ার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল, সহরে থাকিয়া এদিক সেদিক ঘুরিতে ফিরিতে ক্লান্ত শরীর তাহার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল; চাকরী হইল না।

তিনি বি, এ, পড়িবেন না চাকুরী করি-বেন, ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগিতেছেন শুনিয়া কলেজের তৎকালীন প্রফেসার বৈকুণ্ঠনাথ রায়, আমার বড় জ্যেঠামহাশয়কে ধার করিয়া হইলেও বাবাকে পড়াইবার জন্য খুব উৎসাহিত করিলেন। বৈকুণ্ঠবাবু বাবাকে খুব ভাল বাসিতেন, তাহারই উৎসাহে বড় জ্যেঠামহাশয় ধার করিয়া বি, এ, পড়িবার জন্য বাবাকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন।

কলিকাতায় যাইয়া তিনি সুস্থ হইলেন এবং ১৮৭১ খৃঃ তত্রত্য কোথড়েলকলেজে ভর্ত্তি হইলেন। বি, এর চতুর্থ শ্রেণীতে থাকিতে ত্রিদোষরোগে আক্রান্ত হন,ডাক্তার খাস্তগির মহাশয়ের চিকিৎসানৈপুণ্যে সেবার তিনি রোগ মুক্ত হন।

তৎকালে সবজজ শ্রীতারাচরণ সেন ও বারিষ্টার শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার খুব সদ্ভাব জন্মিয়াছিল, তারাচরণ বাবু ও পূর্ণবাবু সেবার বাবার খুব সেবা করিয়াছিলেন রোগ মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু এক বিষম বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে তখনই কলিকাতা ছাড়িতে হইল। সেই বিপদ আমার বড় জ্যেঠার মৃত্যু, এই আকস্মিক মৃত্যু বিপদে আমার বাবা একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়ি-লেন, বি, এ পরীক্ষায় নিরাশ হইলেন।

এই সময় তাঁহাদের কলেজের সহৃদয় প্রিন্সিপল বাবার এই বিপদের বিষয় জানিতে

পারিয়া খুব সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং শীঘ্র ফিরিয়া গিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আশ্বস্ত করেন। তাঁহারই আশ্বাসে অনুকম্পায় আবার কলিকাতা গিয়া টেষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন কিন্তু আবার জ্বরাক্রান্ত হইলেন। পরীক্ষা নিকট পড়িতে অক্ষম, এই অবস্থায় তাঁহার সতীর্থ তারাচরণ বাবু তাঁহার শিয়রে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন তিনি তাহা শুনিয়া শিখিতেন। এইরূপে কিন্তু শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার দৌর্ব্বল্য দর্শনে ডাক্তার শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরীক্ষা দিতে বারণ করেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু হরকুমার বাবু তাঁহাকে পরীক্ষা দিতেই উৎসাহিত করিতে থাকেন। ফলে পরীক্ষা দেওয়াই হইল, ভগবদ্‌কৃপায় বাবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

অনন্তর চট্টগ্রাম আসিয়া কমিশনার অফিসে ৩০ টাকার বেতনে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন, এই চাকরীতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না কেবল পাস নেল এসিষ্টেণ্ট ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর হরিচৈতন্য ঘোষ মহাশয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাবাণীতেই এই ডিপার্টমেণ্টে সামান্য কেরাণীগিরি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১০ মাস কাজ করিয়া নানা কারণে ইহা বিরক্তিজনক হওয়াতে দুটী দরখাস্ত দিয়া বি,এল পড়িবেন স্থির করিয়া ব্যারিষ্টার পূর্ণবাবুর সঙ্গে, ডাক্তার খাস্তগির মহাশয় হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান।

তাঁহার কলিকাতা যাইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার ও তাঁহারই কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুর উৎসাহে পূর্ণবাবু বিলাত যাত্রা করেন। ইতিপূর্ব্বে পূর্ণবাবু হইতে তিনি কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। পূর্ণবাবু বিলাত চলিয়া গেলেই বাবা অনতিবিলম্বে অতি কষ্টে পূর্ণবাবুকে সেই টাকা শোধ করিয়া পাঠাইলেন।

কলিকাতায় প্রাইভেট টিউসনই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল কিছু দিন পরে লংসাহেবের গির্জ্জায় কম্পাউণ্ড কেথিড্রেল মিসন স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া বিএল পড়িবার বন্দোবস্ত করিলেন। ১৮৭৬ ইংরাজীতে বিএল পরীক্ষায় সপ্তম স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

অতঃপর চট্টগ্রাম ফিরিলেন। সেই সঙ্গে বারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষ, লালচাঁদ কাকুর্ডের প্রসিদ্ধ মোকর্দ্দমায় চট্টগ্রাম আসিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে কাপ্তেনের অসাবধানতা হেতু ষ্টিমার চড়ায় লাগিয়া সকলেই একসঙ্গে মৃত্যুর সন্নিহিত হন। সেই সময় বাবা ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক ষ্টিমার হইতে চট্টগ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত বিশেষ পারিতোষিক দিবার অঙ্গীকারে কালাকাপ্তান কার্ণেলভাস্‌কে অনুরোধ করেন। কালা কাপ্তেন এক কাটার বোটে তাঁহাদিগকে করিয়া চট্টগ্রামে আনিয়া দেন। ভগবানের কৃপায় সকলেই রক্ষা পান, কিন্তু কূলে উঠিয়া বাবা ভিন্ন অন্য কেহই কালা কাপ্তেনের পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হইলেন না।

ইহাতে আমার বাবার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু কিছু প্রতীকার করিতে না পারিলেও তাহা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিল। পরে যখন কালা কাপ্তান কোন মোকর্দ্দমায় পড়িয়া বিপন্ন হন, বাবা তখন বিনা পরিশ্রমিকে তাহার মোকর্দ্দমা চালাইয়া কাপ্তানকে বিপন্মুক্ত করেন।

বি এল পরীক্ষাপাশ হওয়ার পর ডাক্তার খাস্তগির মহাশয়,তদীয় ভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবুর কন্যা অথবা তাঁহার কন্যা বিনোদিনীদেবীকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। খাস্তগির মহাশয়,স্বীয় মহত্ব হেতু বাবার সুখের দুঃখের অংশভাগী ছিলেন। অনেকবার আসন্ন মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কত ঘোরতর দুঃসময়ে দুঃখের ভাগ বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ উপকারী মহজ্জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার ভাবও বাবার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্থান পাইল না। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে তাঁহার সহিত খাস্তগির মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

আমার জননী দেবী বিনোদিনী, শিক্ষিতা সহৃদয়া, সরলা, মহিয়সী মহিলা ছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দের ৫ই জুলাই মা আমাদের বাবার কাছে রাখিয়া মহাপ্রস্থান করেন, তদবধি বাবা আমাদের মা ও বাবা দুইই হইলেন।

অর্থোন্নতি, ধর্ম্মোন্নতি ও সমাজ সংস্কার আমার বাবার কর্ম্মজীবনের বিশেষ লক্ষ্যস্থল ছিল। দেশের সমাজের, ধর্ম্মের প্রচলিত কুপ্রথা দর্শন করিয়া তিনি খুব দুঃখিত হইতেন কিন্তু প্রথম জীবনে তাহা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। সকলের সঙ্গে মিলনের সুবিধার জন্য সমাজের ধর্ম্মের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বার মাসের তের পার্ব্বণ সম্পন্ন করিতেন। এবং ইহার মধ্যেই সংস্কারের ভাব জাগাইতে প্রয়াস পাইতেন। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক আনিয়া ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বপ্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রদাস মহাশয় বাবার সঙ্গে বরমার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আহারই ফলে বরমার সুসন্তান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র সেন ও লেপটেণ্টে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন I, M, S.,M. D. R. C. S. F. মহোদয়গণ ১৯০২ ইং ২৪শে জানুয়ারী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

বাবা মিলন খুব ভাল বাসিতেন, মানবে মানবে যে ভেদ তাহা তাঁহার অসহনীয় ছিল, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল সমাজের মাঝে তিনি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মানবের জাতীয় জীবন গঠনের জন্য দেশকে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে জুড়িয়া দিবার জন্য আমার বাবা দেশ নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ও অশেষ আয়াস পাইয়াছিলেন।

আমার বাবা সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। দেশের লোকের মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি আপন জীবনের অনেক উচ্চভাব ও ইচ্ছা সতত লুক্কায়িত রাখিবার চেষ্টা করিতেন, এইজন্য তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত প্রস্ফুরণ দর্শন করিতে সাধারণ জনগণের অনেক বিলম্ব হইয়াছিল।

প্রাণের পরম প্রিয়বস্তু যাহা,তাহা একেলা আপনি উপভোগ করিয়া সান্ত্বনা হয় না, সকলের সঙ্গে তাহা ভোগ করিয়া যে সুখ, সে সুখের তুলনা মিলে না। এই ভাবের প্রেরণায়, দেশের আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিবেন এই আশঙ্কায় তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন; যাহা উত্তম জানিতেন তাহা হইতেও দূরে আছেন এইরূপভাব প্রদর্শন করিতেন। সময়ও সুযোগ পাইলেই ধর্ম্মের উচ্চ অবস্থার কথা আলোচনা করিতেন। দেশপ্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। তজ্জন্য তাঁহাকে সময় সময় সমাজের নিকট নিন্দিত

ও লাঞ্ছিত হইতে হইত; তাহা তিনি নীরবে সহিয়া লইতেন, সহিবার ক্ষমতাও তাঁহার খুব বেশী ছিল।

পাঠ্যজীবনে আমার মাতামহের সাহায্যে ও কর্ম্মজীবনে ব্রাহ্মসমাজের মহজ্জনগণের সঙ্গ লাভ করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের ও ধর্ম্মের প্রতি খুব অনুরাগী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের উচ্চতা ও তাহার মধুরতা প্রাণে প্রাণে তিনি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজের জন্য পুণ্যতীর্থ তাহা তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ বর্দ্ধনের নিমিত্ত তিনি আজীবন আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। চট্টগ্রাম ও বরমা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কার্য্যে ভগবান তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। যখন চট্টগ্রামে ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মিত হয় নাই তখন বাবার বাসভবনে প্রচারক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত ও ষোড়শীমোহন সেনকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এবং উপাসনার্থ একটি ছোট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

অনেক দিন ধরিয়া দেশের দশকে লইয়া উঠিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন, সেই টানাটানির ফলে বরমা ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তদীয় কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মহাশয়ের দীক্ষায় ব্যাকুল বৈচিত্রের মাঝে ভগবানের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া ৫৮ বৎসর বয়সে ১৯০৯ ইং ২৪শে জানুয়ারী পবিত্র মহোৎসবে চট্টগ্রাম ব্রাহ্মমন্দিরে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মের সমাজের চিন্তায়, চর্চ্চায়, সেবায়, স্বীয় জীবন, অর্থ সামর্থ্য অকাতরে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বরমার দরিদ্র ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষা কল্পে আপন জমিদারীর আয় হইতে বার্ষিক ৬০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া সমাজের প্রতি গভীর মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত দেশ প্রচলিত কুসংস্কারের মূল উন্মূলনের জন্য অনুন্নত শ্রেণীর নরনারীর উন্নতির জন্য সাধারণে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মানবের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য,স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য আমার বাবা কার্য্যতঃ, বাক্যতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষত যে কতশত আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,তাহা আমাদের সঙ্গে এদেশ বাসী নরনারী সকলেরই গৌরবের ও অনুকরণের বিষয় বটে।

দানে আমার বাবা সতত সিদ্ধ ও মুক্ত হস্ত ছিলেন। প্রার্থীকে ব্যর্থ মনোরথ করিতে তাহার জীবনে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। নিরন্নকে অন্নদান, বিপন্নকে আশ্রয় দান, রুগ্নকে ঔষধ ও পথ্যদান করিতে কদাচিৎ তিনি কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না। আকুল আগ্রহের সঙ্গে তিনি রুগ্ন ব্যক্তির সেবায় অগ্রসর হইতেন। দেশের দীন, দুঃখী, রুগ্ন, ভগ্ন ব্যক্তির জন্য তাঁহার চিন্তার সীমা ছিল না। আমার মাতৃভূমির দীন দুঃখী, রুগ্ন,ভগ্ন ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য আমার বাবা দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন, সকল দেশে সুশিক্ষা বিস্তৃত হউক এই ইচ্ছা তাঁহার বলবতী ছিল। শুধু এই পক্ষে তিনি বরমায় আমার পিতামহ ও পিতামহী নামধেয় মধ্য ইংরাজী স্কুল উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রবর্ত্তিত করিবার সূচনা করিয়াছেন। চট্টগ্রাম সহরে তন্নামধেয় হাইস্কুল তাহারই পরিচায়ক।

যান। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে অনেক সময়ে তাঁহার গৃহে আলোচনা হইত। প্রতি রবিবার তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মোপাসনা হইত এবং অনেক সময় বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের তিনি সাহায্য করিতেন। এইরূপে ১৮৮৭ সালের মার্চ্চমাস হইতে তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সাক্ষাৎ পরিচয় ও যোগ স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে, হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ পাশাপাশিভাবে, একসঙ্গে, তাঁহার হৃদয় মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। অনেক বৎসর, তিনি দুই সমাজকেই অবলম্বন করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং হিন্দুসমাজের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। এই অবস্থায় লোক-চক্ষুর অগোচরে তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বদা ধর্ম্মসংগ্রাম চলিতেছিল। কোন্ আদর্শ তাঁহার জীবনে জয়যুক্ত হইবে, তাহা তখনও ঠিক হয় নাই। কোন পথে তিনি চলিবেন, তাহা কেহ জানিত না। তজ্জন্য তাঁহাকে লোকনিন্দাও সহিতে হইয়াছিল। লোকে বলিত তিনি গ্রামে যাইয়া হিন্দু ও সহরে আসিয়া ব্রাহ্ম হন। এই দোলায়মান অবস্থার দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

সুরধুনীবালা নামে তাঁহার এক প্রিয় কন্যা ছিল। জলে ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ব্রাহ্মমতে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিলেন। তদুপলক্ষে কোন হিন্দু-অনুষ্ঠান হয় নাই। অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আমার মনে হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মেই তাঁহার সরল বিশ্বাস। কারণ এই শোকের সময় কেহ অসরলভাবে কার্য্য করিতে পারে না। এই কথা ভাবিয়া, পরের দিন আমি তাঁহাকে এক পত্র লিখিলাম। তাহাতে লেখা হইয়াছিল যে শোকের অবস্থাতে তিনি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সরল বিশ্বাসের পরিচায়ক। যদি তাহাই হয়,যদি ব্রাহ্মধর্ম্মেই তাঁহার সরল বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী চিন্তা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার কথা তাঁহার হৃদয়ে কতদূর স্পর্শ করিয়াছিল জানি না, কিন্তু তখন তিনি তাহা কার্য্যের পরিণত করিতে পারেন নাই। ঘটনাক্রমে এই পত্রের কথাটী বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এক উকীলবন্ধু তাহাতে আমাকে বলিয়াছিলেন, "যাত্রামোহনবাবু পাকা উকীল, আপনি তাহা জানেন না বলিয়া, তাঁহাকে ব্রাহ্ম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" বন্ধুর এই উপহাস আমাকে নীরবেই সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, যাত্রামোহনবাবুর পরবর্ত্তী জীবন এই মন্তব্যের সমর্থন করে নাই। তিনি বাস্তবিকই "পাকা উকীল" ছিলেন। কাহারও কথায় বা কোন প্রলোভনে তিনি ব্রাহ্ম হন নাই; কিন্তু ভগবানের কৃপায়, উপযুক্ত সময়ে, তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে তিনি তাঁহার বিশ্বাসের সরল পথ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাইলাম,ভগবানের কৃপায়"পাকা উকীলের" ও হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়; তাঁহারাও ধর্ম্মের সরল পথে চলিয়া ব্রহ্মকৃপালাভ করিতে পারেন। ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিশ্বাসের দোলায়মান অবস্থাতে আরও কিছুদিন গেল।

WRONG PAGINATION

কয়েক বৎসর এইরূপে গত হইলে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি হিন্দুমতে এবং ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তাহাতে দুএকজন ব্রাহ্মবন্ধু তাঁহার বাড়ীতে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই এবং একজন তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, যে যখন তাঁহার ধর্ম্মমতের স্থিরতা নাই, তখন তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন না। এই ব্যবহারেও তিনি হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছু কাল পরে, একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—"হরিশবাবু, আপনারাও আমাকে ঘৃণা করেন"। তাঁহার ন্যায় পদস্থ এবং সম্মানিত ব্যক্তির মুখে এমন কথা শুনিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কেন এমন কথা বলিতেছেন?" তিনি বলিলেন "আমি যে, হিন্দু!" আমি বলিলাম "হিন্দুকে আমি কি ঘৃণা করি? আমার পিতা হিন্দু ছিলেন, আমার পিতামহ হিন্দু ছিলেন। আমি কি তাঁহাদিগকে ঘৃণা করি। আমিও বহুদিন হিন্দু ছিলাম, আমি কি আমাকেও ঘৃণা করি? কখনও না। তবে একথা মনে হয় যে যাঁহার যাহা বিশ্বাস,তাঁহার তাহাই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-জীবনে বিশ্বাসের সরল পথই শ্রেয়ঃ।" আমার কথা হয়ত তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। কারণ, তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতাতেও তাহার সায় পাইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ধর্ম্মবিশ্বাসের অব্যবস্থিত অবস্থাতে থাকিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন,তাহাতে যেমন প্রাণের ভিতরে শান্তি পাওয়া যায় না, তেমনই বাহিরে লোকেরও শ্রদ্ধালাভ করিতে পারা যায় না। আরও কিছুকাল আত্মচিন্তা এবং আত্ম-পরীক্ষা করিয়া অবশেষে তিনি, প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরের পূজা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি নীরবে আত্মচিন্তা করিয়াই ধর্ম্মজীবনের পথ ঠিক করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাহার পূর্ব্বদিনেও কেহ তাহা জানিত না। ১৯০৭ ইংরাজীর জানুয়ারী মাস, মাঘোৎসবের দিন,ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালে উপাসনা শেষ হইলে,তিনি আমাকে ও শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সেনকে তাহার গৃহের এক নির্জ্জনকক্ষে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আজ আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব।" সেই দিন রাত্রিতে তিনি বহুলোকের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। প্রায় ৫৮ বৎসরের বৃদ্ধ,এইরূপে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচুর নৈতিক সাহস ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন। তৎপর ১২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আমরা তাঁহার সরল বিশ্বাস, ঐকান্তিক ভক্তি এবং অবিচলিত নিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি উপাসনাতে শ্রদ্ধাবান ও অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান ছিলেন। বিশবৎসর সংগ্রামের পর, তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের সে পথ তিনি দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

হৃদয়ের মহত্ত্ব।—যাত্রামোহনবাবুর সংস্পর্শে যে কেহ আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন। তিনি ধনে, মানে, জ্ঞানে অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার অহঙ্কার কখনও ছিল না। তাঁহার সামাজিক ব্যবহার খুব অমায়িক ছিল। দরিদ্রের গৃহে তিনি যাইতেন, তাহার খবর নিতেন,

বিপদে সাহায্য করিতেন এবং কখনও দরিদ্র বলিয়া কাহারও প্রতি অবহেলা বা উদাসীনতা প্রকাশ করিতেন না। সকলেই তাঁহার ভালবাসায় এবং সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল। ধর্ম্ম জীবনের দীনতা স্বীকার করা তাঁহার আর একটী প্রবল গুণ ছিল। ধর্ম্মের অহঙ্কার অনেকেরই থাকে। তাঁহার তাহা কখনও ছিল না। ধর্ম্ম সাধনে তিনি নিজেকে খুব দীন বলিয়া মনে করিতেন এবং বলিতেন। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিতে ও উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেও তিনি অগ্রসর হইতেন না। তিনি নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করিতেন। অন্যের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন, ধর্ম্ম আলোচনাতে যোগ দিতেন এবং ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের সাহায্য করিতে তিনি সকল সময়ে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উদার ছিল। কাহাকেও কোন কথার কূট অর্থ করিতে দেখিলে তিনি বলিতেন "তোমরা কেন এমন মনে কর, তাহার মনে হয়ত ভাল ভাব ছিল। ভাল ভাবেই কথাটী গ্রহণ করনা কেন? না জানিয়া কাহাকেও দোষী করা ভাল নয়।" একবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি লইয়া তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী ভয়ঙ্কর মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। তিনি যখন শুনিলেন, বিপক্ষ পীড়িত,তখন তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তিনি দেখা করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। দেখিলাম, বন্ধুভাবে তিনি তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং পীড়িত অবস্থায় বাস করিবার জন্য তাঁহাকে নিজের এক খানা ঘর দিতে প্রস্তাব করিলেন। অবশ্যই তাঁহার বিপক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শুনিয়াছি,মোকর্দ্দমায় পরাজিত হইয়া বিপন্ন হইলেও,তিনি তাঁহাদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ উদারতা অল্পই দেখা যায়।

অর্থ উপার্জ্জন অনেকেই করিতে জানে, কিন্তু অর্থের ব্যবহার করিতে সকলে জানে না। অর্থ ব্যবহার দ্বারা লোকের জীবনও চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাত্রামোহনবাবু যেমন বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমন অর্থের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। তিনি দেশের কল্যাণের জন্য অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের সাহায্যেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কত জন তাঁহার অর্থে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, কত পরিবার তাঁহার সাহায্যে প্রতিপালিত হইয়াছে,তাহা বলা কঠিন। সাময়িক সাহায্য ত অনেকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরের জন্য যেমন তিনি মুক্তহস্তে অর্থের সদ্ব্যয় করিতেন, নিজের পরিবার পরিজনের জন্যও অর্থ ব্যয়ে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাঁহার সন্তানদের শিক্ষা দানের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার দুই পুত্রকে ইংলণ্ডে শিক্ষা দান করিবার জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। টাকার কথা কখনও চিন্তা করিতেন না। যাহাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতেন। এদেশেও পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা পরিবার পরিজনের সুখ সুবিধা এবং সন্তানগণের সুশিক্ষা দানের জন্য অর্থ ব্যয় করাকে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন।

বাবু যাত্রামোহন সেন সৌভাগ্যশালী

পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনে শোক দুঃখের অভাব ছিল না। অসময়ে স্ত্রীবিয়োগ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যার অকাল মৃত্যুতে, তাঁহার হৃদয়ে শোকের কঠোর আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত, পূর্ব্বে তাঁহার আর এক পুত্র শ্রীমান্ নীরেন্দ্রমোহন সেন ইংলণ্ডের ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। ইহাঁর শিক্ষার জন্য ৩০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া তিনি বলিতেন। এই বহু ব্যয় সাধ্য শিক্ষা সমাপন করিয়া সন্তানকে আর দেশে ফিরিয়া আসিতে তিনি দেখিলেন না। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে আর এক কন্যা কুমারী নলিনীবালা পরলোকে চলিয়া যান। ইনি যখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, হঠাৎ কলিকাতা নগরীতে দেহ ত্যাগ করেন। ইহাঁদের শোক বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার মস্তকে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল। তিনি এত কঠোর শোকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ধীর-ভাবে জীবনের পথে চলিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধীর শান্ত মন তাহা সহ্য করিলেও, তাঁহার রুগ্ন ভগ্ন দেহ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। অচিরেই তিনি শয্যাশায়ী হইলেন এবং পৃথিবীর সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া রোগ শোকের রাজ্য অতিক্রম করিয়া পরম পিতার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। সন্তানহারা জননীর ন্যায় ভাগ্য-হীন চট্টগ্রাম আজ তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি এই মহাপুরুষের মহত্ত্বের কাহিনী শেষ করিব। সে অতি পুরাতন কথা। অনেকেই তাহা জানেন না। ২৫ বৎসরের অধিক হইয়াছে, এই সহরের এক ব্রাহ্ম যুবক অতি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৮ দিনের এক শিশু পুত্র রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ পরলোক গমন করেন। শিশুর প্রতিপালনের ভার লইবার জন্য তাঁহার গৃহে আর কেহই ছিল না। কোনও আত্মীয়স্বজন আসিয়াও তাহার ভার গ্রহণ করিলেন না। বেতনভোগী ধাত্রী ও পাওয়া গেল না। শোকে অভি-ভূত, বিপদে নিষ্পেষিত এবং সহায় সম্বল বিহীন যুবক কি করিবেন, কোথায় যাইবেন স্থির করিতে অসমর্থ, এমন সময় যাত্রামোহন বাবু তাঁহার পর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতৃহীন শিশুর প্রতিপালনের কি ব্যবস্থা হইয়াছে। যখন শুনিলেন, কোন ব্যবস্থাই হয় নাই, বেতন দিয়া ধাত্রীও পাওয়া যায় নাই, তখন তিনি শিশুকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যুবক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি শিশুকে কি করিবেন। তিনি উত্তর করিলেন "কেন, সে আমার স্ত্রীর দুধ খাইবে এবং আমার গৃহে প্রতিপালিত হইবে। আপনি কি বলেন?" করুণার্দ্র হৃদয়ে, সাশ্রু নয়নে যুবক বলিলেন "অর্থের বিনিময়ে কোন ছোটলোকও তাহাকে দুধ দিতে প্রস্তুত নয়, আপনি যদি দয়া করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানের, দুগ্ধ-ভাগ করিয়া দেন, আমি আর কি বলিতে পারি।" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি ছোট লোক নই, আমি দিতে পারিব।" তিনি শিশুটীকে লইয়া গেলেন এবং অনেক দিন প্রতিপালন করিলেন।

পরলোকে যদি স্নেহের বন্ধন থাকে, যদি মিলনের সুযোগ থাকে, তবে সেই শিশু আজ এই মহাপুরুষ এবং তাহার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কারণ সেই মাতৃহীন শিশুও আজ পৃথিবীতে নাই; জননীর ন্যায় স্তন্য দান করিবার জন্য যে মহিয়সী নারী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তিনিও নাই এবং যাঁহার প্রভাবে, করুণার এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, আজ তিনিও স্বর্গে। কেবল বিপন্ন যুবক, বর্ত্তমান প্রবন্ধের বৃদ্ধ লেখক এখনও পৃথিবীতে আছেন, এই স্মৃতি সভাতে সেই দেব-চরিত্র মহাপুরুষের দেবত্বের সাক্ষী দিবার জন্য; আর আছে তাঁহার হৃদয়ে করুণার ছাপ, যাহা আজ উজ্জ্বলতর হইয়াছে এবং চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত করিতেছে। আজ আমি আমার তপ্ত অশ্রুধারা সহিত আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা এই মহাপুরুষের এবং তাহার সাধ্বী স্ত্রীর উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেছি।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

অবিশ্বাসী বন্ধু।

(W. Hood)

একদিন চোখে চোখে হয়েছিল দেখা,
ওহে বন্ধু মুখে মুখে হয়েছিল কথা;
অন্তরে ছিল না তার বিন্দু লেখা-জোখা,
ছিলনা একান্ত হাসি স্তব্ধ নীরবতা।
আঁখির মিলন নহে চোখে দেখা-দেখি,
কোলাকুলি নহে বন্ধু, প্রেম-আলিঙ্গন,
ভালবাসা নহে শুধু হাসি মাখামাখি,
প্রেম নহে পরস্পরে অশ্রু বিমোচন।
যা'হবার হয়ে গেছে সুদূর অতীতে,
মোদের কখনো যেন নাই পরিচয়।
এমন অনেক হয় দেখা-শুনা পথে,
আবার এমন কত ছাড়াছাড়ি হয়।
বিদায়—বিদায় বন্ধু, জনমের মত,
চোখে দেখা মুখে কথা—তা'ও নাহি হবে
জন্মশোধ তব প্রেম হইয়াছে গত,
মম প্রাণে তব স্মৃতি তিলেক না রবে।

বৃথা কথা বৃথা গাথা ব্যর্থ প্রণয়ের,
মুখে মুখে এতদিন যে ভালবেসেছি,
সব ভুলে যাও বন্ধু, হইয়াছে ঢের,
সে সকল ফিরে দিতে আজ যে এসেছি।
পারিতাম থাকিবারে আগের মতন,
তোমার অবজ্ঞা-হাসি ভুলিতাম যদি;
শত সান্ত্বনায় নহে সে ব্যথা মোচন,
অন্তর মাঝারে জ্বালা দগ্ধে নিরবধি।
মুখের আলাপ ছিল, তাও হল দূর,
যাও হে চলিয়া যাও, যথা মনে লয়;
আমিও যাইব চলি, কোন্ সে সুদূর,
তব সনে আর যেন দেখা নাহি হয়।
নাহি চাই স্বার্থভরা মিথ্যা ভালবাসা,
জন্মশোধ ঘুচে গেল তব প্রেম-আশা।

দরবেশ।

সূর্য্যকুণ্ড-লিপি।

প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে গয়া জেলা বিশেষ প্রখ্যাত, তাহা আমি পূর্ব্বেই বহুবার বলিয়াছি। গয়া নগরটিও বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্ম্মের লীলা ভূমি, তাহাও আমি পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। গয়া নগর সম্বন্ধে ডাঃ কানিংহাম ব্লক্, ফ্লীট, রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি মনিষীগণ আমূল আলোচনা করিতে ত্রুটী করেন নাই। কৃষ্ণদ্বারিকা, প্রপিতামহেশ্বর গায়ত্রীঘাট, সূর্য্যকুণ্ড, নৃসিংহদেবের মন্দির প্রভৃতি বহু স্থানে প্রাচীন প্রস্তর লিপি আঁটা আছে তাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ যথা স্থানে বিবৃত করিয়াছি। সূর্য্যকুণ্ডের প্রস্তর লিপি গুলির কথা অত্রস্থানে বলিব। সূর্য্যকুণ্ড লিপিতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১৮১৯ লেখা আছে; তাহা হইলে ইহা ১৮১৯—৫৪৩ = অর্থাৎ ১২৭৬ খ্রীঃ হয়। কিন্তু ৺ বাপুদেব শাস্ত্রী ও চীন দেশীয় পঞ্জিকাদির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ডাঃ কানিংহ্যাম বলেন যে ইহা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। সূর্য্যকুণ্ড পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর দেওয়া আছে। ইহা টিকারী রাজ ৺ মিত্রজীৎ সিংহের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার পশ্চিম পাড়ে একটি মন্দির আছে। প্রাচীরটি ২৯২ফিট × ১৫৬ফিট বেড়ে হইবে। সূর্য্যকুণ্ডে যে ২।৩টি প্রস্তর ফলক আছে তাহার লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গয়া সূর্য্যকুণ্ডস্থিত বুদ্ধ নির্ব্বাণের লিপি

ওঁ নমো বুদ্ধায়শুদ্ধায় নমো ধর্ম্মায় শর্ম্মণে নমঃ সঙ্ঘায় সিংহায় লঙ্ঘনায়ভবাম্বুধেঃ ॥ অগাধগুণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্ব-সৌখ্যেরলঙ্কৃতঃ ॥ সুবেশশ্চক্রমাদেশো বসেৎ পূর্ব্ব প্রদেশতঃ ॥২ তত্রাভবন্নরপতির্জ্জয়তুঙ্গ সিংহঃ শ্রীমানরাতি নৃপহস্তি ঘটৈকসিংহঃ অস্ত্রেচ শাস্ত্র নিচয়েচ বিচক্ষণাত্মা দাক্ষিন্য লক্ষণগণৈঃ পরিলক্ষিতশ্চ ॥৩ বাঞ্ছতোপিপ্রদানং সমধিকমখিলে যস্য লোকে সমন্তাৎ বৈলক্ষ্যাৎকল্প বৃক্ষঃ ক্বচিদগমদিবপ্রেক্ষ্য পৃথ্বীমুপেক্ষ্য। জৈত্রাদ্ খড়্গ প্রতাপাত্রি জগতিবিদিতোপ্যুত্তমো ভূপতীনাং তৈস্তৈঃ শ্লাঘৈর্গুণৌঘৈরনঘতর তনুর্যশ্চ নোতুন্নশক্যঃ ॥৪ শ্রীকামদেব সিংহোভূৎসূনুর্ভানু সন্নিভঃ। যোদান মার্গনবর্গেভ্যোহেলয়াহস্তিনোহয়ান্ ॥৫ কামঃ কাম্যতয়া নমস্যবসতোদেবঃ প্রতাপোদয়া দাসীৎসিংহ সমঃ পরাক্রমতয়া ধর্ম্মাবতারশ্চিরং। অস্মাদেব হি কারণ। ত্রিভূবনে যঃ খ্যাতকীর্ত্তির্মহাসাম্নান্নাম্বয় ধারিতেন ধরনীপালঃ কলানান্নিধিঃ ॥৬ স চচক্রনন্দ কভুজো জগতোহিতৈষী লক্ষ্মীপতিঃ ক্ষিতিপতিঃ পুরুষোত্তমশ্চ। নারায়ণঃ প্রকট এষতত্তনুজঃ শ্রীমান্বভূব পুরুষোত্তম সিংহ নামা ॥৭ মর্য্যাদা পরিপালিত ক্ষিতিতলো গাধোপিপাথোনিধিঃসাম্যং যেন চ নাপ্নুয়াৎপ্রবিদুষাতেজস্বিনা জাড্যবান্। সিংহোদীন মৃগান্তকোপ্য করুণশ্চন্দ্রঃ কলঙ্কাঙ্কিতো যেনাপ্যুত্তম বিক্রমেণ যশসা কান্তেনতুল্যোনতু ॥৮ সোহয়ং দ্রষ্টুমিবোত্তমং জিনপুরং যাতস্য পুণ্যাত্মনোরত্ন শ্রীদুহিতঃ সুতস্য চ তথা মানিক্যসিংহস্যহি। পুণ্যোদ্দেশ বশাচচকার রুচিংরাং শৌদ্ধোদনেঃ শ্রদ্ধয়া শ্রীমদ্গন্ধ কুটীমিমামিবকুটীং মোক্ষস্য সৌখ্যস্য চ ॥৯ অস্যাঃ সন্ততকান্তি শান্তনরকধ্বান্তা কৃতেঃ কান্তিবান্। শিক্ষা কোটি বিচক্ষণঃ স্বচহিতো ধিষ্টায়

নিষ্ঠাপরঃ পৃথিমণ্ডলমণ্ডনস্য চক্রমাচক্রস্তরাজ্ঞোগুরুর্বিখ্যাতঃ খলুধর্ম্ম রক্ষিত যতিঃ কর্ম্মান্তর নির্ম্মমে ॥১০ প্রখ্যাতং হি সপাদ লক্ষ শিখরিক্ষমাপাল চূড়ামণিং শীলৈঃ শ্রীমদশোকচল্লমপি যোনত্বা বিনীয়স্বয়ং অত্রচ্ছিন্দনরেন্দ্রমিন্দ্র সদৃশং ভ্রষ্টেমুনেঃ শাসনেস্থিত্যোদ্ধার মসৌ চকার পরমাশ্চর্য্যং কলৌদুর্জ্জয়ে ॥১১ * পূজাঃ পূজ্যতমস্য পঞ্চমগতৈ র্বাদৈস্তু সন্ধ্যং সদা রম্ভাসন্নিভ ভারিনীভিরভিতো চেটীভিরত্যদ্ভুতং নৃত্যন্তীভিরনঙ্গলঙ্গিমগতৈঃ গীতাদি রঙ্গৈরিমা যস্মাৎ সন্তি হি শাসনে ভগবতঃ সৎকার বিস্ফারিতাঃ। ১২ দিব্যাহার বিসারি সত্র বহনান্যত্রৈরবম্যাঃ প্রপাঃ প্রায়ঃ পণ্ডিতবৃন্দমণ্ডিতমিদঞ্চাখণ্ডিতং শাসনং অশ্রান্তং নব কর্ম্ম সর্ব্বত হ্ তঃ শ্রীচক্রবাড়ে যতো বুদ্ধানাং বিবিধানি সন্তি বহুধা কৃত্যান্য হোনিত্যশঃ ॥১৩ বন্দ্যঃ শ্রীবাসুদেবোচ্যুত বদতি মতোম (ন) ন্দিবংশাবতংসঃ খ্যাতঃ শ্রীজীব নাগস্তদনুগুণিবরস্তস্য পুত্রঃ পবিত্রঃ। পূতাং শস্তাং প্রশস্তিং দ্রুত তরমকরোৎ স্বল্পশস্তস্যসূনুঃ কোহপি শ্রীমঞ্জুনন্দী নিজকুল জলধা বিন্দুরানন্দ কন্দঃ ॥১৪ অলিখল্লেখকাধ্যক্ষ ইন্দ্রনন্দীতি সুন্দরঃ। রামেণশিল্পিনোৎকীর্ণ মভিরামেণ বর্ণতঃ ॥১৫ ভগবতি পরিনির্বৃতে সম্বৎ ১৮১৩ কার্ত্তিক বদি ১ বুধে ॥*

এই লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী বহু গবেষণাপূর্ণ বিবরণ ও সমালোচনী প্রবন্ধ দশমভাগ ইণ্ডিয়ান এন্টিকুরী পত্রিকার ৩৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

পিরোজ সাহের লিপি।

ফিরোজ সাহের লিপি :—ইহা কুলচন্দ্রের দ্বারা দক্ষিণার্ক বা দক্ষিণাদিত্য সূর্য্যের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ইহা সূর্য্যকুণ্ডে অবস্থিত আছে। ইহা সূর্য্যকুণ্ডের মধ্যস্থিত তিনটী শিলালিপির মধ্যে অন্যতম একটি হইতেছে এবং দেবনাগর সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত। ইহার বিষয় গটিঞ্জেনের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ কীলহর্ণ, ডাঃ ভগবানলাল ইন্দ্রজী, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনিষীগণ সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। ইহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"ওঁ গণপতয়ে নমঃ ॥ অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধ্যর্থং পুজিতো যঃ সুরৈরপি। সর্ব্ববিঘ্নমপহরতু তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ ॥ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। প্রসাদতো যস্য ধনান্ধকারৈর্বিযুক্ত নাথং কিলচক্রবাকী। ব্যপেত শোকা লভতে দিনাদৌ সদা স বঃ পাতু সহস্র ভানুঃ ॥ অসীম রাজ্যে নৃপ বিক্রমার্কে গতে গ্রহৈর্যুগ্ম যুগেন্দুকালে। ঢিল্লীপতি শ্রীপিয়রোজ সাহেভুবং সমাসাসতি বৈরিদাহে ॥ ভয়েতি বিত্তাত্মভুবা পৃথিব্যাংযদাখ্যয়া ব্রহ্মপুরীমনোজ্ঞা। নিবাস হেতোঃ খলু নির্জ্জরাণাম পোঢ়বিধ্বংসপথীন রানাং ॥ খ্যাতঃ ক্ষিতৌ

* এই সম্পূর্ণ লিপিটি Ind. Antiq. Vol. x ৩৪২—৩৪৭ পৃষ্ঠায় এবং মদ্বন্ধু বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটীক পত্রিকার ৫ ভাগ ৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

* Arch. Sur. Ind. Vol. III, P. 128
,, X ,, 341
Ind. Ant. Vol XX, 312—315.
Arch. Sur. Ind. Vol III P. 129
,, ,, XI ,, 185
,, ,, VIII ,, 75
,, ,, IV ,, 366
Alberuni's India ,, II. ,, 314

ক্ষত্রিয় বীরধীনঃ শ্রীব্যাঘ্ররাজান্বয় (যাত) শূরঃ॥ ডালেতি নাম্না দিশি পশ্চিমা যাম-শ্রান্ত রাজণ্যগণাশ্রিতায়াং॥ তস্যান্বয়ে জাত উদার কীর্ত্তিঃ শ্রীরঙ্গপাদার্চ্চন পুণ্যমূর্ত্তিঃ। পূজ্যঃ সদামান ভৃতাং যশস্বী শ্রীহেমরাজঃ সদয়ো বিবেকী॥ তস্যাত্মজো নীতি বিচার দক্ষঃ সদৈব পুরাণার্থি জনাভিলাষঃ। গয়াধি-কারী সুকৃতী মনীষী কুলাবলম্বী কুলচন্দ এষঃ॥ গয়েতিস্বদ্বার কপাটভেদী অমোক্ষ ভাজামপি মোক্ষদায়ী। সদাক্ষপার্কস্য বিশুদ্ধ বুদ্ধিশ্চকার কীর্ত্তিং বহু কীর্ত্তিনাথঃ॥ সুরাল যং য কুরুতে প্রশস্তং চিরায় ভুংতেঽমুথং নরেশঃ। সমং স দৈব ত্রিদশাংঙ্গনাভিরপাপ দেহো দিবি মোদতে সঃ॥ করোতু কল্যাণ মলং দিনেশশ্চিরং সবৈয়াঘ্রন নৃপস্য বংশে। হতং তমোযেন সহস্র ধাম্না কৃতা প্রশস্তিঃ শিরিসেন নাম্না॥ সরল লিখনং যথা॥ পরম-ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্বিক্র-মাদিত্য দেব নৃপতেব্যতীতাব্দে সম্বৎ ১৪২৯ মাঘ কৃষ্ণাত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শনিবাসরা-ন্বিতায়াং পুনরসীম পৌরুষেত্যাদি সফল বিরুদরাজি বিরাজমান পাশ্চাত্য সুরতরাণ (ত্রাণ) শ্রীপিয়রোজ * সাহ-রাজ্যে। শ্রীমদুদণ্ডপুর দেশে। দক্ষিণাগারি সম্বন্ধি। শ্রীমদ্ গয়াক্ষেত্রে পরম বৈষ্ণব ক্ষত্রিয়ঠাকুর শ্রীডালা পৌত্রেণ ঠাকুর শ্রীহেমরাজ পুত্রেণ ব্যাঘ্ররাজ পদতি শালিনা ঠাকুর শ্রীকুলচন্দ কেন গৃহ্নী (হী) ত গয়াধিকারেণ পুণ্যবতা সকল পুণ্যাভি বৃদ্ধয়ে মাতৃ পিত্রোরাত্মনশ্চ শ্রীমদ্ ভট্টারক শ্রী দক্ষিণাদিত্যস্য পতিতা কীর্ত্তিরুদ্ধৃতা॥ লিখিত মিদং গয়া শাসনিকেন ঠ (ঠাকুর) শ্রীকরার্পসেনসূনুনা শ্রীমতা শ্রী সেনেতেতি॥ সূত্রধারোঽস্য হরিদাস নামা॥ শুভমস্তু সর্ব্বজগতঃ পরহিতনিরতা ভবন্তু ভূত গণাঃ। দোষাঃ প্রযান্তু নাশাং সর্ব্বত্র সুখী ভবতুলোকঃ। অর্থাঃ পাদবজোপমা গিরি নদী বেগোপমাং যৌবনাং মানুষ্যং জল-লোল বিন্দু চপলং স্নেনোপমং জীবিতং। ধর্ম্মময়ো ন করোতি নিশ্চল মতিঃ স্বর্গার্গলো-দ্ঘাটনং পশ্চাত্তাপহতোজরা পরিণতঃ শোকাগ্নিনাদগ্ধহ্যোতে সিদ্ধিরস্তু কার্য্যে সতামিতি॥

এই লিপিসম্বন্ধে পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী বলেন "what is stated before in verse is repeated in a plainer and more business-like manner in prose in lines 6 to 8. Here we are told that on a certain date which will be given below, in the reign of the western Suitan Piyaroja Shaha, conspicuous by his *birudas* Aspimapaurusha (অসীম পৌরুষ) and so forth, the Thacur Kulachandaka who held the post of Governor of Gaya, who followed in the foot-step of the prince Vyaghra, and was the son of the Thakoora Hemraja and a son's-son of the Ksha-triya, the Thakura Daua, a de-cendant and devout worshipper of Vishnu at the sacred place of Gaya, belonging to Dakshinagara in the country of Udandapur, restored the holy temple of Dakshinaditya which had fallen into despair. The prose portion states besides that this inscription was written by the শাসনিক of Gaya. শ্রীসেন (whom I take to be the person *Sirisena* above) a son of the Kayestha, the Thakur Karnasena; and that the architect employed on the repair of the temple was Haridasa. The localities mentioned in the inscription are beside Dhili (i. e. Delhi), Gaya, Dakshi agara and the country of Uddanpur. Of these Delhi and Gaya are well known; the word Dakshinagara denotes very probably the district in which Gaya is sitnate. Udandapur or more correctly spelt Uddandapura, should perhaps have been Otantapur of Taranath's account of the Magadha kings. Sir A. Cunnigham was of opinion that this town might be the present Tandwa or Bishnupur Tandwa about 15 miles east of Gaya. Later, however, he has adopted Mr. Beglar's suggestion that, upto the time of Muhammaden conquest, Uddandapur was the proper name of the town of Behar, in the Patna District of Bengal, which is said to be still * known as Daud Bihar".

* প্রাচীন উদ্দণ্ডপুরের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কোন কোন প্রতত্ত্ববিদ্ বর্ত্তমান বিহার ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন প্রদেশকে উদ্দণ্ডপুরের স্থান বলিয়া নিরূপনকরেন, এবং ডাঃক্যানিংহ্যাম প্রমুখমনিষী-গণ গয়া হইতে ১৩।১৪ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তি বিষ্ণু পুর টাঁড়োয়া হইবে। তারানাথেরও ঐ মত। (Ind. Ant vol. XX 312-15,) তারানাথকৃত মগধেরপাল রাজগণের ইতিহাস ও গয়ার কতকগুলি বিশিষ্ট ২ স্থানের শিলালিপির বিষয় আমি যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

কাপ্তেন কীটোর মতে ইন্দ্রশীলাগিরি বিহার নগরের আসন্ন গিরিয়কগ্রামের সন্নিকট পর্ব্বতরাজি হইতেছে। তাহার অনতিদূরে নালন্দ সংঘারাম অবস্থিত ছিল। নালন্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে বৌদ্ধ যুগ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ডাঃ আলেক্জাণ্ডর কানিঙ্গহাম (Dr. Alexander Cunningham C. S. I.) তাঁহার প্রথম ভাগ আর্কিওলজিকাল সার্ভে রিপোর্টে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি গবেষণাপূর্ণ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার।

* Ind, Antq. Vol XX, p 312-15
Arch. Surv. Ind. Vol III, p 129
" " " V, 41 p 75.

গান।

১

অরূপ-রাজের রূপ সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব্ দে!
গোপন প্রাণের তৃষাটুকু
মিটিয়ে নে রে মিটিয়ে নে!
নাচিস্ নে আর ঢেউএর তালে তালে,
ভাবিস্ নে রে, লিখন কি তোর ভালে,—
শুনিস্ নে রে ওরে চপল!
বল্‌ছে কিবা কে!—
অরূপ-রাজের রূপ-সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব্ দে!

২

তরুণ উষা হিরণ-ভূষা
ভরা পাখীর গীতে!
সুধার ধারা উছলে পড়ে
ফুলের হাসিটীতে!
সুনীল নভে অনিল তুলে লহর কত শত,
শারদ-রাতে জ্যোছনা ঝরে
'পাগ্‌লা ঝোরা' মত,—
সকল কিছুর মাঝে, ওরে!
লুকিয়ে আছে যে!—
(সেই) অরূপ-রাজের রূপ, সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব্ দে!

৩

আপনা টুকু হারিয়ে ফেল্
চির-আপন পদে!
ভুলিস্ নে রে মজিস্ নেরে
বিফল-মোহ-মদে!
হবেই হবে ডুব্‌তে যখন তোর,
ফরিস্ কেন মধুর নিশি ভোর,—
হারাস্ নে রে এমন সুদিন
কূলের পানে চেয়ে!
অরূপ-রাজের রূপ-সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব দে!

৪

কূলে বসি গাঁথ্‌বি কত
জলের কলরোলে!—
অতল-তলে হারিয়ে যারে
সাগর-রাজের কোলে!
কত জনম যাচ্ছে চলে এমনি করে,
কিসের মায়ায় আছিস্ তুই আশা ভরে,—
ওরে বিভল! ভরসা তোর
টুট্‌ছে পদে পদে!
অরূপ-রাজের রূপ-সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব্ দে!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

মহাভারত মঞ্জরী(১)।

(মহাভারত অবলম্বনে লিখিত)

আদিপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়—সূচনা।

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"—মহর্ষি বেদব্যাস আবিষ্কৃত অত্যুজ্জ্বল আলোক। তিনি তাহা সহ কত পুরুষ ও রমণীকে ভারতে পাঠাইয়াছেন। জীবন-পথে চলিতে চলিতে পথিক যখন ঘোর অন্ধকার রজনীতে দুর্দ্দান্ত ষড় সহোদর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সেই পুরুষ ও রমণীগণ সেই আলোক দ্বারা পথ হারা, দিক্‌হারা পথিককে পথ দেখাইয়া দেয়। এস কল্পনে, একবার মানস-চক্ষে সে সকল দেখি—যদি আমরাও পথ পাই।

একদিন ভারতে কত তপোবন ছিল! তথায় কত মুনিঋষি, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সুখে ও স্মিতবদনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের আলোচনায় জীবন যাপন করিতেন। নৈমিষারণ্যেও এইরূপ একটী পবিত্র তপোবন ছিল (১)। তথায় বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ মহর্ষি শৌনক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা দেখিবার জন্য কত মুনি আসিতেছেন। একদিন সূতকুলের (২) মহর্ষি সৌতি আসিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাম উগ্রশ্রবা। সকলে তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি সুখে উপবিষ্ট হইলে, সকলে তাঁহার নিকট আশ্চর্য্য কথা শুনিতে চাহিলেন। তিনি মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন —

"এই ভারতে এক ধীবরের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল(৩) তাহার নাম মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী। তাহার কুমারী কালে একটী পুত্র হয়। জননী সেই শিশুকে তাহার পিতা পরাশর ঋষির আশ্রমে পাঠাইয়াদেন। তাহার কৃষ্ণবর্ণ ও যমুনানদীর মধ্যে এক দ্বীপে জন্ম হয় বলিয়া, তাহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হয়। এই বালক কালে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। বেদ বিভাগ করিয়া "বেদব্যাস" উপাধি-ভূষিত হন।

"তিনিই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পর, তিন বৎসরের অকাতর পরিশ্রমে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন(৪)। তিনি তাহা তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন। রাজা জনমেজয় যখন সর্পযজ্ঞ করেন, তখন বৈশম্পায়ন এই মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি তথায় উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছিলাম। তাহাই আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি। তাহাপেক্ষা মনোহর ও আশ্চর্য্য কথা আর কোথায় পাইব?

"পুরাকালে এই দেশে ভরত নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পুত্র। তাঁহার নাম হইতেই এ দেশের নাম ভারতবর্ষ। তাঁহার বংশের, ভারতবংশের মহৎ বৃত্তান্ত এই মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত। এই নামের অন্য কারণও আছে। ইহা মহত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষাও অধিক. সুতরাং মহত্ব ও গুরুত্ব হেতুও ইহা মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ(৫) ইহা পঞ্চম বেদ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে লক্ষ শ্লোক আছে। বেদব্যাস, মহাভারতে ঈশ্বর, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জ্ঞান, যোগ তপস্যা, বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ, দর্শন পুরাণ উপন্যাস ইতিহাস, অর্থ-রহস্য রাজনীতি সমাজনীতি, তীর্থ ভূগোল ভবিষ্য, যুদ্ধবিদ্যা স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের সার প্রদান করিয়াছেন। তিনি অগাধ জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত পাইয়াছেন, তাহা মহাভারতে রাখিয়াছেন। তিনি ইহাতে পঞ্চপাণ্ডবের সত্যনিষ্ঠা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের দুর্ব্বৃত্তা বর্ণন করিয়াছেন (৬)। দেখাইয়াছেন—ধর্ম্মের পরিণাম উন্নতি আর অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অধোগতি। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন বিপুলকায়া গঙ্গা যমুনা সম্মিলিত হইয়া, নির্ম্মল সলিল দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছে, আর সমস্ত দেশ উর্ব্বর ও উন্নত করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে; মহাভারতেও যেমনি অনুপম কাব্যরস শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে, আর বহুবিধ জ্ঞান তাহার হৃদয় ও মন উচ্চ ও উদার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। কোকিলের কূজন শুনিয়া কাকের কর্কশ কলরব যেমন শুনিতে ইচ্ছা হয় না, তেমনি মহাভারতের পুণ্য কথা শ্রবণ

(১) বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌর উত্তর পশ্চিম দিকে নৈমিষারণ্য ছিল।

(২) ক্ষত্রিয় পিতা ব্রাহ্মণী মাতা। সংস্কৃত মহাভারত, বঙ্গবাসী আফিস হইতে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৮৩০ সংস্করণ। অনুশাসন-পর্ব্ব ৪৮—১০

(৩) দাশ বা ধীবর কন্যা। উদ্‌যোগ পর্ব্ব ১৭৩—১।

(৪) আদিপর্ব্ব ৬২—৪১।৪২।৫২ ॥ ১—৯৬।৯৭। যে দিন ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন, সেই দিন কৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় জানিবেন, কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে" (শল্যপর্ব্ব ৬০—২২)। স্কন্দ-পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে যুধিষ্ঠিরের কাল, কলির পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৭, পৃঃ ২৪৭)। কাশ্মীর ইতিহাস রাজরঙ্গিনী প্রণেতা কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, কুরুপাণ্ডবের জন্ম হয় (রাজতরঙ্গিনী, ১ম তরঙ্গ)। তাহা হইলে বেদব্যাস, কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব কলিযুগের লোক, মহাভারত কলিযুগে রচিত হয়, কলিযুগেরই বিষয় বর্ণনায় পূর্ণ এবং কলিযুগেরই ধর্ম্মশাস্ত্র।

(৫) আদিপর্ব্ব ৬২—৩৯।১—২৭২।২৭৩।২৭৪ ॥

(৬) আদিপর্ব্ব ১—১০০।১০১। পঞ্চপাণ্ডব যে সত্যপরায়ণ এবং দুর্য্যোধনেরা যে পাপাত্মা, তাহা মহাভারতের প্রথমেই আছে।

করিয়া, আর কিছুই শুনিতে ইচ্ছা হয় না। এই ইতিহাস-প্রদীপ সত্যই মোহরূপ তমোরাশি নাশ করিয়া অখিল ভুবনরূপ গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।"

এইরূপে সৌতি মহাভারত কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা মহাভারতের মহাবনে বিচরণ করিয়া যে ফুলটী, যে পত্রটী মাতৃপূজায় লাগিবে বুঝিয়াছি, তাহা অতি যত্নে চয়ন করিয়াছি। যাহা নানা স্থানে ছিল, তাহা একত্র সাজাইয়াছি। আর মনের বন হইতে দুর্ব্বাদল তুলিয়া তাহাকে সংযোগ করিয়া দিয়াছি। এইরূপে তাম্রপাত্র পূর্ণ করিয়া আনিয়াছি। এ দীনহীনের হস্তের পুষ্পপাত্র, পূজায় লাগিবে কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম।

সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। বর্ত্তমান দিল্লীর মধ্যস্থলে যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে যে রমনীয় নগরী ছিল, তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গঙ্গাতীরে যে অতি সুন্দর, অতুলনীয় হস্তিনাপুর মহানগরী ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে (৭)। উভয়ই ভারতবক্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তথাপি তাহাদের ধূলিময় স্মৃতি আজও পর্য্যটকের প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে। হস্তী নামক ভরত বংশীয় জনৈক মহারাজা সেই হস্তিনাপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বংশে কুরু এবং কুরুর বংশে শান্তনু নামে প্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনুর প্রথম রাণী গঙ্গাদেবীর গর্ভে ভীষ্মদেব ও দ্বিতীয় রাণী সত্যবতীর উদরে চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রবীর্য্য নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ভীষ্মদেব জ্যেষ্ঠ হইলেও পিতার মৃত্যুরপরে নিজে রাজা না হইয়া চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিলেন। অল্পদিনের পরেই তিনি যুদ্ধে নিহত হইলেন। তখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিলেন। তিনিও অকালে পঞ্চত্ব পাইলেন। তৎপরে তাঁহার দুই রাণীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং দাসীর গর্ভে বিদুর উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা বেদব্যাস জনিত রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ সন্তান। ভীষ্মদেব তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে বেদাদি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যৌবনে উপনীত হইলেন (৮)। তখন ভীষ্মদেব ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারদেশের রাজা শকুনির ভগিনী গান্ধারীর সহিত বিবাহ দিলেন (৯)। গান্ধারী এতই পতিব্রতা ছিলেন যে যখন তিনি শুনিলেন, তাঁহার স্বামী জন্মান্ধ, তখন তিনি বস্ত্রদ্বারা স্বীয় চক্ষুদ্বয় আবদ্ধ করিলেন, স্বেচ্ছায় অন্ধ হইলেন (১০)। স্বামী যে সুখে বঞ্চিত, সে সুখ তিনি কিরূপে ভোগ করিবেন? পরে ভীষ্মদেব পাণ্ডুকে কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত পরিণীত করিলেন। কুন্তী কৃষ্ণের পিসি। মাদ্রী বাহ্লীক দেশের অন্তর্গত মদ্রনগরের অধিপতি শল্যের ভগিনী (১১)। তৎপরে ভীষ্মদেব রাজা দেবকের শূদ্রানীর গর্ভজাত কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ দিলেন (১২)। তাঁহারা সকলেই যুবক যুবতী। ভারতে তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না (১৩)। ভারতে তখনও বালখিল্যদলের আবির্ভাব হয় নাই।

ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও জন্মান্ধ, রাজ্য পাইতে পারেন না। এজন্য সকলে মিলিয়া পাণ্ডুকে রাজা করিলেন। তিনি শৌর্য্য বীর্য্যে দৃপ্ত হইলেন। বিদুর কৌরব বা কুরুবংশীয় ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা বলিয়া মহাভারতে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছেন (১৪)। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধবয়সেও বৃদ্ধ বিদুরকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে "ভাই ভাই" বলিয়া কত সমাদর করিয়াছেন (১৫)। অতি অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন পর্য্যন্ত তাঁহার চরণ যুগল বন্দনা করিয়াছেন (১৬)। পূর্ব্বে, ভারতে বর্ত্তমানের ন্যায় জাতিভেদ ছিল না (১৭)। বিদুর মহাধর্ম্মপরায়ণ, বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বুদ্ধিতে মহাপ্রাজ্ঞ ও কুরুকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন (১৮)। পূর্ব্বে শিক্ষার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল (১৯)। বিদুর চরিত্র-গৌরবে সাধু ও সজ্জনগণেরও বরেণ্য ছিলেন।

রাজা পাণ্ডু অনেকদিন রাজ্য শাসন করিলেন। বহুদেশ জয় করিয়া বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। বিজিত দেশ হইতে বহু ধনরত্ন আনিয়া হস্তিনাপুরের কোষাগার পূর্ণ করিলেন। পরে দুই রাণীকে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে বনবিহার করিতে লাগিলেন। তথায় একদিন ঋষিরা বলিলেন—"এই দুই রাণীর গর্ভে নিষ্পাপ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে" (২০)।

কিছুদিন পরে ঋষিগণের কথা ফলিল। হিমালয় প্রদেশের এক পবিত্র তপোবনে কুন্তীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম বা বৃকোদর ও অর্জ্জুন বা ধনঞ্জয় এবং মাদ্রীর গর্ভে যমজ নকুল সহদেব,—পাণ্ডুরাজের এই পঞ্চ ক্ষেত্রজপুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা হিমালয়েই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এমন সময় পাণ্ডুরাজের মৃত্যু হইল। মাদ্রী তাঁহার অনুগমন করিলেন। কুন্তীদেবী এখন পঞ্চশিশু সন্তান লইয়া দুঃখের সাগরে ভাসিলেন।

ঋষিরা তাঁহাদিগকে হস্তিনায় লইয়া আসিলেন। এখন যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর রাজ্যের অধিকারী। কিন্তু তিনি বালক। কাজেই ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইলেও রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। বিদুর সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী (২১) তাঁহার নিম্নে সঞ্জয় সর্ব্বপ্রধান অমাত্য। সঞ্জয়, সূত

(৭) দিল্লী হইতে প্রায় ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুরের আনুমানিক ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India, I—123.

(৮) আদিপর্ব্ব ১০৯ অধ্যায়।

(৯) গান্ধারকে এখন কান্দাহার বলে। তাহা আফ্‌গানিস্থানের মধ্যে।

(১০) আদিপর্ব্ব ১১০—১৪।

(১১) আদিপর্ব্ব ১১৩—২।৩। বাহ্লীক-দেশ এখন বল্‌ক নামে প্রসিদ্ধ। তাহা আফগনিস্থানের উত্তরে অবস্থিত।

(১২) আদিপর্ব্ব ১১৪—১২।

(১৩) এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'যৌবন বিবাহ' দ্রষ্টব্য।

(১৪) উদ্‌যোগপর্ব্ব, ৮৬—৭॥ বনপর্ব্ব, ৬—৫। ২৫॥ আদিপর্ব্ব, ১০৬—২৮।।

(১৫) বনপর্ব্ব ষষ্ঠ অধ্যায়।

(১৬) বনপর্ব্ব, ২৫৬—৭৮।।

(১৭) এ সম্বন্ধে এ গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে "জাতিভেদ" দ্রষ্টব্য।

(১৮) আদিপর্ব্ব ১০৯ অধ্যায়। সভাপর্ব্ব, ৭৩—১৫॥ ৪৯—৪৩॥ ৫০—১০।১১॥

(১৯) এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে "শিক্ষা" দ্রষ্টব্য।

(২০) আদিপর্ব্ব, ১২০—২৪। পঞ্চপাণ্ডব যে নিষ্পাপ তাহা এইরূপে মহাভারতের প্রথমেই বলা হইয়াছে।

(২১) সভাপর্ব্ব, ৪৯—৪৩॥ ৭৩—১৫॥

কুলোৎপন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ ও মহা প্রাজ্ঞ। মহাভারতে আছে, "মহাভারতের কূটশ্লোক সকলের অর্থ বেদব্যাস জানেন, তাঁহার পুত্র শুকদেবও জানেন, আর সঞ্জয় জানেন কি না সন্দেহ।" এই বলিয়া সঞ্জয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীদেবীর গর্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শতপুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যা এবং বৈশ্যদাসীর গর্ভে যুযুৎসু নামে পুত্র জন্মিয়াছে। বিদুরেরও অনেক পুত্র হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। ভীম ও দুর্য্যোধন এক দিনেই ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহারা সকলেই কুরুবংশীয়। তথাপি পরিচয়ের নিমিত্ত কেবল পাণ্ডুর পুত্রগণ পাণ্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র প্রভৃতি আর সকলেই কৌরব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতঃপর তাঁহার দুঃশলা তনয়াকে সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

এখন হইতে পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণ সকলে মিলিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভীম সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। তাঁহাকে দুর্য্যোধনেরা শত ভ্রাতায়ও পরাস্ত করিতে পারেন না। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কত স্নেহ! কত ভালবাসা! মানুষ কি বিচিত্রপ্রাণ! এত ভালবাসিতেও কেহ জানে না, এত কলহ করিতেও কেহ পারে না (২২)।

অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অত্যন্ত আবশ্যকতা হইলে সকল দেশেই এইরূপ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের যে শাখা ইউরোপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহাদের মধ্যেও নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রীশ দেশীয় স্পার্টাবাসীরা দীর্ঘকালব্যাপী এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তাহাদের জন-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হয়। এজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত স্পার্টার রাজকীয় সিনেট সভা যুবকদিগকে যে কোন রূপে পুত্রোৎপাদন করিতে অনুমতি দেন এবং এইরূপে পুত্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হয় (Taylor's Anctient History p. 184)। বিগত মহাযুদ্ধে ইউরোপের জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় এই সমস্যা পুনরায় উপস্থাপিত হইয়াছে। এ দেশেও মহাবল পরশুরাম ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। তখন দেশোপকারার্থ যুদ্ধকুশল, দেশরক্ষক সেই ক্ষত্রিয়গণের সংখ্যা যে কোনরূপে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। বৈধ ও অবৈধ, কি উপায় দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা আমরা এই গ্রন্থের ভীষ্মপর্ব্বে গীতার সূচনায় আলোচনা করিব। অধিক কি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যেও নিয়োগপ্রথা ছিল। প্রথমে ২০ প্রকার পুত্র ও তদ্‌পরে ১২ প্রকার পুত্র প্রচলিত ছিল [অনুশাসন পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায় ও মনুসংহিতা ৯—১৫৯ (১৬০)] জন সংখ্যার আধিক্যহেতু পরে কেবলমাত্র দুই প্রকার পুত্র অবশিষ্ট থাকে। এখন দরিদ্রতা ও মৃত্যু যে রূপ কার্য্য করিতেছে, তাহাতে আশা হয়, এই দ্বিবিধ পুত্রও শীঘ্র লুপ্ত হইবে। তখন কেবা লিখিবে? কেইবা দোষ ধরিবে?

(২২) ক্ষেত্রজ পুত্র, সমাজের কোন কোন

তৃতীয় অধ্যায়।—ভীমের জীবন নাশের চেষ্টা।

কুন্তীদেবী বিলাস ও বিরাম পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণের লালন পালন করিতেছেন; ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দেবী প্রভৃতি গুরুজনের পরিচর্য্যায় রত রহিয়াছেন। সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।

ক্রমে দুর্য্যোধন জানিতে পারিলেন, এ রাজ্য, এ ঐশ্বর্য্য সকলই পাণ্ডুর; যুধিষ্ঠির তাহার অধিকারী। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি আমরা, শতাধিক ভাই হইয়াও, কেবল মাত্র কতিপয়ের পদানত

হইয়া থাকিব? কতিপয়ের অনুগ্রহে জীবন যাপন করিব? শুধু সংখ্যায় যে কিছু আসে যায় না, তাহা তিনি বুঝিলেন না। আমরাও বুঝি কৈ? ক্রমে সকল ভ্রাতাই পাণ্ডব-বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধন তখন দুঃশাসন ও মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, মহাবল ভীমকে নিহত করিয়া, তাহার চারি ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজা হইবেন। তখন দুর্য্যোধন পিতার অনুমতি লইয়া সমুদয় ভ্রাতার সহিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতে গেলেন।

গঙ্গাতীরে মনোহর গৃহ ও বিহার-উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই গৃহ মধ্যে জল যন্ত্র সকল জল সঞ্চারণ করিতেছে (২৩)। দুর্য্যোধন আজ ভীমের সহিত অভিন্ন দেহে, অভিন্ন হৃদয়ে আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছেন, আর স্বহস্তে কত মিষ্টান্ন ভীমের মুখে দিতেছেন। তৎপরে তাঁহাকে জলক্রীড়া করিতে গঙ্গায় লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ভীম অচেতন হইয়া সৈকতে শয়ন করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভীমের হস্তপদাদি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া গঙ্গার গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। ভ্রাতৃগণ-সহ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ভীম গৃহে যায় নাই। তখন তাঁহারা বলিলেন, "তবে সে বিনষ্ট হইয়াছে।" অমনি কুন্তীদেবী কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া দীনবন্ধু বিদুর ছুটিয়া আসিলেন। সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "চিন্তা নাই, ভীম নিরাপদে ফিরিয়া আসিবে। তোমরা ইহা লইয়া আর আন্দোলন করিওনা, তাহা হইলে দুর্য্যোধন আবার তোমাদের অনিষ্ট করিবে।"

কএক দিনের পরেই ভীম হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া জননী ও ভ্রাতৃগণের আনন্দের অবধি রহিল না।

আর দুর্য্যোধন? তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়, হায়! এমন কালকূট বিষ, এমন খরতর স্রোত, সকলই বিফল হইল! মকর কুম্ভীর কোথায় রহিল? জল যে বিষের ঔষধি, তাহা তাঁহার মনে হইল না।

দুর্য্যোধন দমিবার পাত্র নন। আবার তিনি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিলেন। আবার তাহাতে অতি তীক্ষ্ণ বিষ দিলেন। যুযুৎসু ভীমকে তাহা বলিয়া দিলেন। তথাপি ভীম সাবধান হইলেন না। তিনি দুর্য্যোধনের আত্মীয়তায় ভুলিয়া সেই বিষান্নও রাশি রাশি আহার করিলেন। কিন্তু জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধন নিদ্রিত ভীমকে কালসর্প দ্বারা সর্ব্বশরীরে দংশন করাইলেন (২৪)। তাহাকেও ভীম মরিলেন না। তথাপি দুর্য্যোধনের জ্ঞান হইল না। হইবে কিরূপে? ষড়রিপু যে তাঁহাকে ধরিয়া নৃত্য করিতেছে, আর বলিতেছে, "আমরাই কাঁধে করিয়া তোমাকে সিংহাসনে তুলিয়া দিব।"

এখন হইতে ভীম অসাধারণ বলবান হইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন—দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণের সহিত সতত পরামর্শ করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ যতই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, ততই বিদুর নিরপরাধী পঞ্চ-পাণ্ডবের পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে সময়ে সাবধান করিয়া, সাহায্য দিয়া, সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন, রাজার কোপানলে পড়িয়া যে সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, তাহা বিদুর একবারও ভাবিলেন না। মহাপুরুষের লক্ষণ এই। প্রবল যে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, তাহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা সতত নিরপরাধী দুর্ব্বলের পক্ষপাতী। তাঁহারা স্বার্থ বুঝেন না, নিজের হিতাহিত ভাবেন না, দেখেন কেবল পরহিত, দেশহিত। একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই তাঁহাদের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। আবার যেদিন এদেশে এই মহোচ্চ আদর্শ আসিবে, সেইদিন হইতে এদেশ উন্নত হইতে আরম্ভ করিবে; তাহার পূর্ব্বে নয়, পূর্ব্ব নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

(২৩) আদিপর্ব্ব ১২৮—৪০।

(২৪) আদিপর্ব্ব ১২৯—৩৭।৩৮॥৬১—১৩৭॥

বঙ্গসমাজ।

(১)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ।
মুখে ভাষা মিঠে কথা,
অন্তরে গরল গাঁথা,
সরলতা উদারতা মরিচীকা সাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(২)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ।
করে ধরে বুকে টানি,
পিছু ফিরে (ই) কানাকানি,
ভ্রাতা ভগ্নি ভালবাসা ছল-মাথা সাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতেও লাজ।

(৩)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
নিরীহ যে সত্যপ্রিয়
শান্তশিষ্ট নম্র রয়,
বিদ্রূপের পাত্র সে যে সমাজের মাঝ,
আপন ঘরে কথা কহিতে ও লাজ।

(৪)

হায়রে এ পোড়াবঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
কাঙ্গাল হইলে তার
নিস্তার নাহিগো আর
অপমান পদাঘাত সে অঙ্গের সাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে ও লাজ।

(৫)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
মেয়েটী বয়স্থা প্রায়,
হয়েছে যাহার হায়,
সর্ব্বনাশ, কি হইবে প্রতিপদে ত্রাস,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(৬)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
দীন হীন ঘরে কন্যা
পিতার বক্ষেতে বন্যা
দিনরাত শান্তিহীন মাথে পড়ে বাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
বিবাহেতে আঁটাআঁটি
কন্যা চাহি পরিপাটি,
দু'চার হাজার ভিন্ন পাত্রটী নারাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(৮)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
পাশ করা ছেলে যার
গরবে বদন ভার
বসিতেও অপমান সকলের মাঝ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(৯)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
আহা ছেলে দরাদরি,
যেন মাছ তরকারী,
পাইকার আছে তাহে ঘটক সমাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(১০)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
স্নেহের পুত্তলী ছেলে,
বজ্রশল্য মেয়ে হলে,
শিহরে পিতার অঙ্গ, মরুহৃদি মাঝ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(১১)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
বার কি তেরর বাড়া
মেয়েটী রাখিবে কারা
জনকের মাথা হেঁট, মার বুকে বাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(১২)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
বড় ঘরের কথা যত
চুপে চুপে হয় গত
দরিদ্রের কথা হলে বাজে বজ্রনাদ,
আপন ঘরের কথা কহিতে ও লাজ।

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।

হুগলী-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

শ্রাদ্ধিকী।

দেব-প্রয়াণ।

একি নিদারুণ কথা, এ যে বজ্রাঘাত ব্যথা,
মর্ম্ম-প্রপীড়িত,
নব্য-ভারতের সূর্য্য, দীপ্তিমান দেশ পূজ্য,
আজি অস্তমিত!
তেজস্বী মনস্বী ঋষি, উজলিলা দশ দিশি,
মহত্ত্ব প্রভায়,
যৌবনে যুঝিয়া রণে, দুর্জ্জয় দারিদ্র্য সনে,
পরাজিলা তা'য়!
সত্য ধর্ম্মে সদা রত, কর্ম্ম, জীবনের ব্রত,
বিশ্ব হিত-কামী,
অন্যায়ে অনল-দীপ্ত, ন্যায়ে চির-পরিতৃপ্ত
কাজে অগ্রগামী!
"আনন্দ-আশ্রম"করি, শত দীনহীনে ধরি,
সযত্নে পালিলা,
অনুরূপা পত্নীসনে, স্নেহার্দ্র দয়ার্দ্র মনে,
সবারে সেবিলা।
কত অবহেলনীয়, হইল প্রাণের প্রিয়;
লভিল আদর!
কত ঘৃণ্যে তুলি বুকে, অমৃতান্ন দিল মুখে,
যেন সহোদর!
সেবাব্রতে চিত্ত স্থির, নিয়ত নির্ভীক বীর,
নির্ভীক লেখনী,
সংযমী, উদার চেতা, নব-ভারতের নেতা,
দেশ গুরু গণি!
কর্ম্মময় অনলস, শুদ্ধ চেতা, আত্ম বশ,
নিত্য নবোদ্যম,
কে বলে"প্রাচীন বৃদ্ধ" দেহ প্রাণ যোগসিদ্ধ
কেশরী বিক্রম!

কঠোর কঠোরতম, কোমল কমলোপম,
পবিত্র হৃদয়,
আসে যায় কত জন, নরকুলে এ তপন,
কদাচ উদয়!
সত্য দেব! গেলে তুমি, ছাড়ি এ মরত ভূমি
অমর ভবনে,
সত্যই কি গেলে তুমি, আঁধারিয়া মাতৃভূমি,
সাহিত্য গগনে?
করিব কি সে বিশ্বাস, "দেশ যোড়া সর্ব্বনাশ
সত্য সত্য তবে?
অসম্পূর্ণ কত কার্য্য, কে করিবে কহ আর্য্য,
কহ কিবা হবে?
সে স্নেহ আদরে কেবা, শিখাবে ভারতী সেবা,
সুশিক্ষা তেমন?
অযোগ্যতা আপনার ভুলি করুণায় কার,
লভিব জীবন?
দেশে আছে যতজন, সবি তব পরিজন,
তুমি যে সবার,
কারো কিছু নাহি ব'লে,কেন তুমি গেলে চলে,
এ কি অবিচার?
আর না লেখনী চলে, নিরুদ্ধ নয়ন জলে,
সত্য তুমি নাই?
"দেবঘরে দেব-প্রাণ, হইয়াছে অবসান,
সত্য তবে তাই?

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

আশৈশব সহচরের স্মৃতি।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী একজন অসাধারণ ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার উদার স্বভাব, নির্ম্মল চরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, নির্ভীক কার্য্যকারিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং তাঁহার পরদুঃখ কাতরতা পরোপকার ব্রত স্বজন বৎসলতা ও দেশহিতৈষিতা যথাযোগ্যরূপে বিবৃত করিয়া তাঁহার জীবনী সঙ্কলন করা বিশেষ ক্ষমতাবান লেখকের আবশ্যক। ভরসা করি যথাসময়ে কোনও সুযোগ্য লেখক তাহা করিবেন। আমি এইক্ষণ কেবল তাঁহার বাল্যকালের ও জীবনের কতকগুলি ঘটনা সন্নিবেশিত করিতেছি মাত্র।

দেবীপ্রসন্ন ১২৬০ সালের পৌষমাসে ২৩শে তারিখে, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা তিথিতে এইক্ষণ ফরিদপুর, তৎকালে বরিশাল জেলার অন্তর্গত উলপুর গ্রামে সুবিখ্যাত বসু রায় চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র রায়চৌধুরী, পিতামহ গোপীকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, প্রপিতামহ শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বৃদ্ধপ্রপিতামহ নন্দরাম রায়চৌধুরী, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরী এবং অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ রঘুনন্দন রায়চৌধুরী ছিলেন। এই রঘুনন্দন রায়চৌধুরী মুসলমান বাদসাহের আমলে সাহাপুর পরগণার জমিদারী অর্জ্জন করেন এবং উলপুর গ্রাম উক্ত পরগণার মধ্যে স্থিত। দেবীপ্রসন্নের পিতা স্বর্গীয় রামচন্দ্র রায়চৌধুরী অতিশয় নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি দেবপূজা ও আহ্নিকাদি কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। দেবীপ্রসন্নের মাতা অতি বুদ্ধিমতী ও স্নেহশীলা রমণী ছিলেন।

দেবীপ্রসন্নের ৬ (ছয়) ভ্রাতা ছিলেন ও তাঁহাদের তিন (৩) ভগ্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রথমে মুনসেফি কার্য্য করিয়া পরে সবজজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে পরলোকগমন করেন। মধ্যম শ্যামাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মোক্তারি কার্য্য করিতেন। তিনি বহুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। দেবীপ্রসন্ন তৃতীয় ভ্রাতা ছিলেন। চতুর্থ রমা প্রসন্ন অতি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। পঞ্চম রাধিকাপ্রসন্ন ও কনিষ্ঠ গিরিজাপ্রসন্ন মাত্র জীবিত আছেন। ছয় ভ্রাতার মধ্যে দেবীপ্রসন্ন ও গিরিজাপ্রসন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও অপর সকলে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। দেবীপ্রসন্নের তিন ভগ্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা যোগমায়া ও কনিষ্ঠা দুর্গাসুন্দরী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী থাকিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। এবং মধ্যমা বিরজা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বিরজার প্রথমে শৈশবাবস্থায় হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়, পরে দেবীপ্রসন্ন তাহাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন।

১২৭৪ সালের পৌষমাসে উলপুর গ্রামে ওলাওঠার রোগের ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয় সেই মহামারীতে দেবীপ্রসন্নের মাতা ও তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা রমাপ্রসন্ন পরলোকগমন করেন এবং তাহার তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পূর্ব্বেই বাল্যকালে দেবীপ্রসন্নের হিন্দুমতে বিবাহ

হয়। বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের কন্যা কমলকামিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পরে কমলকামিনী স্বামীর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

দেবীপ্রসন্নের ভবিষ্যৎ জীবনের অঙ্কুর বাল্যকাল হইতেই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তাহার খেলার সঙ্গীগণ সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিলেন এবং তিনি সকলকে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার খেলার সঙ্গীগণের নেতা ছিলেন। তিনি ও তাঁহার খেলার সঙ্গীগণ কেহ ৭বৎসরের কেহ ৮ বৎসরের কেহ ৯ বৎসরের ও কেহবা ১০ বৎসরের বালক ছিলেন। তখন তাঁহারা একত্র হইয়া রামরাবণের যুদ্ধ অভিনয় করিতেন; এবং তিনি রাবণের পদ গ্রহণ করিতেন। অতি অল্প বয়সে দেবীপ্রসন্ন বিদ্যাভ্যাসের জন্য কলিকাতা আসেন এবং প্রথমে তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্যামাপ্রসন্নের শ্বশুর চেতলা নিবাসী দুর্গাদাস সরকার মহাশয়ের চেতলার বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিসনারী স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন এবং তথা হইতে ১৮৭৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চেতলা থাকা কালেই তিনি ঝামাপুকুর ব্রহ্মমন্দিরে কেশববাবুর উপাসনায় যোগ দিতে আসিতেন। চেতলা থাকা সময়ে দেবীপ্রসন্ন একবার জ্বরপ্লীহা রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসায় কোনও ফল না পাওয়ায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাপ্রসন্নের সহিত একমাসের কিছু অধিককাল মুঙ্গেরে বাস করেন, তাহাতেই তাঁহার পীড়া অরোগ্য হয়। এবং সেই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তি প্রস্ফুটিত হয় এবং এবং তিনি লেখনী পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৮৭৪ সালে দেবীপ্রসন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। এবং তখন হইতে কলিকাতায় পটলডাঙ্গা ও তন্নিকটস্থ স্থানে ছাত্রনিবাসে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগদান করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হন। যদিও দেবীপ্রসন্ন কয়েকবৎসর কাল মেডিকেল কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মেডিকেল কলেজের কোনও পরীক্ষা দেন নাই। কারণ চিকিৎসা গ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল না। তখন হইতেই সাহিত্য সেবায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি তাঁহার প্রাণের সুহৃদ চাওচানিবাসী ৺ কালীপ্রসন্ন দত্ত ও ৺ শশীভূষণ গুহ প্রভৃতি কয়েক বন্ধুর সহিত একত্রে ভারতসুহৃদ নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু এ পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। এবং এই সময় তিনি তাঁহার রচিত শরৎচন্দ্র নামক প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁহার পত্নী কমলকামিনী ও বালবিধবা ভগ্নী বিরজা উলপুর গ্রামে তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিতেন এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় সৌহার্দ্দ্য জন্মে, দেবীপ্রসন্ন যখন বাড়ী যাইতেন তখন মৌখিক উপদেশ দ্বারা এবং কলিকাতা থাকা সময়ে পত্রের দ্বারা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করেন এবং সকল বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় নিয়া নিজের সহিত প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করাইবার সঙ্কল্প

করেন। দেবীপ্রসন্ন কোনও সঙ্কল্প করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন তাহাতে কোনও সংশয় ছিল না এবং কোনও ব্যক্তি বা কোন অবস্থাই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিত না। প্রথমে তিনি তাঁহার বিধবা ভগ্নী বিরজাকে স্বীয় পরিবারবর্গের ও আত্মীয় বন্ধুগণের অমতে কলিকাতায় আনিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করেন। এই সময় দেবীপ্রসন্নের পুত্র প্রভাতকুসুমের জন্ম হয়। কমলকামিনী পিত্রালয়ে থাকিয়া প্রভাত-কুসুমকে প্রসব করেন। পরে কমলকামিনীর পিতা ও মাতা প্রভৃতির অমতে দেবীপ্রসন্ন তাঁহার বন্ধু ৺কালীপ্রসন্ন দত্তের সাহায্যে স্বীয় পত্নী ও শিশুপুত্রকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করেন এবং বিধবা ভগ্নী বিরজাকে শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। এই সকল কারণে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাগণের ও হিন্দু সমাজস্থ অপর আত্মীয় বন্ধুগণের বিশেষ বিরাগ ও বিদ্বেষভাজন হন। কিন্তু দেবী-প্রসন্ন তাঁহার উদার স্বভাব, স্বজনবৎসলতা ও পরোপকারিতা দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই এই বিদ্বেষভাব অপনীত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহার হিন্দু সমাজস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি যে হিন্দুর পক্ষে বিধর্ম্মা, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল।

দেবীপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজের একজন অগ্রণী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতেন এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজে ও উপাসনায় যোগ দিতেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, যখন, কুচবিহারের মহারাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন তখন ৺আনন্দমোহন বসু প্রমুখ অনেক ব্রাহ্ম উক্ত বিবাহের বিদ্বেষী হন এবং তাঁহাদের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়। এবং দেবীপ্রসন্ন তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণের সময় ঐ মন্দিরের পার্শ্বে ব্রাহ্ম-পল্লী স্থাপনের জন্য ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয় মন্দিরের উত্তরদিকে কতক জমি অর্জ্জন করেন এবং দেবীপ্রসন্ন উক্ত জমির মধ্যে কতক জমি খরিদ করিয়া মন্দিরের সন্নিকটে নিজ বাটী প্রস্তুত করেন। প্রথম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকে এবং তাঁহার দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নানাপ্রকার উপকার সাধিত হয়। তিনি অনেক ব্রাহ্ম বালক বালিকা স্ত্রী ও পুরুষগণকে নিজবাটীতে রাখিয়া প্রতিপালন এবং অনেক ব্রাহ্মবালিকা ও যুবতীকে বিবাহ দেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাণিকদহের খ্যাতনামা ও ধনশালী জমিদার বিপিনবিহারী রায় একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। দেবীপ্রসন্নের সংস্রবে আসিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দেবীবাবুর পরামর্শানুসারে কাজ করিয়া তিনি নানারূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং দেবীবাবুর পরামর্শ ও উপদেশ মতে কার্য্য করায় তাঁহাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর অনেক উপকার সাধিত হয়।

ব্রাহ্মগণ যেমন দেবীবাবুর দ্বারা এইরূপে উপকৃত হইয়াছেন তাঁহার হিন্দু আত্মীয় বন্ধুগণও তাঁহাদ্বারা নানারূপে উপকৃত হইয়াছেন। অনেক বালক তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগের মধ্যে অনেককে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছেন। হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি বৈদ্যনাথ ও পুরীধামে যেসকল বাড়ী করিয়াছেন অনেক আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তিকে তাহাতে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দিয়া উপকার সাধন করিয়া-

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত উলপুর গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান এজন্য ফরিদপুরকে ও ফরিদপুরবাসীগণকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। ১৮৮৭ সালে বৈশাখ মাসে তিনি তাঁহার কয়েকটী বন্ধু ও ফরিদপুর নিবাসী অপর কয়েক ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ফরিদপুর সুহৃদ সভা স্থাপন করেন তিনি উক্ত সভার সম্পাদক হন। মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত সভার সম্পাদকের কাজ তিনিই চালাইয়া আসিতেছিলেন প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, ২।১ বার ভিন্ন তিনিই প্রতিবারেই সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইতেন। উক্ত সভারদ্বারা ফরিদপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, ব্যায়ামশিক্ষা বিস্তার, অনাথা বিধবাদিগের সাহায্য, মহামারী সময়ে ঔষধ বিতরণ; দুর্ভিক্ষে অন্নদান প্রভৃতি ফরিদপুর বাসীদিগের নানারূপ উপকার সাধিত হইয়াছে। দেবীপ্রসন্নই তাহার মূলাধার। একমাত্র তিনিই ফরিদপুর সুহৃদসভা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অভাবে এইক্ষণ উক্ত সভার কার্য্য চলিবে কিনা সন্দেহের বিষয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ফরিদপুরে কয়েকবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ে দেবীপ্রসন্ন অনেক চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং ফরিদপুরবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে চাউলাদি বিতরণ করিয়া, অনেক লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। কখনও কখনও নিজে গ্রামে গিয়া ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইয়াছে, তিনি তাহা দৃষ্টিপাত করেন নাই।

নিজ জন্মস্থান উলপুর গ্রামে ১৩০৯ সালে নিজব্যয়ে তাহার পিতা ৺রামচন্দ্রের নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া নিজ হইতে ডাক্তারের বেতন দিয়া ও ঔষধাদি ক্রয় করিয়া তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত দাতব্য ঔষধালয় চালাইয়া আসিয়াছেন। উলপুরবাসিগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এ সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। উলপুর বাসিগণের ভরসা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ প্রভাত কুসুম ঐ দাতব্য চিকিৎসালয় বজায় রাখিবেন।

দেবীপ্রসন্নের পত্নী কমলকামিনী কলিকাতা আসিবার পর তাঁহার দুইটী কন্যা সন্তান হয়, তাঁহাদের একটীর নাম অপরাজিতা রাখিয়াছিলেন, অপরটীর নাম সান্ত্বনা; অপরাজিতা অতি শৈশব অবস্থায় পরলোক গমন করে। দেবীপ্রসন্ন তাঁহার পুত্রকন্যার বিদ্যাশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার ভগিনী বিরজার পুত্র কন্যাগণের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। প্রভাতকুসুম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তিনি তাহাকে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে, তিন বৎসর কাল ইংলণ্ডে রাখেন এবং প্রভাতকুসুম ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করিয়া

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করে। এবং পরে তাহাকে কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্ট প্লীডার স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা ফুল্লনলিনীর সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় বিপিন বিহারী রায়ের পুত্র সুপ্রসন্ন কিছুদিন ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে তাহার সহিত তাঁহার কন্যা সান্ত্বনার বিবাহ দেন। দেবীপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিজা প্রসন্ন হিন্দুসমাজ ভুক্ত ছিলেন। তিনি দেবী-প্রসন্নের উৎসাহে পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি দেবীবাবুর বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকিয়া হাই-কোর্টে ওকালতি করিতেছেন।

সাহিত্য সেবা দেবীপ্রসন্নের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি "শরৎচন্দ্র" হইতে আরম্ভ করিয়া নয়খানি উপন্যাস, দশখানি প্রবন্ধ পুস্তক ও একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এবং ১২৯০ সাল হইতে নব্যভারত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত নব্যভারত এতদিন পর্য্যন্ত তিনি সুদক্ষতার সহিত চালাইয়া আসিয়া-ছেন। এইরূপে তিনি বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। নব্যভারত যাহাতে তাঁহার অভাবেও প্রকাশিত হয় এইরূপ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিতেন। এবং তাঁহার পুত্রবধু ফুল্লনলিনী ঐ পত্রিকা যাহাতে প্রচ-লিত রাখেন এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়া-ছেন। নব্যভারত পাঠকগণ জানেন, যে তিনি যাহা উচিত মনে করিতেন তাহা ব্যক্ত করিতে কোনও রূপ ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সকল দোষ তাঁহার চক্ষে পতিত হইত তাহা তিনি অকুতোভয়ে নব্যভারতে প্রকাশ করিতেন এবং সেইজন্য তিনি অনেক সময় ব্রাহ্মমণ্ডলীর অপ্রিয় হইতেন। এমন একসময় হইয়াছিল যে কতক ব্রাহ্মগণ ইহা ও চেষ্টা করিয়াছিলেন যে দেবীবাবু ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু দেবীপ্রসন্ন ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না এবং কাহাকেও ভয় করিতেন না। তিনি নির্ভীক চিত্তে নিজ কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন এবং যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন ও বলিয়াছেন।

দেবীপ্রসন্ন অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। অনাবশ্যক কাজে তিনি কখনও অর্থব্যয় করিতেন না। বাবুগিরি বা বিলাসিতা তাঁহার চক্ষুর শূল ছিল। বৈষয়িক কার্য্যে তিনি অতিশয় সুদক্ষ ও দূরদর্শী ছিলেন। এজন্য তিনি নানারূপ সৎকার্য্যে ও কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুরীধামে ২টী বড় বড় দোতালা বাটী ও চারিটী এক-তালা বাটী ও বৈদ্যনাথ ধামে চারিটি বাটি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল বাটি ভাড়া দিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এত-দ্ভিন্ন কলিকাতাস্থ সিমলায় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের নিকট তিনি ২টী বাড়ী করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনিও তাঁহার পুত্র-কন্যাদি পরিবারবর্গ বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন বরিশাল জেলায় নারায়ণ পুরে তিনি একটী বাটি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যখন বৈদ্যনাথ প্রভৃতি সাঁওতাল পরগণার নানা স্থানে বাঙ্গালী ভদ্রলোক স্বাস্থ্য অন্বেষণে আসিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি বৈদ্যনাথ কার্সটেয়ার্স টাউনে অনেকটা জমি লইয়া তাহাতে ক্রমে চারিটি বাড়ী প্রস্তুত করেন।

এবং তদ্রূপ পুরীর সমুদ্রতীরে ও তিনি অনেকটা জমি লইয়া তাহাতে ৬টি বাড়ী প্রস্তুত করেন, তিনি বলিতেন যে বৈদ্যনাথ ও পুরী কখনও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া গণ্য না হইলেও চিরকাল তীর্থস্থান বলিয়া তাহার আদর থাকিবে এবং ঐ সকল স্থানের বাড়ীর আদর কখন যাইবে না।

দেবীপ্রসন্ন তাঁহার হিন্দু ও ব্রাহ্ম আত্মীয় ও বন্ধুগণকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সম্পদে বিপদে সর্ব্বদা তাহাদের সাহায্য করিতেন এবং আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়া তাহাদের পরিচর্য্যা করি-তেন। ১৮৭৭ সালে জানুয়ারী মাসে যখন তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িতেন সেই সময় তাঁহার জন্মভূমি উলপুর গ্রামে ও লাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হন সেই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা ও বাল্যসহচর যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী উলপুর গ্রামে ভীষণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়, সেই সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতা হইতে উলপুর চলিয়া যান। তখন খুলনা বা যশোরে রেল ছিল না, কলিকাতা হইতে উলপুর যাইতে অনেক কষ্ট সহিতে হইত এবং অনেক সময় লাগিত; এবং তখন উলপুর গ্রামের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে নিকটস্থ ব্যক্তিগণও পীড়িত আত্মীয়স্বজনকে দেখিতে উলপুর যাইতে সাহস করিতেন না। কিন্তু দেবীপ্রসন্ন নির্ভয়চিত্তে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উলপুর গিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৩২০ সালে কার্ত্তিক মাসে তাঁহার জীবনের চিরসঙ্গিনী ও পত্নী কমলকামিনী পুরীধামে স্বর্গারোহণ করেন। জীবনের চিরসঙ্গিনীকে হারাইয়া তিনি অতিশয় ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের বল এমন ছিল যে কিছুতেই তাঁহাকে কাতর করিতে পারিত না। তাহার পর ১৩২৩ সালে তাঁহার এক-বার কঠিন পীড়া হয় এবং ডাক্তারগণ তাঁহাকে অনেকদিন প্রায় অনাহারে রাখেন এবং তাঁহাকে চলাফেরা করিতে দিতেন না ঐ সময় পুত্রবধু ফুল্লনলিনী তাঁহার শুশ্রূষায় সদা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন ঐ ভাবে থাকিয়া তিনি ঐরূপ ভাবে কাল কাটান অসহ্য মনে করিয়া পুরীধামে চলিয়া যান এবং সেখানে গিয়া সুস্থ হন। ১৩২৫সালে তাঁহার জামাতা সুপ্রসন্ন অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, ইহাতে দেবীপ্রসন্ন অতিশয় মন-কষ্ট পান তৎপর কন্যা সান্ত্বনা ও তাহার পুত্র কন্যাগণের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন।

জীবনের শেষভাগে তিনি নানাপ্রকার পারিবারিক অশান্তিভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অটল চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। গত আশ্বিন মাসে বৈদ্যনাথধামে যান; সেখানে তিনি কোনও রূপ পীড়ার যন্ত্রণা সহ্য না করিয়া, ও কাহাকেও কোনও কষ্ট না দিয়া, সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার ন্যায় বৈদ্য-নাথ ধামে সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি যেরূপ ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার মৃত্যুও তদনুরূপ হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অনেক কার্য্য করিবার ইচ্ছা ছিল তিনি জীবনে যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ও সৎকার্য্য সমাধা করিয়াছেন তাহা চির প্রচলিত রাখিবার জন্য তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল এবং তাহার ব্যবস্থা করিয়া উইল সম্পাদন করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ সকল কার্য্য করিবেন এইরূপ

তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার জীবনলীলা শেষ হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না, ভরসা করি শ্রীমান প্রভাত কুসুম স্বীয় পিতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি বজায় রাখিবেন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী।

দেবলোকে দেবীপ্রসন্ন।

ভূদেব যাঁরা ছিলেন হেথা
যাচ্ছেন তাঁরা একে একে
আঁধার ঘেরা ভারতভূমে
আরো নিবিড় আঁধার ঢেকে!
সেদিন মাতা 'তিলক' হারা,
মুছেন আজো নয়ন-ধারা,
আবার একি মায়ের বুকে
দারুণতর পড়্‌ল বাজ,
নরসিংহ দীন-দয়াল
বিদায় 'দেবী' নিলেন আজ!
"নব্যভারত" শূন্য হল,
শূন্য হল সত্য-সেবক,
শূন্য হল অন্যায়ের
প্রতিযোদ্ধা জন-নায়ক!
বীর-মন্ত্রে পূর্ণ-আশ
শূন্য বাণী-ভক্ত দাস
শূন্য হল পতিতবন্ধু
নীরব-কর্ম্মী মহাপ্রাণ!
শূন্য পূত-চরিত্রের
পুণ্য-দ্যুতি মূর্ত্তিমান!
এমন স্নেহ এমন প্রীতি
এমন নীতি-সদুপদেশ,
হায়রে বিধি! এমন বিধি,
এক নিমেষেই হল শেষ!
মায়ের ভাঙা-কুটীর মাঝে
যখন আলো জ্বল্‌বে সাঁঝে
সকল আলো নিভিয়ে দিয়ে
হাস্‌ছে কেবা অট্টহাসি!
কাহার এমন রুদ্র-লীলা
অশ্রু দিয়ে বাজায় বাঁশী!
দেবলোকে দেবের অভাব
ঘট্‌ল কি আজ এমনতর,
হচ্ছে কি তাই ক্ষণে ক্ষণে
ভারতমাতার শূন্য ঘর!
ভুবন-সেরা রতনগুলি
অলক্ষ্যে কে নিচ্ছে তুলি'
ভারতমাতা ধূলায় লুটে
সান্ত্বনা কে দিবে তায়,
শান্তি-আশার ভরসাটুকু
কাল-সাগরে মিলিয়ে যায়!
যাও হে দেব! "আনন্দাশ্রম"
ওই যে রাজে নয়নাভিরাম!
দুঃখ-দৈন্য পূর্ণ ধরা
নয়গো তব যোগ্য-ধাম!
শোক-সন্তপ্ত স্বদেশের
শ্রদ্ধাঞ্জলি অন্তরের
লও হে তুমি যুগ-যুগান্ত
অন্ত করি' হৃদয়-জ্বালা!
আপন-মনে চারণ কবি
রচ্‌বে তায় অশ্রু-মালা!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।



শ্রীদেবীপ্রসন্ন চৌধুরী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক পুঃ
শ্রেণী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী

দেবীপ্রসন্ন-স্মৃতি

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গোড়ায়। প্রথম পরিচয়েই বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, আর সেই বন্ধুত্ব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল। খুব সম্ভব, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, কৃষ্ণনগরে, শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার মহাশয়ের মুখে প্রথমে ইহাঁর নাম ও ইহাঁর লেখা একখানি কথা গ্রন্থের নাম শুনি; হয়ত সেই কথাগ্রন্থখানি, লেখকের "শরচ্চন্দ্র"। আমার সহিত যখন পরিচয় হয়, তখন হয়ত দেবীপ্রসন্ন চারিখানি কথাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন, ভিখারী ও সন্ন্যাসী। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে দেবীবাবু একটি ছোট বাড়ীতে নিমুখানসামার গলিতে থাকিতেন। সে বাড়ীও নাই, সে গলিও নাই—এখন সেখানে ইডেন হাঁসপাতাল রোড খুলিয়াছে। দেবীবাবু তখন তাঁহার এখনকার বসতবাড়ীর জমি কিনিয়াছিলেন, ও বাড়ী তৈয়ারির বন্দোবস্ত করিতেছিলেন।

আমি কখনও দেবীবাবুকে তাঁহার জীবনের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করি নাই। কখনও কাহারও জীবনের ইতিহাস বা সংসারের খুঁটিনাটির কথা জিজ্ঞাসা করা আমার অভ্যাস নাই। তবে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার জীবনের অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম, সকল কথাই আমার মনে আছে; কিন্তু যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে কথা জানেন, তাঁহারাই সে বিবরণ লিখিলে ভাল হয়। আমি বিশেষভাবে জানি তাঁহার 'নব্যভারত' পরিচালনের কথা; মুখ্যভাবে তাহাই লিখিব।

একদিন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'ফরিদপুর-সুহৃদসভা'র একটা কমিটির কাজের শেষে দেবীবাবু আমাকে ও তাঁহার চারিজন বন্ধুকে লইয়া বিচার করেন, যে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিবেন কিনা। দেবীবাবুর যে চারিজন বন্ধুর কথা উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের নাম ৺কালীপ্রসন্ন দত্ত, ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গাঙ্গুলী ও ৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়। বিচার অনেক দিন চলিয়াছিল, আমি বরাবরই সাপ্তাহিকের বিরোধী ছিলাম। প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছিল যে, একখানি সাপ্তাহিকই বাহির করা হইবে ও সেখানি সংবাদপত্র হইলেও তাহাতে সাহিত্যের আলোচনা থাকিবে। দেবীবাবু, প্রস্তাবিত কাগজখানির 'বসুমতী' নাম রাখিবেন, ঠিক করিয়াছিলেন। এত উদ্যোগের পরও কিন্তু তিনি সাপ্তাহিক ছাড়িয়া শেষে মাসিক ম্যাগাজিনই প্রকাশ করিলেন। মাসিকপত্র প্রকাশের জন্য জিদ্ ছিল আমার, তাই যখন ১৮৯০খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে 'নব্যভারত' প্রকাশ হইল, তখন বড় সুখী হইয়াছিলাম। মাট্‌সিনির 'নব্য-ইটালি'র স্মরণ করিয়াই এই মাসিকপত্রের নামকরণ হইয়াছিল। আর্য্যদর্শন-সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের প্রভাবে আমরা তখন অনেকেই নব্যইটালির নেতাদের কথা পড়িতাম, আর দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী তখন

DIFFERENT CONTRAST

ম্যাটসিনির ভক্ত ছিলেন। এখানে বলিয়া রাখি যে আমি তখন কলেজের ছাত্র ছিলাম আর দেবীবাবু আমার চেয়ে নয় বৎসরের বড় ছিলেন। কখনও দেবীবাবুকে উচ্চপদের বিচারে সুহৃৎ সংগ্রহ করিতে দেখি নাই।

এই সময়ে মাসিকপত্রের যথার্থ অভাব ছিল। আমাদের সাহিত্যের নূতনযুগের প্রবর্ত্তক ও কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' খানি উঠিয়া যায় যায় হইয়াছিল। কেবল 'ভারতী' খানি নিয়মমত চলিতেছিল। 'ভারতী' চিরদিনই সুসম্পাদিত মাসিকপত্র; কিন্তু তখন ঐ পত্রে অবাধে কেহ দেবতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সুপণ্ডিত সম্পাদকের বিরোধী মত সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন না। একজন লেখক (তাঁহার নাম প্রভাতচন্দ্র, কিন্তু উপাধি মনে নাই) নাস্তিকতা সমর্থন করিয়া 'ভারতী'তে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন; তাঁহাব সেই প্রবন্ধের ২।৪টী করিয়া ছত্র 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইত, আর তাহার তলায় মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হইত। দেশে যাহা স্বাধীন চিন্তা বাড়ে, সকল শ্রেণীর লোকই অবাধে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে পারে, অর্থাৎ মাসিকপত্রিকা যাহাতে কোন একটা দলের মুখপাত্র হইয়া না দাঁড়ায়, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নব্যভারত' প্রকাশিত হইয়াছিল। সে যুগে কোন পত্রিকায় কোন একটা মত প্রকাশিত হইলেই,পাঠকেরা সম্পাদককেই সেই মতের সমর্থক মনে করিতেন, সেইজন্য নব্যভারতের প্রবন্ধসূচীর মাথার উপর প্রথম হইতেই লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী। প্রভাত বাবুর যে প্রবন্ধটীর কথা উল্লেখ করিয়াছি; উহা 'নব্যভারত' প্রকাশিত হইবার পর প্রভাতবাবু নব্যভারতে সমগ্র ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবীপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজের লোক, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস খুব দৃঢ় ছিল। কিন্তু তিনি চিরদিনই তাঁহার মাসিকপত্রে সকলশ্রেণীর লোকের মতবাদ অসঙ্কোচে প্রকাশিত হইতে দিয়াছেন। 'নব্যভারত' প্রকাশের পর অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের পরিচালনায় 'নবজীবন' প্রভৃতি মাসিক প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু সে যুগে 'নব্যভারত' ছাড়া সকল পত্রিকাই দল বিশেষের মুখপাত্র ছিল। তাঁহার এই উদারতার জন্য একদিকে দেবীপ্রসন্ন যেমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, তেমনই আবার অন্যদিকে অনেক সুধীব্যক্তির আদর লাভ করিয়াছিলেন।

নব্যভারতে কোন গল্প ছাপা হইবে না, এই কথাই একরকম স্থির ছিল; কিন্তু কথা পাকা হয় নাই বলিয়া ৺ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের একটি ছোট গল্প ও সম্পাদকের 'নবলীলা' প্রথম বৎসরে মুদ্রিত হইয়াছিল। গোড়ার সঙ্কল্প স্মরণ করাইয়া আমি দেবীবাবুকে গল্প না ছাপিতে অনুরোধ করি; আমার কথা তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল, তিনি নব্যভারতে আর গল্প ছাপেন নাই। যে সময়ে অন্যান্য পত্রিকার পসার বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু নব্যভারতের গ্রাহক সংখ্যা তেমন বাড়িল না, তখন দেবীবাবুর অনেক বন্ধু নব্যভারতে গল্প ছাপিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গল্প ছাপিলে যে গ্রাহক বাড়িত,তাহা দেবীবাবু বুঝিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই আপনার সঙ্কল্প ছাড়েন নাই।

'ফরিদপুর সুহৃদসভা' দেবীপ্রসন্নের উদ্যোগেও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আর

চিরদিনই তিনি ঐ সভার প্রধান পরিচালক ছিলেন; এই সম্পর্কে তিনি ফরিদপুর জেলার প্রায় সকল স্থানের ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। 'নব্যভারত' প্রকাশের পর বাঙ্গালার নানাস্থানের সাহিত্যিকদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব ঘটে। ইহার ফলে কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে নানাস্থানের ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইতেন; আর দেবীপ্রসন্ন অতি প্রসন্ন মনে সকলকে আপনার কলিকাতার বাড়ীতে রাখিয়া অতিথি সৎকার করিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া এমনভাবে অতিথিসৎকার করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। দেবীপ্রসন্নের চালচলন সাদামাঠা ছিল। নিজের ঘরের প্রয়োজনে মজুরের কাজও করিতেন, লোকে তাঁহাকে সেইজন্য কৃপণ বলিত। আমি কিন্তু কোন নামজাদা বড় মানুষ দাতাকেও তাঁহার মত অতিথিসৎকার করিতে দেখি নাই।

দেবীপ্রসন্নের সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা কথা বলিব। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন. দেবীপ্রসন্ন তাঁহাদের দলে ছিলেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম পরিচয়, তখন তিনি সাধারণ সমাজে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। আমি তখন সর্ব্বদাই কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতাম. ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে প্রায় প্রতি রবিবারই উপস্থিত হইতাম। কারণ, কেশবচন্দ্রের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল,—এখনও আছে। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে যখন প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে কথা হইত, তখন ভয়ে ভয়ে কথা কহিতাম; কিন্তু অতি অল্পেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। যখন 'নববৃন্দাবন' নাটক অভিনয়ের কথা হয়, তখন ঐ নাটকের লেখক ৺ ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় আমাকে ঐ অভিনয়ের কাজে একটু জড়াইতে চাহিয়াছিলেন; সেইজন্য ঐ সম্পর্কের সকল কথা আমার জানা ছিল। দেবীবাবু আমার মুখে সকল বিবরণ শুনিয়া, নববৃন্দাবনের প্রথম অভিনয়ের দিনে উপস্থিত হইতে চাহেন, কিন্তু সেখানে কিরূপভাবে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন,না জানিয়া একটু সঙ্কুচিত ছিলেন। বিনা টিকিটে যাইতে পারিবেন ও অনাদৃত হইবেন না, একথা তাঁহাকে বুঝাইয়া ছিলাম। আমি দেবীবাবুকে ও ৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম; তাঁহারা উভয়ই সমাদরে সভাস্থ হইয়াছিলেন। এ সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই এই নাটক অভিনয় অন্যায় মনে করিয়াছিলেন। ইহার পরে, আমাদের মধ্যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা হইত; তিনি তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে একদিনও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখি নাই। সাহিত্যবিষয় হউক, সমাজ সম্বন্ধে হউক, তাঁহাকে সর্ব্বদাই অসাম্প্রদায়িক দেখিয়াছি। এখানে দেবীবাবুর ধর্ম্মসমাজ সম্পর্কে যাহা লিখিলাম তাহা আমার কলিকাতায় কলেজে পড়িবার সময়ের কথা।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের যে সকল কাজের সঙ্গে আমার সংস্রব ছিল,

যাহা আমি তাঁহার কাছে থাকিয়া নিজে দেখিয়াছি, তাহারই গোটাকতক কথা লিখিলাম। তাঁহার জীবনচরিতের কথা জানি, তাঁহার গুণাবলীর কথা অনেক বলিতে পারিতাম, কিন্তু সে সকল কথা লিখিবার যোগ্যতর লোক আছেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

তর্পণ।

পূর্ব্ববঙ্গ রত্ন-ওগো সাহিত্য-সন্ন্যাসী,
মহিমায় সমুজ্জ্বল দীপ্তি সাধনার,
বিশ্বের কল্যাণ-কামী, অপূর্ব্ব তেয়াগী,
লহ আজি অশ্রু-ঢালা অঞ্জলি আমার।
দরিদ্র-বান্ধব ওগো দুর্ব্বলের বল,
পতিত-আশ্রয়-দাতা, প্রশান্ত, উদার,
নির্জ্জীবে সজীবকারী, অতুল-মহৎ,
লহ আজি ভক্তি-মাখা অঞ্জলি আমার!

অনন্ত নির্ভরশীল কঠোর সাধক,
বিপদে নির্ভীক, কামী কৃপা বিধাতার,
বিবেক-বাঞ্ছিত-পথ একান্ত আশ্রিত
লহ আজি প্রীতিময় অঞ্জলি আমার!
দিগন্ত বিস্তৃত ওই জলাকীর্ণ 'বিল',
ওই পদ্ম, ওই হংস দিতেছে সাঁতার,
ওই তব জন্মভূমি,—আমি তারি কাছে,
পূর্ব্ববঙ্গবাসী,—লহ অঞ্জলি আমার!

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

শ্রাদ্ধবাসরে।

অকস্মাৎ সে দিন দারুণ দুঃসংবাদের টেলিগ্রাম পাইয়া, যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতন দেবগৃহের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম, তখন ট্রেণে, সমস্ত রাত, তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় অবধি সমুদায় ঘটনা বায়োস্কোপের ছবির মতন একে একে চোখের সাম্‌নে খেলিয়া যাইতে লাগিল! অতি তুচ্ছ খুঁটি নাটি, এত দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও উজ্জ্বলভাবে চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক হেমন্তের প্রভাতে ভাই বোনদের সঙ্গে খেলায় মগ্ন আছি, এমন সময় পিতা ডাকিলেন। পিতার আহ্বানে ছুটিয়া গিয়া দেখি, মাতা সেখানে, এবং তাঁহাদের সঙ্গে সৌম্যমূর্ত্তি প্রসন্নবদন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আলাপ করিতেছেন। মাতার আদেশে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে বলিলেন, "জান মা, আমার মা নাই তাই আমি "আমার মা" খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। সেইজন্য পদ্মা মেঘনা পার হইয়া, আজ আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছি।"

ক্ষুদ্র বালিকারূপে এ গৃহে প্রবেশ

করিয়াছিলাম। খেলা ধূলা ও পড়াশোনা ভিন্ন সংসারের কোন ভাব তখনও মনে জাগে নাই। তাহাতেই বিভোর ছিলাম, এমন সময় তিনি স্নেহমুগ্ধস্বরে "মা" বলিয়া ডাক দিলেন। লৌহ যেমন চুম্বকে আকৃষ্ট হয়—বন্যহরিণী যেমন বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়—ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় লইয়া, তাঁহার সেই মধুর আহ্বানে আমি সেইরূপ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শ্বশুর মহাশয়ও প্রথম দৃষ্টিতেই আমার প্রতি কি এক মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। নিতান্ত সংসারঅনভিজ্ঞা বালিকা বলিয়া, আমার পিতামাতার মনে তাঁহাদের আদরিণী কন্যার জন্য অত্যন্ত ভয় ছিল; কিন্তু তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের আভাস পাইয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ির নিকট যথোচিত আদর ও সদ্ব্যবহার পাইব আশা করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

তখন দেখিয়াছিলাম, তাঁহার অন্তরের কি কমনীয়তা, অন্য দিকে কি তেজস্বিতা, কি বজ্রের ন্যায় কঠোরতা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কি অক্লান্ত পরিশ্রমের শক্তি! যে একবার তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছে, বা তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে, তাঁহার জন্য প্রাণপণে সাধ্যানুসারে তিনি সব করিয়াছেন। অন্যের সুখ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কখনও কখনও পরিজনের উপর কঠোর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমার বিবাহের কিছুকাল পরে তাঁহার একবন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া এই গৃহে আসিলেন, তখন দেখিলাম লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া নিবার জন্য তাঁহার কথা বলিবার কি মিষ্ট ভঙ্গি; মিষ্ট কথায় ভুলিয়া সেই রোগীর জন্য রাত্রি জাগিতে ও অবিরত বমি পরিস্কার করিতে কেহই কুণ্ঠা বোধ করি নাই। আরো দেখিলাম, তাঁহার কি অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি! সেই বন্ধুর জন্য তিনি কি না করিলেন? কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বন্ধু এই গৃহেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্তানদের তিনি নিজ সন্তান নির্ব্বিশেষে গৃহে স্থান দিলেন। বন্ধুর অবর্ত্তমানে তাঁহার সন্তানদের প্রতিপালনের চেষ্টা করা সাধারণ হৃদয়ের কথা নয়।

যখনই যে কেহ এখানে আসিয়াছেন তিনি পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সাহায্যপ্রার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া, বিমুখ হইয়া ফিরিয়া প্রায় কেহ যায় নাই। কত অনাথ ও অনাথাকে নিজ গৃহে স্থান ও অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন; ও কত কন্যাকে নিজ কন্যা নির্ব্বিশেষে বিবাহ দিয়াছেন।

এক দিন যাঁহার সহিত পরিচিত বা যাঁহার কাছে উপকৃত হইয়াছেন, তাহা কখনও ভুলিতেন না। আলাপ হইলেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেন। যে দিন প্রথম তিনি শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীকে নিয়া কলিকাতায় আসেন, সে দিন গাড়ী ভাড়া দিবার পয়সা তাঁহার হাতে ছিল না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই ভাড়া দিয়াছিলেন। এই উপকারটী তিনি চিরজীবন মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও কত বার আমাদের নিকট একথা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

খাইতে ও খাওয়াইতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। নিজে বেশ খাইতেও পারিতেন। তাঁহাকে যিনি একবার খাওয়াইয়াছেন

তিনিই জানেন তাঁহাকে খাওয়াইয়া কি সুখ ছিল! কিন্তু কোন দিনও রান্না খারাপ বা কম হইলে এতটুকু অতৃপ্তির সহিত খান নাই। সামান্য শাক ভাতও তৃপ্তি সহকারে খাইয়াছেন।

আহার্য্য দ্রব্যের ভিতর দুধ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যখনই তাঁহাকে দুধ দিয়াছি, নিজে খানিকটা খাইয়া প্রায় প্রতিদিনই আমাকে দিতেন ও খাইতে বাধ্য করিতেন। কতদিন এমন হইয়াছে যে, রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, নীচে রান্নাঘর হইতে দুধের বাটি নিজে হাতে করিয়া আনিয়া আমায় ঘুম হইতে ডাকিয়া জাগাইয়া জোর করিয়া খাওয়াইয়া তবে গিয়াছেন। আমি কত সঙ্কুচিত হইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই ছাড়েন নাই।

বিলাসিতা বা সুখস্পৃহা বলিয়া কোন জিনিষই তাঁহার ছিল না। চিরকাল এক ভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন। কোনদিন ভাল কাপড় বা সাজসজ্জার পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের বেশভূষার কোন আড়ম্বর ছিল না। কোন কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর করেন নাই। প্রতিদিন স্নানান্তে, শেষদিন পর্য্যন্ত, নিজের কাপড়টী স্বহস্তে ধুইয়াছেন। নিজের শোবার ঘরের আসবাবও আফিস ঘরের টেবিল চেয়ার প্রভৃতি প্রতিদিন স্বহস্তে ঝাড়িতেন, মুছিতেন। কোথাও এতটুকু ভাঙ্গিলে বা রং উঠিয়া গেলে নিজ হাতে মেরামত করিয়াছেন। যে কোনরূপ ময়লা নিজে পরিষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যেমন আত্মনির্ভরশীল তেমনি অক্লান্তকর্ম্মী! কার্য্যে উচ্চ নীচ জ্ঞান করিতে নাই, কথায়ও কার্য্যে প্রতিনিয়ত তাহা দেখাইয়াছেন। (Dignity of Labour) পরিশ্রমের মর্য্যাদা যেন তাহাতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

গত ১৩১৩ সালে ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ে যখন খুব দুর্ভিক্ষ হয়, তখন তিনি Relief Committeeর পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ পাড়িত লোকদিগের সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় ছয়মাস সময় লাগিয়াছিল। তাহার ভিতরে দুই মাস, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারিয়াছিলেন; আর বাকি ৪মাস কখনও একবেলা খাইয়াছেন, কখনও বা সারাদিন অনাহারে গিয়াছে। চাউল বিতরণের সময় (তাঁহার নিজ মুখেও শুনিয়াছি এবং ওখানকার স্থানীয় লোকের মুখেও শুনিয়াছি) একাদিক্রমে ২০ ঘণ্টা ত মধ্যে মধ্যেই হইয়াছে.দু-একদিন ২৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একাসনে বসিয়া তাহা বিতরণ করিয়াছেন। এই ২০ ঘণ্টা বা ২৭ ঘণ্টার মধ্যে আহার নিদ্রা বা একটু উঠা কিছুই করেন নাই। ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় একাসনে বসিয়া অবিরত চাউল বিতরণ করিয়াছেন। ১৩১৩ সালের কার্ত্তিকমাসের নব্যভারতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা না থাকিলে এরূপ কেহ কি করিতে পারে? খাল বিলের অপরিষ্কৃত অবিশুদ্ধ জলে ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। সে স্থানে গিয়া, তথাকার লোকদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, তাদের সঙ্গে সমান ভাবে থাকা, যেন তাদেরই একজন, এইরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শরীর তাঁহার অন্যতম প্রধান সহায় হইলেও ইহাতে মনের কতখানি জোরের দরকার সহজেই বোঝা যায়। দুর্ভিক্ষে দীন দুঃখীর সেবা করিতে পারিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় খুব ইচ্ছা ছিল যে যদিকোন সুবিধা হয়,দুর্ভিক্ষের কাজ করিতে যাইবেন, কিন্তু সে সুবিধা হয় নাই, সে জন্য অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ফরিদপুর সুহৃদসভা ও উলপুর রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁহার জন্মভূমি উলপুরে আমরা একবার যাই তাঁহার খুব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সেখানে থাকিবার সেরূপ সুবিধা না থাকায়, আমরা কোন অসুবিধা বোধ করিয়া পাছে তাঁহার জন্মভূমিকে সেই চক্ষে দেখিতে না পারি, এই আশঙ্কায়, আমরা যাইতে চাহিলেও নিয়া যান নাই। বলিয়াছিলেন, "ডাক্তারখানাটী পাকা করিয়া নেই, তোমাদের থাকিবার মত ভাল বন্দোবস্ত করিয়া তোমাদের নিয়া যাইব।"

ব্যক্তিত্ব তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়াতে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল বলিয়াই, নিঃসম্বল কপর্দ্দকহীন অবস্থায় পতিত হইয়াও, নিজের পায়ের উপর এমন করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তিত্ব যখন অন্যের মতের সহিত প্রতিহত হইত,অশান্তির মাত্রাও তখন সেইরূপই তীব্র হইত; তাহাতে অনেকের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হইয়াছে। সেই হিসাবে, বিশেষতঃ পুত্রবধূ আমি, আমার কোন প্রতিবাদ সহ্য করিবার মতন শক্তি তাঁহার মতন প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমানীর না থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু জানিনা কেন, সর্ব্বদাই কোন প্রবন্ধ বা কাহারও জীবনী লিখিয়াই আমাকে পড়িতে দিয়াছেন। ও মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি তাহাতে কত সময় মনে মনে গর্ব্বও অনুভব করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে কোন আপত্তির কারণ ও স্থান দেখাতে সাহস করিয়াছি। অবশ্য সকল সময় আমার কথা তিনি শোনেন নাই; কিন্তু অনেক সময় আমার আপত্তি অনুসারে বদলাইয়াছেন ও পরিবর্ত্তনের বলিয়াছেন, 'দেখ, তুমি একথাটি বলিলে, তাই তোমার কথার সম্মান রাখিবার জন্য এটা এরূপ করিলাম বা ছাড়িয়া দিলাম।" প্রতিবারই আমি ভাবিয়াছি, ইহার পরে আর কোন লেখা আমায় দেখাইবেন না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা দেখাইয়া লইয়াছেন। কত সময় ভাবিয়াছি শক্তিতে ও সম্পর্কে কত ছোট আমি, কিন্তু স্নেহে তিনি কত উচ্চ স্থান দিতেছেন!

আমার দ্বিতীয় পুত্র প্রণবের মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় ও মনে মনে ঈশ্বর বিদ্রোহী হইয়া উঠি। তিনিও এ আঘাতে অত্যন্ত শোক পাইয়াছিলেন। আমার বিবাহের পর এই ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আনন্দের মাত্রা এত অধিক ছিল যে, তিনি উপাসনার সময়, সর্ব্বদাই বিশ্বজননীকে, 'প্রসন্নময়ী জননী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু ইহার পর, আর তাহা করিতে পারেন নাই। মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে প্রণবের মৃত্যু হয়; সেই হইতে প্রতি মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে তিনি নিয়মিতরূপে একাকী আমায় নিয়া সমানে উপাসনা করিয়াছেন। শরীরের জন্য দীর্ঘ আটমাস কাল দেওঘরে ছিলাম, তখন আমার একরাত্রে জ্বর অত্যন্ত বেশী হয়। সমস্ত রাত শ্বশুর মহাশয় আমার শিয়রে বসিয়া কাটান। কিছুদিন আমার একটি পা ফুলিয়া ছিল, আমার শত সঙ্কোচ সত্ত্বেও,তিনি

গরম জলে ফোমেণ্ট করিয়া, প্রায় মাসাধিক কাল প্রত্যহ নিজে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন। তারপর ২।৩ বার পায়ে আঘাত লাগিয়া ঘা হইয়াছে, তিনি দেখিতে পাইলে পায়ে হাত দিয়া ঘা ধুইবেন ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবেন এই সঙ্কোচে তাঁহাকে লুকাইয়া চলিতে কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই। সর্ব্বদা নিজ হাতে ধোয়াইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঘা শুকাইলে তবে ছুটি দিয়াছেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ আমার খুব বেশী জ্বর হয়। আমি জ্বরাক্রান্ত হইতেই, কাছে বসিয়া সমস্তক্ষণ মাথায় জল বরফ দিয়াছেন,নিজ হাতে বমি পরিষ্কার করিয়াছেন, মুখ ধোয়াইয়া দিয়াছেন। আমার এক মাসীমা তখন কলিকাতায় ছিলেন; তিনি আমার আরোগ্য লাভের পর বলিলেন, "তোমার শ্বশুরের তোমার প্রতি স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি দেখিয়া অবাক হইয়াছি ঠিক মায়ের মতন তোমার সেবা করিলেন; এই বয়সের একজন পুরুষের, বিশেষতঃ শ্বশুরের,এইরূপে তোমার বমি পরিষ্কার করা সহজ কথা নয়।"

বৎসরাধিক পূর্ব্বে একদিন দুপুরে হঠাৎ তাঁহার heartএর অসুখ হয়। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায় ও সমস্ত শরীর ঘামিতে থাকে। তখন বাড়ীতে কেহই ছিল না। নিজেই আমায় ঔষধের নাম বলিয়া দিলেন, আমি সেই সেই ঔষধ দিলাম। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র মহাশয়কে ডাকিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, "আজ আপনি আসার পূর্ব্বে যে আমায় মৃত্যু হয় নাই, সে কেবল বৌমা-য়ের জন্য। আজ এতক্ষণ সে-ই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। এখন আপনি রক্ষা করুন," বলিয়া কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাকে কোন কারণে আমাকে একটু শক্ত কথা কহিয়াছিলেন সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ইহাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি, কখনও তিরস্কার করিনা. বিশেষতঃ ইহার পিতার মৃত্যুর পর সে যাহাতে সেই অভাব অনুভব না করে সমানে সে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সেদিন তাহাকে এমন তিরস্কার করিয়াছি" বলিতে বলিতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া ছেলে মানুষের মতন কাঁদিয়া ফেলিলেন। বড় ছোটকে তিরস্কার করিয়া থাকেন, হয়ত কখনও অন্যায়রূপেও হইতে পারে, কিন্তু ছোটর সম্মুখে কে তাহা অন্যের নিকট স্বীকার করিয়া কাঁদিতে পারে? নাতি ও নাতিনীদের প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তাহাদের কান্না শুনিলে যেখানেই থাকুন, শতকাজ ফেলিয়া, এমন কি অধিক রাত্রিতেও শয্যা হইতে উঠিয়া আসিতেন। তাহাদের ছাড়া তাঁহার খাওয়াই হইত না। নিজের প্রিয় জিনিষ কখনই একা খাইতে পারিতেন না। সর্ব্বদা ওদের তো ভাগ দিতেনই, আমাকে পর্য্যন্ত ভাগ না দিয়া তৃপ্তি পাইতেন না।

বঙ্গ ভাষা তাঁহার জীবনের সাধনার ধন ছিল। সর্ব্বদাই বলিতেন, সাহিত্যের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। কত চিঠি যে পাইয়াছি, কত লোক যে বলিয়াছেন, যখন তাঁহারা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন, হয়ত লেখা তেমন বিশুদ্ধ হয় নাই. তবুও, তিনি উৎসাহ দিয়াছেন, 'নব্যভারতে' লেখা ছাপাইয়া মাতৃভাষার সেবক

হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। শেষ দিকে, বার্দ্ধক্যে,নিজের ছাপাখানার অভাবে, 'নব্য ভারত' যে কষ্টে চালাইয়াছেন তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তাহা ছাড়িতে পারেন নাই। 'নব্য-ভারত' আর বোধ হয় রাখিতে পারিলাম না, বলিতে গিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।

দেশের উন্নতির জন্য তাঁর প্রাণ অত্যন্ত কাঁদিত; প্রায়ই বলিতেন, দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্র হইয়া না মিশিতে পারিলে, তাহাদেরও উন্নতি হইবে না, দেশেরও উন্নতি হইবে না। তাই তিনি দরিদ্রের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়াছেন। বাজারে দোকানে লোকদের নিকট হইতে জিনিষ কিনিতে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে কি মিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন! বয়স্ক ও বৃদ্ধ লোকদের পর্য্যন্ত পায়ে মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়াছেন (আমরা অনেক সময় তাহা দেখিয়া হাসিয়াছিও) এবং তাহাদের প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এজন্য সেদিন বিচালিওয়ালা, মিস্ত্রী, দপ্তরী প্রভৃতি লোকেরা আসিয়া কি কান্নাই না কাঁদিতেছিল।

আত্মনির্ভরশীল ছিলেন বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেন না। তাহাতে অনেক বিরোধও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে ও অনেক সময় অনেককে হয়ত অন্যরকম মনে করিয়াছেন। কিন্তু যখনই তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়াছেন আবার একেবারে গলিয়া গিয়াছেন। জামাতার মৃত্যুর পর তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার শোক তাঁহার নিকট তীব্র মর্ম্মঘাতী হইয়াছিল। তাহার পর নানাদুঃখে হৃদয়ের সরসতা আর সেইরূপ রাখিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত নানারূপ বিরোধ হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজকে তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছেন। প্রায় চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সেদিন যখন প্রথম heartএর অসুখের প্রবল আক্রমণ হয়,সেদিন সমস্ত রাত্র জাগিয়া আমাদের কত কথাই বলিয়াছিলেন! "তোমরা কখনও ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িও না। যদিও আমার সহিত নানা বিষয়ে বিরোধ হইয়াছে,তথাপি—নিশ্চয় জানিও,ব্রাহ্মসমাজ আমার প্রাণের প্রিয় জিনিষ।"

সেই রাত্রেই পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"আমি জানি তুমি বউমাকে যত্ন কর, আদর কর—তবুও যদি এবার আর না উঠি—আর যদি বলা না হয়, তাই বলি—আমি অনেক সাধ করিয়া, অনেক অনুসন্ধান করিয়া, মেঘনার ওপার হইতে "আমার মা" আনিয়াছি, তাহাকে একটুও অযত্ন বা অবহেলা করিও না। করিলে পরলোকেও আমি প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইব।"

বিবাহের পূর্ব্বদিন তিনি আমার পিতৃগৃহে যাইয়া আমাকে তাঁহার বধূমাতা রূপে বরণ করিয়াছিলেন। সেই 'বধূমাতাবরণ' যেন গদ্যে একখানি কবিতা। তাহাতে এক জায়গায় আছে—"আমি বাল্যকাল হইতে মাতৃহীন; তুমি আজ মাতৃহীনের মাতা হইয়া একবার জগতের দ্বারে আত্মত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া দাঁড়াও। তুমি আজ এই বরণ-মণ্ডপে এই মাতৃত্ব-সাধন ব্রত গ্রহণ কর এবং আমাকে অভয় দেও যে, আমি শত অপরাধ করিলেও কখনও তাহা মনে রাখিবে না এবং আমাকে স্নেহ আশ্রয় দানে কৃতার্থ করিবে।" আজ অশ্রুজলে স্নাত হইয়া সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে অন্তরের শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, তিনি

আমার মুখ রক্ষা করিয়াছেন, কত সময় একান্ত দুঃখে মন অভিভূত হইয়াছে, কিন্তু, অসহায়ের সহায় পরম পিতা নিজে হাতে ধরিয়া, আমাকে কর্ত্তব্যপথে স্থির রাখিয়া চালাইয়াছেন। আজ তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই।

'নব্যভারত' এক ফর্ম্মা ছাপান বাকি রাখিয়া ৪।৫ দিনের কথা বলিয়া তিনি দেওঘরে যান। এত বৎসরের ভিতর কখনও 'নব্যভারত' শেষ ও বাহির না করিয়া কোথাও যান নাই। সে কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন ৪।৫ দিনের জন্য যাইতেছি। ইহার পর পুরীতে গিয়া বেশী দিন থাকিতে হইবে। তুমি ইহার মধ্যে শেষ ফর্ম্মাটী করাইয়া রাখিও, আমি আসিয়া কাগজ ডাকে দিব ও তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া পুরী গিয়া কিছুদিন থাকিব।" দেওঘরেও সকলের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন।

শেষ ফর্ম্মা, তাঁহার আদেশ মত আমাকেই করাইতে হইল, কিন্তু 'নব্যভারত' বাহির করা যে তাঁহার চিরদিনের মতন শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা জানিতাম না। ৪।৫ দিন পরে আসিব বলিয়া, একজন লোকও সঙ্গে নিলেন না; স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই—সেই বিদায় চিরজন্মের মতন বিদায়—সেই যাওয়াই তাঁহার শেষ যাওয়া, আর তিনি তাঁহার এত সাধের "আনন্দ আশ্রমে" ফিরিয়া আসিবেন না।

দেবগৃহে গিয়া, গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, গৃহের ভিতর যে দৃশ্য দেখিয়াছি—মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা আমার তীক্ষ্ণশলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্য ও সেই অনুভূতি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এখনও মনে করিতে সমস্ত শরীর মন শিহরিয়া উঠিতেছে! পরিবারের সকল ও বাহিরের কত লোক যাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত, এতটুকু অনাদরে যাঁহার অভিমানে আঘাত লাগিত, সেই দুর্জ্জয় অভিমানী, তেজীয়ান পুরুষ, অনাদরে অযত্নে কঠিন পাষাণের উপরে, মরণের কোলে গা ঢালিয়া চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন! এ পৃথিবীর রঙ্গালয়ে তাঁহার অভিনয় চিরদিনের মত শেষ হইয়া গিয়াছে! নিজের চোখ ও নিজের মনকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না—যিনি কখনও কোন জিনিষ বিনা বিচারে গ্রহণ করেন নাই এবং যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা শেষ না করিয়া ছাড়েন নাই, সেই ব্যক্তি, এই পৃথিবীতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বে, কি করিয়া বিনা বিচারে ও নির্ব্বিরোধে মৃত্যুর দূতের হস্তে, পরাজয় স্বীকার করিয়া, আত্মসমর্পণ করিলেন, এ প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

রহস্যময় বিশ্বদেবতার প্রহেলিকা ভেদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি, একবার যে তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া শেষ আশীর্ব্বাদ চাহিয়া নিবার সময় ও সুযোগ পাইলাম না! আমার অতি সামান্য ত্রুটি হইলে অভিমানে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত; এই দীর্ঘকাল আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতন রাখিয়া শেষকালে যাওয়ার সময় ফাঁকি দিয়া গেলেন। শেষ মুহূর্ত্তে প্রিয়জনের মুখ দেখিবার আশীর্ব্বাদবাণী শোনাইবার সেবা পাইবার জন্য তাঁহার দেহমন না জানি কতই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল! এ দুঃখ এ ক্ষোভ যে রাখিবার ঠাঁই নাই। আজ তাঁহার চরণে সকল অপরাধ ও সকল ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। বিদেহী তিনি আজ আমাদের সঙ্গে একাত্মক হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। বিশ্বপিতা তাঁহাকে স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় ও চিরশান্তি দান করুন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পুণ্যভূমি দেবপুরে, প্রকৃতিমাতার ক্রোড়ে
কে তুমি শুয়েছ দেব? অন্তিম শয়নে!
বীরের বাঞ্ছিত নিধি, তোমারে দিলেন বিধি,
সার্থক হইল পূজা মহাসন্ধি-ক্ষণে!
আনন্দ-আশ্রম-বাসী, অকাতরে ভালবাসি,
কত দে'ছ স্নেহ দয়া আত্ম-বিতরণ।
অন্নহীনে অন্নদিয়া, ক্ষুধাতুরে বাঁচাইয়া,
মুছালে চোখের জল ঘুচালে বেদন।
কর্ম্ম-বীর কর্ম্ম-লাগি', ভীষণ শ্মশানে জাগি,
দুর্ভিক্ষ দানবে কত, করিয়াছ জয়।
অবিচার অত্যাচারে, কঠিন নিগড় ভারে
ভাঙিয়া পড়েনি কভু ও বীর হৃদয়!
তোমার স্নেহের চক্ষে, ও তব বিশাল-বক্ষে,
ঠাঁই পেয়ে ধন্য হল কত অভাজন!
জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে, ডাকিয়াছ ভালবেসে,
আনন্দ-আশ্রম মুক্ত সবারি কারণ।
ভাগবতী তনু লয়ে, যাও দেব! নিজালয়ে
ঘুচে যেন যায় তথা হৃদয়-বেদন।
ধরণীর দুঃখ দেষ, সবি যেন হয় শেষ,
অনন্ত শান্তির জলে হয়ে নিমগন।
অনন্ত নীরধি-নীরে, জীবন-তরণী ধীরে
প্রেমের বাদাম তুলি' যাইল ভাসিয়া।
ভব কর্ণধার যিনি, আপনি লইলা তিনি,
কর্ম্মবীর পুত্রে তাঁর, বাহু প্রসারিয়া।
দুঃখ জ্বালা অবসান, হইল হে মহাপ্রাণ!
পোহাল তোমার এবে জীবন যামিনী।
জয়মাল্য লয়ে করে, দাঁড়ায়ে তোমার তরে,
আছেন সেথায় দেবী কমল-কামিনী!
হে দেবি! প্রসন্ন হয়ে, লয়ে তব প্রেমালয়ে
দেখাও তোমার চির-প্রসন্ন আনন!
যত ব্যথা হাহাকার, করে দাও চুরমার।
বহাও জীবন-মূলে প্রীতি প্রস্রবণ!
বরিষ আশীষ-রাশি, হে আনন্দ-ধাম-বাসী!
খেলা সাঙ্গ হলে যবে মুদিব নয়ন!
তব পদ চিহ্ন ধরি', তব পথ অনুসরি,
তেয়াগিতে পারি যেন এ ভব-ভবন!
আজি এ শ্রদ্ধা-অঞ্জলী, লহ দেব পুষ্পাঞ্জলী,
হোক্ দীন অধমের, সফল জীবন!
পদ-ধূলি লয়ে শিরে, সময়-সাগর-তীরে,
জীবনের মহাপূজা করি সমাপন।

শ্রীনগেন্দ্রবালা ঘোষ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

দেবীপ্রসন্ন ও "নব্যভারত"।

দেবীপ্রসন্ন তিরোধান করিয়াছেন, তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার মত লোক ত সারা বাঙ্গালায় খুঁজিয়া পাইনা। কর্ম্ম ও বচনের সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি যে মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এদেশে একান্তই দুর্ল্লভ। 'নব্যভারতে'র মধ্য দিয়া দেবীপ্রসন্নকে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি, কর্ম্মক্ষেত্রেও দেবীপ্রসন্ন সেই দেবীপ্রসন্নই ছিলেন। এমন উদার চেতা এমন নির্ভীক, এমন সত্যনিষ্ঠ, এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্ম্মীও সাহিত্যিক বাঙ্গালা দেশের পক্ষে, বিধাতার এক অভিনব দান।

নানা প্রতিবন্ধকের মধ্যদিয়াও দেবীপ্রসন্ন যেভাবে কিঞ্চিন্ন্যূন চল্লিশ বৎসর কাল 'নব্যভারত'কে চালাইয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর সাহিত্যানুরাগ এবং চিত্ত দৃঢ়তারই পরিচয় পাওয়া যায়। জনতুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে এক চঞ্চল ব্যবসাদারী সাহিত্য,এদেশে ভরিয়া উঠিতেছে সেরূপ সাহিত্যে গা ভাসাইয়া তিনি ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিতে যান নাই। যুগস্রোতের ঊর্দ্ধে তাঁহার লক্ষ্যকে ধ্রুব নিশ্চল রাখিয়া তিনি চলিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যকে সাহিত্যের সার্থকতার দিক হইতেই দেখিতেন। ব্যক্তিগত হীন লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ আনিয়া বিপনি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তাঁহাতে ছিল না। আজ এই লঘু সাহিত্য-প্রীতির যুগে এদেশের কতকগুলি মাসিক পত্র যে ভাবে পাঠক সাধারণের মন যোগাইয়া আসিতেছে, তাহাদের সহিত ভাব করিয়া চলিতেছে, সেরূপ চেষ্টা করিলে হয়ত 'নব্যভারতে'র বিক্রয় শতগুণ বৃদ্ধি পাইত ; কিন্তু দেবীপ্রসন্ন সেই লাভের মাঝে আত্ম বিক্রয়ের লোকসানকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাই 'নব্যভারত' সাধারণ চক্ষের চাকচিক্যকে বাদ দিয়া তাহার জীবনারম্ভের লক্ষ্যকে একই ভাবে বহিয়া লইয়া চলিয়াছিল। 'নব্যভারতে'র কথা বলিতে বসিয়া আজ আমাদের দুঃখ হয়, যে, বাঙ্গালী তাহার মনকে কেমন হাল্‌কা করিয়া গড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে লঘু সাহিত্যেরই প্রচার দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এদেশের পাঠক গল্প বা উপন্যাসেরই পাঠক। আনাচে কানাচে, হিন্দুর ঘর ছাড়াইয়া মুসলমানের সুদৃঢ় পর্দ্দার ভিতর পর্য্যন্ত গল্প উপন্যাস প্রবেশ করিয়া আরামের সামগ্রীরূপে পূজিত হইতেছে। গল্পোপন্যাসের প্রেমের নেশার আরামকে আমরা যে পরিমাণ বরণ করিয়া লই, কোন রূপ মস্তিষ্ক পরিচালনার ক্লেশ হইতে সেই পরিমাণেই তফাৎ থাকিতে চেষ্টা করি। সেইজন্যই দর্শন বিজ্ঞানাদি সাহিত্য আমাদের দেশের বাজারে অচল। মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা খুলিলে দেখিতে পাই, যতগুলি নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহার পনর আনাই গল্প বা উপন্যাস। অবশ্য সুরচিত গল্প বা উপন্যাসের যে সাহিত্যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু তাই বলিয়া ইহাই সাহিত্যের যথা সর্ব্বস্ব নয়। এক

বৎসরের ভিতর একজন গ্রন্থকারেরই বারো খানা উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। 'ছয় আনা সংস্করণ,' 'বারো আনা-সংস্করণ,' 'টাকা-সংস্করণ' প্রভৃতিতে যত পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, উহার সমস্ত গুলিই উপন্যাস বা গল্প।

দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসাদি সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ ত এইরূপ সংস্করণ নামে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। এইরূপ কোনো সংস্করণ বিশেষের বিজ্ঞাপন দেখিলেই যেন ধরিয়া লইতে হইবে যে, উহাতে হয়ত গল্প, নয়ত উপন্যাসের তালিকা। সংস্করণের নামে এমন সংস্কারত অন্য কোন দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে জন্মেনা। সে সব সংস্করণে যেমন গল্পোপন্যাস আছে, তেমন অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাদিও আছে, আমাদের দেশে যে অন্যরূপ হয়, তাহার কারণ, আমরা সাড়ে পনরো আনাই গল্পোপন্যাসের পাঠক ; আমরা কেবল গল্পোপন্যাসই চাই। তাই যেমনি চাহিদা তেমনিই যোগান্। অন্যান্য দেশে যে গল্পোপন্যাস কম কিংবা সেরূপ সাহিত্যের প্রতি লোকের রুচি বা আদর কম, তাহা নয়, তবে সেই তুলনায় বিভিন্ন সাহিত্যের প্রচার কিংবা পাঠক সংখ্যা আমাদের দেশের মত এমন সাংঘাতিক রকমে কম নয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই দেবীপ্রসন্ন 'নব্যভারত'কে গল্পোপন্যাস হইতে মুক্ত রাখিয়া এক শ্রেণীর পাঠক সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন। দেশের একদল লোকও উপন্যাস গল্পের মধ্যে এইরূপ একখানা মাসিক পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া ছিলেন। 'নব্যভারত' ব্যতীত আরও অল্প সংখ্যক কয়েক খানা মাসিক পত্র এইরূপ লক্ষ্য লইয়া দেখা দিয়াছিল। উহাদের কয়েকখানা 'নব্যভারতে'র অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াও অচিরেই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু 'নব্যভারত'কে দেবীপ্রসন্ন তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শত বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। 'নব্যভারত'কে জীবিত রাখিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেশের লোকের নিকট কত কাতর ক্রন্দন করিয়াছেন। তথাপি সহজ পন্থা অবলম্বনে জন-তুষ্টির ব্যবস্থা করিয়া 'নব্যভারতে'র অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসী হন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'নব্যভারতে' ব্যবসায়ের গন্ধমাত্র ছিল না। সাধারণ কাগজে, ও বহুবার যুগ্ম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উহার গ্রাহক সংখ্যা তত অধিক ছিল না। তথাপি যা' তা' বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিবেন না বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দৈন্যের দায় হইতে 'নব্যভারত'কে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠা দেবীপ্রসন্ন চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। কি সংসারে, কি সাহিত্যে, কি কর্ম্মে, কি বচনে এইরূপ দুইটী শ্রেষ্ঠ উপাদানের অভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের মনুষ্যত্ব কিরূপ ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিতে যাইয়া মনে হয়, "দেবীপ্রসন্ন, আজ দেশে তোমার একান্তই প্রয়োজন"। আমাদের জাতীয় জীবনে সত্যোপাসনার অভাব, তাই আমাদের সাহিত্যিকের মনের কথায় প্রাণের জোর নাই। আমাদের সাহিত্যে কেমন একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ, একটা ভীরুতা।

রাজনীতিকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি যে কোনো বিভাগেরই উল্লেখ করিনা কেন, জীবনের লক্ষণ কোথায়ও পাওয়া যায় না।

কেবলই দাসত্ব; অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র আমাদের দাসত্বের রজ্জু। আধুনিক সাময়িক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই নিতান্ত ভাল মানুষীই ইহাদের অধিকাংশের লক্ষ্য। ভিড়ের মাঝে যাইয়া পাছে পরের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়া ব্যবসায় নষ্ট হয় এই ভয়ে নিতান্ত বাঁধা বুলিতে ইহারা চলিতেছে। সত্যসেবীর স্বাধীন মত প্রচারের প্রয়াস মোটেই নাই। ইহাতে যেমন একটা অসাড়তা তেমন সঙ্কীর্ণতাও দৃষ্ট হয়। এরূপ নির্জ্জীবতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেবীপ্রসন্নের 'নব্যভারতে' ছিল না। দেবীপ্রসন্ন তাহাতে সকলকেই স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিতেন। গোড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিভিন্ন মতকে অবহেলা করিতেন না। সর্ব্বপ্রকারের ব্যক্তিগত স্বার্থ বর্জ্জন করিয়া সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা বিমুক্ত হইয়া তিনি নিজে যেমন নির্ভীক চিত্তে কথা বলিতেন অন্যকেও সেইরূপ কথা বলিবার অধিকার দান করিতেন। এমন কি, বিভিন্ন মাসিকপত্রিকা হইতে প্রত্যাখ্যাত অনেক সমালোচনা 'নব্যভারতে' স্থান লাভ করিত। প্রকৃত কথা, সত্যপ্রতিষ্ঠাই ছিল 'নব্যভারতের মূলমন্ত্র। দেবীপ্রসন্ন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দাসত্ব বা গোলামী করিবেন না; সেই প্রতিজ্ঞা সংসারক্ষেত্রে যেমন অটুট রাখিয়াছেন, সেই মন লইয়াই তিনি 'নব্যভারত'ও পরিচালনা করিয়াছেন। সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, আজ বাঙ্গলা সাহিত্যে নব্যভারতের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। আজ বাঙ্গলা সাহিত্যিকের প্রাণে 'নব্যভারতে'র সত্যোপাসনার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সত্যই, সাহিত্যের প্রাণ, একথা যতদিন না মানুষ বুঝে, ততদিন তাহার প্রকৃত সাহিত্য গঠিত হয় না। সাহিত্য, ব্যষ্টির স্বার্থ লইয়া নয়, সমষ্টির স্বার্থেই সাহিত্য। যেখানে সমষ্টির স্বার্থ, সেখানেই মিথ্যা, সেখানেই সত্যোপাসনার অভাব অনিবার্য্য। আজ সত্যের উপাসক, সাহিত্যের অকৃত্রিম ভক্ত দেবীপ্রসন্ন মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি তাঁহার পবিত্র শক্তিমান্ আত্মা বাঙ্গলায় সাহিত্যিকবৃন্দের দুর্ব্বল হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করুক।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

স্বর্গীয় সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দীন দরিদ্রের পিতা তুমি
কাঙ্গাল দুখীর বাপ্,
তোমার তরে আজি সবার
দারুণ শোক-তাপ।
কোথায় তুমি গেলে চলে
দীন দুখীদের ফেলে,
থাম্‌বেনা এ হায় হাহাকার
তোমায় নাহি পেলে।
দীনের জন্য কে দেয় অন্ন
এমন্ কে আর আছে?
ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র পরাণ
কেমনে ভবে বাঁচে?
তুমি ছিলে দয়ার সাগর
উদার মহান্ অতি,
দানে তুচ্ছ তোমার কাছে
কোটী লক্ষপতি।
কাঁদিতেছে সাহিত্যিক সব্
তোমায় হয়ে হারা,
এমন শিক্ষা পাবে কোথায়
বঙ্গদেশে তারা?
গদ্যে ছিলে সুপণ্ডিত
ভাবে ছিলে কবি,
তোমার মাঝে একাধারে
ছিল যেন সবি।
দিবানিশি সাহিত্যের
কর্‌তে তুমি সেবা,
তোমার মত দেশের মাঝে
বল আছে কেবা?
কর্ম্ম-জীবন ছিল তোমার
ধর্ম্মে ছিল মতি,
অল্পেতেই তুষ্ট ছিলে
যেমন পশুপতি।
তোমার তরে এদেশ যুড়ে
উঠ্‌ছে হাহাকার।
দীন দুখীদের চেয়ে দেখ
খুলি স্বর্গদ্বার।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

দেবীবাবু।

বাঙ্গালার অসংখ্য লেখকশ্রেণীর মধ্যে খাঁটী সাহিত্যসেবী দেখিতে পাই মাত্র দুই জন। প্রথম ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, দ্বিতীয় 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। সকলে সাহিত্য সেবা করেন, নিজ নিজ বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অবসর সময়ে, আর ইহাঁরা করিয়াছেন, 'শয়নে, স্বপনে, জাগ্রত নয়নে'। অন্য কর্ম্ম হইয়া তাই শুধু ইহারা দুইজনই কেবলমাত্র সাহিত্য সেবার উপর নির্ভর করিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রজনী বাবু বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। দেবী বাবু ছিলেন, তিনিও গেলেন; সুতরাং বাঙ্গালীর এক্ষেত্রে গৌরব করিবার আর কেহই থাকিলেন না।

দেবীবাবু বহু গ্রন্থের রচয়িতা, কিন্তু 'নব্যভারতে'ই যে তাঁহার বিশেষ ব্যক্তিত্বের সম্যক পরিস্ফুটন হইয়াছে একথা বলিতেই

হইবে। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া বন্ধুর প্রশংসা, শত্রুর নিন্দা, উপকৃতের সকৃতজ্ঞ করুণ দৃষ্টি, অত্যাচারীর রোষ-কষায়িত ভ্রূকুটী কিছুতেই অধীর বা বিষণ্ণ না হইয়া নিজের সুর বজায় রাখিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় 'নব্যভারতের মধ্য দিয়া তিনি যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা কখনই বিস্মৃত হইবেনা।

এই ছবি উপন্যাস ও রঙ্গরস পূর্ণ চটুল-ক্ষেত্রে কি করিয়া কি অমানুষিক শক্তি ও সাধনা বলে যে তিনি নীরস কঠোর কর্ত্তব্যের দূত 'নব্যভারতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তাহা ভাবিতেও ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে স্বতঃই আমাদের মস্তক তাঁহার উদ্দেশে অবনত হইয়া আইসে।

গত ১৫ বৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া আমরা সাহিত্যসেবায় ব্রতী হইয়াছি। প্রধান অপ্রধান প্রায় সমস্ত মাসিকপত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তবুও এতকাল মধ্যে 'নব্য-ভারতে কোন প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহস পাই নাই। আশঙ্কা, পাছে অনুপযুক্ত বলিয়া উহা ফেরৎ আইসে। যাহাহউক অবশেষে ১৩২৬ সালে ঝড়ের পূর্ব্বে 'আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতি বিষয়ক একটী প্রবন্ধ দেবীবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। আশা আমার, প্রবন্ধের দোষ ত্রুটী যাহাই থাকুক সাহিত্য রথীর নামের সংস্পর্শে উহা চলিয়া যাইবে। হইলও তাহাই। প্রবন্ধ পাইয়া দেবীবাবু লিখি-লেন, 'আপনার 'স্মৃতিপূজা' ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল। উহা এই সংখ্যায়ই যাইবে। এই শ্রেণীর আরও প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশিত হইবে।

দেবীবাবুর এই আশ্বাস বাক্যে ও আশ্বিনমাসের 'নব্যভারতে' আমার প্রবন্ধ মুদ্রিত দেখিয়া আমার ভয় ভাঙ্গিল। ক্রমে 'জজ কবি বরদাচরণ মিত্র' ও 'সখাপ্রবর্ত্তক প্রমদাচরণ সেন' শীর্ষক আর দুটী প্রবন্ধ পাঠাইলাম। দেবীবাবু এই উভয় প্রবন্ধই গ্রহণ করিয়া 'নব্যভারতে'প্রকাশ করিলেন। তারপর গত পূজার পূর্ব্বে একদিন আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়া উহা পাঠাইতে যাইতে-ছিলাম, এমন সময় আমাদের স্বগ্রামবাসী আত্মীয় শ্রীযুত গিরিজানন্দ সেন মহাশয় আসিয়া বলিলেন—'ওহে, শুনেছ, দেবীবাবু মারা গিয়াছেন?" আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলাম 'কোন দেবীবাবু?" তিনি উত্তর দিলেন—'আবার কোন দেবী-বাবু! 'নব্যভারত' সম্পাদক বাবু দেবী-প্রসন্ন রায়চৌধুরী'। দেবীবাবুর সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ কোন দিন হয় নাই, কাগজে প্রবন্ধ লেখার সম্পর্কে চিঠিপত্রের ব্যবহারও হইতেছে মাত্র এই এক বৎসর; তবুও এই সংবাদে আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল। দেবীবাবুর মৃত্যু আমার পরমাত্মীয় বিয়োগ মনে হইল। আর আমার অন্তঃস্থল মথিত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বাহির হইল 'একটা মানুষের মত মানুষ চলিয়া গেলেন'।

গিরিজাবাবু আমার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন 'একটা মানুষের মত মানুষই বটে'। এই বলিয়া তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনে কলিকাতা অবস্থান কালীন দেবীবাবুর প্রথম জীবনের অনেক কথা বলিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে মহিলা কুললক্ষ্মী কবি মানকুমারীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত অতীত ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্যসেবি-গণ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। দেবী-বাবুর কথা উঠিতেই তিনি বলিলেন—'হাঁ, খাঁটী সাহিত্যসেবী ছিলেন একজন, এই দেবীবাবু। এমন কায়মনোবাক্যে সাহিত্য সেবা করিতে আর বড় কাহাকেও দেখি নাই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও এমন অতি কম দেখিয়াছি যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে তিনি বজ্রাদপি কঠিন হইয়া অচল অটলভাবে নিজ-কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কোন বাধা কোন প্রলোভনই তাঁহাকে সঙ্কল্প বিচ্যুত করিতে পারে নাই। আবার যেখানে অত্যাচার পীড়িতের ক্রন্দন, বিপন্নের করুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে সেখানেও কুসুম কোমল হৃদয় লইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই অগ্রসর হইতে দেখিয়াছি। পাপকে তিনি চিরকালই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু পাপীকে কোনদিনই ত্যাগ করেন নাই। দেবীবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে কোন দিনই স্পর্শ করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার আর একটীমাত্র লোকের নাম করা যাইতে পারে; তিনি সিটীকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তাই মনে হয়, দেবীবাবুর স্থান আর সহজে পূর্ণ হইবে না।"

কবির সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও বলি—'দেবীবাবুর স্থান সহজে পূর্ণ হইবার নয়'। তবে ভরসা করি, তাহার পুত্র প্রভাতকুসুম বাবু পিতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কায়মনোবাক্যে দেশের ও দশের সেবা করিয়া পিতার যোগ্য সন্তানের গৌরব-লাভে সমর্থ হইবেন।'

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

১৮৮৫ কি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মাণিকদহ গ্রামে স্বর্গীয় বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোৎসবে দেবীপ্রসন্ন বাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং আলাপ হয়। তিনি আমার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। তবু তাঁহার সহিত আমার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার পরে, এই ৩০।৩৫ বৎসর কাল ব্যাপিয়া বহুসূত্রে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে হইয়াছে। এই মিলন এবং তাঁহার জীবনব্যাপী সেবা ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া, তাঁহার বিশেষত্ব কোথায় এবং দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা যেন অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। পরলোকগত আত্মার গুণাবলী উল্লেখ করিয়া সমুচিত শ্রদ্ধার্পণেই কল্যাণ হয়। দুর্ব্বলতার দিকগুলি উল্লেখে, সত্যের অপলাপ না হইলেও, তাহাতে জনসমাজের বিশেষ মঙ্গল হয় না।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর প্রকৃত প্রকৃতি ছিল

পরদুঃখানুভূতির ভিতরে। এই মৌলিক সমবেদনা হইতেই বন্ধুপ্রীতি। লোকের দারিদ্র্যমোচন, দুঃস্থের সেবা, স্বদেশও জন্মভূমির হিতসাধনকল্পে দীনতা, জীবনে কৃচ্ছ্র সাধন প্রভৃতি ফুটিয়াছিল। এই সহানুভূতি ও সমবেদনাপূর্ণ প্রাণ লইয়া দেবীবাবু বহু নিরাশ্রয় ব্রাহ্মযুবক এবং ব্রাহ্মকন্যাকে পালন করিয়াছিলেন। যাহার কোথায়ও স্থান মিলে নাই, দেবীবাবু তাকে স্থান দিয়াছেন। দেবীবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা তাঁর সর্ব্বপ্রকার সাহচর্য্য, সাহায্যে এবং সুকোমল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। যিনি ইহাঁর উপরে নির্ভর করিয়াছেন, দেবীবাবু তাঁর জন্য সবই করিয়াছেন।

নিঃসহায় পাঠ্যাবস্থায় উদার ও অগ্নিময় ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণে তাঁর জীবনে অদম্য স্বাধীনতার স্ফুরণ হইয়াছিল। এই স্বাধীনতা বহুদিকব্যাপিনী। ইহারই বলে তিনি জীবনে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজে, উপাসকমণ্ডলীতে, বন্ধুতার স্থানে বিদ্রোহ আসিয়াছে, বিচ্ছিন্নতা এবং গভীর বিষাদও ঘটিয়াছে। একাকিত্বের ভিতরে গভীর মর্ম্মবেদনা সহিয়াও তিনি উদ্যমের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া দেশের ভিতরে বিশিষ্ট ও চিহ্নিত হইয়াছিলেন। একটিদিক লক্ষ্য করিয়াছি এই যে, এই অদম্য স্বাধীনতা তাঁকে সংহত ও সংযত করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রই যেন মাথা উঁচু করিয়া তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। বিচ্ছিন্নতা ও গভীর বিষাদের মূলসূত্র এখানেও দশের সঙ্গে মিলিয়া তিনি বিশেষ কার্য্য করেন নাই। যাহা করিয়াছেন, তাহা অনেকটা নিরপেক্ষ ভাবেই, স্বাধীনতার সঙ্গেই।

সাহিত্য-সেবাতে তাঁহার আদর্শ অতীব পবিত্র এবং উজ্জ্বল ছিল। আজ সাহিত্যের ভিতরে কত লঘুতা ও তরলতার তরঙ্গ আসিয়া যুবক যুবতীদিগকে হাসিকান্নার ভিতরে চিন্তাহীন অসার করিয়া তুলিতেছে। সেইদিনে দেবীবাবুর 'নব্যভারত' আড়ম্বর বিহীন চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী সমানভাবে চিন্তাশীলের চিন্তার অন্ন যোগাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আজ সে স্থান, কে পূর্ণ করিবে? দেবীবাবুর উপন্যাস গ্রন্থগুলির ভিতরে বঙ্গীয় সমাজের অনেক প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি বিষয়ে দেবীপ্রসন্নবাবু যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। লেখা পড়িয়া মনে হইত, সঙ্গোপনে একজন পুরুষ দেশের, সমাজের এবং শিক্ষাক্ষেত্রের কথা সত্য ও নিঃস্বার্থভাবে ভাবিবার জন্য রহিয়াছেন। তাঁহার স্থান সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীতে না হইলেও দেশেরও, দশের দৃষ্টি তাঁহার দিকে ছিল।

জীবিতকালে যে সকল ধর্ম্মবন্ধু ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা তিনি করিয়াছেন,—যাহাতে অনেক অনর্থ ঘটিয়াছে,—আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদের দেহাবসানে দেবীবাবু প্রত্যেককেই স্বর্গের দেবতা না করিয়া ছাড়েন নাই। অনেক দিন ধরিয়া এ বিষয়ে ভাবিয়াছি, ইহার হেতু কি? এখন বুঝিতেছি, তিনি স্বাধীনতার সরল পথ

ধরিয়া যখন যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। ইহাতে দায়িত্বপূর্ণ গভীর চিন্তার দিক তেমন না থাকিলেও, অভিসন্ধির অবিশুদ্ধতা ছিল না।

দেবীবাবু সংযমী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দৈহিক কান্তি, মনের উদ্যম এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। পরিহাস পটুতা, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও গল্পে তাঁহার বিলক্ষণ যোগ ছিল। একত্রে অনেক স্থানে গিয়া আহারে বিহারে এবং শয়নে এগুলি অনুভব করিয়াছি।

পুরুষকারের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া, দারিদ্র্যকে পদদলিত করিয়া, কালে প্রচুর ধনাগমের পন্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিলাসব্যসনের ত্রিসীমায় তাঁর জীবন ছিল না। নিজহস্তে না করিয়াছেন এমন কোন কর্ম্ম ছিল না। দেবীবাবুর মিতব্যয়িতা সকলের পক্ষে আদর্শ না হইলেও, তাহা বহু অপব্যয়ী পুরুষের পক্ষে এক শিক্ষনীয় বিষয়।

দেশে স্পষ্টবাদী লোকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। দেবীবাবু স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। উপরে উপরে লোকের কাছে ইহাতে অপ্রিয় হইলেও, স্পষ্টবাদীর সত্যের শক্তি চিরকালই অমোঘ ও মঙ্গলজনক।

মানুষ ধর্ম্মরাজ্যে, সেবাক্ষেত্রে, ধনাগমের সূত্রে, কৃতিত্বের সোপানে বিশিষ্ট হইলেও, বহুদিন গত না হইলে এবং ধর্ম্মসাধন সত্য ও সফল না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনের একটা বড় বিষয় ধরা পড়ে না। সে বিষয়টী হইতেছে—আমিত্ব। এই আমিত্বের, অথবা অভিমানের বিষদন্ত ভাঙ্গিতে না পারিলে, এ জগতে শান্তির সম্ভাবনা নাই! বহু ধর্ম্মসাধক, দেশনায়ক, সমাজের পরিচালককে এখানে বিধ্বস্ত হইতে হইয়া থাকে। আজ দেবীবাবু স্বর্গলোকে। এ জগতে থাকিতে, তাঁহাকে ঐ স্বাধীনতার সূত্রে, এই আমিত্বের ভূমিতে, মনে হয় যেন, অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু আবারও বলি, তিনি অভিসন্ধি শূন্য, সরল, সাহসী পুরুষ ছিলেন। আজ তিনি এক মহাসভার মধ্যে সাম্যের ভূমিতে দ্বন্দ্বাতীত রাজ্যে আনন্দ লাভ করিতেছেন। তাঁহার প্রেমপূর্ণ সবল আত্মা আজ আনন্দনীরে স্নাত ও বর্দ্ধিতই হইতেছে, বিশ্বাস করি।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

পুণ্যাত্মার মহাপ্রয়াণ।

কি শুনিলাম? হায় ২৩শে আশ্বিনের 'বঙ্গবাসী' *! এ কি বজ্র হানিলে? 'নব্যভারত' প্রকাশে বিলম্ব হইলে আতঙ্কিত হৃদয়ে পত্র লিখিয়া যাঁহার সংবাদ লইয়াছি, তাঁহার কালব্যাধির কোনও কিছু জানিতে পারিলাম না! অকস্মাৎ দরিদ্রবন্ধু স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চলিয়া গেলেন! একে একে সুহৃদগণ প্রস্থান করিয়াছেন। কুস্থানে বাসহেতু নিত্য-ঝটিকা সঙ্কুল এ জীবনের একমাত্র সাহস-ভরসা সান্ত্বনাস্বরূপ চির-প্রসন্ন দেবীপ্রসন্ন আজ নিত্যধামে। আমরা কাহার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিব? মহানগরীর বক্ষঃস্থিত 'আনন্দ-আশ্রম' আজ যেরূপ নিরানন্দ, রবিকর-বিরল বংশ-বন-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র কুটীর-খানিও সেই সঙ্গে সেইরূপ শোকময়!

মহাপুরুষের মহৎ জীবনের আলেখ্য চিত্র অকপট নির্ভীকতাদর্শ পুরুষপুঙ্গবের বিয়োগে এ বঙ্গে কে না ব্যথিত হইবে? তাঁহার চরিত্রের আন্তরিকতা, তাঁহার রচিত সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হইত। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীতে এবং তাঁহার পরিচালিত ও সম্পাদিত "নব্যভারতে" এ কথার সার্থকতা পদে পদে প্রমাণিত। তিনি চরিত্রে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই চির নির্ভীক। আটত্রিশ বৎসরকাল তাঁহার পরিচালিত মাসিকপত্র "নব্যভারতে" ইহার প্রমাণ দিয়া আসিতেছে। স্বাস্থ্যোদ্ধার সংকল্পে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি দেওঘরে গিয়াছিলেন; কিন্তু দেওঘরের মৃত্তিকায় বাহাত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। যুগধর্ম্মের হিসাবে বলিতে হয়, তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন; কিন্তু দেশের ও সাহিত্যের দিকে চাহিলে মনে হয়, দেবীপ্রসন্ন! তুমি আরও বাঁচিলে না কেন? এ বঙ্গ সাহিত্যে যে এখনও তোমার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বলিলে কি হয়, নিয়তিরোধ কে করিবে? এখন তাঁহার কৃতীপুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাত কুসুম পিতার গুণানুবর্ত্তী হইয়া পিতৃ-কীর্ত্তি স্মরণীয় করিয়া রাখুন। ইহাই শোকে শান্তি।"

---

* 'বঙ্গবাসী', ২৩শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩২৭ সাল তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশ করেন—

"পরলোকে দেবীপ্রসন্ন।—এ বৎসর বঙ্গের সাহিত্য সত্য সত্যই শোকের সাগর। বিয়োগ বিধুরা বঙ্গ জননী আর একটী কৃতি পুত্র-হারাইলেন। গত সোমবার বেলা দুইটার সময় একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক "নব্যভারত"-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় দেওঘরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; আত্মবিশ্বাসমতে ইনি যেরূপ অকপটচিত্তে আত্মধর্ম্ম পালন করিতেন, এ বঙ্গে আধুনিক ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ বিরল। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত দোষ-নির্দ্দেশে এবং সে দোষপ্রক্ষালনপ্রয়াসে যেরূপ নির্ভীক চিত্তে আলোচনা সমালোচনা করিতেন, সেরূপ ত এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃ আত্মম্ভরী ব্রাহ্মের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্ম হইলেও অন্য ধর্ম্মীর যেটা সুসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন, তাহার অনুকরণের প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য নিত্য উদ্যত-লেখনী হইয়া থাকিতেন। এ হেন নিত্য হৃষ্টচিত্ত

করিতে সুযোগ্য শত তুলিকা অগ্রসর। তাহার মধ্যে এ অযোগ্য লেখনীর ব্যর্থ প্রয়াস কি জন্য? চির নিরুদ্ধ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমন অবসর আর কি মিলিবে? তাই ভক্তবৃন্দের চিত্ত-সরসী-জাত সরস-ভক্তি সরোজচয় যে চরণোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইতেছে, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিও শুষ্কবন-দুর্ব্বাদলে অঞ্জলি পূরিয়া সেই চরণে অর্পণ করিতে উৎসুক হইয়াছে।

যখন আমরা কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী) স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ প্রভৃতির হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতাস্রোতে আকণ্ঠ নিমগ্ন, সেই সময়ে কানাইপুরের কোনও বিজ্ঞব্যক্তির মুখে "নব্যভারত" কাগজের ও সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন বাবুর নাম শুনিতে পাই। আমার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় রসিকলাল রায় ফরিদপুর জেলা স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, কলিকাতা রিপণ কলেজে প্রবিষ্ট হইলে, দেবীবাবুর সহিত ক্রমে ক্রমে তাঁহার ঘনিষ্টতা জন্মে। তখন তাঁহার মুখে দেবীবাবুর সুখ্যাতি শুনিতে পাই। পাঠকগণ অবগত আছেন,—উলপুর ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম। উলপুরের বসুবংশীয় রায় চৌধুরী মহাশয়েরা জমিদার এবং বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন। শুনিয়াছি, দেবীপ্রসন্ন জাতিচক্রে বিপন্ন হইয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত হন। স্বর্গীয়া কমলকামিনী দেবীর জীবনীতে তাহা বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, ঐ সময়ে দেবীবাবুর কোনও জ্ঞাতি, কার্য্যোপলক্ষে, কয়েকবার আমাদের বাটীতে যাতায়াত করেন। লোকটী শিক্ষিত, কিন্তু ধূর্ত্ত। তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। যখন রসিকলাল দেবীপ্রসন্নের গুণমুগ্ধ ভক্ত, তখন ঐ ভদ্রলোক দেবীবাবুর অজস্র কুৎসাধারা আমাদের কর্ণে বর্ষণ করিতেন। সুতরাং, এ সময়ে আমরা দেবীপ্রসন্ন সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু স্থির করিতে পারি নাই। তাঁহাকে কখন চক্ষেও দেখি নাই। বিশেষতঃ, আমরা চিরদিন হিন্দু আচারের একান্ত পক্ষপাতী। তখন, ষ্টিমারে কি রেলপথে ভ্রমণ করিতে হইলে, হয়ত দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাস করিতাম। ঐ সময়ে আমরা দেশীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মকে প্রায় এক শ্রেণীস্থ মনে করিতাম। প্রতিবাসী মুসলমানের বিধবা-বিবাহ অকাতরে সমর্থন করিতাম। কিন্তু, হিন্দু বিধবা-বিবাহের নাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতাম। সুতরাং, রসিকলালের কথিত দেবীবাবুর ব্যক্তিগত অশেষ গুণে আমরা তৃপ্ত থাকিলেও, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মোচিত কার্য্যাবলীতে বিদ্বেষ পোষণ করিতাম।

১৩০২ সালের, মাঘ মাসে, আমরা চাকরী অন্বেষণে কলিকাতা যাইয়া ২৯নং হ্যারিসন রোডের মেসে, রসিকবাবুর সহিত একত্র অবস্থান করি। রসিক তখন ফোর্থইয়ার ক্লাসে। আমার কলিকাতা যাওয়ার কয়েকদিন পরেই, দেবীপ্রসন্নের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের শুভ-বিবাহ হয়। ঐ বিবাহে রসিকলালের নিমন্ত্রণ ছিল। শুধু নিমন্ত্রণ কেন? রসিকলালকে শুভকর্ম্ম সম্পাদন—সমিতির একজন দক্ষ সদস্য বলিলেও বলা যায়। রসিক আমাকে বিবাহ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্ম-

বিবাহ কিরূপ প্রণালীতে হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরাও কৌতূহলী ছিলাম। সুতরাং, দ্বিরুক্তি না করিয়া, রসিক রায়ের 'সবান্ধবে'র পর্য্যায়ভুক্ত হইলাম। বিবাহ দিবস অপরাহ্নে রসিকবাবুর সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম মন্দিরের পার্শ্বস্থ গলির মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—গৌরবর্ণ, শ্মশ্রুলকান্তকান্তি একটী ভদ্রলোক আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। আমি রসিকলালের পশ্চাতে। আমাকে দর্শনমাত্র ভদ্রলোকটী গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। আমি ত অবাক্। জানিতে বাকী রহিল না যে তিনিই সদানন্দ মহাপুরুষ, দেবীপ্রসন্ন!

ব্রাহ্মমতে বিবাহ পদ্ধতি যাহা দেখিলাম, তাহা হিন্দু প্রথার রূপান্তর মাত্র। বরযাত্রাকালে বক্তৃতার মুখে আশীর্ব্বচন। গোত্রপ্রবর উল্লেখে হিন্দুর মতই কন্যা সম্প্রদান। আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পৌরহিত্য করিলেন। কুশণ্ডিকার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র কয়েকটি বিবাহ সময়ে পঠিত হইল। তবে মন্ত্রগুলি সংস্কৃতে না হইয়া, বাঙ্গলায় উচ্চারিত হইল। হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল কি না, স্মরণ হয় না। গড়ের এক সাহেব সম্প্রদায় ইংলিশ ব্যাণ্ড বাজাইয়াছিল।

ঐ দিবস হইতে আমরা দেবীবাবুর বন্ধুমধ্যে গণ্য হইলাম। কিছু পরে 'নব্যভারতের' গ্রাহক ও 'সুহৃদ্ সভার' সভ্য হইলাম। দেবীপ্রসন্ন ব্রহ্ম মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক হইয়াও কস্মিনকালে আমাদিগকে হিন্দু-সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম হইতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। ১৩০৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'নব্যভারতে "৺মদনমোহন" নামে আমার একটি বৃহৎ কবিতার স্থান দিয়া উৎসাহিত করেন। তাহাতে মনে হয়, তিনি স্বয়ং নিরাকারবাদী হইয়াও, সাকারসাধনতন্ত্রে অশ্রদ্ধা পোষণ করেন নাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, ভক্তিরসে তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুপ্লুত হইয়া আসিত।

১৩০৪ সালের আষাঢ় মাসের শেষভাগে দারুণ দুর্ভিক্ষে ফরিদপুরবাসী ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। কচু, ঘেচু, পাটপাতা, ইত্যাদি দ্বারা জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছিল। অর্দ্ধাহারে,অনাহারে থাকিয়া থাকিয়া প্রতিনিয়ত মরণ-মুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে দেবীপ্রসন্ন 'সুহৃদ্ সভার' পক্ষ হইতে আমাদের অঞ্চলে ধান চাউল বিতরণ করিতে আসিয়াছিলেন। ফরিদপুরের স্কুল সাব-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। আমরা তখন রাজসাহী জেলায় চাকরী করি। দেবীবাবুর আগমন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিলাম। গ্রামবাসী বহু ভদ্রলোক তাঁহার মহৎ কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। উক্ত সনের 'সুহৃদ্-সভা'র কার্য্য বিবরণীতে তাহা বিবৃত রহিয়াছে। কত বুভুক্ষিত নরনারী এই অন্নদানের ফলে জীবনরক্ষা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। এই উপলক্ষে দেবীবাবু দিবসত্রয় আমাদের ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে ধন্য করেন।

উক্ত বৎসরের শেষভাগে পাঙ্গং কোটালীপাড়া প্রভৃতি স্থানে বিসূচিকা-রোগে মহামারী উপস্থিত করে। তখন আবার দেবীপ্রসন্ন বাবু ঔষধপূর্ণ বাক্স ও মাণিকদহের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় বিপিনবিহারী রায়ের গৃহ-চিকিৎসক মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে ধাবমান হন। ফরিদপুর আসিয়া আমার জ্বরের সংবাদ শুনিয়া,চৈত্রের খররৌদ্র শিরে ধরিয়া, সুদীর্ঘ নয় মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া আমাকে দেখিয়া যান। আমার জ্বর অতি সামান্য। দরিদ্র বন্ধু আমাদের গৃহে নারিকেল মুড়ি ও শর্করা মাত্র জলযোগ করিয়া, তখনই আবার ঐ পথ ভাঙ্গিয়া প্রস্থান করেন। বলিয়া যান, জ্বর গুরুতর বুঝিলে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া মাত্র ডাক্তার সহ উপস্থিত হইবেন।

ঐদিন হইতে বুঝিলাম, সংসারে আমরা নির্ব্বান্ধব নহি। বন্ধুহীনের বন্ধু, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা, পিতৃহীনের পিতা, দরিদ্রবৎসল দেবী প্রসন্ন অভয়-হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। সেইদিন হইতে সারাজীবন যখন যে বিপদে পড়িয়াছি, তাঁহার উপদেশে পরিচালিত হইয়া উদ্ধার পাইয়াছি। সারাজীবন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিয়াছি।

মহাত্মা আত্ম-জীবনের মমতা না করিয়া মরণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দক্ষিণ ফরিদপুর শ্মশানে পরিণত! তেমন নিদারুণ উলাউঠা বুঝি বা পৃথিবীর কুত্রাপি কখন উপস্থিত হয় নাই। গৃহে গৃহে মুমূর্ষু রোগীর আর্ত্তনাদ! জলটুকু দিবার লোক নাই। বাড়ী বাড়ী শব। সৎকার করিবার কেহ নাই। কতলোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কতজন পথে ঘাটে মাঠে পড়িয়া মরিয়া আছে। এইক্ষেত্রে, দেবীপ্রসন্ন নির্ভীক বীরের মত, কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকবার তিনি এই নিদারুণ ব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দুইবার রসিকলাল সঙ্গে ছিলেন।

আমরা যতবার কলিকাতায় গিয়াছি, সর্ব্বপ্রথম "আনন্দ আশ্রমে" উপস্থিত হইয়া দেবীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি বহুদিনের সঞ্চিত জ্বালা তাপ তাঁহার সকাশে ঢালিয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনা পীযূষে পরিষিক্ত হইয়া ফিরিয়াছি। এইরূপ

কতবার হইয়াছে। একবার কুমুদবাবুর সহিত কলিকাতা গিয়াছিলাম। কুমুদ বড় লোকের ছেলে; বড়ই শান্তশিষ্ট। দেবীবাবু তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। প্রথম সাক্ষাৎ দিনে তিনি বলিয়া দিলেন, বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে আর একবার যেন অবশ্য দেখা হয়। বাড়ী ফিরিবার দিন, অপরাহ্নে দেখা করিতে গিয়া শুনিলাম, তিনি শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া উপরের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। আমরা সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, পিতৃবৎসল শ্রীমান্ প্রভাতকুসুম বিনয়সহকারে তাঁহার অসুখের কথা জানাইয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিতেছিলেন, আমরাও ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিয়াছিলাম; এমন সময়,সিঁড়িতে জুতার-শব্দ শুনিলাম। সুহৃদ্-প্রেমিক মহাত্মা, দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া, আমাদিগকে দর্শন দিলেন। তাঁহার অসুস্থতার জন্য সত্বর বিদায় লইতে আমরা ব্যস্ত হইলেও, তিনি ধীর ও স্থিরভাবে বহুক্ষণ বসিয়া কত আলাপ করিলেন। দরিদ্র সংসারের খুঁটিনাটি তিনি যেমন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এমন আর দ্বিতীয় দেখি নাই। অনেক সময়ে নিজ জীবনের কাহিনী অকপট-চিত্তে আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট যতটুকু সময় অবস্থান করিতে পারিয়াছি, সেই সময়টুকুই বেশী মূল্যবান্ মনে করিয়াছি।

দেবীবাবুর ঈশ্বরে অটল নির্ভর ছিল। একদিন আমার বালক ভৃত্যটীর আসিবার বিলম্ব দেখিয়া আমি বড়ই বিচলিত হইয়া উঠি। তিনি আমার ভাবগতিক দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে রাখিলে এইরূপেই উদ্বেগ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ভগবানে নির্ভর করুন, কোনও চিন্তা নাই।" তাঁহার এই বাক্যের অর্দ্ধঘণ্টা পরেই, ভৃত্যটা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাঁহার বিশ্বাস দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম।

দেবীবাবু স্নেহ করুণায় রমণীর ন্যায় কোমল-স্বভাব হইলেও,কর্ত্তব্য-পালনে বজ্রাদপি

কঠিন হৃদয় ছিলেন। তাঁহার কার্য্য নির্ভুল! সেইজন্য প্রতিবাদ সহিতে পারিতেন না। একদা আমি ও রসিক 'নব্যভারত' কার্য্যালয়ে দেবীবাবুর পার্শ্বে বসিয়া আছি। শ্রীমতী সান্ত্বনা তখন ৯।১০ বৎসরের বালিকা। জানিনা কি অপরাধে, দেবীবাবু সহসা উঠিয়া গিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন, এবং কার্য্যালয়ের একপার্শ্বে দাঁড় করিয়া রাখিলেন। রসিক,ভাব বুঝিয়া, গম্ভীর হইয়া বসিলেন। আমি সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলাম। দেবীবাবু স্থিরভাবে'নব্যভারতের' প্রুফ দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আমাদের অপরিচিত, দেবীবাবুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক, একটী ভদ্রলোক কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। এবং দুই একবার 'আহা', 'উহু' করিয়া সান্ত্বনাকে সাপটিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিলেন। বুদ্ধিমতী মেয়ে পিতার প্রকৃতি সেই বয়সেই জ্ঞাত ছিলেন। কাজেই যাইতে আপত্তি করিলেন। ভদ্রলোক শুনিলেন না। ভদ্রলোকটী দেবীবাবুর জ্ঞাতি কি কুটুম্ব, আগন্তুক কি প্রতিবেশী, তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই। দেবীবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। মূর্ত্তি, স্থির—ভীষণ! হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন এবং পুনর্ব্বার সান্ত্বনাকে ধরিয়া আনিয়া পূর্ব্ববৎ দাঁড় করাইলেন। এবার কিঞ্চিৎ প্রহার প্রয়োগও হইল। দেবীপ্রসন্ন আবার নিজাসনে বসিয়া কার্য্যে মনোযোগী হইলেন। কিন্তু, কাজ আর চলে না। অন্তরে প্রলয় ঝটিকা! আমরা স্থির নির্ব্বাক! দেবীবাবু আমাদিগের দিকে চাহিয়া ভদ্রলোকের ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! আমাপেক্ষা স্নেহ বেশী তাঁর?" রসিক মৃদু সায় দিলেন। আমি বলিলাম—"ভদ্রলোকের মুরুব্বিয়ানার ফলে নিরপরাধা বালিকার দ্বিগুণ দণ্ডভোগ।" দেবীবাবু তখন বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকাইলেন। আমি প্রমাদ গণিলাম। ভাবিলাম—"এই বার বুঝি, আমার পালা।" কিন্তু আমার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। হঠাৎ আগ্নেয়গিরি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দেখিলাম, নেত্রকোণে করুণাশ্রু দেখা দিয়াছে। এই শুভ অবসরে, সান্ত্বনাকে ক্ষমা চাহিতে ইঙ্গিত করিলাম। সান্ত্বনা সভয়ে নিকটস্থ হইলে. কন্যাবৎসল পিতা একেবারে তাহাকে কোলে তুলিয়া বলিলেন—"আর এরূপ করিস না, মা!" সান্ত্বনা কাঁদিয়া বলিলেন—"আজ আমাকে ক্ষমা করুন্। আমি আর অন্যায় কিছু করিয়া আপনাকে কষ্ট দেব না বাবা!" সান্ত্বনা আর বালিকা স্বভাব-সুলভ অপরাধ করিয়াছিলেন কি না,জানি না। কিন্তু দেবীপ্রসন্নের সুবৃহৎ জীবননাট্যের এই ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্কের অভিনয় টুকু কল্য-দৃষ্ট চিত্রবৎ মনে জাগিয়া রহিয়াছে।

দেবীবাবুর পরিবারিক বিধিব্যবস্থা আদর্শ ছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী হইলেও স্ত্রী স্বাধীনতার তত্দূর পক্ষপাতী ছিলেন না। আনন্দ-আশ্রমের কোনও পুরমহিলার পিতা স্বামী বা সহোদর ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কাহাকে কোনও পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহাকে জানাইয়া লিখিতে হইত। বাহিরের পত্র সকল তাঁহার হাতে আগে আসিত। তিনি দেখিয়া ভিতরে পাঠাইতেন। বাহিরের কোনও ব্যক্তি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোনও পুরনারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। সাধের আনন্দ আশ্রমের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। কিন্তু তথাপি দুই একবার উহা আবিলতায় পূর্ণ হইয়াছে। এক সময়ে 'ফরিদপুরের' কোনও বিখ্যাত পরিবারের এক ব্যক্তি, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে লইয়া আনন্দ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ভাদ্রবধূকে পত্নী পরিচয় দিয়া দ্বিতল গৃহে সুখে বাস করিতে থাকেন। দৈবক্রমে ফরিদপুরের একজন স্কুল সাব্ ইন্‌স্পেক্টর আনন্দ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপার জানিতে পারেন। তিনি ফরিদপুর হইতে জানিয়া যান যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অঘটন ঘটাইয়া পলাতক হইয়াছেন। বন্ধুর কথায়, দেবীবাবু, নরপ্রেতকে গৃহমুক্ত করিলেন।

দেবী প্রসন্ন পবিত্র পুরুষ ছিলেন। আর তাঁহার সহধর্ম্মিনী সাধ্বী কমল কামিনী আদর্শ হিন্দু মহিলা ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্ম সমান আদরে তাঁহাদের গৃহে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। হিন্দুদের অসহনীয় কুল-গর্ব্বে যেমন তাঁহার বিরাগ ছিল, ব্রাহ্ম সমাজের অনেক বাড়াবাড়িতে তেমনই তিনি ঘৃণা পোষণ করিতেন।

আমার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় রসিকলাল রায়কে তিনি সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রসিকও সারাজীবন তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে দুই একবার সামান্য মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। শেষবার এই মনোমালিন্যের অবস্থায় রসিকলাল জ্যৈষ্ঠের বন্ধে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়া কঠিন জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া আসেন। তখন তিনি অখিল মিস্ত্রীর লেনে একমাত্র পুত্র-সহ বাস করিতেন, ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে মাষ্টারী করিতেন। রসিকের জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে দন্তমূল হইতে প্রভূত শোণিত নির্গত হইতে থাকে। দেবীপ্রসন্ন জানিবামাত্র তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া 'আনন্দ আশ্রমে' লইয়া আসেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারী ও কবিরাজীর চরম চিকিৎসা করান। বিপদ কখন একাকী আইসে না। এই সময়ে দেবীবাবুর সহোদরা ভগ্নী, যিনি সম্পদে বিপদে সম-সুখ-দুঃখ ভাগিনী ছিলেন, স্থানান্তরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র দারুণ টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পিতা মাতার ও পিতামহের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। ভগবানের অশেষ কৃপায়, বহু চিকৎসা ও শুশ্রূষার পর প্রসূন রক্ষা পাইল। রসিকের জন্য দেবীবাবুর যত্ন শুশ্রূষা, চিকিৎসা সকলই ব্যর্থ হইল। রসিক 'আনন্দ-আশ্রমে' দেহ রক্ষা করিলেন। দেবীবাবু রসিকের জন্যই সমধিক মনোযোগী ছিলেন, বলিয়াছিলেন—"প্রসূনকে দেখিবার জন্য তাহার পিতা মাতা আছে, রসিকবাবুকে আমি না দেখিলে, দেখিবে কে?"

দেবীবাবুর কার্য্যালয় স্বর্গীয় দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসু অক্ষয় কুমার, কালীপ্রসন্ন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের এবং জাতীয় মহাসমিতির সারথি বর্গের প্রতিমূর্ত্তিতে পরিশোভিত দেখিতাম। আর দেখিতাম, নানাস্থানের স্বভাব জাত লতা পুষ্প ও সুন্দর সুন্দর শ্বেত কৃষ্ণ উপল খণ্ড। কার্য্যালয়টি ক্ষুদ্র হইলেও, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁহার জীবনে কোনও আড়ম্বর ছিল না; অথচ তিনি যাহা করিতেন, তাহাই সুন্দর—তাহাই অনুকরণ যোগ্য।

দেবী প্রসন্নের প্রতিভা অসাধারণ ছিল। ভাষাসম্বন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই সমধিক প্রশংসা করিতেন। তিনি ইংরেজী কি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন না সত্য, কিন্তু কত এম, এ, পাস বাবু ও মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কত খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও যশোমণ্ডিত কবি সর্ব্বদা তাঁহার 'আনন্দ আশ্রমে' যাতায়াত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। আবার, বিষয়-বুদ্ধিও তাঁহার অনন্য-সাধারণ ছিল। কত বড় বড় ষ্টেটের ম্যানেজারেরা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। কত মোকদ্দমার পক্ষগণ তাঁহার যুক্তিমত কাজ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। স্বয়ং স্বেচ্ছায় মধ্যস্থ হইয়া কত জটিল মোকদ্দমা মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষকে ধন-দণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত সমস্ত উপন্যাস পাঠ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। "পুণ্য-প্রভা" মুদ্রিত হইলে একখণ্ড আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার "মুরলা" পাঠ করিয়া আমাদের অভিমত লিখিয়া জানাই। বুঝিতে পারিয়াছিলাম—মুরলার "অরবিন্দ" ও পুণ্যপ্রভার "প্রেমাঙ্কুর" তাঁহারই জীবনের ছায়া। আমরা তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম—'অরবিন্দ' খাঁটী সোণা! বহু মণি-মুক্তা-সংযোগে 'প্রেমাঙ্কুর'-চরিত্র রচিত বটে, কিন্তু তাহার মূল্য নির্ণয় করা ও তাহার দীপ্তি সহ্য করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। 'অরবিন্দ' যেন স্বভাবজাত সুমিষ্ট অমৃত ফল। আর 'প্রেমাঙ্কুর' নানা মসলা ও তৈল-ঘৃত সংযোগে প্রস্তুত গুরুপাক পলান্ন!" এই কয়েকটী কথা পড়িয়া তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

দেবীপ্রসন্ন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যাহা, শেষ হইল। আমরা তাঁহার জীবনের কতটুকু কিইবা জানি, বলিবই বা কি? তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তাঁহার ন্যায় কোমলে কঠোরে গঠিত বীরাত্মার সহিত এ সংসারে আর পরিচয় হয় নাই। পরকে দৃষ্টিমাত্র হৃদয় মন ঢালিয়া তিনি যেমন ভালবাসিতে পারিতেন, এমন আর দেখি নাই। তাঁহার নিকট ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সুন্দর, কুৎসিত, বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলের সমান আদর! সকলেই তাঁহাকে আপন হৃদয়ের অভিন্ন অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া মনে করিত। এই গুণেই তিনি জগৎ মাতাইয়া ছিলেন। যদিও শেষ বয়সে রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য বশতঃ সর্ব্বকার্য্যেই অশক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, তথাপি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত মনে "নব্যভারত" ও "সুহৃদ্ সভা"র সেবা করিয়াছেন। কর্ম্মী-পুরুষ কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলেন, কর্ম্ম সমাধা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীর দুঃখ দারিদ্র্য দেখিয়া যত কাঁদিয়াছেন, দুর্নীতি দেখিয়া ততোধিক কাঁদিয়াছেন। বলিতেন, "যতদিন ভারত-বাসীর পঙ্কিল চরিত্র সংশোধিত না হয়, ততদিন শত চেষ্টা করিলেও এ দেশ জাগিবে না।"

তবে যাও মহাপুরুষ! এ ধরার কলুষ-প্রবাহ এড়াইয়া যাও সেইস্থানে, যেথানে মহৎ চরিত্রের নিত্য পূজা হয়, যেখানে পরের দুঃখ পরে বুঝে, পরের অশ্রুজল সযত্নে পরে মুছাইয়া দেয়! যাও দেব, সেইস্থানে, যেখানে সাধ্বী কমল কামিনীদেবী পারিজাত মাল্য হস্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছেন, যেখানে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তোমার আলিঙ্গন-আশায় লোলুপ-দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান। যাও মঙ্গল-নিকেতনে! কিসের "আনন্দ আশ্রম?" কিসের পুরীর বা বৈদ্যনাথের নশ্বর কুটীর-নিচয়? যে আনন্দ মন্দিরে সারা বিশ্বের পবিত্র সত্ত্বা সমূহ একত্র মিলিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের জয় গাহিতে গাহিতে বিশ্বেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, তুমিও সেই মন্দিরে সেই মহানে মিলিয়া যাও। বিশ্বের দুঃখে কত জ্বলিয়াছ, এখন অনন্ত শান্তি-ধামে শান্তি সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হও।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র বসু।

কর্ম্মবীর দেবীপ্রসন্ন।

পুণ্যচরিত্র, মাতৃভূমি মাতৃভাষা এবং মাতৃ-জাতির অকৃত্রিম সেবক, অতিথিবৎসল, বিশ্বাসী, জিতেন্দ্রিয়, কর্ম্মবীর, নীরবসাধক, স্বনামধন্য পুরুষসিংহ, 'নব্যভারতে'র সুবিখ্যাত সম্পাদক, পিতৃস্থানীয় আমার মাতুল দেবীপ্রসন্নের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই নিদারুণ সংবাদ সহরে বাহিরে প্রচারিত হইয়াছে, এবং যোগ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার জীবনের কথা লিখিয়াছেন এবং লিখিতেছেন। আজ সেই নিদারুণ সংবাদ ঘোষণা বা সেই কর্ম্মময় ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী জনসমাজে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করি নাই। তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবনের দুই একটী অতি সাধারণ কথা বিবৃত করিতেছি মাত্র।

১২৬০ সনের ২৩শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমার দিন, বরিশালের অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে উলপুরের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বসুবংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতৃদেব ৺রাম-চন্দ্র বসু রায়চৌধুরী ও মাতৃদেবী ৺চন্দ্রকলা। যৌবনে তিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নূতন ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারস্থ সকলে বিমুখ হয়েন। তাঁহার মতি ফিরাইবার জন্য কতরূপ নির্য্যাতন করা হইয়াছে, কতদিন অনশন বা অর্দ্ধাশনে যাপন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মবিশ্বাসীর প্রবল ধর্ম্মানুরাগ অটল রহিয়াছে; যে কোন কাজ তিনি ভাল বলিয়া বুঝিতেন জীবন পণ করিয়া তাহার উদ্‌যাপন, এবং সম্পাদন করিতেন; শত বাধা বিঘ্ন বা প্রিয় পরিজনের চোখের জল তাঁহাকে তাঁহার অটল সংকল্প হইতে কখনই বিচ্যুত করিতে পারে নাই। 'প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর, এই ভাবে দিন কাটুক তোমার'—ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। জীবনে ইহা পালন করিতে অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন। চারণের মুখে মুখে অতীত যুদ্ধ গৌরব কাহিনী গীত হইত বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী যতবার শুনিয়াছি, ততবারই ভাবিয়াছি, ইহাও কিছু সামান্য নহে, ভাবিয়াছি, সাধারণ হইতে তাঁহার হৃদয়বল কত পরিমাণে অধিক ছিল। হিন্দুসমাজ এবং আত্মীয়ের বক্ষ হইতে প্রথমে তাঁহার অনুজাকে (আমার পরলোক-গতা মাতৃদেবী) এবং পরে তাঁহার পরলোক-গতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও এক বৎসরের শিশু পুত্রকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করিতে অনেক নির্য্যাতন সহ্য ও বহু বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। একদিন নহে, দুদিন নহে, কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত ধন-জন-বিহীন অবস্থায় জীবন সংগ্রামে যে বিশ্বাস ও হৃদয়বলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উল্লেখযোগ্য। রিক্ত হস্তে তিনি জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অতুল বিভবের অধিপতি হইয়া দশজনের একজন হইয়াছিলেন, ইহা কম সাধনার ফল নহে। মায়ের প্রসাদে তাঁহার হাতের ধুলামুষ্টি যেন সোণায় পরিণত হইয়াছে। গৃহহীন অবস্থায় একাকী গৃহের বাহিরে,—শুধু গৃহের বাহিরে নহে—পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি যে প্রেমপরিবার গঠন করেন, তাহাতে অতিথি অভ্যাগত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, অনাথ অনাথা এপর্য্যন্ত সমানভাবে গৃহ এবং আশ্রয় পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন, মহর্ষি,

শাস্ত্রী এবং অন্যান্য প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের জন্মস্থান বলিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছিল; কিন্তু জন্মভূমিকে একদিনও তিনি বিস্মৃত হয়েননাই। ফরিদপুরের উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সেবায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন; নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারের জন্য 'ফরিদপুর সুহৃদ সভা'র সংগঠন করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে বরাবর কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন; নিজ গ্রামে তাঁহার জনকের নামে 'রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ বহু সদনুষ্ঠান করিয়া এ যাবৎকাল মাতৃভূমি, মাতৃ-ভাষা এবং মাতৃজাতির সেবা করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজ, যে সমাজেই হউক, তাঁহার সহিত যাহার পরিচয় হইয়াছে, তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন এবং সুমিষ্ট আলাপে সকলেরই মন বিমুগ্ধ হইয়াছে।

পরিচ্ছন্ন-প্রিয়তা তাঁহার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য সৎগুণ। গৃহে, প্রাঙ্গনে যে কোন আবর্জ্জনা দেখিতেন, নিজহস্তে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করিতেন। সেলাই, মিস্ত্রীর কাজ, রোগীর সেবা, গৃহপালিত পশুর তত্ত্বাবধান তিনি না করিতেন এমন কাজই খুঁজিয়া পাই না। তাঁহার বেশভূষা, চালচলন অতি সামান্য লোকের মতই ছিল। জীবনে চিরকাল সকলের সেবাই করিয়া আসিয়াছেন, কখনও কাহারো সেবাগ্রহণ করিতে চাহেন নাই; মৃত্যুতেও নহে। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা; কিন্তু, অনেককেই তিনি পুত্রকন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। তাঁহার অকস্মাৎ তিরোধানে কত জন চোখের জলে ভাসিতেছেন, তাঁহার অভাবে কত গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে। যিনি কর্ম্ম এবং চরিত্রের আদর্শে সকলের হৃদয়ে সমানভাবে বিরাজমান, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তাঁহার বিয়োগে আমাদের শোক করিবার কারণ যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার পুণ্যস্মৃতিতে গৌরবের কারণ ততোধিক বিদ্যমান রহিয়াছে; এখন ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

পদব্রজে আমার বাড়ীতে আসিয়া, তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, আমার কন্যারা তাঁহার সেবা করিতে গেলে নিবারণ করিয়া বলিতেন—'এখন দরকার নাই, মৃত্যুকালে আমার মুখে জল দিও'। ইদানীং কতবার ঐ একই কথা বলিয়াছেন। সে আদেশ পালন করিবার অবসর না দিয়া, অতুল ধন-জন-পতি, দেওঘরে প্রভাত-কুটীরের একটী কক্ষে, যখন শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পুত্র, কন্যা, বধূ, পৌত্র দূরে থাক্, একজন আত্মীয়ও কাছে ছিল না যে সেই অন্তিমসময়ে মুখে জল দেয়। রোগাক্রমণের এক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল; তবু সেটুকু সময়ও, তাহার মাথায় বরফ দূরে থাক্, বাতাস ও জল দিবার জন্য কোন আত্মীয় কাছে ছিল না। 'জন্মিলে মরিতে হবে'—সকলেই জানে, কিন্তু যত বৃদ্ধ বয়সেই হউক, পিতামাতা বা যে কোন প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটিলে, শোকাবেগে প্রাণ অধীর হয়ে পড়ে। তারপর যখন ভাবি তিনি আত্মীয়-শূন্য অবস্থায়, কিরূপে দেহত্যাগ করিয়াছেন—নাজানি কত যন্ত্রণাই ভোগ করিয়াছেন, সেবা করার জন্য মালী ভিন্ন দ্বিতীয় লোক ছিল না, তখন চোখের জল সংবরণ করিতে পারি না। বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায়, অকস্মাৎ, একেবারে শেষ খবর লইয়া কলিকাতা এবং গিরিডিতে যখন তারের বার্ত্তা পৌঁছিল, তাঁহার চির সুহৃদ্

ভগ্নীপতি রোগজরাজীর্ণ দেহ লইয়া ভগ্নপ্রাণে পাগলের মত বৈদ্যনাথে গিয়াছিলেন; কিন্তু, হায়, তখন সকলই শেষ হইয়াছে! তাঁহার অতি সাধের বৌমা এবং স্নেহের 'সান্ত্বনা' মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাঁহার অন্তিম সৎকার করাইবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাঁহার পুত্রসম স্নেহের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর সংবাদ পাইয়াই অস্থির প্রাণে দেওঘরে ছুটিলেন; গিয়া দেখেন, চিতায় প্রায় সব শেষ হইয়াছে। একমাত্র পুত্র সুদূর বোম্বাইয়ে; তিনি আমাদেরই মত হতভাগ্য; শেষ দেখাও দেখিতে পাইলেন না। না জানি কোন অভিমানে আমাদের সকলকে এবং এত যে সাধের 'আনন্দ-আশ্রম' তাহাও পরিত্যাগ করিয়া সেই অক্লান্ত-কর্ম্মী নির্জ্জনে দেওঘরে চির-সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শিখিলাম,—ভাল করিয়াই শিখিলাম—যে সংসার অসার; আর, শির পাতিয়া গ্রহণ করিলাম—তাঁহার মঙ্গলবিধান। সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে, বিরহে মিলনে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। আজ সেই বিদেহী আত্মার জন্য কি আর প্রার্থনা করিব? তাঁহার চির-ঈপ্সিত শান্তিময়ী মায়ের চরণে তিনি ত স্থানলাভ করিয়াছেন; তাঁহার প্রিয়জনের সহিত মিলিয়াছেন। তবু বলি, তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক। মঙ্গলময় আজ সেই মুক্ত আত্মার কল্যাণ করুন্ এবং আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন্, এই প্রার্থনা।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

পবিত্রতা-সাধক দেবীপ্রসন্ন।

মানুষ আমরা, "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। যদি তাই হয়, তাহা হইলে সকলের আদি এই অমৃতের সন্ধান পাওয়া দরকার। সাধারণতঃ সকলে সে চেষ্টা করে না, এবং সেই চেষ্টা না করার কারণ দেখাইতে গিয়া, আমরা বলি "মায়া।" কিন্তু মাঝে মাঝে এক এক জন ব্যক্তি এই সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ফেরে। কেহ বনে যাইয়া বনস্পতির পত্রশিহরণের মধ্যে সেই সাড়া পায়, কেহ বা জনকোলাহল মুখরিত সমাজের পূর্ণপথে, দুঃখ ব্যথার আর্ত্তনাদের মধ্যে, সেই বজ্রধ্বনি বুকে বুকে অনুভব করে ও করায়। সেই জন্যই বলা যায় যে খ্রীষ্ট ও কনষ্ট্যাণ্টাইন, প্লেটো ও পেরিক্লিস, চৈতন্য ও শিবজী, প্রতাপ ও নানক, উইলবারফোর্স ও আব্রাহাম লিঙ্কন, রামমোহন ও রামকৃষ্ণ সকলেরই গতি ও লক্ষ্য ছিল একই সেই ধারা-বিগলিত প্রস্রবনে অবগাহন করা, যদিও প্রত্যেকে ছিলেন ভিন্নপথযাত্রী। দেখা গিয়াছে, ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ব্রতকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া, নিজ নিজ জীবনে সেই ব্রতের মন্ত্র প্রাণপণে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দেবীপ্রসন্ন যে এইরূপ শ্রেণীরই একজন ব্যক্তি ছিলেন, একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জীবনে বিশেষ ব্রত ছিল—পবিত্রতা ও সেবা। একবার এই ব্রত গ্রহণ করিয়া, তাহার উদ্‌যাপনে জীবনে কখনও কাতর বা পরাঙ্মুখ তিনি হন নাই। এই বিরাট আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বলিষ্ঠ কার্য্যতৎপরতার দ্বারা জীবনে আশ্চর্য্য সফলতা প্রাপ্ত হইয়া

ছিলেন। তাই তাঁহার 'সুহৃদসভা'র দীক্ষামন্ত্র ছিল—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কঠোর ভাবে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কিঞ্চিন্ন্যূন চারি বৎসর পূর্ব্বে একবার তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় একদিন আমাদের উপস্থিতিকালে তাঁর স্নেহময়ী পুত্রবধূকে বলিয়াছিলেন—"বৌমা, আমি মরে গেলে আমায় চিতায় স্থাপন করবার আগে চন্দন দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গে লিখে দিও—পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা।" কঙ্কালকঠোর রূঢ় মূর্ত্তিতে মৃত্যুর দূত যখন মরণের সিংহদ্বারের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া মানুষকে পথ দেখাইতে থাকে তখন, যে দেশে গেলে অনন্তকালের অনুবীক্ষণে জীবনের সকল সত্যমিথ্যা ধরা পড়িয়া যাইবে, সেই দেশের দ্বারপথে দাঁড়াইয়া মিথ্যা দাম্ভিকতার বাক্‌চাতুর্য্য বিস্তার করিতে পারে,এমন লোক জগতে কেহই নাই। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্ভীকচিত্তে জোর করিয়া উপরিউক্ত কথাগুলি বলায়—দেবীপ্রসন্নের চরিত্রে যে কতখানি নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না; ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহার মনের জোর শরীরের উপর কতখানি ছিল। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য লাঞ্ছিত, গৃহবিতাড়িত ও কপর্দ্দকহীন হইয়া যখন তিনি কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার (তাঁহারই কথায় বলি)"দুই পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কেটে গিয়েছে।" সেই সময় আবার পিত্রালয়ের বাধা, অনুযোগ ও ভীতি-প্রদর্শন তুচ্ছ করিয়া দেবীপ্রসন্নের সহধর্ম্মিনী প্রাতঃস্মরণীয়া সাধ্বী কমলকামিনী কিরূপে স্বামীর সহিত সম্মিলিত হন, সে এক অদ্ভুত উপন্যাস! প্রাগোক্ত পীড়ার সময় আর এক দিন উক্ত সময়কার ঘটনা বিবৃত করিতে করিতে বলেন—"আমার প্রথম সন্তান প্রভাতের জন্ম হলে তার মাকে আমি বলি—'দেখ, আমাদের এই দারিদ্র্যের মধ্যে ছেলে-পিলে বেশী হলে দুই দিক দিয়েই বড় কষ্টকর হবে। এখন থেকে আমাদের সংযমী হ'তে হবে।" তাই আমার প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের জন্মকাল মধ্যে ১২ বৎসরের ব্যবধান।" যাঁর এইরূপ ভীষণ আত্মসংযম, সংসারে থাকিয়াও প্রবৃত্তিকে যে এইরূপভাবে কঠোর তাড়না করিতে পারে, সে কি মহাযোগী নয়? পাশ্চাত্য দেশে যখন দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের মধ্যে অনিয়মিত পরিবার বৃদ্ধির সমস্যা উৎকট হইয়া উঠে, সেই সময়, নীতি-বিশারদ ম্যালথস্ ব্যবস্থা দেন যে প্রত্যেক দম্পতির সংযমী হইয়া সন্তান সংখ্যা নিয়মিত করা উচিত। নৈতিক চারিত্র্যের উপরই তিনি এই নীতি প্রতিষ্ঠা করিতে চান। কিন্তু ভোগ-লোলুপ, লালসা-পরায়ণ কূটবুদ্ধি ইউরোপ, শারীরিক ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিয়া কৃতকর্ম্মের কঠিন দায়িত্বের হাত এড়াইবার জন্য,বৈজ্ঞানিক রীতির উদ্ভাবন করিল। অন্ন ও দারিদ্র্য সমস্যার জটীলতার সঙ্গে সঙ্গে, এই ভীষ্মবীরের দেশেও, ঐ সব অমানুষিক জঘন্য প্রণালীর প্রচলন দেখা দিয়াছে। ভীষ্মের মতই আত্মজয়ী দেবীপ্রসন্নের চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের কিছু লাভ হইবে কিনা, কে জানে!

"সেবাধর্ম্ম" হিন্দুর ধর্ম্মনীতির এক বিরাট অঙ্গ। সেবার মধ্যে দেবীপ্রসন্নের জীবন

বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। অনাহারখিন্ন, রোগক্লিষ্ট দেশবাসীর ব্যাকুল আর্ত্তনাদ যে কি বেদনার করুণ কম্পন তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রে শিহরণ তুলিয়া দিত, আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দেশবাসীর বেদনা দূর করিবার জন্য অক্লান্তকর্ম্মীর কি অদম্য চেষ্টা—তাহা বাঙ্গলার, বিশেষ করিয়া ফরিদপুরের, অধিবাসীরা মর্ম্মে মর্ম্মে জানে ও স্বীকার করে। এখনও ফরিদপুরের লোক দেবচরিত্র দেবীপ্রসন্নকে দেবতার আসনে স্থান দিয়া থাকে। একবার কোটালিপাড়ার জনৈক ভদ্রলোক বলেন—"সেবার দুর্ভিক্ষের সময় দেখিয়াছিলাম দেবীবাবুর কর্ম্মশক্তি! ভোর চারটে থেকে পরদিন সকাল আটটা পর্য্যন্ত একজায়গায় একভাবে বসে চাল বিতরণ করলেন। এর মধ্যে মুখে অন্নজল নেই, এমন কি মলমূত্র ত্যাগেরও অবসর নাই। রাত্রে সেইখানেই একটা ছেঁড়া মাদুরে অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নিতেন।" সাধারণতঃ আমাদের নেতৃবৃন্দ আফিস ঘরে বসিয়া কাজ করেন—সহচরেরা উপদেশানুযায়ী চলে। ইঁহাদের মতে, সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রের মারকাটের মধ্যে থাকিলে চলিবে না, পশ্চাতে বসিয়া ইঙ্গিত করিবেন, পদ্ধতি বলিয়া দিবেন, আর সুকুমার বালক ও যুবকবৃন্দ জল ভাঙ্গিয়া, নদী সাঁতরাইয়া বিপন্নের সেবা করিবে। দেবীপ্রসন্ন এই ধরণের নেতা ছিলেন না। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে যখন অবতীর্ণ হইতেন, নিজে আগে চাকায় কাঁধ দিয়া অপরকে আহ্বান করিতেন। ৺পিতৃদেবের* মুখে শুনিয়াছি, একবার ফরিদপুরে যখন ওলাউঠার অত্যন্ত প্রকোপ হয়, মহামারীর মহাগ্রাসে গ্রাম জনশূন্য হইতে থাকে, চিকিৎসার অভাবে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে—তখন দেবীপ্রসন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স বগলে করিয়া পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিকিৎসা করেন। বর্ষাকালে দেশ জলে জলময়; কোথাও নৌকাযোগে, যেখানে নৌকা চলে না, সেখানে হাঁটিয়া, এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া, অন্ধকারে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া, অনাহারে সারাদিন ঔষধ দিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অনুচর ও সহকর্ম্মীরা তাঁহার এই কর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত ও প্রবুদ্ধ হইতেন। জীনার সমরক্ষেত্রে শত্রুর ভীষণ গোলাবৃষ্টির মুখে সঙ্কীর্ণ সেতুর উপরে স্বয়ং অগ্রগামী হইয়া নেপোলিয়নের সৈন্য চালনার বীরত্ব ও দেবীপ্রসন্নের এই আচরণ কি একই জাতীয় নয়?

তাঁহার 'সুহৃদসভা' যে ফরিদপুরের কত জলের অভাব, চিকিৎসার অভাব, যাতায়াতের সুবিধার অভাব ও জ্ঞানের অভাব দূর করিয়াছে তাহা ফরিদপুর-বাসী মাত্রেই জানেন। অবরোধ-প্রথার বাধা অতিক্রম করিয়া, অর্থ-সমস্যা সমাধান পূর্ব্বক মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার যে কত দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেবীপ্রসন্ন তাহা বুঝিয়া, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন-পূর্ব্বক, ঘরে বসিয়া পরীক্ষা দিবার সুযোগ দান করিয়া, ফরিদপুরের অন্তঃপুরচারিণীদের অল্পদিনের মধ্যেই সহজে শিক্ষিতা—অন্ততঃপক্ষে লিখিতে পড়িতে অভিজ্ঞা—করিয়া তোলেন। দেবীবাবুর এ কাজটিই তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে।

বন্ধুদের অথবা বাড়ীর কাহারও অসুখ করিলে, তিনি বয়স ও সম্পর্ক নির্ব্বিশেষে, কি ভাবে সেবা করিতেন, তাহা যে না দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না। বন্ধুপ্রীতিও তাঁহার

* স্বর্গীয় রসিকলাল রায়।

অসাধারণ ছিল। লোককে তিনি ব্যবহারে ও কথায় পরিতুষ্ট করিয়া, একেবারে অনুগত করিয়া ফেলিতে পারিতেন। একবার 'ঢোল-সমুদ্র' পার হইবার সময় তাঁহার নৌকা নিমজ্জনোন্মুখ হয়। আমার ৺পিতৃদেব নাকি তীরে দাঁড়াইয়া, যতক্ষণ নৌকা দেখা গিয়াছিল, একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন এবং সাশ্রুনয়নে করজোড়ে ভগবানের নিকট দেবীবাবুকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কবি গোবিন্দদাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে দেবীবাবুকে লেখেন—"আমি জানিতাম, একা আমিই দেবীবাবুকে ভালবাসি, সেদিন দেখিলাম আর একজনও আমার মতই আপনাকে ভক্তি করেন।" আমার পিতৃদেব সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে, তিনি দেবীবাবুকে যে কতখানি ভালবাসিতেন তাহাই আমাকে বুঝাইবার জন্য ঐ ঘটনা দেবীবাবু স্বয়ং আমার নিকট বিবৃত করেন। আজ মনে হইতেছে—আমার পিতৃদেব অশিক্ষিত ছিলেন না—অন্ধভক্তের দলভুক্ত তিনি ছিলেন না—স্বার্থান্বেষীও তিনি ছিলেন না; কিন্তু, দেবীবাবুর চরিত্রের এমনই একটা দিক ছিল, যাহা দেখিয়াই তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবং আরও অনেকে ছিলেন, এবং আছেন যাঁহারা দেবীবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহাকে ঐরূপ ভাবেই শ্রদ্ধা করিতেন।

দেবীপ্রসন্নের জীবন হইতে আর একটি খুব বড় জিনিস শিখিবার আছে, তাহা কোনরূপ শারীরিক কর্ম্মে পশ্চাৎপদ না হওয়া। যখন অর্থ তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যদ্বারা ধনী-সমাজে তাঁহার আভিজাত্য স্বীকৃত হইয়াছে, তখনও দেখিয়াছি, বাড়ীর কোথাও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে, স্বয়ং তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন! চাকরেরা কাজে ব্যস্ত, নিজেই কোঁচার একপ্রান্ত গায়ে জড়াইয়া, একটি পেরেক কিনিতে ঠন্‌ঠনিয়ার মোড় পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন। যদি এমন কোনও কাজ থাকিত যাহা ভৃত্যদের করিতে বলিলে তাহারা অপমানিত বোধ করিতে পারে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সে কার্য্য তিনি স্বয়ং করিতেন, তাহা যতই হীন কাজ হউক না কেন। একদিন বাটীর ভিত্তিগাত্রে কে কফ-মিশ্রিত নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করে; তিনি তাহা দেখিয়া,নিজেই ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে ঘষিয়া পরিষ্কার করেন। কাহাকেও আজ্ঞা করিলেই কাজটি হইত; কিন্তু, পাছে কেহ ক্ষুণ্ণ হয়, সেই জন্য তাহা করিলেন না। মানুষ কতটা উন্নত হইলে, তাহার চরিত্রে এই বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহা ভাবিবার বিষয়।

তিনি পুরুষ-সিংহ ছিলেন, তাঁহার বলিষ্ঠ ন্যায়-পরায়ণতা ছিল। যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহা বলিতেন; যাহা বলিতেন, তাহা আবার করিতেন। কাহাকেও এজন্য ভয় করেন নাই; সর্ব্বতোভাবে আপনাকে ও আপনার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টার সম্মুখে, সকল বাধা হয় মস্তক অবনত করিত, নয় চূর্ণ হইয়া যাইত।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানপত্র বিহীন হইয়াও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজের নামের স্থান আদায় করিয়া লইয়া ছিলেন। এই অ-সহযোগিতার হিড়িকে, স্কুল কলেজের বিদ্যা ব্যতীত কি করিয়া খাইব, এই আশঙ্কায় যে সকল ছাত্র ভীত হইতেছে, তাহারা দেবীবাবুর জীবনী একবার আলোচনা করিয়া দেখিলে পারে। ত্যাগ, সততা, একনিষ্ঠতা ও ঈশ্বরভক্তি থাকিলে, যে কোনও প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িলেও, মানুষ

ধনে, মানে ও জ্ঞানে নিজেকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, দেবীবাবুর জীবন তাহার দীপ্ত সাক্ষী।

সরস্বতীর সাধনা তিনি সারা জীবন একনিষ্ঠ ভাবে করিয়াছেন; অর্থ চান নাই, মানও চাহেন নাই। বাগ্দেবী কিন্তু তাঁহাকে এই দুইটাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছিলেন। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় বাম হস্ত উদরে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে পূজারীগণ বাণীর চরণে অঞ্জলি অর্পণ করেন। দেবীপ্রসন্নের পূজাপদ্ধতি এরূপ ছিল না তা' বিশেষ করিয়া বলাই বাহুল্য। তিনি হয়ত কোনও নূতন ভাবে ও নূতন পথে সাহিত্যের ধারা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, হয়ত তিনি কোনও একটা বিশেষরূপে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি যথেষ্টরূপে সাহিত্যের পালন, পোষণ ও সেবা করিয়াছেন—শুদ্ধভাবে ও শুদ্ধচিত্তে।

গৃহীব্যক্তি মাত্রেরই জীবন যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে অনেক দোষই তাহাতে পাওয়া যাইতে পারে। দেবীবাবু সম্বন্ধে যে একথা খাটে না, তাহা বলিতে চাহি না। তিনিও মানুষ ছিলেন; দোষ ত্রুটির অগম্য তিনি ছিলেন না। কিন্তু দূর হইতে আমরা দশজনে যখন নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য কোনও ব্যক্তির জীবন আলোচনা করি, বিশেষতঃ সেই সব ব্যক্তির, যাঁহারা কালের বুকে অমর পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দোষগুলি আমাদের চোখে স্পষ্ট ছায়াপাত করে না। সূর্য্যের মতই তাঁহারা তেজ ও দীপ্তিতে ভাস্বর—সূর্য্যের অদৃশ্য অঙ্গব্রণের মতই তাঁহাদের দোষও গুণরাশির অন্তরালে নেপথ্যে অবস্থান করে। দেবীবাবু যে মন্ত্রবলে জীবন উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন, যে সাধনা দ্বারা জীবন সার্থক করিয়াছিলেন, সেই আগুণের স্ফুলিঙ্গ মাত্রও যদি আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়া কর্ম্ম ও সাধনার জলন্ত আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয়, আপনাকে তাহা হইলে ধন্য মনে করিব। তাই আজ সেই স্বর্গগত মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সত্যনিষ্ঠ জীবনকে ধ্যান করিয়া, আপনাকে আপনি আহ্বান করিতেছি—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত।"

শ্রীসুধীন্দ্র লাল রায়।

পরলোকে দেবীপ্রসন্ন।

যখন গত আশ্বিন মাসে পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রৈলোক্য নাথ কবিভূষণ মহাশয়ের পত্রে পরম শ্রদ্ধাভাজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সতত শুভানুধ্যায়ী দেবীপ্রসন্ন বাবুর ইহলোক পরিত্যাগের হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইলাম, তখন সেটা এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে আঘাত আমাকে অবসন্ন করিয়া দিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ সাংঘাতিক কোন পীড়া হয় নাই, সুতরাং এরূপ সংবাদের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান কে রোধ করিবে? কখন কি ভাবে যে কাহার উপর মৃত্যু তাহার কঠোর হস্ত

বিস্তার করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং; সুতরাং, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু দেবীপ্রসন্নের এই হঠাৎ মহাপ্রস্থানে আমরা যে কি এক অমূল্য-রত্ন হারাইলাম, তাহা ভাবিতে গেলেই শোকে হৃদয় অবশ হইয়া আসে। আমাদের হতভাগ্য ফরিদপুরের এমন একনিষ্ঠ সেবক কি আর আছে? দেবীপ্রসন্নের তিরোধানে ফরিদপুরের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। এজন্য ফরিদপুর-সন্তান আমাদের, তাঁহার মৃত্যুতে আরো বেশী শোকের কারণ ঘটিয়াছে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে ফরিদপুর জেলার উলপুর গ্রামের বিখ্যাত কায়স্থ রায় চৌধুরী বংশেই তাঁহার জন্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহাকে উলপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাতে স্থায়ী বাসস্থান করিতে হইলেও, তিনি সারা জীবন ফরিদপুরের চিন্তাকেই জপমালা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। দুর্গম পথ, ম্যালেরিয়া, পচা জল-পূর্ণ খানা, ডোবা ও পুকুর কিছুই তাঁহাকে পশ্চাদপদ করিতে সক্ষম হয় নাই; ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া তিনি অশেষ অসুবিধা এবং কষ্ট সহ্য করিয়াও ফরিদপুরের নানা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্টের কথা বাসিন্দাগণের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন; তাহার প্রতিকার-কল্পে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।

'ফরিদপুর সুহৃৎ-সভা' তাঁহারই অক্লান্ত সাধনার ফল এবং তিনিই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহার জন্য তিনি আর্থিক ক্ষতি অনেক সহ্য করিয়াছেন, শারীরিক কষ্টও যথেষ্ট পাইয়াছেন। আমরা ফরিদপুর জেলা-বাসী অনেকেই মৌখিক সহানুভূতি দেখাইলেও, কাজে বড় একটা কেহই কিছু করি নাই। বার্ষিক ১৲ টাকা মাত্র চাঁদার টাকাও কত কত সভ্যের বহু বৎসরের বাকী পড়িয়া আছে, তাহা চাঁদার হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। দেবীপ্রসন্ন বাবু কিন্তু সভার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ, পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; যাঁহারা ভিতরের খবর জানেন, তাঁহারা বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। এই 'সুহৃৎ সভার' দ্বারা ফরিদপুর জেলার অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষাবিধানের জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা যদি সম্যক্ ফলবতী না হইয়া থাকে, তবে সে পক্ষে আমাদের ঔদাসীন্যই তাহার কারণ; তাঁহার ঐকান্তিকতার অভাব নহে।

আমি যখন আট কি দশ বৎসরের বালক, সেই সময় হইতেই দেবীপ্রসন্নের নামের সহিত পরিচিত হই। আমার জন্মভূমি যশাই গ্রামের নিকটবর্ত্তী, হাবাসপুর গ্রামের জ্যেষ্ঠ সোদর-তুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র নাগ মহাশয়ের নিকট হইতে আমি দেবী-বাবুর প্রণীত শরচ্চন্দ্র, সন্ন্যাসী, ভিখারী, বিরাজমোহন প্রভৃতি পুস্তক পাইয়া, সেই সময়ই উহা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করি; এবং তাহার পরই, তাঁহার "নব্যভারত" প্রকাশিত হইলে, তখন হইতেই আমি উহারও নিয়মিত পাঠক ছিলাম। সেই সময় হইতেই, আমাদের ফরিদপুরের এই গৌরব-রত্নটির প্রতি আমার হৃদয় শ্রদ্ধাবনত হইয়া

পড়ে। তারপর ক্রমে, আমার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অন্যান্য পুস্তকাবলীও আমি পাঠ করিতে থাকি, এবং তাঁহার নানা সদ্‌গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, স্বতঃই হৃদয় তাহার প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হয়।

অতঃপর কলিকাতাতে বি,এ, পড়িবার সময় তাঁহাকে প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য হয় এবং তাঁহার সঙ্গে সামান্য পরিচয়ও হইয়া যায়।

তখন হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ অজস্রধারে আমার উপর বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহার স্বভাব এমনই অমায়িক ছিল, এমনই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে তিনি জানিতেন, যে তাঁহার স্নেহপাত্রগণের প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে তাঁহাকেই তিনি সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে পড়িয়াছিলাম মনে হয়, যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ-পূত-হৃদয়া গোপকামিনীগণের প্রত্যেকেরই মনে এই অভিমান ছিল, গোপাল তাঁহারই প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত। এমনই তাঁহার প্রাণ দিয়া প্রেম-সঞ্চার করিবার প্রভাব।

দেবীবাবুর বিষয়েও কতকটা এই ভাবের অভিমান তাঁহার স্নেহপাত্রগণের মনে ছিল বলিয়া আমার ধারণা; কারণ, এইরূপ কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলাপে, এই ভাব প্রত্যেকের মধ্যেই দেখিয়াছি।

যিনি 'আনন্দাশ্রমের' সেবক, দেবী-হৃদয়া কমল কামিনীর স্বামী, পতিত, ত্যক্ত, দুঃস্থ অনাথের আশ্রয়স্থল, তাঁহার হৃদয় এইরূপ উদার প্রেম-প্রবণ হওয়াই ত স্বাভাবিক।

নীরবকর্ম্মী দেবীপ্রসন্নের, ধর্ম্ম-প্রাণ দেবী-প্রসন্নের, নির্ভিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সমালোচক ও সম্পাদক দেবীপ্রসন্নের, প্রবীণ সাহিত্য-সেবক দেবীপ্রসন্নের, দেশভক্ত স্বাবলম্বন-পন্থা দেবী-প্রসন্নের, বন্ধু-বৎসল দেবীপ্রসন্নের, সত্যৈক-ব্রত দেবীপ্রসন্নের দীর্ঘ কর্ম্মময় বিচিত্র ঘটনা-বহুল জীবনের সমুদয় কাহিনী বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য; আমি তাহা করিতেও আসি নাই। তদ্বিষয়ে আমাপেক্ষা বহুগুণে যোগ্যতর অনেক বন্ধু আছেন। আমি কেবল তাঁহার বিয়োগ-স্মৃতির তর্পণস্বরূপ দুই চারি বিন্দু অশ্রু অঞ্জলি প্রদান করিতে আসিয়াছি মাত্র। তাঁহার যে সব গুণে আমি তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলাম, তাহারই দুই একটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, তিনি কিরূপ সাদা সিদা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। সাদা ধুঁত, সাদা জামা ও চাদর, শীতের দিনেও ছাই রঙ্গের একখানা আলোয়ান, এই তাঁর পোষাক ছিল।

সাদা বাফ্‌তা কি জিনের কোটও সময় সময় ব্যবহার করিতেন কিন্তু সবই সাদা সিদা। সুগন্ধি এসেন্সাদি কখন তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দেখি নাই। পুণ্যবতী সাধ্বী কমল কামিনী তো একেবারে সেকেলে হিন্দু-ঘরের মেয়েদের আদর্শ ছিলেন। লালপেড়ে মোটা শাড়ী আর হাতের শাঁখা তাঁহার তাঁহার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারের প্রধান উপকরণ ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। একবার এই বিলাসিতার সম্বন্ধে দেবী-বাবুর সহিত আমার কথা হইতেছিল। সেই প্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে তাঁহাদের ব্রাহ্ম-সমাজে এই বিলাসিতার স্রোতটা বড় বেশী পরিমাণে প্রবাহিত

হইতেছে এবং সেজন্য ব্রাহ্ম-সমাজ নিজের পূর্ব্ব পদ-গৌরব হইতে অধঃপতিত হইয়াছেন। পুরুষদিগের অপেক্ষাও রমণীগণ এ বিষয়ে বেশী অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে ধর্ম্মাদর্শের পূজা রহিত হইয়া, বিলাস-বাহুল্যের পূজাই বেশী চলিতেছে। দেবীবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—"সেই জন্যেই তো আমার সমাজের অনেকে আমাকে দেখিতে পারেন না; কারণ আমিও ঠিক আপনার এই সব কথাই তাঁদের বলি! কি দেখে এখন লোকে ব্রাহ্ম হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে? না আছে সত্যের মর্য্যাদা; না আছে চরিত্র, না আছে কিছু! কেবল যেনতেন প্রকারেণ স্বার্থ-সাধন, আত্মোদর পূরণ, বিলাস-লীলা, উচ্ছৃঙ্খলতা, আর পরচর্চ্চা। যাঁরা এ সব ভালবাসেন না, তাঁরা দূরে সরে যেতে চান—এ সবের মধ্যে তাঁদের পোষায় না! তাই আমি কোন সমাজেরই নই, কোন সমাজেই মিশিনা; উচিত কথা বল্‌লেই লোকে চ'টে যায়; কি করি বলুন।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে নিজ মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়া নীরব হইলেন।

ধর্ম্মের গোঁড়ামি তাঁহাতে মোটেই ছিল না। সত্য-ধর্ম্ম-বোধে তিনি নিজ কৌলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অশেষ নির্য্যাতন এবং ক্লেশ সহ্য করিয়াও, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া, ধর্ম্মান্তর-বিদ্বেষ তাঁর মধ্যে ছিল না। হিন্দু-ধর্ম্মের আচরণকারীগণের মধ্যে ভাল লোক পাইলে, তাঁহা-তিনি শুধু আদর নহে, রীতিমত ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাদের কাছে কত শিক্ষনীয় বিষয় আছে তাহা উৎসাহের সঙ্গে বিবৃত করিতেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুগণের বাড়ীতে কোন পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইলে, তথায় যাইতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। আমার দাদার কলিকাতার বাসাতে একবার শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান করা হয়; দেবী বাবুকেও নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইয়াছিল। পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি তাঁর বাসাতে দেখা করিতে যাই; তিনি তখন অসুস্থ। আমাকে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেখুন, দাদা আমাকে পূজার নিমন্ত্রণ দিয়াছেন, আমিও আনন্দের সহিত যাইতাম; কিন্তু আমি অসুস্থ, ডাক্তার আমাকে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাই বাধ্য হইয়া এ স্নেহ-আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অক্ষম হইলাম। দাদা যেন, আর কিছু মনে করে, কষ্ট বোধ-না করেন। দাদা যে পূজা কচ্ছেন, সেও তো সেই জগন্মাতারই পূজা। যে রূপেই যাঁর বিশ্বাস, সবই তো সেই একেরই উদ্দেশ্যে। সুতরাং, আমার যেতে আপত্তি বা বাধা হতেই পারে না, দাদাকে বুঝিয়ে বল্‌বেন।"

একবার আমাদের একটি বাসা খোঁজ করার দরকার হওয়াতে, দেবীবাবু তাঁহার আত্মীয় একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের বাড়ীর এক অংশ আমাদিগকে লইতে পরামর্শ দেন, এবং সেই বাড়ী দেখার জন্য আমাকে সেখানে যাইতে বলেন। আমি গিয়া, বাড়ীটির যে অংশ ভাড়া দেওয়া হইবে, তাহা দেখিলাম। তারপর, বাড়ীর অধিকারীর সহিত কথা-প্রসঙ্গে জানিলাম যে, আমরা হিন্দুমতে সময় সময় যে পূজা অর্চ্চনা করিব, তাহার শঙ্খ, ঘণ্টাদির বাদ্যে তাঁহাদের অসুবিধা হইবার সম্ভব। আমি সেই কথা দেবীবাবুকে আসিয়া বলাতে তিনি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য কথা! আপনারা কি রঙ্গ-

রসের গান বাজনা করিবেন, না মদ খাইয়া ঢলাঢলি করিবেন, যে অসুবিধা হইতে পারে? ও সব কোন কথাই নহে, আমি সে সব ঠিক করিয়া দিব। পণ্ডিত মশায় ঋষি-তুল্য লোক, তাঁর সঙ্গে একত্রে বাস তো পুণ্যের কথা, ভাগ্যের কথা!" ইহাতেও তাঁহার সেই উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমার কন্যার বিবাহের সময়ও তিনি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন। আবার আমার কনিষ্ঠ তৃতীয় ভ্রাতার সাংঘাতিক পীড়া হইলে, পুরীতে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার কথা হয়, তখন তিনি সাগ্রহে তাঁহার পুরীর বাড়ীর একখণ্ড আমাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, স্বাস্থ্যকর স্থানে কয়েকটা বাড়ী করিয়া রাখিয়াছি তো এই জন্যই, যে সময় সময় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণের দরকার মত একটু উপকার করা যাইতে পারে। নিজেরাও ত সময় সময় থাকিতে পারি। আর ভাড়া দিয়া যাহা পাওয়া যায়, তার দ্বারা উহাদের মেরামত আদি কাজ চলিলেই যথেষ্ট। সত্য সত্যই দেবীবাবু যে কতদূর পর-দুঃখ কাতর ছিলেন, পরের বিপদে নিজেকে কতদূর বিপন্ন মনে করিতেন এবং কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রাণপণে পরের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য এবং সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, তাহা যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না।

বন্ধুবর ৺ রসিকলাল রায় মহাশয় যখন পীড়িত হইয়া অখিল মিস্ত্রীর লেনের মেসের বাসাতে ছিলেন, সে সময় আমি কলিকাতাতে ছিলাম। সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখিলাম যে দেবী প্রসন্ন বাবুও সেখানে উপস্থিত আছেন। তিনি রসিক বাবুকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। তখন রসিকবাবু যাইতে সম্মত হন নাই; দেখা যাউক কিরূপ দাঁড়ায়, এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমি ও দেবীবাবু একত্রেই তথা হইতে ফিরিলাম। পথে, তিনি, রসিকবাবু কেন এত সঙ্কোচ বোধ কচ্ছেন, এই বলিয়া বড় দুঃখ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তার পরদিনও রসিক বাবুকে দেখিতে গেলাম এবং তাঁহাকে দেবীবাবুর বাড়ীতে যাইতেই পরামর্শ দিলাম। তার ২।১ দিন পরেই রসিকবাবু দেবী বাবুর বাড়ীতেই আসিয়া ছিলেন। সেখানে আসার পরও আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি; তাঁর পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্র লালও তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। সেখানে দেবীবাবু এবং তাঁর পরিবারস্থ সকলে রসিক বাবুকে যেরূপ যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁর কাছেই আমি শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় যে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও, রসিকবাবু কাল-কবল হইতে রক্ষা পান নাই।

দেবীবাবু নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর এতদূর দৃঢ় ছিলেন যে তাহার বিরুদ্ধ-কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই পরিপন্থী-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; তাহার জন্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কাহারও অসন্তুষ্টি, ভ্রূকুটি, পীড়ন কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। এভাব তাঁহার দীর্ঘ-জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যে দেদীপ্যমান দেখা যায়।

এই জন্যই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়াও সে সমাজের দোষ ত্রুটি, বিচ্যুতি প্রভৃতির প্রতিবাদ বরাবর তীব্রভাবে তিনি করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রিয় বন্ধুর কার্য্যও,

অন্যায় বুঝিলে, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তিনি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। আবার অপর ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে সদ্‌গুণ, ধর্ম্ম-ভাবের বিকাশ, ঐকান্তিকতা প্রভৃতি দেখিলে তাহার প্রশংসা শতমুখে করিয়াছেন। ৺ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিরদিন ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সেই ইন্দ্রনাথের পরলোক-গমনে, দেবীবাবু যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইন্দ্রনাথের গুণস্তুতি বিষয়ে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রবন্ধ আমি বোধ হয় আর কোন কাগজে দেখি নাই।

সহজ বিশ্বাস এবং ভক্তির সহিত যে কোন ভাবে ভগবানকে ডাকিলেই যে মুক্তি-পথ প্রশস্ত হইতে পারে, এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করিতেন। আমি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে 'যমুনা'-নামক পত্রিকাতে "বিশ্বনাথ মন্দিরে" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমরা হৃদয়ে সন্দেহ এবং দ্বৈধভাব লইয়া বিশ্বনাথ মন্দিরে যাই, পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া পূজার্চ্চনা করি না, নিরক্ষর মূর্খ লোকেরা হৃদয়ের প্রবল বিশ্বাস ও ভক্তি লইয়া সেখানে যায়, সুতরাং, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিশ্বনাথের দর্শনলাভ করে, এই ভাবের কথা ছিল। সেই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দেবীবাবু আমাকে বলেন "আপনার প্রবন্ধটা আমার বেশ লেগেছে। প্রকৃত-পক্ষেই, আমি যখন দেখিতে পাই ঐরূপ সহজ বিশ্বাসী ভক্ত তাহার পাথরের ঠাকুরটির নিকট প্রাণের বাসনা জানাইতেছে, তাহার সম্মুখে দরবিগলিত ধারে অশ্রুপাত করিতেছে, তাহাকে খাওয়াইয়া, পোষাক পরাইয়া, শোওয়াইয়া পরম শান্তি পাইতেছে, তখন প্রাণে বড়ই কষ্ট হয় যে আমি কবে ঐরূপ-ভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইব। তার কাছে তো ওটা পাথর নয়। তার শুদ্ধা ভক্তি যে উহাতে অমর প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে! আহা!" —তাঁর চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

সাধন-রাজ্যে তিনি অনেক দূরই অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া আমি মনে করি, যদিও সে সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু নিজজ্ঞানে জানি না। তবে সংসারের নানা ঝড় ঝঞ্ঝা তাঁহার উপর দিয়া প্রবলভাবে বহিয়া গিয়াছে, শোক, তাপ, অনাটন, উৎপীড়ন তাঁহাকে অনেক ভয় দেখাইয়াছে, কিন্তু তিনি প্রশান্ত অটল অচল-ভাবে তাহা সহ্য করিয়াছেন; ইহাতেই তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠার পরিচয় ভালরূপই পাওয়া যায়।

যাঁহারা নিয়মিতভাবে তাঁহার 'নব্যভারত' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতেই তাঁহার চরিত্র বিশিষ্টতার অনেক পরিচয় পাইবেন। ইদানীং কিছুকাল তিনি যে 'সঙ্গ-নিকা' লিখিতেছিলেন, তাহা হইতেও তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত ভাল রূপেই জানা যাইত। তিনি রাজনীতিতে ভিক্ষার পথের পথিক ছিলেন না, গরম দলের মতই তাঁহার ছিল, তাহা আমরা জানি। আর 'সঙ্গনিকা'তে তাহা স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কুটিল কটাক্ষে ভীত হইবার লোক ছিলেন না। কখনও কাহারও খোসামোদ করিতে যান নাই, বা অনুগ্রহ-প্রার্থী হন নাই। দেহ মনে পবিত্রতা রক্ষার আগ্রহ তাঁহাতে প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। এদিকে তিনি আবার পরম উদার, শিশুর ন্যায় সরল, অমায়িক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম হইলেও তাঁহার 'নব্যভারতে' সকল সম্প্র-দায়ের লেখকগণের স্বীয় স্বাধীন-মত প্রকাশিত হইত। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা তাঁর কাছে ছিল না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেবীবাবুর প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। তিনি অনেক উপন্যাস,

প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। সমস্তগুলিই সদ্‌ভাব-উদ্দীপক এবং তাহার দ্বারা অনেকের জীবনের গতি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা জানি।

যাহারা সাহিত্য-চর্চ্চা করেন, এমন যুবক-গণকে তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। আমার ন্যায় নগণ্য অযোগ্য সাহিত্য-সেবকের অনেক প্রবন্ধের এবং প্রকাশিত পুস্তক দুইখানির সম্বন্ধেও তিনি খুব প্রশংসা করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার 'বান্ধবে' বহুকাল পূর্ব্বে (বোধহয় এখন হইতে ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে) আমি 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহা প্রকাশিত হইবার পর, আমার সঙ্গে যখন দেবীবাবুর দেখা হয়, তখন ঐ প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া আমাকে এরূপ প্রীতি-প্রফুল্ল ভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন যে, আমি বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

মধ্যে মধ্যে সমালোচনার্থ যে সব পুস্তক পাইতেন, তাহাও আমাকে পড়িতে দিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র মতামতও জানিতে চাহিতেন; কোন কোন স্থানে তাঁহার মতের সঙ্গে আমার মত না মিলিলে, আমার যুক্তি দেখাইতে বলিতেন এবং নিজ যুক্তি ও প্রদর্শন করিতেন। মাইকেল জীবনী প্রণেতা, পৃথ্বীরাজ ও শিবাজীর প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য তিনিই আমাকে বিশেষ করিয়া বলেন এবং তাঁর পরামর্শমতই যোগীন্দ্র বাবুর বাটীতে গিয়া তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়া কৃতার্থ হই।

বেশী কি আর বলিব। কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি ধর্ম্ম-প্রাণতায়, দেবী-প্রসন্ন যে স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার অভাবে তাহার শূন্যতা পূর্ণ হওয়া কঠিন।

তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম বাবুর এ বিয়োগ বেদনাতে স্বীয় বেদনার অশ্রু-সেচন করা ভিন্ন আমাদের আর কি করণীয় আছে? দেবী বাবু ব্রহ্মপদে চির-শান্তি লাভ করিয়াছেন। প্রভাত বাবু সেই দেবোপম কর্ম্মী মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনু-সরণ পূর্ব্বক, সংসারে পরম প্রতিষ্ঠা-লাভ করুন, ভগবৎ চরণে এই প্রার্থনা।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

"দেবী"-বিয়োগে।

হে বঙ্গজননী! তুলি ফুল সাজি ভরে
প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-পূত পবিত্র অন্তরে
অর্পিলা জীবন-অর্ঘ্য যে মহান্ প্রাণ
আজি সে নীরব হেথা, নীরব প্রয়াণ!
'মুরলা' 'সন্ন্যাসী' চিত্র অমল ভাষায়,
আঁকিয়া নিখুত ছবি সরলতাময়;
কে ভুলাবে কে কাঁদাবে বাঙ্গালীর মন
আজি সে নীরব বীণা, নীরব এখন।
কোলাহলময় এই সংসারের কাজে
তোমারি প্রতিভা-দীপ্তি সতত বিরাজে;
সাধিয়া মহান্-ব্রত, হে মৌন, মধুর,
লভিলা বিশ্রাম এবে পুণ্য দেব-পুর
দেব-গৃহ কোলে। মরণ?—মরণে মিলন
এ যে তার প্রাণভরা সুখ-সম্মিলন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থ

ভারতী মায়ের স্নিগ্ধ জ্ঞান-দীপ্তি নিয়ে
হে "দেবীপ্রসন্ন", তুমি সব প্রাণ দিয়ে
সাধিলে যে দিন সেই একেশ্বর কথা,
রহিবে স্মরণ তাহা মরমেতে গাঁথা ;
সত্য-ধর্ম্ম, জ্ঞান-মর্ম্ম মহিমা প্রচার,
করিবে তোমার কীর্ত্তি, অক্ষয় অপার।
তোমারি বিহনে হায়, ভারতী মাতার
দুটি চোখে ঝর্ ঝরে নয়ন আসার।

তাই মোর শেষ ভিক্ষা, হে মহান্ ঋষি,
সাম্য-প্রেম-মৈত্রী পথে মাতাইয়া দিশি,
শিখাতে একের মন্ত্র ভাই ভগ্নীগণে—
আবার আবার পুনঃ এসো এ ভুবনে।

* * * * * * * *

সবি তো নিবিয়া গেল, নিবিল রে আলো,
ধন্য আমি—ধন্য তাঁরে বাসিয়াছি ভালো।

শ্রীপ্রফুল্লশেখর মিত্র।

গুটি দুই কথা।

তিনি নাই। তাও কি হইতে পারে? তিনি আছেন, তিনি উচ্চতর লোকে গিয়াছেন। হতভাগ্য আমরা, তাঁহার সেই সৌম্য, সেই উৎসাহ-দীপ্ত-মূর্ত্তির দর্শন-লাভে বঞ্চিত হইয়াছি।

দেবীপ্রসন্নের সহিত আমার পরিচয় প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে। তিনি তখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক, আমি সবেমাত্র কলেজে প্রবেশ করিয়াছি। বয়স ও অবস্থাগত পার্থক্য তিনি অনুভব করিতে দিলেন না। তাহার পর, কতবার, কত সময়, কত উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে, বরাবর কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতন দেখিয়াছেন। কত সুখ দুঃখের কথা কহিয়াছেন, দেশের কত কথা আলোচনা করিয়াছেন, 'নব্য ভারতে' লেখার জন্য কত উৎসাহিত করিয়াছেন। সেরূপ আন্তরিকতা আর কোথায় পাইব।

দেশের ও দশের সেবা, বিলাসিতা-বর্জ্জন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি বলিতেন, যখন দেশের লোকের অবস্থা দেখি, উদরান্নের অভাব দেখি, কত আত্মীয়স্বজনের অর্থ-কষ্ট দেখি, অমনই মনে হয় বিলাসিতায় অধিকার নাই। তিনি স্ব-গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, স্ব-গৃহে 'আনন্দাশ্রমের' অনেকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্ব-জেলায় দুর্ভিক্ষ বা মারীভয় উপস্থিত হইলে তখনই সেবাব্রতে লাগিয়া যাইতেন ; কিন্তু নিজেরও নিজ পরিবারের জীবনে, চিরকাল তাঁহার আদর্শ ছিল, plain living and high thinking। কখনও তাঁহাকে পায়ে মোজা ব্যবহার করিতে দেখি নাই ; পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই নিতান্ত সাদাসিধে রকমের ছিল ; খাদ্য দ্রব্যে কখনই অপব্যয়ী ছিলেন না।

পুত্র প্রভাতকুসুমের বিবাহের পর, তাঁহার পুত্রবধূর পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে দেখাইতে আনিয়াছিলেন ; তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলেন,—'উহা আমাকে দেখান কেন, আমার নিকট ছাই মুষ্টিও যাহা, এ অলঙ্কার-সমষ্টিও তাই'। গল্পটি তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছিলাম। সূত্রধরের যন্ত্রাদি তিনি নিজে রাখিতেন ও ব্যবহার করিতেন। দেওয়ালে চূণের লেপ দিয়া, সেই অপরিষ্কৃত হস্তে বৈঠকখানায় কথা কহিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি।

তাঁহার দেবী প্রতিমা সহধর্ম্মিণী তাঁহারই দৃষ্টান্ত ও উপদেশে অনুপ্রাণিতা ছিলেন।

একমাত্র পুত্র প্রভাত কুসুমকে বিলাত পাঠাইবার সময়ে তিনি দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার, দেশীয় ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি বদ্ধ করিয়া লন। দেশী ভাষার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কত বড় বড় সাহেবী ধরণের বাঙ্গালীর ইংরেজী চিঠির তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তর দিয়াছেন। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও, তিনি "নব্যভারত"কে কখনও হস্তচ্যুত করেন নাই। এত দীর্ঘকাল, এক হস্তে, কোনও মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালা দেশে পরিচালিত হয় নাই। নব্যভারত চিরকাল একভাবে চলিয়াছে। কখনও গল্প বা উপন্যাসের সমাবেশ দ্বারা ইহার গুরুত্বের লাঘব করেন নাই। গল্প ও উপন্যাস না থাকিলে মাসিক পত্রিকা এ দেশে বেশী কাটে না, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু সামান্য অর্থের জন্য কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সাহিত্যের গতি নিয়মিত করিবেন, তরল সাহিত্যের আশ্রয়স্থল করিয়া নব্যভারতের আসন নিম্নে নামাইবেন না, ইহা তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। অনেক বিজ্ঞাপন প্রতারণামূলক ও বিলাসিতা বর্দ্ধক বলিয়া তিনি (মলাটের পৃষ্ঠায় সামান্য কয়েকটী ব্যতীত) নব্যভারতের দেহ কখনই বিজ্ঞাপনদ্বারা ভারাক্রান্ত করিতেন না। বিজ্ঞাপন যে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পক্ষে একটী বিশেষ লাভজনক ব্যাপার তাহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু বিলাসিতা ও প্রতারণা নিবারণ তিনি গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করিতেন। নব্যভারতের কাগজ ও ছাপাও এইজন্য বরাবর বিলাসিতা বর্জ্জিত রহিয়া গিয়াছে। তরল-সাহিত্যের অঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বারবণিতার অভিনয় চিরকাল তাঁহার ঘৃণার বিষয় ছিল। সাধ্যমত কায়িক পরিশ্রমে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ঘরে কলি ফিরান ও সূত্রধরের কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। নব্যভারতের উপরে গ্রাহকের ঠিকানা পর্য্যন্ত তিনি স্বহস্তে লিখিতেন। প্রত্যেক গ্রাহকের হিসাব তিনি নিজে রাখিতেন।

তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম জীবনে ধর্ম্মবিশ্বাসের উত্তেজনায় গৃহ ও গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। স্বাধীন ভাব ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থার অশেষবিধ তাড়নার মধ্যেও কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হন। শুনিয়াছি তিনি এই অবস্থা হইতে প্রথমে যে অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কোনও সমশ্রেণীর দুরবস্থাপন্ন বন্ধুকে, আলুর ব্যবসায়ের জন্য দেন। বন্ধুটী এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ফরিদপুরের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা কোন কালেও ভুলিবার নয়। সুহৃদ্ সভা তাঁহার অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত ছিল। রুগ্নদেহে পুনঃ পুনঃ ইহার সম্পাদকীয় ভার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেও ফরিদপুরবাসী তাঁহাকে ছাড়ে নাই। জানি না তাঁহার অবর্ত্তমানে ইহার কি হইবে।

সত্যকে মূল সূত্র করিয়া তিনি জীবনক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, স্বাধীন ভাবের প্ররোচনায় তিনি যে কখনও পার্থিব বিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করেন নাই এ কথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার শ্রেণীর লোক সেদিকে লক্ষ্য রাখে না। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া

উঠিতেন। পূর্ব্বপুরুষের সমাজের নিগ্রহ মস্তক পাতিয়া লইয়া তিনি যে সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী সময়ে সত্যের অনুরোধে অনেক সময়ই জলন্ত ভাষায় তাহার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার সেই স্বাধীন ভাবের প্ররোচনায় তাহা হইতে কতকটা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার সৌম্য মুখশ্রী বক্তৃতা-কালে অনেক সময় আন্তরিক তেজে অগ্নিময় হইয়া উঠিত। বোধ হইত যেন তাঁহার প্রতি বাক্যে বিশ্বাস মূর্ত্তিমান হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য-সেবক ভক্ত দেবীপ্রসন্ন।

বঙ্গের সাহিত্যাকাশ হইতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল! বঙ্গের সাহিত্য কাননে প্রস্ফুটিত কুসুম "নব্যভারত" শ্রীহীন হইলেন! দেবী প্রসন্নের বৈদ্যুতিক লেখনী নীরব হইল! ভক্ত দেবী ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন! যে সাহিত্যাকাশ হইতে "অক্ষয়", "ঈশ্বরচন্দ্র", "বঙ্কিম" প্রভৃতি মনীষীগণ চলিয়া গিয়াছেন, সেই সাহিত্যা-কাশ হইতে সাহিত্য সেবক "ভক্ত দেবী" চলিয়া গেলেন! মাতা বঙ্গভূমি তাঁহার এক পুত্র রত্ন হারাইলেন! ব্রাহ্ম সমাজের কক্ষ হইতে যে সকল সাহিত্যানুরাগী মহাশয়গণ তাঁহাদের সুলেখনী প্রসূত গ্রন্থ ও সাহিত্য-পত্র দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের সেবার জন্য দাঁড়াইয়া-ছিলেন, ভক্ত দেবী তাঁহাদের মধ্যে একজন। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জলন্ত ও নবীন উৎসাহের সহিত যে সকল গ্রন্থকার ও সুলেখকগণ কার্য্যক্ষেত্রে শোণিত-দান করিয়া গিয়াছেন, দৈবশক্তি পরিচালিত "দেবী"ও তাঁহাদের মধ্যে একজন। হৃদয়ের স্বাধীনতা তেজস্বিতা ও মনস্বিতার অদমনীয় প্রভাবে যে লেখকগণ তাঁহাদের লেখনী সঞ্চলন করিয়া গিয়াছেন, কর্ম্মবীর ও ভক্তবীর "দেবীও" তাঁহাদেরমধ্যে একজন। "নব্য ভারত" নবীন-ভারতে সত্য সত্য এক দিন যুগান্তর উপস্থিত করিয়া ছিলেন। সত্যই এতদিন পরে "নব্যভারত" পিতৃহীন হইলেন! জানিনা আজ কোন্ কর্ণধার আসিয়া বিপর্য্যস্ত তরীর কর্ণ ধারণ করিবেন!

ভক্ত "দেবী প্রসন্ন", জীবনে সাহিত্য সেবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় ও অতুলনীয় তেজস্বিতা দেখাইয়া গিয়াছেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রেও স্বাধীন প্রাণতা ও স্বাধীন ভাবেরও বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন বিভাগের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, স্বাধীন নিরপেক্ষ মতের পরিচয় দিয়া থাকেন, ভক্ত দেবীপ্রসন্ন তাঁহাদের মধ্যে একজন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা স্বর্গগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" সম্বন্ধে যে সমুদয় অযথা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, স্বাধীন চেতা "দেবীপ্রসন্ন", তাঁহার স্বাধীন সহযোগী স্বর্গগত ভক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনী-সম্ভূত প্রবন্ধগুলি, ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিকী সত্যপরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকগণের লিখিত প্রবন্ধ নিচয় তাদৃশী ন্যায়পরতা-প্রবৃত্তির পরিচালনায়

স্বীয় পত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায় ও সত্য যেখানে অবমানিত হইয়াছেন, সেখানে "দেবীপ্রসন্নের" লেখনী নীরব থাকিতে পারে নাই। তাঁহাকে অনেক সময় অনেক কথা লিখিতে হইয়াছে। বিসদৃশ আবরণে সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখা দেবীপ্রসন্নের নিকট এক বিভী-ষিকা-পূর্ণ পাপরূপে প্রকাশিত হইত। পাপ-বোধ তাঁহার খুব প্রবল ছিল।

অবশ্য আজ ইহা বলিতে আসি নাই যে শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত ইতিহাস সম্বন্ধে ন্যায়ানুমোদিত সমালোচনা প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর ভক্ত "দেবীপ্রসন্ন" শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করিয়া "নব্যভারতে" হৃদয়ের উচ্ছাস ও সহানুভূতি-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে তাঁহার ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয় হইয়াছিল যে তিনি বর্ত্তমান ব্রাহ্মবিধানকে "নববিধান" বলিয়া ধরিতে পারেন নাই। অবশ্য আমরাও এ সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য, ভক্ত ও সাহিত্য-সেবক "দেবীপ্রসন্নের" নিকট ব্রাহ্ম সমাজ ও বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ঋণী। তাঁহার ইহধাম পরিত্যাগে আমরা সকলেই বিশেষ অভাব ও শোকগ্রস্ত! তাঁহার পবিত্র ও প্রেতআত্মা দেবধামে সেই শান্তিময়ী জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে চিরদিন বাস করিতে থাকুন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ, মজুমদার।

শোকাশ্রু।

(১)

চলিলে দুঃখীর সখা!
স্মৃতি-পটে থাক আঁকা,
শান্ত মূরতি তব করি দরশন
জুড়াব মরম ব্যথা, ওহে মহাত্মন!

(২)

সাহিত্য-সেবার তরে
নিজ দেহপাত ক'রে,
এ "নব্যভারত" করি প্রতিষ্ঠা, পালন,
সাহিত্য-মন্দিরে পেলে তুমি উচ্চাসন।

(৩)

দীন দুঃখী তোমা তরে
অশ্রু বরিষণ করে,
অন্নদানে নিত্য শোভে ভবন তোমার;
রাখুক তোমার কীর্ত্তি তোমার কুমার।

(৪)

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-বলে
সাধনায় সিদ্ধ হ'লে,
জীবনের মহাব্রত হ'ল সমাপন,
পুণ্যবলে যাও চ'লে শান্তি-নিকেতন।

(৫)

যতেক অমরগণ
করে তোমা আবাহন,
কিন্নর কিন্নরী গায় সুযশ' তোমার,
তোমা তরে উদ্ঘাটিত অমরার দ্বার।

(৬)

ধন্য বৈজয়ন্ত ধাম!
শান্তি যথাঅবিরাম,
অমিশ্র আনন্দ-ধারা বহে শতধারে,
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু যথা যেতে নারে।

(৭)

নাহি বৃদ্ধি নাহি ক্ষয়,
সকলি অক্ষয় রয়,
অমর জগতে হয় অমর জীবন,
সমভাবে যথা শোভে লাবণ্য যৌবন।

(৮)

পবিত্র অমরালয়
পুণ্যতেজে জ্যোতির্ম্ময়,
দিব্যগন্ধবহ যথা বহে নিরন্তর,
উছলিত শত শত অমৃত-নির্ঝর।

(৯)

দুর্লভ ত্রিদিব ধাম !
পুণ্য লোক প্রাণারাম !
নিত্যধাম নাহি মিলে কোটি রত্ন দিলে,
নিরমল পুণ্যবলে দিব্যধাম মিলে।

(১০)

এ হেন ত্রিদশালয়ে
স্বর্গীয়া পত্নীরে ল'য়ে,
অনন্ত আনন্দে তুমি করহে বিশ্রাম,
পুণ্য লোকে ধন্য হো'ক তব পুণ্যনাম !

শ্রীরাখালদাস কবিরত্ন।

বন্ধুর স্মৃতি।

যখন মেডিকেল কলেজে পড়িতাম, আড়াই শতের অধিক ছেলের ভিতরে কাহাকে দেখিয়াছি না দেখিয়াছি স্মরণ নাই, তখন তাঁহাকে চিনি নাই। কিন্তু নাম জানিতাম না বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম সমাজের যে দল সাধারণ নামে অভিহিত হইলেন, তাহাদের মধ্যে একদল প্রতিবাদকারী আর সাধারণ সমাজে স্থান গ্রহণ করিলেন না, দেবীবাবু যে তাহাদের অন্যতম তাহা জানিতাম, শ্রদ্ধাস্পদ আনন্দমোহন শিবনাথ প্রভৃতি মহোদয়গণের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব এ দল সহ্য করিতে না পারিয়াই সাধারণ সমাজের বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে গভীর অনুরাগ, সমাজ সংস্কারের প্রবল স্পৃহা স্বাধীন চিন্তার প্রবল তেজ ইহাদিগের মধ্যে লক্ষিত হইত। কিন্তু কাহারও অনুগত হইয়া চলিবার ইহাদের বাসনা ছিল না। যাহা হউক তাঁহার জীবন চরিত আখ্যায়ক এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করিবেন।

আমি ছাত্র জীবনে বীণায় কয়েকটী কবিতা দিয়াছিলাম, বগুড়া আসিয়া কয়েক বৎসর কোন সুবিখ্যাত কাগজে লিখি নাই। প্রথম কবিতা নব্যভারতে "প্রেম"

অমিয়ার ধারা সম এ মর মরত ধামে
তুইলো পিরীতি।

এই কবিতার পরে প্রায় প্রবন্ধই নব্যভারতে তিনি সাদরে গ্রহণ করিবেন, এবং তখন হইতেই এ অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি প্রিয় সুহৃদ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি বোধ হয় ১৮৮২ সালে বগুড়ায় আগমন করেন, তখন হইতেই তাহার সহিত বন্ধুতা ঘনীভূত হয়, তৎপরে ক্রমে জমাট ভাব স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালের এলাহাবাদ কংগ্রেসের পরে কয়েকটী রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। যখন কলিকাতা গিয়াছি, অনেক কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব থাকা সত্ত্বেও, দেবীবাবুর আনন্দাশ্রম যেন আমার একটী শান্তি নিকেতন বলিয়া বোধ হইত। এবং কত মনীষী বর্গের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ হইত। মনে হইত যেমন এডিসন, ষ্টিল, সুইফট্ প্রভৃতি এক সাহিত্য-মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন, দেবীবাবুর গৃহে এইরূপ মণ্ডলী মধ্যে আসিয়া পড়িতাম, এবং ধর্ম্মনীতি রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েই প্রধানতঃ আলাপ হইত। তাহাতে দেখিতাম, দেবীবাবু সম্পূর্ণ স্বাধীন চেতা, কখনও মত সংযম করিতেন না। তাঁহার আদর্শ ম্যাটসিনির মত ; স্বদেশ প্রেমিকতাও আত্ম বিসর্জ্জন, পোষাকে, আহার বিহারে, সকল কার্য্যে এমন সংযম দেখিয়াছি,

এ যুগের লোকের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কোন দিন কোন জাঁকাল পোষাক পরিচ্ছদ কি বিলাস বাসনা তাঁহার দেখি নাই, সর্ব্বদাই দেশের জন্য প্রাণে একটা বিষাদ তাঁহার প্রতি কার্য্যে দেখিতাম,'যে দেশের নভোদেশে, নিত্য মেঘ সেজে এসে, করে নিত্য বারিবরিষণ'।

সেই দেশের অধিবাসীর উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে কি প্রয়োজন? মুখে আমরা বলিতাম বটে, কিন্তু একমাত্র দেবীবাবুকেই কার্য্যে সেরূপ অনুষ্ঠান করিতে দেখিতাম। দুঃখী নরনারীর জন্য তাহার প্রাণ কান্দিত, কত শিশু ছেলে মেয়ে অনাথ অনাথিনীগণ তাঁহার যত্নে প্রতিপালিত হইত। তাহাদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় আজিও প্রাপ্ত হই। দেবীবাবুর দীর্ঘ জীবন কর্ম্মময় ও পরসেবায় উৎসর্গীত দুর্ভিক্ষে, রোগে, বিপদে তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে কত দেশের উপকার করিয়াছেন, কোটালিপাড়ের দুর্ভিক্ষ, ও ফরিদপুরে অন্যান্য স্থানের অন্নকষ্টের জন্য তাঁহার প্রাণ বিদীর্ণ হইত, ও অকাতরে তিনি লোক সেবার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতেন। এমন সাধু জীবন যে আরও অধিক দিন দেশের সেবা করিয়া প্রাণ সার্থক করিতে পারিলেন না; ইহা দেশের দুর্ভাগ্য। এক্ষণে আমরা কয়েকটী বন্ধু তাঁহার শোক বহন করিয়া জীবিত রহিলাম, ভগবানের কৃপায় স্বর্গে সেই আনন্দ আশ্রমে পুনর্ম্মিলিত হইব, এই বাসনা। দয়াময় ঈশ্বর এই পুণ্যময় জীবনকে পরকালে সুখে ও শান্তিতে রাখুন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

সদ্দৃষ্টান্তের স্মারক।

স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন চৌধুরী আমার একজন যৌবনকালের বন্ধু। ঠিক কোন সময়ে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় স্মরণ হইতেছে না। ১৮৭৬ কি ৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভগ্নী ৺বিরজাদেবীকে আমি বালিগঞ্জে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইবার জন্য লইয়া যাই। সেই সময়ে আমি ঐ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ছিলাম। কিছু দিন পরে Indian Association বা 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং আমরা উভয়ে ৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে সেই Indian Associationএর বাড়িতে বাস করি। তখন দেবীবাবু তাঁহার "শরচ্চন্দ্র" এবং "বিরাজমোহন" প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি সেই সময়ে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যস্থল চট্টগ্রামে যাই। তখন রেল ছিল না, জাহাজে চট্টগ্রামে যাইতে হইত। আবার জেটীও ছিল না, ডিঙ্গীতে করিয়া গিয়া জাহাজে উঠিতে হইত। জাহাজে উঠিবার সময়ে ঘটনাক্রমে আমার স্ত্রীর শাড়ীতে অনেক কাদা লাগে। দেবীবাবু অনেক যত্নের সহিত সেই শাড়ীর কাদা ধুইয়া আমাদিগকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে পর আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ১৮৭৮ সনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম হয়। বৎসর চারি পরে আমি আমার কর্ম্মস্থল কলিকাতা ফিরিয়া আসি। তখন দেবীবাবু ও দ্বারিকবাবু প্রভৃতির সঙ্গে কিছু দিনের জন্য এক বাড়িতে বাস করি সেই সময়ে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্ম হয়। সেই সময়ে দেবীবাবুর পত্নী এবং ভগ্নী আমাদিগের

যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এ জীবনে ভুলিব না। অনেক বিষয়ে দেবীবাবু গুরুর ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই সময় এই "আনন্দ আশ্রম" নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তখন কত যে পরিশ্রম করিতেন বলিতে পারি না। তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যহ নিজেদের বাজার করিতেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমিও নিজ হাতে নিজেদের বাজার করিতে আরম্ভ করি। ব্রাহ্ম সমাজ মুখে হিন্দু মুসলমানকে সমান বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু একমাত্র দেবীবাবুকেই দেখিয়াছি কার্য্যতঃ তাঁহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সামসুদ্দীন বলিয়া একটি মুসলমান বালককে ঘরের ছেলের মতন তিনি পালন করিতেন। চাকরদের প্রতি সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তাঁহার কাছে যেরূপ দেখিয়াছি, এমন আর কোথাও দেখি নাই। 'কুঞ্জকে' প্রথম হইতেই নব্যভারতের কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। কুঞ্জের প্রতি তিনি একেবারে নিজের রক্ত মাংসের সম্পর্কিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং পুত্রকে তাহার পায়ের ধূলা নিয়া প্রণাম করিতে শিখাইয়াছেন। এরূপ উদার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখি নাই।

কত অসহায় বালবিধবা তাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে, এ সকল সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্ত আর যে কোথায় দেখিতে পাইব, জানি না। ভগবান তাঁর স্বর্গীয় আত্মাকে তাঁর সদ্দৃষ্টান্তের ফল প্রদান করুন। এবং আমাদিগের মধ্যে তাঁহার সেই স্বর্গীয় প্রভা বিস্তার করুন।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

স্মৃতি-পত্র।

জন্ম—১২৬০ সাল, ২৩শে পৌষ।
মৃত্যু—১৩২৭ সাল. ১৮ই আশ্বিন।

বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে যাহাঁরা প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী অন্যতম। পিতার নাম ৺রামচন্দ্র রায়চৌধুরী জন্মস্থান—মাতুলালয়—বরিশাল জেলার অন্তর্গত কাশীপুর নামক গ্রাম। জন্ম—১২৬০ সাল ২৩শে পৌষ বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা তিথি। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান উলপুর গ্রাম। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারিপুর মহকুমার অধীন গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত এই উলপুর অবস্থিত। তথাকার বসুবংশ সম্ভ্রান্ত। ইঁহারা বঙ্গজকায়স্থ এবং মস্ত কুলীন। বংশ পরম্পরাক্রমে ইঁহাদের জমিদারী আছে। এই জন্য ইঁহারা মুসলমান রাজত্বকাল হইতে "রায়চৌধুরী" উপাধিতে ভূষিত।

বাল্যে, স্বগ্রামে—উলপুরের পাঠশালায়, তৎপরে চারিমাসকাল কলিকাতা চেতলায় মতি মাষ্টারের স্কুলে, তাহার পর ভবানীপুর নন্দন ব্রাদার্স একাডেমিতে, তদনন্তর কালীঘাট ইউনিয়ন্ একাডেমিতে এবং পরিশেষে লণ্ডন মিশনারী কলেজে ইংরাজী ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে নিযুক্ত হন এবং চারিবৎসর কাল ডাক্তারী পড়েন। শেষে মস্তিষ্কের পীড়ার জন্য কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বন প্রিয় ছিলেন। পরাধীনতায় চিরদিনই তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। যে কোন উপায়ে হউক চিরদিন "স্বাধীনভাবে কাল কাটাইব"—ইহাই তাঁহার জীবনের

মূলমন্ত্র ছিল। এই মূলমন্ত্র সাধনের জন্য তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। এই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীন প্রবৃত্তির জন্য বাল্যেই তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের স্নেহপাশ ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। দেশ সেবায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আসক্তি। বাল্যে স্বগ্রামের লোকহিতকর অনেক কার্য্যই করিতেন। বাল্যে যাহা হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল কালে তাহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলে-ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল।

বঙ্গের সুসন্তান দেবীপ্রসন্ন ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও চরিত্রগুণে অনেক হিন্দুরও আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী কষ্টসহিষ্ণু, স্বাবলম্বনপ্রিয়, স্বাধীনচেতা ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। অতি বড় শত্রু হইলেও সত্যের অনুরোধে, তিনি তাঁহার গুণ চাপিয়া রাখিতেন না; পক্ষান্তরে পরম মিত্র হইলেও তিনি তাঁহার দোষ ঢাকিতে কিম্বা তাঁহার সেই দূষনীয় কার্য্যের পোষকতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সত্য প্রিয়তার জন্য এবং চিত্তের এইরূপ দৃঢ়তার অনুরোধে, তিনি প্রথমে অনেকেরই বিরাগভাজন হন, কিন্তু কালে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় তাহার যশঃ কিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। স্পষ্টবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তার জন্য তিনি অনেক বড় বড় বন্ধু হারাইয়াছেন; তথাপি ব্রতচ্যুত কিম্বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। সমান তেজে, সমান জেদে, সমান দৃঢ়তায় তিনি সত্য প্রকটনে রত ছিলেন। ব্রাহ্ম সাধারণের অনেক মলিনতা, অনেক দুর্ব্বলতা তিনি আপন স্বভাব-সুলভ আন্তরিকতাপূর্ণ তেজস্বী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া লোক-লোচনের সমীপবর্ত্তী করিয়াছেন। তাঁহার সেই লিপি-পটুতার গুণে অনেকের স্বভাব সংশোধন এবং সমাজেরও অনেক সংস্কার সাধিত হইয়াছে। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন সহস্র বিঘ্ন বাধায়ও তাহা করিতেন। তিনি নির্ভীক উচিত বক্তা লেখক ও সম্পাদক বলিয়া সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানেই তাঁহার সহানুভূতি ছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ফরিদপুর অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট নরনারীর জীবন রক্ষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে যথার্থই সাধুবাদ দিতে হয়। তিনি দরিদ্র ছাত্রগণকে অন্নদান, বেতন এবং পুস্তকাদি সাহায্যও মধ্যে মধ্যে করিতেন। আর্থিক অবস্থায় ও সামাজিক সম্ভ্রমে দেবীপ্রসন্ন ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান উদ্যমশীল পুরুষ-সিংহ অতি বিরল!

বঙ্গসাহিত্যে তিনি সুপরিচিত। তাঁহার সাহিত্য জীবনের ইতিহাস অপূর্ব্ব। সংসারের শত সহস্র বিঘ্ন বাধার সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া, বহু অভাব অনাটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াও, তিনি বিশেষ ধীরতার সহিত জীবনের দীর্ঘকাল সাহিত্যব্রত পালন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি পবিত্র চক্ষে দৃষ্টি করিতেন। সাহিত্য-সেবী সুধীগণ প্রায় সকলেই তাঁহার সুহৃৎ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "নব্যভারত" পত্রিকা খানি আজ অষ্টাত্রিংশ বৎসর কাল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা একখানি উচ্চ অঙ্গের প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র ও সমালোচন। সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্ব ধর্ম্মী লোকের রচনা ইহাতে প্রকাশিত হয়। মত বিরুদ্ধ বলিয়া, ভাল রচনা, সম্পাদক বাতিল করিতেন না। বঙ্গের বহু সুপ্রসিদ্ধ লেখকই ইহাতে লিখিয়া থাকেন। দেবীপ্রসন্ন

নির্ভীক ছিলেন; প্রেস আইনের কঠোরতার বিরুদ্ধে তিনি প্রায়ই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। তাঁহার একটি ছাপাখানা ছিল, সেই প্রেসে "নব্যভারত" মুদ্রিত হইত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সেই প্রেসের নিকট গবর্ণমেণ্ট আমানত চাহিলে তিনি প্রেস বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি টাকা জমা দিয়া প্রেস চালান নাই। দেবীপ্রসন্ন রিক্ত হস্তে কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্য-সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শিশির-কুমার ঘোষও তাহাই। উভয়েই সাহিত্য সেবায় অর্থলাভ করিয়া গিয়াছেন। শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন, সন্ন্যাসী, ভিখারী, যোগজীবন, মুরলা, অপরাজিতা, নবলীলা, পুণ্যপ্রভা, সোপান, বিবেকবাণী, প্রসাদ, সান্ত্বনা, বিবাহ-সংস্কার, দ্যুতি, দীপ্তি, জ্যোতিকণা, উৎকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রসূন, প্রণব, এই বিশখানি উপন্যাস ও প্রবন্ধ পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলির সহিত এখনকার পাঠক-দিগের কিরূপ পরিচয় আছে জানি না। বস্তুতঃ দেবীপ্রসন্ন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন এবং যথাশক্তি সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় উদ্যম ও অধ্যবসায়-শীল স্বাবলম্বন-প্রিয় ব্যক্তির প্রতি স্বভাবতঃই কমলা কৃপা করিয়া থাকেন। তিনি দীর্ঘকাল অতি যোগ্যতার সহিত "নব্যভারত" সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি, তদীয় উপযুক্ত পুত্র, পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি পরিচালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

দেবীবাবুর সম্বন্ধে অন্য অনেক কথাই প্রবন্ধের বাহুল্যতার জন্য লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সম্বরণে বাধ্য হইলাম।

"নব্যভারত" সম্পাদক প্রবীণ লেখক বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় ৬৭ বৎসর বয়সে বিগত ১৮ই আশ্বিন সোমবার বৈদ্যনাথধামে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরমধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার নিরাড়ম্বর আত্মা অনন্তধামে পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া অক্ষয় শান্তি লাভ করুক।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু

দেহ-রক্ষান্তে।

"আমার আর কোন সাধ নাই। কেবল কঠোর পরোপকার-ব্রত, কেবল আত্ম-সংযম, কেবল বিলাসিতা বিসর্জ্জন আমার জীবনের লক্ষ্য।"—মুরলা।

"চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমি কখনও গোলামী করিব না,.....আমি ভয়ে বা ভালবাসার খাতিরে কাহারও মতের গোলামী করিতে পারিব না।"—মুরলা

মানুষ যতদিন দেহে অবস্থান করিয়া আমাদের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকেন, যতদিন সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাঁহার সহিত একত্র চলাফেরা করিবার সুযোগ ও সুবিধা আমরা পাইয়া থাকি, যতদিন আর দশ জনের মত তিনিও আমাদেরই একজন হইয়া আমাদেরই মধ্যে বিদ্যমান থাকেন, ততদিন তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ছোট খাট কার্য্যগুলিকেও আমরা খুঁটিনাটি করিয়া না দেখিয়া ছাড়ি না। তারপর আবার সে মানুষ যদি ভগবৎ কৃপায় এবং আত্মশক্তির সাহায্যে সংসারে দশ জনের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হয়েন, তাঁহার যশঃ সৌরভ যদি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করে, তিনি যদি ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিয়া

বহুসংখ্যক লোকের পূজা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রতি-নিয়ত সম্ভোগ করিতে থাকেন, অথবা তাঁহার উন্নতচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া যদি কেহ কেহ তাঁহাকে আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যকলাপের দিকে জনসাধারণের সমালোচনোন্মুখ দৃষ্টি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তারপর, যখন হঠাৎ একদিন কালের করাল বিষাণ বাজিয়া উঠে, অকস্মাৎ মৃত্যুর আবির্ভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে যখন একটা যুগান্তর উপস্থিত হয়, অতি সুলভ বলিয়া যে জিনিষকে আমরা তেমন আদর করিতে পারি নাই, সেই জিনিষকেই যখন চিরদুর্লভ করিয়া দিয়া আমাদের মনে অনুতাপের তীব্র অনল প্রজ্জলিত করিয়া দিয়া যায়, তখন আমরা আর তাঁহার দোষ ত্রুটী দেখিতে পাই না। সেই জন্যই জীবিতাবস্থায় যে সমস্ত সামান্য দোষত্রুটী গুলিকে আমরা অনুপেক্ষনীয় মনে করিয়া তীব্র সমালোচনা করি, মৃত্যুর পর সেইগুলিকে আর বিশেষ দোষ বলিয়াই আমাদের মনে হয় না। তখন শুধু তাঁহার অশেষ গুণাবলীই প্রতিনিয়ত আমাদের হৃদয়-ফলকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। তাই মানুষ স্বতঃই মৃতব্যক্তির দোষত্রুটীর কথা বিস্মৃত হইয়া শুধু তাঁহার গুণগ্রামই ঘোষণা করিয়া থাকে।

অক্লান্ত কর্ম্মী, স্বদেশপ্রেমিক, সাহিত্যসেবী ফরিদপুর সুহৃদসভা'র প্রতিষ্ঠাতা ও পরি-চালক, এবং 'নব্যভারতে'র প্রবীণ সম্পাদক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাম ফরিদপুর নিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেরই নিকট অল্পাধিক পরিমাণে পরিচিত। আমরা যখন ছাত্রবৃত্তি স্কুলের ৪র্থ কিম্বা ৫ম শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন হইতেই উলপুরের দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাম আমাদের সুপরিচিত ছিল। এক-দিকে যেমন স্বর্গীয় মহাত্মা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম যেন জন্মাবধিই শুনিয়া আসিতেছি, অপর দিকে তেমনি ফরিদপুরের দরদী ফরিদপুরের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, 'সুহৃদসভা'র জীবন-স্বরূপ স্বর্গীয় দেবীবাবুর নাম ও আশৈশবই আমরা ফরিদপুরের লোকেরা শুনিয়া আসি-তেছি। তখন দেবীবাবুকে আমরা খ্রীষ্টান বলিয়াই জানিতাম। সে যুগে ব্রাহ্মমাত্রই খ্রীষ্টান বলিয়া অভিহিত হইত। আমাদের বাল্যসংস্কার বশতঃ তাঁহাকে ঠিক আমাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না; অথচ সুদূর পল্লীতে থাকিয়াও সকলের নিকট যাহা শুনিতাম তাহাতে তাঁহাকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমদয়ালু দেবতুল্য লোক ভাবিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া পারিতাম না। একদিকে যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবা-বিবাহের সমর্থনকারী বলিয়া সমা-লোচিত হইতে শুনিতাম, অপর দিকে তাঁহার অপার দয়ার ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা যখন শুনিতাম, তখন তিনি কোন দেশের লোক, সেই প্রশ্ন আমাদের মনেই উঠিত না। তিনি এতবড়, এত মহান্ যে তাঁহাকে আমরা সর্ব্বসাধারণের আপনার বলিয়া অসঙ্কোচে ও বিনাবিচারে স্বতঃই মানিয়া লইতাম। আর যখন দেবীবাবুর দয়ার কথা, ফরিদপুরের জন্য অকাতরে পরি-শ্রমের কথা, ফরিদপুরের উন্নতির জন্য 'সুহৃদ-সভা' স্থাপন ও 'অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিভাগ' পরিচালনের কথা শুনিতাম, তখন, তিনি যে খ্রীষ্টান এই কথা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাকে শুধু ফরিদপুরেরই একমাত্র নিজস্ব-

জন বলিয়া মনে মনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতাম; সত্য বলিতে কি, গর্ব্ব অনুভব করিতাম। আর মনে মনে ভাবিতাম, কি গুণে তিনি এত বড় হইলেন। সমস্ত ছাত্র-জীবন ব্যাপিয়াই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হইতে পারি নাই। তারপর যখন সৌভাগ্যবশতঃ ক্রমে তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম যখন তাঁহার আপন আলয় 'আনন্দ-আশ্রমে' অল্পাধিক পরিচিত বা অপরিচিত নর-নারীর অব্যাহত গতি ও অবস্থিতি অবলোকন করিলাম, সর্ব্বোপরি, যখন তাঁহার কর্ম্ম-পটুতা, সহৃদয়তা ও আশ্রিতবৎসলতা নিরীক্ষণ করিলাম, তখন হইতে বুঝিতে আরম্ভ করিলাম, তিনি কেমন করিয়া এত বড় হইলেন, তিনি কি গুণে এত লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিলেন, তিনি কিসের প্রভাবে ফরিদপুর-বাসীর হৃদয়-রাজ্য জয় করিলেন।

এস্থলে 'আনন্দ আশ্রমে'র বিশেষত্বের কথা একটু বলা প্রয়োজন। দেবীবাবু 'আনন্দ আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তাঁহার সুযোগ্যা সাধ্বী পত্নী। 'আনন্দ আশ্রমে' আসিয়া কেহ কখনও অভুক্ত চলিয়া গিয়াছেন, এমন কথা কেহ কখন শুনেন নাই। ইদানীং 'আনন্দ আশ্রমের' স্বচ্ছলতার কথা বন্ধু-বান্ধব অনেকেই বিদিত আছেন। কিন্তু, এমন একদিন ছিল, যখন 'আনন্দ-আশ্রমের' প্রতিষ্ঠাতাকে অতি কষ্টে সংসার চালাইতে হইত। সেই দুর্দ্দিনেও 'আনন্দ আশ্রমে' কত লোকে যে অন্ন এবং আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, তখন 'আনন্দ আশ্রমের' স্থানের বড়ই অভাব ছিল; অথচ যাহারা সেখানে প্রতিপালিত হইতেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী; তাই কক্ষ-মধ্যে মাচা তৈয়ারী করিয়া কেহ কেহ উপরে এবং কেহ কেহবা নীচে শয়ন করিতেন। তথাপিও কেহ আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হন নাই। এরূপ অদ্ভুত কথা কেহ আর কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

'আনন্দ-আশ্রমের' দ্বিতীয় বিশেষত্ব, পরিচিত বা অপরিচিত, ছোট কিম্বা বড়, ইহার ইতর বিশেষ কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই। কলিকাতায় এবং অপর স্থানেও প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণ দীন দুঃখীর আহারের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সব স্থলেই কর্ম্মচারীগণ তাহার পর্য্যবেক্ষণ করেন। 'আনন্দ-আশ্রমের' বিশেষত্ব এই যে, গৃহস্বামী স্বয়ং পুত্র-কন্যা-পুত্র-বধূ ইত্যাদির সমভিব্যাহারে উচ্চনীচভেদে সকলকেই আপনার জনের মত একত্র লইয়া একসঙ্গে আহার করিতেন। এবিষয়ে প্রভু-ভৃত্য, পরিচিত অপরিচিত, উচ্চনীচ, প্রভৃতি কোনও ভেদাভেদ কখনই পরিলক্ষিত হয় নাই। এইরূপ উদার-প্রাণতা ও মহানুভবতা বক্তৃতায় শ্রুতিগোচর হইলেও, চর্ম্ম-চক্ষে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। মানুষকে কত বড় করিয়া দেখিলে, এইরূপ আপনার মনে করা যায়, তাহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়।

'আনন্দ-আশ্রমে' আশ্রয় পাইয়া কত নর-নারী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী যে আজ সংসারক্ষেত্রে গণ্যমান্য ও বরেণ্য হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়লোক বলিলে, সচরাচর যাহা বুঝায়, দেবী বাবু কোন কালেই তাহা ছিলেন না। তিনি যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন, তা নয়; তদপেক্ষা উন্নত অবস্থাপন্ন হাজার হাজার লোক কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিতেছেন। কিন্তু দেবীবাবুর 'আনন্দ-আশ্রমের' দ্বার যেমন কাঙ্গাল-গরীবের পরিচিত অপরিচিতের জন্য নিয়ত উন্মুক্ত ছিল, এমন আর কোথাও দেখি নাই। ধনীজনোচিত বাহিরের জাঁকজমক তাঁহার ছিল না। তথাপিও, তিনি বড় লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যে অসাধারণ পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাহাও নয়; অথচ দেখিয়াছি, কত মহামহোপাধ্যায় তাঁহাকে নতশিরে সম্মান না করিয়া পারিতেন না। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে চরিত্র বলে, ধর্ম্ম বলে, নীতি বলে, তিনি এতই উন্নত, বলীয়ান, ও মহৎ এবং উদার প্রাণ ছিলেন যে, মহামহা সাহিত্য রথী, মহামহা ধনকুবের ও মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী তাঁহার সমীপে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে সাহস পাইতেন না। চরিত্ররূপ দুর্ভেদ্য কবচে যিনি সতত সুরক্ষিত, নীতি ও ধর্ম্ম-রূপ শাণিত অস্ত্রশস্ত্রে যিনি সুসজ্জিত, মতের দৃঢ়তায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার সমক্ষে বিদ্বানের বিদ্যার বড়াই বা ধনকুবেরের ধন-গর্ব্ব কতক্ষণ স্থান পাইতে পারে? তাই, যাঁহারা তাঁহার বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা একবাক্যে সাক্ষ্য দিবেন যে তাঁহার নিকট যাঁহারা আসিতেন এবং তাঁহার সহিত বিশেষরূপে মিশিতেন তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে তাহার মত সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব যেন লোপ পাইয়া যাইত; তাঁহারা দেবীবাবুর কোনও মতের আর প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। এই অসাধারণ শক্তিটি তাঁহার মধ্যে এতই উৎকর্ষতা-লাভ করিয়াছিল যে, সময় সময় ইহাতে তাঁহার বিস্তর অনিষ্ট ও ক্ষতি হইয়াছে।

কিন্তু, যাহা বলিতেছিলাম। তিনি কেমন করিয়া ফরিদপুর-বাসীর হৃদয়ের উপর এমন অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিলেন? পাঠক-পাঠিকাগণ হয়ত বা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে ফরিদপুরের উজ্জ্বলরত্ন, লোকমান্য স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের নাম অপেক্ষাও ফরিদপুর-বাসীর অধিকাংশের নিকট দেবী বাবুর নাম অধিকতর সুপরিচিত ও সমাদৃত। বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান লোককে বড় করিয়া তুলে, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু চরিত্র ও সহৃদয়তা মানুষকে দেবত্ব প্রদান করে। জ্ঞানে মানুষ পাণ্ডিত্যের সম্মান লাভ করেন, আর প্রেমে মানুষ দেবতার মত পূজাই পাইয়া থাকে। প্রেমেই যীশুর যীশুত্ব, প্রেমেই চৈতন্যদেবের চৈতনত্ব, আর প্রেমেই বিবেকানন্দের বিশেষত্ব। জগতে প্রাণ ঢালিয়া যাহারা নরনারীর সেবা করিতে পারিয়াছেন, নিজের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল অসঙ্কোচে অম্লানবদনে যাহারা ক্ষুৎপিপাসাতুরের মুখে তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বড় হইয়া গিয়াছেন। মস্তিষ্কের শক্তিবলে প্রশংসা, অর্থ, সম্মান ও বাহবা সমস্তই লাভ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয় জয় করা যাইতে পারে না; একমাত্র হৃদয়ের শক্তিই হৃদয়কে জয় করিতে পারে, আর কোন শক্তিই তাহা পারে না। দেবী বাবুর হৃদয় ছিল; তাই তিনি ফরিদপুর-বাসীর হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন। ফরিদপুর-বাসীর এবং ব্রাহ্ম-সাধারণের সেবা করিতে তিনি কোনও দিনই কুণ্ঠিত হন নাই। এই পরোপকার ব্রত সত্যসত্যই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। পরের উপকার করিতে পারিলে, তিনি নিজের জীবনকে ধন্য মনে করিতেন।

কোটালীপাড়ার দুর্ভিক্ষের সময় যখন তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর সেবার জন্য তথায় গমন করেন,-তখনকার তাঁহার সহকর্ম্মী আমাদের একজন বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, যে সবদিন তাঁহাদের আহারের সময় হইয়া উঠিত না ; দুই তিন দিন পর পর রান্না করিবার সময় মিলিত, এরূপ ভাবে,একাদিক্রমে পাঁচছয় মাস জলে কাদায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কাটান যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা একবার কল্পনা চক্ষে অনুমেয়। এই সময়ে একদিন চাল বিতরণ সময়ে তিনি একাদিক্রমে প্রায় দুইদিন একরাত্রি একাসনে কাটাইয়া দেন ; একবারও আসন-ত্যাগ করিয়া উঠেন নাই। দৈহিক শক্তি কখনও এরূপ দুরূহকার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। একমাত্র হৃদয়ের শক্তিতেই এইরূপ অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হয়। ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন, তাঁহার পরসেবা-ব্রত কতদূর কঠোর ছিল। সত্যসত্যই, তিনি কঠোর পরোপকার-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

আত্ম-সংযমে যে তিনি বিশেষ অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সুস্থ, সবল ও কর্ম্ম-কুশল শক্তি-সম্পন্ন দেহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কলিকাতার মত জনপূর্ণ সহরে সুদীর্ঘ-কাল বাস করিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও কোনও দিন তাহাকে স্বাস্থ্যের জন্য সান্ধ্য বা প্রাতভ্রর্মণ করিতে কেহ দেখেন নাই। শৈশবে তিনি কোনরূপ ব্যায়ামাদি করিতেন কি না জানি না ; কিন্তু তাঁহার সুগঠিত দেহ, অতুলনীয় কার্য্যপটুতা ও সাধারণের অবিশ্বাসযোগ্য শীতাতপ সহিষ্ণুতা, তাঁহার আত্মসংযমের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিকগণের অনুমোদিত স্নান, আহার, ব্যায়াম, ভ্রমণ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী তাঁহার জীবনে কখনও প্রতি-পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সকলেই জানেন, তিনি কোনও দিনই দিবাভাগে ১২টা বা ১টার পূর্ব্বে প্রায় কখনও স্নানাহারের জন্য উঠিতেন না ; অনেক সময়, গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, এবং 'নব্যভারত' বাহির করি-বার জন্য তাঁহার তিনটা চারটার সময়ও আহার করিতে দেখিয়াছি ; অথচ এ সমস্ত অনিয়মের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও কখনও তিনি কোনও অসুস্থতা অনুভব করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। আত্মসংযমের দরুণ তিনি যে সুদৃঢ় লৌহ-সদৃশ দেহ লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র সেই সুস্থ দেহের বলেই, তিনি দিনরাত এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারিতেন। এইরূপ অসাধারণ বীর্য্য-বান ছিলেন বলিয়াই, তিনি একটা অপরাজেয় শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই শক্তি বলেই তিনি আশৈশব অকুতোভয়ে বীর-পুরুষের মত সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন, বিপদ আপদ, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারিয়া ছিলেন। নিজে এইরূপ সংযমী ছিলেন বলিয়াই, কাহারও একটুকু অসংযমের ভাব দেখিলে, তাহা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেক সময়ে তাঁহাকে অনেক গণ্যমান্য ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও সংযমের অভাব এই দোষারোপ করিতে শোনা গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সুস্থ দেহের প্রমাণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। যাহারা তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই, তাহা-দের বিশ্বাসের জন্য একটি ঘটনা বলিতেছি। পৌষ মাঘ মাসের দারুণ কন্‌কনে শীতে কার্য্যব্যপদেশে আপ্রাদ মস্তক গরম শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা

যখন রাত্রি আট কি নয় ঘটীকার সময় 'আনন্দ আশ্রমে' গিয়াছি, তখনও কতদিন দেখিয়াছি তিনি অনাবৃত দেহে দ্বিতলস্থ শয়ন-কক্ষ হইতে নীচে আসিলেন, চৌবাচ্চা হইতে বালতী পূর্ণ করিয়া জল লইয়া বাহিরের ফুল গাছের গোড়ায় সেচন করিলেন, শৌচাগার প্রভৃতিতে বাল্‌তী করিয়া জল ঢালিয়া দিলেন, তারপর ঈষদুষ্ণ গরম জলের দ্বারা সমস্ত গা ধুইয়া ফেলিলেন এবং কোনও দিন কাপ-ড়ের আঁচল গায়ে দিয়া কোনও দিন, বা অনাবৃত দেহেই, আহার করিতে বসিলেন এবং আহারান্তে আবার সেই অনাবৃত দেহেই শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শরীরের ভিতর কতটা তেজ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা সম্ভব হয়, তাহা সকলেই একবার অনুধাবণ করিবেন। কঠোর সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী আত্ম-সংযম ব্যতীত ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, এবিষয়ে বোধহয় কাহারও মত দ্বৈধ হইবে না। সুতরাং তিনি কঠোর আত্মসংযম ব্রতও সুষ্ঠুরূপে উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তালতলার চটী যেমন সর্ব্বজন সুবিদিত, দেবীবাবুর কাল বাদামী জুতা ও কোটও তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের তেমনি সুপরিচিত। বেশ-ভূষায় তিনি কখনও অপরিচ্ছন্ন ছিলেন না। তাঁহার 'নব্যভারত' কার্য্যালয়ের ফরা-সের উপর একটুকু ধুলা বা এক টুকরা চুলও কেহ কখনও পতিত দেখেন নাই। অথচ তিনি কোনও দিনই বিলাসতা ভাল বাসিতেন না। সত্য বলিতে গেলে তিনি আজীবন বিলাসিতার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। কাহাকেও কখনও অনাবশ্যক-রূপে বেশী জামা, জুতা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দেখিলেই, মনে মনে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইতেন এবং সুযোগ পাইলেই তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ছাড়িতেন না।

ব্রাহ্মসমাজে বিলাসিতা বাড়িতেছে এই কথা বলিয়া যে তিনি কতদিনই আক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন এবং সেই মিতব্যয়িতার গুণেই তিনি অতি অল্প ব্যয়ে সমস্ত খরচাদি নির্ব্বাহ করিতে পারি-তেন। কোন কার্য্যেই তিনি অতিরিক্ত খরচের পক্ষপাতী ছিলেন না। যে কার্য্য অল্প খরচে হয়, সেই সেই কার্য্যে অধিক খরচ করিলে মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইতেন। বন্ধু-বান্ধবের গৃহে বিবাহ প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে যাহাতে অন্যায় খরচ না হয়, সেজন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। আপন ভৃত্যদিগকে পাঠাইয়া, গাড়ী দিয়া সাহায্য করিয়া যাহাতে তাঁহাদের কিছু অল্প ব্যয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেন।

আজীবন বিলাসিতা-বর্জ্জন অভ্যাস করিয়া সত্য সত্যই তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধ-কাম হইয়া-ছিলেন। তার-যোগে এই নিদারুণ সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্রবধূ ও একমাত্র কন্যাকে লইয়া যখন দেবগৃহে পৌঁছিলাম ও ঊষার অস্পষ্ট আলোকে প্রভাতকুটীরের কঠিন প্রস্তর-শয্যায় শায়িত, অনাবৃত দেহ, উপাধান পরিশূন্য মস্তক ও বিক্ষিপ্ত পাদুকা বিশিষ্ট অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তাঁহার বিলাসিতা বর্জ্জনরূপ কঠোর ব্রত উদ্‌-যাপনের কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইল। তার পর যখন অত্যল্প সংখ্যক বন্ধু কয়েকজন মাত্র সেই শবদেহ লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং দেবগৃহের সেই অপূর্ব্ব শ্মশানে অপর্য্যাপ্ত কাষ্ঠাদির দ্বারা সেই জড় দেহের অন্তিমকার্য্য শেষ করিলাম, তখন তাঁহার বিলাসিতা-বর্জ্জন-সাধনায় সিদ্ধি লাভের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

সংসারে অনেক সময় দেখিতে পাই, লোকে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিবার অভিলাষে চাকুরী ইত্যাদি না করিয়া স্বাধীন ব্যবসা ইত্যাদি করিয়া থাকেন। চাকুরী করা ত তিনি কোন দিনই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি, জীবনে একবার অল্প কিছু সময়ের জন্য তিনি গৃহ-শিক্ষকতার কাজ করিয়া ছিলেন। তিনি এইরূপ স্বাধীনচেতা ছিলেন যে কিছুতেই স্বীয় মতকে পরিবর্ত্তন

করিতেন না। "আমি ভয়ে বা ভালবাসার খাতিরে কাহারও মতের গোলামী করিতে পারিব না—" তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এই কথার জলন্ত সাক্ষী-রূপে বর্ত্তমান। অপরে শত শত অকাট্যযুক্তি প্রদর্শন করিলেও, তিনি কখনও নিজের মত পরিবর্ত্তন করিতেন না। স্বীয় মতের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, এজন্য তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ অনেক সময় তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইতেন। এ কথা আমাদের অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই মতের দৃঢ়তার জন্যই, অথবা আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসের বলেই, আজ তিনি এত বড় হইয়াছেন; নচেৎ ধনে, মানে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, তাহা অপেক্ষা বহুতর গুণে অধিকতর শক্তিশালী অনেক লোক কেন তাঁহার কথা নতশিরে পালন করিবেন, এবং কেনইবা তাঁহার মতের প্রতিবাদ না করিয়া অম্লান বদনে, তাহা গ্রহণ করিবেন? এই আত্ম-মতে ও বিশ্বাসে তাঁহার ঈদৃশী দৃঢ়তা ছিল যে সময় সময় ইহা তাঁহার অহমিকার সূচনা করিত বলিয়াও অনেকে মনে করিতেন। আজ আমরা বলিব, তিনি আত্ম-শক্তিকে, আত্ম-বিশ্বাসকে, আত্ম-মতকে এতটা শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন বলিয়াই এত লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। আমরা আপন আপন মতকে শ্রদ্ধা করিতে পারি না বলিয়াই লোকের শ্রদ্ধা ও লাভ করিতে পারি না।

তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিতাম,—"বন্ধুবান্ধব যাঁহারা দয়া করিয়া ভালবাসেন, অনেক সময় তাঁহারা অনেক দূর হইতে দেখা করিতে আসেন; উপরের ঘরে থাকিলে পাছে তাঁহারা দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া যান, এইজন্যই আমি সমস্তদিন নীচের ঘরেই থাকি।" মানুষকে কতদূর সম্মানের চক্ষে দেখিলে মনের এইরূপ ভাব হইতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

দেবীবাবুর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে নিত্য নিত্য নূতন নূতন নাম তৈয়ারী করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কত বন্ধু-বান্ধবের ছেলেমেয়েকে যে তিনি নূতন নূতন নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মৃতের-স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। গৃহপ্রাঙ্গনে প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত স্মৃতিলিপি বক্ষে ধারণ করিয়া অনেকগুলি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিনিয়তই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ব্যতীত অনুষ্ঠানাদিতে, প্রবন্ধাদিতে সুযোগ পাইলেই তিনি মৃত আত্মীয় ও সুহৃদগণের গুণ কীর্ত্তন করিতেন। কেহ মৃতের প্রতি সম্মান যথোচিত দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইলে বড়ই দুঃখিত হইতেন।

দেবীবাবুর অপূর্ব্ব বন্ধু বাৎসল্য, অসাধারণ তেজস্বিতা, অদম্য অক্লান্ত ও জীবন-ব্যাপী সাহিত্যসেবা এবং স্বদেশ-সেবার কথা আরও অনেকে লিখিয়াছেন। সুতরাং সে সমস্ত বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে আর চাই না। তবে দেবীবাবুর বিশেষত্বের কথা আর একবার সর্ব্বসাধারণের নিকট উল্লেখ করিয়া আজ বিদায় লইতেছি—চরিত্রবল, আত্মসংযম, পরোপকার, বিলাসিতা বর্জ্জন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, স্বীয় মতে দৃঢ়তা, চিন্তায় ও মতের স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির উন্নতির চেষ্টা ও দেশের সেবা তাঁহার বিশেষত্ব।

আমাদের চাই কি?—"লোহার মত বজ্র-কঠোর দেহ—যে দেহ দুইপাঁচ দিন অনাহারে ক্ষীণ শক্তি হইবে না। যে দেহ দশদিন বৃষ্টিতে ভিজিলে কিম্বা প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘুরিলে অসুস্থ হইবে না, যে দেহ দশদিন রাত্রি জাগিলে ক্লান্ত হইবে না, এমন সুস্থ সবল দেহ; আর চাই, প্রেমে ঢলঢল, পর দুঃখে বিহ্বল, দেশের এবং দশের সুখে চির সুখী একখানা হৃদয়।"

এইকথাগুলি দেবী বাবুর জীবনে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখিয়াছি।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

স্মরণ।

সে আজ ৩৮ বৎসরের কথা। এই সময়ে আমরা শিবনারায়ণ দাসের লেনের মেসে থাকিয়া এল-এ পড়ি। আমাদের মেসে সকল রকমের ছাত্রই ছিলেন। কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগী হইয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন, কেহ কেহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গে মেলা মেশা করিয়া জাতীয়-জীবন উন্নত করিবার জন্য তনু-মন-ধন দিয়া খাটিবার কল্পনা করিতে ছিলেন, আবার কেহ বা ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে চলিবার অভিপ্রায়ে, কলেজের পড়া ছাড়িয়া, ইংরাজী রচনার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। অপর কেহ কেহ, কি উপায়ে সাহেব তুষ্ট করিয়া, বড় চাকুরী যোগাড় হয়, সে ভাবনাও ভাবিতেছিলেন। ৺রামোত্তম ঘোষ মহাশয় ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া এবং হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের আচার ব্যবহার অনুশীলন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের মনে নূতন নূতন আশার সঞ্চার করিতেছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী, ছাত্র-সমাজে শাস্ত্রী-মহাশয়ের বক্তৃতা, আমাদের নিকট যেন নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতেছিল।

এই সময়ে শুনিলাম যে ফরিদপুরের একজন "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" বাণী উচ্চারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ইঁহার নাম, দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী। প্রথম আলাপেই মনে হইয়াছিল যে একজন প্রকৃত কর্ম্মীর সাক্ষাৎলাভ হইল। এই সময়ে দেবীবাবুর গৃহ বহু অসহায় নর-নারীর আশ্রয়স্থল ছিল। দাসত্ব করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিবার পর, নিজ পায়ের উপর কি প্রকারে দাঁড়াইলেন—এই কাহিনী শুনিতে বড়ই আনন্দ বোধ হইত। দুঃখ দারিদ্র্যের তাড়নায় অস্থির হইয়া, অনেক সময়ে, দেবী বাবুর সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়া, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হই নাই। ইহাতেই বুঝা যাইবে, তাঁহার প্রভাব, আমার উপর কি পরিমাণে বিস্তার করিয়াছিল। তাহার মুখের উপর, তাঁহার কার্য্য কলাপের তীব্র সমালোচনা আমাপেক্ষা বোধ হয় আর কেহ করেন নাই, তথাপি এই আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে এক দিনের তরেও তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটে নাই।

তাঁহার পুত্রবধূ একদিন বলিয়াছিলেন, আমি যে ভাবে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত তর্ক করি তাহাতে বুঝি বা আমার তাঁহাদের বাড়ী যাওয়া আসা বন্ধ হইয়া যায়। সাধারণতঃ, আমাদের তর্ক হইত "নব্যভারতে" ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আক্রমণের জন্য। কাহারও ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার অধিকার অন্যের নাই, এই বিষয়ে আমি তীব্র-প্রতিবাদ করিতাম। দেবীবাবুর ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মসমাজ জগতে নূতন আদর্শ আনিয়াছে। এই সমাজ-ভুক্ত নরনারীর সমাজ-দ্রোহী কোন কাজ কোন প্রকারে চাপা দেওয়া সঙ্গত নহে। তিনি ভয় করিতেন, সামাজিক ব্যভিচার ঢাকা দিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্ম-সমাজ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে; আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি কোন প্রকার মতলবের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা করিতেন না, ঐ সমাজের মঙ্গল সাধনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

দেবীবাবু পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন। মনে করিতেন, মানুষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে, এবং ভগবানে অটল বিশ্বাস না থাকিলে, লোকে সৎপথে চলিতে পারে না এবং good citizen ও হইতে পারে না। আমার সহিত এ সম্বন্ধে কথা হইলে, আমি বলিতাম, নরকের ভয় দেখাইয়া বা স্বর্গের আশা দিয়া, মানবাত্মার উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তবুও বিশেষ যে কার্য্যকরী হইয়াছে, এমন মনে হয় না। পারিবারিক উপাসনায় দেবীবাবু অনেক সময়ে আমাকে ডাকিতেন। একদিন এই প্রকার উপাসনায় দেবীবাবু, তাঁহার পরলোকগত প্রিয়জনেরসহিত মিলনের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, স্মরণ করিয়া, আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া-

ছিলেন। উপাসনা শেষ হইলে, আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, পরলোকে প্রিয়-জনের সম্মিলন যেমন আনন্দবর্দ্ধক, ইহলোকে যাহাদের শত্রু মনে করা যায় তাহাদের সহিত মিলন নিরানন্দ-সূচক হইবে কি? এই প্রশ্নেও কোনপ্রকার বিরক্তির ভাব দেখি নাই। তিনি জানিতেন কুতর্ক করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম মাত্র।

দেশানুরাগের অনেক দৃষ্টান্ত দেবীবাবুর মধ্যে দেখিয়াছি। প্রভাতকুসুমকে বিলাত পাঠান সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমি বলিয়াছিলাম, তাহাকে এমন কিছু শিখিতে দিন, যাহাতে দেশে ফিরিয়া বড় একটা চাকুরী পাইতে পারে। দেবীবাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"নিজে ঘোরতর আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও যখন চাকুরীর চেষ্টা করি নাই, তখন একমাত্র পুত্রকে পয়সা খরচ করিয়া গোলাম বানাইয়া আনিব কি করিয়া? প্রভাত ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া যদি একজন নিরপরাধীকেও আইনের খপ্‌পর হইতে বাঁচাইতে পারে, তাহা হইলেও আমার অর্থব্যয় সার্থক হইবে।" তিনি পুত্রকে দেশের কাজে ব্রতী হইবার সাহায্য করিলেন।

দেবীবাবুর বিবেক-বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। তিনি তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধিতে যাহা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন, তাহা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। ইংরাজের উপর তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সমর্থন করিতেন না। রাজদ্রোহী না হইলেও, তাঁহার নাম গোয়েন্দা পুলিশের খাতায় ছিল। তিনি কলিকাতা ছাড়িলেই, তাঁহার নম্বর তারে গন্তব্য স্থানে জানান হইত। অবশ্য, তিনি ইহাতে ভীত ছিলেন না। সর্ব্বদাই নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মত কাজ করিয়া যাইতেন। পুরীর একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী আমাকে বলিয়াছিলেন যে দেবীবাবুর ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোকের উপরও "নজর" রাখিতে হয় মনে করিলেই, তাঁহার চাকুরীর উপর ঘৃণা জন্মে। এই ব্যক্তি দেবীবাবুর উপর দৃষ্টি (watch) রাখিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন।

দেবীবাবুর মৃত্যুতে ফরিদপুর একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হারাইল। তাঁহার ন্যায় আর একজন কবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, জানি না। 'সুহৃদ সভা' সম্বন্ধেও আমাদের মতের ঐক্যতা ছিল না। তাই আমি তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় যোগদান করি নাই। এক দিন আমার বক্তব্য শুনিয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে ভাবে 'সুহৃদ সভা' রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'সুহৃদ সভা' দ্বারা ফরিদপুরের কিছু কাজ হইতেছে মনে করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেন। 'নব্যভারত' এবং 'সুহৃদ সভা' তাঁহার প্রাণের জিনিস ছিল। আশা করি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র এবং পুত্র-বধূ এই দুই জিনিস সজীব-ভাবে রাখিয়া, তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবেন।

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

মনে পড়ে, সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এই পৌষমাসে, ফরিদপুরের এক গ্রামে, প্রসন্নমূর্ত্তি দেবীপ্রসন্নকে প্রথম দেখি। দাদার কাছে নাম শুনিয়াছিলাম; পরিচয় দিয়া প্রণাম করিতেই, দেবীপ্রসন্ন হাসিতে হাসিতে "তুমি আমাদের বন্ধু বিজয়বাবুর ভাই" বলিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তারপর তিনি "আমাদের জন্মভূমি, ফরিদপুরের উন্নতির জন্য 'ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা' প্রতিষ্ঠিত ক'রেছি, সভার কাজে গ্রামে গ্রামে আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে—এস"—বলিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। ভক্ত কেশবচন্দ্র মরণাপন্ন; শীঘ্র কলিকাতা ফিরিতে হইবে, এই দুশ্চিন্তা লইয়া কেশব-ভক্ত দেবীপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি কাজ সারিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্ণে কেশবচন্দ্র আর নাই—এই নিদারুণ সংবাদ আমরা শুনিলাম। অকস্মাৎ পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া পুত্র যেমন বজ্রাহতের ন্যায় হয়, কেশবচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে দেবীপ্রসন্ন শোকাহত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল; আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত রাত্রি মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিলেন; কাহারও সঙ্গে একটি কথাও বলিলেন না। তরুণ বয়সে, সেই প্রথম অনুভব করিয়াছিলাম, রক্তের টান না থাকিলেও মানুষে মানুষে কত খানি প্রাণের টান হয়। আরও বুঝিয়াছিলাম, ধর্ম্মাচার্য্যের প্রতি শিষ্যগণের পিতৃভক্তি কথার কথা নয়। দেবীপ্রসন্ন তাঁহার 'নব্যভারতে', কেশবচন্দ্রকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন—তাহা পিতৃ-তর্পণ স্বরূপ হইয়াছিল। তাহা পড়িয়া কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন 'ভক্তের আবেগপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস'। আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "কেশবচন্দ্র" নামক কবিতাটিও 'নব্যভারতের' সেই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবীপ্রসন্ন সেই কবিতাটির নিম্নলিখিত কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, অনেকদিন পর্য্যন্ত, দেবীবাবুর মুখে তাহার আবৃত্তি শুনিয়াছি—

নিভিবে না চিতানল অশ্রুজলে জানি জানি,
তবু কাঁদি আয়;
ফিরিবে না মহাযোগী, হরিপাদপদ্ম ছাড়ি
তবু ডাকি তায়।
বর্ত্তমান কাঁদ কাঁদ, আজি এ দুঃখের দিনে
কেশবের তরে,—
নতুবা তোমার পুত্র, সুকৃতজ্ঞ ভবিষ্যৎ
নিন্দিবে তোমারে।

—নব্যভারত, ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা, ৪২০।

উড়িষ্যার কতিপয় যুবক কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়া দেবীবাবুর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দর্শনপ্রার্থী হইলে, দেবীবাবুর অনুরোধে, আমি তাঁহাদিগকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া সেই উৎকলবাসিগণকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কলিকাতা আসিয়া কোথায় আছেন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন—"আমরা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি।" অসুস্থ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন; উত্তর শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন; মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! কত স্থানের কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন; কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় একই উত্তর পাই,—'আমরা দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি"। এই ধনী প্রধান কলিকাতা নগরে, প্রবাসে আসিয়া, সামান্য গৃহস্থ দেবীপ্রসন্নের গৃহে এত অতিথি স্থান পান, এই স্বার্থপরতার দিনে, এতো সামান্য কথা নহে!" সেই মহত্ত্বের আদর্শ মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর, দেবীপ্রসন্নের মহত্ত্বের একটিমাত্র পরিচয় পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা জানি, দেবীবাবু প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় করিয়া ধনী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ভোগ

বিলাস সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া, কত অনাথ অনাথাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার 'আনন্দ আশ্রম' অতিথি অভ্যাগতের নিকট সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল।

"ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা" প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবীপ্রসন্ন অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের মধ্যে নারীর উপযোগী শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ফরিদপুরবাসীর দুঃখ অভাব মোচনের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন এবং সমস্ত ফরিদপুরবাসীর সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম, তাঁহাকে জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর সেবা করিয়া ভগ্ন রুগ্ন দেহে ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু সেবার প্রীতিতে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন।

আমাদের দেশের সাধুগণ নারীজাতিকে মাতৃ সম্বোধনে সম্মানিত করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের সহিত মেলামেশা সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের আদর্শ ও উপদেশ দেবীপ্রসন্ন অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিয়াছেন। তিনি কোনও রমণীর সহিত চপল হাস্যপরিহাস করিতেন না; যাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে 'মা' 'বোন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এ সম্বন্ধে ব্রতধারী সংযত সন্ন্যাসীর মত তাঁহার নিষ্ঠা ছিল। বোধ হয়, এই জন্যই তাঁহার মুখশ্রী লালসা বিবর্জ্জিত পবিত্রতা মণ্ডিত ছিল।

কখনও কখনও দেবীপ্রসন্নের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াছি। সবল যখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিত, তখন দেবীপ্রসন্ন তেজস্বী বীরপুরুষের ন্যায় অগ্রসর হইতেন। তখন তাঁহার নয়নের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তেজোময় বচন ও সিংহবিক্রমে অত্যাচারীর হৃদয় কম্পিত হইত।

দেবীপ্রসন্নের আর এক মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। মানুষের সে ছবি আমার কাছে বড় মধুর বলিয়া মনে হয়, চোখ ভরিয়া জল আসে। সে ঠাকুরদাদার ছবি। যখন জীবন-খেলা ফুরাইয়া আসিতেছিল, দেবীপ্রসন্ন নাতি নাতিনীকে কোলে করিয়া স্নেহে বিগলিত হইয়া—বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কতদিন সে দৃশ্য দেখিয়া অধীর উচ্ছ্বাসে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিন দেখিলাম, বৃদ্ধ, শিশু পৌত্রটিকে কোলে করিয়া, একখানি কচুরি তাহার হাতে দিয়া, আর একখানি নিজে লইয়া বলিলেন—"দাদা, একখানা তুমি খাও, আর একখানা আমি খাই"। বাঙ্গলাদেশের সকল ঠাকুর-দাদা, সকল নাতি নাতিনীর প্রেম-দৃশ্য, আমার মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দেবীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতি-কৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল তাঁহার স্বাভাবিক মুখশ্রী প্রতিচ্ছায়াতে পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। হৃদয়পটে অঙ্কিত দেবীপ্রসন্নের ভোগ-বিলাস-লালসা-চিহ্ন-পরিশূন্য পবিত্র গম্ভীর সৌম্য প্রসন্ন মূর্ত্তিখানি প্রতিকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

মহাত্মা দেবীপ্রসন্ন।

আর একটি মানুষের মত মানুষ অকস্মাৎ কর্ম্ম জগৎ হইতে অপসৃত হইলেন। বিগত ১৮ই আশ্বিন, ১৩২৭ সাল, ইংরাজী ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২০ প্রবীণ সাহিত্যিক উন্নত চরিত্র, অকৃতকর্ম্মা দেশ-প্রেমিক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী আনন্দধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার অভাব আজ আত্মীয় স্বজন ও অনুরাগী দেশবাসীগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। বহুকণ্ঠে আর্ত্তনাদ ও বহুনেত্রে অশ্রুপাত করিলেও, তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার

উপায় নাই। দেশবাসী অনুরক্তগণের শান্তি-লাভের একমাত্র উপায় তাঁহার সমুন্নত চরিত্র ও কর্ম্ম-জীবনের আলোচনা। তাহাতে উপকৃত হইবারও সম্ভাবনা। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার জীবন কথার আলোচনা করিব।

দেবীপ্রসন্নবাবু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ফরিদপুর জেলান্তঃপাতী উলপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত বসু রায় চৌধুরী বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যখন ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন, তখনকার হিন্দুসমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল এবং বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। স্বাধীনভাব-সম্পন্ন যুবকেরা যুক্তিহীন আচার-ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠেন; দলে দলে হিন্দু-সমাজের প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া পড়েন। দেবীপ্রসন্নবাবুও তদ্রূপ একজন। স্বধর্ম্ম স্ব-সমাজ, আত্মীয় স্বজন পরিবর্জ্জিত হইয়া তাহাকে যে কি প্রকার কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল, লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে বুক পাতিয়া লইয়া কিরূপ বীর হৃদয়ের পরিচয় দিতে হইয়াছিল, যাঁহারা তৎকালীন অবস্থা সম্যক জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন। দেবীবাবু দৃঢ় সঙ্কল্প, অদম্য উৎসাহ লইয়া জন্মিয়াছিলেন। প্রতিকূল অবস্থা কখনও তাঁহার সঙ্কল্প নির্জ্জিত ও উৎসাহ বিচূর্ণ করিতে পারে নাই। অসহায় অবস্থায়, আপনার পায়ের উপর নির্ভর করিয়া, যাঁহারা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও সম্পত্তিবান হইতে পারিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস দেবীপ্রসন্ন তাঁহাদেরই অন্যতম। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। সাহিত্য-সাধনা ও দেশ-হিত-ব্রত তাঁহার অবলম্বনীয় হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সে সাধনা ও ব্রত হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। পবিত্রভাবে, সংযমের গণ্ডীর ভিতর দিয়া, মানসিক সদ্‌গুণ প্রভাবেই তিনি যশ মান অর্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। ইহা তাঁহার অসাধারণত্বের দ্যোতক। সাহিত্য-সাধনায় তিনি যে কি প্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিরচিত গ্রন্থ-নিচয়ই প্রতিপন্ন করিতেছে। মাসিক পত্র সম্পাদনে তাঁহার কৃতিত্বের তুলনা নাই। "নব্যভারত" বাস্তব পক্ষেই নব্যভারতে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে। সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার মনস্বিতা, তেজস্বিতা ও দৃঢ়চিত্ততা, সর্ব্বোপরি উদারতার, লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে অবসর পাইয়াছে। 'নব্য-ভারতে' তিনি কখনও অযথা লোক-রঞ্জনের প্রয়াস পান নাই; দৃঢ়তার সহিত শুধু লোক-শিক্ষার উচ্চ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া, কঠোর কর্ত্তব্য-পালন করিয়া গিয়াছেন। গল্প বা উপন্যাস তাঁহার সম্পাদিত কাগজে কখনও স্থানলাভ করে নাই। অর্থ লোভে কখনও যা' তা' বিজ্ঞাপন 'নব্যভারতে'র সহিত সংযুক্ত করেন নাই। 'নব্যভারতে' বিজ্ঞাপন ছিল না বলিলেই হয়; অথচ তজ্জন্য ব্যাকুলতা বা ক্ষোভ-প্রকাশ করিতে কোন দিনও শুনা যায় নাই। মাসিক পত্রের কোন সমালোচনা তাঁহার কাগজে প্রকটিত হইত না। প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মতের বিরুদ্ধ মত প্রকাশক প্রবন্ধও, সুলিখিত হইলে, তিনি 'নব্যভারতে' স্থান দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না; বরং সাদরে পত্রস্থ করিতেন। এতটা উদারতা সম্পাদক-সম্প্রদায়ে অতীব দুর্ল্লভ। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে তাঁহার স্বাধীনতা সর্ব্বদাই নির্ভীক প্রকৃতির পরিচয় দিত। এজন্য তিনি অনেক সময় তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাহাতে অবসন্ন হয় নাই। 'নব্যভারত' পরিচালনে তিনি লাভবান হইতে না পারিলেও, বিস্ময়ের বিষয় এত দীর্ঘকাল পত্রখানাকে জীবিত রাখিতে পারিয়াছিলেন। 'নব্যভারতে'র বয়সের সাময়িক-পত্র বর্ত্তমানে অতি অল্পই আছে; বহু পত্র পত্রিকাই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। 'নব্য-ভারতে'র দীর্ঘ-জীবনের হেতু অনুসন্ধান করিলে, সম্পাদকের প্রভূত শক্তি ও পরিচালনের সুরুচি-সম্মত বৈশিষ্ট্যই প্রধান

কারণরূপে গণ্য হইবে। আমাদের মনে হয়, দেবীপ্রসন্ন সাহিত্যচর্চ্চায় ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালনে যে উচ্চ লক্ষ্য ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। অনেকেরই অনুকরণীয়।

দেবীবাবু তাঁহার শক্তি সামর্থ্যের ওজন বুঝিতেন। যে কার্য্য তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা রাখিতেন, তাহাই সম্পাদন করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেন। শুধু আড়ম্বর, শুধু হৈ চৈ করিয়া নাম করিবার প্রযত্ন তাঁহার ছিল না। তাই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ থাকুক, সমগ্র বঙ্গের হিত-সাধন-রূপ বিরাট ব্যাপারে কোন সময় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার স্ব-জেলার সমুন্নতির নিমিত্ত আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। 'ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা' এই মহতী ইচ্ছার ফল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রত্যেক জেলার সুসন্তানেরা স্ব স্ব জেলার হিতসাধনে নিয়ত হইলে, অল্প আয়াসে বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের, তথা ভারতবর্ষের, সম্যক উন্নতি সংঘটিত হইবে। নেতৃ-নামে অভিহিত অনেক মহোদয়, ভারতবর্ষের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর। দুঃখের কথা, তাঁহাদের জন্মস্থান ক্ষুদ্র পল্লীর উন্নতি অবনতির তাঁহারা ধার ধারেন না। তাঁহাদের বৃহৎ মস্তিষ্কে এ ক্ষুদ্র চিন্তার স্থান নাই! দেবীপ্রসন্নবাবুর স্বভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ক্ষুদ্র লইয়াই তাঁহার কার্য্যারম্ভ ক্রমশঃ বৃহতে তাহার পরিসমাপ্তি। 'ফরিদপুর সুহৃদ সভা', ফরিদপুরবাসীর অশেষ হিত সাধন করিতে পারিয়াছে, সমুন্নতির পন্থা প্রদর্শন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে পারগ হইয়াছে; ইহা অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কোন ফরিদপুরবাসীই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ফরিদপুর জেলায় এমন কোন ভদ্র পরিবার নাই, যাহার মহিলারা সামান্য লেখাপড়া জানেন না। এই শিক্ষা-বিস্তার "সুহৃদ্-সভা'র চেষ্টার ফল। দেবীবাবু 'সুহৃদ্ সভার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। তিনি যৌবনে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্ব-জেলার নানাবিধ অভাব দূরীকৃত করিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলার বহু রাস্তা ও খাল তাঁহার উৎসাহ ও যত্নের ফল। গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিতেন এবং যখন কোন গ্রামে কলেরার প্রকোপ হইত, তথায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স প্রেরণ করিতেন। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারের জন্য নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করিয়া মহিলাদিগকে শিক্ষানুরাগিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কৃষক বালকবৃন্দের শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য যত প্রকার সদুপায় হইতে পারে, দেবীপ্রসন্ন তাহার প্রায় উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যদিও দেশবাসীর ঔদাসীন্য তাহার উদ্যমকে সম্পূর্ণ সফলতা দান করিতে দেয় নাই, তথাপি আশা করি, তাঁহার দেব-হৃদয়ের উচ্চতা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাঁহারই পন্থাবলম্বনে অসম্পূর্ণতা নিরাকৃত করিবে।

তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্ববিধ উচ্চতার বীজই নিহিত ছিল। শুধু শিক্ষা স্বাস্থ্য ও নীতি লইয়াই তিনি বিব্রত ছিলেন না। দেশবাসীর অন্নাভাব দূর করিবার নিমিত্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্লেশবোধ হইত না। করুণায় তাঁহার মানস-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল। ফরিদপুরে কয়েকবার দুর্ভিক্ষে তিনি আহার-নিদ্রা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্নক্লিষ্ট জনগণের মুখে এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবপক্ষেই আশ্চর্য্য। বুভুক্ষিতের ক্ষুধা নিবারণের জন্য ঐরূপ আত্মহারা অবস্থা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শুনিয়াছি, একবারের দুর্ভিক্ষে কোন একস্থানে ক্রমান্বয়ে কয়দিন আহারহীন নিদ্রাহীন অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া শত শত লোককে চাউল বিতরণ করিয়াছেন। আহার তৃষ্ণার কথা, স্বাস্থ্যের কথা, একটী বারও মনে করেন নাই। এরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনে দেব-হৃদয় ভিন্ন অন্যের কি অধিকার হইতে পারে? তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।" তিনি বলিতেন, "সৎকার্য্য

করিতে আরম্ভ করিলে অর্থের অভাব হয় না।" একবার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট উত্তরে লেখেন, "দুর্ভিক্ষ কোথায়? সাহায্য করার উপযুক্ত অবস্থা এখনও হয় নাই।" অথচ দেশে অন্নাভাবে বহুজন বহু পরিবার ক্লিষ্ট। দেবীবাবু গবর্ণমেণ্টের উত্তর পাইয়া কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু রেভারেণ্ড মথুরানাথ বসু বলিলেন,—"দেবী, কাঁদিতেছ কেন? কার্য্য আরম্ভ কর, অর্থের অভাব হইবে না।" দেবী বলিতেন,—"ফলতঃ, গুরুবাক্যে আস্থা-স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, নানাস্থান হইতে সাহায্য আসিতে লাগিল। সেবারকার দুর্ভিক্ষে ভগবানের করুণায় আমাদের সেবায় বহুলোক মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল।"

দেবীবাবু প্রকৃত পক্ষেই দেশের অভিভাবকের যোগ্য ছিলেন। তিনি ফরিদপুরবাসীকে আপনার বৃহৎ পরিবারভুক্ত মনে করিতেন। তাঁহাকে জানাইলে অথবা জানিতে পারিলে, তিনি ফরিদপুরবাসীর সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের সহায়তা করিতেন। অনেকে তাঁহার সহায়তায় চাকুরীর সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। স্কুল কলেজে ফ্রি হইতে পারিয়াছেন। পীড়িতাবস্থায় আনুকূল্য পাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু ৺রসিকলাল রায়, যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনী হইতে জ্বর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া দেবীবাবুর বাসায় থাকেন। রোগ ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করে। দেবীপ্রসন্নবাবু ডাক্তার দেখাইয়া, আত্মীয়ের ন্যায়, অতি যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, রসিকবাবুর জীবন রক্ষা পায় নাই। আজ কালকার দিনে এরূপ উচ্চ-মানবতা অতি বিরল।

দেবীবাবুকে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বটে, কিন্তু গোঁড়াও ছিলেন না—পাঁতিও ছিলেন না। হৃদয়-মাধুর্য্যে তিনি উভয় সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কখনও অন্যধর্ম্মাবলম্বী বা অন্য সমাজকে অশ্রদ্ধা করিতে দেখি নাই। তাঁহার সহিত মিশিয়া বুঝিতে পারি নাই, তিনি হিন্দু কি ব্রাহ্ম। শুধু এইটুকু বুঝিয়াছি, তিনি আমার স্বদেশী স্বজন।

তাঁহার অহঙ্কার ছিল না। অভিমান ছিল, যে অভিমান অন্যকে ক্লিষ্ট করে না; আপনার মনুষ্যত্বকে পুষ্টির পথে লইয়া যায় সেই অভিমান। সেই অভিমানের বলেন দেবীপ্রসন্ন কলেজের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলেও, অধ্যবসায়-গুণে প্রকৃত শিক্ষা ও সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার আর একটী প্রধান গুণ ছিল, তীব্র আক্রমণ-সহিষ্ণুতা। আমরা অনেক সময় 'সুহৃদ-সভা'র ত্রুটী বিচ্যুতি লইয়া সম্পাদককে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছি; তিনি সাময়িক ক্ষুণ্ণ হইলেও, চিরদিনের জন্য আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন নাই। যখনই দেখা হইয়াছে, তখনই আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার মত কর্ম্মঠ ব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায় না। সর্ব্বদাই তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। শুধু লেখাপড়া কর্ম্ম নয়, শারীরিক শ্রমসাধ্য সাংসারিক কর্ম্মেও তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না। শ্রমের কার্য্যে তাঁহার অপমান বোধ ছিল না। তিনি আপনাকে আদর্শ বাঙ্গালীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

এরূপ স্বনামধন্য মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন বাঙ্গালীর অন্তর্ধান, প্রকৃতপক্ষেই দেশের দুর্ভাগ্যের কারণ। তাঁহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। তবে আমাদের আশা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী গুণী পিতার পদাঙ্কানুসরণ করতঃ তাঁহার অভাব পূরণের চেষ্টা করিবেন, তাঁহার নাম অক্ষুন্ন রাখিবেন। ভগবচ্চরণে বিনীত প্রার্থনা, দেবীপ্রসন্নকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে চির-শান্তি দান করুন। দেশবাসী তাঁহার আদর্শ-জীবন সম্মুখে রাখিয়া, মানুষ হউক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ-বর্ম্মা।

স্বর্গত দেবীপ্রসন্নের তিরোধানে।

অয়ি মাতঃ বঙ্গভূমি কেন মা কাঁদিছ তুমি
হারায়ে ফেলেছ বলে হৃদয়-রতনে ?
কত রত্ন প্রসবিলে কত রত্ন বিসর্জ্জিলে
কতই কাঁদিলে, মাগো! আকুল নয়নে।১

এক এক অঙ্গ তব খসিয়া পড়িছে সব
কি নিয়ে থাকিবে ঘরে বুঝিতে ত নারি।
শূন্য গৃহে শূন্য প্রাণে কাঁদিছ সাশ্রু-নয়নে
কাঁদে যত বাণীসুত তব সুসন্তানে স্মরি।২

তোমার ক্রন্দন-ধ্বনি প্রবাসে বসিয়া শুনি
সে ধ্বনিতে আমিও মা কাঁদি সনে তার।
কাঁদে মা ভারতবাসী শক্তিহীন অহর্নিশি
কান্না যেন আমাদের অস্থিমজ্জা সার।৩

সহায় বিহীন মোরা চাহি মুখ পানে যাঁর
কুটিল শমন প্রাণে সহে না তখনি
কলাফল ভেদহীন মায়া মমতা বিহীন
লোল-জীহ্বা বা'র করি গ্রাসিবে অমনি।৪

সুজলা শ্যামলা তুমি ছিলে মা সুখের খনি
এবে হায় জরামরা অদৃষ্টের গুণে;
কত শত নব রোগে তব সন্তানে ভোগে
অকালে চলিয়া যায় কে জানে কেমনে!৫

দুর্ভাগা যদ্যপি চায় সমুদ্র শুকায়ে যায়
আমাদের এই দশা কর্ম্ম দোষে হায়!
ঘুচিবে না কিবা মাগো কেটে কুকর্ম্মের ফল
হাসিমুখে বসিবে না ঘিরিয়ে তোমায়।৬

যদি কোন পুণ্যফলে, আসে মা সুপুত্র কোলে
তার মুখপানে চায় অন্য পুত্রগণে
অমনি করাল কাল ব্যাদনিয়া করে গ্রাস
সেই ক্ষণজন্মা তব জীবনের ধনে।৭

ও মা বঙ্গ জন্মভূমি! দেবীপ্রসন্নেরে তুমি
পেয়েছিলে কোলে তব মহাপুণ্য ফলে।
সদা দানাব্রত-রত সত্যবাদী ব্রহ্ম রত
অমায়িক মিষ্টভাষী এ মহী মণ্ডলে।৮

নিবৃত করিয়া কর্ম্ম সাধিয়া নিজের ধর্ম্ম
মহাপুণ্য ধামে এবে করেছে প্রয়াণ।
নব্যভারতের স্বামী ওহে সৌম্য, গুণমণি,
গুণগ্রাহী ছিলে তুমি, ধর্ম্ম-পরায়ণ।৯

দীন-দুঃখী লোক জনে অন্ন দানি সুখ-মনে
শুভ-কর্ম্ম-জাত সুধা করে গেছ পান।
তোমার এ তিরোধানে হাহাকারে সর্ব্বজনে
তোমার বিহনে সবে আজি ম্রিয়মাণ।১০

আশ্বিন আঠার দিনে দ্বিপ্রহর মহাক্ষণে
রাখিলে নশ্বর দেহ কাঁদায়ে সবায়।
ধন্য বাণী-পুত্র ছিলে আজন্ম তাঁরে সেবিলে
কীর্ত্তিমান! যশ তব রহিবে অক্ষয়।১১

দেহ রাখি দেবঘরে চলি গেছ দেবপুরে
অক্ষয় অনন্ত শান্তি বিরাজে যথায়।
লভহ অনন্ত সুখ, তথা নাহি কোন দুঃখ;
আশীষ করহ সবে থাকিয়া তথায়।১২

গড়িতে 'নব্যভারত' আয়াস করেছ কত
পবিত্রতা সাধুতায় কর্ত্তব্য পালনে
নব্যভারতের সৃষ্টি লিখন বড়ই মিষ্টি
প্রথিত থাকুক দেব তব নাম মনে।১৩

ভারতের দুঃখতরে হৃদয় কাঁদিত তব
তাই বুঝি হৃদরোগে দেহ তেয়াগিলে।
কর্পূরের মত যেন শূন্যেতে মিশিলে হায়!
ব্রহ্ম-রূপ মহাশাপে অলক্ষ্যে অদৃশ্য হলে।১৪

যাও, দেব, যাও চলি নাহি তথা দলাদলি
পরম পিতার পদে লভহে বিশ্রাম।
কিশোরে আশীষ কর মাগিতেছে এই বর
তোমা-সম কার্য্য যেন সাধে অবিরাম।১৫

শ্রীরাজকিশোর রায়।

শ্রদ্ধার স্মৃতি।

আজ মুক্ত-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার স্মৃতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি, আমি মুক্তপ্রাণে তাহা করিব।

৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এক দিবস গ্রীষ্মের ছুটিতে গোয়ালন্দের জাহাজে দেশে যাইতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, এক

অনিন্দ্যসুন্দর রূপবান্ আরোহী, ভদ্রবিশিষ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, জাহাজের এক কোণে শান্তভাবে আপনার মনে বসিয়া রহিয়াছেন। বহু আরোহী পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন, "ইনি কে?" আমি ও সেই সময়ে সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, দেখিলাম 'দেবীবাবু'। অন্যেরা আমার নিকট হইতে পরিচয় পাইয়া, আগ্রহের সহিত তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। আমাকে তিনি চিনিতেন না। আমিও নিকটে যাইয়া বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি ফরিদপুরের যাত্রী। সেদিন জাহাজ চরায় ঠেকিয়াছিল, তাই সেখানে পৌঁছিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই সময়ের একটী ক্ষুদ্র ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, চিরদিনের মত আমাদের দুজনের প্রাণে প্রাণে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের আহার কালের পূর্ব্বেই তিনি যথানিয়মে ফরিদপুর পৌঁছিতে পারিবেন, এই ভরসায় বাড়ী হইতে কোন আহার সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া যান নাই। আমি খুঁজিয়া এই কথাটী বাহির করিলাম। আমার সঙ্গে বোম্বাই আম ও অন্য খাবার ছিল। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া, উহা হইতে কিছু গ্রহণের জন্য তাঁহাকে স্বীকৃত করাইলাম। সেইদিন তাঁহাকে তৃপ্তিমত আহার করাইয়া আমি কি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এই উপলক্ষে যে প্রীতির সূত্রপাত হয়, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও ঘনিষ্টতর হইয়া উত্তরকালে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। অশ্রুসিক্ত প্রাণে সাক্ষ্য দিতেছি, তাঁহার বন্ধুত্ব অকৃত্রিম ও অতুলনীয় ছিল। এমন হিতৈষী ও দরদী খাঁটী বন্ধু জগতে অতীব দুর্ল্লভ। মহাত্মা তুলসীদাসের একটী স্মরণীয় উক্তি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "লাখে না মিলল এক,"— লক্ষের মধ্যে একটী খাঁটী বন্ধু মিলে না। হইতে পারে, কখন কখন ইহার জন্য তিনি অপযশ-ভাগী হইয়াছেন। সাময়িকভাবে মিলিলেও, প্রায়ই ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতে হয় সে বন্ধুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু আমি প্রথম পরিচয় হইতে শেষ পর্য্যন্ত, দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল একাদিক্রমে তাঁহার অনুপম বন্ধুত্ব সম্ভোগ করিয়াছি। একদিনের জন্যও ইহার প্রীতি-প্রফুল্ল দৃষ্টির প্রসন্নতা হইতে বঞ্চিত হই নাই। আমাদের মধ্যে, অতি গূঢ়তম কথারও বিনিময় হইয়াছে এবং এই সুদীর্ঘ কাল তিনি সমভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছেন। এই অযোগ্যকে তিনি কি যে স্নেহ, আদর ও শ্রদ্ধা করিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয় ও গৃহে কি যে অধিকার দিয়াছিলেন, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবার বিষয়, বুঝাইবার বিষয় নহে। কি এক নিগূঢ় আকর্ষণ যাঁহার গুণে ও স্নেহে চির বাঁধা পড়িয়াছিলাম, আর তাঁহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব না। আজ কত স্মৃতি প্রাণের মধ্যে হাহাকার করিতেছে। অভাব ও বেদনার কি এক দারুণ অনুভূতি প্রাণকে ক্লিষ্ট করিতেছে। আজ যেন হৃদয় বিদ্ধ হইয়া শোণিত বিন্দু নিঃসৃত হইতেছে।

এই ক্ষুদ্রের মধ্যেও যে কোন শুভ উপকরণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহার কি ব্যগ্রতাই না দেখিয়াছি। আমি যখন কলেজের ছাত্র, তখন তিনি আমার একটা ক্ষুদ্র লেখা দেখিয়া অনবরত উৎসাহ দিয়া, সেই তরুণ বয়সেই আমার দ্বারা প্রবন্ধ লিখাইয়া 'নব্য ভারতে' মুদ্রিত করিয়া, আমাকে সমধিক উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেই হইতে আমরণ তিনি লেখার অনুশীলনের জন্য আমাকে কেবলই উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন।

এই দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কালের মধ্যে, আমি কত লোকের নিকট, তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে কত কথা শুনিয়াছি। সেই জন্য অনেক সময় আমি তাঁহাকে বিশেষ সমালোচনার চক্ষে দেখিয়াছি এবং তাঁহার সহিত সসম্ভ্রমে অনেক তর্ক বিতর্কও করিয়াছি। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আমি একদিনের জন্য ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই। তাঁহাকে যেটুকু বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই আমি দুই চারি কথায় নিম্নে লিখিতেছি।

তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত গুণরাশি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ

ও সাহিত্যসেবা, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষত্ব, তাঁহার স্বাবলম্বন ও স্বাধীন-চিন্ততা, তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণা ও আর্ত্তসেবা, তাঁহার পরোপকার-সাধন ও পরকে আশ্রয় দান, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীকতা,—এই সকল গুণ সর্ব্বসাধারণেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি আমার ভাবে তাঁহার মধ্যে যাহা দেখিয়াছি ও তাঁহাকে যেরূপ বুঝিয়াছি সুধু তাহাই বলিব।

নিজের সম্পর্কে ও অন্যের সম্পর্কে আমি সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি, কোন বন্ধুর কথা অবিশ্বাস করার ভাব তিনি ঘুণাক্ষরেও মনে স্থান দিতে পারিতেন না। কখন২ অত্যন্ত ক্লেশের সহিত দেখিয়াছি, তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে কোন কোন স্থলে তাঁহার এই সরল, অকপট বিশ্বাস-নিষ্ঠার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। এইরূপ বিশ্বাস-নিষ্ঠার দোষের মনে হইতে না পারে; কখন কখন ইহার জন্য তিনি অপযশ-ভাগী ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অনেক সময় কবি গোল্ডস্মিথের উক্তি স্মৃতিতে উদিত হইয়া এইরূপ মনে হইয়াছে যে, তাঁহার এই বন্ধুবিশ্বাসকে ত্রুটী বলিতে হইলে, এই ত্রুটীও leaned to virtue's side—ইহার প্রবণতা পুণ্যের দিকেই ছিল।

তাঁহার গৃহে, তাঁহার হৃদয়ের বিশাল উদারতা-প্রসূত যে সদাব্রত দেখিয়াছি, তাহা আর অন্যত্র দেখি নাই। এক সময়ে প্রায় শতাবধি লোক দিনের পর দিন এই গৃহে আহার করিয়াছেন এবং অন্নপূর্ণা-রূপে ইঁহার গৃহিণী ইহাদিগকে খাওয়াইয়া, এমন কি নিজের জন্য বাড়া ভাতের থালা পর্য্যন্ত অতিথিকে দিয়া, দিনান্তে বাজার হইতে খাবার আনাইয়া, আহার করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। এই পুণ্য-দৃশ্য জীবনে আর দেখিতে পাইলাম না।

পুত্রের কল্যানের জন্য তাঁহার প্রাণে কি গভীর আকুলতা ছিল, তাহাও ভাবিবার বিষয়। এই মহানগরীতে ছাত্রগণের সর্ব্বনাশের পথ-স্বরূপ অসংখ্য প্রকার দুর্নীতির অবাধ বাণিজ্যের মধ্যে, পাছে তরুণ বয়সে পুত্রের অকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি একজন পূত-চরিত্র বিচক্ষণ শিক্ষক-বন্ধুর গৃহে পূর্ব্ববঙ্গে তাহাকে শিক্ষা লাভের জন্য রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ে সকলে তাঁহার সহিত একমত না হইলেও, কয়জন পিতা, পুত্রের জন্য অতটুকু চিন্তা করেন ও সাবধানতা অবলম্বনে প্রয়াসী হন, তাহা বিশেষ ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

তাঁহার পরিবারিক জীবনে সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব দেখিয়াছি, তাঁহার পুত্র-বধূর প্রতি অলোক-সামান্য প্রীতি ও সম্মান। আর্য্য-গণের অনুষ্ঠানে পিতা কন্যাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব"। তিনি যে চারুশীলাকে স-অর্ঘ্য, সপুষ্পে ও সচন্দনে অষ্টা দশ বৎসর পূর্ব্বে, সস্নেহও সাগ্রহে বধূমাতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, আমি অনুদিন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি যে, সেই বধুমাতাকে তিনি এই দীর্ঘকাল সত্য সত্যই তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমন বধূ-প্রীতি জগতে সুদুর্লভ। আজ এই দুর্লভ-সৌভাগ্য-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া বধূমাতাও নিজেকে কত দরিদ্র মনে করিতেছেন।

আমি আর কিছু বলিতে চাহিনা; শুধু এই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, ৩৬ বৎসরকালদোষেগুণে তাঁহাকে যাহা দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর ভ্রমরের স্বর্ণপ্রতিমা সম্বন্ধে শচীন্দ্রের উক্তির কথা মনে পড়িতেছে। আর ইংরেজ কবির এই অমর ছত্রও মনে হইতেছে—"with all thy faults, I love thee still."—তোমার সকল দোষ সত্ত্বেও, তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে; ঈশ্বর আমাদের এই সম্বন্ধের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ-পুষ্প বর্ষণ করুন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

আড়ি।

যাঁহারা আমাদের নেতা বা মোড়ল সাজিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের বার্ষিক বড় সভায় বলিয়াছেন, যে এদেশের শাসন নীতি ও শাসন কর্ত্তাদের সঙ্গে তাঁহাদের আড়ি। মোড়লেরা বলিতেছেন যে, বিলাত ত পার্লামেণ্টের হাতের গড়া শাসন-নীতির ঠুঁটো ঠাকুর; যেমন আছেন তেমনই ভারত-শাসন-পরিচালনের রথে থাকুন, আমরা কেহ রথ-যাত্রায় যাইব না—রথের দড়ি টানিব না; ঠুঁটো ঠাকুরের সহিত আমাদের আড়ি। যে সভায় বড় কর্ত্তারা এই আড়ি পাতিলেন, সে সভায় দেশের বিস্তর মাথাল মাথাল লোকের জনতা হইয়াছিল, শুনিতে পাই। এক জায়গায় অনেক লোক জমিলে, আমাদের চলিত ভাষায় বলে যে, স্থানটিতে মানুষের "গাঁধি লাগিয়াছে"; এই চলিত ভাষায় আমরাও বলিতে পারি, যে এবারকার দেশের মহাসভায় গাঁধি লাগিয়াছিল।

যাঁহারা প্রাচীন রথযাত্রাটাকে একঘ'রে করিয়া মারিয়া নূতন রথযাত্রা করিবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যত রথের মহারথীরা যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হইল না, যে উঁহারা রথের দড়ি একেবারেই ছুঁইবেন না। প্রাচীন রথের অনেক দড়ি; তাই দুচার গাছি দড়ির পরিচয় দিয়া কথাটা খুলিয়া বলিতেছি। ইংরেজেরা আমাদের বিপুলায়তন ভারতবর্ষে একচ্ছত্র রাজ্য বজায় রাখিবার জন্য যত আয়োজন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনটীর নাম করিতেছি, যথা—রেল, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস। অল্প সময়ের মধ্যে দূরের খবর ও ঘরের খবর পাওয়া চাই, সহজেই নানা স্থানের জিনিষ পত্র টানিয়া আনা চাই, প্রজারা দৈবাৎ বেয়াদপি বা বিদ্রোহ করিলে তাড়া-তাড়ি তাহা দমন করা চাই; এইরূপ নানা প্রয়োজনে রেল, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস না থাকিলে একালে একচ্ছত্র রাজত্ব করা অসম্ভব। ঐ কারখানাগুলি শাসনের প্রয়োজনে বসিয়াছে; এখন উহা বসিবার পর এদেশের লোকেরও সুবিধা হইয়াছে। কাজেই এই তিনটি কারখানা শাসননীতির রথের খুব মোটা মোটা তিন গাছি বড় দড়ি। যাঁহারা ঠুঁটো ঠাকুরকে ছুঁইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ও তাঁহার রথখানিকে পঙ্গু করিবেন বলিতে-ছেন, তাঁহারা কিন্তু এ বড় তিন গাছি দড়ি সজোরে প্রাণপণে টানিতেছেন, ও টানিবেন বলিতেছেন। বাঙ্গলা দেশে যখন শিঙ্গী না খাইলেও শিঙ্গীর ঝোল খাইবার ব্যবস্থা আছে, তখন কর্ত্তাদের এই ব্যবহারকে দুষিতে পারি না। তবে, যে যুক্তিতে বুদ্ধিমানেরা মোটা দড়িগুলি রাখিতে চাহেন ও সরুগুলি ছিঁড়িতে চাহেন, তাহা সহজে বোঝা যায় না। রেলের প্রসাদে বিলাতের পুষ্টি হয় না অথবা টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিসের মত ইংরেজের গড়া অন্য দশটা ঠাট এদেশের টাকায় চলিতেছে না, একথা যখন বলা চলে না, তখন মনকে চোখ ঠারিবার যুক্তি না দিলেই ভাল হয়। সোজা কথায় বলিলেই ভাল হয়,—যাহা করা চলে না, মোড়লেরা তাহা করিবেন না।

নেতাদের বিচারে যাহা করা চলে, তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। হাকিম, উকিল,

ডাক্তার, কেরাণী প্রভৃতি নাকি আপনাদের কাজ ছাড়িবেন। তবে, এই কথাটার সঙ্গে একটা বড় রকমের 'যথাসম্ভব' জোড়া আছে বলিয়া, অনেক মোড়ল ও তাঁহাদের শিষ্যরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন, ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়াছে! এখন নেতাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ হইয়াছে, পাঠশালার ছেলেদের ঘাড়ের বোঝা নামাইয়া দেওয়া। বালকদের রথ দেখা বন্ধ হইবে কিন্তু হয়ত অন্য কোন হাটে কলা বেচা'কেনার ব্যবস্থা থাকিবে। এই বিষয়টি বড়; কাজেই ইহারই একটু আলোচনা করিব।

স্কুল, কলেজগুলি যে আমাদের টাকায় চলিয়াছে ও আমাদের টাকায় চলিতেছে, তাহা ত নিশ্চিত। ইংরেজের রাজত্ব উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, আমাদের সকলকেই মাল-গুজারি ও ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইতে হইবে; তাহার সঙ্গে, শিক্ষার ব্যয়ের জন্য দেয় টাকা জোড়া আছে। আমরা শিক্ষার ব্যয়ের জন্য টাকা দিব, আর সে টাকায় অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে অপরে, ও আমরা আবার টাকা তুলিয়া নূতন ঠাট তুলিব,—এই হইল নেতাদের সুযুক্তি। এই উদ্যোগে বথাট ছেলেদের মহলে রথ দেখার চেয়েও বড় রকমের উৎসবের পালা পড়িয়াছে।

যদি তর্কের খাতিরে এই মিথ্যাকথাটাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, এদেশের জ্ঞানের মন্দির গুলি ইংরেজদের লাভ-জনক ব্যবসায়ের কারখানা, তাহা হইলেও নিজের উন্নতির জন্য ও দেশের উন্নতির জন্য এ মন্দির গুলি যে ছাড়া চলে না, তাহা বলিতেছি। অতি বড় মূর্খেরা আপনাদের অসার দম্ভে যাহাই বলুক, যাঁহারা অতি অল্প পরিমাণেও সৃষ্টির বিকাশ পদ্ধতির ইতিহাস জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পৃথিবীতে মানুষের জ্ঞান প্রতিদিন উন্নত হইতে উন্নততর হইতেছে, ও অতি প্রাচীনকালের জ্ঞান, অতি বড় হইলেও, একালের জ্ঞানের তুলনায় ক্ষুদ্র। একথা লইয়া তর্কের ঝড় না তুলিয়াও সহজে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারা যায়। একালে আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি ও যে ভাবে বহু জাতির সংঘর্ষে বাস করিতে হইতেছে, তাহাতে, আপনাদিগকে বাঁচাইতে হইলে, একালের সকল বিভাগের জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। জ্ঞান জিনিষটি যে কোন দেশের বা কোন জাতির নিজস্ব নয়—পৃথিবীর যে কোন দেশেই উহার উৎপত্তি হউক—উহা যে বিশ্বব্যাপী স্বারস্বত-মন্দিরে উৎসর্গ করা সকলের উপ-ভোগ্য নৈবেদ্য, একথা কখনও ভুলিলে চলিবে না। নিজের কল্যাণের জন্য ও দেশের হিতের জন্য, এই জ্ঞান লাভের জন্য মানুষকে যে কোন দেশে যাইতে হইবে। স্বার্থের জন্য অর্থাৎ উন্নতির জন্য যখন ঘরের টাকা দক্ষিণা দিয়া বিলাতের মন্দির হইতেও জ্ঞান-সংগ্রহ করিতে হইবে, তখন জ্ঞানের মন্দির-গুলি ইংরেজের লাভের জন্যই যদি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে সে মন্দিরগুলিকে একঘ'রে করিব কেন?

মহাত্মারা সম্প্রতি শিক্ষা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া, ইংরেজি প্রভৃতি পরিহার করিয়া, কেবল প্রাচীনকালের সংস্কৃত পড়িতে অনুরোধ করিয়াছেন দেখিয়া, অনেক কথা বলিতে হইল। পুরুষের পক্ষে হউক, স্ত্রী-লোকের পক্ষে হউক, জ্ঞান-উপার্জ্জনে যে ক্ষুদ্রতা অবলম্বন করা চলে না,—স্বদেশী-গিরি চলে না, একথা নিরন্তর মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—

প্রাচীরে রোধিয়া অবাধ অসীমে, বিশ্ব ঠেলিয়া দূরে,
রুদ্ধ ক্ষুদ্র কারার গর্ভে
পাবেনা সত্য, মিথ্যা গর্ব্বে;
বাড়িছে বৃহৎ, বাড়িছে মহৎ, নিখিল জগৎ পুরে।

নেতা মহাশয়েরা হয়ত বলিতে পারেন, যে তাঁহারা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষা ভাল পদ্ধতি রচনা করিবার মতলব রাখেন। কিন্তু, সে পদ্ধতি যখন খাড়া করা হয় নাই, উহা ভাল হইবে কি মন্দ হইবে জানা যায় নাই, তখন গাছে উঠিবার আগেই এত বড় এক কাঁদি পাড়িয়া ফেলিলে কেন? বিদ্যা-লয়ের বালকদিগকে লেখাপড়া ছাড়াইয়া হুজুগে মাতাইলে কেন? উত্তরে হয় ত শুনিতে পাইব যে, ছাত্রেরা এ কালের বিদ্যা-লয়ে যাহাতে গোলামি-বুদ্ধি না শিখে, তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এই "গোলামি বুদ্ধি" কথাটা যে ইউরোপ থেকে ধার করিয়া আনা, এখনও সে ঐ কথাটা ইংরেজি ভাষায় slave mentality উচ্চারণে ব্যবহৃত হইতেছে, একালের ইউরোপীয় সাহিত্য পড়িয়াই যে আমরা তোতা পাখীর মত কথাটা আওড়াইতেছি, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। কি রকমের সামাজিক অবস্থায় ইউরোপে ঐ কথাটির জন্ম হইয়াছে, আর আমাদের এখনকার সামাজিক অবস্থা তাহার তুলনায় কিরূপ, তাহা এ প্রবন্ধে বিচার করা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করিলে অনেকেই দেখিতে পাইবে যে, সামাজিক অবস্থার ফলে, আমাদের হাড়ে মাংসে 'গোলামি বুদ্ধি' জড়াইয়া আছে। আমরা এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীকে পায়ের তলায় দলিয়া, ও জানিয়া শুনিয়া অনেক কুপ্রথার দাসত্ব করিয়া, যে "গোলামি বুদ্ধি" পাকাইয়া তুলিয়াছি, তাহা দূর করিতে না পারিলে, ইউরোপীয় জাতির নিকটে ধার করা কথা আওড়াইয়া ও ইউরোপ-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়া, মানুষ হইতে পারিব না। কবির ভাষায় বলি—

পরের পরে কেন এ রোষ, নিজের'ই যদি শত্রু হোস!
তোদের এযে নিজের'ই দোষ!
আবার তোরা মানুষ হ।

এই যে বিপুল কংগ্রেস, দেশী ভাষায় নাম না থাকিলেও যাহা National বা জাতীয়, তাহার এ নূতন আন্দোলনকে কি বলিব? এই কংগ্রেসের একদল আবেদন নিবেদন' লইয়া পচিয়া গেল, আর এক দল তাজা পাগলামি লইয়া দেশটাকে হন্যা করিয়া তুলিল। এ অবস্থায় বলিতে পারি যে, শ্রেষ্ঠ "আড়ি" হইবে, কংগ্রেসের সঙ্গে আড়ি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

যুগল-চিত্র।

১

না পড়িতে একটি নিমেষ
সব হল—সব হল শেষ!
মুছে ফেল সিঁথির সিঁদুর!
টুটে দাও শাঁখার বলয়!

জ্বাল জ্বাল জ্বাল তুষানল!
আমরণ দহিতে হৃদয়!
কেড়ে লও রাঙ্গা সাড়ী তার!
কেড়ে লও সব আভরণ!

শত মতে দল পদতলে !
একখানি ফুটন্ত জীবন !
এই ধর্ম্ম—এই লোকাচার !
আছে কার কিবা বলিবার ?

২

না পড়িতে একটি নিমেষ
সব হল—সব হল শেষ !
বয়স তেমন বেশী নয় !
থাকুক্ না প্রপৌত্র-তনয় !

সাজাওরে বরণের ডালা !
লাগে গৃহ বড় শূন্যময় !
বাজাও বাজাও জয়-ঢাক !
মহোৎসব কর আয়োজন !
নর-শিশু দাও বলিদান !
পশু-তৃপ্তি করিতে সাধন !
এই ধর্ম্ম—এই লোকাচার !
আছে কার কিবা বলিবার !!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

উদ্বাহ-তত্ত্ব।

মানব ইতিহাসের লিখিত বিবরণ বহু প্রাচীন নহে। মানুষ সভ্যতামার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইলে তবে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির উৎপত্তির আদি ঘোর তমসাচ্ছন্ন। পণ্ডিতেরা অসভ্য জাতি সকলের আচার পদ্ধতি দেখিয়া ও অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের মধ্যে অসভ্য প্রথা সকলের উদ্বর্ত্তন আলোচনা করিয়া, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির উদ্ভবের ক্রম নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রণালী যে কষ্টসাধ্য এবং ইহাতে যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী, তাহা সহজেই অনুমেয়; অথচ অন্য কোন উপায়ও নাই। বর্ত্তমান সময়ে, আমরা যে সকল অসভ্য জাতি দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে অসভ্যতমও যে আদি মানব অপেক্ষা অনেক উন্নত, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, এই আদি মানব-সমাজ হইতেই আমাদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার পাইয়াছে।

ভ্রম নানা দিক্ দিয়া হইতে পারে। দুইটী বিভিন্ন সমাজে একই প্রথা দেখিয়া যদি মনে করি যে উহা একই প্রণালীতে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, তবে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অথচ, অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরও এই ভ্রম হইয়াছে। একটী প্রথা হয়তো এক সমাজে প্রাচীনের উদ্বর্ত্তন, অন্যত্র হয়তো উহা বিশেষ অবস্থানিচয়ের সমবায়ে নূতন উৎপন্ন। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোনও কোনও প্রথার উৎপত্তির কারণ, আদি মানবের অভ্রান্ত-সহজ-প্রবৃত্তি—Instinct. ইহা পশুপক্ষীতে অহরহই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু পণ্ডিতেরা আকাশ পাতাল ভাবিয়া অনেক গবেষণার পর হয়তো এক অদ্ভূত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলেন।

এই সর্ব্ব-জন-বিদিত বিবাহ-রূপ প্রতিষ্ঠানের কথাই ভাবা যাক্। যে পরিবারে মানবের জন্ম, সে পরিবারে "জোড়া মিল" প্রতিষ্ঠিত ছিল; অথবা, এক "পালের গোদার" বহুনারী ও সন্তানাদি লইয়া এমন এক মণ্ডলী ছিল, যাহার উপর অন্য পুরুষের কোন দাবী ছিল না। অবাধ-সমাগম (Promiscuity)

প্রচলিত ছিল না। তবে, আদির এই জোড়া-মিলকে, একনিষ্ঠ বিবাহ বলিলেও ভুল বলা হইবে। এই জোড়ামিল পশুপক্ষীর মধ্যে—পশু অপেক্ষাও পক্ষীর মধ্যে—বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী মঙ্গল বিধান, বিশেষতঃ উচ্চ-জীবের মধ্যে। উহা সহজ-প্রবৃত্তি-জাত। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অবাধ সম্মিলনে ক্রমে ক্রমে জনন-শক্তি বিনষ্ট হইয়া, জাতি ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হয়। ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু, গরিল্লা শিম্পাঞ্জির মধ্যে এই বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা আছে, তাহা শুনা যায় না। অথচ, তাহাদের মধ্যে জোড়ামিলই বর্ত্তমান, অবাধ সম্মিলন নহে। এই জোড়া-মিল ঘরে ঘরে স্থিরীকৃত হয়। ইহা দেখিয়া কেহ যদি ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত করিতে চান, তবে তিনি সহজেই বলিতে পারেন যে, উহা মানবের অতি প্রাচীন ও 'সনাতন' ধর্ম্ম। আবার, যদি কেহ বলেন, কোন কোন সভ্যসমাজেও যে ভাইবোনের বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা ইহারই 'স্মৃতির' উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা হইলেই বা বলিবার কি আছে। একজন হেরড্ ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। ক্লিও-পেট্রা স্বীয় ভ্রাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভারতীয় শাক্যবংশে নাকি ভ্রাতা ভগিনীতে বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন পারস্য রাজগণও ভগিনীকে বিবাহ করিতেন। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা বর্ত্তমান। কোন কোন স্থলে এই প্রথা সংকীর্ণ হইয়া কেবল বৈমাত্রের ভগিনীতেই আবদ্ধ। এব্রাহাম বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করেন। ফিনিসীয়, আসিরীয় ও এথেনীয়দের মধ্যেও এই নিয়ম ছিল। মক্কায় ও কোন কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের (South Slavonian Mahomedan) মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত। কোন কোন স্থলে (Guatemala ও Yucatan) কেবল বৈপৈত্রেয় ভগিনীকেই বিবাহ করা চলে। ইহা জোড়ামিলেরই বৈজ্ঞানিক বা অ-বৈজ্ঞানিক সংস্করণ। কেন না, কেহ বলিবেন, এরূপ ঘনিষ্ঠ-বিবাহ বৈজ্ঞানিক—রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার ইহা প্রকৃষ্ট উপায়। কেহ বলিবেন, বিজ্ঞানসম্মত নয়, যেহেতু, এরূপ সংমিশ্রণে রক্তের হীনতা সম্পাদিত হইয়া উন্মাদ প্রভৃতি উৎপন্ন করে। নাসৌ মুমির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

মানুষ কিন্তু জোড়ামিলের প্রথা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াও হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিঞ্চিৎ বয়স হইলে, মানুষ যে কারণেই হউক, এই স্বাভাবিক সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া অবধি, যৌন-সমাগম গ্রহণ করিয়াছিল। যে সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রতিষ্ঠার আখ্যায়িকা রক্ষিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই ইহার সাক্ষী। মহাভারতের নানা আখ্যায়িকার, বিশেষতঃ পাণ্ডু ও কুন্তীর কথোপকথনের মধ্যে, আদির স্বৈরাচার ও বিবাহ-প্রথার অবিদ্যমানতা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। চীনাদিগের মধ্যে কথা আছে যে, আদিতে স্ত্রীপুরুষের ব্যবহারে, মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য ছিল না। সুতরাং সন্তানগণ মাতা ছাড়া, পিতা যে আবার কে, তাহা জানিত না। সম্রাট ফো-হি (Fou-hi) বিবাহের প্রচলন করিয়া এই অবস্থার উন্নয়ন করেন। প্রাচীন মিসরে মেনিস্ (Menes) ও প্রাচীন গ্রীসে কেক্রপস্ (Kekrops) বিবাহ-প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ল্যাপ

ল্যাণ্ডবাসীদিগের মধ্যেও এই প্রবাদ যে, জ্ঞাবিশ্ ও আর্ত্তজিস্ (Njavvis and Artjis) তাহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আদির জোড়ামিল হইতে বিবাহ বিকশিত হয় নাই। কিন্তু মানুষ সে জোড়ামিল ভুলিয়া যে অবাধ সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারই পরিবর্ত্তন করিয়া, বিবাহের উৎপত্তি। বিবাহ-প্রতিষ্ঠার কারণ যে সব জায়গায় একই ঘটিয়াছিল, তাহাও নহে—কোথায়ও বৈজ্ঞানিক কারণে, কোথাও বা অর্থ-নৈতিক কারণে, কোথাও শারীরিক কারণে। কারণ আবার কোন স্থলে সামাজিক, কোন স্থলে বা ব্যক্তিগত; কোন স্থলে বা একাধিক কারণের সমবায়ে বিবাহ আবির্ভূত হইয়া থাকিবে।

এখানে আরও একটী কথা প্রণিধান যোগ্য। স্ত্রীপুরুষের জোড়ামিল লইয়া যখন মানুষের আবির্ভাব, তখন পারিবারিক জীবন লইয়াই যে মানব সমাজের জীবন যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ জোড়ামিলের প্রথা নষ্ট না হইলে, মানব-সমাজ পরিবারেরই সমষ্টি হইত। কিন্তু পরিণামে তাহা হয় নাই। জোড়ামিলের স্থান যেমন অধিকার করে অবাধ-সম্মিলন, তেমনি পরিবারের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়—গণ বা গোষ্টি (clan বা tribe) বিবাহ আসিয়া যখন আবার জোড়ামিল প্রতিষ্ঠা করিল, তখন এই গণের একটা অংশই পরিবার আখ্যা প্রাপ্ত হইল। বর্ত্তমান পরিবার, গণের বিশ্লেষণ হইতে উৎপন্ন। এই যে শেষোক্ত জোড়া মিল—ইহাতেই বিবাহের সূত্রপাত।

অনেক বিবর্ত্তনে বিবাহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিবাহ-প্রথা বিকশিত হইতে সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। আদিতে যাহাকে বিবাহ বলা হইত, তাহাকে আমরা আর এখন বিবাহ নাম দিতে রাজী হইব না। সে তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয়, এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, যাহা অনেকের কাছে রুচি-বিরুদ্ধ মনে হইবে। তাঁহারা বলিবেন, উহার আলোচনা না করাই ভাল। তাঁহাদের নিকটে এই মাত্র নিবেদন, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সত্য-গোপন ছাড়া অন্য অশিষ্টতা নাই।

মানুষ বর্ব্বরাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছে। জ্ঞানধর্ম্ম লইয়া একদিন হঠাৎ আকাশ হইতে খুপ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হয় নাই। একদিন ছিল, যখন বাহিরের দৃষ্টিতে মানুষকে পশু হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। তখন পশু-জগৎ হইতে মানব-জগৎ স্বতন্ত্র ছিল না। যখন স্বতন্ত্র হইল, তখনও জ্ঞান এতটা পরিপক্ক হয় নাই যে, সন্তানোৎপাদনে যে আবার পিতার স্থান আছে, তাহা ধরা পড়িতে পারে। আহার পান যেমন প্রকৃতির তাড়নায় সম্পন্ন হয়,প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের জন্যই পশুপক্ষী যেমন আহার অন্বেষণ করে ও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, নরনারীও তেমনই সঙ্গত হইত। ইহাদ্বারা যে ধাত্রী প্রকৃতিদেবী আপনার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেন, ইহা পশুপক্ষী যেমন জানে না, এই আদিম মানুষও তাহা জানিত না। সুতরাং, পিতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয় নাই। এ জ্ঞানলাভ করিতে বহুদিন গিয়াছে। কিন্তু মাতৃত্বের জ্ঞান অপরিহার্য্য। সন্তান মাতৃ উদরে জন্মে ও পরিপুষ্ট হয়, ইহা ধরা পড়িতে

দেরী লাগে না। কাজেই সন্তানের উপর মায়ের দাবী, অপ্রতিহত ও অবিসম্বাদিত। এই আদিকাল হইতেই কিন্তু মাতৃকৈন্দ্রিক (Matriarchal) সমাজ-ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তারপর যখন পিতৃত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও প্রথম প্রথম সন্তানকে মাতৃ-নামেই পরিচয় দিতে হইত। কেন না, আট্‌ঘাট্ বাঁধিয়া বিবাহ একদিনে প্রচলিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও যদি পিতৃনির্ণয় কষ্টসাধ্য হইত, তখন পুত্র মাতৃ-নামেই পরিচয় দিত—যেমন উপনিষদের জবলা-পুত্র জাবালি। নরনারী যখন অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইত, তখন পিতৃনির্ণয় অতি সুকঠিন, এমন কি অসম্ভব, কার্য্যই ছিল। সুতরাং, এই মাতৃ-কৈন্দ্রিক-ধারা তখনও অপ্রতিহত না থাকিয়া পারে নাই। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এই ধারা রহিয়াছে। মান্দ্রাজের নায়ারদের মধ্যে এখনও উহা প্রচলিত। উত্তরাধিকার কন্যাগত, পুত্রগত নহে। সন্তান কাহার ঔরসজাত তাহা নির্ণয় না হইলেও, কাহার গর্ভজাত তাহা নির্ণয় হইতে সময় লাগে নাই। সুতরাং, অঞ্চবকে পরিত্যাগ করিয়া, উত্তরাধিকার ধ্রুবেরই অনুসরণ করে। তবে, উহা প্রাচীন প্রথারই উদ্বর্ত্তন, না বিশেষ অবস্থা সকলের সমবায়ে স্থান বিশেষে একটা বিশেষ ব্যবস্থার বিবর্ত্তন, এই তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথা নিঃ সন্দেহে বলা যায়, যে উহা অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলেই বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্মত মূল-প্রথা। মাতা তো জননী, এ বিষয়ে কোন দ্বিধাই নাই; কেন না, তিনি গর্ভধারিনী। পিতাও তো জনক—সন্তানোৎপাদনে পিতৃত্বের স্থান মাতৃত্বের নিম্নে কিছুতেই নহে। তবে সন্তান কেবল মাতৃনামেই অভিহিত হইবে কেন? বিশেষতঃ, নারী যখন সব বিষয়েই হীন হইয়া পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিলেন, পুরুষ সর্ব্ব বিষয়েই যখন আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিল, তখন এই এক বিষয়ে নারীর আধিপত্য টিঁকিতে পারে নাই। তাই পিতৃকৈন্দ্রিক-ধারার (Patriarchal system) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইল। কিন্তু তখনও তো সুনিয়ন্ত্রিত বিবাহ প্রণালীর আবির্ভাব হয় নাই। বিবাহ আসিয়াছিল, কিন্তু নরনারীর অবাধ মেলা-মেশার পথ অব্যাহতই ছিল। নারী একমাত্র পুরুষেই আবদ্ধ থাকিবে, বিবাহের এই মন্ত্র তখনও উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং, যুক্তি তো এই কথাই বলিবে যে মাতৃকৈন্দ্রিক ধারাই প্রবাহিত থাকুক। কিন্তু নারীর এই প্রাধান্য, বোধ হয়, পুরুষের পক্ষে অসহ্য হইল। তাই যুক্তি যাহাতে সায় দিল না, কৌশলে তাহা সম্পন্ন করিবার আয়োজন হইল। যে পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত, নারী তাহারই ক্ষেত্র। জনক যিনিই হউন না কেন, যাঁহার ক্ষেত্রে জন্ম, সন্তান তাঁহারই, তাঁহারই নামে সে পরিচয় দিবে। ক্ষেত্র-নির্ণয়ে নাপিত পুরোহিত তো সাক্ষী আছে-ই। সুতরাং, কৌশলে নারীর অধিকার বিনষ্ট করিয়া, সেই উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক অবস্থারও পিতৃকৈন্দ্রিক-ধারা প্রচলিত হইল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মানব-সমাজ বিবাহ-প্রথা লইয়াই আবির্ভূত হয় নাই; সমাজ-বিবর্ত্তনে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, উহা ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান উন্নত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসের দিকে মহাভারতের আখ্যায়িকা তাহা প্রমাণ করিবে।

প্রথম আখ্যায়িকা।

পাণ্ডু-কুন্তী সংবাদ।

পাণ্ডু বলিলেন,—"সুন্দরি! ঋষিগণ যে প্রাচীন ধর্ম্মের কথা কহিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বকালে মহিলা সকল স্বাধীন ছিল। যাহাকে ইচ্ছা হইত তাহারই সহবাস করিতে পারিত, তাহাতে স্বামী বা অন্য কাহারও আজ্ঞা অপেক্ষা করিত না। অবিবাহিতাবস্থায় তাহারা যাহা ইচ্ছা করিত, তাহাতেও কোন দোষ হইত না; কারণ, তখন ধর্ম্মই ঐ প্রকার ছিল। এক্ষণে, পশু-পক্ষীরা সেই প্রাচীন ধর্ম্মের অনুগমন করে, তজ্জন্য কেহ কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হয় না। ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, এই ধর্ম্ম প্রমাণসিদ্ধ; সুতরাং, তাঁহারা উহার সম্মানও করেন। উত্তরকুরু-দিগের মধ্যে ঐ ধর্ম্ম অদ্যাপি প্রচলিত ও আছে। উহা অতি প্রাচীন ও মহিলাদিগের পক্ষে সাতিশয় অনুকূল"। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২২)

দ্বিতীয় আখ্যায়িকা।

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

উদ্দালক নামে এক ঋষি ছিলেন। মহা-তপস্বী শ্বেতকেতু তাঁহার পুত্র। একদিন শ্বেতকেতু পিতা মাতার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "যুবতি! আমার সমভিব্যাহারে চল।" দ্বিজ এই কথা বলিয়া যেন বল-প্রকাশ করিয়াই তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহা দেখিয়া শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, "পুত্র! কোপ করিও না; অতি প্রাচীনকাল অবধি এই সনাতন-ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে সর্ব্ব-বর্ণের কামিনী-রাই স্বাধীন। মনুষ্য সকল সমান-বর্ণ মহিলাতে গো-সদৃশ আচরণ করে। যে যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহাকেই সম্ভোগ করিতে পারে"। উদ্দালক পুত্রকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শ্বেতকেতু এই ধর্ম্মের অনুমোদন করিলেন না। প্রত্যুত ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই সীমা নির্দ্দেশ করিলেন যে, আজি হইতে যে নারী স্বামীকে অতিক্রম করিয়া অন্য পুরুষের সহবাস করিবে, সে ভয়ানক দুঃখের নিদান ভূত-প্রাণ-হত্যা-পাতকে নিমগ্ন হইবে। যে পুরুষ পতি-ব্রতা ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া অন্যনারীর সহবাস করিবে, সেও উক্ত পাপের ভাগী হইবে। আর যে পত্নী পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহাকেও প্রাণঘাতিনী হইতে হইবে।"

তৃতীয় আখ্যায়িকা।

দীর্ঘতমার বিবরণ।

ঋষি দীর্ঘতমা, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা, উতথ্যের পুত্র। তিনি অন্ধ ছিলেন ও স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিতে পারিতেন না। বরং স্ত্রীকেই তাঁহার ভরণপোষণ করিতে হইত। এই "বৃহস্পতি-তুল্য তেজস্বী উতথ্য-সন্তান" ঋষি দীর্ঘতমার আর যে যে দোষ ছিল, তাহা মহাভারত পাঠ করিলেই জানা যাইবে; তাহার পুনরুক্তি চলে না। তাঁহার পত্নী তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে আর তিনি তাঁহার ভরণ করিবেন না। তখন দীর্ঘতমা বলিলেন,—"আমি আজ হইতে পৃথিবীতে এই সদাচার নির্দ্দেশ করিলাম, পত্নী মরণকাল পর্য্যন্ত একমাত্র স্বামীকেই

পরমাগতি বলিয়া জ্ঞান করিবে। পতি জীবিত থাকুন, আর পরলোকেই গমন করুন, ভার্য্যা কখনই অন্য পুরুষের সংসর্গ করিতে পারিবে না। যে নারী এই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে, সে নিশ্চয়ই পতিত হইবে।"

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৫)

আমাদের প্রথম কথা—বিবাহের এক-নিষ্ঠতার নিয়মগুলির বিবর্ত্তনে নারীরই আটঘাট বাঁধিয়া দেওয়া হইল, পুরুষের বেলায় পথ খোলাই রহিল। সুতরাং, বিবর্ত্তন এই-খানে থামিতে পারে না। উভয়তঃ এক-নিষ্ঠতার প্রতিষ্ঠানেই বিবাহ-বিবর্ত্তনের পরাকাষ্ঠা। নতুবা, একপেশে নিয়মে নিয়ম রক্ষিত হয় না। দীর্ঘতমা স্বয়ং ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি নারীর পক্ষে এই সকল কঠোর ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু নিজেই তাহা ভঙ্গ করিলেন। একপেশে নিয়ম, আত্মঘাতী।

আমাদের দ্বিতীয় কথা—ভারতের বিবাহ বিবর্ত্তনের আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, একটী সনাতন-ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে (প্রথম ও দ্বিতীয় আখ্যায়িকা), সকলের রক্তই সকলের শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। সুতরাং, পেটেল বিল লইয়া যে হাঙ্গামা, তাহা হিন্দুর সনাতন-ধর্ম্মের বিরোধী হইতেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রেরণা।

তুলি শির আজি না পারি দাঁড়াতে
নত হয়ে রহি তাই,
এ জীবন লয়ে কিসের গৌরব
এ যেন শ্মশান ছাই।
জীবনের সেই প্রতিভা কোথায়
কোথা বা উদ্যম আর?
কোথা দয়া ধর্ম্ম দান ত্যাগশীল
রহে হৃদি ক'জনার?
হেরি' আচরণ, জাগে শুধু মনে,
ধরণী নেশার ঠাঁই,
বসন ভূষণ, বাক্য বাহাদুরী
সহায় সম্বল তাই।
ভুলে গেছি হায়! কেন এসেছিনু
কেন এ জীবন আর?
তাই খাঁটি ছেড়ে মোহ-পঙ্ক-স্রোতে
ভেসে মোরা অনিবার,
শিক্ষা অভিমানে হয়ে গরীয়াণ
তুলি যবে ধীরে শির,
শত স্মৃতি জাগি' লজ্জা অনুতাপে
বহে যে নয়ন নীর।
তারা ও রমণী, মোরা ও রমণী,
কাদের গৌরবে জাগি?
কাহাদের নাম স্মরিয়া প্রভাতে
নিয়ত কল্যাণ মাগি?
কোথা সেই "খনা", যাহার বচন
আজিও সকল ঘরে?
কোথা এবে "গার্গী", পণ্ডিত-সমাজ
পরাজয় যাঁর করে?
"উভয় ভারতী" কোথা বল আজি
পতির দাসত্ব-হারী,
ভারত-বিজয়ী শঙ্করে হারালে
জ্ঞান বলে যেই নারী?

কোথায় "পদ্মিনী", সতীর সম্মান
প্রাণ সঁপি রাখে যেবা ?
নিজ পুত্র-মাংসে "পদ্মাবতী" সমা
কে করে অতিথি সেবা ?
কোথায় "গান্ধারী", হৃদি-বল যাঁর
চির-অতুলন ভবে,
"ধর্ম্মজয়" মাগি ভীম রণে যেবা
প্রেরিলা সন্তান সবে ?
কোথায় "সুমিত্রা" সপত্নী পুত্রের
আরাম-কারণ তরে,
আপন আত্মজে অকাতরে যেবা
কাননে প্রেরণ করে ?
কোথা "কুন্তী" আজি দুর্ব্বলে রক্ষিতে
পুত্র দেয় অরি ঠাঁই ?
ধর্ম্মে পাগলিনী কোথা রহে এবে
বিভু-গতা "মীরাবাই" ?
রাজেন্দ্রানী হয়ে "ক্ষেমা" সম কেবা
নিয়েছে সেবার ব্রত ?
কাঙ্গালের অন্ন জোগাতে ব্যাকুল
কে রহে "বিশাখা" মত ?
তারাও রমণী মোরাও রমণী,
কতদূর ব্যবধান,—
ক'জনার মাঝে রয়েছে এখন
যাহারে বুঝায়—"প্রাণ" ?
আপনারে লয়ে বিব্রত মোরা যে
ধারিনা কাহারো ধার।
কাজ হতে হায়! বাহ্য-আড়ম্বর
কথাই মোদের সার!
উন্নতির যদি একান্ত বাসনা
ভগিনী! মোদের রয়,
নিস্বার্থ-কৃপাণে হইবে নাশিতে
স্বার্থ-রাশি সমুদয়।

"পর" "পর" ভাবি কেন যাই সরে
কেহ নাহি "পর" ভবে,
একই মায়ের মোরা যে সন্তান,
কেন ভেদাভেদ তবে ?
ধরণী মোদের হয় কর্ম্মভূমি
এ যে গো আবাস নয়,
জীবনের ব্রত হইবে সাধিতে
জননী-আদেশ রয়।
সবারি ব্যথায় ঝরিবে নয়ন
সুখেতে লভিব প্রীতি,
যেটুকু শকতি হিত-কামনায়
নিয়োজিব তাই নিতি।
অধীন অবলা যদিও রমণী
হৃদয়ে শকতি রয়,
হৃদয়ের গতি রোধিতে ধরায়
কারো যে শকতি নয়।
নতশির আরো করি অবনত
মায়ের ও রাঙ্গাপায়,
মোদের সে সব "হারাণ-ভূষণ"
এস! মাগি পুনরায়।
হে বিশ্বজননী! দুরবল মোরা
চলিতে অক্ষম ভবে,
বিতর করুণা, আপনার পদে
দাঁড়াই যেন হে সবে।
চলিতে সংসারে প্রতি পদক্ষেপে
যেন হে নয়ন আগে,
তোমারি মধুর মোহিনী মূরতি
নিয়ত মোদের জাগে।
এ হৃদয় হোক্ পূজার মন্দির
তোমারি অর্চ্চনা তরে,
ও রাঙ্গা চরণে ভকতি কমল
বিকাশি যেন গো পড়ে।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

৺ পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ইংরাজী ১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী, গত ১৭ই পৌষ শনিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময়, বাঙ্গলা সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ও সুহৃদ্, "সাহিত্য" পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৫১ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বাল্যকালে মাতামহ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেশচন্দ্রকে ইংরাজী-প্রধান শিক্ষার পথ হইতে দূরে রাখিয়া, সংস্কৃত-প্রধান অধ্যয়ন প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। বয়সে, তিনি ইংরাজী নিজেই শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যরথীদিগের গ্রন্থনিচয় পাঠ করিয়াছিলেন। বাল্যের সংস্কৃত চর্চ্চা তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভেই সাহিত্য-রসের অনুরাগী করিয়াছিল। এবং সেই অনুরাগের ফলেই তাঁহার "সাহিত্য" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। "সাহিত্যের" প্রথম কয়েক বৎসর, তাঁহার যৌবনের বন্ধু সকলেই সাহিত্য-সেবার জন্য উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহাদের যে দলটীর ভাব-বিনিময়ে "সাহিত্য" সৃষ্টি, সেই দলটীর অনেকেই বৃত্তির জন্য অন্য পথে গিয়াও আজীবন সেই সাহিত্য-সেবা ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"স্বদেশীর" সময় সুরেশচন্দ্রের বাগ্মিতা শক্তির উন্মেষ হয়। আমাদের মনে পড়ে, ৺নন্দলাল বসুর বাটীতে বিজয়া-সম্মিলনের দিন—সেইদিন প্রথম সুরেশচন্দ্রই বক্তৃতার মুখে বলেন, "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গলার নবযুগের মন্ত্র, বঙ্কিমচন্দ্র সেই মন্ত্রের ঋষি। সেইদিন প্রথম আগ্নেয় গিরির স্রাবের মত সেই জ্বালাময়ী ভাষা, কত না বেদনা ভরা, আশা ভরা, আকাঙ্ক্ষা ভরা, উৎসাহ ভরা, প্লাবনে স্রোতৃবৃন্দকে স্নাত করিয়া দিয়াছিল। সেইদিন প্রথম সুরেশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছিলেন, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত বহুল ভাষার যে এতটা প্রাণের স্পন্দন আছে, এতটা তেজের ইন্ধন আছে, এতটা উন্মাদনার আবেগ আছে, তাহা ত ইতিপূর্ব্বে কেহ জানাইতে পারে নাই। তাহার পর হইতে, সুরেশচন্দ্র তাহার সেই অননুকরণীয় ভাষায় অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় অকালে সেই ভাষার উৎস শুখাইয়া গেল!

ক্রমান্বয়ে প্রায় ১৮ বৎসর ধরিয়া নানা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার সহিত সুরেশচন্দ্র সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "সুরভি ও পতাকা," "প্রতিবাসী," "সন্ধ্যা," "বসুমতী," "নায়ক"-যখন যে পত্রিকাতেই লিখিতেন, তাঁহার সেই সরল ব্যঙ্গ ও সেই জ্বালাময় শ্লেষ, তাঁহার লেখার ঢংকে অন্য সকল লেখা হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিত। অমিত্রাক্ষরে সাময়িক প্রসঙ্গের যে বিশ্লেষণ বাহির হইত, তাহা বঙ্গ-ভাষায় অতুলনীয়, উপভোগের সামগ্রী। আর "সাহিত্যে" মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি, গভীর বেদনাবোধ ও যথোপযুক্ত কষাঘাতের সহিত তাঁহার যে সাহিত্য-বিহিতকীর্ষা ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষিত হইত, আক্ষেপ হয়, বোধ হয় বা, তাহা তাঁহার সহিতই তিরোধান হয়। এই সমালোচনা লইয়া তাঁহার সহিত অনেকের মনান্তর ও মতান্তর হইয়াছে, কিন্তু তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থা—"হিতং

মনোহারি চ দুর্লভং বাঃ”—পরিত্যাগ করেন নাই, বুঝিবা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেননা সুরেশচন্দ্র মাতামহের একটা বিরাট গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাহার মনে এক, ও আচার ব্যবহার কথায় অন্য এক মানুষ ছিল না। দেহে মনে, অন্তঃকরণে, কথায়, বাগ্মিতায়, ব্যবহারে তিনি বিরাট সাধনা করিতেন, এবং সেইজন্য সর্ব্ব-প্রকার স্বদেশ-সেবার কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১শে পৌষ, বুধবারের 'নায়কে' যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিবার যোগ্য—

সুরেশচন্দ্র ত লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। আমাদের দৈনিক নায়কের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে গোটা কয়েক কথা বলা প্রয়োজন বুঝিয়াই এই আহত শয্যাশায়ী অবস্থায় মনের কথা ব্যক্ত করিতে হইতেছে।

সুরেশ সত্যই আমাদের সহোদর সদৃশ ছিল। ভাই ভাই ঝগড়াও হইয়াছে, ভাবও হইয়াছে। লেখালেখিও চলিয়াছে, কথা কাটাকাটিও হইয়াছে। সে ত জীবনের লীলা খেলা,—সে ত মমত্বের পরিচায়ক। সে বাঁচিয়া থাকিয়া যদি কেবলই ঝগড়া করিত, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যধিক মাত্রায় আনন্দ-দায়ক হইত। তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিলেও একটা সুখ ছিল। সে সুখে এইবার জীবনের বাকী কয়টা দিন বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইল। ইন্দ্রনাথ, কাব্য-বিশারদ, যোগেন্দ্রচন্দ্র আর সুরেশচন্দ্র,—এই কয়জনের সহিত কলম বাজীতে একটু অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করা যাইত। শেষ সুরেশচন্দ্র ছিলেন, তিনিও চলিয়া গেলেন। সুরেশচন্দ্র সংস্কৃত জানিতেন, অলঙ্কার শাস্ত্রও একটু পড়া ছিল, রঙ্গব্যঙ্গের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা তিনি বুঝিতে পারিতেন। পাল্‌টা জবাবও দিতে জানিতেন। তাই বলিতেছিলাম, সুরেশ শতায়ু হইয়া এই সংসারে থাকিয়া আমাদের সহিত কলমবাজী করিল না কেন?

দৈনিক নায়ক যখন ৺হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পত্তি হইয়াছিল, তাহার কয়েক মাস পরেই সুরেশ দৈনিক নায়কের সহযোগী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহযোগিতায় নায়ক সত্যই অনেক বিষয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অমন গদ্য ও পদ্য লেখক ত আর পাইব না। অমন অনুভবী রসিক ত আর ছিল না। একটু ইসারায় ইঙ্গিত পাইলেই সে ব্যাপারটা সব বুঝিয়া লইত, এবং অতি উজ্জ্বল ভাষায় সরস ভঙ্গীতে তাহা লিখিয়া দিতে পারিত। সুরেশের সহিত সংবাদপত্রের লিখন-ভঙ্গীর একটা ধারা চলিয়া গেল। সে পদ্ধতি বা ধারা নকল করিবার নহে। ভিতরে একটু বিশিষ্টতা না থাকিলে লেখার মধ্য দিয়া সেটুকু ফুটিয়া উঠে না। সুরেশের মৃত্যুতে দৈনিক নায়কও ক্ষতিগ্রস্ত হইল,—একটা বড় জাঁদাল লেখক হারাইল।

সত্যই সুরেশের মত আর গদ্য লেখক পাইব না। অমন সুমার্জ্জিত ব্যাকরণ-শুদ্ধ অথচ শব্দ-সম্পদে নিত্য প্রফুল্ল ভাষা ইদানীং আর ত কাহারও লেখনী মুখে নিঃসৃত হইতে দেখি না। সুরেশ রসিক ছিল; বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের সনাতন রস-প্রবচন গুলি তাহার আয়ত্ত ছিল, এবং যথা স্থানে সে সকলের প্রয়োগ করিতে জানিত। সুরেশ স্পষ্টবাদী তেজস্বী লেখক ছিল। উপকারক বন্ধুকেও সে যুক্তিযুক্ত কথা শুনাইতে সঙ্কোচ করিত না। খবরের কাগজের মহল হইতে বিধাতা তাহাকে সরাইয়া লইয়া বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিলেন। যে ধারা 'সুলভ সমাচার' হইতে 'নায়ক' পর্য্যন্ত নানা ভঙ্গীতে বহিয়া আসিতেছিল, তাহা যে অনেকটা শুকাইয়া গেল, সত্যের খাতিরে এটুকু আমরা বলিতে বাধ্য। সুরেশ ফুটিয়াছিল তিন কাগজে। প্রথম সন্ধ্যায়, দ্বিতীয় সাপ্তাহিক বসুমতীতে, তৃতীয় নায়কে। ইহা ছাড়া অন্য অনেক কাগজের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলেও, সুরেশের লিখন ভঙ্গীর বিশিষ্টতা আর কোথাও তেমন প্রকট ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুরেশ চলিয়া গেল, তাহার স্থান অধিকার করিবার মানুষ আর ত দেখিতে পাই না।

আবার বলি, সত্যই সুরেশ আমাদের সহোদর সদৃশ ছিল। সে আজ পঁচিশ বৎসরের অধিককালের কথা; তখন আমি সবেমাত্র বঙ্গবাসীর সম্পাদক বিভাগে যোগ দিয়াছি। সেই ১৮৯৫ সাল হইতে তাহার সহিত সুখে দুঃখে, সাফল্যে বিফলতায়, সম্মিলিত থাকিয়া দিন কাটাইয়াছি। এমন জাক

ছিল না, যাহাতে উভয়ে এক সঙ্গে কাজ করি নাই। সুরেশ যেমন লেখক ছিল, তেমন সদ্বক্তাও ছিল। সে বক্তৃতা করিতে গোড়ায় একেবারেই পারিত না। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় সে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করে। পরে এমনই ভাল বক্তা হইয়াছিল যে, লোকে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বক্তা বলিয়া গণনা করিত। ইহা কম বাহাদুরীর কথা নহে। দশ বৎসরের চেষ্টায় একেবারে অগ্রণী বক্তা বলিয়া পরিচিত হওয়া অপূর্ব্ব মনীষারই পরিচায়ক।

সুরেশের "সাহিত্য" সুরেশের কৃতিত্বের বড় পরিচায়ক। সাহিত্য ত বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র ছিলই,—কেবল তাহাই নহে, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন ও নবজীবনের ধারা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। সাহিত্যের কল্যাণে, সাহিত্য-পত্রে মক্স করিয়া অনেক গদ্য পদ্য লেখক বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। বুঝি বা সুরেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের সাহিত্যও লোপ হয়।

সুরেশ চলিয়া গিয়াছে। তাহার গণা দিন শেষ করিয়া, তাহার কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া, সে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যে কয়জন আছি, জীবনের বাকী কয়টা দিন তাহার কথা কহিব, তাহার জন্য তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করিব। যদি বাঙ্গালার এই অভিনব সাহিত্য টিকে, যদি বাঙ্গালার সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে হয় ত দূর ভবিষ্যতে সুরেশের স্মৃতি উজ্জ্বল হইলেও হইতে পারে। কারণ, সুরেশ যে সাগর-বক্ষের একটা বড় বুদ্‌বুদ্ ছিল। বিদ্যাসাগর হইতে ভাব-সাগর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গের যে সাহিত্যসাগর বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। তাহার উপর সুরেশ যে একটা বড় বুদ্‌বুদ্ ছিল। কাজেই বলিতে হয় এ সাহিত্যের যখন আদর হইবে, তখন হয় ত সুরেশের নাম আবার জাগিয়া উঠিবে। এখন সম্মুখে রাজনৈতিক কর্দ্দমপূর্ণ বিপ্লববাদের উৎকট বন্যা আসিতেছে। সে বন্যা-মুখে কোন্‌টা থাকিবে কোন্‌টা ভাসিয়া যাইবে, তাহা বলা কঠিন! তাই আমরা যতদিন আছি, ততদিন সুরেশের অভাব অনুভব করিব; তাহার কথার আলোচনা করিব; শেষে আমাদিগকেও ডুবিতে হইবে।

পরিশেষে, পরমারাধ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সুরেশের মাতা ঠাকুরাণীকে আমরা কি বলিয়া প্রবোধ দিতে পারি, বুঝিতেছি না। তাহার জীবনের সন্ধ্যাকালে এই অতি বড় নিদারুণ শোক যহন করিবার একমাত্র শক্তি সামর্থ্য সেই শ্রীহরিই বিধান করিতে পারেন। মানুষের কথায় সে কষ্ট, যে যন্ত্রণা উপশম হইবার নয়; সে জ্বালা নিভিবার নয়। তিনি দুইটী পুত্ররত্নের অধিকারিণী ছিলেন—সুরেশ ও জ্যোতিশ। বেশী দিন নয়, জ্যোতিশ মায়ের কোল অর্দ্ধ-রিক্ত করিয়াছিলেন; এখন বিধাতা সুরেশকে লোকান্তরে লইয়া গিয়া মাতৃ অঙ্ক একেবারেই শূন্য করিলেন। মাতৃদেবীর এই শোকদগ্ধ প্রাণে তিনি এখন শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন, এই সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

মাতৃরূপে হেরি তোমা বাৎসল্যের খনি।
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, সন্তান স্নেহের পাত্র
তার সুখ শান্তি তরে কিনা কর তুমি;
ত্যাগের জীবন্ত-মূর্ত্তি সাজগো জননি!
যতদিন বেঁচে থাক এমর-জগতে
সন্তান-কল্যাণ তরে, ভোগ সুখ রেখে দূরে,
যত্ন কর অনিবার ক্লান্তি নাহি চিতে;
এত সহিষ্ণুতা প্রেম না হেরি মহীতে।
দয়াময়ী প্রেমময়ী নিঃস্বার্থ হৃদয়;
মাতৃরূপে নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

ভগ্নীরূপে নারী তুমি কত ভালবাস,
তৃপ্তকর স্নেহদানে, যে পেয়েছে সেই জানে,
দুঃখে কাঁদ, সুখ হেরি আনন্দেতে ভাস ;
স্নেহ প্রস্রবণ নিতি করমে প্রকাশ।
দুঃখ দৈন্য তিরোধানে কর সহায়তা,
না খেয়ে ভ্রাতাকে দিয়ে, পুলকিত তব হিয়ে,
সুখী হও শুনে তার মঙ্গল বারতা ;
ভ্রাতৃময় হিয়া তব কি মহা প্রাণতা !
ভাবি যবে মনে কত হয় সুখোদয় ;
ভগ্নীরূপে নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

পত্নীরূপে বিশ্বে তুমি প্রেম প্রবাহিনী ;
দানকরি প্রেমামৃত, কর্ম্ম-ক্লিষ্ট পতি-চিত,
শুষ্ক তপ্ত, রসময় কর বিনোদিনী ;
মন বিনোদিয়া হও হৃদয়ের রাণী।
আপনাকে মিশাইয়া দাও পতিসনে,
সুখে দুঃখে অনিবার জীবন-সঙ্গিনী তাঁর,
স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া হও একমনেপ্রাণে,
ভিন্ন স্বার্থ লুপ্তকর আপন জীবনে।
হৃদয়ে ভরিয়া রাখ পতি দেবতায় ;
প্রেম-পুষ্প দিয়ে নিতি, পুজে তাঁরে পাও প্রীতি
পতি বিনে অন্য দেব, কে আছে কোথায়
ভাবিয়া করেছ হৃদি শুধু পতিময়।
কত মধুময়ী তুমি শান্তির আলয় ;
পত্নীরূপে নারী তুমি, দেবীই নিশ্চয়।

কন্যারূপে হেরি যবে, প্রীতির আধার
জনক জননী প্রতি, সরল অগাধ প্রীতি,
সেবাধর্ম্ম শিরে বহি চল অনিবার ;
আদেশ পালনে কভু না হও কাতর।
মাতা পিতা উভে সেব কিঙ্করীর মত ;
কত যত্ন, কত ভয়, কত ভক্তি প্রাণময় ;
নীরবে কর্ত্তব্য ব্রত সাধ অবিরত ;
স্মিতমুখে নতশিরে স্নিগ্ধ করি চিত।
পরগৃহে বাস করি, মিশি পর সনে,
তবু কত আকর্ষণ, নাহি হও বিস্মরণ,
দুঃখে নেত্রঢালে অশ্রু,সুখে সুখী-মনে
নন্দিনী তোমার সম কে আর ভুবনে ?
শুভাননা প্রীতিময়ী আনন্দ-নিলয়,
ভক্তিমতী নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

পরদুঃখে দ্রবময়ী দয়াবতী নারী
হৃদয় অমৃত নদী, সুধা স্রোতে নিরবধি,
সিক্তকর তপ্তহিয়া মুছ নেত্রবারি
আর্ত্তজন, করুণা মণ্ডিত করে ধরি।
বিপন্ন হেরিয়া দয়া হয় উছলিত ;
নহ ভগ্নী নহ মাতা, পত্নী নহ পতি-রতা
ভক্তিমতী নহ কন্যা তবু হেন চিত ;
বিপন্ন উদ্ধার তব জীবনের ব্রত।
নাহি কোন স্বার্থ গন্ধ উদার হৃদয় ;
এ জগতে নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

রাজপুতানার পথে।

দাসত্বের দায়ে কাঠিবার যাত্রাকালে নিতান্তই এক নিশ্বাসে দৌড় দিতে হইয়াছিল,—পথে সুতরাং রাজপুতানার রেলগাড়ি চড়া ভিন্ন কোথাও উহার নৈসর্গিক রমণীয়তা উপভোগ করিবার অবসর মিলে নাই। এবারে তাই দুর্গা পূজার বন্ধে দশদিন স্বাধীনতার একটু সুবাতাস পাইয়া, দিল্লী হইয়া, আর একবার সে পথে বেড়াইবার সঙ্কল্প করা গেল। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা"—নীতিজ্ঞের এই সদুপদেশ সত্ত্বেও, সহধর্ম্মিণী এবার সঙ্গ ছাড়িলেন না,—তাঁহার বড় সাধ—'সাবিত্রী'র সীমন্তে সিন্দুর চড়াইয়া তাঁহার নারীজীবন সার্থক করিবেন। অগত্যা যথাসাধ্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া সঙ্কটবারিণীর নাম স্মরণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক বাহির হইয়া পড়িলাম। অপর সহযাত্রীর মধ্যে এক মাতৃহীনা শিশু

নাতিনী ; যেখানেই যাই, তাহার সঙ্গ অপরিহার্য্য।

অবকাশের অল্পতা নিবন্ধন পথে অযথা সময় ক্ষেপণ অনভিপ্রেত হইলেও, একবার দিল্লী দর্শনের লালসা পরিত্যাগ করা গেল না। এ লালসা হিন্দুর হস্তিনাপুরের, বা মোগলের মহৈশ্বর্য্যের, স্মৃতিসম্ভূত নহে ; কুতবের বিজয়কেতন হুমায়ুনের সমাধিসদন, দেওয়ানি খাসের অপূর্ব্ব মর্ম্মর প্রাচীর বা জুম্মার অদ্বিতীয় উপাসনা মন্দির, বা ঐরূপ কোন হর্ষ বিষাদের, তমঃসত্ত্বের, স্মৃতিলেখার কুহকজনিতও নহে। সে লালসা ত পূর্ব্বেই একাধিক বার চরিতার্থ করা গিয়াছে, সে স্মৃতি ত অটুট অক্ষরে হৃদয়ফলকে চিরদিন অঙ্কিত রহিয়াছে। এ লালসা কেবল ভারতেশ্বরীর ভুবনবিখ্যাত রাজধানীর চিতাভস্ম নবসম্রাটের অভিনব রাজধানী প্রতিষ্ঠার আয়োজন দর্শনের নিমিত্ত। কুক্ষণে কর্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গ-ভঙ্গ সাধিত হইয়াছিল,—বাঙ্গালীর সহস্র চেষ্টাতেও সে ভাঙ্গা আর জোড়া লাগিল না। অনেক সাধনা উপাসনার পর, অনেক বোমা-'বয়কট' প্রভৃতি বীভৎস অভিনয়ের পর, অনেক প্রাণি হত্যা, দ্বীপান্তর, প্রভৃতি মর্ম্মান্তিক কাণ্ডের পর, সম্রাটের শুভাগমনসূত্রে সে জোড়া লাগিল, যাহাতে আমাদিগের রাজনৈতিক দলপতিগণ, অভীষ্টসিদ্ধ হইল ভাবিয়া, মহা আনন্দ অনুভব করিলেন, সে জোড়ায় চিড় ঘুচিল না, বিহারী বন্ধু বহুদিনের গৃহ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, অসমীয়া অন্তরঙ্গ দশদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া আবার স্বতন্ত্র সংসারে সরিয়া পড়িলেন, ওড়িয়া ভায়া অনিচ্ছায় বিহারী ভ্রাতার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন, আর, সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়, বঙ্গের চিরন্তন কীর্ত্তির বিলোপ সাধন করিয়া কলিকাতা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইল। আমাদিগের এ ক্ষেত্রে দিল্লী যাত্রা এই নব রাজধানীর নূতন সংস্করণ দেখিবার জন্য।

পুরাতন দিল্লী প্রাচীরের প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে, টিমারপুর মহল্লায়, সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ্য দরবারে—সম্রাট্ নূতন সহরের ভিত্তিস্থাপন করিয়া গেলেন। তাহার কিছুদিন পরেই শুনা গেল, এই অঞ্চলের জমির দশ ফিট নিম্নে দুরন্ত যক্ষ্মারোগের বীজ বিদ্যমান ; অতএব এস্থানে সহর প্রতিষ্ঠা বিপজ্জনক বিবেচনায়, পূর্ব্বোক্ত দিল্লী প্রাচীরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, প্রায় তিন চারি ক্রোশ দূরে, কুতবের পথে, রাইসিনা নামক স্থানে সম্রাট্ প্রোথিত ভিত্তিশিলা স্থানান্তরিত হইল। টিমারপুর হইতে এই রাইসিনা ঠিক পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে—পল্লীবাসীর হিসাবে সম্পূর্ণ গ্রামান্তর বলিলেই হয়। সম্রাট কর্ত্তৃক ভিত্তিস্থাপনের গুরুত্ব ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, অথচ তাঁহারই দোহাই দিয়া এই সুদূর প্রান্তরে নূতন সহরের প্রতিষ্ঠাকল্পে রাশি রাশি অর্থ অকাতরে ব্যয়িত হইতেছে। Government House, Secretariat Buildings, Council Chamber, প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় অট্টালিকাদির গঠনকার্য্য শেষ হইতে এখনও তিন চারি বৎসর লাগিবে, বোধ হয়। ওদিকে রাইসিনাতে স্থায়ী Council Chamber ক্রমশঃ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, এদিকে টিমারপুরের অস্থায়ী Council Chamberএ স্থান সঙ্কীর্ণতা বশতঃ প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা ব্যয়ে তাহা বর্দ্ধিত করা হইতেছে। বস্তুতঃ সুপ্রশস্ত রাজপথ ও ছোট-বড় সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীগণের বাসভবন ভিন্ন এ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই শেষ

হয় নাই। রাইসিনাতে বিস্তর বাড়ী ঘর প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও, সিমলার সাহেবেরা দিল্লীতে নামিয়া প্রায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন; তাহার ভাড়ার কতক অংশ তাঁহারা স্বয়ং দেন, কতক সরকার বাহাদুরকে দিতে হয়। টিমারপুরের অস্থায়ী বাসাবাটীতে সিমলাগত সকল কেরাণীর স্থান না হওয়ায় অনেককে রাইসিনায় থাকিতে হয়; তাঁহাদিগের যাতায়াতের পথখরচ সরকার বহন করেন। এইরূপ কত দিকে কত অর্থ অনর্থক ব্যয় হইতেছে, যক্ষ্মাসঙ্কুল টিমারপুরে এ যাবৎ অস্থায়ীভাবে রাজকার্য্য সকলই চলিতেছে, তথাপি রাইসিনাতে নূতন সহরের পত্তন করিয়া রাজাজ্ঞা পালন করিতেই হইবে; কলিকাতার প্রতি কুদৃষ্টি ভিন্ন ইহার আর অন্য কি কারণ নির্দ্দেশ করিব?

অপরিহার্য্য সরকারি অট্টালিকা নির্ম্মাণেই এই বিলম্ব, ইহার পরে সহরের শোভাবর্দ্ধক ও সাহেবগণের আনন্দদায়ক দীর্ঘিকা, বীথিকা, বিলাসকানন, প্রমোদভবন প্রভৃতি নয়নরঞ্জন কত কি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার সমকক্ষ বা ততোধিক সুন্দর করিয়া তুলিতে আরও কতকাল লাগিবে, ও কত অর্থ ব্যয় হইবে, কে বলিতে পার? এক বিষয়ে এখনই কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লক্ষিত হইল; বাসবাটীগুলি এক একটি চকে squareএ বিভক্ত করা হইয়াছে—এরূপ চক বা square বিস্তর ও তাহার প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম,—যথা, Havelock Square, Dalhousie Square, Wilson Square ইত্যাদি। এই সমস্ত নূতন কাণ্ড দেখিয়া আমরা কেবল পুরাতনের মোহে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

রাজপুতানার রমণীয়তা উপভোগ করাই এ যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, পঞ্চনদে আসিয়া উহার দুই একটা প্রাচীন কীর্ত্তিস্থল এই সূত্রে দেখিয়া লইবার সুযোগ ছাড়া কর্ত্তব্য বোধ হইল না। তাই বর্ত্তমান দীল্লির ব্যবস্থায় দারুণ দুঃখ অনুভব করিয়াও অতীতের দুঃখকাহিনীজড়িত আর এক শ্মশান ক্ষেত্রে অচিরে যাত্রা করা গেল। রেল পথের উভয় পার্শ্বে পলায়নপর মৃগকুলের ক্ষিপ্র পাদক্ষেপ, রবিকরসম্পাতে সমুজ্জ্বল কলাপ বিস্তার পূর্ব্বক অবাধবিচরণশীল ময়ূরের মন্থর নৃত্য, প্রকাণ্ড মহীরুহের মস্তকাসীন বনজ বিহঙ্গের মধুর কূজন, প্রভৃতি নৈসর্গিক কাণ্ড নিরানন্দ অন্তরেও ক্ষণিক আনন্দের সঞ্চার করিল, নীরস হৃদয়ও ক্ষণকাল সরস করিয়া ঐশী মহিমায় তন্ময় করিয়া তুলিল। যাহা হউক, এই সকল কাণ্ডের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া গাড়ি সমান বেগে দৌড়িতে লাগিল ও যথাসময়ে আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে পঁহুছাইয়া দিল। আমরা থানেশ্বর বা কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনের কাষ্ঠফলকে নাম দেখিয়া, যাত্রীগণের সতর্কতা উদ্দীপক ষ্টেশন খালাসীর চীৎকার শুনিয়া, আর আমরা কোন্ অতীত স্মৃতির কুহকে কোথা যাইতে অগ্রসর হইয়াছি চিন্তা করিয়া, একবার মনে উদয় হইল একি সেই "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র", যেখানে যুদ্ধার্থী সমবেত কৌরবপক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষ কি করিল জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে কাতর প্রশ্ন করিয়াছিলেন? এ কি সেই স্থান যাহার মহিমা বুঝাইবার জন্য নির্ব্বাসিত যক্ষ জলধরকে বলিয়াছিলেন—

"রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি?"—

যেখানে দাঁড়াইয়া শ্রীভগবান্ ভক্তের সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য যোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন? একি সেই পুণ্যসলিলা সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত ব্রহ্মাবর্ত্ত, যেখানে আর্য্যগণ সমাগত হইয়া সুমধুর সামগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভারতভূমে হিন্দুত্বের বিজয় নিশান উড়াইয়াছিলেন? একি সেই প্রাচীন থানেশ্বর, যেখানে মহম্মদ ঘোরির নির্ম্মম হস্তে প্রবলপ্রতাপ পৃথীরাজ নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোণার ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতারবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল?

রাজপথে গমনকালে অতীতের এই সমস্ত ঘটনার কোন চিহ্নই চক্ষে পড়িল না কেবল এক প্রনষ্টগৌরব প্রাচীন সহরের নাতিপরিচ্ছন্ন ভাব নয়নগোচর হইল। যাহা হউক আমরা অনতিবিলম্বে পাণ্ডা রামনিরঞ্জন পণ্ডিতের স্থলাভিষিক্তগণের সাহচর্য্যে এক দীর্ঘিকার কূলে নীত হইলাম শুনিলাম, ইহাই দ্বৈপায়ন হ্রদ। রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরস্থিত, সহরের প্রান্তবর্ত্তী, অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী এই হ্রদের পশ্চিমকূলবর্ত্তী অনেক স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান; এই সকল স্থানের নিভৃত গাম্ভীর্য্য দর্শকের মনে অনির্ব্বচনীয় আতঙ্ক উদ্দীপন করে। অপর তিন কূলে অনেক স্নানের ঘাট এবং ঘাটের সমীপবর্ত্তী অনেক মন্দির প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে; তন্মধ্যে তীরের সহিত সেতুবন্ধে সংলগ্ন হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এক মন্দির স্থাপত্য কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয়, এবং পাণ্ডাগণের নির্দ্দেশমত তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বরেণ্য। অধিকাংশ মন্দিরেই লক্ষ্মীনারায়ণের বা অন্য দেবদেবীর মূর্ত্তি,—কেবল একস্থানে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি দেখিলাম, তবে তাহা মৃণ্ময়, নিতান্ত আধুনিক—দেখিয়া 'হাসি-কান্না' ভিন্ন শ্রদ্ধা-ভক্তির উদ্রেক হইল না। যাত্রীর সংখ্যা বড় বেশী দেখিলাম না; তবে শুনিলাম, রেলপথ খোলার পরে, একবার সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষে না-কি, সাত-আট লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। যাহা হউক, দ্বৈপায়নকূলে পিতৃপিতামহাদির উদ্দেশে যথারীতি শ্রাদ্ধতর্পণাদি শেষ করিয়া আমরা সেস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

অতঃপর আরও একটু অগ্রসর হইয়া, অম্বালা ছাড়িয়া, সুবর্ণমন্দির-দর্শনলালসায় অমৃত সহরে যাওয়া গেল। তখন গান্ধীর গন্ধে কেহ উন্মত্ত হয় নাই,—ডায়ারের ডঙ্কা কোথাও বাজে নাই,—জালিয়ানোয়ালাবাগের যন্ত্রণা কাহাকেও সহিতে হয় নাই। অমৃতস'র প্রকৃতই অমৃত সহর, আনন্দের উৎস, দরবার সাহেবের * অপূর্ব্ব স্বর্গনিকেতন। আমরা নির্ভয়ে নিরুপদ্রবে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সহরে আধুনিক প্রথামত সরকারি বিদ্যালয়, Town Hall, কুসুমোদ্যান, দণ্ডক সরোবর প্রভৃতি দর্শনযোগ্য বিস্তর স্থান আছে। হাট বাজারও অল্প নহে, পণ্য দ্রব্যও অগণ্য, তন্মধ্যে সুদূর প্যারিস প্রদর্শনীতেও সুবর্ণপদক-প্রাপ্ত শাল ও গালিচাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগন্তুকের বাসোপযোগী সরাই, ধর্ম্মশালা, প্রভৃতি স্থানেরও অসদ্ভাব

* মন্দিরাভ্যন্তরস্থ আরাধ্য বস্তুর নাম 'গ্রন্থ সাহেব' আর মন্দিরের নাম 'দরবার সাহেব'।

নাই। কিন্তু এ সকল দেখিবার জন্য কেহ অমৃতস'রে আসে না; এখানে দেখিবার সার বস্তু—সুবর্ণমন্দির। শিখতীর্থের এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইলেও, অমল ধবল মর্ম্মরের গ্রন্থন কৌশলে ও সংস্কারগুণে এখন পর্য্যন্ত উহা যেন সদ্যোরচিত বলিয়া বোধ হয়। সুদীর্ঘ সরোবরের চতুঃপ্রান্ত মর্ম্মরে মণ্ডিত,—তাহারই মধ্যস্থলে এই মনোহর মন্দির মর্ম্মরে গ্রথিত এবং মর্ম্মররচিত সেতুবন্ধে তীরের সহিত সংলগ্ন। মন্দিরের চূড়া ও সমগ্র শীর্ষ-ভাগ সোণার চাদরে আচ্ছাদিত, ও এইজন্যই উহা সুবর্ণমন্দির বলিয়া বিখ্যাত। মন্দির মধ্যে কোন দেবপ্রতিমা নাই—আছেন কেবল সযত্নরক্ষিত শিখের ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থ সাহেব"; উহারই উদ্দেশে শত শত যাত্রী কর্ত্তৃক পুষ্প-অর্ঘ্য অর্পিত হয়, আর তদ্বিনিময়ে পাণ্ডাপ্রদত্ত অমূল্য "কড়াপ্রসাদ" পাওয়া যায়।

এই 'প্রসাদ,' নামে 'কড়া' হইলেও, প্রকৃত পক্ষে অতি কোমল, অতি মধুর, অতি সুরস। বস্তুতঃ উহা বাজারের হালুয়াপক্ক 'হালুয়া-সোহন' মাত্র। এই প্রসাদের প্রয়োজনাধিক্যে এখানকার বাজারে, বিশেষতঃ মন্দিরের সমীপবর্ত্তী দোকান সকলে, অন্য মিষ্টান্ন অপেক্ষা হালুয়াই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ও তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই রুচিপ্রদ হালুয়ার-এই মহাপ্রসাদ "কড়া প্রসাদের"—মাহাত্ম্য, সাধারণ ক্রেতা বা যাত্রী দূরে থাকুক, স্বয়ং 'গ্রন্থ'রক্ষক প্রসাদ-বিতরক পাণ্ডাগণও সকলে অবগত নহেন। সহানুভূতির বন্ধনশূন্য পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন,—সুতরাং হৃদয়হীন শক্তিহীন পঞ্চনদবাসীর মধ্যে যোগশক্তি-সঞ্চারের জন্য মহাত্মা নানক এই পরম পবিত্র, শক্তি-সঞ্চারক, স্বর্গীয় সুধা আপামর সকলকে বিতরণ করেন,—বিয়োগধর্ম্মী বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সংযোগধর্ম্ম সাম্যের প্রতিষ্ঠা সাধন করেন,—হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণশূদ্র নির্ব্বিশেষে, হাড়িচণ্ডাল নির্ব্বিশেষে, এই অতুল শক্তির আধার "কড়াপ্রসাদ" বিতরণ করিয়া সকলকে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে যে শিখজাতির শিখশক্তির, শিখধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু হায়! এখন আর সে সংযোগধর্ম্ম কোথা? সে অতুল প্রেমবন্ধন কোথা? সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ-প্রবর্ত্তিত শক্তির আধার কোথা?—এখন নাম মাত্র "কড়াপ্রসাদ" ভ্রান্ত ধর্ম্মীর, ভ্রান্ত কর্ম্মীর, রসনা তৃপ্ত করিতেছে মাত্র! আমরাও সেইরূপ রসনাতৃপ্তির সঙ্গে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমৃতসহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

এইবারে, আবার উজনপথে দিল্লী হইয়া, সত্যসত্যই আমরা রাজপুতানাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং রাত্রিশেষে প্রথম উদ্দিষ্ট স্থান জয়পুরে পঁহুছিলাম। অপরিচিত স্থানে অসময়ে কোথা আশ্রয় পাইব, ভাবিয়া আশঙ্কা জন্মিয়াছিল; কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অতি সহজেই সে আশঙ্কা দূর করিলেন—ষ্টেশনের সন্নিকটেই সুন্দর পান্থশালায় আমরা নির্ব্বিঘ্নে স্থান পাইলাম ও নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করিলাম।

প্রাচীন অম্বরের নূতন রাজধানী জয়পুর, নব-দিল্লীর নূতন সংস্করণের বহু পূর্ব্বেই, বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল। দৈর্ঘ্যে এক ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী এই সহরের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে গুম্বজে অলঙ্কৃত ও সুদৃঢ় তোরণে

সংরক্ষিত। অশীতি হস্ত বিস্তৃত ক্রোশব্যাপী রাজপথ সহর ভেদ করিয়া উহার দীর্ঘতার পরিচয় দিতেছে এবং মাঝে মাঝে প্রায় তদ্রূপ প্রশস্ত অন্যান্য পথ ঐ প্রধান পথ ভেদ করিয়া গিয়াছে ও তাহার প্রত্যেকের সন্ধিস্থলে এক একটি বাজারের চক সুশৃঙ্খল ভাবে রচিত হইয়া রচয়িতার নিপুণতার সাক্ষ্যদান করিতেছে। নব-দিল্লীর পূর্ব্বকথিত নূতন চক অপেক্ষা রচনাকৌশলে ইহা বিশেষ হীন নহে।

নগরের মধ্যভাগে রাজপ্রাসাদ ও তৎ-সংলগ্ন পুষ্পবাটিকা ততোধিক রচনাপারিপাট্যে সহরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে এবং প্রাসাদের সপ্ততলবিশিষ্ট গগনস্পর্শী সম্মুখভাগ ও রাজ-পথের সমীপবর্ত্তী শিলামণ্ডিত সমুন্নত প্রাসাদ-শৃঙ্গ রাজোচিত উচ্চতার নিদর্শন জ্ঞাপন করিতেছে; পরন্তু প্রাসাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী দিল্লীর অনুরূপ দেওয়ানি-খাস, দেওয়ানি-আম সুখনিবাস, প্রভৃতি অট্টালিকা মহারাজার অতুল সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুদৃঢ় প্রাকারবেষ্টিত পুষ্পবাটিকা তাল-তমাল প্রভৃতি তরুরাজিতে,—দেশী-বিদেশী নানা অপরূপ লতাগুল্মে,—কৃত্রিম প্রস্রবণ, নিভৃত নিকেতন, প্রভৃতি বিলাসোপকরণে, সুসজ্জিত হইয়া মর্ত্তধামে অমরভোগ্য নন্দনের সুষমা বিস্তার করিতেছে। ইহারই একপার্শ্বে গোবিন্দজীর মন্দির বর্ত্তমান। মন্দির এরূপ সুকৌশলে রচিত যে, দূরবর্ত্তী আপন প্রাসাদ-কক্ষ হইতে মহারাজা অনায়াসে উহার মধ্যস্থিত দেববিগ্রহের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন। আমরা এই মন্দির ও তন্মধ্যস্থিত যুগলমূর্ত্তির সান্ধ্য আরাত্রিক সন্দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। এই মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়াই, না-কি, মহারাজা সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন,—ইহাই, না-কি, গোবিন্দজীর মূল মূর্ত্তি—বৃন্দাবনে ইহার প্রতিকৃতি মাত্র। মন্দিরে অবস্থানকালে একবিষয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলাম,—বিগ্রহের পূজক পুরোহিত হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দ পর্য্যন্ত সকলেই বঙ্গবাসী; বাস্তবিক, তখন—বারাণসীতে বা বৃন্দাবনে, বাঙ্গালার দেবমন্দির বা মাড়বাড়ের মঠে—কোথায় দেব-দর্শন করিতেছি, বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। জয়পুরাধিপতির রাজসভা হইতে দেবমন্দির পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতি কর্ত্তৃত্ব-ভারার্পণ দর্শনে মন সহজেই পুলকিত হয় ও কৃতজ্ঞতার আকর্ষণে তাঁহার চরণে মস্তক স্বতঃই অবনত হয়।

প্রাসাদসংলগ্ন এই উদ্যান অপেক্ষা জন-সাধারণের উপভোগ্য জয়পুরের প্রধান রাজোদ্যান অনেকাংশে উৎকৃষ্ট,—এমন কি, উহা সমগ্র ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বতন স্বর্গীয় মহারাজা কর্ত্তৃক প্রায় চারি লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উদ্যান রচিত হইয়া-ছিল। ইহারই মধ্যে য়্যালবার্ট হল, মেয়ো হাঁসপাতাল, চিত্রশালা (museum), প্রভৃতি লোকহিতকর অনুষ্ঠান বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন রামনিবাস উদ্যান, রাজ কলেজ, শিল্পবিদ্যালয়, মুদ্রারচনশালা (mint), "হাওয়া মহল," প্রভৃতি আরও অনেক নয়নরঞ্জন ও চিত্তাকর্ষক কাণ্ডে জয়পুরের রাজধানী অলঙ্কৃত। আমরা একে একে যথাসম্ভব সকল স্থান দর্শন করিয়া চক্ষু চরিতার্থ করিলাম; কেবল দেখা হইল না—রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বর। সময়াভাবে, অবশ্যগ্রহণীয় Political Agent সাহেবের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিতে না পারায়, আমাদিগের সে সাধ মিটিল না। আমরা তাহার ক্ষোভ মিটাইলাম—গালব

মুনির আশ্রম গল্‌তা পাহাড় দর্শনে। গালব মুনির আশ্রমের কোন নিদর্শন নয়নগোচর না হইলেও, গল্‌তা-গিরিসঙ্কটসংলগ্ন তদীয় স্মৃতি-সূচক অনেক মন্দিরে অধুনাতন সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম দেখিলাম, আর উহার অনন্য সুলভ নৈসর্গিক শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ,—প্রদোষের ছায়া প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, এমন সময়ে —এই দিবা-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে —সঙ্কটের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে, অতীত স্মৃতির মোহে —ইহা যে মেবার নহে, জয়পুরের জন-বিরল গিরিপথ, একথা বিস্মৃত হইয়া—উদাস প্রাণে, আকুল তানে, গান ধরিলাম—

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল
যেথা প্রতাপ বীর"—

সঙ্গিনী শিশু নাতিনিটী নাচিতে নাচিতে চলিতেছিল,—মিনার্ভা রঙ্গালয়ের কৃপায় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের এই মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত তাহার শুনা ছিল,—সেও শিশুকণ্ঠে তারস্বরে যোগ দিল—

"মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার
রক্তনিশান উড়ে না আর।"

তখন মোহ কাটিল, দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া, অদূরস্থিত অশ্বযানে আরোহণ পূর্ব্বক সকলে ষ্টেশনসমীপস্থ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর গৃহিণীবাঞ্ছিত 'সাবিত্রী'দর্শন-উদ্দেশে অজমীর যাত্রা করা গেল। অজমীর অতি প্রাচীন সহর;—এরূপ কিংবদন্তী আছে যে উহা রঘুবংশীয় মহাত্মা অজরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেরূপ প্রাচীনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আধুনিক গৌরবেও উহা অন্যান্য সহর অপেক্ষা হীন নহে। সুরম্য পাহাড়-বেষ্টিত উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় উহা স্বভাবতই বড় সুন্দর, অধিকন্তু সহরের পশ্চিম-ভাগে অন্নসাগর নামক কৃত্রিম হ্রদ সংলগ্ন হওয়ায় উহাকে আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বতন রাজপুতনা-মালব রেলপথের ইহাই প্রধান কার্য্যস্থল ছিল; অধুনা বম্বে-বরদা লাইনের বিরাট ব্যাপারের সহিত বন্ধনযুক্ত হইলেও, ঐ অপ্রশস্ত রেলপথের এঞ্জিন, গাড়ি ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জামের কল-কারখানা সমস্তই এখানে বিদ্যমান। বস্তুতঃ, বড় লাইনের পক্ষে যেমন সমগ্র ভারতবর্ষে জামালপুর ও লিলুয়ার কারখানার সমকক্ষ অন্যত্র নাই বলিলেই হয়, ছোট লাইনের উপযোগী কারখানার মধ্যে এই অজমীরের কারখানাই সেইরূপ আদি এক সময়ে অদ্বিতীয় ছিল। রাজপুত নৃপনন্দনগণের বিদ্যানুশীলনের নিমিত্ত মেয়ো কলেজ এইখানেই প্রতিষ্ঠিত। তদ্ভিন্ন খ্বাজা সাহেবের সমাধি, অধয়-দীন-কী-ঝোপ্‌ড়ি, তারাগড়ের মস্‌জিদ্, প্রভৃতি মুসলমান স্থাপত্যের ও ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের নিদর্শন-সূচক বহুস্থান দর্শনযোগ্য।

আমরা কিন্তু সে সকল দেখিবার জন্য সময়ক্ষেপ না করিয়া, টোঙ্গাযোগে পুষ্করাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। পার্ব্বত্যপথে গমনাগমন পক্ষে টোঙ্গাই প্রকৃষ্ট যান;—সিমলা, শিলং, নৈনিতাল, প্রভৃতি সমস্ত শৈলাবাসেই পূর্ব্বে টোঙ্গায় যাইতে হইত, এখন কোথাও রেল-গাড়ি, কোথাও মোটর গাড়ি তাহার কার্য্য অধিকার করিয়াছে। অজমীর হইতে পুষ্করের পথও প্রথম কতকটা সমতল, পরে সিকতাময় পর্ব্বতের উপর দিয়া গিয়াছে। পথে ও গ্রামের মধ্যে এত বালুকা যে তাহা ভেদ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ বালুকাময় পর্ব্বতবেষ্টিত অপ্রশস্ত উপত্যকার মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। পুষ্কর নামক পরম পবিত্র হ্রদের

জন্যই এই স্থান সুপরিচিত। অজমীরের প্রায় চারি ক্রোশ নৈর্ঋতে এই পুষ্কর গ্রাম ও হ্রদ বিদ্যমান। কুরুক্ষেত্রের দ্বৈপায়ন হ্রদ অপেক্ষা আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, পবিত্রতা সম্বন্ধে উহা ভারতে অদ্বিতীয়। কার্ত্তিকী মেলায় প্রতি বৎসর এখানে প্রায় লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, এবং শোণপুরের মেলার ন্যায় হয়-হস্তী পর্য্যন্ত বিক্রয়ার্থ আনীত হয়; বস্তুতঃ সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে এরূপ মেলা অন্যত্র কোথাও হয় না। হ্রদের প্রায় চতুঃপার্শ্বে দেবমন্দির ও স্বর্গীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণের স্মৃতিমন্দির। পুষ্কর হ্রদের অপর নাম ব্রহ্মকুণ্ড। কথিত আছে,—ব্রহ্মা যজ্ঞসাধনসঙ্কল্পে এই স্থানে অবস্থিতি করেন এবং যজ্ঞবিঘ্নকারী অসুরগণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার্থ চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বত-শৃঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করেন। সস্ত্রীক যজ্ঞসাধন করা বিধেয়, কিন্তু ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী দেবী যথাকালে উপস্থিত হইতে না পারায়, ব্রহ্মা এক অপ্সরাকে পত্নীর স্থলাভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। কিয়ৎকাল পরে সরস্বতী সমাগতা হইয়া এই বিসদৃশ কাণ্ড দর্শনে রোষে ও অভিমানে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে অন্তর্হিতা হইয়া প্রস্রবণে পরিণতা হয়েন! পরে কোন ব্যাধিক্লিষ্ট রাজা মৃগয়ায় আসিয়া এই প্রস্রবণের পবিত্র জলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করায়, সেই কষ্টদায়ক ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ঐস্থানে হ্রদ খনন করেন। এই সূত্রেই এই হ্রদ ব্রহ্মকুণ্ড নামে পরিচিত।

হ্রদের নিকটবর্ত্তী মন্দির সকলের মধ্যেও ব্রহ্মার মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিন্ধিয়ার রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ মর্ম্মরনির্ম্মিত দুই হস্তী ও অন্যান্য মূর্ত্তি গঠনশিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

দ্বৈপায়নের ন্যায় ব্রহ্মকুণ্ডেও শ্রাদ্ধতর্পণাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তদুদ্দেশ্যেই এত যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। আমরাও পাণ্ডা মদনলাল রামচন্দ্রের সহায়তায় যথারীতি সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। পাণ্ডা-ঠাকুরের উৎপীড়ন দেখিলাম না, বরং তাঁহার সাদর যত্নে আপ্যায়িত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

এখানকার ক্রিয়া শেষ করার পর গৃহিণীর সাধের সাবিত্রীদর্শনপর্ব্ব উপস্থিত, হইল। এ পর্ব্বে আমার কর্ত্তব্য কিছুই ছিল না; সুতরাং তাহাতে অন্তরায়ও হইলাম না, অন্তরঙ্গতাও করিলাম না। তিনি প্রত্যূষে ভৃত্যসমভিব্যাহারে বংশনির্ম্মিত বিচিত্র শিবিকাযোগে সাবিত্রীমন্দিরে যাত্রা করিলেন, শিশু নাতিনীটীও এক কুলির পৃষ্ঠে তাঁহার সঙ্গ লইল,—আমি বাসায় বসিয়া সেই অবকাশে একটু বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া লইলাম। সাবিত্রীর মন্দির পুষ্করের অদূরবর্ত্তী এক নাতি-উচ্চ শৈলের উপরিভাগে অবস্থিত। মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তির মস্তকে সিন্দুর বিলেপন ও শাঁখা-সাড়ী প্রভৃতি সোপকরণ পূজার সামগ্রী অর্পণ করা ভিন্ন সেখানে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নাই;—এই কর্ত্তব্য-কৃত্য সমাপন করিয়া বেলা দশটার মধ্যেই সকলে প্রত্যাগত হইলেন। উপকরণাদি পূর্ব্বেই সংগৃহীত ছিল —এক্ষেত্রে ব্যয়ের মধ্যে সাবিত্রীর নির্দ্দিষ্ট দর্শনী পাঁচ সিকা ও যাতায়াতের ডুলিভাড়া আর পাঁচ সিকা মাত্র; শিশুটীর বাহককেও অবশ্য অতিরিক্ত কিছু দিতে হইয়াছিল।

উদ্দিষ্ট কার্য্য একরূপ সমাপ্ত হইল,—এখন স্বদেশে ফিরিলেই চলিত। কিন্তু আশার

অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ অবকাশের অনুমতি পাওয়ায়, এই পথের অদৃষ্টপূর্ব্ব আর এক পুণ্যক্ষেত্র এই সূত্রে দেখিয়া লইবার আশায় আরও একটু অগ্রসর হওয়া গেল। আমরা পুষ্কর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পরদিন প্রাতে 'আবু রোড' ষ্টেশনে পঁহুছিলাম, এবং সেখান হইতে টোঙ্গাযোগে আবু পাহাড়ে উঠিলাম। শিলং ও সিমলা যাত্রা উপলক্ষে পার্ব্বত্য পথের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, অতএব এপথে নূতনত্ব কিছুই লক্ষিত হইল না, বরং প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাদৃশ্যবশতঃ অনেকস্থল যেন পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল। পথও অল্প—ষ্টেশন হইতে ৮।৯ ক্রোশ মাত্র; পাহাড়ের উচ্চতাও অপেক্ষাকৃত অল্প—৪৫০০ ফীট মাত্র; তবে, দার্জ্জিলিঙ্, নৈনিতাল, সিমলা প্রভৃতির ন্যায়, ইহা স্বাস্থ্যনিবাসও বটে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিদাঘনিকেতনও বটে। যাহা হউক, মধ্যাহ্নের বহু পূর্ব্বেই আমরা যথাস্থানে নীত হইলাম; তখন কিন্তু এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইল—আশ্রয়স্থানের অসদ্ভাব। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনা ছিল, অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এখানেও Brooke's Serai নামে এক পান্থশালা আছে, এবং তাহারই ভরসায় শিশুসঙ্গে সস্ত্রীক এই অপরিচিত স্থানে আসিতে সাহস করিয়াছিলাম। টোঙ্গা হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম, অতি নিকটেই সরাই আছে সত্য বটে, কিন্তু লোকসমাগমের অসদ্ভাব বশতঃ তাহা সংস্কারবর্জ্জিত—সুতরাং ভদ্র-পরিবারের বাসের একান্ত অনুপযোগী। যাহা হউক, করুণাময়ের কৃপায়, সমস্যার সমাধানে বড় বিলম্ব ঘটিল না। টোঙ্গা আপিসে সন্ধান লওয়ায় তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষগণের আতিথেয়তাগুণে তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামভবনে বাসের অনুমতি পাইলাম ও পূর্ব্বোক্ত ব্রুক্-সরা'য়ের এক কক্ষে পাকাদি নিষ্পন্ন করিয়া, স্বচ্ছন্দভাবে দুই দিন সেখানে অতিবাহিত করিলাম। তখন স্বতই মর্ম্ম ফাটিয়া মুখ ফুটিল—

"সবাই ছেড়েছে, নাহি যা'র কেহ,
তুমি আছ তা'র, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন—পথ যা'র গেহ—
সেও আছে তব ভবনে।"

অপরাহ্নে অনায়াসলভ্য, পরন্তু অনন্যসুলভ, টোঙ্গা-যানে সকলে মিলিয়া সহর প্রদক্ষিণ করা গেল, এবং যে মহাতীর্থের আকর্ষণে এই সুদূর শৈলপথে আসা গিয়াছে, সেই তীর্থ-সন্দর্শনলাভে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ইহা ভারতের অন্যতম জৈনতীর্থ,—এ হিসাবে অন্যধর্ম্মীর পক্ষে এ তীর্থ, হয় ত, পরম শ্রদ্ধার স্থল না হইতে পারে; কিন্তু যে হিসাবে আগ্রার তাজ, দিল্লীর মস্‌জিদ্, মাদুরার হিন্দু মন্দির, অমৃতসরের শিখ মন্দির বা গয়ার বৌদ্ধমন্দির ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল যাত্রীর সমভাবে নমস্য, আবুর এই তীর্থে জৈন মন্দিরের সমক্ষেও সেই হিসাবে সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই মস্তক অবনত করিতে হয়। এই তীর্থস্থানের নাম দিলোয়ারা বা দেবলবারা। শুনা যায়, প্রথমতঃ এখানে হিন্দুর শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির ছিল, পরে বনূল সাহ নামক পত্তনের কোন ধনবান জৈন বণিক ঐস্থানের স্বত্বাধিকারীকে সমগ্র ভূখণ্ড-আচ্ছাদনোপযোগী রজতমুদ্রা মূল্য-স্বরূপ দান করিয়া উহা হস্তগত করেন, এবং তদুপরি আপন ধর্ম্মের অনুকূল মন্দির-স্থাপন করেন। মন্দির সংখ্যায় পাঁচটি, তন্মধ্যে তিনটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও আকার প্রকারেও হীন। অপর দুইটীই প্রাচীন ও মনোহর, কিন্তু একই সময়ে একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত কি না, বলা দুরূহ। একটির গাত্রস্থিত শিলালিপি পাঠে বোধ হয়, উহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্থাপিত এবং তীর্থঙ্কর নেমিনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। অপরটির রচনাকাল নির্দ্ধারণের উপায় নাই; কিন্তু উহাই যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও বণিক-পুঙ্গব বনূল সাহের অর্থে রচিত, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী আয়োজনে, অষ্টাদশ ক্রোর মুদ্রা ব্যয়ে, প্রথম ও প্রধান তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের উদ্দেশে, রচিত এই ত্রিতল মন্দির দর্শনে মন মোহিত হইয়া যায়। স্থাপত্য গৌরবে তাজমহল ভারতের অদ্বিতীয় অট্টালিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু বস্তুতঃ, তাজ শ্রেষ্ঠ, কি এই দিলোয়ারার মন্দির শ্রেষ্ঠ, বিচার করা আমাদিগের ন্যায় মুগ্ধ ও অনভিজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব। তবে তাজ ভিন্ন অপর কোন অট্টালিকাই যে ইহার সমকক্ষ নহে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।*

আমরা এই অপূর্ব্ব মন্দিরের স্মৃতি বহন করিয়া ও রাজপুতানার পথে আশাতীত আনন্দ উপভোগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

* Beyond controversy this (the Dilwara) is the most superb of all the temples in India, and there is not an edifice, besides the Taj Mahal, that can approach it," —Col. Todd.

আত্মীয়ের পরিচয়।

(১)

এ কি ভ্রান্তি? না কি ব্যাধি? বুঝিবার নয়!
যারা চিরদিন ধরি'
দলিছে অবজ্ঞা করি'
পাছে রুষ্ট হয় বলে সদা যারে ভয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(২)

স্বার্থ ভিন্ন মোর সনে কথা নাহি কয়,
কাছেতে মধুর বুলি,
পিছে ফিরে দেয় গালি,
কথা কয়ে মধু ঢালে প্রাণে বিষময়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৩)

ঘৃণা তুচ্ছ হেলাভরে স্পর্শে না আলয়,
মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ
যারা করে প্রতি দান,
অর্থ পেলে মোর প্রতি যে রহে সদয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৪)

আমার গৌরব ভেঙ্গে যার সুখোদয়,
পেষিয়া দলিয়া পায়
চির শান্তি যারা পায়,
প্রতি কাজে প্রতি পদে যে করে সংশয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৫)

কলঙ্ক পশরা দেয় স্নেহ বিনিময়,
বুকের পাঁজরগুলি
সঙ্গোপনে দিয়ে খুলি'
অত্যাচার উৎপীড়নে ভেঙ্গে সমুদয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৬)

সন্ধানি' আমার দোষ করে দেশময়,
আমার দীনতা হেরে
হৃদয়ে আনন্দ ক্ষরে,
হিংসা-দ্বেষ পরিপূর্ণ যাহার হৃদয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৭)

আমার বিপদকালে হর্ষিত-হৃদয়,
হাতে দেখে ভিক্ষা ঝুলি
যারা দেয় করতালি,
তিল টুকু দোষ পেলে তালসম কয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৮)

যার সনে ন্যায়-বাক্যে প্রাণে পাই ভয়,
সকলের কাছে মোরে
যারা রাখে হেয় করে,
উন্নতি দেখিলে মোর আঁখি অন্ধ হয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।

কেশবচন্দ্র।

কলিকাতা হইতে দূরে থাকিতাম। পরমপূজনীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। অগ্রজের নিকট শুনিয়াছিলাম, ভগবদ্ভক্ত কেশবচন্দ্র মধুরকণ্ঠে অমৃত বর্ষণ করেন, তাঁহার দিব্য সৌম্য উজ্জ্বল মুখশ্রীতে ধর্ম্ম জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠে। যে তাঁহাকে দেখে, যে তাঁহার কথা শুনে, সেই মজে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বড় আশা করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম; যদি সুযোগ হয়, সাধু কেশবচন্দ্রের পদধূলি মাথায় দিয়া কৃতার্থ হইব; অন্ততঃ দূরে দাঁড়াইয়া সাধু দর্শন করিব। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না; পথেই শুনিলাম মহাপুরুষ দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। স্বর্গগত কেশবচন্দ্রের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভক্তিভরে যোগ দিয়াছিলাম। কমলকুটীরে দেবালয়ের প্রাঙ্গনে তাঁহার পূত চিতাভস্ম হস্তে লইয়া তাঁহার পুত্র অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া কাতর করুণ কণ্ঠে ভক্তিগদ্গদ-স্বরে নিষ্ঠার সহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন,—সে দৃশ্য ও অনুষ্ঠান হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়া আছে।

তারপর মধ্যে মধ্যে সাধক-প্রবর কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের উপাসনায় গিয়া শোকার্ত্ত উপাসকমণ্ডলীর সহিত বসিতাম। ধূপধূনা-পুষ্প-চন্দন-গন্ধামোদিত মন্দিরে পবিত্রতার বাতাস প্রবাহিত হইত। পূজার শেষে "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" ধ্বনি গম্ভীর মধুর পবিত্র শঙ্খধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়ে বাজিয়া উঠিত।

সাধু মহাজনদিগের জন্মমৃত্যু স্মরণার্থ দিনে তাঁহাদের তপস্যার ফল আমরা কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছি কিনা তাহাই ভাবিয়া দেখা উচিত। মহাত্মা কেশবচন্দ্র কি কি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার, একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার সংখ্যাধিক্য দেখাইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সভাসমিতির বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে যেমন ৫২টি অধিবেশনের ৫২টি কর্ম্ম-তালিকা থাকে, অনেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি-

গণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যও তেমনি তাঁহাদের সমস্ত জীবনের কার্য্যের একটি লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করেন, যথা—অমুক বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ১৩টি, বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ১৭টি, জাতিভেদের বিপক্ষে ১৯টি এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে ২৩টি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তির এরূপ বাহাদুরী দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, সাধুতা ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব প্রমাণের জন্য কেহ কেহ বলেন তাঁহার হস্তাক্ষর বড় সুন্দর ছিল, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম-কুশল ছিলেন, এমন কি সূত্রধরের কার্য্যও জানিতেন এবং ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকল বাঙ্গালীকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব কর্ম্মবহুলতায় নহে, সর্ব্বকর্ম্ম-নিপুণতায় নহে, বাগ্মীতায় নহে;—তাঁহার মহত্ত্ব ছিল—বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমে। ভগবান তাঁহার লীলা প্রদর্শনের জন্য মহাপুরুষগণকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসেন তাঁহারা ধর্ম্মের আদর্শ ও সাধন সঙ্কেত পাইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন। আমরাও পরলোকগত মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারি। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কত কত সাধু জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা যদি মনে করি আমরা সকলেই সমান,—পুরুষকার দ্বারা আমরা যে কেহ বুদ্ধদেব, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ হইয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে মহাপুরুষ জগতে সুলভ হইয়া উঠিত। স্বীকার করি, সাধু সাজা সহজ। অভিনয়ের সময়, আমাদেরই মত একজন লোক সাজ-ঘরে ঢুকিয়া, চট্ করিয়া, বুদ্ধদেব সাজিয়া আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া হারমোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলাইয়া, চোখ উল্টাইয়া "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই" বলিয়া যখন গান ধরিয়া দেয়, তখন কি আমরা তাহাকে দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া সম্মান করি? পুরুষকার দ্বারা ধন, মান, যশ লাভ করিতে পারি, কিন্তু রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র হইতে পারি না। সাধুপুরুষের আবির্ভাব "মানব দুয়ারে দেবতা ভিখারী" বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। এ ভিখারীকে ফিরাইলে অকল্যাণ হয়, ভক্তের অপমানে ভক্তিবিহীন হইয়া সংসার-মরুতে ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিতে হয়। ভক্ত ভক্তকে চিনেন। পরমহংসদেব লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কেশবকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। যাত্রা দলের অধিকারী, ভক্ত বৈষ্ণব নীলকণ্ঠ, কেশবকে দেখিয়া মজিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর বহুকাল পরে, কোনও স্থানে তাঁহার এক পুত্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, নীলকণ্ঠ বলিয়াছিলেন "যাই যাই, ভক্ত কেশবচন্দ্রের রক্ত যাঁর মধ্যে আছে তাঁকে দর্শন ক'রে আসি।" কেশবচন্দ্রের কন্যাগণ মন্দিরে বসিয়া যখন ভক্তিভাবে মধুরকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের পবিত্র মুখশ্রী দেখিয়া ও অমৃতময় বাণী শুনিয়া মনে হইয়াছে, তাঁহাদের পিতৃদেবের অমর আত্মা তাঁহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা, সাধু মহাজনগণের জীবনকাহিনী আলোচনা করি বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ ভাল করিয়া স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের ভয় হয়, মানুষকে অধিক ভক্তি করিলে বুঝি বা ঈশ্বর বিরক্ত

হইবেন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন কর্ম্মচারীকে সম্মান করিলে আফিসের বড় সাহেব চটিয়া যান। ঈশ্বরকেও কি আমরা সেই চক্ষে দেখিব? খৃষ্টীয় প্রভাবে আমরা অনেক কথাই বলিতে শিখিয়াছি। আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের বালকবালিকার মুখেও শুনিতে পাই, রথযাত্রার সময়, হিন্দুরা যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, তখন পথভাবে আমাকে প্রণাম করিল, রথভাবে আমাকে প্রণাম করিল, বিগ্রহ ভাবে আমাকে প্রণাম করিল, আর অন্তর্য্যামী যিনি তিনি সকলের ভ্রান্তি দেখিয়া মনে মনে হাসেন। ছাত্রদের ইংরেজী লেখায় গ্রামারের ভুল দেখিয়া, হেডমাষ্টার যেমন হাসেন আমাদের ভ্রান্তি দেখিয়া পরমেশ্বর যদি সেইরূপ হাসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বড় ছোট করিয়া দেখা হয়। ভারতবর্ষের সাধক বলেন, "লোকে পথকেই প্রণাম করুক, রথকেই প্রণাম করুক আর বিগ্রহকেই প্রণাম করুক,—সে নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম বিশ্বপতির চরণে গিয়াই পৌঁছে। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া, কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয়ভাব অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষের উদার ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় খুঁজিয়া পাইলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন—যুগে যুগে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সকলেই সত্যপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে, ক্ষুদ্রগণ্ডী অতিক্রম করিয়া, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার সীমা ছাড়াইয়া, উদার উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতেন। কেশবচন্দ্রের ভক্তিবিহ্বলতা দেখিয়া অনেকে তাঁহার পদধূলি লইতেন। কোনও কোনও ব্রাহ্ম মনে করিলেন,—'মানুষকে এরূপ ভক্তি করিলে ঈশ্বরের প্রাপ্য ভক্তি মানুষকে অর্পণ করা হয়। ইহারই নাম গুরুবাদ। গুরুবাদ পরম অপরাধ।" ভক্ত বৈষ্ণব নীলকণ্ঠের একটি ভক্তিপূর্ণ গান কোনও ব্রহ্মসঙ্গীতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই গানের "সর্ব্ব অঙ্গে মাখি ভক্ত-পদধূলি" অংশটি বর্জ্জিত হইয়াছে। এইরূপে রসময়ভাব বর্জ্জন করিতে করিতে আমাদের ভক্তিরস শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চমত মানিয়াই তৃপ্ত আছি। আমরা যতই উচ্চকণ্ঠে বলি না কেন "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে'—তাহাতে আমাদের পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না; শুষ্কমত লইয়া মরুভূমিতে পড়িয়া থাকিব। ভক্তিহীন হইয়া কান্নার সুরে সুদীর্ঘ প্রার্থনা করি, চোখে এক ফোঁটা জল আসে না;—সে প্রার্থনা করুণ রসের অভিনয়ে পরিণত হয়। ভক্তের মধ্যে ভগবান দর্শন করিতে না পারিলে, ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হইবে না, হৃদয় সরস হইবে না। সূর্য্যচন্দ্রে, নদী পর্ব্বতে, আকাশে অরণ্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, বিশ্বের সকল দৃশ্যে বিশ্বপতির বিশ্বরূপ দর্শন হয়—আর ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—ভক্ত মানবের মধ্যে বিশ্বেশ্বর-দর্শন হয় না? ভক্ত কেশবচন্দ্রকে যথাযোগ্য ভক্তি অর্পণ না করিয়া আমরা অপরাধ করিয়াছি। অনেক দিন হইল, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া তাঁহার উপাস্য দেবতার চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। আজ সাঁইত্রিশ বৎসর পরে, তাঁহার মৃত্যুদিনে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি আর ভাবিতেছি, আমরা কি তাঁহার ভাব সম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিয়াছি?

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

রুচি।

নেহারি পূরবাকাশে তরুণ তপন
বিমল আনন্দে ভাসে জগৎ-বয়ান,
কেহ ভাবে বিধির এ লোহিত লোচন,
কেহ কয় কেন হয় নিশা অবসান।

আশীবিষ দরশনে আতঙ্কে অস্থির
কেও হয়; কিন্তু ওই সাপুড়ে স্বেচ্ছায়
বিবরে প্রবেশি করে আদর অহির;
রজ্জুতে সর্পের ভ্রমে কেহ মূর্চ্ছা যায়।

মদ্যপায়ী স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সুরাপানে,
কেহ ত্যজে বিষবৎ সেই মদিরায়।
রাজ্যলোভে নরশিরে কেহ অস্ত্র হানে;
তৃণসম গণে কেহ রাজ্য পিপাসায়।

প্রবৃত্তি প্রকৃতিভেদে বিধির বিধান;
হলাহল শব্দে হয় সুধা অভিধান।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার লোধ।

পরলোক ও মনুষ্যাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব।

এই দুইটীর মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে; একটীর উল্লেখে অপরটীর কথা মনে উদিত হয়। মনুষ্য আত্মার ব্যক্তিগত অমরত্বে (personal immortality) আত্মায়, চৈতন্য, স্মৃতি ও অবিভাজ্য স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে হইবে। জলবিম্ব যেরূপ উদ্ভূত হইয়া পুনর্জ্জলবক্ষে লীন হয়, মৃত্যুর পর মনুষ্যাত্মা, পরমাত্মায় তদ্রূপ লীন হয় না; মৃত্যুতে, মনুষ্যের স্থূল শরীর লোপ পাইলেও সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান থাকে; তজ্জন্য মৃত্যুকে, আত্মার জীর্ণবাস পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ভক্তগণ, আত্মাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর সঙ্গে তুলনা করেন; পাখী, পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিলে যেমন তাহার পিঞ্জরের বাধা দূর হওয়ায়, সে অসীম গগণের মুক্ত আলোকে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে সমর্থ হয় ও তাহার গম্যস্থানের প্রসার বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ দেহবিমুক্ত আত্মাও দেহের বাধা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, অনন্ত উন্নতির পথে, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আকার অবলম্বনে, সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বদর্শী, ও সর্ব্বজ্ঞ হন।

পরলোক সম্বন্ধে নানা লোকের নানা ধারণা, বিশেষতঃ স্বর্গ ও নরক কল্পনা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে এবং কবিদের কাব্যে, স্বর্গ ও নরকের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা সাধারণ লোকের মনে অনেক স্থলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। বস্তুত, স্বর্গ ও নরক, মনের অবস্থামাত্র; আত্মপ্রসাদই স্বর্গের সুখ, অনুতাপই নরকের অনল; এবং ইহাই যথা-ক্রমে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি। পাপ ও পুণ্যের "ওজেবাদ" (set off) হয় না; পাপের জন্য অনন্ত নরক ভোগ নাই। আকরিক অপরিষ্কার ধাতু যেরূপ "ব্লাষ্ট্ ফার্ণেসের (Blast furnance) উত্তাপে মলিনত্ব বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল আকার ধারণ করে, আত্মাও অনুতাপানলে তদ্রূপ সংস্কৃত হয়।

মনুষ্যসৃষ্টির আদিমকাল হইতেই, পরলোকরহস্য মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান সমস্যাপূর্ণ বিষয় হইয়া রহিয়াছে। অহিফেণ সেবনাভ্যস্ত ব্যক্তি যেমন ক্ষণিক তন্দ্রামুক্তির অবস্থায় চৈতন্য লাভ করে, বিষয়সেবী ব্যক্তিও মায়ামোহাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে সময়ে সময়ে ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া পরলোকের বিষয় মনে করে। বস্তুতঃ প্রিয়জনের মৃত্যুতে তাহার এই ক্ষণিক চৈতন্যোদয় হয়। প্রত্যহ অসংখ্য লোক পরলোক গমন করিতেছে ইহা দেখিয়াও অনেকেই মনে ভাবে না তাহাদিগকেও সেই অজ্ঞাত রাজ্যে যাইতে হইবে; "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্" (ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর বিষয় কি হইতে পারে?)

প্রকৃতির মোহাবরণের একপ্রান্ত উত্তোলিত করিতে বিশ্বাস, ভক্তি ও সাধনার আবশ্যক, নচেৎ, ঐ আবরণের অপর পার্শ্বস্থ ঝল্‌সান্ আলোকে অন্ধতা ও অনন্তের বিশালত্বধারণায় অক্ষম হওয়ায় মস্তিষ্ক-বিকৃতি উপস্থিত হইতে পারে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের দর্পচূর্ণকারী সুপণ্ডিত চৈতন্যদেব শুষ্কজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গের আশ্রয় লইয়াছিলেন। শাক্তভক্তদ্বয়, সাধক রামপ্রসাদ ও সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী ও সরল বিশ্বাস ও পরাভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। যাহা তৎকালীন খ্যাতনামা মনীষীগণের নিকট দুর্ব্বোধ্য সমস্যা ছিল, তাহা বেথেলহেমের সূত্রধর তনয় ও তাঁহার গ্যালিলি সাগরতীরবাসী নিরক্ষর ধীবর শিষ্যগণের পক্ষে সহজবোধ্য হওয়া বিচিত্র কি? বিশ্বাস ও ভক্তি মধ্যে পরস্পর ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ এবং আধ্যাত্মিক জগতে শুষ্ক জ্ঞান অপেক্ষা সরল বিশ্বাস ও ভক্তির এবং মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়ের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

পরলোকেও মনুষ্যাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্বে বিশ্বাস আছে বলিয়া মানবসমাজে পাপপুণ্যের বিচার, সুশৃঙ্খলা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, আত্ম-বিসর্জ্জন, আশা, শান্তি প্রভৃতি যাহা কিছু কল্যাণকর ও সুন্দর তৎসমুদায় বর্ত্তমান আছে। এই বিশ্বাস সভ্য মানবসমাজের ভিত্তি, সংসার সমুদ্রে জীবনতরীর কর্ণ ও ধ্রুবনক্ষত্র। ইহাতে শোকে সান্ত্বনা, দুঃখ কষ্টে আশা ও শান্তি লাভ হয়, ইহলোক ও পরলোক এই উভয়ের মধ্যে অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং মৃত্যু ভয় দূর হয়; বিশাল জগচ্চিত্র উদ্দেশ্যবিহীন অসার স্বপ্নচ্ছবিতে পরিণত হয় না।

কোনও কোনও ভাবুক এই পৃথিবীকে পান্থনিবাসের সঙ্গে তুলনা করেন; কেহ বা পক্ষীগণের রাত্রি যাপনের আশ্রয়-তরুর সঙ্গে তুলনা করেন; কিন্তু তাহাতে মনুষ্য জীবনের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সকলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। তজ্জন্য, ইহাকে নাট্যশালার মঞ্চ সঙ্গে তুলনা করাই সঙ্গত বোধ হয়; কারণ, নাট্যশালার অভিনয়ে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ মধ্যে কর্ত্তব্য কার্য্য ভাগ করা ও তজ্জন্য "ষ্টেজ মাষ্টারের (Stage Master) নিকট ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে; অভিনয়ের দোষ গুণ বিবেচনায় পুরস্কার ও প্রশংসা আছে, তিরস্কার ও নিন্দা আছে। রঙ্গমঞ্চ, ইহলোক, নেপথ্য পরলোক, যবনিকা, প্রকৃতির আবরণ; নেপথ্যে গমন পরলোক গমন; তাহাতে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ব্যতীত ব্যক্তিগত কোনও পরিবর্ত্তন সংঘটন নাই; নেপথ্যই শেষ গন্তব্য ও মিলন স্থান। রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া নেপথ্য গমনে কি কাহারও ভীতি কি কষ্ট

বোধ হয়? যদি হয়, তবে তাহা কি অভিনয় ত্রুটীজনিত ষ্টেজমাষ্টারে তিরস্কার ভীতি নয়? তবে পরলোকগমন কি প্রবাসীর স্বদেশ যাত্রা নয়? পরলোক কি পুনর্ম্মিলন স্থান নয়?

জ্ঞান ও বিজ্ঞান অনন্ত; মনুষ্যজীবন নানা বিঘ্নশঙ্কুল, ও অল্পকালস্থায়ী। যদি মৃত্যুতেই ইহা শেষ হয়, তবে বৃথা দুঃখপূর্ণ-জীবন-ভার বহনে ফল কি? অতৃপ্ত অনন্ত আশার, অসমাপ্ত আরব্ধ কর্ম্মের কি এখানেই শেষ? জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্য এ পৃথিবীর নিকট নানা ঋণে ঋণী; সেই সকল ঋণ কি পরিশোধের আশা নাই; শুষ্ক জ্ঞানী দার্শনিক হয়ত ইহাকে শিশুর সরল বিশ্বাস কি কবির কল্পনা বলিবেন। যাহা হউক, সকল বিষয়েরই ফলদ্বারা দোষগুণ বিচার করা হয়; সুতরাং সরল বিশ্বাসী ভক্তের ও শুষ্ক জ্ঞানী দার্শনিকের, এই উভয়ের, জীবন তুলনা করিলেই প্রশ্নটীর মীমাংসা সহজ হইতে পারে। যে পাণ্ডিত্য মনুষ্য জীবনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া উদ্দেশ্যহীন ও অকর্ম্মণ্য করে তাহার গৌরব ও মূল্য কি? উহা কি অনধিকার চর্চ্চার শাস্তি নয়? কীটাণুকীট মানবের পক্ষে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ পুরাণ পুরুষের জন্মকুষ্ঠী উদ্ধার চেষ্টা কি অনধিকার চর্চ্চা নয়? পোষাকী পাণ্ডিত্য অপেক্ষা দৈনিক ব্যবহারিক সরল বিশ্বাস অধিকতর কার্য্যকর ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ। নিবৃত্তি মার্গানুসারিণী ইহাই কল্যাণপ্রদায়িনী ও সৌন্দর্য্যসম্পন্না।

কুমার ও কুমারীর মধ্যে পরস্পর ভালবাসা সঞ্চার হইয়া তাহা উভয়ের বয়োবৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু, বিধি বিড়ম্বনায় তাহাদের পার্থিব মিলন হইল না; পরলোকে মিলন আশায় উভয়ই ব্রতনিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন। দম্পতীর মধ্যে একজন লোকান্তর গমন করায়, উভয়ই কাল-স্রোতের দুইতীরে পৃথক্ পৃথক হইয়া নিশাবসানে চক্রবাক্ চক্রবাকীবৎ মিলন আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন। মানব সমাজের কল্যাণ কামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি না হইতেই কর্ম্মবীর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন; পরলোক হইতে তাহার ফলোদয় দেখিতে পাইবেন, এই তাঁহার আশা। রুষ-জাপ সমরে, জাপ-সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবিত সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময়ে যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের প্রেতাত্মা ও পূর্ব্ব পুরুষদের প্রেতাত্মা সকলকেও ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হন নাই।

জীবনের শেষ বয়সে, বহুদিন পর, বাল্য ও যৌবনের লীলাক্ষেত্র এবং প্রাপ্ত-ব্যবহার-বয়সের কর্ম্মক্ষেত্র সকল দর্শন করিলে, রজনীর নিস্তব্ধতায় জ্যোতিষ্কমালা-খচিত নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে, এবং উষাকালে করুণ-রসাত্মক সঙ্গীত শ্রবণে, বায়োস্কোপের ছবিবৎ, মানসপটে যে সকল দৃশ্যাবলী উদ্ভাসিত হইয়া, এক যোগে অমৃত-বর্ষণ ও বিষ-বিসর্প দ্বারা হৃদয়কে যেরূপ বিহ্বল করে, তাহা অনেকেই অনুভব করেন। তখন মনে হয়, "হায়, ইহলোকেই কি এই সকল দৃশ্যের শেষ? আর কি কখনও এই সকল দৃশ্য দেখিতে পাইব না"?

মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা, পোষণজন্য পিণ্ডোদক প্রদান ও তুষ্টি-সম্পাদন জন্য তৎপ্রতি ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, কি স্নেহপ্রকাশ, সভ্যমানবসমাজে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। হিন্দুদের গয়ায় পিণ্ডদানের ও দৈনিক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের মন্ত্রের প্রাণপ্রদ

মধুরতা কে না স্বীকার করেন? বস্তুত, শোকাশ্রু-সিক্ত-স্মৃতি দ্বারাই পরলোকগত আত্মাকে নিকটে দর্শন করা যায়; তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য ত্রুটী-জনিত ক্ষমা প্রার্থনা, ঋণ-শোধ জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা এবং তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা ও আমাদের মঙ্গল জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা; আমাদের মনের কথা ও প্রাণের ব্যথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করা, এই সকল কি প্রকৃত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডোদক দান নয়?

বলা বাহুল্য, উপরে যাহা উল্লেখ করা হইল তাহার মূলে ঈশ্বর-ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ-স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। আত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব সম্বন্ধে কোনও কোনও আধুনিক দার্শনিকগণের মতও নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন জড়-বাদেরও প্রসার বৃদ্ধি দেখা যায়। পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে সজীব পদার্থ সকলের প্রাণ সঞ্চার হয়, এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসই জড়বাদের ভিত্তি বলিয়া বোধ হয়। দুগ্ধ পচিলে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাহার মধ্যে কীট জন্মে; বীজাণুর আবিষ্কর্ত্তা বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক "কক্" (Koch) তাঁহার আবিষ্কার দ্বারা এই ভ্রম-বিশ্বাস দূর করায়, এখন ইহা প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কেবল জীব হইতে জীব উৎপন্ন হয়; জড় পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জীব উৎপন্ন হইতে পারে না।

যেস্থানে বিষ সেইস্থানেই বিষের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা প্রকৃতির নিয়ম। বোধ হয় প্রকৃতির সেই বিধান ক্রমেই আধুনিক জড়বাদের প্রতিষেধক-স্বরূপ "থিওসফী" (Theosophy=ব্রহ্মতত্ত্ব) ও "স্পিরিচুয়ালিজম্" (Spiritualism=আত্মা-তত্ত্ব) এই দুইটি মতের অবতারণা হইয়াছে। রুষিয়ার ম্যাডাম্ ব্ল্যাভোস্কী, "থিওসফিক্যাল সোসাইটীর (Theosophical Society) স্থাপয়িত্রী; এই মত প্রধানতঃ ভারতীয় দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত; তিনি তিব্বতী লামাদের নিকট ঐ সকল শিক্ষা করেন। তাঁহার পর, কর্ণেল অল্‌কট্ উক্ত সোসাইটীর নেতা হইয়া আমেরিকা হইতে সশিষ্যে ভারতবর্ষে আইসেন এবং আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বেদজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদোপদেশ শিক্ষার্থী হন। কর্ণেল অল্‌কটের পর শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট ঐ সোসাইটীর নেত্রী হইয়াছেন। পৃথিবীর অনেক স্থানে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

"থিওসফী"র ন্যায় "স্পিরিচুয়ালিজম্"ও পৃথিবীর অনেক স্থানে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সমাদৃত হইয়াছে।

এরূপ কথিত আছে, থিওসফীর প্রবর্ত্তিত মত খণ্ডন জন্য, ইউরোপে ও আমেরিকায় নিরীশ্বর বিজ্ঞানবাদীগণ প্রথমে "সাইকিক্ রিসার্চ্চ সোসাইটী (Psychic Research Society) ও তাহার শাখা সকল স্থাপন করেন। এই শেষোক্ত সোসাইটীর সভ্যগণ নিরপেক্ষচিত্তে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে তৎকালীয় ভূতপ্রেতের গল্পের ও উপদ্রবের এবং পুরাতন বিচার আদালত সকলের "উইচ্ ক্র্যাফ্‌ট্" (witch-craft=ডাইন্ বিদ্যা) ঘটিত অপরাধ বিচারের নথী সকল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষার ফলে, অবশেষে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাঁহাদের পরীক্ষিত

প্রতি বৎসর সহস্র মরার মধ্যে অন্তত তিন চারিটী ঘটনা এরূপ দৃষ্ট হয় যে, প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে, তাহাদের অন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা করা যায় না। ভরতবন্ধু ব্র্যাড্‌ল ও সরস্বতী-রূপিণী শ্রীমতী এ্যানি বেসাণ্ট্ ও অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ঐ সাইকিক্ সোসাইটীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

সম্ভবতঃ "থিওসফী" ও "সাইকিক্ রিসার্চ্চ" এই উভয়ের পরস্পর সংস্পর্শে, চুম্বক স্পর্শে লৌহবৎ, সাইকিক্ রিসার্চ্চে প্রাণ-সঞ্চার হইয়া, তাহা হইতে স্পিরিচুয়ালিজমের উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও "থিওসফী" ও স্পিরিচুয়ালিজম্, দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক মত, তথাপি, তাহারা উভয়ই, মনুষ্যাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব ও পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া, শোকবিহ্বল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের শান্তি-বারি পিপাসু শুষ্ক হৃদয়ের সান্ত্বনার উৎস স্বরূপ হইয়াছে। এই উভয় মতেরই অনেক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা আছে। "স্পিরিচুয়ালিজম্" মতাবলম্বী ডাক্তার মায়ার্স্ যে সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মনুষ্যাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব সপ্রমাণ করা হইয়াছে। স্পিরিচুয়ালিষ্টদের অধিবেশিত সভাকে "সীয়ান্স" (Seance) বলে। তাহাতে তাঁহারা প্রক্রিয়া বিশেষে প্রেতাত্মা সকলকে উপস্থিত করেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা প্রেতাত্মার "ফটো" গ্রহণও করিয়া থাকেন।*

* অনেক দিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়, পাবনা টাউনে একজন ভদ্রলোকের দ্বিতীয় সংসারের সহধর্ম্মিণীর "ফটো" গ্রহণ সময়ে, তাঁহার প্রথমা মৃত-স্ত্রীর প্রতিকৃতিবৎ অন্য একটী ফটোও তৎসঙ্গে উঠে। তৎপরও সংবাদ পত্রে ঐরূপ আর একটী ঘটনা পাঠ করার বিষয় মনে পড়ে।

অমৃত বাজার পত্রিকার আফিস্ হইতে হিন্দু স্পিরিচুয়াল্ ম্যাগাজিন্ (Hindu Spiritual Magazine) নামক একখানা ইংরেজী মাসিক পত্রিকা অনেক দিন হইতে বাহির হইতেছে। মিষ্টার "ষ্টেড্" (Stead) ও লর্ড কল্‌ভিন্, উভয়ই "স্পিরিচুয়ালিজম" মত সমর্থন করেন।

অধুনা পাশ্চাত্য দেশে জড়বিজ্ঞানের যেরূপ ক্রমোন্নতি দেখা যায়, একদা প্রাচীন ভারতেও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির তদ্রূপ উন্নতি হইয়াছিল। হিন্দু দার্শনিকদের প্রচারিত যে সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে অনেকের নিকট কল্পনা বলিয়া বোধ হইত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বাধীনভাবে তৎ-সকলের আলোচনা করিয়া তাহা সমর্থন করায়, তৎপ্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক-যুগে চিন্তাশীল লোকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

ক্লোরোফরম্ আবিষ্কারের পূর্ব্বে, "ট্র্যান্স" (trance) দ্বারা রোগীকে অচেতন করিয়া অস্ত্র করার প্রথা ছিল। "হিপ্‌নোটাইজ" (hypnotise) করিয়াও ঐরূপ অস্ত্র করা যাইতে পারে। "মেস্‌মেরিজমে"র কথা অনেক দিবস যাবৎ সকলেই অবগত আছেন।

"১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, ফ্রেডারিক্ মেস্‌মার (Frederick Mesmer) প্রচার করেন যে, সমস্ত প্রাণী-শরীর, বিশেষতঃ মনুষ্য-শরীর হইতে, বিশেষ প্রকৃতির একটী শক্তি (force =বল) প্রতিনিয়ত বাহির হয় এবং তাহা চুম্বক শক্তির ন্যায় অন্য পদার্থে সংক্রামিত করা যাইতে পারে; কোনও কোনও অবস্থায় তাহার রোগারোগ্য ক্ষমতাও যথেষ্ট থাকে। তিনি আরও প্রকাশ করেন, যে ঐ চুম্বক-শক্তি নির্গমন-সময়ে জ্যোতিষ্মান্ দেখায়। এই শেষোক্ত কথাটী, হিপনোটাইজর্থকৃত ব্যক্তি-

গণের উক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিগণ বলেন, সমস্ত পদার্থ হইতে, বিশেষতঃ হিপ্‌নোটাইজ-কারীগণের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে জ্যোতিঃ বাহির হয়; কিন্তু হিপ্‌নোটাইজ-কৃত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ জ্যোতিঃ দেখিতে পায় না। তৎপর "মুসোঁ মরিস্ ম্যাটারলিঙ্ক (M. Maurice Materlinck) তাঁহার "নিউ ইন্টিমেশান্‌স্ অর্ব ইম্মর্ট্যালিটী" (New Intimations of Immortality=অমরত্বের নূতন সংবাদ) শীর্ষক বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে, জীবিত অবস্থায় ওজোবৎ একপ্রকার পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হয় এবং মৃত্যুর পরও তাহার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া চিন্তা সকলকে (thoughts) মস্তিষ্কের নিরপেক্ষভাবে সংরক্ষিত করে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার ফিলিপ্ ক্যারি ব্যারণ ভন্ রিচেন্‌ব্যাক্ (Dr. Philip Kari Baron von Reichenbach) প্রচার করেন যে, প্রত্যেক শরীর হইতে যে এক প্রকার শক্তি বাহির হয় তাহা যদিও সাধারণ লোকের চক্ষুর অগোচর, তথাপি, হিপ্‌নোটাইজ-কৃত বিশেষ প্রকৃতির লোকেরা, তাহার ক্রিয়া দ্বারা তাহা অনুভব করে। ঐরূপ শক্তির অস্তিত্বদ্বারাই জান্তব চুম্বক-শক্তির (animal magnetism) যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায়। অত্যধিক স্নায়বিক-অনুভূতি-সম্পন্ন এই প্রকৃতির লোকেরা, অন্ধকার গৃহের অন্যান্য লোকদিগের দক্ষিণ পার্শ্ব জ্যোতির্ম্ময় নীলাভা দ্বারা এবং বামপার্শ্ব পীতাভ লালবর্ণ দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিতে পায়। আর, যদি অন্য কোনও ব্যক্তি, এইরূপ স্নায়বিক-অনুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত, তাহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধৃত করে, তাহা হইলে একটী অপ্রীতিকর উত্তাপ অনুভূত হয়; আর যদি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই ব্যক্তির বাম হস্ত ধৃত করে, তাহা হইলে একটী প্রীতিকর স্নিগ্ধ অনুভূতি উপলব্ধি হয়। ইহাতে "রিচেন্‌ব্যাক্" সিদ্ধান্ত করেন যে, একই প্রকৃতির জান্তব চুম্বক-শক্তিদ্বয় পরস্পরকে বিপ্রাকর্ষণে বিক্ষিপ্ত করে এবং ভিন্ন প্রকৃতির জান্তব চুম্বক-শক্তিদ্বয় পরস্পরকে আকর্ষণ করে; চুম্বকশলাকার পোল্ (Poles=প্রান্তকেন্দ্র) দ্বয়েরও এইরূপ ধর্ম্ম। এক ব্যক্তির প্রতি অন্য ব্যক্তির যে অহৈতুকী ভালবাসা কি বিদ্বেষ-ভাব, তাহারও ইহাই কারণ। এই জান্তব চুম্বক-শক্তি এক শরীরের ভিতর দিয়া অন্য শরীরে সংক্রামিত করা যাইতে পারে এবং তখন ঐ সকল শরীর আলোকে উজ্জ্বল দেখায়। রিচেন্‌ব্যাকের মতে, প্রত্যেক শরীর হইতেই ঐ চুম্বক-শক্তি বাহির হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ঐ শক্তিও চুম্বকের ন্যায় প্রান্ত-কেন্দ্র ধর্ম্ম (polraity) বিশিষ্ট।

যদিও বিশ্লিষ্ট আলোক-রশ্মি-পটের (spectrum=রামধনুবৎ আলোক-পট) এক প্রান্তে আল্ট্রা-রেড্" (Ultra-red = অধি-লোহিত) অর্থাৎ লোহিতবর্ণের বহিস্থ বর্ণ ও অপর প্রান্তে আল্টা-ভায়লেট (Ultra-vialet=অধি-বেগুন) অর্থাৎ বেগুণ বর্ণের বহিস্থ বর্ণ, চক্ষুর অগোচর, তথাপি তাহাদের ক্রিয়াদ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। আর, যদিও কর্ণগোচর স্বর-গ্রামের (audible scale) এক প্রান্তে, স্বরের উচ্চ সীমার বাহিরের শব্দ অত্যধিক উচ্চ বিষয়ে এবং অপর প্রান্তে, স্বরের নিম্ন সীমার বহিস্থ শব্দ অত্যধিক নীচ হওয়ায় শ্রুতি গোচর হয় না, তথাপি তাহাদের অস্তিত্বও ঐ রূপে নির্ণীত হয়। তদ্রূপ, ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে

যে, চক্ষু ও এরূপ বর্ণ থাকা অসম্ভব নয়, যদ্দ্বারা ঐরূপ অদৃশ্য-বর্ণ সকল দেখিতে ও অশ্রুত-শব্দ সকল শুনিতে পারা যাইতে পারে। সেইরূপ, এরূপ স্নায়বিক প্রকৃতির লোক থাকিতে পারে যে, যদিও অন্য কোনও ব্যক্তি তাহা দেখিতে না পায়, তথাপি, পূর্ব্বোক্ত জান্তব চুম্বক-শক্তি কোনও শরীর হইতে বাহির হওয়া সে অনুভব করিতে পারে। যদি কোনও গাঢ় অন্ধকার গৃহে, "ফটোগ্রাফের নিগেটিভ পিক্‌চার" (negative picture—ফলকে গৃহীত প্রথম ছবি) উঠান জন্য প্রস্তুত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রলেপ-যুক্ত "সেন্সেটিভ প্লেটের" (sensitive plate =আলোক-ক্রিয়া-ব্যঞ্জক-ফলক) উপর মনুষ্যহস্ত কিছুক্ষণ জন্য স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ফলকের (প্লেটের) উপর সাধারণ ভাবে আলোক পাতিত করিয়া যেরূপ "ফটো ডেভেলপ" (photo develop) অর্থাৎ ছবি-বিকাশ করা যায়, ঐ হস্ত হইতে বিকীর্ণ আলোকোদ্ভূত অদৃশ্য ছবিও তদ্রূপ বিকাশ করা যায়। ইহার দ্বারা "স্পিরিট ফটো"রও সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

রিচেন্‌ব্যাকের জান্তব চুম্বকশক্তি ও হার্জের তাড়িত-তরঙ্গ (Hertz's Waves of electricity) দ্বারা প্রমাণীকৃত বিষয় সকলের মধ্যে সৌসাদৃশ্য থাকা এবং ডাক্তার ব্যারেটীর (Dr. Barety) মতে, দৃশ্যমান আলোক-রশ্মি সকল যে নিয়মের অধীন, আলোক-পটের পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্য আলোক-রশ্মি সকলও সেই সকল নিয়মের অধীন থাকাও, এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক দর্শকগণ, নিদ্রিতবৎ "মিডিয়ামের (medium=যে ব্যক্তিকে মেস্‌মেরাইজ করা হয়) শরীর হইতে ঈষৎ শুভ্র-মেঘবৎ বাষ্প বহির্গত হওয়া ও প্রথমে তাহা মোচাগ্রবৎ আকার ও পরে মনুষ্যাকৃতি ধারণ করা দেখিয়াছেন। কখন কখন এইরূপ অপচ্ছায়াটী (phantom) একটী আলোক-সূত্র দ্বারা "মিডিয়ামের" সঙ্গে সংযোজিত, কখন বা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ হইয়া গৃহ মধ্যে স্বেচ্ছামত ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে থাকা, দেখা গিয়াছে; এবং যদিও তাহা অদৃশ্য, তথাপি স্পর্শদ্বারা তাহার অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মে। এই অপচ্ছায়াকে "মিডিয়াম্" ব্যক্তিগণ "স্পিরিট" (Spirit=প্রেতাত্মা) বলে। কিন্তু, প্যারিস্ নগরীর, ইকোল্ ডি ম্যাগনেটিজমের, ডি রোশাস্ ও ডার্ভিলের (de Rochas and Durviller of the Ecole de magnetisme, Paris), গবেষণায় জানা যায় যে, "মিডিয়াম্" যখন "হিপনোটিক্" অবস্থায় থাকে, তখন তাহার স্থূল-শরীর স্পর্শ করিলে, এমন কি তাহাতে ঘা দিলেও সে তাহা অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম শরীর (etheral body), যাহা বাষ্পাকারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত থাকে, তাহাতে স্পর্শানুভূতি বিদ্যমান থাকে এবং তজ্জন্য যখন সেই সূক্ষ্ম-শরীর স্পর্শ কি বিদ্ধ করা যায়, তখন স্থূল-শরীরে সেই স্পর্শ জ্ঞান কি বেদনা অনুভূত হয়। তাহার নাসিকার নিকট "এ্যামোনিয়া" (ammonia) ধরিলে সে তাহার ঘ্রাণ অনুভব করে না। কিন্তু যখন তাহা, তাহার সূক্ষ্ম-শরীরের নাসিকার নিকট ধরা যায়, তখন তাহার স্থূল-শরীরের মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত হয়। তজ্জন্য, "ডি রোশাজ" মীমাংসা করেন যে, কোনও কোনও অবস্থায়, শরীর হইতে কেবল যে ঐরূপ বাষ্পোদ্গারণ হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে অনুভব-শক্তি এবং অবশেষে গতিশক্তিও

শরীর হইতে বাহির হইতে পারে। এই অপচ্ছায়া সকল পরলোক হইতে প্রেতাত্মার আবির্ভাবই হউক, কিম্বা মনুষ্য শরীরে সীমার বাহিরে যাইয়া, শরীর হইতে পৃথক হইয়া আত্মার স্বাধীনভাবে কার্য্যকরণ ক্ষমতার প্রমাণই হউক, তাহার সঙ্গে, মৃত্যুর পর আত্মার স্থায়ীত্বের প্রশ্নের সম্বন্ধ আছে। এই সকল আধুনিক আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে হিন্দু দার্শনিকগণ এই জান্তব চুম্বক-শক্তিকে প্রাণের একটী বাহ্যস্ফুরণ বলিয়া জ্ঞাত ছিলেন এবং ইহার উপরই তাঁহাদের প্রাণায়াম যোগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে, 'প্রাণ' একটী বৈজ্ঞানিক-প্রমাণ-সিদ্ধ সত্য। তাহা কোনও কল্পনা ভিত্তির উপর স্থাপিত দার্শনিক মত নয় এবং তদ্দ্বারা কেবল যে, "ক্লেয়ার ভয়ান্স" (clairvoyans—অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রত্যক্ষানুভূতি শক্তি), অন্যের মনের কথা জানা (mind-reading=মাইণ্ড রিডিং), "টেলিপ্যাথী" (telepathy=দূরবর্ত্তী ব্যক্তিদ্বয়ের মনোভাবের যোগ), "মেস্‌মেরিজম্" (mesmerism=সম্মোহনশক্তি) ইত্যাদি অনেক বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা নয়, তদ্ব্যতীত, আত্মা-ঘটিত যে সকল উচ্চতর অদ্ভুত ব্যাপার দ্বারা, আত্মার শরীর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্ণয় হয়, তাহাদের কারণ ও বাস্তবিকতাও সপ্রমাণ হয়।" *

* Sunday's World Magazine নামক পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের সর্ব্বপ্রথম আমেরিকান শিষ্য, স্বামী কৃপানন্দের "If a man die, shall he live again" (=মানুষ মরিলে কি পুনর্ব্বার জীবনধারণ করিবে?) শীর্ষক বক্তৃতা অবলম্বনে উপরোক্ত "কোটেশান" ভুক্ত অংশ লিখিত। ইঁহার পিতা মাতা, ফরাসী ও রুষ বংশীয় ছিলেন। ইনি প্যারিসে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চল্লিশ বৎসর আমেরিকায় যুক্ত-রাজ্যে বাস করেন। বেদান্তদর্শন প্রচার

এই প্রসঙ্গে, এতদ্দেশীয় অদ্বৈতবাদ ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা গেল।

"শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই জগৎ স্বপ্নবৎ। শাস্ত্রকার মুনিঋষিগণ আত্ম-প্রত্যয় (intuition) দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, নির্ম্মল আত্মা উপাধিদ্বারা আবৃত। উপাধি মধ্যে তাঁহারা এই কয়েকটী গণ্য করেন—মায়া-মোহাচ্ছন্ন আত্মা, (unconscious spirit) মন, ইন্দ্রিয়গণ (senses), জড়শরীর (material body) অর্থাৎ পঞ্চভূত-গঠিত শরীর, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় (object of senses)। প্লেটোর মতে, এই জগৎ ছায়াবৎ; ইহার প্রকৃত কোনও সত্ত্বা নাই; আমরা মনের সাহায্যে বাহ্য জগৎ দেখি। মনের বিশ্লেষণ দ্বারা দার্শনিক ক্যাণ্টও (Cant) ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন; তাঁহার মতে, কাল, দেশ ও কারণ, এই তিনটী মনের উপাদান; সুতরাং এই তিনটী, আমাদিগকে যাহা দেখায়, অর্থাৎ যে ছবি আমাদের নিকট ধরে, তাহাই আমরা দেখি। যেমন রঞ্জিত কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া কোনও বস্তু দেখিলে, সেই বস্তুকে ঐ কাচের বর্ণ বিশিষ্ট দেখায়, কিন্তু তাহার প্রকৃত বর্ণ দেখা যায় না। তবে, প্রকৃত বস্তু কি? মনুষ্য-আত্মা সম্বন্ধে শপেনহয়ার (Schopenhauer) এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধে যেরূপ, মনুষ্যের দৃশ্য-শরীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ, অর্থাৎ মনুষ্যের স্থূল-শরীরও প্রকৃত বস্তু নয়। মন, দর্পণস্বরূপ; তাহাতে বাহ্য পদার্থের ছবি প্রতিফলিত হয়; এবং

জন্য, বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ইনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

মনের কর্ম্মশালায় ঐ সকল প্রতিফলিত ছবি, ভাব বা অনুভূতি সকলের (concepts) আকারে গঠিত হয়। সুতরাং, শরীর অপেক্ষা মনের সঙ্গে আত্মার নিকটতর সম্বন্ধ; মনের প্রকৃতি দ্বারা ঐ অনুভূতির বিকৃতি হয়; কিন্তু প্রকৃত বস্তু যে আমাদের আত্মা তাহা মনদ্বারা ঐরূপ বিকৃত হয় না। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ঐরূপ হইলেও আমাদের অন্তর্জগত সম্বন্ধে তদ্রূপ হয় না। আমাদের অন্তরাত্মার একটী উপাদান প্রবৃত্তি (volition), মনের দ্বারা ঐরূপ বিকৃত হয় না। বরং তাহা মনকেই শাসন করে। তজ্জন্য, মন অপেক্ষা, প্রবৃত্তি, আমাদের অন্তরাত্মার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। আমার হস্ত-চালনায়, ঐ দৈহিক কার্য্যটী, মনের দ্বারা, কাল, দেশ ও কারণ বিশিষ্ট ঘটনারূপে অনুভূত হয়; কিন্তু যে প্রবৃত্তিদ্বারা ঐ দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা দেশ মধ্যে অবস্থিত নয় এবং বাহ্য জড়-কারণ (external causality) দ্বারা শাসিত হয় না; তাহাতে কালের উপাদান থাকিতে পারে; কারণ, প্রত্যেক প্রবৃত্তিই যত কেন অল্প হউক না, কিছু সময় গ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তি অনেক সময় বিবেক-বুদ্ধি (sense of right) দ্বারা শাসিত হয় এবং বিবেক-বুদ্ধির উৎপত্তি স্থান একটী নিভৃত গভীর গুহায় নিহিত আছে। এই বিষয় বিশেষরূপ চিন্তা করিলে বুঝা যায়, বিবেক-বুদ্ধি যে ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা কালেরও অতীত। শপেনহয়ার এই ভিত্তিকে ইচ্ছা (will) নাম প্রদান করিয়া সেই ইচ্ছাকেই প্রকৃত সত্ত্বা (Real self) বলেন এবং সেই ইচ্ছা হৃদয়ে অবস্থিতি করে। তিনি, ক্যাণ্টের মত অবলম্বনে ঐরূপ বলেন এবং তাঁহার মত ভারতীয় দর্শন দ্বারাও সমর্থিত হয়। আত্মা (self=প্রকৃত সত্ত্বা) দেশ ও কালের অতীত হওয়ায় তাহা অবিভাজ্য বস্তুরূপে সকল পদার্থ মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কারণ, দেশ ও কালের দ্বারাই বিভাগের অনুভূতি জন্মে। গীতাতেও সেইরূপ —"যিনি পরমাত্মাকে জানেন, তিনি সকল পদার্থ মধ্যে তাঁহাকে একই ভাবে দেখেন, নশ্বর-পদার্থ মধ্যে তাঁহাকে অবিনশ্বর দেখেন।" পুরাতন বাইবেলেও আছে—"আমি কি আকাশ ও পৃথিবী পূর্ণ করিয়া বিদ্যমান নয়?"

ইচ্ছা (will), প্রবৃত্তি-প্রসূত চেষ্টায়, কিম্বা নিবৃত্তি জনিত নিশ্চেষ্টায়, প্রকাশ পায়।

পাশ্চাত্য দর্শন মতে, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি-জনিত ক্রিয়ায় প্রকাশ পাইলে, কাল, দেশ ও কারণ মধ্যে প্রকৃতির বল সকলের (forces of nature) যেমন, উত্তাপ, আলোক, মাধ্যাকর্ষণ, প্রভৃতির ভিতর দিয়া কার্য্য করে এবং দৃশ্যমান জগতের নানা সত্ত্বা গঠিত করে * (Deussen's Metaphysics)। ভারতীয় দর্শনের মতেও, আত্মা, জড়ের ত্রিগুণ,—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সঙ্গে মিলিত হইয়া বাহ্য জগৎ বিকাশ করে। যখন ইচ্ছা (will), প্রবৃত্তির (volition) অনুসরণ করে, তখন ইহার প্রকৃত অবিভাজ্য একত্ব, কাল ও দেশ মধ্যে বিভক্ত-বিকাশ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটী অহঙ্কার-মার্গে চালিত হইয়া, নিজকে পৃথক পৃথক জ্ঞান করে; আর, ভিন্ন ভিন্ন অহঙ্কার-মার্গে চালিত অহংতত্ত্ব সকলের পরস্পর সংঘর্ষে এই পৃথিবীতে পাপ সৃষ্টি করে। এইরূপে, কারণত্বের (causality) অতীত-হেতু নিবৃত্তিমার্গানু-

* লর্ড কল্‌ভিনের মতে matter is the vortex of energy=শক্তির আবর্ত্তকেই জড় বলে। হিন্দুদর্শনেও, পুরুষের আশ্রিতা প্রকৃতি হইতেই জড়োৎপত্তি।

সারিণী ইচ্ছা, প্রবৃত্তি-মার্গানুসরণ করিলেই পাপ সৃষ্টি হয়।

কিন্তু, ডাক্তার "ডউসেনের" মতে, সগুণাত্মিকা-ইচ্ছা (affirmation of self= অহঙ্কার ?) আমাদের অস্তিত্বের একটী প্রান্তকেন্দ্র (pole) মাত্র; অপর বিপরীত প্রান্ত-কেন্দ্র যাহা অনন্তে (in eternity) অবস্থিত; তাহাও আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তরতম স্থানের নিকটবর্ত্তী ও তাহা তথায় প্রাপ্তব্য (obtainable)। ঋগ্‌বেদেও আছে আমাদের সত্তা কেবল এক চতুর্থভাগ ইহলোকে এবং তাহার অবশিষ্ট তিন চতুর্থ ভাগ অমর (=অবনিশ্বর) রূপে পরলোকে অবস্থিত"। এই শেষোক্ত ভাগের উপর আমাদের নৈতিক ভিত্তি স্থাপিত এবং তাহা সগুণাত্মিকা ইচ্ছার স্বাভাবিক অহমিকার অতীত। সুতরাং, নিষ্কাম ইচ্ছাই (will denial) প্রকৃত সত্তা; তাহাই বিবেক বুদ্ধির ভিত্তি; তাহাই লোকের প্রশংসা ও ভক্তি আকর্ষণ করে। ত্যাগ-স্বীকারকারী ব্যক্তিকে লোকে ঈশ্বর-প্রেরিত দূত-জ্ঞানে পূজা করে। গীতায় আছে—ত্যাগ-স্বীকারই নিজের মঙ্গল, ত্যাগ-স্বীকার না করাই নিজের অমঙ্গল। নিষ্কাম ইচ্ছাই প্রকৃত ঈশ্বর, বেদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ। বাইবেলে ইহাকেই পবিত্রাত্মা (Holy ghost) বলে। বাইবেলেও জানা যায়, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে নিজকে অন্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় (সর্ব্বভূতে এক আত্মা জ্ঞান জন্মে) এবং তজ্জন্য "Do to others as you would be done by" (অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে তুমি ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতি তুমিও সেইরূপ ব্যবহার কর)।" *

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার।

* ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের Indian Review নামক পত্রিকায় জনৈক খ্যাতনামা দেওয়ান বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত Adyaitabad and Western Metaphysics Compared (অদ্বৈতবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শন তুলনা) শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ।

পরাজয়-গাথা সপ্তক।

১৯১৪ সালে, ইউরোপের মহা-সমরের আরম্ভে, জর্ম্মনী বেলজিয়মকে পদদলিত করিয়া কিরূপ বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহা সকলেরই জানা আছে। সেই সময়ে বেলজিয়ান কবি, Emile Cammaerts কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতায় বেলজিয়মের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও ইংলণ্ডের উদারতার বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ-গীতি গুলি, ১৯১৫ সালেই, আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট, লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক অনূদিত হয়; তখন ইংরাজি ভাষার পাঠকেরা বেলজিয়ান কবিতা গুলির সহিত পরিচিত হন। ১৯১৬ সালের প্রথমেই আমি Emile Cammaretsএর সাতটি যুদ্ধ-গীতি অনুবাদ করি; নানা কারণে এগুলি প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকজনের অনুরোধে এবার প্রকাশিত করিলাম। পরাজিত হইয়াও বেলজিয়ানেরা কি অদম্য উৎসাহে স্বদেশ-প্রেম জাগাইয়া রাখিয়াছিল, এই কবিতাগুলি হইতে তাহা অনেকটা বোঝা যায়।

বেলজিয়ান নিশান।

Le drapeau belge.

[বেলজিয়ান জাতীয় পতাকায় তিনটি রং আছে—কালো, লাল ও হলদে। নিম্নলিখিত কবিতায় সেই তিনটি রংয়ের কারণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে]

রক্তপতাকা উড়িছে আকাশে বীরের রক্ত স্মরি';
সন্তানহারা জননীর তরে,
কৃষ্ণ নিশান উড়ে অম্বরে;
সমর-বহ্নি-প্রভার চিহ্ন এ পীত পতাকা' পরি।
গৌরবময় এই সে পতাকাতলে
এসো সবে দলে দলে;
স্বদেশের ডাক শুনে চল ধেয়ে—
বাঁচিবে মৃত্যু দলে'।

বীরের রক্ত স্মরণে উড়িছে রক্ত পতাকাগুলি;
কৃষ্ণ নিশান পতিহীনা তরে;
পীতগুলি ঐ উড়ে অম্বরে
জয় গর্ব্বিত বীরের স্বর্ণ-মুকুটের সম জ্বলি।
পতাকার তলে এসো সন্তান দল!
স্বদেশ তোদের ডাকে।
এমন উচ্চে ওড়েনি নিশান কভু
শোভায় সাজিয়া আগে!

রক্তপতাকা উড়িছে আকাশে সমর-অনল তরে
গভীর শোকের চিহ্নের মত
কৃষ্ণ নিশান উড়ে অবিরত;
স্বর্ণপতাকা মৃতে সম্ভাষি উড়িছে গর্ব্বভরে।
এসো সন্তান এসো এ পতাকা তলে
দেশের আশীষ লয়ে।
ধ্বংসের 'পরে উড়িছে নিশান ঐ
উজ্জ্বলতর হয়ে।

গান গাও হে বেলজিয়াম-বাসী, গান গাও।

Chantons, belges, chantons!

[জর্ম্মণীর মত পরাক্রান্ত জাতির সঙ্গে যোগ দিয়া, ধর্ম্মও ন্যায়ের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধে বেলজিয়ানরা পরাজিত হইলেও, সে পরাজয় যে জর্ম্মণীর অন্যায় পথে জয়ের অপেক্ষা গৌরবময়, এই গানে সেই কথাই বলা হইয়াছে]

গাও দেশবাসী সবে!
ক্ষরুক ক্ষতের মুখেতে রুধির,
হোক্ না কণ্ঠ ক্ষীণ,
ডুবাও কামান-নিনাদ গভীর,
রণ-হুঙ্কার ভীম।

গাও আজি পরাভবে,
পরাজয়ে মোরা বিজিত নহিরে,
মহিমা-দীপ্ত আজি,
পরাজয় মাঝে উঠিছে গভীরে
বিজয়-বাদ্য বাজি।

শারদ-সূর্য্য তলে
উপেখি অরির নীচ প্রলোভন
রেখেছি দেশের মান,
চাহি না স্বস্তি শান্তি, যখন
কলঙ্কিত সে দান।

ধ্বংসের পর জ্বলে
প্রচণ্ড তেজে যে অনল রাশি
বাজাও সেখানে ভেরী,
নাচো উল্লাসে হে স্বদেশবাসী,
গৌরব-ভূমি ঘেরি।

আগুন জ্বলিছে চোখে,
ঘূর্ণা নৃত্যে মাথা ঘুরে পড়ি
তবু নাচি ঘুরি ঘুরি,
শুকানো ডালের এ মশাল ধরি,
বাজায়ে ডঙ্কা, তুরী।

আয় ভাই ডাকি তোকে!
সমাধি রচিতে মৃতের লাগিয়া
এমন দিনই ত চাই!
বায়ু ভরে যবে উঠিছে কাঁপিয়া
তরুশির-গুলি ভাই!

শুষ্ক পত্র থেকে
মধু-সৌরভ পড়েছে ছড়ায়ে
সকল কানন ভরে,
মৃত্যু-পুরীতে আজি যেন যায়
সুবাস মৃতের তরে।

বাহুর উপর রেখে,
হে ধরণী! আজি দুলাও আদরে
মৃত সন্ততি দলে,
দাও গো শান্তি শ্রান্তি-কাতরে
তোমার বক্ষ-তলে।

ঘুমায়ে নীরবে সেথা
হয়ত দেখিবে স্বপ্ন-আবেশে
পুন রণ-অভিনয়
উদ্ধারি দেশ, শত্রুর দেশে
ঘোষিবে আপন জয়।

ভাবিয়া নিজেরে জেতা
প্রবেশিবে তারা লইয়া সেনানী
দর্পে শত্রুপুরে;
প্রেরণ করিবে অরি রাজধানী
অতল পাতালে—দূরে

গাও গো স্বদেশ-হারা!
ক্ষরুক ক্ষতের মুখেতে শোণিত
হোক্ না কণ্ঠ ক্ষীণ;
ডুবাও কামান-নিনাদ গভীর,
রণ-হুঙ্কার ভীম।

যদিও শোণিত-ধারা
ক্ষত মুখ হতে ঝরে অবিরল,
তবুও এ ভাঙ্গা বুকে
অরিপরে ঘৃণা রাখিব অটল
আশা-গীত গাব সুখে।

শারদ-আকাশ পরে
জ্বলিছে সূর্য্য, চলিব তাহার
উত্তাপ বহি শিরে
গাহিব দেশের গীতি বার বার
গৌরবভূমি ঘিরে।

গাই এস প্রাণ ভরে,
গরবের সেই কথা,—যে আমরা
করুণা নিয়েছি বরে',
প্রতিহিংসার বাসনা প্রখরা
দূরে ঠেলে গেছি সরে।

অন্ধ বেলজিয়ান ও তাহার পুত্র।

L' aveugle et son fils.

[বেলজিয়ানরা পরাজিত হইয়া যখন স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তখন অনেকে ইংলণ্ডে পলাইয়া আশ্রয় পাইয়াছিল। অন্ধ-পিতা ও তাহার পুত্রের কথোপকথনে, ইংলণ্ডের মহত্ত্ব ও তাহার প্রতি বেলজিয়ানদের কৃতজ্ঞতা পরিস্ফুট হইয়াছে]

"অরির কামান-ধ্বনি দূর হ'তে
পশেনা শ্রবণে আর;
কোথায় পলায়ে এসেছি পুত্র?
কহ শুনি একবার।"
—"এসেছি স্বাধীন দেশেতে, হে পিতা,
ইংলণ্ড নাম যার।"

"তরীর পালেতে বায়ুর আঘাতে
ভীম-হুঙ্কার নাই;
দৃঢ় তীর-ভূমি, কম্পিত এই
পদতলে যেন পাই।
দুঃখ অবসান হয়েছে কি?"—"পিতা
ব্রিটেনে পেয়েছি ঠাঁই।"

"সহানুভূতির কথা যেন শুনি
যদিও বুঝি না ভাষা;
মনে হয় যেন সুদূরে এসেছি
ছাড়িয়া দেশের আশা।
তবু চেনা স্বর শুনি যেন!"—"পিতা,
ব্রিটেনে পেয়েছি বাসা।"

"সুগন্ধভরা মুক্তির বায়ু
প্রতি নিঃশ্বাসে পাই;
এ ভাঙ্গা বীণায় স্বর্গের সুর
কেঁপে উঠে বুঝি তাই!"
"হে পিতা, আমরা স্বাধীন দেশের
বুকেতে পেয়েছি ঠাঁই।"

"নদী, পাখী আর তরুরাজি যেন
কহিছে দেশের কথা;
বিশ্রাম কেন মধুর এমন
কমে গেল কেন ব্যথা?"
"ইংলণ্ডেতে এসেছি গো পিতা,
তাই এই সজীবতা।"

"এস, এক সাথে নতজানু হয়ে
ওগো বাছা আমি তুমি,
ক্ষত-করে ছুঁই অতিথি-তীর্থ
ব্রিটেনের পূত-ভূমি;
স্মরিয়া স্বদেশ, এস তারপর
এদেশের মাটি চুমি।"

ইংলণ্ডে পলায়ন।

Fuite en Angleterre.

[জর্ম্মনীর অত্যাচারে, মেরী তাঁহার বৃদ্ধস্বামী যোসেফ ও শিশুপুত্র যীশুখৃষ্টকে লইয়া ইংলণ্ডে পলাইতেছেন, এই কথা কবিতাটিতে বলা হইয়াছে। কবিতাটির মর্ম্ম এই যে, অন্যায় অত্যাচার হইতে ধর্ম্ম দূরে চলিয়া যান]

আঁধার নিশীথে যায় দুরান্তে চলে,
নাহিক বিরাম, নাহি বিশ্রাম পথে;
শিশুটি চাপিয়া শূন্য-বক্ষ তলে,
পলায় জননী স্বামী সাথে হেথা হ'তে।

আঁধার নিশীথে যায় দুরান্তে চলে,
পশ্চাতে ফেলি নগর পল্লী যত;
ত্যজিয়া রক্ত-পিপাসু ঘাতক দলে,
আঘাতে যাদের কাঁদে অসহায় শত।

"কার তরে কোথা চলেছ বৃদ্ধ তুমি,
সঙ্গে লইয়া যুবতী পত্নী তব?"
—"লুকাতে শিশুটি, খুঁজি মোরা নরভূমি,
খুঁজিগো নূতন মানুষ, হৃদয় নব।"

নিশীথ আঁধারে সুনীলাম্বর তলে,
দ্রুতগতি ঐ পলায় তাহারা হায়!
চরণ-শব্দ ক্ষীণ হয় পলে পলে,
পদাঙ্কগুলি ধূলায় মিলায়ে যায়!

১৯১৫ সালে নববর্ষের কামনা (জর্ম্মণ সৈন্যের প্রতি)।

Vaux de Nouvel an, 1915,
A l'armée Allemande.

[অত্যাচারী জর্ম্মণ সৈন্যদের প্রতি, স্বদেশহারা উৎপীড়িত, বেলজিয়ানদের তপ্ত অভিশাপ]

প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাদের প্রাণ
আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাক্;
প্রতি পদক্ষেপে পদতলগুলি
জ্বলে পুড়ে হোক্ খাক্।

বিশ্ব-মাধুরী চোখে যেন আর
নাহি ফোটে পলে পলে ;
যাত্রা করিও দিবস রজনী
আঁধার গগন-তলে।

ছোট যে ফুলটি বিকশিত ওই
রয়েছে বেড়ার কোণে,
চেওনা সেদিকে ; অন্ধ হইয়া
চলে যাও নিজ মনে।

প্রেয়সীর বাণী, শিশুর কাহিনী
যে গান জাগায় প্রাণে,
সে গীতি, সে কথা, এ জীবনে যেন
না পশে তোদের কাণে।

অস্ত্র তোদের প্রোথিত হউক
আমাদের ভূমিতলে ;
মোদের নদীর বন্যা ডুবাক্
তোদের সৈন্য দলে।

প্রেত-বিভীষিকা নিশীথে তোদের
করুক বিরামহীন ;
হতের রুধির-স্মৃতি তোমাদের
ভরিয়া রাখুক দিন।

মোদের ভগ্ন-গৃহ-অবশেষ
পড়ুক তোদের শিরে ;
যাতনায় যেন জ্ঞানহারা হোস্,
তেজ নাহি পাস্ ফিরে।

ঝঞ্ঝাতাড়িত পশুর মতন
ছুটে যাস্ পালে পালে।
মোদের সকল দুঃখ ফিরিয়া
আসুক্ তোদের ভালে।

দীর্ঘ-জীবনে ইহলোকে তোরা
কাঁদিস্ গভীর শোকে,
তা' দেখে দেবতা করুণা করুন
তোমাদের পরলোকে।

ছোট দেশের বড় রাজার প্রতি।

Au grand roi d'un petit pays.

[বেলজিয়ম ছোট দেশ, কিন্তু তাহার অধিপতি রাজোচিত শৌর্য্য ও বীর্য্যে কাহারও অপেক্ষা ছোট নহেন। বেলজিয়ম-বাসী তাই সগর্ব্বে সেই রাজা ও স্বদেশের জন্য প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত]

চালাবে যেথায় চলিব সেথায় তুচ্ছ করিয়া প্রাণ!
তুষার-পাত ও বর্ষা ঠেলিয়া,
মাঠ-ঘাট-বন পিছনে ফেলিয়া,
চলিব আমরা তোমারি আদেশে
করিতে জীবন দান।

শিখাবে যে কাজ করিব তাহাই,
যেথা লবে যাব সুখে,
অনল ও অস্ত্র পদতলে দলে'
রণ-কোলাহল মাঝে যাব চলে,
ঝঞ্ঝণারব শত অস্ত্রের ভয় না জাগাবে বুকে!

তোমারি সঙ্গে চলিব আমরা তুচ্ছ করিয়া প্রাণ!
আহতের ক্ষীণ ক্রন্দন ঢেকে,
গর্জ্জে কামান যেথা থেকে থেকে
চলিব সেথায় তোমারি আদেশে
করিতে জীবন দান।

দূর করি দিয়া পীড়কে আমরা
ফিরিব দেশের মাঝে ;
বিমল আকাশে মাথা তুলি তার
দুর্গের চূড়া জাগিবে আবার!
প্রবেশিবে তুমি শত্রুর দেশে
বিজয়ী বীরের সাজে।

রক্ষক রাজা! তোমারে রক্ষা করুক জগৎপাতা!
হে মুষ্টিমেয় সেনানীর পতি!
বরিয়াছ মান উপেখিয়া ক্ষতি,
পাবে আশ্রয় বিভুর চরণে, দীন-আশ্রয়দাতা!

ক্ষুদ্র দেশাধিপতি! তোমা তরে জীবন করিব দান!
দেশ-গৌরব! বীর-ব্রত-ধারী!
বিশ্বপ্রেমের ভক্ত পূজারি!
তোমারি সঙ্গে চলিব আমরা তুচ্ছ করিয়া প্রাণ!

সৈন্যদের তামাকের জন্য।

Pour la pipe des soldats.

[M. Emile Cammaerts যুদ্ধের সময় যে কবিতার বইখানি প্রকাশিত করেন, এই কবিতাটি তাহার উৎসর্গ-পত্র। তাঁহার এই পুস্তকের আয় তিনি বেলজিয়ান সৈন্যদের তামাকের খরচের জন্য দিয়াছিলেন]

গোপন যে সব মরমের কথা
বলিতে মন না সরে,
সে সব আজিকে কবিতায় গেঁথে
সাজায়েছি থরে থরে ;
সরম ত্যজিয়া, হৃদয় আমার
মুক্ত করেছি হেন
সবার সমুখে, আজিকার দিনে,—
জান কি গো ভাই কেন?
রাখিতে দেশের গৌরব যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়,
শ্রান্তি-বিনোদে যেন গো তাহারা
তামাক একটু পায়!

নিভৃত-মনেরে বাহিরে এনেছি
দিনে দিনে পলে পলে,
অটল প্রেমের কাহিনী গেয়েছি
হাসি-অশ্রুর ছলে,
সব আবরণ ঘুচায়ে, হৃদয়
প্রকাশ করেছি হেন,
মুক্ত করেছি সবার সমুখে,—
জান কি গো ভাই কেন?
তারকা-খচিত আকাশের তলে
যুদ্ধ করিছে যারা,
শ্রান্তি-বিনোদে একটু তামাক
পায় যেন ওগো তারা!

আছে কি না আছে মধু-কল্পনা,
হয়ত বে-সুর বীণ্ ;
ছলা কলা নাই,—সরল এ গাথা
বুঝি তান-লয়-হীন!
হাসিবে হয়ত তোমরা, আমার
স্পর্দ্ধা দেখিয়া হেন!
তবুও হৃদয় খুলিয়া দিয়াছি
জান কি গো ভাই কেন?
কামানের গোলা-বর্ষণ মাঝে যুদ্ধ করিছে যারা,
শ্রান্তি-বিনোদে তামাক একটু
খেতে পায় যেন তারা!

শ্রীসুনীতি দেবী।

দেও-উমগা (মুঙ্গা)।

উমগা নগরের বিষয় উল্লেখ না করিলে দেওর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। উমগা প্রাচীন নগরী এবং বর্ত্তমান দেব রাজবংশের পূর্ব্বতন রাজধানী। এই নগর এখন পর্ব্বতোপরি ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়া অতীত কাহিনীর সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

দেওদেবক্রম সম্বন্ধে অনেক স্থানে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উমগার ইতিহাস কেহই লিখেন নাই। ইহা গয়াজেলায় অন্তর্গত আওরাঙ্গাবাদ সবডিবিজনস্থ রাণীগঞ্জের সন্নিকটে অবস্থিত।

উমগা দেও হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে

একটি প্রাচীন বৃহৎ জনস্থান হইতেছে। ইহা পর্ব্বতোপরি অবস্থিত; ইহার সীমার মধ্যে বায়ান্নটি প্রাচীন রাজগণের খনিত জলাশয় ও ঐ সংখ্যক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। এই মন্দির গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটি বিক্রমাব্দ ১৪৯৬ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় এবং রাজা ভৈরবেন্দ্রের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। ইহার সম্বন্ধে পরে বিবৃত করিতেছি। এই লিপি উমগার পর্ব্বতমালার উপরিস্থ গৌরী-শঙ্কর মন্দিরের গাত্রে সংযুক্ত আছে। এই লিপি ২২×১৫ ইঞ্চি প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদিত এবং ১৫ পংক্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে। এই লিপি আমার বন্ধু ৺পরমেশ্বর দয়াল বহু কষ্টে উদ্ধার করেন। * এই লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এইখান হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে, বনের মধ্যে, সান্ধাইল পর্ব্বতের উপর ষণ্ডেশ্বরনাথ শিব বিরাজ করিতেছেন। এই লিপি ১৫০০ সম্বতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই লিপির ভাষা আধুনিক দেবনাগর অক্ষরে। এই লিপির বয়স অনুসন্ধান করিলে মোটামুটি অবগত হওয়া যায় যে, দুর্দ্দমানর-পতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে উমগায় রাজ্যশ্রী পরিচালন করিতে ছিলেন। উমগায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পূর্ব্বদিগে, ফতেপুর পুলিষ ফাঁড়ির সন্নিকট, আর একটি ষণ্ডেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। উমগা হইতে পঁচিশ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে, কোঁচ নগর বিরাজ করিতেছে। কোঁচের মন্দির সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধযুগ অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। কোঁচের প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির উমগায় স্থাপয়িতা ভৈরবেন্দ্রের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এদেশে এক প্রাচীন প্রবাদ আছে। এইখানে প্রাপ্ত দুইটি লিপির মধ্যে চন্দ্রবংশীয় তেরটি রাজার বৃত্তান্তও কুর্শীনামা পাওয়া যায়।

* J. A. S. B. (N. S.) Vol. ii, p, 23.

উমগা-লিপি।

ওঁ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ আসী-দ্দুর্দ্দমদুঃখদাবদহনঃ সোমান্বয়ে দুর্দ্দমস্তৎপুত্রঃ কুলপালকো গুণনিধির্ন্নাম্না কুমারোঽ ভবৎ। তস্মাল্লক্ষ্মণপাল একসুকৃতী চন্দ্রস্ততশ্চন্দ্র (ৎপ) দ্মাক্ষোনয়পাল একশরণঃ সপ্তেশইত্যাত্মকঃ ॥১। যজ্ঞে যোঽভয়দেব এক পুরুষোমল্লঃ প্রসূত (স্ত) স্তস্মাৎ কেশবভক্তিযুক্তি-নিপুণঃ কেশীশ্বরো ধার্ম্মিকঃ। তৎসূনুর্ন্নরসিংহ এব রিপুজিস্তানুর্ম্মহীয়াং স্ততঃ সোমঃ সোমকুলাব-তন্স পরমোব্রহ্মাণ্ডদঃ কোটিদঃ ॥২। তস্মাল্লোক বিবর্জ্জনোনৃপগুরুর্ব্বংশস্য কর্ত্তা প্রভুঃ শ্রেষ্ঠঃ সদ্ব (ম্বলো) কপো বসুমতী যেনাস্তি-রাজন্বতী। দীনত্রাণ তলাগয়াগদিবিষৎপ্রাসাদ-কৃদ্ধর্ম্মবিচ্ছ্রী মন্ত্রৈরবভূপতির্গ্গজপতিঃ কীর্ত্ত্যা-চরামৌপমঃ ॥ ৩। উমাং মহেশংসগণং গণেশং সংস্থাপ্য বেধাবিদধে বিধিজ্ঞঃ। নদাদিবর্য্যৈরু-মগং গুণাঢ্যং সোমান্বয়ানামিহ পত্তনং চ ॥ ৪। গিরৌ গিরীশং গিরিজাং গণেশং খথেষুচন্দ্রে খলু বিক্রমাব্দে॥ জ্যৈষ্ঠেঽসিতেমাসতিথৌচ চন্দ্রে প্রত্যষ্টি পড়ৈরব (should be প্রাতি-ষ্ঠিপৎ) একভূপঃ ॥ ৫। অন্নাঙ্কেনাপি সম্বত ১৫০০ ॥ কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ। কারয়িত্বা হরের্দ্ধাম ধূতপাপোদিবং ব্রজেৎ ॥ ৬। তীর্থে চায়তনে পুণ্যে সি (দ্ধক্ষে) ত্রেতথাশ্রমে। কর্ত্তুরায়তনং বিষ্ণোর্যথোক্তাত্রি-গুণং ফলং ॥৭। ফলশতগুণং শৈলে (যথো)-ক্তাৎ পরিকীর্ত্তিতং। সহস্রগুণিতং শৃঙ্গে কর্ত্তুর্দেবালয় স্য চ ॥ ৮। শুভমস্তু সর্ব্বম্॥

দেওরাজ্যের মধ্যে উমগা নগরীতে প্রাপ্ত দুইটি প্রস্তর লিপির মধ্যে উপরোক্তটি ক্ষুদ্রতর লিপি ও প্রথমটি বৃহৎত্তর আটাশ শ্লোকের তিন হাত লম্বা ও দেড় হাত চৌড়া প্রস্তর খণ্ডে মহারাজ ভৈরবেন্দ্র স্বীয় বংশতালিকা বিক্রম সম্বৎ ১৪৯৬ সালে খোদিত করিয়া মন্দির গাত্রে আঁটিবার স্থান পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই বৃহত্তর লিপি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ ও মন্দিরস্তূপ মধ্যে অনেক প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। কিন্তু বহুকালের "কাই ও ছাতা" জমিবার কারণ সেগুলির সহজে পাঠোদ্ধার করা যায় না। পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে স্থানীয় লোক লইয়া একটা পনর দিন ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

মহাভারত-মঞ্জরী।

আদিপর্ব্ব।

চতুর্থ অধ্যায়—ভীষ্মদেব।

মহাভারতের কাব্যপটে ভীষ্মদেব অতি উজ্জ্বল, অতি মনোহর চিত্র। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম ভারতের গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইবে। ভীষ্ম উপাধি; আসল নাম, দেবব্রত। তিনি রাজা শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি প্রথম বয়সে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়া উঠেন। যৌবনে যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়া ভারত-বিখ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ বীরত্ব অপেক্ষা, পিতৃভক্তিই তাঁহাকে চিরবরেণ্য ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার পিতা একদিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি বনে বনে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী খেয়া নৌকা চালাইতেছে, পথিকদিগকে যমুনা নদীর এক পার হইতে অন্য পারে লইয়া যাইতেছে। তাহার শরীর হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইতেছে। রাজা মুগ্ধ হইলেন, পরাজিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী উত্তর করিল, "আমি ধীবর কন্যা, নাম সত্যবতী।"

ইহারই গর্ভে পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা শান্তনু তখনই তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন, সত্যবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। ধীবর বলিল, "তাহা ত সুখের কথা, সম্মানের কথা। কিন্তু আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই সিংহাসন দিতে হইবে।" রাজা উত্তর করিলেন, "তাহা অসম্ভব। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রতই রাজা হইবে।" ধীবর বিবাহ দিতে অসম্মত হইল। রাজা নিরাশ ও নিরানন্দ মনে গৃহে গমন করিলেন।

ক্রমে একথা দেবব্রত জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার পিতা কি আমার জন্য অসুখী হইবেন? তাঁহার স্নেহ ভালবাসার এই পরিণাম হইবে? দেবব্রত কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। অবিলম্বে সেই ধীবরের গৃহে উপনীত হইলেন, পূর্ব্ব প্রস্তাব পুনরায় তুলিলেন। ধীবর উত্তর করিল, "সে ত আনন্দের কথা। কিন্তু আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই রাজ্য দিতে হইবে।" অমনি দেবব্রত

বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কখনও পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিব না।" তখন বুদ্ধিমান ধীবর হাসিয়া উত্তর করিল, "আপনি না লইতে পারেন, কিন্তু আপনার পুত্রগণ পরিত্যাগ করিবে কেন?" কুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কখনও বিবাহ করিব না।" ধীবর বিস্মিত হইল, মুগ্ধ হইল। তখনই সত্যবতীকে তথায় আনয়ন করিল। দেবব্রত তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া রথে তুলিয়া লইলেন, অচিরে হস্তিনায় লইয়া আসিলেন। রাজা শান্তনু তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বে ভারতের সকল জাতিই সকল জাতির কন্যা বিবাহ করিত *।

দেবব্রতের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এজন্য রাজা শান্তনু তাঁহাকে 'ভীষ্ম' উপাধি প্রদান করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা না হইলে মৃত্যু হইবে না, এই বরও দিলেন। ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছেন।

এই রাণী সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র জন্মিল। বলিয়াছি, তাঁহাদের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। শান্তনুর মৃত্যুরপরে তাহাদিগকেই ভীষ্ম একে একে রাজা করিয়াছিলেন। তাহাদের অল্প বয়স বলিয়া, ভীষ্ম, সত্যবতীর মতানুসারে, রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। তিনি আজীবন বেতন-ভোগী অমাত্যের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াছেন, কখনও স্বীয় মতকে প্রবল করিতে চেষ্টা পান নাই। তিনি পিতার সুখের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন।

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইলে, হস্তিনার সিংহাসন শূন্য হইল। কুরুবংশ নির্ব্বংশ হইতে চলিল। তখন রাণী সত্যবতী ভীষ্মকে বিবাহ করিতে ও রাজা হইতে কত অনুরোধ করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "মা, আপনার বিবাহ সময়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা কোন কারণেই ভঙ্গ করিতে পারিব না। পৃথিবী গন্ধহীন হইবে, জল রস বর্জ্জন করিবে, বায়ু স্পর্শগুণ শূন্য হইবে, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইবে, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিব না। সেই সত্যের তুলনায় কুরুবংশ, কৌরব-রাজ অতি সামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর।" ধন্য ভীষ্মদেব! ধন্য তোমার চরিত্র! চরিত্র যার, পৃথিবী তার।

পঞ্চম অধ্যায়—কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা।

পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণ কৃপাচার্য্যের নিকট নানাবিধ শাস্ত্র ও যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এখন তাঁহারা মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের নিকট উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। সে সময় এক ভীষ্মদেবের নীচেই দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার যশে আকৃষ্ট হইয়া কর্ণ প্রভৃতি অপরেও তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন রজনীতেও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া, অন্ধকারে অদৃশ্য লক্ষ্যভেদ করেন, উভয় হস্তে তুল্যরূপে বাণ বর্ষণ অভ্যাস করেন। ক্রমে অর্জ্জুন ও কর্ণ ধনুর্বিদ্যায় এবং ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে আর সকলকে অতিক্রম করিলেন।

একদিন ছাত্রগণ মৃগয়া করিতে বনে

* এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে "বিবাহ" দ্রষ্টব্য।

গিয়াছেন। তথায় অর্জ্জুন দেখিলেন, একলব্য নামে এক নিষাদ-পুত্র অবিরাম বাণ বর্ষণ করিতেছে, অবিরাম জ্যা-নির্ঘোষ নির্গত হইতেছে। অর্জ্জুন বিস্মিত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া আচার্য্যকে বলিলেন,—"গুরুদেব, আপনি বলিয়াছিলেন, আমিই ধনুর্দ্ধারীগণের অগ্রগণ্য। কিন্তু দেখিলাম, আপনার শিষ্য একলব্য আমাকেও অতিক্রম করিয়াছে।" আচার্য্য উহা শুনিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া সেই বনে উপস্থিত হইলেন। একলব্যের নিকট তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলী গুরু-দক্ষিণা চাহিলেন। একলব্য তখনই তাহা বাম হস্তদ্বারা ছেদন করিয়া গুরুদেবকে প্রদান করিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে দরবিগলিত ধারে রুধির নির্গত হইতে লাগিল, তৎপ্রতি তিনি একবারও দৃক্‌পাত করিলেন না। সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আচার্য্য ও অর্জ্জুন চলিয়া আসিলেন। একলব্য আবার অবশিষ্ট অঙ্গুলী দ্বারা বাণ বর্ষণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং চেষ্টা ও সাধনাদ্বারা অচিরে মহাধনুর্দ্ধারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। সাধনায় কি না হয়? আজ ভারতে সে সাধনা কোথায়?

দ্রোণাচার্য্য একদিন ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতে চাহিলেন। তিনি মৃত্তিকা দ্বারা একটী পাখী নির্ম্মাণ করিয়া এক বৃক্ষের উপর বসাইয়া রাখিলেন। পরে যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি সমুদয় ছাত্রগণকে একে একে আনিয়া সেই পাখীর মস্তক ছেদনার্থ লক্ষ্য স্থির করিতে বলিলেন। লক্ষ্য স্থির হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি সকল ছাত্রই বলিলেন, "ঐ পাখী, বৃক্ষ ও আপনাকে দেখিতেছি।" তাহাতে আচার্য্য বিরক্ত হইয়া, সর্ব্বশেষে অর্জ্জুনকে ডাকিলেন। তিনি গুরুদেবের আদেশে লক্ষ্যভেদার্থ বাণ স্থির করিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুদেব তাঁহাকেও সেই প্রশ্ন করিলেন। অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "একমাত্র ঐ পাখী দেখিতেছি।" তাহাতে আচার্য্য আনন্দিত হইয়া ঐ পাখীর মস্তক ছেদন করিতে বলিলেন। অর্জ্জুন অমনি বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে দ্রোণাচার্য্য একদিন রাজসভায় গিয়া বলিলেন, "কুমারগণের শিক্ষা শেষ হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া সকলই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আজ ভীষ্মদেব কুমারগণের শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এক বিস্তৃত প্রান্তরে মনোহর মঞ্চ ও গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। আজ দলে দলে নাগরিকগণ তথায় সমবেত হইতেছে। দ্রোণাচার্য্যের শুক্ল কেশ, শুক্ল বেশ, শুক্ল উপবীত, শুক্ল শ্মশ্রু, শুক্ল মাল্য, শুক্ল চন্দন-চর্চ্চিত কৃষ্ণকায় সকলে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে *। ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মদেব, বিদুর, সঞ্জয়, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই আগমন করিলেন। গান্ধারী ও কুন্তী আসিলেন। অন্যান্য রাজ-মহিষীগণও দাসীগণ সহ আসিয়া মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দেবপত্নীরা সুমেরু-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। † পূর্ব্বে ভারতে অবরোধ-প্রথা ছিল না। ‡

ক্রমে রঙ্গস্থল লোকে পূর্ণ হইল। কুমারগণ অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব

* আদিপর্ব্ব ১৩৪—১৯। দ্রোণাচার্য্য এখনই বৃদ্ধ! † আদিপর্ব্ব ১৩৪—১৩।

‡ এসম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে "অবরোধ-প্রথা" দ্রষ্টব্য।

রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা কৃত্রিম-যুদ্ধ করিতে করিতে প্রকৃত-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে যথা-শক্তি গদার প্রহার করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য তাহা দেখিয়া স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামা দ্বারা তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। দুর্য্যোধন তখন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিকৃষ্ট ভীম তাঁহার ন্যায় রাজপুত্রকে প্রহার করিয়াছে বলিয়া অতি অভিমানী অধীর হইতে লাগিলেন।

এখন অর্জ্জুন বিচিত্র রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। কখনও দ্রুতগামী রথোপরি, কখনও ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও ভূতলে থাকিয়া পলকে পলকে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর লক্ষ্য ভেদ করিতে লাগিলেন। সমবেত সকলেই তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহা দুর্য্যোধনের অসহ্য হইতে লাগিল।

এমন সময় কর্ণ আসিলেন। তিনি অর্জ্জুনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "অপেক্ষা কর, তোমাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রণকৌশল দেখাইব।" এই বলিয়া বিবিধ প্রকারের রণনৈপুণ্য দেখাইলেন। দুর্য্যোধন তাহাতে আনন্দিত হইয়া কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ তুমি আসিয়াছ। আমি তোমার অধীন। তুমি এই কৌরব-রাজ্য ইচ্ছানুসারে উপভোগ কর, আর শত্রুগণের মস্তকে পদাঘাত কর।"

কর্ণ তাহাতে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। অর্জ্জুনকে বলিলেন, "আজ নিশ্চয়ই তোমার শিরচ্ছেদ করিব। এস, আমার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" দুর্য্যোধন কর্ণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই রঙ্গভূমি দুই দলে বিভক্ত হইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃপাচার্য্য বুঝিলেন, আত্মদ্রোহ উপস্থিত-প্রায়। তখন তিনি অগ্রসর হইয়া কর্ণকে বলিলেন, "রাজপুত্রেরা কখনও নীচ-বংশের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন না। তুমি কোন্ বংশে জন্মিয়াছ, অগ্রে বল; পরে বিবেচনা করা যাইবে, তোমার সহিত অর্জ্জুনের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সম্ভবপর কিনা।"

তাহা শুনিয়া কর্ণ মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন ভাবিলেন, এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কর্ণ এখনই অর্জ্জুনকে নিহত করিতে পারিবেন, এখনই পাণ্ডবগৌরব অস্তমিত হইবে, আজই আমি নিরাপদ হইব। তিনি অতি দর্পে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আচার্য্য যাহা বলিতেছেন, তাহাই যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের নিয়ম হয়, তাহা হইলে আমি কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের রাজা করিলাম। এখন তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন।" দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় অনুচরগণ তখনই অভিষেকের দ্রব্যাদি তথায় আনিল, তখনই কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। দুর্য্যোধন, অঙ্গরাজ্য কর্ণকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে, একবারও পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। পিতাও তাঁহার কার্য্যে কোন বাধা দিলেন না।

কর্ণের বৃদ্ধ পিতা, সূত জাতীয় অধিরথ সারথি শুনিলেন যে তাঁহার প্রাণের পুত্র রাজা হইয়াছে। অমনি তিনি দ্রুতপদে, স্খলিত বস্ত্রে, "কর্ণ! কর্ণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে সেই মহাসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা কর্ণ, দীন হীন পিতাকে অস্বীকার করিলেন না। বরং তিনি তখনই মস্তক অবনত করিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। পুত্র সত্যই রাজ্য পাইয়াছে, সত্যই রাজা হইয়াছে, জানিয়া দরিদ্র পিতা

আনন্দে বিহ্বল হইলেন। পুত্রকে সস্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

এদিকে কুন্তীদেবী, কর্ণ আসিবামাত্র এক দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। যতই দেখিতেছিলেন, ততই দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। এখন কর্ণার্জ্জুন যুদ্ধ আরম্ভ-প্রায় দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। বিদুর ও পরিচারিকাগণ চন্দনজল সেচন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। এখন কুন্তীদেবী নীরবে, উদ্বিগ্ন মনে বসিয়া রহিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ নিবারণের উপায় কি?

এদিকে ভীম, কর্ণের আস্ফালন ও দর্প দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন, "তুমি এই সামান্য সারথির পুত্র হইয়া এত গর্ব্ব করিতেছ! তুমি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবারও উপযুক্ত নহ।" তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্, তোদের জন্মের কথাও সকলের জানা আছে?" অমনি পাণ্ডবেরা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। উভয় পক্ষ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় সূর্য্যাস্ত হইল, কাযেই বিবাদ আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের হস্ত-ধারণ করিয়া অতিদর্পে রঙ্গস্থল হইতে চলিয়া গেলেন। কর্ণ এখন হইতে পাণ্ডব-বিদ্বেষে পূর্ণ হইলেন। কাযেই দুর্য্যোধনের মিত্র ও মন্ত্রী হইলেন। আর শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বন্ধুগণ দুর্য্যোধনের নীচ-প্রবৃত্তির মূলে কুপরামর্শের সলিল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। হায়, কুসংসর্গের ন্যায় সর্ব্বনাশের কারণ আর কিছুই নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়—মহাবীর দ্রোণাচার্য্য।

এই কি সেই দেশ, যেখানে নিঃস্বার্থপর, নিষ্কাম ব্রাহ্মণ-বংশেও মহাবীরের আবির্ভাব হইত? পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা কি চিরদিনের জন্য এ দেশ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন? নতুবা এদেশের এত অধঃপতন হইবে কেন?

দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। তিনি অসাধারণ বীর ছিলেন। পরশুরামের নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি দুর্লভ অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়া অতুলনীয় হইয়া উঠেন।

কৃপাচার্য্য ও তাঁহার ভগিনীকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রতিপালন করিয়াছিলেন। দ্রোণ কৃপাচার্য্যের ভগিনীকে বিবাহ করিলেন। তাহার ফল, পুত্র অশ্বত্থামা।

দ্রোণাচার্য্য অতি দরিদ্র। একদিন অশ্বত্থামা, ধনীর পুত্রগণকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া, দুগ্ধের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য সমুদয় গ্রাম অনুসন্ধান করিয়াও দুগ্ধ পাইলেন না। তখন অন্য বালকেরা জলে পিঠালী গুলিয়া, তাহাই দুগ্ধ বলিয়া অশ্বত্থামাকে দিল। বালক তাহাই পান করিয়া, "আমি দুগ্ধ খাইয়াছি," বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন সেই বালকেরা দ্রোণকে বিদ্রূপ করিল। বলিল, "দ্রোণ এতই দরিদ্র যে পুত্রকে একটু দুগ্ধও দিতে পারেন না!" তাহা শুনিয়া দ্রোণের মনে ঘৃণা হইল। তিনি তখনই অর্থের অন্বেষণে নির্গত হইলেন।

কোথায় যাইবেন? ভাবিলেন, "পাঞ্চাল রাজকুমার দ্রুপদ আমার সহপাঠী ছিলেন, পাঠ্যাবস্থায় আমাকে "সখা," "সখা", বলিয়া ডাকিতেন। অর্দ্ধেক রাজ্যও দিতে চাহিয়া-

ছিলেন। এখন তিনি রাজা; তাঁহার নিকট গেলে অন্ততঃ দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হইবে"। এই ভাবিয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু যেই তাঁহার সভায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে 'সখা' বলিয়া ডাকিলেন, তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "যেমন মূর্খ পণ্ডিতের সখা হইতে পারে না, কাপুরুষ যেমন বীরপুরুষের সখা হইতে পারে না, তেমনি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনীর সখা হইতে পারে না। অগ্রে রাজা হও, পরে রাজার সহিত সখ্যতা করিতে আসিও।" এই বলিয়া তিনি দ্রোণাচার্য্যকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মহাবীরকে আশ্রয় দিলে তিনিও যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন, অহঙ্কারে তাহা বিস্মৃত হইলেন।

দ্রোণাচার্য্য এখন হস্তিনায় আসিয়া কৃপাচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সভায় আনিয়া, তাঁহার উপর মহাসম্মান বর্ষণ করিলেন। গুণী ভিন্ন গুণীর মর্ম্মকে বুঝিবে? এখন ভীষ্মদেব পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণের শিক্ষার ভার দ্রোণের উপর অর্পণ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য সে কার্য্য কি ভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এখন তিনি ছাত্রগণের নিকট গুরু-দক্ষিণা চাহিলেন। বলিলেন, "তোমরা দ্রুপদ-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দীভাবে লইয়া আসিবে, এই দক্ষিণা চাহি।" ছাত্রগণ সম্মত হইয়া বহু কৌরবসৈন্য-সহ নির্গত হইল।

কিন্তু অহঙ্কার-দীপ্ত কৌরব-কুমারগণ কি দরিদ্র পাণ্ডবগণের সহায়তা লইয়া দ্রুপদ-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবে? তাহা অসম্ভব। তাই কৌরবেরা পাণ্ডবগণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া, পশ্চাতে রাখিয়া, দ্রুপদরাজকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া পলাইয়া আসিয়া, অবনত মস্তকে পুনরায় পাণ্ডবগণের সহিত মিলিলেন। পাণ্ডবেরা যখন দেখিলেন যে দুর্য্যোধন ও কর্ণের দর্প খর্ব্ব হইয়াছে, তখন অগ্রসর হইয়া মহাপরাক্রমে দ্রুপদ-রাজকে আক্রমণ করিলেন। তিনি অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইলেন। ভীম তাঁহার সৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিষেধ করিলেন*। পরে দ্রুপদরাজকে বন্দী করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট লইয়া আসিলেন। দ্রোণ বলিলেন, "রাজন্, ভয় নাই। ক্ষত্রিয়ের বাক্য নবনী তুল্য কোমল ও মধুর। কিন্তু হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ। আর ব্রাহ্মণের বাক্য তীক্ষ্ণধার-তুল্য কিন্তু হৃদয় নবনী-বৎ কোমল, সহজেই দ্রব হয়†। এজন্য ব্রাহ্মণের স্বভাবই ক্ষমা করা! কিন্তু তুমিত রাজা না হইলে দরিদ্রের সহিত সখ্যতা করিবে না! এজন্য আমি গঙ্গার উত্তর তীরবর্ত্তী তোমার অর্দ্ধ-রাজ্য গ্রহণ করিলাম, আর দক্ষিণ তীর-স্থিত অর্দ্ধ-রাজ্য তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। তুমি এখন আমার সহিত সখ্যতা করিতে প্রস্তুত কি?" দ্রুপদ ভাবিলেন, সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হইলে, পণ্ডিতগণ অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়াও, অপরার্দ্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি মুখে সৌজন্য ও সখ্যতা প্রকাশ করিয়া, অর্দ্ধরাজ্য লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু সত্য সত্যই কি দ্রুপদ দ্রোণের বন্ধু হইল? তাহাও কি সম্ভব? তিনি কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, দিবা রাত্রি ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি দিন তাঁহার প্রাণে প্রতিহিংসানল জ্বলিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক অগ্নিবর্ণ পুত্র হইল। তৎপরে দ্রৌপদী নামে এক কন্যা জন্মিল। ইহাদিগের পূর্ব্বে দ্রুপদরাজের শিখণ্ডী নামে এক সন্তান হইয়াছিল। কালে দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়া অসাধারণ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন‡। রাজা দ্রুপদ এইরূপে দুই মহাবল সন্তান পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিলেন। যাহার দ্বারা পিতৃকুল উজ্জ্বল হয়, সে-ই প্রকৃত সন্তান। আর সকলে কুষ্মাণ্ড মাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

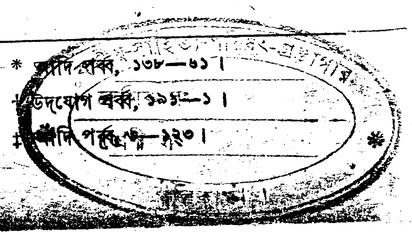

* আদি পর্ব্ব, ১৩৮—৪১।
† উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৯৫—১।
‡ আদি পর্ব্ব, ৬—১২৩।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের নিকটে কয়েকটী কথা।

(১)

প্রিয় ছাত্রবর্গ—

আজ কয়েকদিন হইতে তোমাদের মধ্যে non-co-operation-নীতির অঙ্গ-স্বরূপ কলেজ-বর্জ্জন লইয়া, বিশেষ একটা উন্মাদনার ভাব লক্ষিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে আমি কয়েকটী কথা বলিব। তোমরা আমার কথাগুলি নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিয়া দেখিবে, এ আশা আমার আছে। চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে, আমাদের বংশ অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। চরিত্রের পবিত্রতা এবং অধ্যাপনাকেই যাঁহারা জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বংশে উদ্ভূত হইয়া, আমিও, তোমাদের অধ্যাপকতার কার্য্যে, প্রায় বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি। এই জন্যই, আমার মনে হয় যে তোমাদিগকে এই মহা সন্ধিক্ষণে কিছু বলিবার আমার অধিকার আছে; এবং তোমরাও উত্তেজনার মুখে, কথাগুলি উড়াইয়া না দিয়া, ভাবিয়া দেখিবে।

দেশের যাঁহারা নেতা, অপর গুণের মধ্যে, তাঁহাদের একটী গুণ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে থাকা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। সেইগুণটী—তাঁহাদের 'মতের' স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা। যাঁহাদের উপদিষ্ট পথে চালিত হইতে ইচ্ছা করিয়া, তোমরা, যাঁহাদের কথায়, জীবনের এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারে আপনাদিগকে ঢালিয়া দিতেছ, তাঁহারা যে কর্ত্তব্য-কার্য্যটীর নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন, সেটী সুস্পষ্ট, সন্দেহ-বর্জ্জিত এবং সর্ব্বপ্রকার মত-দ্বৈধ-পরিশূন্য হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আমি প্রথম হইতেই ইহাঁদের মতের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি; ইহাঁরা কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া তোমাদিগকে কি কার্য্য করিতে বলেন, তৎ-সম্বন্ধে কোনই স্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায় না; যতই ভাবিয়া দেখা যায়, ততই ইহাঁদের কথায় পরস্পর বিরোধ ও মত-দ্বৈধই ফুটিয়া উঠে। কেন আমার মনে কোন স্পষ্ট আভাস মুদ্রিত হইতেছে না, একে একে তোমাদিগকে সেই কথাটাই বলিব।

সর্ব্বপ্রথমে "নায়কের" কথাটাই বলিব। এই পত্রিকার সম্পাদক যখন তোমাদের দ্বারা আহূত সভা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তোমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন এবং তোমরাও যখন তাঁহার পরামর্শ শুনিবার নিমিত্তই তাঁহাকে সভায় আহ্বান করিয়াছ,—তখন, তাঁহাকেও আমি তোমাদের নেতৃ-স্থানীয় বলিয়া ধরিয়া লইব। ইনি, তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন, তাহা অবশ্যই তোমাদের গ্রহণীয়। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। ইনি ইহাঁর নিজের মতের স্থিরতা ও দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন কি না? যদি দেখিতে পাই যে, ইনি আপন মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইলে, আজ ইনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিতেছেন, সেটী যে ইহাঁর সুচিন্তিতপূর্ব্ব দৃঢ় মত, তাহা যে পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইবে না,—তদ্বিষয়ে স্থিরতা থাকে কৈ? কেন এরূপ সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইতেছে, তাহা বলিতেছি।

বেশী দিনের কথা নহে। যখন আলিগড় কলেজে ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছাত্রবর্গের মধ্যে কলেজ-বর্জ্জনের আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে 'নায়ক'-সম্পাদক, তাঁহার দৈনিক 'নায়কে', অতীব সুস্পষ্ট-ভাষায়, বাঙ্গলাদেশের ছাত্রবর্গ 'ঠকিয়া শিখিয়াছে" বলিয়া, এ দেশে যে ঐ আন্দোলন ফল-প্রসূ হইবে না, এই কথাই বলিয়াছিলেন; এবং বাঙ্গলার ছাত্রবর্গকে কলেজ বর্জ্জন-নীতি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইবারই পরামর্শ দিয়াছিলেন। যে সময়ে নাগপুরের কংগ্রেসের সভাপতি ছাত্রবর্গের কলেজ-বর্জ্জন-নীতির বিরুদ্ধে আপনার মন্তব্য উদ্‌ঘোষিত করিয়াছিলেন, তখনও 'নায়কে', সভাপতির মতের সহিত নিজের মতেরও মিল আছে বলিয়া, সম্পাদক, আমাদিগকে স্পষ্ট-ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন। সম্পাদক বলিয়াছিলেন—

"তিনি (শ্রীযুত বিজয় রাঘব) ছাত্রদিগের স্কুল-কলেজ বর্জ্জনের বিরোধী। * * * বিশেষতঃ ছাত্রদিগের বিদ্যালয়-পরিত্যাগের বিরুদ্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, কেহই তাহার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। * * * ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া বয়াটে হইয়া যাইলে কি লাভ হইবে? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। তাই আমরাও এই বিষয়ে সভাপতির সহিত একমত"— ইত্যাদি। ১৯শে পৌষের 'নায়ক'।

আর, আজ যদি সেই 'নায়কে'র সম্পাদক,—যিনি, তোমরা কলেজ ছাড়িলে "বখাটে" হইয়া যাইবে বলিয়াছিলেন—তোমাদিগকে কলেজ ছাড়িবার পরামর্শ দেন ও তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেন,—তবে তাঁহার কোন্ মতটীকে আমরা ঠিক্ মত বলিয়া ধরিয়া লইব? পূর্ব্বের কথিত মতটী, না এখনকার কথিত মতটী?

এই সম্পর্কে আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। এই কিছুদিন পূর্ব্বে, যে সময়ে গো-বধ-নিবারণের আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং অনেক মুসলমানও সেই আন্দোলনে যোগ দিতে লাগিলেন, ঠিক্ ঐ সময়ে 'নায়কে' হঠাৎ "গো-রক্ষণী-সভা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ সম্পাদকীয় স্তম্ভে বাহির হইল। এই প্রবন্ধে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে,—

"অতি পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এত অধিক পরিমাণে গো-হত্যা হইত যে, তাহা শুনিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাহার পরিমাণে আজকাল যে গো-হত্যা হয় তাহা কিছুই নহে।"

এই কথা বলিয়া, বেদের সংহিতা-ভাগ, ব্রাহ্মণ-ভাগ ও সূত্রাদি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া, "সকলকে অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিতে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে" বলা হয়। এই প্রবন্ধটী পড়িলে ইহাই মনে অনিবার্য্যরূপে ফুটিয়া উঠে যে, প্রাচীনকালে যখন হিন্দুরা "অধিক পরিমাণে" গো-হত্যা করিতেন, তখন এ আন্দোলনটী নিরর্থক।

ইহারই কিছুদিন পরে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যখন প্রাচীনকালের গো-হত্যা-সম্পর্কিত বচনগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে বসিলেন এবং বোধ করি যখন চারিদিকে নিন্দা ঘোষিত হইতে লাগিল, তখন 'নায়কে,' ঐ প্রবন্ধের ভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা প্রকাশিত হইল। তখন 'নায়কে' লেখা হইল—

"কেন যে এমন সময়ে আমরা বেদে গো-হত্যার নানা (?) কথার উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর আর কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রে আপনি ফুটিয়া উঠিবে * * * এখন কোন হিন্দু যেন এমন রব না তোলেন যে, হিন্দু বৈদিক-যুগে গো-খাদক ছিলেন"—ইত্যাদি। (৩০শে আশ্বিনের 'নায়ক')।

তোমরা অবশ্যই দেখিতে পাইতেছ যে, 'নায়ক' কেমন করিয়া আপনার মতের পরিবর্ত্তন করিয়া লয়েন! ইহাঁর কোন্ কথাটা

তোমরা খাঁটি স্থির বলিয়া ধরিয়া লইবে; যাঁহার মতের এরূপ চঞ্চলতা, তাঁহার নির্দ্দেশিত মত-দ্বয়ের মধ্যে, তোমরা কোন্‌টীকে আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে?

প্রিয় ছাত্রবর্গ! তোমাদের যাঁহারা অপরাপর নেতৃ-স্থানীয়, তাঁহাদের মধ্যেও, তোমাদের এই কলেজ-বর্জ্জন ও ইউনিভার্সিটী-বর্জ্জন সম্বন্ধে মতের ঐক্য দেখিতে পাইতেছি না। মহাত্মা গান্ধী কি প্রকার 'উদ্দেশ্য' লইয়া কলেজ-বর্জ্জন-নীতিটী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন? আমরা সকলেই জানি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অচল করিবার উদ্দেশ্যই তাঁহার মুখ্য-উদ্দেশ্য। তাঁহার মতে, যে গভর্ণমেণ্ট, জাতির অবমাননা করিয়াছেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া শপথ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাদৃশ গভর্ণমেণ্টের সংস্পর্শে আসিলে পাপ-গ্রস্ত হইতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কি, মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত এই মহান্ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই কলেজ-ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ? যদি উহাই তোমাদিগের প্রাণের একমাত্র প্রধান লক্ষ্য হইত, তবে তোমরা কেন ন্যাশন্যাল-কলেজ স্থাপনের জন্য সোৎকণ্ঠ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছ? ইহা ত এই আন্দোলনের মুখ্য-উদ্দেশ্য নহে। সহস্র সহস্র ছাত্র, কলেজ ছাড়িলেও ত গভর্ণমেণ্টকে অচল করিতে পারা যাইবে না। মহাত্মা গান্ধী ত ন্যাশন্যাল কলেজ স্থাপনকে গৌণ অবান্তর-কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

আবার দেখ, এ বৎসর যিনি নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও ত দেশবাসীর নেতাই বলিতে হইবে। তাঁহার নিজের মত কি ছিল, মনে করিয়া দেখ ত। ভোটে তাঁহার নিজের মত টিকে নাই সত্য, কিন্তু ভোট-দাতারা ত দেশের 'নেতা' নহেন। নেতা তিনিই। তোমরা শুনিয়াছ, এই সভাপতি, সুস্পষ্ট-ভাষায়, তোমাদিগকে কলেজ ছাড়িয়া দিতে নিষেধ-বার্ত্তাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা এ স্থলেও, দুই জন নেতৃ-স্থানীয় মহাপুরুষের, দুই প্রকার মত ও দুই প্রকার উপদেশ পাইতেছি।

আবার দেখ, লালা লাজপত রায়কেও কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরণ করা হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকেও দেশবাসীর নেতা বলিব। ইনিও কলেজ-পরিত্যাগের অনুকূল মত প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি তিনি বলিতেছেন যে, ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের পক্ষে, কলেজ-পরিত্যাগ আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এ স্থলেও আমরা মতের স্থিরতা দেখিতেছি না।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয় আত্ম-ত্যাগের মহান্ আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে কলেজ-ত্যাগের বিধি দিয়াছেন। কিন্তু একটী কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিব। তাঁহার মতেও, "স্বরাজ" লাভই মুখ্য ও প্রধান লক্ষ্য; কলেজ ত্যাগ ইহার আনুষঙ্গিক মাত্র। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও "স্বরাজ" প্রাপ্তিকেই তোমাদের মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া ধরিতে বলিতেছেন। কোন কোন নেতা আবার, তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া একথাও বলিয়া দিতেছেন যে,—কলেজ ত্যাগের পর, নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া, ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্যই যে, এই non-co-operation এর মুখ্যগতি, তাহা নহে। ছাত্রগণ ত্যাগ-স্বীকারে দীক্ষিত হইবে দুঃখদৈন্য বরণ করিয়া লইবে,—ইহাই ইহার লক্ষ্য। আমরা এ

স্থলেও নেতাদিগের পরস্পর কথায় ও মতে —একটীমাত্র, স্থির, দৃঢ়, অটল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দেখিতেছি না।

যখন উপদেশের উদ্দেশ্য ঠিক্ একরূপ নহে এবং উপদেশের মধ্যেও যখন মত-দ্বৈধ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, তখন তোমরা কোন্ উদ্দেশ্যকে ও কাহার পরামর্শকে স্থির, অচঞ্চল রূপে ধরিয়া লইয়া, কলেজ পরিত্যাগে সমুদ্যত হইয়াছ? যে কার্য্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে মত-দ্বৈধ এবং পরস্পর বিরোধ থাকে, সে কার্য্যে স্বতঃই এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবে যে, তোমরা কি উদ্দেশ্য লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমাদিগের মনের মধ্যে, এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত ধারণা আছে কি?

প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু তোমাদিগকে বলিয়াছেন যে, Science Collegeটী দেশীয় লোকের অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের অর্থ দ্বারা যখন গঠিত হইয়াছে এবং উহা যখন দেশীয়গণ দ্বারা চালিত, সুতরাং Science College ত্যাগ ছাত্রদিগের পক্ষে সমীচীন হইবে না। আমি রামানন্দ বাবুর এই যুক্তিপূর্ণ উক্তিগুলিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিতে চাই। প্রথম সংস্থাপন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মহান্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা দেশের কত মহানুভব দানশীল মহাপুরুষগণের অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ইহার প্রত্যেক খানি ইষ্টক-খণ্ড দেশীয় অর্থে উৎসর্গীকৃত। ইহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। গবর্ণমেণ্টের সংস্রব ও control নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর একটা প্রকাণ্ড গৌরবের নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে বড় অকৃতজ্ঞতা প্রকটিত হইবে! এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সম্প্রতি মহাপুরুষ সার্ আশুতোষের প্রভাব ও সামর্থ্যে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—যত দোষই থাকুক—ইহার মত জাতীয়-শিক্ষা-প্রণালী ভারতের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবলম্বিত হইতে পারে নাই। তোমরা national বা জাতীয়-শিক্ষা-প্রণালী লাভের নিমিত্ত উৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ; কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রকার মহীয়ান্ জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা কখনই উপেক্ষা করিতে পার না। যদি কর তবে নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। এই শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বারান্তরে তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব।

---

(২)

প্রিয় ছাত্রবর্গ—

তোমাদিগকে আমি আর কয়েকটী কথা বলিতে চাহিতেছি। নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ না করিয়া, নিতান্ত অন্ধ-ভাবে অপরের পরামর্শের বা কার্য্যের অনুসরণ—এটী অতীব নিন্দনীয়। এরূপ করিলে চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া, অনুচিকীর্ষা ও পরতন্ত্রতা বুদ্ধি পাইতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী নাগপুরে ছাত্রবর্গকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন যে, ছাত্রদিগের পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য হইবে যে, যদি তাহারা নিজে বিচার-বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা, অ-সহযোগিতা বা কলেজ-বর্জ্জন নীতিকেই তাহাদের অবলম্বন-যোগ্য বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে সেই নীতিই তাহারা গ্রহণ করিবে। মহাত্মা গান্ধীর ইহাই অভিপ্রায়; ইহাই সুস্পষ্ট উপদেশ। ষোড়শ-বর্ষ-

বয়ঃক্রমের নির্দ্ধারণও—এই কথাই দৃঢ়ীকৃত করিতেছে। আমার মনে হইতেছে যে, তোমরা দুই দিন যে কাণ্ড করিয়াছ, তাহাতে মহাত্মা-জীর এই আদেশটী প্রতিপালিত হয় নাই; বরং তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ-কার্য্যই করা হইয়াছে। একথা কেন আমার মনে আসিতেছে, তাহা বলিতেছি। যে সকল ছাত্র বি-এল্ পরীক্ষা দিবার জন্য এবং আই-এ পরীক্ষার ফি দিবার নিমিত্ত কলেজ-গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়াছিল, তোমরা তাহাদিগের প্রবেশ-পথে শুইয়া তাহাদের প্রবেশে বাধা জন্মাইয়াছিলে। আমার মনে হয়, ইহাতে ঐ সকল পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের বিচার-বুদ্ধি ও স্বাধীনতার উপরেই হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। উহারা ত নিজের চিত্তে বুঝিয়া, সুঝিয়া, বিচার-বিতর্ক দ্বারাই পরীক্ষা দেওয়াই শ্রেয়স্কর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। নতুবা উহারা যাইবে কেন? তোমরা যদি উহাদিগকে বাধা না দিয়া, পরীক্ষা না দেওয়ার পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সেই যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিতে এবং না যাইবার জন্যই বিশেষ অনুরোধ করিতে,—তাহা হইলেই মহাত্মার উপদেশের মত কার্য্য করা হইত। বাধা জন্মাইতে গিয়া, ঐ সকল পরীক্ষার্থীর স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগকেই ত ক্ষুণ্ণ করা হইল! পথ-রোধ করার অর্থই ত, প্রকারান্তরে, তাহাদিগকে, নিজের বিচার-বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া, তোমাদের প্রদর্শিত কার্য্যের অন্ধ-অনুসরণ করিতে বলা!! আমার মনে হয়, কোন সমর্থ ব্যক্তিকেই, তাহার অন্তর্নিহিত স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি যাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, কেবল অন্ধানুচিকীর্ষা জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ কোন কার্য্যে প্রশ্রয় না দেওয়াই—মহাত্মা গান্ধীজীর উপদেশের একমাত্র লক্ষ্য। তোমরা সেই লক্ষ্যের অনুকূলে কার্য্য কর নাই—বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পথ-রোধ, একরূপ বাধা-প্রদানেরই নামান্তর মাত্র; কেন না ইহা পরীক্ষার্থীর বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের স্বাধীনতা-কেই কুণ্ঠিত করিল।

আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিব। সম্প্রতি, national বা জাতীয় কলেজ স্থাপন এবং জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য, তোমাদের চিত্ত নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তোমরা স্বদেশ-প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছ। জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতির দিকে যে তোমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমি অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি।

কিন্তু, আমার মনে অনেকদিন হইতেই একটা গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকবার আমার মনে হইয়াছে যে, অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনের দিকেই তোমাদের লক্ষ্য; চতুর্দ্দশ পুরুষের অনুমোদিত, জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতির দিকে তোমাদের লক্ষ্য নহে। কেন আমার মনে সর্ব্বদাই এই সন্দেহ আসিয়াছে, তাহা বলিতেছি। আমি তোমাদিগের দৃষ্টি, Post-Graduate class গুলির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। এই Post-Graduate-শিক্ষা বিভাগে, যে সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের অতীত গৌরব অদ্যাপি ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রখ্যাপিত করিতেছে, সেই সকল বিষয়ের প্রধান প্রধান শিক্ষিতব্য বিষয়ের জন্য, শ্রেণীসকল সংস্থাপিত হইয়াছে। এ কথা তোমরা জান। ভারতের বেদ ও আরণ্যক; ভারতের সুপ্রখ্যাত দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, প্রভৃতি দর্শন-গুলি; ভারতের প্রাগৈতিহাসিক বিভাগের অবশ্য-জ্ঞাতব্য গ্রন্থ-নিচয়—এ সকলই সংস্থাপিত

হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সকল ক্লাশের প্রত্যেক ক্লাশেই যে সকল ছাত্র বৎসরের পর বৎসর, ভর্ত্তি হইতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা এত কম কেন? আর, ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী গণিত, ইংরাজী ইতিহাস, ইংরাজী সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি খাঁটি ইংরাজী বিভাগস্থ ক্লাশ গুলিতেই বা এত ছাত্রাধিক্য কেন? এই অত্যন্ত বিসদৃশ ছাত্র সংখ্যার তারতম্য-দর্শনে, স্বতঃই অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয় যে,—তোমাদের এই যে "জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতি" অবলম্বন ও সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুলতা দেখা যাইতেছে, এই ব্যাকুলতাটা ঠিক্ প্রাণের কথা নহে। এটা বোধ হয় সাময়িক একটা অস্থায়ী উত্তেজনার অভিব্যক্তি মাত্র! তোমরা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বি-এ পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়া, তার পরে এই Post-Graduate ক্লাশ গুলিতে প্রবেশ করিয়া থাক। সুতরাং, কেবল সংস্কৃত বিদ্যা শিখিয়া বর্ত্তমানে উপযোগিতা লাভ করা যায় না—এই জন্যই ভারতীয় প্রাচীন-শিক্ষা-বিভাগে ছাত্রসংখ্যা তত হয় না,—এ আপত্তি ও ত উত্থাপন করা অসম্ভব। তাই আমার মনে হয় যে, অর্থকরী বিদ্যাই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাহা না হইলে, কোথায় বা তিন শত—আর কোথায় বা দুইটী বা তিনটী মাত্র ছাত্র!! এমন বিস্ময়-জনক বৈষম্য কেন বৎসরের পর বৎসর দেখিতে পাই?

তোমাদের মধ্যে যখন ধীরে ধীরে এই কলেজ-বর্জ্জন-নীতি প্রবিষ্ট ও শনৈঃ শনৈঃ প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন আমাদের মনে কি প্রকার আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একটা প্রকৃত কথা তোমাদিগকে আমি শুনাইতে ইচ্ছা করি। আমরা—এই ইউনিভার্সিটীর অধ্যাপকেরা—এই আশা করিতেছিলাম যে, চারিদিকের এই আন্দোলনের সময়ে, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গ সার্ আশুতোষের পক্ষাবলম্বন করিবে এবং তাঁহারই পতাকামূলে সমবেত হইবে! আমরা কেন এই প্রকার আশা করিতেছিলাম, শুনিবে কি?

তোমরা জান, সার্ আশুতোষকে সকলে fighting man নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কেন করে? স্যার্ আশুতোষ, আপন জীবনের প্রায় সমগ্র অংশটাই, গভর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর কঠোরতার বিরুদ্ধে এবং যাহাতে ছাত্রবর্গের অধ্যয়ন, অবস্থান ও পরীক্ষা বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা হয়, তাহারই অনুকূলে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদাই অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। যাহাতে গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার কঠোর-নীতি অবলম্বন না করিতে পারেন, ইহাঁর সর্ব্বতো-ব্যাপ্ত চক্ষু সর্ব্বদাই সেদিকে জাগরূক ছিল। এই ছাত্র-বৎসলতার জন্যই, ইনি অনেক সময়ে অনেক গভর্ণমেণ্টের শক্তিশালী কর্ম্মচারিগণের অসন্তোষ-ভাজন হইয়াছেন * এবং তাঁহাদের তাদৃশ প্রিয় হইতে পারেন নাই। প্রধানতঃ, ছাত্রবাৎসল্যের জন্যই ইহাঁর এই দশা!! এই নিমিত্তই, স্বভাবতঃই আমাদের মনে এই কথাটাই উদিত হইয়াছিল যে, তোমরা,—বাঙ্গলা দেশের ছাত্রবর্গ,—কখনই সার্ আশুতোষকে ত্যাগ করিবে না!

যে সময়ে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন, ইউনিভার্সিটী সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে ছাত্রবর্গের মধ্যে এবং অধ্যাপকগণের মধ্যেও, পাঠ্য

* তোমাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়াই ত ইঁহাকে Sharp সাহেবের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হইয়াছিল।

গ্রন্থাবলীর গুরু-চাপে এবং পরীক্ষার প্রশ্ন ও পদ্ধতির অতি কঠোরতার একটা ভাবী আশঙ্কার সঞ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। তখনকার দিনের সেই অতি-আতঙ্কের কথা, এখনও আমাদের মধ্যে অনেকের মনে সম্যক্ মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। 'কার্জ্জনীয়' নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-ভুক্ত ছাত্রবর্গ আর সহজে 'পাশ' করিতে পারিবে না,—উহাদের কৃতকার্য্যতার সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, সর্ব্বত্র এই প্রকার একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু সেই বৎসরের শেষ ভাগ হইতেই, সেই ত্রাসের পরিবর্ত্তে, ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলী ও অভিভাবকগণের অন্তঃকরণে, হর্ষেরই উৎপত্তি হইতে আরম্ভ হয়। সার্ আশুতোষ তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন বলিয়াই, কার্জনীয় কঠোর নীতি অপকার-জনক ফল প্রসব করিতে পারে না। কত বিপদ হইতে বাঙ্গলার ছাত্রবর্গকে তিনি, তখন এবং পরবর্ত্তী 'স্বদেশী' আন্দোলনের যুগে, রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমানে ও সর্ব্বদাই করিতেছেন—একথাটা অন্ততঃ বাঙ্গলা-দেশের ছাত্রবর্গ ভুলিয়া যাইবে না—যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সঙ্কটে বাঙ্গলার ছাত্রবর্গ, তাঁহার সাহায্যার্থে, তাঁহারই পক্ষাবলম্বন করিবে, আমরা অনেকে এই আশাই পোষণ করিতেছিলাম।

কেবল বাঙ্গলাদেশের ছাত্রবর্গ কেন? তাঁহার অসাধারণ কার্য্যকারিণী শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই Post Graduate বিভাগের ছাত্রবর্গের কথাও বিশেষ করিয়া আমাদের মনে উদিত হইতেছিল। Post Graduate বিভাগের ছাত্রগুলি সকৃতজ্ঞচিত্তে, সার্ আশুতোষকে মমতা দ্বারা জড়াইয়া ধরিবে,—আমরা অনেকে এই আশাটাও মনে স্থান দিতেছিলাম। পূর্ব্বকালের শিক্ষা-পদ্ধতি এবং বর্ত্তমানের Post-Graduate শিক্ষা-পদ্ধতি—এই উভয় পদ্ধতির দিকে একবার চাহিয়া দেখ। আমি অন্যান্য কথা কথা এস্থলে উপস্থিত করিব না। তোমরা national বা জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছ। তোমাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—Post-Graduate শিক্ষা-কেন্দ্রে, কোন্ জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা কাহার অসাধারণ মনীষা ও কর্ম্ম সামর্থ্যের পরিচায়ক? হিন্দুর বেদ, আরণ্যক ও দর্শন শাস্ত্র—বিশ্ববিখ্যাত। যে সকল বিদ্যায় হিন্দুজাতির পৃথিবী-বিখ্যাত কীর্ত্তি ছিল, সেই সকল বিদ্যার কোনটীই উপেক্ষিত হয় নাই। এই সকল স্ব-জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতের অন্যত্র দেখিতে পাইবে না। এই সকলের ব্যবস্থা করিতে প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক বিভাগে, সার্ আশুতোষকে যে সকল বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এবং যে প্রকার ক্লেশ, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত, সেই সকল প্রতিকূল অবস্থা ও বিরুদ্ধবাদী লোকদিগকে আপন মতে শনৈঃ শনৈঃ লইয়া আসিতে হইয়াছিল,—তাহা স্মরণ করিলে, সার্ আশুতোষের নিকটে দেশ ও দেশবাসী যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একথা দৃঢ়তার সহিত বলিব যে, এই সকল ব্যবস্থা নানা স্থানে মঞ্জুর করিয়া লইতে এবং অবশেষে ভারত গবর্ণমেণ্টের চরম-অনুমোদন লাভ করিতে যে প্রকার সূক্ষ্মদর্শিতা তর্ককুশলতা, শাস্ত্রাভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বোপরি সাহস ও বাক্‌পটুতার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা কেবল সার্ আশুতোষেরই উপযুক্ত।

সর্ব্বশেষে, দেশের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় এই বঙ্গ-ভাষার প্রবর্ত্তন,—এটী অপর কোথাও দেখিতে পাইবে না। তাই বলিতেছিলাম, কোন্ মহাপুরুষের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্নে, এই সকল 'জাতীয়' শিক্ষার ব্যবস্থা Post-Graduate বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল? কাহার উপকারের জন্য সার্ আশুতোষকে এত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, এবং এত বিনিদ্র রজনী শ্রম-স্বীকার করিতে হইয়াছিল? বাঙ্গালী ছাত্রের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, বিশ্ববিদিত। তাই, আমরা সাগ্রহে, সোৎকণ্ঠে, সানন্দে তোমরা যে, হে প্রিয় ছাত্রবর্গ! সার্ আশুতোষের পক্ষাবলম্বন করিয়া দাঁড়াইবে এবং বিদেশীকে দেখাইবে যে, তোমরা যাঁহার দ্বারা এত মহোপকার পাইয়াছ, তাঁহাকে বিপদে সাহায্য করিতে জান—আমরা অনেকে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য আশান্বিত হইয়াছিলাম! সে আশা সফল হইয়াছে কি?

---

(৩)

প্রিয় ছাত্রবর্গ—

প্রাণিমাত্রেই, আপন আপন 'জাতীয়' কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও আদর্শ বুকে লইয়া অভিব্যক্ত হয়। প্রথম প্রথম, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, evolution theory এই জাতিগত বিশিষ্টতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অংশ-সমষ্টি, অনন্তকাল হইতে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে হইতে, উন্নততর জীবের আবির্ভাবের হেতুরূপে নিয়ত কার্য্য করিতেছে। জাতি-বিশেষের সীমা-নির্দ্দেশ করিবে কি প্রকারে? কিন্তু বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য মনীষীবর্গ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, evolution-বাদ,—স্ব স্ব জাতীয় বিশিষ্টতার বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনিবার্য্যরূপে, ক্রমোন্নততর জাতিগত বিশিষ্টতারই পরিপোষক theory বলিয়া পরিগণিত। তোমাদের মধ্যে যাহারা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ, তাহাদিগকে এই তত্ত্বটী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা বেদান্তদর্শনের শঙ্কর-ভাষ্য পড়িতেছ, তাহাদের নিকটেও এই তত্ত্বটী বিশেষ পরিচিত।

হিন্দু ও মুসলমান জাতিরও, বিশিষ্ট একটা আদর্শ, ও বিশিষ্ট একটা চিন্তা ও কার্য্যের ধারা আছে। আমাদের শিক্ষা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, সেই শিক্ষা-পদ্ধতি, আমাদের স্ব স্ব জাতিগত বিশিষ্টতাকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট এবং চরমে পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া, জাতীয়-আদর্শ-প্রাপ্তির সহায়তা করে। যাহাতে জাতিগত বৈশিষ্ট ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, সেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতিকে 'জাতীয় শিক্ষা' বলিতে পারা যায় না। ইহা, দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা অনুমোদিত অকাট্য সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, নব-প্রতিষ্ঠিত Post-Graduate-শিক্ষা-কেন্দ্রে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহাতে কেবল যে, জাতীয় আদর্শের বিকাশের উন্মেষক, নানা বিষয়ক, গ্রন্থগুলি অধ্যয়নেরই কেবল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নহে। উহাতে যে একটী অতি সুন্দর বিশেষত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সে দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মৌলভীগণ, কেবল যে প্রাচ্য প্রাচীন বিদ্যাগুলির প্রতিনিধি তাহা

নহে; ইহাদের মধ্যে, প্রাচ্য-বিদ্যার যে একটা বিশিষ্টতা-সূচক চিন্তার ধারা পূর্ব্বপুরুষ হইতে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সেই প্রাচ্য-চিন্তা-পদ্ধতিটী ইঁহাদের মধ্যেই অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে। তুমি যদি উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থলগুলি হইতে সুশিক্ষিত, চরিত্রবান্, প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে এবং মৌলভীবর্গকে বর্জ্জন কর, তাহা হইলে, দুইদিকে দুইটী অসম্পূর্ণতা আসিয়া শিক্ষা-কেন্দ্রকে দূষিত করিবেই। বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে ঈদৃশ প্রাচ্যশিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত-গণের কোন স্থান নাই, জগতের সমক্ষে এই কথাটীই ঘোষিত করা হইবে এবং তদ্দ্বারা এই প্রাচীন ভারতবর্ষকেই অবমাননা করা হইবে। বিশেষতঃ, বর্ত্তমানকালের ইউনি-ভার্সিটী, এই সকল প্রাচীন পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সম্মান করে না, দেশবাসীর ও বৈদেশিক লোকের মনে, এ কথা উদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় নিমগ্ন এতদ্দেশীয় ছাত্রবর্গকে, ভারতের পুরুষানুক্রমিক একটা বিবিধ বিদ্যার চিন্তা-ধারার বিশিষ্টতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে। অথচ, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গকে, সেই প্রাচীন চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়া তোলা কতদূর আবশ্যক।

প্রিয় ছাত্রবর্গ! তোমরা কি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ যে জাতীয় গ্রন্থগুলি শিক্ষা দিবার যতগুলি বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগের প্রায় প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ group-গুলিতে, ছাত্রবর্গ, একজন করিয়া প্রাচ্য-বিদ্যা-পারদর্শী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন করিয়া পাশ্চাত্য-বিদ্যায় সুশিক্ষিত আধুনিক নিয়মাভিজ্ঞ ইংরেজী-শিক্ষিতের দ্বারা, যুগপৎ শিক্ষালাভ করিতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিব। একটী ছাত্র বেদান্ত-group লইয়াছে। একজন আধুনিক নিয়মানুসারে পাশ্চাত্য-দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ অধ্যাপক, সেই ছাত্রটীকে সংস্কৃতে বেদান্ত পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে, পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের realism, idealism প্রভৃতি মতের পাশ্চাত্য দেশে যে প্রকার উৎপত্তি, ক্রম-পরিপুষ্টি এবং বর্ত্তমানে ঐ বাদগুলি যে প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে,—এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব তাহাকে, বেদান্তের পাঠের সঙ্গে সঙ্গে, দিনের পর দিন, শিখাইয়া দিতেছেন। আবার ঐ ছাত্রটী, বেদান্তেরই অপর কোন গ্রন্থ যখন, প্রাচ্য-প্রণালীতে শিক্ষিত প্রাচীন বৈদান্তিক পণ্ডিতের নিকটে পড়িতেছে তখন, সে প্রতিদিন ভারতীয় বেদান্তের পুরুষানুক্রম-প্রাপ্ত চিন্তা-ধারা ও শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ও তাহাতে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। সকল বিভাগেই, Post-Gradu-ate-শিক্ষা-কেন্দ্রে, এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই মহোপকারিনী ব্যবস্থা, সার্ আশুতোষের, চিন্তার ফলে সমুদ্ভাবিত। এতদ্দ্বারা সার্ আশুতোষের ঐকান্তিক স্বদেশ-নিষ্ঠা ও জাতীয়-বিদ্যা-প্রিয়তা অভ্রান্তরূপে প্রকটিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য-পদ্ধতি-ক্রমে, এদেশে, যে সকল উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহার একটীতেও, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বর্জ্জন ভিন্ন, এ প্রকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মৌলভীগণের সম্মান ও উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহা-দিগের জন্যও স্থান নির্দ্দেশ করা,—কোথাও হইয়াছে কি? এই নবীন ব্যবস্থার ফলে আর একটী মহান্ উপকার সাধিত হইতেছে। কেবল গ্রন্থ পাঠ দ্বারাই ত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়

না। অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত ও চরিত্রবল, ছাত্রদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে থাকিলে, পরিশেষে উহা হইতে যে ফল প্রসূত হয়, তদ্দ্বারা সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতি উন্নত হইয়া উঠে। একটা দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর সংস্থাপন এবং তথায় বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতির জন্য, সমগ্র সময় ও নিজের সমগ্র যত্ন, সর্ব্বদা নিয়োজিত করিতে পারিবেন, এই আকাঙ্ক্ষার পূরণোদ্দেশে, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, তাঁহার সারাজীবনের উপার্জ্জিত মুদ্রা এবং মাসিক দুইশত টাকারও উপরে যে অধ্যাপনা-কার্য্যের বেতন ছিল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া—ঐ চতুষ্পাঠীতেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। এ প্রকার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত Post Graduate বিভাগের ছাত্র স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছে। এই সকল অধ্যাপকের সরল জীবন-যাত্রা প্রণালী, স্বল্পে-সন্তোষ, বিলাস-বিহীনতা—প্রভৃতি গুণের প্রভাবও ছাত্রবর্গের উপরে নিত্য পড়িতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এইরূপ প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া, তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। ইহার তুল্য জাতীয়-শিক্ষা আর কোথাও পাইবে না। জাতীয় বা national শিক্ষা-পদ্ধতির এইটাই মুখ্য অঙ্গ। Todhunter প্রভৃতি প্রণীত বীজগণিত ছাড়া, ভারতে ও যে ভারতীয় গ্রন্থকার প্রণীত বীজগণিত এবং রেখাগণিতের শুল্‌ভশাস্ত্রাদি গ্রন্থ রহিয়াছে,—এই সংবাদটাই কয়টী ছাত্র তোমরা অবগত আছ? কিন্তু, সার্ আশুতোষের একমাত্র ঐকান্তিক চেষ্টায়, এই সে দিনও, ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মহীশুরাদি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকাগারগুলিতে পরিশুদ্ধ "শুল্‌ভশাস্ত্রে"র অনুসন্ধানে এবং তত্তৎদেশীয় গণিতাভিজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত তদ্বিষয়ক আলোচনার নিমিত্ত, Post Graduate বিভাগের একজন গণিত-শাস্ত্রাধ্যাপককে পাঠাইয়া দিয়া, শুল্‌ভশাস্ত্রের তত্ত্বনির্ণয়ের পথ কত সুগম করিতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা জাতীয়-শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতেছ। কিন্তু, আমাকে বলিয়া দাও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ সর্ব্বতোমুখী জাতীয় শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতররূপে স্ব-জাতীয় আদর্শানুরূপ শিক্ষা, অন্যত্র লাভ করিতে আশা করা দুরাশা হইবে না কি? তথাপি তোমরা, এই সঙ্কট-কালে কিরূপে সেই মহোপকারী বন্ধু ও সদাহিতৈষী পরমাত্মীয়কে পরিত্যাগ করিলে, —যিনি সারা জীবন তোমাদিগেরই মঙ্গলার্থ, তোমাদের জন্য কত আত্মত্যাগ করিয়া আসিতেছেন?

যাহাতে জাতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ না হয় জাতীয় আদর্শ ও culture পরিপুষ্ট হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ করিবার জন্য তোমরা সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছ। এটা তোমাদের ঠিক্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি না, তদ্বিষয়ে আমার মনে আর একটা সংশয় জাগিয়া উঠিতেছে। তোমরা সর্ব্ব প্রথমেই তোমাদের স্ব-জাতীয় একটা প্রকাণ্ড আদর্শ ও নীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছ বলিয়া, আমার চিত্তে একটা দুর্ব্বিসহ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদের এই কলেজ-পরিত্যাগ-নীতি, সকল পিতামাতা ও আত্মীয় অনুমোদন করিতেছেন না। তাঁহারা তোমাদিগের এই ব্যবহারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা তোমাদিগের পিতামাতা ও আত্মীয়-গণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া, একরূপ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, একটা নূতন "ফণ্ড" সংস্থাপন করিয়া, সেই "ফণ্ড" হইতে আপনাদের ব্যয়-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়াছ। এই ব্যবহারকে পিতা-মাতাকে অগ্রাহ্য করা ভিন্ন অপর কোন নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য আদর্শ কিরূপ তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এটা, আমাদের জাতীয়-আদর্শের আদৌ অনুকূল নহে। একথা কি তোমরা জান না? তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ কি প্রকার আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন? পিতার ইচ্ছার সম্মান কি জানি পাছে ক্ষুণ্ণ হয়, এই আশঙ্কায় মহাপুরুষ দেবব্রত, সমগ্র জীবন রাজ-ভোগ্য বিভব বর্জ্জন করিয়া চির-কৌমার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন! এই মহান্ আদর্শ কাহার জন্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে? মহারাজ দশরথের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায়, পুত্র রামচন্দ্র, কত বড় আত্ম-ত্যাগ দেখাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন? মহাকবি কি এই বিস্ময়কর পিতৃভক্তির মহান্ আদর্শ, বৃথাই অমর কবিতায়, অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন? তোমাদিগেরই স্বজাতির ধর্ম্ম-সংহিতা-প্রণেতা মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন যে,—"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতা হি পরমংতপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে, প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে "ফণ্ড" হইতে সাহায্য লইয়া, তোমরা এই মহান্ জাতীয়-আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতেছ, ইহাই আমার বিশ্বাস। জাতীয় আদর্শানুরূপ শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা, যেখানে প্রথমেই জাতীয় একটা বড় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সে আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি-বন্ধনটা 'বালির বাঁধের মত' শিথিল-মূল! আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, এই বালির বাঁধের উপরে নির্ম্মিত আকাঙ্ক্ষার সৌধটীও, যেন অদূর-ভবিষ্যতে বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া যাইবে, —আপন চিহ্ন ও রাখিবে না!!!

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ফাগুনে।

কুঞ্জে কোয়েল, ডাক্‌ছে মধুর, গুঞ্জে অলি ফুলে
আকুল মলয়, লতার গায়ে, পড়্‌ছে দুলে দুলে।
আজ্‌কে এমন ফাগুন মাসে
পাখীর গানে ফুলের বাসে
ছন্দে গীতে গন্ধে হাসে
পরাণ গেছে খুলে।
পাগল হবার এই তো সময় সকল কথা ভুলে।
কুঞ্জে কোয়েল ডাক্‌চে মধুর গুঞ্জে অলি ফুলে।

আজ্‌কে মোরা কর্‌ব কেবল
'অকেজো-কাজ যত
বাতাস-বওয়া ফাগুন মাসে খেলাই মহাব্রত।
নিজ্‌কে শুধু বিজ্ঞ জানি'
গম্ভীর মুখে গভীর বাণী
ফইবনা আজ, লইব মানি'
অবোধেরি মত—

আকাশ বাতাস যে কথা আজ কইছে অবিরত।
আজ্‌কে মোরা কর্‌ব কেবল
'অকেজো-কাজ যত।
রুদ্ধ-দুয়ার ঘরের মাঝে শুয়েই আছো যারা
তাদেরে আজ ডাক্‌ব কেবল,
পেতেই হবে সাড়া;

সব-মেশানো এমন খনে
আপন কি পর সবার সনে
মিশ্‌ব সবাই প্রাণে মনে
হয়ে' আপন হারা
আজ ফাগুনে বিশ্ব নিখিল 'মিলন-পাগল-পারা!
রুদ্ধ-দুয়ার ঘরের কোণে রহিবি আজ কারা?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রামতনু।

ঋষিকল্প রামতনু লাহিড়ীর মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি বিধাতার মঙ্গল বিধানে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছেন; সংসারের ঝটিকা, আবর্ত্তে অবিচলিত চিত্তে চলিবার জন্য বুক বাঁধিয়াছেন। একে একে পুত্র কন্যা বিসর্জ্জন দিয়া, বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, রামতনু যেমন শোকে সান্ত্বনা পাইয়াছেন, কে এমন পাইয়াছেন জানি না। পুত্রকন্যা হারাইয়া আমরা জোর করিয়া মুখে বলি, 'করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক'; কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, ইহার মধ্যে কতটা মিথ্যা লুক্কায়িত আছে। সন্তান-শোকের মত এত বড় দুঃখ পৃথিবীতে আর কি আছে? চিতার আগুনে পুড়িয়া নিঃশেষ না হইলে, এই শোকের আগুন নেবে না। এই নিদারুণ শোক রামতনু নির্ব্বিকার-চিত্তে সহিয়াছেন। কন্যা ইন্দুমতী ও পুত্র নবকুমার উভয়ে একই সময়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইন্দুমতী বাবাকে ডাকিলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইন্দু, কেন আমাকে ডেকেছ?" কন্যা চোখ খুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ আমার কাছে বস, আজ আমাকে বড় অস্থির কর্‌ছে।" লাহিড়ী মহাশয় কন্যার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া বলিলেন—"ইন্দু, আমাদের যা কর্‌বার ছিল কোরেছি, আর কিছু কর্‌বার নেই; এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যে তিনি তোমাকে শীঘ্র এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন॥" ইন্দুমতী হাত দু'খানি ধীরে ধীরে বুকের উপর আনিয়া যুক্ত-করে প্রার্থনা করিয়া বাবার মুখের দিকে চাহিয়া চির-বিদায় চাহিলেন—"বাবা, আমি যাই!" বাবা বলিলেন "যাও মা।" ইন্দুমতী চলিয়া গেলেন। ইন্দুমতীর মা "মা রে, ইন্দুয়ে!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই পরলোক-বিশ্বাসী রামতনু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"কর কি! কর কি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, তিনি ইন্দুর সকল যন্ত্রণা দূর কোরে শান্তিধামে নিয়ে গিয়েছেন। এখন অস্থির হয়ো না, আর একটি সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য এখনও বাকি আছে, এখন অধীর হ'লে তার সেবার ব্যাঘাত হবে। চল এখন তার সেবায় নিযুক্ত হই।"

লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিবার আকর্ষণে কতিপয় যুবক সপ্তাহে একদিন

তাঁহার গৃহে সমবেত হইতেন। সেই সাপ্তাহিক অধিবেশনে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার উপস্থিত থাকিতেন। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর যে দিন তাঁহার ভাই নবকুমারের মৃত্যু হয়, সে দিন সেই সাপ্তাহিক অধিবেশনের দিন ছিল। যুবকগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দ্বিজেন্দ্র লাল আসিয়া নবকুমারের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রামতনু দ্বিজেন্দ্রকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন—"দ্বিজু, তুমি শিক্ষিত হ'য়ে আপনাকে সংযত কোর্ত্তে পাচ্ছ না? কোথায় তুমি তোমার জ্যাঠাইমাকে বোঝাবে, শান্ত কোর্‌বে,—না, তুমিই অস্থির হ'য়ে পোড়্‌লে!" যুবকগণ দুর্ঘটনার সংবাদ না জানিয়া সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামতনু তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বলিলেন—"দেখ, আজ আমি তোমাদের সঙ্গে ব'স্‌তে পার্‌বো না। আমার ভুল হ'য়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।" কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধীরভাবে বলিলেন—"একটু আগে নবকুমারের মৃত্যু হ'য়েছে, তার মৃতদেহ ঐ ঘরে প'ড়ে আছে, তোমরা ও ঘরে যেয়োনা, দেখ্‌লে কষ্ট হবে।" একদিন কোনও ব্যক্তি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন-"একে একে পুত্র কন্যা হারিয়ে কি দারুণ আঘাতই পাচ্ছেন!" রামতনু বলিলেন—"দয়ার উপর কি দাবি আছে? ভগবান দয়া কো'রে যে ক'টি সন্তান রেখেছেন, তার জন্যই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌বো।"

দুই প্রকারের সাধু এই পৃথিবীতে দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক কত তপস্যা, কত কৃচ্ছ্র-সাধন, কত উত্থান পতনের, কত সংগ্রামের মধ্য দিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আর এক শ্রেণীর লোকের সাধুতা জন্মগত। শিক্ষা দ্বারা নহে, সৎসংসর্গে নহে, প্রবল প্রয়াসে নহে—তাঁহারা স্বভাবতঃ সতত সাধুতার পথে বিচরণ করেন। রামতনুর সাধুতাও প্রকৃতি-গত ছিল। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের ন্যায়, ভারতীয় ঋষিগণের সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তপঃপ্রভাব ও ঋষিত্ব লাভ করেন নাই। জগজ্জননী তাঁহাকে আদরকরিয়া স্বহস্তে ধর্ম্মভূষণে সাজাইয়া, রক্ষাকবচ পরাইয়া জগতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; বলিয়া দিয়াছিলেন—যাও বৎস! সংসারের পথ কেবল সুকোমল পুষ্পময় নহে, কণ্টকাকীর্ণ পথেও চলিতে হইবে। মায়ের অভয় বাণী, আশীর্ব্বচন স্মরণে রাখিয়া অম্লান বদনে, প্রশান্ত চিত্তে, অটলভাবে মানব জীবন-ব্রত সাধন করিও।"

এই রক্ষাকবচ, এই ধর্ম্মের বর্ম্ম পরিয়া সংসার সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই রামতনু ডিরোজিয়োর নাস্তিকতা-প্রবণ প্রভাবে পড়িয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের বড় বড় বক্তা ও লেখকগণ কথায় কথায় ফিরিঙ্গি যুবক ডিরোজিয়োর প্রভাবের উল্লেখ করিয়া বলিয়া আসিতেছেন—তিনি আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে উদ্দীপনা ও নব-জীবন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু, ডিরোজিয়োর সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত যুবকগণ সুফল অপেক্ষা কুফল অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর প্রভাবে সুরাপান, নাস্তিকতা, নিষ্ঠা-শ্রদ্ধা-হীনতা, ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খল কালাপাহাড়ী-ভাব আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পথ ছাড়িয়া, আমাদের দেশের লোকেরা যে পরিমাণে বিদেশের হীন অনু-

করণ করিয়াছেন—সেই পরিমাণে তাঁহারা ধর্ম্ম-হীন হইয়াছেন।

ভোগে নহে, বিলাসে নহে, ত্যাগের পথে না চলিলে আমাদের কল্যাণ নাই। এক ভূদেব ভিন্ন ভারতবর্ষের এই উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিবার লোক তখন কেহ ছিলেন না। স্বদেশের স্ব-জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা না করিয়া বিদেশাগত প্রবল বন্যায় গা ভাসাইয়া দিয়া বাঙ্গালা দেশের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ ডিরোজিয়ো-প্রদর্শিত-পথে সদর্পে পদার্পণ করিলেন। সেই দলে পড়িয়া এমন, যে জন্ম-সাধু রামতনু, তিনিও পান-দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পান নাই।

বিনা সাধনে রামতনু ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্ত দেখিলেই তাঁহার প্রতি আসক্ত হইতেন। বন্ধুপুত্র কেশবচন্দ্রের মুখে ভক্তি-কথা শুনিয়া অশ্রুজলে আপ্লুত হইতেন। কেশবচন্দ্রের উপাসনার সময় একটি ভক্তির কথা শুনিয়া উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে বাহিরে আসিয়া "কেশব কি মধুর বাণীই শুনাইলেন! কি সুন্দর! কি সুন্দর!" বলিয়া পাদচারণা করিতেন। একদিন দেখিয়াছি রামতনু, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। আরাধনার কয়েক মিনিট পরেই উঠিয়া আসিয়া মন্দিরের বারাণ্ডায় পায়চারি করিতেছেন, চোখ মুছিতেছেন আর বলিতেছেন—"শিবনাথ আজ কি সুন্দর কথাই বোল্লেন!" তাঁহার কোন প্রকার কৃত্রিমতাই ছিল না। লোকে কি ভাবিবে, কি বলিবে মনেই আসিত না। তিনি দীর্ঘ উপাসনায় বেশাক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। যতক্ষণ ভাব থাকিত, যতক্ষণ অনন্যমনা হইয়া থাকিতে পারিতেন, ততক্ষণই উপাসনায় বসিতেন। তিনি সর্ব্ববিধ কার্য্যে অকৃত্রিম ছিলেন; তাঁহার মত খাঁটি লোকের পক্ষে, নিয়ম-রক্ষার কৃত্রিমতা অবলম্বন অসম্ভব ছিল। তিনি শাস্ত্রী-মহাশয়কে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"শিবনাথ, তোমরা যে এতক্ষণ ধরিয়া উপাসনা কর, এত কথা বল—সবই কি আন্তরিকতা পূর্ণ হয়?" শাস্ত্রীমহাশয় দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়াছিলেন, আন্তরিকতা না থাকিলেও, প্রচারের জন্য অনেক কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বলিতে হয়। এই প্রকার প্রচার-প্রবৃত্তি প্রবল হইলে ফেনাইয়া ফেনাইয়া বক্তৃতা করিতে হয়; কোন কথা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না। তাহা আমরাও বর্ত্তমান সময়ে অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিষ্টতা কৃত্রিমতার নামান্তর মাত্র। এই কৃত্রিমতার যুগে সেই অকৃত্রিম মহাপুরুষ রামতনুর কথা বড়ই মনে পড়ে। আমাদের দেশের খাঁটি লোক একে একে চলিয়া যাইতেছেন। এখনও পল্লীগ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচিত হইলে, খাঁটি চরিত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়; দুদিন পরে তাহাও লোপ পাইবে।

রামতনুর বিনয়ও স্বাভাবিক। তাঁহার বিনয়ের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। নিয়ম মুখস্থ করা বিনয় নহে, অন্যান্য গুণের ন্যায় বিনয়ও তাঁহার স্বভাব-জাত ছিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা সকলের নিকটই তিনি সৌজন্য, শিষ্টাচার ও বিনয় প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার বিনয়ে সকলেরই লজ্জায় অবনত মস্তক হইত। তাঁহার পক্ষে এই বিনয় স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আমরা তাহার অনুকরণ করিলে হাস্যাস্পদ হইব। গুণকে প্রকৃতি-গত করিতে

না পারিলে, অন্যের গুণের অনুকরণ, কৃত্রিম অভিনয় বলিয়া ধরা পড়ে।

উদার-হৃদয় রামতনু বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া জগতের সকল নরনারীকে সমান প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান, স্বদেশ বিদেশ, আপন পর—সব তাঁহার এক হইয়া গিয়াছিল। কত নিষ্ঠাবান হিন্দু, কত খৃষ্টান, কত নাস্তিক তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি কোনও মতের ব্রাহ্ম, কোনও দলের ব্রাহ্ম ছিলেন না। একবার একজন ব্যারিষ্টার, সাধারণ-ব্রাহ্ম-দল-ভুক্ত একজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"রামতনু বাবু আদি, নববিধান ও সাধারণ—এই তিন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কোন্ দলভুক্ত?" সাক্ষী মহাশয় উত্তর করিলেন "রামতনু বাবু কোন্ দলের বোল্‌তে পারি না, তাঁর দলাদলি নাই।" একটি উচ্চ স্থান আছে, সেখানে যাঁহারা উঠেন তাঁহাদের দলের বন্ধন খসিয়া পড়ে। বিশ্ব-প্রেম হৃদয়ে লইয়া যখন কেহ ঘর ছাড়িয়া জগতের উন্মুক্ত স্থানে বাহির হইয়া পড়েন, তখন দলের লোকেরা সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর উচ্চ করিয়া, দৃঢ় করিয়া বাঁধে,—ভয় হয় বিশ্বপ্রেমিকের বিশ্ববাণীর বাঁশি শুনিয়া ঘরের ছেলে মেয়েরাও বাহির হইয়া পড়িবে।

রামতনু শোকবিজয়ী-মহাপুরুষ ছিলেন। প্রেমভক্তি বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তাঁহার চোখ দেখিলে হরিভক্ত কৃষ্ণকান্ত পাঠকের গান মনে পড়িত—"তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।" একজন হৃদয়বান—ব্যক্তি জগতের দুঃখ ক্লেশে, অবিচার অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া গাহিয়াছিলেন—

"সিংহশিশু করে মেষরক্ত পান,
বলী বলহীনে করে অপমান;
তুমি সর্ব্বশক্তি, তুমি ন্যায়বান,
দূরে কি বসিয়া—দেখিছ তাই।
ধনীর আস্পর্দ্ধা, কপটের জয়,
ধর্ম্মের পতন তবে কেন হয়?
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়,
এ নিয়ম তরে কে তবে দায়ী?"

এ তো—সংশয়ে পড়িয়া অভিমানের কান্না। বিশ্বাসী রামতনুর সংশয় ছিল না, অভিমান ছিল না। তিনি সংসারের দুঃখও বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার হৃদয় বীণার সঙ্গীত ছিল—

"আর বোল্‌ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়,
দীনবন্ধু হে।
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই-ই সমান;
তুমি যে বিধি কর বিধি; সেই হয় মঙ্গল বিধি,
গুণনিধি হে;
ঘোর বিপদেও বোল্‌ব তোমায়, দয়াময়।"

রামতনু প্রচারক ছিলেন না, আচার্য্য ছিলেন না, বক্তা ছিলেন না। কোনও বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে তাঁহার কার্য্য-সংখ্যার তালিকা বাহির হইত না। তাঁহার মধুময় পবিত্রময় ঋষি-জীবনের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই উপকৃত হইয়াছেন। দীনবন্ধু তাঁহার "সুরধুনি কাব্যে" রামতনুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ-দুঃখ-সম-জ্ঞান ঋষিদের মত।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।"

এই সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া অনেকে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। সাধু রামতনুর পুণ্য-চরিত আলোচনা করিলে আমরাও ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ।

হে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্র বঙ্গের!
ত্যাগের মহিমা-গর্ব্বে কি দীপ্তি চিত্তের
উদ্ভাসিল আজি তব! তুমি নহ আর
ধনীর দুলাল শুধু, ভারতী মাতার
সুধা-স্রাবী সপ্ততন্ত্রী, বসন্তের পিক
মধু-কণ্ঠ অতুলন! মুগ্ধ দশদিক্;
হেরিতেছে সবিস্ময়ে মহর্ষি-সন্তান
উদার নির্ভীক প্রাণে ন্যায়ের সম্মান
রক্ষিবারে রাজ-দত্ত মোহের শৃঙ্খল
ছিন্ন করি অনায়াসে তপোতেজোজ্জ্বল
প্রবোধিত ভারতের লাঞ্ছিত আত্মার
দাঁড়াল প্রতিভূরূপে! ত্যজিয়ে অ-'সার'
আজি সত্য সার-গ্রাহী ঋষি নবোত্তম
তুমি আর্য্যকুল-রবি! ভাতে নিরুপম
মেঘমুক্ত দিনমণি! লহ নমস্কার,
হে সবিতৃ বাঙ্গলার! কবি চট্টলার
করে তোমা অর্ঘ্যদান! প্রবুদ্ধ-ভারত
করিছে প্রতীক্ষা আজি ওগো সিদ্ধ-ব্রত!
রুদ্র-গীতি তব কণ্ঠে শুনিতে এবার
সকল সুপ্তির অন্তে প্রণব-ঝঙ্কার।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিমলা।

বিমলা শঙ্খিনী জাতীয়া নারী। শঙ্খিনী নারী সাধারণত হাস্যময়ী প্রগল্‌ভা বাগ্বৈদগ্ধ্যা সাহসিকা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী, আর সকল প্রকার অভিনয়ে সুনিপুণা হইয়া থাকে। 'বিষবৃক্ষের কমলমণিও শঙ্খিনীরই আর এক মূর্ত্তি। বিমলা শঙ্খিনীর অন্যবিধ চিত্র। তিলোত্তমা পদ্মিনী।

আপাত দৃষ্টিতে বিমলা যে ভাবে গজপতির সহিত প্রেমালাপের অভিনয় করিল, রহিম সেখের সহিত প্রণয় খেলার ভাণ করিল—তাহা কোন সতী নারী করিতে পারে না। আদর্শের চক্ষুতে ইহা নিন্দনীয়। অথচ বিমলা পতি-প্রাণা সতী নারী। পদ্মিনী কি চিত্রিনী নারীরা ইহা পারে না; পারে এক শঙ্খিনী; তাহাও সকলে নহে। মানুষের মন লইয়াই সব। মনেই পাপ, মনেই পুণ্য। আপাত-দৃষ্টে মন্দবৎ প্রতীত কার্য্য অনেক সময়ে মন্দ হয় না। মন লইয়া বিচারই বিচার। মানুষে সে বিচার ঠিক করিতে পারে না, ভুল করে। তাই উপরের কার্য্য দেখিয়াই বিচার করিতে বাধ্য হয়। বিমলা যেরূপ অভিনয়ই করুক্, যেরূপ খেলাই খেলুক্, অসতীত্বের যে কোন মূর্ত্তিই দেখাক্, তাহাতে মন লিপ্ত ছিল না বলিয়া, তাহা দোষের নহে। মন যাহার নির্ম্মল রহিল—তাহার কার্য্য ত বাহিরের একটা খোসা মাত্র। আপাত-দৃষ্টে স-মলাবৎ প্রতীতা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্-মলাই।

বিমলা পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়া নারী—ইহা কবির উক্তি। নচেৎ তাহার তাম্বুলরাগ রক্ত ওষ্ঠাধর, কজ্জল-নিবিড় প্রশস্ত লোচনের চকিত-কটাক্ষ, রূপে ঢলঢল রসে টলমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; দেখিলে কে বলিবে ইহার বয়স চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের অধিক? এমন চাঁপা ফুলের মত কোমল ত্বক্, এমন চঞ্চল আবেশময় চক্ষু, এমন কুঞ্চিত বিপুল কেশভার যুবতীরই যোগ্য। যে নিজের যৌবনভারে নিজেই হাসে, বীণা-নিন্দিত মধুর স্বরে আপন মনে গান গায়, গোলাপ-পূর্ণ কর্পূর পূর্ণ তাম্বুলে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করে—তার যৌবন প্রবাহে ভাটা আসিয়াছে, ইহা কেহই বলিবে না। মুক্তাভূষিত কাঁচুলি, বিচিত্র কারু-কার্য্যময় বসন পরিয়া, কনক-রত্ন-ভূষায় সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, রত্নভূষিত পাদুকা লইয়া বিমলা যখন ভ্রমণে বাহির হয়—তখন তাহার রূপে পথ আলো হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন, সে আলো প্রদীপের আলোর মত। তাহাতে গৃহকার্য্য চলে, কিন্তু স্পর্শ করিলেই পুড়িয়া মরিতে হয়। সে রূপের আগুনে রহিম সেখ পুড়িয়া মরিল, গজপতি অর্দ্ধ দগ্ধ হইল। নবাব কতলু খাঁ উন্মত্তের মত সেই আগুন স্পর্শ করিতে গিয়াই জন্মের মত মৃত্যুকে লাভ করিল।

বিমলা বিলাসিনী, দর্পিতা, সুখলালসা পরিপূর্ণা ও প্রগল্‌ভ-যৌবনা নারী। ইহার সৌন্দর্য্য অপরাহ্ণের স্থলপদ্মের ন্যায়। নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্ক-পল্লব অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে, বিমলা প্রগল্‌ভা জাতীয়া নায়িকাশ্রেণীর অন্তর্গত। তিলোত্তমা মুগ্ধা, আয়েধ্যা, সধ্যা। বিমলা যে প্রগল্‌ভা, তাহা প্রগল্‌ভার লক্ষণ দেখিলেই বোঝা যায়। যথা—

স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্ত রতকোবিদা।
ভাবোন্নতা দয়ব্রীড়া প্রগল্‌ভা-আক্রান্ত নায়িকা॥

স্মরান্ধা—যৌবনোন্মত্তা, কামোন্মাদিনী। যৌবনমদমত্তা বিলাসিনী সুখলালসা-পরিপূর্ণা নারীই স্মরান্ধা। কবির বর্ণনামতে মিলাইলে বিমলা স্মরান্ধা, ইহা প্রতীতি হয়। বিমলা রূপে ঢলঢল, রসে টলমল। বিমলা সুখলালসা-পরিপূর্ণা। গাঢ়তারুণ্যা—প্রগাঢ়যৌবনা। যৌবনের শেষে, যৌবনের ভাবে ভাবময়ী, রসে রসময়ী, বিমলা গাঢ়যৌবনা নারী। ভাবোন্নতা—অণুভাবোন্নতা। অণুভাব আদিরসে ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদি। যথা, সাহিত্য দর্পণে—

উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈ র্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥

ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষচালনা, নেত্রসঙ্কোচ, অশ্রুপাত, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি অণুভাবে বিমলা যে কিরূপ নিপুণা, তাহা বিমলা চরিত্র অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। করুণ রসে, অদৃষ্ট নিন্দা ক্রন্দনাদি, হাস্যরসে, নেত্র-সঙ্কোচ বদনস্মেরতাদি অণুভাব। ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষক্ষেপ অঙ্গভঙ্গী অঙ্গচালনা হাসিখুসী প্রভৃতি অণুভাবের মধ্যেই। দরব্রীড়া—অত্যল্পমাত্র লজ্জাযুক্তা। প্রয়োজন—ক্ষেত্রে, অভিনয় হিসাবে, বিমলা সম্পূর্ণ নির্লজ্জার মত ব্যবহার করিলেও, সে সম্পূর্ণ নির্লজ্জা রমণী মধ্যে গণিত হইতে পারে না। বিমলা পতি-ব্রতা সতী নারী। পতিরতা সতী নারী হইয়া সে প্রগল্‌ভা-জাতীয়া। আক্রান্তনায়িকা—আক্রান্তঃ নায়কো যয়া সা—আক্রান্তনায়িকা। বিমলা যে কি ভাবে পুরুষগণকে অবলীলা-ক্রমে আয়ত্ত করিতে পারে, কেমন ভাবে তাহাদের আক্রমণ করিয়া পদানত করিতে পারে—তাহা গজপতি ও বিদ্যাদিগ্‌গজকে দিয়াই দেখা হইয়াছে। ইহাও এক জাতীয়

আক্রান্ত-নায়িকার কার্য্য। সাধারণতঃ নায়িক বলিতে এস্থলে প্রণয়ী, স্বামী।

নায়িকা প্রথমতঃ স্বীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী (প্রকাশ্য বার-বিলাসিনী) এই ত্রিবিধ। তন্মধ্যে বিনয়ার্জ্জবাদিযুক্তা গৃহকর্ম্ম-পরা পতিব্রতা নারীই স্বীয়া। সেই স্বীয়াই মুগ্ধা (তিলোত্তমা), মধ্যা (আয়েষা) প্রগলভা (বিমলা) ভেদে আবার এই তিন প্রকার। পরকীয়া—যাত্রাদি-নিরতা গলিত-ত্রপা কুলটা এক প্রকার। অজাতোপযমা (অবিবাহিতা) নব-যৌবনা সলজ্জা কুমারী আর একপ্রকার। পিতা প্রভৃতির আয়ত্তাধীনা বলিয়া ইহারাও পরকীয়া। সাধারণী—কলা-প্রগল্‌ভা সামান্য-নায়িকা, বেশ্যা। ক্বচিৎ অণনুরক্তা, সাধারণতঃ অনুরক্তা।

বিমলা সমস্ত রত-নিপুণা, প্রখর বুদ্ধিশালিনী সুশিক্ষিতা রমণী। তাহার উপর নিজে সে প্রণয় ব্যাপারে একজন ভুক্তভোগিনী। কাজেই জগৎ সিংহকে দেখিবামাত্র তিলোত্তমার মনোমধ্যে ভালবাসার সঞ্চার লক্ষ্য করিতে পারে। নিজের দৃষ্টান্তেই সে তিলোত্তমাকে বুঝিয়া লয়। সে যে নিজেই পিতার আশ্রমে বীরেন্দ্র সিংহকে দেখিবামাত্র অনুরাগিনী হইয়া পড়ে; তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে। কাজেই, সে তিলোত্তমার ভাবগতিক দেখিয়া, তাহার মনোমধ্যে যে প্রগাঢ় ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে। নিজের জীবনে স্পষ্ট উপলব্ধির জোরেই সে অত বড় পণ্ডিত পিতার সহিত তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেয়—"না না, প্রভু, সে লক্ষণ নয়। পক্ষমধ্যে তিলোত্তমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কি বয়স্যাদিগের সঙ্গে সেরূপ দিবারাত্র হাসিয়া কথা কহে না; তিলোত্তমা আর প্রায় কথা কয় না; তিলোত্তমার পুস্তক সকল পালঙ্কের নীচে পড়িয়া পচিতেছে; তিলোত্তমার ফুলগাছ সকল জলাভাবে শুষ্ক হইল; তিলোত্তমার পাখীগুলিতে আর সে যত্ন নাই; তিলোত্তমা নিজে আহার করে না; রাত্রে নিদ্রা যায় না; তিলোত্তমা বেশভূষা করে না; তিলোত্তমা কখনও চিন্তা করিত না, এখন দিবানিশি অন্যমনে থাকে। তিলোত্তমার মুখে কালিমা পড়িয়াছে।"

বিমলা, পিতার আশ্রমে, বীরেন্দ্র সিংহকে যেদিন প্রথম দেখিল, সেই দিনই তাহার চিত্ত পরের হইল। সেই দিনই সে বীরেন্দ্র সিংহে প্রাণ মন নিবেদন করিয়া বসিল। অভিরাম স্বামী শিষ্যের নিকট কন্যার বিবাহ করার কথা উত্থাপিত করিলেন। শূদ্রীগর্ভজা বলিয়া বিমলাকে বিবাহ করিতে বীরেন্দ্র অনিচ্ছুক হইল। অভিরাম স্বামী তখন কন্যাকে বীরেন্দ্র-অনুগামিনী দেখিয়া, তাহার আগমনে কন্যার অনিষ্ট হইতেছে বুঝিয়া, তাঁহাকে আশ্রমে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বিমলা তথাপি চাতকীর মত সেই বীরেন্দ্রের আগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিল; এমনই কামোন্মাদিনী—যে তাহাকে শূদ্রীগর্ভজা বলিয়া বিবাহ করিতে চাহে না, তাহারই সঙ্গ-লাভের আশায় তবু সে উন্মত্তা। ইহা স্মরান্ধা প্রগল্‌ভারই উপযুক্ত। ভাবোন্নতা আলঙ্কারিক-মতে অণুভাবোন্নতা। নচেৎ, ভাবোন্নতা নারী কখন এত আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-হীনা ভোগ-বিহ্বলা কামোন্মাদিনী হয় না। আদি-রসে ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষক্ষেপাদি, অণুভাব।

কিছুদিন পরে বীরেন্দ্র আবার যাওয়া আসা আরম্ভ করিল। কয়দিনের অদর্শনে বিমলা আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। এখন

আবার বীরেন্দ্রকে দেখিয়া সে আনন্দের আবেগে আপনাকে হারাইয়া বসিল। বীরেন্দ্রের সম্মুখে সে যেটুকু সঙ্কোচ করিয়া চলিত, সেটুকুও আর রহিল না। অসঙ্কোচে মেলামেশা চলিতে লাগিল। পিতা প্রমাদ গণিলেন। আসন্ন অনিষ্টপাত ভয়ে কন্যাকে বীরেন্দ্রের সম্মুখ হইতে সরানই এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য বুঝিলেন। সাব্যস্ত হইল, মানসিংহের অন্তঃপুরে মহিষী উর্ম্মিলা দেবীর তত্ত্বাবধানে বিমলা থাকিবে। সেস্থানে বীরেন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ আর ঘটিবে না। বিমলাও ক্রমে আপনাকে সংযত করিয়া লইবে।

বিমলা সেখানে লেখা পড়া শিখিল, নৃত্যগীতাদিতে পারদর্শিনী হইল। কিন্তু যে হৃদয় তাহাই রহিল। বীরেন্দ্র শূদ্রীগর্ভজা বলিয়া কিছুতে বিমলাকে বিবাহ করিবে না; অথচ, তাহারই জন্য বীরেন্দ্র উন্মত্ত, তাহাকেই চাহে। এই অবৈধ আকাঙ্ক্ষা, এই নির্লজ্জ ধৃষ্টতা, বিমলা বুঝিত না, এমত নহে। কিন্তু যে প্রণয়ে এমত উন্মত্তা, সে এসব আদৌ গণনা করে না। এমতই কামবিহ্বলা, সেই বীরেন্দ্রকে তবু সে চাহে। নির্লজ্জ এবং ধৃষ্ট বীরেন্দ্র মানসিংহের অন্তঃপুরে আশমানীকে দূতী করিয়া পাঠাইল। আর স্মরান্ধা আর প্রগল্‌ভা বিমলা সেই দূতী দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ধৈর্য্য বুঝি আর থাকে না।

একদিন রাত্রে সহসা বীরেন্দ্র আসিয়া বিমলার কক্ষে উপস্থিত হইল। আশমানীর সাহায্যে বারিবাহক দাস সাজিয়া বীরেন্দ্র রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য বিমলার ইহাতে সম্মতি ছিল না। অনেক দিনের পর সাক্ষাৎলাভ! অমনই বিমলা, সকল কথা ভুলিয়া, বীরেন্দ্রের কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। রাত্রে এমনভাবে মিলন এই প্রথম। এ মিলনে যে ফল ফলিত তাহা কখনই শুভ হইত না। বীরেন্দ্র উন্মত্ত কামুক, বিবাহে অনিচ্ছুক, অথচ তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। আর বিমলাও আত্মহারা কামোন্মাদিনী; বিবাহে অনিচ্ছুক বীরেন্দ্রের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী। আজিকার এই বিশ্রম্ভ সমাগমের ফল বিমলার পক্ষে ভাল নহে। বিমলা-চরিত্র বুঝি আর রক্ষা হয় না।

ভগবান মুখ চাহিলেন। চোর ধরা পড়িল। বন্দী হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিল। বিমলা তখন সমস্ত দোষ আপনার স্কন্ধে লইয়া, প্রণয়ীকে বাঁচাইতে যত্ন পাইল। পিতা অভিরাম স্বামী ও রাজমহিষী উর্ম্মিলা দেবীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, ক্ষমা চাহিল।

সাব্যস্ত হইল, বীরেন্দ্র যদি বিমলাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করে, তবে তাঁহার দোষের ক্ষমা হইবে। বীরেন্দ্র তথাপি বিবাহ করিতে চাহিল না। কারা-যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন অগত্যা অর্দ্ধ-সম্মত হইল; বলিল, "বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখন উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করি—নচেৎ নহে।"

বিমলা বিপুল পুলক সহকারে তাহাই স্বীকার করিল। দাসী বেশে ভর্ত্তৃ-ভবনে প্রবেশ করিয়া, সাধারণ চক্ষে রক্ষিতা-বৎ হইয়া বাস করিতে থাকিল। বিমলা পতি-প্রাণা প্রেমবতী সতী স্ত্রী—পতির প্রণয়-লাভ করিয়া সে সুখী হইল।

বিমলা স্বভাবতই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী। সে যখন ছয় বৎসরের বালিকা, তখনই এক

পাঠান বালককে চোরের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় করে; ভয়ে বিহ্বল হয় নাই। সেই পাঠান বালকই উত্তরকালের কতলু খাঁর সেনাপতি, মহাবীর ওস্মান্। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপে বিমলা মুক্তি-চিহ্ন-স্বরূপ অঙ্গুরী-লাভ করে।

শিক্ষাগুণে রাজান্তঃপুরের সাহচর্য্যে বিমলার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরও মার্জ্জিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মানসিংহ মহিষী উর্ম্মিলা দেবী বিমলাকে একপ্রকার নিজ হাতে লেখাপড়া শিখাইলেন, শিল্পকার্য্যে নৃত্যগীতে সম্যক্ পারদর্শিনী করিয়া তুলিলেন। এমত মণি-কাঞ্চন সংযোগ সকলের ভাগ্যে মেলে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাইয়া বিমলার প্রকৃতি-দত্ত গুণ সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ-লাভ করে। তাই বিমলা অত চতুরা, অত বুদ্ধিমতী, অত নির্ভীক, অত প্রগল্‌ভা হইতে পারিয়াছিল।

শৈলেশ্বর মন্দিরে প্রথম দর্শনেই বিমলার অসামান্য বাক্‌পটুতা শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হই। তাহার পর, তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তির পরিচয় পাইয়া ততোধিক বিস্মিত হই। বিদ্যাদিগ্‌গজকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া, পথেই কেমন বুদ্ধি করিয়া তাহাকে বিদায় দিল; মৃত অশ্ব, পাগড়ী ও ঘোড়-সোয়ারের চিহ্ন দেখিয়া বহুতর সেনা গড় মন্দারণের পথে গিয়াছে, ইহা অনায়াসেই সে অনুমান করিল। জগৎসিংহকে সঙ্গে করিয়া আনিবার কালে, শব্দ শুনিয়া, পশ্চাতে কেহ আসিতেছে বলিয়া সে বিবেচনা করিল। পরিশেষে, গুপ্তপথ দিয়া গিয়া, বীর-পঞ্চমীর ব্রতের নাম করিয়া, জেলখানার প্রহরীর নিকট হইতে কেমন কৌশলে বর্শা লইয়া আসিল।

বিমলার নির্ভীকতা সাধারণ স্ত্রীলোকে সম্ভবে না। সশস্ত্র বীরপুরুষের কবলে পড়িয়া বিমলা ক্ষণকালের জন্য বিহ্বলা চিত্রার্পিত পুত্তলিকা-বৎ নিষ্পন্দ হইয়াছিল মাত্র। তার পর যে বিমলা সেই বিমলা। তারপর অমৃতময় রসালাপে, বিশাল চক্ষুর অব্যর্থ কটাক্ষ-সন্ধানে প্রহরীকে মুগ্ধ করিয়া, নিজের বন্ধন মোচন করিয়া লইল। বিমলা এক আশ্চর্য্য রকমের অভিনেত্রী; তাহার অভিনয় অভিনয় বলিয়া বুঝে, তাহার সাধ্য। মুগ্ধ প্রহরী বিমলার ভালবাসার অভিনয় সত্য বলিয়া বুঝিবে, আশ্চর্য্য কি? বিমলা ওড়না দ্বারা বাতাস দিতে লাগিল। প্রহরী কৃতার্থ হইল। আবার বিমলা যখন তাহার নবনীত সুকুমার কোমল কর-পল্লবে তাহার কর ধরিল, কণ্ঠস্থ স্বর্ণহার তাহার কণ্ঠে পরাইয়া প্রণয়ীর আদর করিল, তখন সেই উন্মত্ত প্রহরী সশরীরে স্বর্গে গেল। সে রূপাগুণে সেখজী পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া গেল। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—বিমলার রূপের আলোয় পুড়িয়া মরিতে হয়। আদর্শের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, সতী-নারীর পক্ষে এ অভিনয় অবশ্য অনুচিত। কিন্তু বিমলার চরিত্রগত বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলে বলিতে পারা যায় যে, তাহার কোন পাপ-স্পর্শ হয় নাই। আর মন, আরব্ধ অভিনয়-কার্য্যে, অনেক সময়েই নির্লিপ্ত ও অকলুষ ছিল, বলা যায়। নির্লিপ্ত অকলুষ মনের অভিনয়-খেলা, কার্য্যসিদ্ধির উপায়রূপে আরব্ধ বলিয়া, নিন্দনীয় নহে, মনে করা যায়। এই অভিনয় সকলে পারে না। যে পারে না, তাহার নিকট ইহা পাপের মতই ভীতি-প্রদ। যে পারে, তাহার কাছে ইহা খেলার মত সহজ। বিমলার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শালিনী রমণী এমন অভিনয় করিতে পারে। বিমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনন্য সাধারণ। প্রহরী রহিম সেখের নিকট হইতে

পলায়ন করিয়া আবার যখন তাহারই হস্তে ধরা পড়িল, তখন কেমন করিয়া প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব খাটাইয়া তাহারই দ্বারা নিজের কার্য্যো-দ্ধার করিয়া লইল। চতুরা সুন্দরী নারীরা কামী পুরুষকে মুগ্ধ এবং প্রলুব্ধ করিয়া, এক কথায় বোকা বানাইয়া, কেমন যথেচ্ছভাবে চালনা করে, তাহাদিগকে লইয়া কেমন বানরের মত নাচাইয়া থাকে—তাহার সুন্দর চিত্র দেখা গেল।

সেই হাস্যময়ী প্রগল্‌ভা নারীর চক্ষুর উপর সুতীক্ষ্ণ কুঠার সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, আর প্রিয়তমের (বীরেন্দ্র সিংহের) ছিন্ন শির রুধির-সিক্ত ধূলিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিমলা প্রস্তরমূর্ত্তির মত তখন দণ্ডায়-মানা রহিল। মস্তকের একটী কেশ বাতাসে দুলিল না; চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইল না, কেবল শোকভার-স্তম্ভিতা হইয়া নিষ্পলক-নেত্রে স্বামীর ছিন্ন-শির প্রতি চাহিয়া রহিল।

চক্ষুর উপর প্রিয়তমের রক্ত দর্শন করিয়া বিমলা হৃদয়ের সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিল। সে পতির নৃশংস হত্যা চক্ষে দেখিয়া মন প্রাণকে প্রতিহিংসার উত্তেজনায় কঠোর করিয়া লইল।

যে বিমলা একদিন জগৎসিংহকে বর্শা আনিয়া দিয়া শত্রু বধে আপনাকে নিমিত্ত-ভাগিনী মনে করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল; আমি মহাপাতকিনী, আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহুকালেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না বলিয়া ব্যথিতা হইয়াছিল; শত্রুবধে ধর্ম্ম আছে শুনিয়াও তবু যাহার মুখে "যোদ্ধারা এখন বিবেচনা করুক, আমরা স্ত্রীজাতি" এই কথা শুনা গিয়াছিল; সেই বিমলাই আজ অবলীলা-ক্রমে কতলুখাঁর বক্ষে আমূল ছুরিকা বসাইয়া দিতে কুণ্ঠিতা হইল না। বিমলার মানসিক কোমল-বৃত্তি, ও দ্বিধা-সঙ্কোচ প্রিয়তমের রুধির স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে বলিয়াই, আজ সে নবাবকে প্রতিশোধ দিতে সক্ষম হইল। এ হত্যা নহে, এ দণ্ড। বিচারকের মত বিমলা নিজ হস্তে এই দণ্ডের বিধান করিয়া অনুতপ্তা হয় নাই। সামান্য মাত্রও মুহ্যমানা হইয়া পড়ে নাই—তাই "পিশাচী নহি, সয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী" বলিয়া বাধ্য হইয়া কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। ইহা উত্তেজনা-জাত হত্যা মাত্র হইলে, বিমলা সে সময়ে অমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া কখন পলায়নে সফল-কামী হইতে পারিত না।

পতিহত্যার শোধ হইয়া গেল। পতিহীনা বিধবার জীবন ধারণের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গেল। আর জীবনের লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই, ফলও নাই। তিলোত্তমাকে সুখী দেখাই এক্ষণে শেষ আকাঙ্ক্ষা, তাহাও পূর্ণ হইল। দুঃখের মধ্যে ইহা একটী অভাবনীয় আনন্দ! এই দুঃখ শোকে আনন্দ মিশিল। বিমলা পাগল হইয়া গেল। যে প্রতিশোধের জন্য সে, নারী হইয়া, পতিব্রতা কুলস্ত্রী হইয়া, হত্যা করিল, তাহা তাহার কঠোর ব্রত-পালন। এ এক প্রকার আত্মবলি। সে ঠিক পতির তৃপ্তি-সাধনের জন্য বা পতির শেষ-আজ্ঞা পালনের জন্য, আপনার হৃৎপিণ্ডচ্ছেদ ও করিতে পারিত। তাই নবাবকে অস্ত্রাঘাত করিল; তাই ইহা হত্যা নহে। হত্যা করা বিমলার প্রকৃতির উপযোগিনী নহে। হত্যা-কারিনী পিশাচী নারীও, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায়, পাপের অনুশোচনায়, কখন কখন পাগল হইয়া উঠে। আর সতী নারীতে সেই হত্যার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে না?

অত যার চিত্তবল, অত যার নির্ভীক সাহস, অত যাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি—সে করিবে কি? অত বড় শোকে তাহার কান্না আসিল না। শোকের আগুণ অথচ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। শোকের তাপই ক্রন্দনের আকারে উচ্ছসিত হয়; পশ্চাৎ অশ্রু হইয়া নির্গত হয়। তাহাতে শোকের তাপ কথঞ্চিৎ শীতল হইয়া থাকে। যাহারা কাঁদে না, তাহাদের তাপ সমানই উষ্ণ থাকে। সেই উষ্ণতায় দেহের অভ্যন্তর-ভাগ ক্রমে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। ফলে, সেই তাপ ইন্দ্রিয় ও পরিশেষে মনকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। পরিণামে উন্মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়। আত্মহত্যাও ইহার বিষময় ফল। বিমলা উন্মত্তা হইয়া যে অধিক দিন বাচিয়া থাকে নাই, স্বর্গগত পতির সহিত পরলোকে সত্বরই যাইয়া মিশিয়াছিল—তাহা আমরা পাঠকবর্গকে নিশ্চয় করিয়া জানাইয়া রাখিলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

গান।

(ভৈরবী—টোরী)

আকাশের আলোর সাথে
মিল্‌বি যদি সহজ হ'।
কাননের ফুলের সাথে
মিল্‌বি যদি সহজ হ'।
তরু-মর্ম্মর পবন দোলায়
মৃত্য-দোদুল তারার মালায়
যে গান দোলে সেই দোলাতে
দুল্‌বি যদি সহজ হ'।

আনিস্ নে তোর ঘরের কথা
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথা
সহজ সরল শিশুর প্রাণে
বাহির-হ'।
দেখ্ রে চেয়ে আকাশ পানে
বিশ্বভুবন ভরা গানে
সেই গানের তালে হৃদয় মেলে
সহজ হ'॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার।

"প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধের (১) উপসংহারে লিখিয়াছিলাম যে, প্রাচীন ভারতে অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে বারান্তরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই অসবর্ণ-বিবাহ প্রধানতঃ দুই প্রকার—অনুলোম ও প্রতিলোম। অদ্য আমরা অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে

(১) অর্চ্চনা, ফাল্গুন, ১৩২৫।

সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া, অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

শাস্ত্রে দেখিতে পাই প্রাচীন ভারতে চারিটী মূল বর্ণ ছিল—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

এই বর্ণ বিভাগের পূর্ব্বে, ভারতাগত আর্য্যদিগের যে কোন পুরুষ যে কোন নারীর পানিপীড়ন করিতেন। পরে, জাতি বিভাগের উৎপত্তি হইলে, তদানীন্তন সমাজ-নীতি-বিদ্‌গণ, এই বিবাহ বিষয়ে কতকটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। তাই আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—

সর্ব্বাগ্রে দ্বিজাতীনাম্ প্রশস্তদ্বার কর্ম্মনি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরা॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা বিশঃস্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্র
জন্মনঃ। ৩।১৩

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয় প্রথমে স্ব-জাতীয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করিবেন, উহাই তাহাদিগের প্রশস্ত বিবাহ। তবে তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে—তাঁহারা অসবর্ণা কন্যাদিগের ও পানিপীড়ন করিবেন। বৈশ্য—বৈশ্যা ও শূদ্রা; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা; এবং ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। এই যে শাস্ত্রানুসারে উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নীচ বর্ণের স্ত্রী সহিত বিবাহ ইহাকে অনুলোম বিবাহ বলে। এই সমস্ত বিবাহ সমাজে কি ভাবে নিষ্পন্ন হইত? মহাত্মা মনু বলিতেছেন—

পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাসুপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি। ৪৩।

শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্য প্রতোদো বৈশ্য কন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট রেদনে॥ ৪৪।৩অ

সমান জাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিতে হইলে পাণি-গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইবে। আর অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহে বক্ষ্যমান রীতিমত-বিধান প্রশস্ত জানিবে। ব্রাহ্মণ যখন ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবেন, তখন ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ধৃত শর গ্রহণ করিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যখন বৈশ্যাকে বিবাহ করিবেন, বৈশ্যা বর কর্ত্তৃক প্রতোদের (গো-তাড়ন যষ্টির) একদেশ গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিলে, শূদ্রা ব্রাহ্মণাদির প্রবৃত বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবেক।

—ভারতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত অনুবাদ।

অবশ্য এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমান সমান বর্ণের বিবাহই যখন "পাণি-গ্রহণ-সংস্কার" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন অসবর্ণ-বিবাহ বিবাহই নহে। আমরা কিন্তু এ বৃথা প্রশ্নের কোন হেতু দেখি না। কারণ, প্রথমে দেখা উচিত যে "পাণিগ্রহণ" বা "পাণি-গ্রহণ-সংস্কার" এই দুইটী শব্দের প্রকৃতার্থ কি এবং উহাদের ব্যাপ্তি ব্যাপকতাই বা কি? পাণি-গ্রহণ শব্দের মুখ্যার্থ "হস্তধারণ" অর্থাৎ বর কর্ত্তৃক কন্যার হস্ত ধারণ; গৌণার্থ—"বিবাহ"। তাহা হইলে, "পাণি-গ্রহণ সংস্কার" শব্দের মুখ্যার্থ—হস্তধারণ কর্ম্ম এবং গৌণার্থ "বিবাহ কর্ম্ম।" এক্ষণে আমরা দেখিব, ভগবান মনু কোন্ অর্থে এই "পাণি-গ্রহণ সংস্কার" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি ভগবান মনু "পাণিগ্রহণ সংস্কার" "হস্তধারণ কর্ম্ম" এই মুখ্যার্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। কেন?—কারণ, শ্লোক সংস্থিত "উদ্বাহ কর্ম্মণি" শব্দের দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন

হইতেছে। কেবল ইহাই নহে; শ্লোক সংস্থিত "শূদ্রয়োৎকৃষ্ট রেদনে" শব্দ দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, মহাত্মা মনু বিবাহ বিষয়েই বলিতেছেন, অন্য কোন বিষয়ে নহে।

যাহা হোক, উদ্ধৃত প্রমাণাবলী হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, উচ্চ বর্ণ নীচ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত এবং ইহাও শাস্ত্রানুমোদিত। এক্ষণে আমরা দেখিব, ঐ সকল অসবর্ণা স্ত্রীগণ এবং তাহাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণ তদানীন্তন সমাজে কি ভাবে গৃহীত হইতেন। মনু বলিতেছেন—

গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যা প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥২১০।২ অ,
[অভিমুখী করণায় বাদনং নামোচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কারঃ
অভিবাদয়ে ভো অমুক শর্ম্মা অহমিত্যেবং রূপ।
তত্ পাদস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কারঃ।—শব্দকল্পদ্রুম]

অর্থাৎ, গুরুর অন্তেবাসিগণ সবর্ণা পত্নীকে ঠিক গুরুর মত পূজা করিবেন। আর গুরুর অসবর্ণা ভার্য্যাগণও উহাদিগের সম্যক্ পূজনীয়া। গুরুর অসবর্ণা স্ত্রীকে দেখিলে (বসিয়া থাকিলে) গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদবন্দনা ও অভিবাদন করিবে।

যখন সমাজে অসবর্ণ-বিবাহ প্রথম প্রচলিত হয়, তখন অসবর্ণা নারীর গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃ-বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। তাই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

"মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রা যেন জাত স এব সঃ।" ২-২৯

ক্রমশঃ, পরবর্ত্তী যুগে, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কিছু তারতম্য ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, অনুলোমজগণ-"অপসদ" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নীচ বলিয়া অভিহিত হন। তথাহি—

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতে বর্ণযোদ্বয়োঃ।
বৈশস্যে বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়তেঽপসদা স্মৃতাঃ ॥১০।১০

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা এবং বৈশ্যের শূদ্রাজাত এই ছয়জন অনুলোমজ পুত্র। ইহারা স্ব স্ব পিতার সবর্ণ-স্ত্রী-জাত পুত্রগণ হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। পরবর্ত্তী যুগে, ইহারও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, অসবর্ণা-স্ত্রী-জাত সন্তানগণের কোন পৃথক সংজ্ঞা ছিল না। পরে, ইঁহারা পিতৃ-স্ব-জাত্য পাইলেও, পৃথক সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে থাকেন। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই অনুলোম সন্তানগণের একটী তালিকা দিয়াছেন। আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম—

বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়াং, বিশঃ স্ত্রিয়াং অম্বষ্ঠ;
শূদ্র্যাং নিষাদোজাতঃ পারশবোঽপি বা। ৯১
বৈশ্যা শ দ্রাস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাৎ তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ
বিধিস্মৃতঃ।৯২।১অ

তত্র বিজ্ঞানেশ্বর—ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াং বিন্নায়াম্ উৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত নাম পুত্রো ভবতি। বৈশ্য কন্যকায়াং বিন্নায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম পুত্রো ভবতি। শূদ্রায়াং বিন্নায়াং নিষাদ নাম পুত্রো ভবতি। নিষাদো নাম কশ্চিৎ মৎস্যঘাতজীবী প্রতিলোমজঃ সমাভুদিতি পারশবোঽয়ং নিষাদ ইতি সংজ্ঞা বিকল্প, বিপ্রাৎ ইতি সর্ব্বত্র অনুবর্ত্ততে। ৯১।

বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াং চ বিন্নায়াং রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ যথাক্রমং পুত্রৌ সম্ভবতঃ। বৈশ্যেন শূদ্রায়াং বিন্নায়াং করণো নাম পুত্রোভবতি। এষ সবর্ণ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি বিন্নাসু উঢ়াসু এষ স্মৃত উক্তো বেদিতব্যঃ। এতে মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠ নিষাদা মাহিষ্যোগ্রকরণা অনুলোমজাঃ পুত্রা বেদিতব্যঃ।

অবশ্য আপনারা প্রশ্ন করিবেন, যে বিষ্ণু সংহিতায় ও অগ্নি পুরাণে ত অনুলোমজগণকে "মাতৃবর্ণা" বলিয়া উক্ত হইতে দেখা যায়। হাঁ, আমরা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা" ও "অনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতি মাতৃসমা স্মৃতা" ইত্যাদি বচন যে না দেখিয়াছি এমন নহে। তবে এই বচন দ্বয় সাধীয়সী নহে। কেন আমরা এরূপ বলিতে অভিলাষী? কারণ, এই উক্তিগুলি মন্বাদি সংহিতা ও অন্যান্য পুরাণের উক্তির সহিত সম্পূর্ণ বিরোধী; সুতরাং ইহা গ্রাহ্য নহে। আমাদের এই উক্তির সমর্থন জন্য নিম্নে কতকগুলি প্রমাণ অধ্যাহার করিব। ইহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে বিষ্ণুসংহিতা ও অগ্নিপুরাণের বচনদ্বয় অগরীয়সী।

স্ত্রীষ্বনন্তর জাতেষু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু মাতৃদোষ বিগর্হিতান্ ॥৬।১০ম মনু।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহাদের অসবর্ণা স্ত্রীজাত সন্তান, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্রকরণ ইহারা সকলেই পিতার সদৃশ।

উক্তঞ্চ ব্যাসদেবেন—

উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামজ্ঞাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥৯।২ অ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রথমতঃ সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যদি ইচ্ছা বশতঃ অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তবে সেই অসবর্ণা-স্ত্রী-জাত সন্তান "সবর্ণাৎ ন প্রহীয়তে"—পিতৃ স্বজাত্য হইতে একেবারে অধিক নিকৃষ্ট হইবে না, কিঞ্চিৎ হীন হইবে।

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণ্যাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈবহি ॥২৮—৪৭

তবে ইহাদের মধ্যে মুখ্য ও গৌণভেদে কিছু তারতম্য ছিল; তাই আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—

ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রীয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগেঽয়ং বিধি স্মৃতঃ ।১৪৯
চতুরোঽংশান্ হরেদ্ বিপ্র স্ত্রীন্ অংশান্ ক্ষত্রিয়াসুত।
বৈশ্যাপুত্রোঽহরেৎ দ্ব্যংশং অংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ।

যাহা হোক, এতদ্বারা সপ্রমাণিত হইল যে প্রাচীনকালে অনুলোমজ-গণ পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন; পরন্তু মাতৃবর্ণ নহে। শাস্ত্রে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, মিশ্র অনুলোমজ-গণও (অর্থাৎ অনুলোম জাতিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহিত সন্তানগণ) পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহারা দ্বিজাতির মধ্যে গণ্য হইতেন। তথাহি—

"মাহিষ্যেণ করণাস্তু রথাকর প্রজায়তে" তত্র বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরা—ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামুৎপাদিতঃ মাহিষ্যঃ। বৈশ্যেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতা করণী। তস্যাং মাহিষ্যেণ উৎপাদিতো রথাকারো নাম জাত্যা ভবতি। তস্য চ উপনয়নাদি সর্ব্বং কার্য্যং বচনাৎ সদাহ শঙ্খঃ—

ক্ষত্রিয় বৈশ্যানুলোমস্তরোৎপন্ন যো রথাকারঃ তস্য ইজ্যা দানোপনয়ন সংস্কার ক্রিয়া অশ্বপ্রতিষ্ঠা রথসূত্রবাস্তু বিদ্যাধ্যয়ণ বৃত্তি তা চ।

এই কারণেই জাতি-তত্ত্ব-বারিধি-প্রণেতা লিখিয়াছেন—পূর্ব্বকালে, মাতা 'যে কোন জাতীয়াই হউন না কেন, সন্তানগণ পিতৃ স্বজাত্য বা তৎসাদৃশ ভজনা করিতেন। এই কারণে, ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ-কন্যা হইতে জাত, আভীর বা সদ্‌গোপগণ, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য-কন্যা হইতে জাত তাম্বুলিকগণ, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্য-কন্যা হইতে জাত সুবর্ণবণিকগণ এবং অম্বষ্ঠ রাজপুত্রী হইতে জাত গন্ধবনিকগণ ও তথাবিধ দ্বিজাতি সম্পৃক্ত অন্যান্য বহুজাতি এক সময়ে উপবীত ধারণ করিতেন। সুতরাং তাঁহারা দ্বিজাতির মধ্যেও পরিগণিত ছিলেন। —জাতি-তত্ত্ব-বারিধি, ১ম ভাগ, ১২৯ পৃষ্ঠা।

ক্রমশঃ, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল মিশ্র-অনুলোমজ-গণের ও অনুলোমজগণের মধ্যে কতকগুলির দ্বিজোচিত গুণের অভাব ঘটিলে পর, তদানীন্তন সমাজনীতিবিদ্‌গণ দ্বিজাতির শূদ্রাপরিণয় পাতিত্বজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং মিশ্র-অনুলোমজ-গণকে দ্বিজাধিকার দানে বিরত

হন (২)। ফলে, যে মহাত্মা মনু বা ভৃগু ঔদার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিজাতিরও শূদ্রা বিবাহের বিধি মনুসংহিতার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই মনুসংহিতায় কোন অজ্ঞাত-নামা রক্ষণশীল ব্যক্তি দ্বিজাতির শূদ্রাবিবাহের নিন্দাসূচক নিম্নোক্ত তিনটী শ্লোক অন্তঃ-প্রবেশন (interpolation) করিয়া দেন—

"ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতো।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥"
১৩।৩।১০

"হীনজাতি স্ত্রীয়ং মোহাৎ উদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু স সন্তানানি শূদ্রতাং॥" ১৪ ঐ

"শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতাং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যা দেবহীয়তে॥ ১৭ ঐ

যাহা হৌক, পরিশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, মোট ছয়টী জাতি দ্বিজাতির অন্তর্গত; অন্যান্য জাতি নহে। তাই মনুসংহিতায় লিখিত রহিয়াছে—

স্বজাতি জামন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিনঃ
শূদ্রানাং তু স্বধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজা স্মৃতাঃ। (৩)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, ও বৈশ্য ও বৈশ্যা সমান জাতিতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই স্বজাতিজ তিন পুত্র এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত মাহিষ্য এই তিন অনন্তরজ পুত্র, মোট এই ছয় জাতি উপনয়ন-যোগ্য ও দ্বিজ-পদ-বাচ্য। আর অপধ্বংসজ-গণ শূদ্র-ধর্ম্মা। এই অনুলামজ-গণ সমাজ কি ভাবে গৃহীত হইতেন?

(২) আমরা মনে করি, মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে, ২৫ শ্লোকটী পরবর্ত্তী যুগে মনুসংহিতায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(৩) এই শ্লোকটীও মনুসংহিতাতে পরবর্ত্তী যুগে যোজিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম মূর্দ্ধাবসিক্তাশ্চ বৈদ্যাঃ ক্ষত্রবিশাবপি
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্।
(মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক-কৃত চন্দ্রপ্রভা-ধৃত হারীত বচন)

ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম) মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই পাঁচ জনের যথাপূর্ব্ব গৌরব।

এখানে মহর্ষি হারীত ষড়দ্বিজের পরিবর্ত্তে পঞ্চদ্বিজের নাম লইয়াছেন, খুব সম্ভব ঐ যুগে মাহিষ্যজাতির পতন ঘটিয়াছিল বা অন্য কারণও থাকিতে পারে। তাই হারীত উহার নাম করেন নাই। যা হোক, সামাজিক পরি-বর্ত্তনের জন্য এরূপ বিধি হইল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র যে উহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা মনে হয় না; কারণ তাহা হইলে মহর্ষি উশনা বলিতে পারিতেন না—

শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাত্যাপারশবামতাঃ।
মদ্রকাদীন্ সমাশ্রিত্য জীবেয়ু পূজকাঃ স্মৃতাঃ।
৯।২।খ

ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শূদ্রা কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে যে পারশব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা মদ্রাদি (পাঞ্জাব?) দেশে দেব-পূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এই পারশবেরা হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকিলেও তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নহেন? দেবার্চ্চনা কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে?

হিন্দুসমাজ বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আসিয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কাজেই আমরা এখন শাস্ত্রোক্ত অনেক অনুলোম জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। ভারতের কোন প্রদেশে মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, মাহিষ্যগণেরও অবস্থা তদ্রূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে

মূল বর্ণ ক্ষত্রিয়; বৈশ্যজাতি নাই। তবে কি আমরা মনে করিব যে, ঐ সকল জাতি একেবারে কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন। স্থূল দৃষ্টিতে এরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভারতে চতুর্ব্বর্ণ প্রতিষ্ঠার বহু-কাল পরে, যখন জাতিগুলি জন্মগত হইয়া দাঁড়াইল, তদানীন্তন সময়ের সমাজনেতৃগণ মূল বর্ণ চতুষ্টয়ের যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তদ্রূপ অনুলোম জাতিরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। (৪) হিন্দু রাজত্বের সময় যে যাহার বৃত্তি সে তাহাই করিত। যদি না করিত তবে তাহার বর্ণ সঙ্করত্ব ঘটিত। তাই মনু বলিতেছেন—"স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করঃ।" আর বর্ণসঙ্কর হইলেই তাহারা শূদ্রধর্ম্মাবলী হইতেন। সুতরাং, তদানীন্তন সমাজের নিষ্পেষণে পরবর্ত্তীযুগে অনেকের জাতি-পতন যে ঘটিয়াছিল, তাহা ধ্রুবই। তাই আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচিত বংশগত উপাধি (৫) এখনও তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যে দেখিতে পাই। কে বলিতে পারে যে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চ জাতিগুলি ইদানীন্তন সমাজের তথা-কথিত শূদ্রজাতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করে নাই? ইহার কি প্রমাণের অভাব আছে?

(৪) কুল্লুক মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—বৃত্তয়শ্চ এষাম্ উশনা উক্তা—হস্ত্যশ্ব রথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তানাং নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতি শুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুর রক্ষাচ পারশবোগ্রকরণানাম্।

(৫) ভবিষ্যতে উপাধি-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার বাসনা রহিল।

তৎপর আবার শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি-গ্রহণ (৬) করিয়াও, এই সকল অনুলোমজ-জাতি পরবর্ত্তী-যুগে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ও এখনও হইতেছেন! বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া, উদাহরণ-স্বরূপ, আমরা বাঙ্গলার দুইটী প্রধান জাতির বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে অম্বষ্ঠ-গণ বাঙ্গলা দেশে বৃত্তি অনুসারে—"অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" "বৈদ্যজাতি" বলিয়া পরিচিত, সেই অম্বষ্ঠগণই উৎকলে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত! উৎকলের কারিকাই এ বিষয়ে জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—

করশর্ম্মা ভরদ্বাজ ধরশর্ম্মা পরাশরঃ
মৌদ্গল্য দাশশর্ম্মা গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ
ধন্বন্তরি সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ,
শাণ্ডিল্য চন্দ্রশর্ম্মা চ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইমে॥
—উৎকল-কারিকা।

কার্য্যব্যপদেশে সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থানহেতু আমরা জানিতে পারিতেছি যে, উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশে "বৈদ্য" বা "অম্বষ্ঠ" উপাধি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ রহিয়াছেন! আবার যে কায়স্থগণ উৎকলে 'করণ বলিয়া পরিচিত (৭), বাঙ্গলা দেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৃত্তি অনুসারে তাঁহারা "কায়স্থ" (৮) বলিয়া পরিচিত। মিথিলার

(৬) উশনা বলিয়াছেন—বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে। কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোপি তথৈবাগ্নেয় বৃত্তিকঃ ধ্বজিনী বৃত্তি কোপি চিকিৎসা শাস্ত্র জীবিকঃ॥

(৭) উড়িষ্যাবাসী কায়স্থগণ করণ বলিয়া পরিচিত। কৈলাসে চন্দ্র সিংহ লিখিত প্রবন্ধ; ১২৯৫ সাল, ৪২৩ পৃষ্ঠা, নব্যভারত।

(৮) করণঃ পুং শূদ্রা বৈশ্যয়োর্জ্জাতি বিশেষ ইত্যমরঃ। অথ লিখনবৃত্তি কায়স্থ ইতি (তট্টীকায়াং) ভরতঃ শব্দকল্পদ্রুম।

লোকেরা কায়স্থকে "লিখনী দাস"(৯) বলিয়া অভিহিত করেন।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুসমাজের মধ্যে কত মিশ্রণ সংমিশ্রণ ব্যাপার ঘটিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞগণ অবগত আছেন। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি নীচাদপি নীচ জাতিও ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। যাঁহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ শূদ্র বলিয়া অভিহিত করি, তাঁহারা অধিকাংশই মূলতঃ অনার্য্য শূদ্র নহেন; পরন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয়ের অন্তর্বংশ।

অতএব আমরা দেখিলাম যে প্রাচীন আর্য্যসমাজে অনুলোম বিবাহের বহুল প্রচলনই, সমাজে বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী বিভাগের প্রধান কারণ। পৌরাণিক যুগের সামাজিক শাসনে এবং বৌদ্ধ ও পরবর্ত্তী যুগের নানা বিপ্লবে হিন্দুসমাজ শতধা বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে, যে সকল উচ্চজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছিল, আজ ইংরাজি শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত হইয়া, তাঁহারা তাঁহাদের সমাজে স্ব স্ব অধিকার-লাভে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা যে সমাজের শুভ-লক্ষণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা করি, সমাজ-নেতৃগণ উদারতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়।

(৯) কায়স্থোঽক্ষর জীবিকঃ। হলায়ুধঃ।

অনাদর।

হে মোর জীবন-প্রিয়, অবহেলা ভরে
দলিয়া-মথিয়া তুমি হৃদয় আমার,
ম্লান ছায়া আঁক, তৃষিত নয়ন প'রে
মোর! সমাদরে কাছে ডাকিও না আর।

—তোমার আদরে সখা, ভুলি ভগবানে,
তব অনাদরে কাঁদি তাঁহারি সন্ধানে!

শ্রীঅনাথ বন্ধু সেন।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্কোটাস্ ঈরিগিনা।

(Scotus Erigena)

মানব পার্থিব ও অপার্থিব যাবতীয় জীবরাজ্যের সারাংশে গঠিত এবং বিশ্বের ক্ষুদ্রাবয়ব; একারণ সমগ্র সৃষ্টির উপরেই তাহার আধিপত্য অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবতার সহিত মানবের প্রভেদ এই যে, মানব পাপাশ্রিত জীব, অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন তাহার উদ্ধারের উপায় নাই। কেবল দেহের সহিতই পাপের সম্বন্ধ। দৈহিক

বিকাশের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রাধান্য অধিক হওয়ায় বুদ্ধির স্ফূরণ হয় না বলিয়া পাপের ক্রিয়াই অধিক প্রতিভাত হয়।

মানব মূলে দেহভাব পাইয়াছিল বলিয়াই যে পাপের আধিকাবশতঃ তাহার এই অবনতি হইয়াছে, তাহা নয়; তদীয় অধোগতিও আবার দেহভাব-প্রাপ্তির কারণ। দৈহিক বৈলক্ষণ্য, ব্যধি, মৃতবৎ জড়তা, দেহের সহিত আত্মার বিরোধ, স্ত্রীপুংভেদ, এসকলেই পাপ, পতন, ঈশ্বর-বিচ্যুতি এবং বিশ্বপ্রেমের অভাব প্রকটিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত যখন সৃষ্টিই নাই, তখন যাহাকে আমরা ঈশ্বর-বিচ্যুতি, পাপ বা পতন বলি, তদ্দ্বারা কোন বাস্তব সত্তার জ্ঞান না হইয়া বরং অসত্তার জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। সৃষ্টি বিষয়ে অপটুতা, অকৃত-কার্য্যতা, এবং নাস্তিত্বের ধারণা হয়। অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্ব নাই; যে বস্তু যে পরিমাণে মঙ্গলকর, তাহার অস্তিত্বও ততটুকু, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব বা সারবত্তাই পরিমাপক। বাস্তবে এবং পূর্ণতায় প্রভেদ নাই। এই তত্ত্বকেই যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে, যে বস্তু সর্ব্বৈব অসম্পূর্ণ, যাহাতে পূর্ণত্বের আভাস মাত্র নাই, সে বস্তুর অস্তিত্বও নাই; কিন্তু এরূপ বস্তুরই ত কল্পনা হয় না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, মূর্ত্তিমান পাপ, যাহাকে পাপের পূর্ণাবতার বলা হয়, তাহা জগতে দুর্লভ। সত্তা, জীবন কিম্বা মঙ্গলের অভাবকেই অমঙ্গল বলে। কোন বস্তু হইতে যদি তাহার সারভাগ বা সদ্‌গুণাবলী নিঃশেষে নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে সে বস্তুর বস্তুত্বই থাকে না, তাহা তখন সর্ব্বতোভাবে লোপ পাইতে বাধ্য।

সৃষ্টি চিরন্তন এবং নিরবচ্ছিন্ন; সৃষ্টি ক্রিয়ার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। ঈশ্বর-মহত্ত্বেই জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী, কালে নয়; কাল দ্বারা তাঁহার অগ্রবর্ত্তিতা বা আদিমতার তুলনা হয় না। তিনি সর্ব্বাংশে, সম্পূর্ণরূপে ধ্রুব; জগতের ধ্রুবতা আপেক্ষিক। সূর্য্য কিম্বা অগ্নি হইতে যে প্রকারে তাপ বা আলোক বিচ্ছুরিত হয়, ঈশ্বর হইতেও সেই প্রকারে জগতের বিকাশ হইয়াছে। ঈশ্বরের ভাবই সৃষ্টি এবং তাহাতেই জগতের উদ্ভব। ঈশ্বরের ভাবের যেমন আরম্ভ নাই, তাঁহার ক্রিয়াশীলতারও সেইরূপ আরম্ভ নাই। প্রাণীমাত্রই মূলতঃ অক্ষয় ও অমর, নিখিল প্রাণিজগৎ অনাদি ও অনন্ত কাল সূত্রে গ্রথিত। আমরা সকলেই প্রাচীনতম কাল হইতে জীবিত রহিয়াছি, তবে বর্ত্তমানে আমাদের যে, যে পর্য্যায়ে অবস্থিত, তাহার সেই পর্য্যায়, এক অসীম কারণ পরম্পরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর পূর্ব্বাপর পূর্ণ-ব্রহ্ম-রূপে বিরাজমান; তিনিই কেবল কালের কোন বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে বীজরূপে অবস্থান করেন নাই। বাইবেলে যে বলে, "কিছু না" হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই "কিছু না"র অর্থ শূন্য (০) নয়, পরন্তু তাহা এমন "কিছু" যাহার তুলনা হয় না,—তাহা এক অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য, অ-পার্থিব বস্তু যাহাতে ভগবানের অসীম সৌন্দর্য্যের আদিরূপ নিহিত রহিয়াছে; সেই রূপ মানবের বাঙ্‌মানসোগোচর ত বটেই, এমন কি দেবতার ও অপরিজ্ঞাত।

জাতি, শাখা বা শ্রেণী এবং ব্যক্তি (individual) অসীম মহাসত্তা (infinite being) হইতে পর্য্যায়-ক্রমে বিশিষ্ট হইয়াছে। সামান্য ও বিশেষের অনন্ত বিশ্লেষণই সৃষ্টি। সত্তা সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম স্তর, সর্ব্বজীবের আদি

ভাব। সত্তা হইতেই দেহাবস্থিত প্রাণ পর্য্যায়-ক্রমে পৃথগ্‌ভূত হইয়াছে। প্রাণ হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি, এবং বুদ্ধি দেবতা-ও-মানব-ক্রমে, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর জীব গণ্ডিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মানবে আবার বুদ্ধির পরিণতি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশরূপে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ। যাবতীয় সৃষ্টি কতকগুলি ঐককেন্দ্রিক বৃত্তের (concentric circle) সম্যক সমন্বয়। একদিকে, পারমার্থিক সত্তার (divine essence) অবিরাম বিকাশ, প্রসার ও স্ফুরণ; অপরদিকে, সৃষ্টির শেষ পরিধি হইতে জীবের ঈশ্বরানুবর্ত্তন। এই উভয় গণ্ডীর মধ্যে গমন ও আগমন ভিন্ন সৃষ্টির আর অন্য অর্থ নাই। মনুষ্য বিরচিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, বস্তুতঃ কিরূপে আদি-কারণ (first causes) হইতে দ্রব্যনিচয়ের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কিরূপেই বা দ্রব্য সমূহের শ্রেণী ও জাতি বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারই নির্ণয় করা। এই অর্থে বিজ্ঞানকে "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্" (dialectics) নাম দিয়া তাহাকে জড়-বিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞানে (*) বিভক্ত করা যায়, কিন্তু প্রকৃত "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্" আদি-যুগের "সফিষ্ট" বা তার্কিক দিগের মতানুসারে কেবল কল্পনা বা খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। স্বয়ং ঈশ্বরই নিখিল বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার মূলীভূত কারণ এবং তিনিই "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌কে" বস্তুজাতের স্বরূপের সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সংযোগেরই পরিণতি-স্বরূপ মানবাত্মা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিয়া পরিশেষে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে। জগতের পক্ষে এই পরিবর্ত্তন মানবে সাধিত হয়, মানবের পক্ষে খ্রীষ্টানে ও খ্রীষ্টে এবং খ্রীষ্টানের পক্ষে তদীয় সূক্ষ্ম শরীরের ভিতর দিয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভাবে, ঈশ্বরেই পর্য্যবসিত হইতেছে। বস্তু মাত্রেই যেমন ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হয়, তেমনি আবার ঈশ্বরেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। স্কোটাস্ যে সার্ব্বজনীন পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ-বাদের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য মোক্ষ-লাভ। মোট কথা, পতিত দেবতা, পতিত মানব এবং পতিত জীব, সকলেরই ঈশ্বরত্বে অধিকার আছে; কেহই ঈশ্বরানুগ্রহে বঞ্চিত নয়। নরকের শাসনই আত্মোৎকর্ষের হেতু। পরমার্থ বা মোক্ষলাভ অপেক্ষা মহত্তর পুরস্কার নাই, পাপকৃত সন্তাপ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা-প্রদ দুঃখও নাই। দণ্ডমাত্রই স্বকৃত কর্ম্মের ফল, ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘনের অনিবার্য্য পরিণাম।

সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্।

(St. Anselm)

স্কোটাস ঈরিগিনা অমানিশার উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তত্তুল্য প্রতিভাবান ব্যক্তি তৎকালে আর জন্মিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। এই সময়ে(†) অর্থাৎ

* গ্রীকদর্শন, ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† প্রাচ্য প্রদেশে বোগ্দাদ্, বসোরা, বোখারা ও কুফার বিদ্যালয় এবং পশ্চিমে স্পেনদেশে কর্ডোভা, গ্রাণাডা, টোলেডো, সেভিলা, মুর্ষিয়া, ভ্যালেন্‌সিয়া, আলমিরিয়া প্রভৃতির বিদ্যালয়। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে আরবীয়েরাই গ্রীক, পারসিক ও হিন্দুদিগের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্র অ্যারিষ্টটোলীয় দর্শন এবং নব-আদর্শবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠামাত্র। তাঁহারা যে এই মতদ্বয়ের এত ভক্ত ছিলেন, তাহার কারণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের একেশ্বরবাদের সহিত এই দুই

খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আরবীয় শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ যখন গ্রীসীয় এবং প্রাচ্য দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিপত্তি লাভ করিতেছিল, সেই সময়ে অপরদিকে ইউরোপ খণ্ডের খ্রীষ্টীসমাজে, কতিপয় ব্যক্তি জ্ঞান (reason) ও বিশ্বাস (faith), উভয়ের সমন্বয়-সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। ইঁহাদের একজনের নাম জার্ব্বার্ট বা দ্বিতীয় সিলভেষ্টর্ (Gerbert or Sylvester, II); ইনি আরবদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। টুর্সের বেরেঙ্গার (Berengar of Tours), লাফ্রাঙ্ক (Lanfranc), নীতিবিষয়ক একখানি পুস্তক-প্রণেতা টুর্সের বিশপ্, লাভার্দ্দিনের হিল্‌ডিবার্ট্ (Hildebert of Lavardin) প্রভৃতি কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য। স্কোটাস্ যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, এই সকল ব্যক্তির কিন্তু তাহাতে উৎসাহ ছিল না। তাঁহাদের জ্ঞানের পরিধি সঙ্কীর্ণ ছিল। এজন্য সাধারণতঃ তাঁহারা অর্ব্বাচীনের ন্যায় সামান্য সামান্য বিষয়ের তর্কে সময়াতিপাত করিতেন। এ স্থলে তাঁহাদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। "ঈশ্বরানুকম্পায় কি কুমারী বারাঙ্গনা কুমারিত্ব পায়?" "মূষিকে খ্রীষ্টানের মাংস ভক্ষণ করিলে কি খ্রীষ্টের মাংসই ভক্ষণ করা হয়?" খ্রীষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের তখনও শৈশবাবস্থা, সুতরাং এই সকল প্রশ্নের সমাধানেই তাঁহাদের অনুরাগ দেখা যাইত। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মূলে যে উত্তরকালের এক তুমুল সংগ্রাম প্রধূমিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্কোটাসের পর লাফ্রাঙ্কের শিষ্য সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্‌ই ভাবুক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া গণ্য। তিনি খ্রীষ্টীয় ১০৩৩ অব্দে আওস্তায় (Aosta) গ্রন্মগ্রহণ করেন। পরে, ১০৬০ অব্দে নর্ম্মাণ্ডির অন্তর্গত "বেক্" মঠের অ্যাবট্ (abbot) পদে এবং পরিশেষে ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টারবেরির প্রধান যাজকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি Monologium, Prosologium, Apologeticus, Fide Trinitales, De Grammatico, De Veritale প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা।

সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্ ও সেণ্ট আগষ্টাইন্, উভয়ের মূলমতে ভেদ ছিল না; একারণ, সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্‌কে দ্বিতীয় আগষ্টাইন্ বলা হইয়া থাকে। আগষ্টাইনের ন্যায় তিনিও

মতের ঐক্য আছে। মূল মতের পুনরাবৃত্তি হইলেও আরবদিগের দ্বারা ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

আরবীয় শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

(১) ঈরিগিনার সমসাময়িক অল্‌কেন্দি (Alkendi) ও বোগ্দাদের অল্‌ফ্যারেবী (Alfarabi)। শেষোক্ত ব্যক্তি খ্রীষ্টান দার্শনিকদিগের আদৃত একখানি কোষগ্রন্থের রচয়িতা। (২) অবিচিন্ন (Avicenna or Ibn-Sina)। ইনি একজন চিকিৎসক এবং অ্যারিষ্টটলের টীকাকার। (৩) অলগ্‌জল্ (Algazal)। ইনি বোগ্দাদের একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং সন্দেহবাদী দার্শনিক (১১১১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু)। (৪) স্পেনদেশে সারাগোসার এভম্পাস্ (Avempace or Ibn-Badja), ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। (৫) কাডিজের ইবন্ ভপ্‌হৈল (Ibn-Tophail, খৃঃ ১১০০-৮৫)। (৬) কর্ডোভার এভ্‌রোজ (Ibn-Racid, খৃঃ ১১২৬-৯৮)। ইহাকে "ভাষ্যকারের ভাষ্যকার" বলা হয়। ইঁহাদের সকলেই বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন।

বলিয়াছেন, বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল এবং বিশ্বাসি ধর্ম্ম-বিষয়ক যাবতীয় তর্ক ও চিন্তার পূর্ব্বগামী। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের মূলতত্ত্বে আস্থা নাই বলিয়া মূলতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টাও নাই। বিশ্বাসীদের চেষ্টা আছে, কারণ তাহাদের মূলতত্ত্বে আস্থা আছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, উভয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু এক, তত্ত্বজ্ঞানলাভ; প্রভেদ এই যে, একের উদ্দেশ্য সফল হয়, অপরের হয় না। অবিশ্বাসীর তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বিষয় জ্ঞানের মূল যেমন অভিজ্ঞতা, তত্ত্বজ্ঞানের মূলও তেমনি বিশ্বাস। দুয়ের কার্য্য একই রূপ। অন্ধ যেমন আলোকের অনুভূতি নাই বলিয়া আলোক কিরূপ জানে না; মূক ও বধির যেমন শব্দের অনুভূতি নাই বলিয়া শব্দ কিরূপ জানে না; অবিশ্বাসীও সেইরূপ আত্মিক অনুভূতির অভাবে তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে বুঝিতে পারে না। যেবিষয়ে যাহার অনুভূতি নাই, সেবিষয়ে তাহার জ্ঞান হইবে কিরূপে? আমরা (অর্থাৎ বিশ্বাসীরা) বিশ্বাস করি বলিয়াই বুঝিতে চাই ও তাহার ফল-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি। উদার মতাবলম্বী খ্রীষ্ট সমাজের পবিত্র শিক্ষা ও দীক্ষায় কোন খ্রীষ্টানেরই সন্দেহ থাকা উচিত নয়। পরন্তু তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য যে তিনি দীনতার সহিত, ভক্তির সহিত, উক্ত শিক্ষা ও দীক্ষায় আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক তাহা বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করেন। সত্যই যদি তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত গ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে নিখিল বুদ্ধির কারণ স্বরূপ সেই পরমেশ্বরের প্রতি তিনি অবশ্যই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবেন। অপারগ হইলে তাঁহার নিজেরই অসামর্থ প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য অন্য কেহই দায়ী নহেন এবং মতেরও কোন দোষ নাই। না বুঝিয়া মতের দোষ দেওয়া কিম্বা তাহার বিপক্ষতাচরণ করা, অবিধেয়। বিশ্বাসের ফলে কেবল যে, ধর্ম্মের অনুরেদ্গাম হয়, তাহা নহে,—খৃষ্টানের লক্ষ্য কেবল বিশ্বাসী হওয়া নয়,—বিশ্বাস অবিচলিত থাকা; যেহেতু, এই বিশ্বাসেই চিন্তা ও ভাবের পরিণতি, চরম অভিব্যক্তি; ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের স্থিতিকেন্দ্র বা সন্ধিস্থল।

উপরোক্ত বিবরণ সেণ্ট অ্যান্‌সেল্‌মের প্রায় স্ব-উক্তি বলিলেই হয়। উহা পাঠকালে মনে হয়, তিনি যেন কেবল ধর্ম্ম জগতেরই লোক; কিন্তু ঠিক তাহা নহে। এই ধর্ম্মপ্রাণ উদারচেতা দার্শনিক আপনাকে যত সরল ও সহজ লোক মনে করিতেন, বস্তুতঃ তিনি তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে স্বাধীন-চিত্ত ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি একজন খাঁটী সাম্প্রদায়িক মতবাদী এবং মধ্যযুগীয় দর্শন-শাস্ত্রের মূলভিত্তি জ্ঞান ও বিশ্বাসের সদ্ভাব স্থাপনকর্ত্তা।

তাৎকালিক পদ্ধাতিক্রমে সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্ অধ্যাত্মের দিক দিয়াই দর্শন শাস্ত্রের কূট মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে, তদীয় উপদেশাবলী এক সুবৃহৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হইয়াছিল। সেণ্ট্ আগষ্টাইনের ন্যায় তাঁহার তর্কও অন্তর্ম্মুখী ও অবরোহ-পন্থী ছিল। প্রথমেই তিনি ঈশ্বরকে নিখিল সৃষ্টির নিমিত্ত ও উদ্দেশ্য-সাধক-কারণ রূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র (Theodicy) একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং মতের সমীচীনতায় তাহা অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। মোট কথা সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্ হইতে সে সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বের যে

পরিমাণে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতে ইহাকেই এক পরিণত-বিজ্ঞান (science) রূপে গ্রহণ করা চলে। উত্তরকালের দার্শনিকগণ স্ব স্ব বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভাবে ইহার বিভিন্ন ভাষ্য প্রচার করিলেও মূল তত্ত্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তৎপ্রণীত Prosologium ও Monologium গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তৎসহ ঈশ্বরের গুণাবলী (অর্থাৎ মৌলিকতা, নিত্যত্ব, বিরাটত্ব প্রভৃতি), সৃষ্টি বিবরণ এবং দৃষ্টান্ততত্ত্বও (exemplarism) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এই স্থলে কয়েকটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব (existence of God) ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তিগুলির অধিকাংশই সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলমের মৌলিক। তিনি বলেন—"এমন কোন বস্তু অবশ্যই আছে যাহা স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ, মহান্ ও স্ব-প্রতিষ্ঠ, সেই বস্তুই ঈশ্বর।" পুনশ্চ, এই যে বিশাল প্রতীয়মান শ্রেণী-বিন্যস্ত প্রাণি জগৎ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজিত, ইহার মূলে এমন কোন বস্তু অবশ্যই বিদ্যমান, যাহার অপেক্ষা মহত্তর বস্তুর অবস্থিতি অসম্ভব, সেই বস্তুই পরমেশ্বর। অধিকন্তু, আমরা সকলেই এমন এক মহাপুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি যাঁহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী মহাপুরুষের কল্পনাই হয় না। এরূপ ধারণা হয় কেন? এরূপ ধারণা হয়, কেন না এবম্প্রকার পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্তা বা বিদ্যমানতা স্বয়ংই পূর্ণতাব্যঞ্জক। একারণ, পূর্ণসত্তার ধারণা হইতে পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতএব এই পূর্ণ পুরুষই ঈশ্বর। মধ্যযুগে সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলমের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সমীচীন বিবেচিত হইলেও এবং তিনি এই মতের প্রথম প্রচারকর্ত্তা হইলেও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কিন্তু ইহার দোষ দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বা মহৎ কোন বস্তুর ধারণা থাকিলেই যে সেই বৃহত্তম বা মহত্তম কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, তাহা বলা ভুল। গউনিলো (Gaunilo) নামে সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলমের সমসাময়িক এক ব্যক্তি উল্লিখিত যুক্তির এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ মহাসমুদ্রস্থিত কোন অসীমসৌন্দর্য্যশালী দ্বীপের কল্পনা করেন, তাহা হইলে সেই দ্বীপের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিত, বিশেষতঃ সেণ্ট্ টমাস্, এই মতকে ভ্রান্ত মত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। সত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ (definition of truth)—সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলন্ dederitale (সত্যসিদ্ধান্ত) নামক গ্রন্থে সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সত্যকে তিনি অতিন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক ভাবেই দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সত্য (ut debent) বস্তু সকলের সারত্ব প্রতিপাদক মিলনগ্রন্থী, পারমার্থিক সভার প্রতিনিধি, যাবতীয় বস্তুর সারভাগ যাহা পরিশ্রুত ও প্রমাদপরিশূন্য হইলে কেবল বুদ্ধিরই অধিগম্য হয়। সত্যের নাশ নাই, সত্য নিত্যচঞ্চল মানসরাজ্যের বহির্দ্দেশে, অর্থাৎ ভগবানে বদ্ধমূল। এস্থলেও সেণ্ট্ আগষ্টাইনের সহিত সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলমের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে রস্কেলিনের (Roscelin) বিরুদ্ধে পারমার্থিক ঐক্যের সমর্থন,—রস্কেলিন বস্তুতত্ত্বের (realisim) বিরোধী ছিলেন, অথচ পর্‌ফিরী প্রচারিত ত্রিমূর্ত্তিবাদের (doctrine of trinity) মূলে

তিনি পৃথক পৃথক তিনটি দেবতার কল্পনা (tritheism) করায় তদ্দ্বারা এক ভ্রান্ত মতের উৎপত্তি হইতেছিল বুঝিতে পারিয়া, ইহাও বলিতে বাধ্য হন যে, তিনটি দেবতা (God the Father, God the Son and God the Holy Ghost) পরস্পর পৃথক বটে কিন্তু তাহারা একই ইচ্ছাপ্রণোদিত এবং একটিমাত্র মহাশক্তি পরিচালিত। রস্তেলিনের এই ধারণা হইতে খ্রীষ্ট সমাজে একটু গোলযোগের সূত্রপাত হয়। সেণ্ট অ্যান্সেলম্ দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করেন যে, ত্রিমূর্ত্তি সংক্রান্ত বিশ্বাস কেবল কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; পরন্তু উহা বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্ভূত এবং ঈশ্বরের অসীমত্বেই তাঁহার ঐক্য (unity) সূচিত হয়। এই মত হইতে সেণ্ট্ অ্যান্সেলম্কে একজন গোঁড়া বাস্তববাদী মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি গোঁড়া বাস্তববাদী ছিলেন না। অন্ততঃ তিনি বাস্তববাদের (realism) এমন কোন ব্যাখ্যাই করেন নাই যে, তদ্দ্বারা সর্ব্বদেবত্ববাদের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাঁহার "থিওডিসী" গ্রন্থ ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। মোটের উপর, তাঁহার (Monologium) গ্রন্থের সহিত "গ্রাম্যাটিকো" গ্রন্থের বড় মিল ছিল না। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি জাতিবাচক শব্দ (the universals) সমূহ দ্বারা কোন বাস্তব সভা প্রকটিত হয় না বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। কেন না, জাতিবাচক শব্দ সকল ভাষারই রূপান্তর মাত্র।

মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান,—মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সেণ্ট্ অ্যান্সেলম্ কোন বিশেষ গ্রন্থ রচনা না করিলেও কয়েকটি স্থূল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলে। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং মনোবৃত্তির মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, মনোজ সংস্কারগুলির মূলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য লক্ষিত হয়। মনোবৃত্তি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা (১) স্মৃতি, (২) বুদ্ধি ও (৩) প্রেম (love)। আত্মা স্বয়ংই আত্মজ্ঞানে সমর্থ, ইহাঁর জন্য অপর কোন বস্তুর মধ্যবর্ত্তিতা আবশ্যক নাই। ঈশ্বরে তিনি যে এক অসীম পারদর্শিতার আরোপ করিয়াছেন, তাহা বুঝা কঠিন। যদিও তিনি পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক দিগের ন্যায় মানবের দ্বিবিধ প্রকৃতির বিষয় অবগত ছিলেন না, তবু মানব প্রকৃতিতে যে জড় ও বুদ্ধির ক্রিয়া যুগপৎ লক্ষিত হয়, তাহা বুঝিতেন। আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই।

সেণ্ট্ অ্যান্সেলামের নীতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মত প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক। আদি পাপ জীবমাত্রেই সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা ঈশ্বরানুজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল। ঈশ্বর স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ হইয়াও পাপকে ক্ষমা করিতে পারেন না, পাপের মার্জ্জনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কেন না, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বের (majesty) হানি হয়। তবে কি পাপ হইতে জীবের ত্রাণ নাই? অবশ্যই আছে। এই ত্রাণের নিমিত্তই ঈশ্বরকে অবতার হইতে হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিকট পাপের মার্জ্জনা নাই, তবে তিনি পাপীকে মার্জ্জনা করেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, পাপ সর্ব্বসাধারণে জীবমাত্রেই সংক্রমিত বলিয়া ব্যক্তিবিশেষকে দণ্ড দিলে, তদ্দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধ হয় না। সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস ভিন্ন অথবা অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভিন্ন, পাপীর উপযুক্ত সাজা নাই। কিন্তু জীবের সুখের নিমিত্তই যে সৃষ্টি, অনন্ত সুখই যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই জন্যই, উভয় দিক রক্ষার নিমিত্ত, ঈশ্বরকে অবতার-(incarnation) রূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

বাসনা।

আমি চাই ফুল্ল ফুলটির মত
পবিত্র সুরভি হ'তে
আমি চাই শুধু আপনা ভুলিয়া
সুবাস বিলায়ে দিতে,
চাই—নিভৃতে ফুটিয়া সাধনা সাধিয়া
নীরবে ঝরিয়া যেতে,
কুমুদের মত প্রতিদান ভুলে
প্রেমে আত্মহারা হ'তে।
তটিনীর মত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া
অনন্তে মিশিতে চাই,
নীল নভোস্থলে ধ্রুবতারা মত
স্থিরলক্ষ্য হয়ে রই।
জ্যোছনার মত স্নিগ্ধ নির্ম্মল
সমুজ্জ্বল হ'তে সাধ;
ভুলে যেতে চাই জগতের তুচ্ছ
অভিমান বিসম্বাদ।
জুড়াইতে চাই তপ্ত ধরাবক্ষ
সলিলের শৈত্য লয়ে,
অন্তের মালিন্য ধুয়ে দিতে সাধ
নিজ অশ্রুধারা দিয়ে!
আকাশের মত প্রশস্ত প্রশান্ত
যেন এ হৃদয় হয়;
সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম, তিতিক্ষা, বিশ্বাসে
যেন সদা উজলয়।
তোমারি কাজেতে, ওহে জগদীশ,
আপনা সঁপিতে চাই,
(আমি) আর সব ভুলি, শুধু তুমি নাথ
বিরাজ এ হৃদি ঠাঁই।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

চক্‌চকে আন্দোলন।

দেশে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে—"জয় গান্ধী মহারাজের জয়।" যাঁহার নামে এই জয়ধ্বনি, তিনি ত্যাগী, সাধু, কর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বদেশ-প্রেমিক। তাঁহার উদ্দেশ্য দেশের দুর্গতি মোচন। কাজেই তাঁহার অকপট আহ্বানে দেশের লোক উৎকর্ণ হইয়াছে, ও অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তি হইয়াছে। মানুষেরা যখন একজনের সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হয় ও সাধু-পুরুষের প্রচারিত কর্ম্ম করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, তখন ভাবের উত্তেজনায় ও শ্রদ্ধার আধিক্যে আপনাদের বিচার শক্তি হারাইয়া ফেলে; যেখানে ভাবের চমক আছে, সেখানে নিজের মনের মোহকেই অনেকে সুবুদ্ধির প্রেরণা মনে করে। সাধু হইলেই যে মানুষ সুবুদ্ধি অথবা সুবিচারক হইবেন, এখন কিছু ধরা বাঁধা কথা নাই। কিন্তু সাধুতার আকর্ষণে অনেক লোকই সে কথা বুঝিতে পারে না।

মকরসংক্রান্তির দিন শুনিলাম যে, নয় মাসের মধ্যেই আমরা সকলে স্বরাজই পাইব। সে পদার্থটা কি, তাহা ভাল করিয়া কেহ কাহাকেও বুঝায় নাই, কিন্তু তবুও কালিদাসের অভিশপ্ত যক্ষের মত আশায় বুক বাঁধিয়াছি যে আগামী কার্ত্তিকী একাদশীর দিন আমরা শাপ-মুক্ত হইব। আমরা নাকি যে-যেমন

স্নিগ্ধছায়া তরু,' তলায় আছি, সেইরূপ থাকিলেই চলিবে; কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আপনাদের পাঠশালা ছাড়িয়া এই নয় মাস ধরিয়া যদি হিন্দি পড়ে ও চর্‌কা কাটে, তাহা হইলেই আমরা হাতে হাতে স্বরাজ পাইব। এত তাড়াতাড়ি ও এত সহজ উপায়ে ভারতবর্ষ তাহার অজানা সাধনার ধন পাইবে, এ কথায় অনেকের চমক লাগিয়াছে। চলিত কথায় বলে—সবুরে মেওয়া ফলে; তবে আমরা যখন 'বিলম্ব' বুঝাইতেও চলিতকথায় 'ছ'মাস—ন' মাস' বলিয়া থাকি, তখন মেওয়া ফলার তাড়াতাড়ি হইবে বলিতে পারি না। সিদ্ধিলাভের উপায় সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, কলেজের ছাত্রেরা, ন্যায়-শাস্ত্রের সরু সুতা না কাটিয়া, চর্‌কা ধরিলে, দেশের লোকের শারীরিক লজ্জা দূর না হইলেও, ভদ্রলোকের ছেলেরা শ্রমজীবীর কাজকে লজ্জাজনক মনে করিবে না; কাঠের চর্‌কায় যাহাই ফলুক, অনেকে হয়ত নিজের চর্‌কায় তেল দিতে শিখিবে।

এখনও কিন্তু গোড়ার কথাটার বিচার হয় নাই; স্বরাজ পদার্থটা কি, তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। কথাটার অর্থ হয়ত এই, যে ইংরেজেরা তাহাদের চাটি-বাটি তুলিয়া জাহাজে উঠিবে, আর গোটা ভারতবর্ষের শাসন ও রক্ষার ভার এ দেশের লোকের হাতে পড়িবে। প্রথম সমস্যা এই যে ইংরেজেরা, বিনা জোর জুলুমে, তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য, কল-কারখানা, রেল-টেলিগ্রাফ ও এক-ছত্র প্রভুতা ফেলিয়া যাইবেন কেন? চর্‌কার ঘেনর ঘেনর শুনিয়া যে দিক্ হইয়া পালাইবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প; কারণ, আমাদের কংগ্রেসের অনেক বক্তৃতা শুনিয়াও উঁহারা পালান নাই। তবে আশার কথা এই যে, সুরেন্দ্র নাথ যখন তাঁহার চিরজীবনের সাধনার ফল পাইয়াছেন, তখন ফল না পাইবার কথা না উঠিতেও পারে। ধরিয়া লইলাম, ইংরেজ পালাইবেন; কিন্তু যদি অন্য কোনও বিদেশী আমাদের টুঁটি কাটিতে আসে, তখন কি করিব? তখন কি আবার দেশের বাঞ্ছারাম সর্দ্দারেরা উপবাস করিয়া ও চর্‌কা ধরিয়া শত্রু তাড়াইবেন? আমরা না হয় আগামী আশ্বিনে চর্‌কা-বাহন-স্বরাজ ঠাকুরের পূজা করিব, ও কার্ত্তিকী একাদশীর উপবাসের পারণার দিনে মুক্তি-ফল পাইবার আশায় থাকিব। কিন্তু, আমাদের অগ্রহায়ণের পাকাধানে কেহ মই দিতে আসিলে, কি দিয়া আটকাইব?

ইহার উত্তরে হয়ত কেহ কেহ আমাদের কানে কানে বলিয়া যাইতে পারেন, যে নয় মাসে ভারত উদ্ধারের কথাটা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলিবে বলিয়া প্রচারিত হয় নাই; ঐ আশার কথা প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে, দেশের লোক (বিশেষ কলেজের ছাত্রেরা) এই চমক্‌দার কথা শুনিয়া চট্ করিয়া, কোমর বাঁধিয়া, কাজে লাগিবে। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের উন্নতির জন্য সকল শ্রেণীর লোককেই খুব উৎসাহে আদা জল খাইয়া কাজে লাগা চাই; তবে যাহাতে স্থায়ী উৎসাহ বাড়ে, যাহাতে বুঝিয়া সুঝিয়া আশায় উদ্দীপ্ত হওয়া যায়, সেই সত্য জিনিষটাকে আনিয়া সম্মুখে না ধরিলে, কু-ফল ফলিতে পারে। ঠিক কার্ত্তিকী একাদশীর উপবাসের পর যদি আস্ত স্বরাজ দেখা না দেয়, যদি সেদিনকার অবস্থাকেই গোঁজামিল দিয়া খাঁটি স্বরাজের গোঁড়া বলিয়া বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে প্রচারক মহাত্মার গোঁয়ার চেলার দল একেবারে চটিয়া যাইতে পারে,

এবং অন্য কোন চিত্ত-রঞ্জন কথায় না ভুলিতেও পারে। একবার বেলুনে ঘোড়া উড়িবার বিজ্ঞাপন দেখিয়া বহুলোক টাকা খরচ করিয়া দর্শক হইয়াছিল। কিন্তু, যখন দেখিল যে বেলুনে কাঠের ঘোড়া বাঁধা, তখন দর্শকেরা বেলুনওয়ালাকে মারিতে ধাইয়াছিল।

আসল কথা না বুঝাইয়া ভবিষ্যৎ-বাণী করিলে, ভবিষ্যৎ-বক্তাকে বুজরুক সাজিতে হয়, ও চেলার দলকে অন্ধ-ভক্ত করিতে হয়। এদেশ গুরুগিরি ও বুজরুকিতেই ডুবিয়াছে; দেশের লোক না বুঝিয়া সুঝিয়া শাস্ত্র, গুরু ও আচার মানিয়া তাহাদের হাড়ে-মাসে গোলামি-বুদ্ধি পাকাইয়া তুলিয়াছে। যাহাতে গোলামি বুদ্ধি বেশি করিয়া পাকে, তাহা কি স্বাধীনতা লাভের অনুকূল? আমরা সকলেই দেখিয়াছি, কলেজের যে সকল ছেলেরা আড়ির দলে জুটিয়াছে, তাহারা অপরের স্বাধীন মত ও স্বাধীন ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়াছে, ও জোর না করিবার নামে, বেজায় জুলুম করিয়া অপরকে ইচ্ছানুরূপ পথে চলিতে দেয় নাই। অপরের স্বাধীন বুদ্ধিকে যাহারা সম্মান করিতে জানে না, তাহারা যে নিজেরা গোলামিতে ডুবিয়া অপরকে গোলামির আবর্ত্তে ফেলে, ইহাও কি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে? গান্ধি মহারাজের মন বিশুদ্ধ আছে বলিয়াই মনে করি। কিন্তু, অনেক চেলারা যে তাহাকে খাঁটি দেবতা বা নূতন অবতার করিয়া তুলিতেছে, তাহা অনেক জনরবে শুনিতে পাই। যে প্রথায় কাজ চলিতেছে, তাহাতে বাস্তবিকই নেতাকে অবতার খাড়া না করিলে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়া চলে না। তাহা হইলেই দাঁড়াইল এই যে, গোলামি-বুদ্ধি না পাকাইলে ও গোলামিতে না ডুবিলে, স্বরাজ বা স্বাধীনতা মিলিবে না। এযে বিরোধী-কথায় জোড়া বিষম হেঁয়ালি!

আড়ির দলের নেতাদের মনের ভাব হয়ত এই যে, স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের জন্য সময়ের অপেক্ষা করিলে চলিবে না—একেবারে দেশ শুদ্ধ লোক প্রস্তুত হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে উহা লাভের জন্য অপেক্ষা করা চলিবে না। যদি এইটি তাঁহাদের মনের ভাব হয়, তবে কেহই তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারেন না। আমি আড়ির দলের কার্য্য-প্রণালীর বিরোধী, কিন্তু যাহা তাঁহাদের মত বলিয়া আন্দাজে ধরিয়া লইয়াছি, তাহা সমর্থন করি। এ বিষয়ে দু-চারিটী কথা বলিলে আমার মনের ভাবও স্পষ্ট হইবে, আর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যাহা করা উচিৎ, তাহাও বুঝিবার সুবিধা হইবে।

প্রতি মানুষের জীবনের গতিই স্বাধীনতার দিকে। শিশু আপনার পায়ে দাঁড়াইতে চায়, ও সকল বাধা এড়াইয়া নিজের ক্ষমতায় চলিতে চায়; চলিতে শিখিবার পথ অবাধ না হইলে, কোন শিশুই মানুষ হইতে পারে না। জৈবিক ক্ষমতার হিসাবে শিশুতে শিশুতে প্রভেদ থাকিতে পারে,—কিন্তু সকলেরই বাড়িয়া উঠিবার সুবিধাটা অবাধ হওয়া চাই। সুবিধার স্বাধীনতার নামই যথার্থ স্বাধীনতা। রেলগাড়ী চলিতেছে, আর উপযুক্ত টাকা দিলেই যে কেহ যে কোন শ্রেণীর যাত্রী হইতে পারেন; যদি কেহ টাকা দিয়াও টিকিট কিনিতে না পায়, অথবা শ্রেণী-বিশেষের টিকিট কিনিয়াও, সে শ্রেণীর গাড়িতে উঠিতে না পায়, তবে রেলের সুবিধা হইতে সে বঞ্চিত হয়। যদি রাজ্য শাসনে এমন ব্যবস্থা থাকে যে, অমুক লোক অমুক প্রদেশের বলিয়াই, সে সৈন্য-বিভাগে হউক অথবা অন্য

কোন বিভাগে হউক ঢুকিতে পারিবে না, তবে স্বাধীনতার পথে সে লোকের পূর্ণ বাধা। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা; জ্ঞান-লাভে হউক, পদমর্য্যাদা-লাভে হউক, যদি সমাজের কোন শ্রেণীর কোন লোক আপনার পথে পা বাড়াইতে বাধা পায়, তবে সে সমাজ দাসত্ব-দোষে দুষ্ট। শাসন তন্ত্রে হউক, বা সমাজ-তন্ত্রে হউক, যদি আমরা দেখিতে পাই যে একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বা দলের লোক কর্ত্তাগিরি চালাইয়া বলিতেছে, অপর শ্রেণীর লোকেরা উপযুক্ত নয়, অথবা উপযোগী কি না, তাহার বিচার তাহাদের হাতে, তাহা হইলেই শাসন-তন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র গোলাম গড়িবার কারখানা হইয়া দাঁড়ায়,—মানুষের মুক্তির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। খাঁটি স্বরাজ সেইখানে, যেখানে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তাহার উন্নতির পথ মুক্ত। যেখানে মানুষ আপনার অধিকার-লাভের জন্য অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সেখানে, অনুগ্রহ-দত্ত অধিকার যত বড় হইলেও, মানুষের স্বাধীনতা নাই! যদি একটা দীর্ঘ তালিকায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় যে, দেশের লোকে অমুক অমুক বড় বড় অধিকার পাইবে, তাহা হইলে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের পথ প্রস্তুত হয় না; বরং উহাতে দেশের গোলামী স্বীকৃত হয়। শাসন-তন্ত্রে ও সমাজ-তন্ত্রে যদি মানুষের কোন অধিকার-লাভের পথ খোলা থাকে, আর যত বড় হইলেও কোন অধিকার বিশেষের নাম একটা বাছাই করা তালিকায় নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে মানুষের স্বাধীনতা আছে বলিতে পারি। এই স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ সকল সময়েই ঐ সুবিধা অবাধ থাকা চাই; যে যেমন উপযুক্ত, সে সেইরূপ ভাবেই অবাধ পথে চলিতে পারে। কাজেই, মানুষ যে উপযুক্ত হইলেই অধিকার পাইবে, এই কথাটাই উঠিতে পারে না। দেশের লোকে যদি নিজে আপনাদের দেশ রক্ষা করিতে না পারে, তবে দেশটাও আমাদের হাতে সঁপিয়া দিলে স্বাধীন হইব না। যদি কার্ত্তিকী একাদশীর পর জার্ম্মানী বা রুশিয়া জলপথে বা আকাশ পথে আসিয়া ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলে, তবে রাসপূর্ণিমার দিনে আমাদের সকল নাচন শেষ হইবে।

আর একটী কথা,—সেইটীই বড় কথা। স্বাধীনতা-লাভের একেবারে গোঁড়ার কথা হইল এই যে, মানুষের আত্ম-সম্মানের জ্ঞান বাড়িবে ও স্বাধীনতা লাভের জন্য যথার্থ আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে,—যাহা কিছু স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা, তাহা এড়াইবার জন্য প্রতিজ্ঞা জন্মিবে। যদি সামাজিক বিধানের ফলে আমরা দাসত্ব করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকি, যদি শিক্ষায় ও কর্ম্মে পরের পা-চাটার প্রবৃত্তি সংজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে যতদিন সেই বিধান ভাঙ্গিবার জন্য উৎসাহ না জন্মিবে, ততদিন স্বাধীনতাকে প্রিয় পদার্থ বলিয়াই মনে হইবে না। এ সম্পর্কে আড়ির দলের লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, আগে স্বরাজ হাতে আসা চাই, ও তাহার পরে সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার করা সম্ভব হইবে। স্বাধীনতা-লাভের পথে যাহা বাধা, তাহার গায়ে রাজনৈতিক ছাপ দাগা আছে, না সামাজিক বিধানের ছাপ আছে, সে কথা কি বিচার্য্য? বাধাগুলির শ্রেণী ভাগ করিয়া যাঁহারা 'আগু-পিছুর' কথা তুলেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করা কঠিন। অগ্র-পশ্চাতের জ্ঞান না থাকিলে, মানুষকে যখন মূর্খ বলে—

তাহা আহাম্মক বলে,—তখন সে বিষয়ে একটু বিচার করা উচিৎ। দুঃখ-নিবৃত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন দার্শনিক মতগুলিকে পাকা বলিয়া মনে করি না বটে, কিন্তু দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধের একটী বচন খুব যুক্তিযুক্ত মনে করি, বুদ্ধ বলিয়াছেন। যাহা নাশ করিতে হইবে, আগে তাহার মূল খুঁজিয়া বাহির করা চাই। আমাদের গোলামি-বুদ্ধির শিকড় কোথায়, তাহা যদি খুঁজিয়া না দেখি, আর যদি সেই শিকড় তুলিবার কোন উদ্যোগ না করি, তবে স্বাধীনতা-লাভের হুজুগে যতই ডাল-পালা ছাঁটি না কেন, বদ্ধমূল শিকড় আবার গজাইবে।

যেখানে একজাতের লোক অন্য জাতের পা-চাটাকে পরমার্থ মনে করে, ও মনুষ্যত্ব জাগাইয়া পরের সমকক্ষ হইতে চায় না, নীচ হইয়া থাকাই জন্ম-কর্ম্মের প্রাকৃতিক ফল মনে করে, তাহারা দাসত্ব-ব্যাধি-গ্রস্ত। এই জন্যই নির্ব্বিবাদে দেশের লোকেরা বহুশতাব্দী ধরিয়া দাসত্ব ভোগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। 'ধর্ম্ম গেল' বলিয়া কখনও কখনও একএকবার মাথা নাড়া দিয়াছে, কিন্তু দেশের প্রীতিতে ও আত্ম-সম্মানের জন্য মাথা তুলে নাই। আত্ম-সম্মানের জন্য ও স্বদেশ-প্রীতির তাড়নায় যে যোট বাঁধিতে হইবে, এ কথা সকলেই ইউরোপীয় শিক্ষায় পাইয়াছি; ইয়ুরোপীয়দের কাছে এবারকার মহাসমরের সময়ে slave mentality কথাটা পাইয়াছি; সেই জন্যই তোতা-পাখির মত ঐ কথাগুলি আওড়াইতেছি। কিন্তু আমাদের গোলামি-বুদ্ধির শিকড় যে কোথায়, তাহা খুঁজিয়া দেখিতেছি না। সেদিন ভবানীপুরের যুবকদের একটী সম্মিলনীতে শ্রীমান্ গোকুলচন্দ্র নাগ নামে একটী বালক তাহার প্রবন্ধে বর্ত্তমান সময়ের আন্দোলনের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিল,—যদি একটী পাখি তাহার খাঁচায় বাস করা সুখকর মনে করে ও পায়ের শিকলকে স্বাধীনতার বাধা না ভাবে, তবে, তাহার পক্ষে, মুক্ত-আকাশে উড়িবার আকাঙ্ক্ষা ও ছটফটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এদেশের বালকেরা যে সকলেই মোহে পড়িয়া বুদ্ধি হারায় নাই, আলেয়ার আলোকে ধ্রুব-তারা ভাবে নাই, সেই আশার কথা জানাইবার জন্যই এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিলাম। ব্যাধিগ্রস্তের যে খাদ্যে অরুচি হয়, সেত ব্যাধির ফলে। ব্যাধি সারাইবার দিকে দৃষ্টি না করিয়া যাঁহারা পোলাও খাওয়াইয়া অরুচি ভাঙ্গিতে চাহেন, ও অরুচি ভাঙ্গিবার পর, ঔষধ দিতে চাহেন, তাঁহাদের 'অগ্রপশ্চাৎ-জ্ঞান' কি বড়ই প্রখর?

যে মুহূর্ত্তে মানুষের মনে আত্ম-সম্মানের বোধ জন্মিবে, যে মুহূর্ত্তে স্বাধীনতার যাহা কিছু বাধা তাহা এড়াইবার ইচ্ছা জন্মিবে, যে মুহূর্ত্তে আমাদের পুরাতন ব্যাধিকে আমরা ব্যাধি বলিয়া চিনিতে পারিব, ও ঐ ব্যাধি ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা জন্মিবে ও উদ্যোগ বাড়িবে, সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই প্রতি মানুষের মনে স্বরাজ্যের গোড়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের লক্ষ্য কি ও বাধা কি তাহা যেদিন ঠিক ভাবে ধরিয়া ফেলিতে পারিব, যেদিন হুজুগ ছাড়িয়া উৎসাহিত মনে অথচ ধীরভাবে কর্ত্তব্যপথের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব, সেই দিনই স্বরাজ আসিবে। আর উহার জন্য কার্ত্তিকী একাদশী পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতে হইবে না।

আমাদের সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা না

জাগিলে যে দেশ জাগিবে না, তাহা ত সর্ব্বত্রই স্বীকৃত। উহারা যে আমাদের সামাজিক অবস্থার ফলে ভারতবর্ষকে আপনাদের দেশ বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না। কতকগুলি সামাজিক শিক্ষা-জনিত-সংস্কার একেবারে ধ্বংস না হইলে যে দেশের সাধারণ লোকেরা আমাদের সঙ্গে যুটিবার দিকে মন ফিরাইতে পারিবে না, সে কথা অন্য সময়ে বিচার করিতে চেষ্টা করিব। এবারকার মত এইটুকু বলিয়াই কথা শেষ করিতেছি যে, চরকা কাটা ভাল কথাই বটে, তবে আমাদের ব্যাধির খাঁটি নিদান বুঝিবার জন্য নিজেদের বুদ্ধির চরকায় একটু তেল দিলে ভাল হয়। যে সময়ে আমাদের বল-সঞ্চয়ের দরকার, যে সময়ে অতর্কিতভাবে ধীরে ধীরে বল বাড়াইবার দরকার, সে সময়ে অযথা বিদ্বেষ-বুদ্ধি জাগাইয়া ক্ষুদ্রবলকে পিশিয়া মারিবার জন্য একটা বৃহৎ বলকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তোলা সুবিচারের কাজ নয়। আড়ির দলের কেহ কেহ হয়ত একথায় চোখ টিপিয়া বলিতে পারেন যে, বাহিরের একটু টেপা-টিপিতেই অথবা অত্যাচারেই তাঁহারা কর্ম্মপথে চলিবার উত্তেজনা পাইবেন। যদি এইরূপ উত্তর পাই, তাহা হইলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের যাহা উত্তেজনা ও উৎসাহের স্থায়ী-মূল বা উৎস, তাহা আমরা ধরিতে পারি নাই। আর সেই জন্যই কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনা খুঁজিতেছি। যাঁহারা সামাজিক দুর্দ্দশার চিন্তা চাপা দিয়া, উল্টা পদ্ধতিতে কাজ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের যদি একবার অগ্র পশ্চাতের জ্ঞান জন্মে, তবে দেখিতে পাইবেন, যে বাহিরের অত্যাচার না খুঁজিয়াই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনা ও উৎসাহের স্থায়ী উৎস পাইবেন। জাতি সাধারণের মধ্যে যদি অল্প পরিমাণে ও আত্মসম্মানের বোধ জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে যে সমাজ-বিপ্লব ঘটিবে, তাহা হইতেই স্বাধীনতা-লাভের জন্য স্থায়ী-উৎসাহ ও বল জাগিয়া উঠিবে। গল্পে আছে—একজন তাহার নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রাণের টান জন্মাইতে না পারিয়া বাহিরে উত্তেজনা খুঁজিতেছিল, ও তাহাকে উত্তেজনা দিবার জন্য তাহার এক বন্ধু রাস্তার এক দুষ্ট ছেলেকে দিয়া পিছন হইতে তাহার কানমলার ব্যবস্থা করিয়াছিল; লোকটী তাহাতে উত্তেজিত হইল বটে, কিন্তু কাজ হইল না। এ সম্পর্কে আর একটী কথা বলি; যদি ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানেরা কোন অত্যাচার না করিয়া ন্যায়-শাসন চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে দৈত বনবাসীরা কি করিবেন? দেশের উত্তেজিত লোকদিগকে বলি তাহারা যেন আপনা-দের উদ্দীপ্ত আগুনে আপনারাই পুড়িয়া মরিবার ব্যবস্থা না করেন। নানা কারণে, এ সময়ের আন্দোলন বেশ চক্‌চকে হইয়াছে বটে। কিন্তু যাহা কিছু চক্‌চকে তাহাই সোণা নয়। একবার ভাবিয়া দেখিবেন, ইহা সম্ভবপর না হইলেও হইতে পারে যে,—

চর্‌কা বাহন স্বরাজ ঠাকুর, ঢেকুর তুলে উপোসে,
চোৎ ক'রে ঠিক কর্বে কাৎ দুর্দ্দশাটার কুপো সে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মহাভারত মঞ্জরী।

সপ্তম অধ্যায়—যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক।

যুধিষ্ঠির যৌবনে পড়িয়া অতুল রূপবান ও বলবান হইয়াছেন। বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার শরীরের বর্ণ। চক্ষু তাম্রবর্ণ ও আকর্ণলম্বিত। উন্নত নাসিকা। সিংহের ন্যায় শরীর; যে দেখিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। তিনি স্থির ও ধীর, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। সকলেই তাঁহাকে অতি গৌরবে "ধর্ম্মরাজ" বলিয়া ডাকিতেছে। ভীমের বর্ণও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। বিশাল বক্ষ, বৃষস্কন্ধ। বাহুযুগল স্থূল ও দীর্ঘ। অর্জ্জুন সুশ্যামল, কমল-লোচন ও সিংহ-স্কন্ধ। তাঁহার সুপ্রশস্ত বক্ষস্থল। নকুলের শ্যাম কলেবর, রক্ত চক্ষু, মহাভুজ। সহজে অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন। সকল ভ্রাতাই পরস্পরে অত্যন্ত অনুরক্ত। প্রত্যেকেই অগ্রজের আজ্ঞাকারী। প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাচরণে, ভীমের ধৈর্য্যে ও অর্জ্জুনের স্বভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইল। পঞ্চ-পাণ্ডব প্রজাগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্র চরমুখে সকলই জানিতে পারিলেন। ভাবিলেন, এ রাজ্য পাণ্ডুর, এখন সকলে তাঁহার পুত্রকে রাজা করিলে উপায় কি? তাহাপেক্ষা তিনিই এখন যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করিবেন; আসন্ন বিপদ নিবারণ করিবেন। পরে, সময় পাইলে সাবধান হওয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রচার করিলেন তাঁহার পরে যুধিষ্ঠিরই হস্তিনার রাজা হইবেন।

ইহাতে কি দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইলেন? তাহা কি সম্ভব? যুধিষ্ঠিরের যে সকল সদ্‌গুণ দুর্য্যোধনের তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অসদ্‌গুণ। তিনি চঞ্চল, উদ্ধত, শাসনের বহির্ভূত; হিংসা-পরায়ণ, পরশ্রীকাতর, অতি অভিমানী ও পাপাত্মা। তিনি পিতার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, পাণ্ডবগণের ঘোর শত্রু হইলেন।

সকলেই বুঝিলেন, মহাঝটিকার সূচনা হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই দেখিয়া সকলেই নীরব রহিলেন। এক দিন ধৃতরাষ্ট্র সভা করিয়া বসিয়াছেন। দুর্য্যোধনাদি সকলেই আছেন। এমন সময় দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে বলিলেন—"আমি যে তোমাকে এত শিখাই-য়াছি, তাহার গুরু দক্ষিণা দাও।" অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—"কি দিব বলুন।' আচার্য্য বলিলেন, "রণস্থলে আমি তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি আমার সহিত তুল্য ভাবে প্রতি-যুদ্ধ করিবে, এই গুরুদক্ষিণা চাহি।"* অর্জ্জুন অগত্যা সম্মত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভাবিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? দুর্য্যোধন ভাবিলেন, তাহাতে কি? কর্ণ ত আমার পক্ষে আছেন।

ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি সজ্জনেরা দ্রোণাচার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দূরদর্শীর কথায় কুজন কবে কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে?

---

* আদিপর্ব্ব, ১৩৯—১৪।

অষ্টম অধ্যায়।

কণিকের উপদেশ।

অন্ধরাজ আদেশ দিলেন, আর পাণ্ডবগণ নানা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া, নানা দেশ জয় করিয়া তাঁহার রাজ্য-বিস্তার করিলেন। অপরের রাজ্য হইতে বহু ধনরত্ন আনিয়া তাঁহার রাজ-কোষ পূর্ণ করিলেন। তাহাতে কি ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হইলেন? যখন তিনি দেখিলেন, কোন যুদ্ধেই পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল না, কোন পাণ্ডবই নিহত হইল না, পরন্তু তাঁহারা শৌর্য্য-বীর্য্যে দৃপ্ত হইয়া উঠিল, সকলেরই প্রশংসা-ভাজন হইল, তখন তিনি চিন্তায় আকুল হইলেন, নিদ্রা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া ভাল করি নাই।

শেষে তিনি মন্ত্রীবর কণিককে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিলেন, বলিলেন,—"দ্বিজোত্তম, পাণ্ডবগণ দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায়, ঈর্ষান্বিত হইয়াছি। ইহাদের সহিত এখন সন্ধি করা কর্ত্তব্য, কি যুদ্ধ করা উচিত, পরামর্শ দিন। আমি তদনুসারে কার্য্য করিব"*।

মন্ত্রীবর উত্তর করিলেন,—"রাজন্, আমার মত প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি সতত শত্রুর গৃহে ছিদ্র অন্বেষণ করিবেন, কখনও নিজ গৃহে ছিদ্র হইতে দিবেন না। দিলে আপনিই অগ্রে দুর্ব্বল হইবেন। যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। শত্রু প্রবল হইয়াছে বুঝিলে, তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবেন। শেষে সুসময় ও সুবিধা পাইলে, তাহাকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করিবেন। সময় বিশেষে, আপনি অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থিতি করিবেন। শত্রুগণের দোষ দেখিয়াও দেখিবেন না, শুনিয়াও শুনিবেন না। কিন্তু মহারণ্যে মৃগের ন্যায় সতত সতর্ক থাকিবেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও, উপেক্ষার বিষয় নহে। আবার শত্রুকে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াও যিনি উপেক্ষা করেন, তিনি দিন দিন বর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায়, তদ্দ্বারাই বিনষ্ট হন। শত্রুকে সতত আশা দিয়া ঘুরাইবেন। আশাপূর্ণ করিলে অঙ্গীকৃত সময় উপস্থিত হইলে, একটি অলীক প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করিয়া আবার আশা দিবেন। আপনি ক্রুদ্ধ হইলেও, তাহা গোপন করিয়া হাসিবেন। প্রহার করিবার সময়েও প্রিয়-বাক্য বলিবেন। দুর্ব্বল বা তুল্যবান শত্রুর নিকট বিক্রম দেখাইয়া, বলবানের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া, কাপুরুষকে ভয় দেখাইয়া, লোভীকে লোভ দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হইবেন। যে কার্য্যই করিবেন, তাহার মর্ম্ম, শত্রু কি মিত্র কেহই যেন পূর্ব্বে জানিতে না পারে। পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনাদি অপেক্ষা অধিক বলবান্ হইয়াছেন। শেষে যাহাতে শোকগ্রস্ত হইতে না হয়, তাহাই করুন।"

* আদিপর্ব্ব, ১৩৯—২৭॥১৪০—৩।

নবম অধ্যায়।

জতুগৃহ দাহ।

মন্ত্রীবর পরামর্শ দিয়া প্রস্থান করিলেন। আর রাজা ধৃতরাষ্ট্র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। চরেরা তাঁহাকে বলিয়াছে,—"প্রজারা বলাবলি করিতেছে, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, সেইজন্য তিনি পূর্ব্বে রাজ্য পান নাই, এখন কিরূপে পাইবেন? যুধিষ্ঠিরই পাণ্ডুর রাজ্যের অধিকারী। আমরা তাঁহাকেই রাজা করিব' (১)। পূর্ব্বে রাজা করিবার অধিকার প্রজাগণেরই ছিল। দুর্য্যোধনও উহা শুনিয়াছেন, তিনি দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ স্থির করিলেন। পরে, জনকের নির্জ্জন-গৃহে উপস্থিত হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করিলেন, পাণ্ডব ও কুন্তীদেবীকে বারণাবত নগরে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। অন্ধরাজ উত্তর করিলেন,—"বৎস, তুমি যাহা ভাবিতেছ, আমিও তাহাই ভাবিতেছি। তবে তাহা পাপজনক বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না" (২)।

সভায় সকলে একত্রিত হইয়াছেন। অন্ধরাজ যুধিষ্ঠির মধুর বচনে বলিলেন,—"বৎস, বারণাবত অতি রমণীয় নগরী। তথায় পাশুপৎ উৎসব হইতেছে। তোমরা জননীকে লইয়া তথায় গমন কর" (৩)।

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদের পিতৃতুল্য। আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।"

পঞ্চ-পাণ্ডব সকলের নিকট বিদায় লইয়া বারণাবত চলিয়াছেন। বিদুর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছেন। পরে ম্লেচ্ছভাষায় যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"লোহ নহে, অথচ শরীর নাশ করে, এমন বিষয় ও তাহার প্রতিকারের উপায় যিনি জানেন, শত্রুরা তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। যাহা তৃণ কাষ্ঠাদি বিনাশে সমর্থ, তাহা বিবরস্থিত ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে অসমর্থ। যিনি চক্ষু মেলিয়া চলেন, তিনিই পথ ও দিক্ দেখিতে পান। ভ্রমণ করিলে পথ জানা যায়। নক্ষত্র দেখিলে দিক্ জানা যায়। ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি কখনও বড় হইতে পারে না। যুধিষ্ঠির সেই ভাষায় উত্তর করিলেন,—"বুঝিয়াছি।" তখন বিদুর সকলের নিকট বিদায় লইয়া, বিষণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন। (৪)

এখন কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিদুর কি বলিলেন?" পুত্র উত্তর করিলেন,—"তিনি আমাকে সতর্ক করিলেন। বলিলেন,—গর্ত্তে থাকিলে অগ্নি অনিষ্ট করিতে পারে না। চারিদিকে ভ্রমণ করিলে পথ ঘাট জানা যায়।"

অন্ধরাজ পূর্ব্বেই তাঁহার মন্ত্রী পুরোচনকে বারণাবতে পাঠাইয়াছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। এক সুন্দর গৃহে লইয়া গেলেন এবং বহু উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ও আহারাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নগরাধ্যক্ষ, সকলের গৃহে গমন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। এদিকে, পুরোচন অন্ধরাজের আদেশানুসারে এক বৃহৎ গৃহ প্রস্তুত করিলেন। দশদিবস পরেই পাণ্ডবগণকে তথায় স্থানান্তরিত করিলেন। যুধিষ্ঠির সেই গৃহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহা লাক্ষা, ধুনা, শণ, তৃণ, চর্ব্বি, ঘৃত প্রভৃতি দাহ্য বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১) আদিপর্ব্ব, ১৪১—২৫।২৭।

(২) আদিপর্ব্ব, ১৪২—১৬।

(৩) বর্ত্তমান এলাহাবাদের নিকট বারণাবত নগরী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India, I—125.

(৪) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই ম্লেচ্ছ ভাষা গ্রীক ভাষা।

তিনি সে কথা ভীমকে বলিলেন। ভীম বলিলেন,—"তাহা হইলে আমাদিগের এখানে বাস করা উচিত নয়।" তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"দুর্য্যোধন দুরাত্মা, পদস্থ, সহায়-সম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যবান। আমরা দীনহীন, সহায়-বিহীন। আমরা এখান হইতে পলায়ন করিলেও সে অনুচর দ্বারা আমাদিগকে নিহত করিতে পারিবে। আমাদের পক্ষে সতত সাবধান হইয়া বাস করা অসম্ভব।" তখন সেই গৃহে থাকাই স্থির হইল। পাণ্ডবেরা দিবসে মৃগয়া করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর সাবধানে সেই গৃহে রজনী কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে একবৎসর অতীত হইল।

একদিন এক ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের নিকট নির্জ্জনে আসিয়া বলিল,—"মহাত্মা বিদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি ম্লেচ্ছ ভাষায় আপনাকে সাবধান করিয়াছিলেন। তাহাতেই বুঝিবেন, আমি তাঁহারই লোক। আমি খনক। তিনি বলিয়াছেন,—'ইহা জতুগৃহ। পুরোচন আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ইহাতে অগ্নি দিবে। সে দিনের আর বেশী বিলম্ব নাই।"

পাণ্ডবগণের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে সেই গৃহের এক কক্ষে পুরোচন বাস করেন। অন্য কক্ষের মধ্যে খনক বসিয়া নিঃশব্দে সুরঙ্গ প্রস্তুত করিতে লাগিল। পরে এক রাত্রিতে কুন্তীদেবী বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। আহারান্তে সকলে গৃহে গমন করিল। ক্রমে রজনী গভীর হইল, রাজপথ জনশূন্য হইল। প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। এমন সময়, সেই জতুগৃহ অকস্মাৎ অগ্নিময় হইয়া উঠিল। তখনই বারণাবতের নরনারী সকলেই দৌড়াইয়া আসিল। সকলেই প্রাণপণে অগ্নি নিবারণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সাধ্য কি? দেখিতে দেখিতে সেই গৃহ ভস্মে পরিণত হইল। বারণাবতের সকলেই পাণ্ডবগণের জন্য হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। প্রভাত হইবামাত্র তাহারা পাণ্ডবগণের শরীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে সেই ভস্মরাশির মধ্য হইতে পাঁচটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের দগ্ধদেহ বাহির হইল। পুরোচনেরও মৃত দেহ প্রাপ্ত হওয়া গেল। সেই দিনই সে সংবাদ হস্তিনায় প্রেরিত হইল। পঞ্চ-পাণ্ডব ও কুন্তীদেবীর মৃত দেহ বাহির হইয়াছে জানিয়া, ধৃতরাষ্ট্র সভায় বসিয়া পুত্রগণ-সহ হাহাকার করিয়া রোদন করিলেন। শেষে তাঁহাদের প্রেত-কার্য্যও যথাবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। (৫) এখন পিতাপুত্রে আনন্দ করিতে লাগিলেন,—"আমরা নিরাপদ!" "আমরা নিরাপদ!" শকুনি বলিলেন,—"আমি যাহার কর্ণধার, সে কবে বিপদাপন্ন!" সকলেই ভুলিলেন এ বিশ্বের নিয়ন্তা আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

(৫) আদিপর্ব্ব, ১৫০—১৬।১৭॥১৪১—১৭।১৬।

সঙ্গিণিকা।

নব্যভারতে প্রবন্ধ বিশেষে আলোচিত যে কোন্ প্রশ্নের যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে অপর-পক্ষ বিচার করিয়া সন্দর্ভ প্রেরণ করেন, সাগ্রহে পত্রস্থ করা হইবে।

* * *

বিদ্যালয় বর্জ্জন। সহযোগিতা-বর্জ্জনের ফলে, ছাত্রেরা স্কুল কলেজ 'বয়কট' করিতেছে। জাতীয়-শিক্ষা সমস্যার জটিলতা অদ্যাপিও সমাধান হয় নাই। সে শিক্ষার কি প্রকার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহার আদর্শ কিরূপ হওয়া সমীচীন, কি উপায়ে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে,—এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ও নিষ্পত্তি সুদূর-পরাহত। 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।'

* * *

বয়কটে ছাত্রদের ব্যবহার। বর্ত্তমানে ছাত্রবর্গের মধ্যে যে প্রকার সম্ভাবনা-পূর্ণ-আশা-প্রদ উৎসাহ, উদ্দীপনা, সরলতা, সততা, নির্ভীকতা এবং প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত যে আনন্দিত, ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। কিন্তু বিদ্যালয় বর্জ্জন ব্যাপারে, তাহাদের নামে, যে সকল ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সেই সকল ব্যবহার কোন মতেই অনুমোদন না করিতে পারিয়া দুঃখিত আছি। ভরসা করি, সে ঘটনা সকল কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফল। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, আত্ম-প্রতিষ্ঠানে সকলেরই সমান অধিকার আছে। ব্যক্তিগত মতকে প্রচার করা অথবা যাহাতে সেই মতটী সাধারণে বরণ করিয়া লয়, সে বিষয় কায়মনোবাক্যে তৎপর হওয়া, সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা পাওয়া,—আত্ম প্রতিষ্ঠারই অঙ্গ-বিশেষ ও উচিত কার্য্য। তাহাতে বাধা দিলে চলিবে না। তাই বলিয়া কিন্তু, অপর পক্ষেরও যে ব্যক্তিগত একটা মত থাকিতে পারে, তাহা বিস্মৃত হওয়াও দোষনীয় হইবে। অপর পক্ষের সেই মতের গৌরব মানিয়া লইতে হইবে, তাহার মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কোন প্রকার অবৈধ শক্তি প্রয়োগে অপর পক্ষের সেই স্বাধীন চিন্তা, স্বতন্ত্র মত ও পৃথক আদর্শকে বিকশিত হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে এবং সেই মতের অনুবর্ত্তী কাজে বাধা দিলে, অনধিকার চর্চ্চা হয়,—ইহা বে-আদবী, ইহা নীতি-বিরুদ্ধ সংগ্রাম।

* * *

মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অ-'সার'-জ্ঞানে যাহা ত্যাগ করিয়া হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই 'সার' গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম মন্ত্রীপদে বরিত হইয়াছেন। শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করিয়া যে তাহার সৎ-ব্যবহার করিতে পারে না, তাহাকে লোকে 'বোকা' বলে। সুরেন্দ্র নাথের অগাধ বুদ্ধিমত্তায় আমাদের কোন দিন সন্দেহ ছিল না, আজও নাই। সেইহেতু, তিনি যে, সুযোগ বুঝিয়া, তাঁহার বেতন বাৎসরিক ৬৪০০০৲ টাকার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার কার্য্য কে 'সাবাস' 'সাবাস' করিতে বাধ্য। উষ্ণ রক্তাধিক্যের দিনে তিনি বিগত ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল ধরিয়া শাসন-ব্যয় সংক্ষেপ করিবার প্রয়াসী ছিলেন এবং সময়ে অসময়ে লেখনী চালাইয়া ছিলেন, উচ্চকণ্ঠে

মহাত্মা গান্ধী। বিশেষ পরিতাপের বিষয়, মহাত্মাজীর সূচিত সহযোগিতা-বর্জ্জন-মন্ত্র বরণ করিয়া লইয়া আমরা সম্পূর্ণ জীবন-গত করিতে পারিলাম না। ইহাতে মহাত্মাজীর অথবা তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যধারা বা প্রণালীর কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাহাতে আমাদেরই অক্ষমতা, সৎসাহসের অভাব, কার্য্যকারিতার ভনিতা, এবং সর্ব্বোপরি, লাভালাভ গণনা-স্পৃহা প্রকটিত হয়। সে যাহাই হোক, মহাত্মাজীর প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে দুইটীকে শ্লাঘা না করিলে, কৃতঘ্ন হইতে হয়। প্রথমটী,—হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষকে(Dictyledon) দ্বিভাগ-যুক্ত বীজের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন মুগ মুসুরি ছোলা, আম জাম কাঁঠাল, প্রভৃতি বীজের দুইটী ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং পক্ষদ্বয় স্বরূপ এই বীজে শাঁসের মধ্যে বীজের প্রাণ, বীজের অঙ্কুর, বীজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত থাকে ও সংরক্ষিত হয়; তেমনি ভারতের প্রাণ, ভারতের অঙ্কুর, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও আশা, দুই বীজ শাঁসের ন্যায়; হিন্দু এবং মুসলমান এই দুইয়ের মধ্যে নিহিত আছে। বীজের এই পক্ষদ্বয়ের একটীকেও বিনষ্ট করিলে, বীজের সমূহ প্রাণ বিনষ্ট হয়; তেমনি, হিন্দু মুসলমানের যে কোন একটীর অবনাততেই ভারতের প্রাণ-হানির সম্ভাবনা। দুইটীকেই একত্রে মিলিয়া, পাশাপাশি এক আবরণে যুক্ত হইয়া, তাহাদের দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত প্রাণ, অঙ্কুর, সম্ভাবনাটীকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। এই নীতি স্বতঃসিদ্ধ, অতি পুরাতন, ও সনাতন। এপর্য্যন্ত কিন্তু, ক্ষণিক স্থানীয় সফলতা ভিন্ন, এই মিলন সার্ব্বজনীন-ভাব ধারণ করে নাই। আজ যাহা করিয়াছে, তাহা কেবল মহাত্মা গান্ধীর প্রসাদে। যে অমোঘ শক্তি এই জীবনপ্রদ প্রাণময় অনুষ্ঠানকে সফলতা দান করিয়াছে, আমরা সেই অভূতপূর্ব্ব অজানা চিন্ময় শক্তিকে বরণ করি ও ভক্তিভরে তাহার নিকটে প্রণত হই। দ্বিতীয়টী, ধনী দরিদ্র সকলের সম্মতও স্বীকৃত পানদোষ নিবারণ। এ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তাহা অভাবনীয়; সে অসাধ্য-সাধন কেবল মহাত্মা গান্ধীরই সাধ্য। বিধাতার কৃপায়, এই অনুষ্ঠান নিত্য হোক, সত্য হোক, ধন্য হোক, এই প্রার্থনা। এই সিদ্ধির ফল যে কতদূর ব্যাপক, দেশের দরিদ্র নারায়ণের, দীন শ্রমজীবি ও ঘৃণিত নিন্দিত, সমাজ-বিতাড়িত কারামুক্ত অভাগাগণের সেবাতে যে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, সে ভিন্ন অপরে কতদূর প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারিবে, বলা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর যদি সমস্ত কার্য্য ইহাতেই পর্য্যবসিত হইত, আর কিছুতেই তিনি যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তারস্বরে বলিতাম,—"মহাত্মা গান্ধী মহারাজ কী জয়!"

* * *

সাধু সাবধান! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মানের 'আড়ি' না প্রাণের দায়?

"যানি টানা বলদের গলায় ঘণ্টা থাকে, ঘণ্টার আওয়াজ থামিয়া গেলেই বুঝা যায় যে টান থামিয়া গিয়াছে, এই জন্যই ঘণ্টা বাঁধা"—এই কথা শুনিয়া এক নৈয়ায়িক বলিয়াছিলেন, "গরুটা যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়ে?" শোনা যায় তাহাতে কলু উত্তর করিয়াছিল, "গরু ত আর ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নাই?" বাস্তবিক সহজ জিনিষটা জটিল করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি পণ্ডিতেরই আছে,—জ্ঞান-বৃদ্ধ বিজয়চন্দ্রের 'আড়ি' প্রবন্ধ তাহার এক প্রমাণ। মানব যজ্ঞে আহুত হইয়া ছাগ এতদিন আভিজাত্য গৌরবে লাফাইতেছিল, এমন সময় এক নিদারুণ দৃশ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিল যে সে যজ্ঞের উদ্‌যাপনের অর্থ তাহার নিজের আয়ুঃশেষ। তখন সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া পালাইয়া নিজের গুহায় আশ্রয় লইল, এবং মানব-পক্ষ হইতে পুনরায় নিমন্ত্রণ, পত্র আসিয়া পৌঁছিলে সে বলিল, "প্রাণ মান দুই-ই বজায় রাখিয়া যদি কোন দিন যাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে এ নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইব, নতুবা নহে। আপাততঃ বিদায়।" পরম পণ্ডিত বিজয়চন্দ্র এই মারাত্মক সহযোগিতার প্রত্যাখ্যানের নাম দিয়াছেন "আড়ি", যেন কত অভিমানের ব্যাপার। অথচ প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রাণের দায় মাত্র।

এই সোজা কথাটা লেখকের মনে আসে নাই। না আসিবার প্রথম কারণ "আড়ির" প্রবর্ত্তকগণের উপর তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ। "যাঁহারা আমাদের মোড়ল সাজিয়াছেন" বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধের আরম্ভ। এ তীব্রতা কেন? যাহাকে গাঁয়ে মানে সেই মোড়ল, তা' সে নিজেই নিজেকে জাহির করুক বা অন্য কেহই তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক। লেখক ত জানেন যে গাঁয়ে তাহাদের দলকে মানিতেছে? হয়ত তাহা গ্রামের মূঢ়তা, এমন কি দুর্ভাগ্য,—হয়ত তাহারা বিজ্ঞতর নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে পারিত। কিন্তু সে সব নেতা যদি ঘরের কোণে বসিয়া কেবল নিজ নিজ নেতৃত্বের দাবীটুকু অনুভব করিতে থাকেন, তবে কে তাঁহাদিগকে সেই কোণ হইতে টানিয়া বাহির করিবে? বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। যাহারা কাজ করে, মানুষকে বিশ্বাস করে, ভ্রম সত্ত্বেও নিজেরা বাহির হইয়া দশের কাজে লাগিয়া যাইবার সাহস রাখে, তাহারাই দেশনায়ক। অহম্মন্য মোড়ল বলিয়া গালি দিলে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

প্রবন্ধকারের রাগের দ্বিতীয় প্রমাণ, তাঁহার 'গান্ধী' নামটীর উপর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধভাব। তিনি নাগপুর কংগ্রেসের মহাসম্মিলনকে 'মোড়লের গাঁধি' বলার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারেন নাই; এমন কি সে জন্য প্রবন্ধের ঐ অংশটীকে অসংলগ্ন করিয়া ফেলিতেও সংকোচ বোধ করেন নাই। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা-ভঙ্গ প্রয়াস কি সুবুদ্ধির কার্য্য?

লেখকের অধীরতার এইরূপ বহু নিদর্শন ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীর মধ্যে বিদ্যমান। তিনি অস্বাভাবিক জোরের সহিত বলিয়া উঠিতেছেন—"এই মিথ্যাকথাটাও যদি স্বীকার

মহাত্মা গান্ধী। বিশেষ পরিতাপের বিষয়, মহাত্মাজীর সূচিত সহযোগিতা-বর্জ্জন-মন্ত্র বরণ করিয়া লইয়া আমরা সম্পূর্ণ জীবন-গত করিতে পারিলাম না। ইহাতে মহাত্মাজীর অথবা তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যধারা বা প্রণালীর কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাহাতে আমাদেরই অক্ষমতা, সৎসাহসের অভাব, কার্য্যকারিতার ভনিতা, এবং সর্ব্বোপরি, লাভালাভ গণনা-স্পৃহা প্রকটিত হয়। সে যাহাই হোক, মহাত্মাজীর প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে দুইটীকে শ্লাঘা না করিলে, কৃতঘ্ন হইতে হয়। প্রথমটী,—হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষকে(Dictyledon) দ্বিভাগ-যুক্ত বীজের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন মুগ মুসুরি ছোলা, আম জাম কাঁঠাল, প্রভৃতি বীজের দুইটী ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং পক্ষদ্বয় স্বরূপ এই বীজে শাঁসের মধ্যে বীজের প্রাণ, বীজের অঙ্কুর, বীজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত থাকে ও সংরক্ষিত হয়; তেমনি ভারতের প্রাণ, ভারতের অঙ্কুর, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও আশা, দুই বীজ শাঁসের ন্যায়; হিন্দু এবং মুসলমান এই দুইয়ের মধ্যে নিহিত আছে। বীজের এই পক্ষদ্বয়ের একটীকেও বিনষ্ট করিলে, বীজের সমূহ প্রাণ বিনষ্ট হয়; তেমনি, হিন্দু মুসলমানের যে কোন একটীর অবনাততেই ভারতের প্রাণ-হানির সম্ভাবনা। দুইটীকেই একত্রে মিলিয়া, পাশাপাশি এক আবরণে যুক্ত হইয়া, তাহাদের দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত প্রাণ, অঙ্কুর, সম্ভাবনাটীকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। এই নীতি স্বতঃসিদ্ধ, অতি পুরাতন, ও সনাতন। এপর্য্যন্ত কিন্তু, ক্ষণিক স্থানীয় সফলতা ভিন্ন, এই মিলন সার্ব্বজনীন-ভাব ধারণ করে নাই। আজ যাহা করিয়াছে, তাহা কেবল মহাত্মা গান্ধীর প্রসাদে। যে অমোঘ শক্তি এই জীবনপ্রদ প্রাণময় অনুষ্ঠানকে সফলতা দান করিয়াছে, আমরা সেই অভূতপূর্ব্ব অজানা চিন্ময় শক্তিকে বরণ করি ও ভক্তিভরে তাহার নিকটে প্রণত হই। দ্বিতীয়টী, ধনী দরিদ্র সকলের সম্মতও স্বীকৃত পানদোষ নিবারণ। এ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তাহা অভাবনীয়; সে অসাধ্য-সাধন কেবল মহাত্মা গান্ধীরই সাধ্য। বিধাতার কৃপায়, এই অনুষ্ঠান নিত্য হোক, সত্য হোক, ধন্য হোক, এই প্রার্থনা। এই সিদ্ধির ফল যে কতদূর ব্যাপক, দেশের দরিদ্র নারায়ণের, দীন শ্রমজীবি ও ঘৃণিত নিন্দিত, সমাজ-বিতাড়িত কারামুক্ত অভাগাগণের সেবাতে যে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, সে ভিন্ন অপরে কতদূর প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারিবে, বলা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর যদি সমস্ত কার্য্য ইহাতেই পর্য্যবসিত হইত, আর কিছুতেই তিনি যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তারস্বরে বলিতাম,—"মহাত্মা গান্ধী মহারাজ কী জয়!"

* * *

সাধু সাবধান! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মানের 'আড়ি' না প্রাণের দায়?

"ঘানি টানা বলদের গলায় ঘণ্টা থাকে, ঘণ্টার আওয়াজ থামিয়া গেলেই বুঝা যায় যে টান থামিয়া গিয়াছে, এই জন্যই ঘণ্টা বাঁধা"—এই কথা শুনিয়া এক নৈয়ায়িক বলিয়াছিলেন, "গরুটা যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়ে?" শোনা যায় তাহাতে কলু উত্তর করিয়াছিল, "গরু ত আর ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নাই?" বাস্তবিক সহজ জিনিষটা জটিল করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি পণ্ডিতেরই আছে,—জ্ঞান-বৃদ্ধ বিজয়চন্দ্রের 'আড়ি' প্রবন্ধ তাহার এক প্রমাণ। মানব যজ্ঞে আহুত হইয়া ছাগ এতদিন আভিজাত্য গৌরবে লাফাইতে ছিল, এমন সময় এক নিদারুণ দৃশ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিল যে সে যজ্ঞের উদ্‌যাপনের অর্থ তাহার নিজের আয়ুঃশেষ। তখন সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া পালাইয়া নিজের গুহায় আশ্রয় লইল, এবং মানব-পক্ষ হইতে পুনরায় নিমন্ত্রণ, পত্র আসিয়া পৌঁছিলে-সে বলিল, "প্রাণ মান দুই-ই বজায় রাখিয়া যদি কোন দিন যাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে এ নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইব, নতুবা নহে। আপাততঃ বিদায়।" পরম পণ্ডিত বিজয়-চন্দ্র এই মারাত্মক সহযোগিতার প্রত্যাখ্যানের নাম দিয়াছেন "আড়ি", যেন কত অভিমানের ব্যাপার। অথচ প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রাণের দায় মাত্র।

এই সোজা কথাটা লেখকের মনে আসে নাই। না আসিবার প্রথম কারণ "আড়ির" প্রবর্ত্তকগণের উপর তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ। "যাঁহারা আমাদের মোড়ল সাজিয়াছেন" বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধের আরম্ভ। এ তীব্রতা কেন? যাহাকে গাঁয়ে মানে সেই মোড়ল, তা' সে নিজেই নিজেকে জাহির করুক বা অন্য কেহই তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক। লেখক ত জানেন যে গাঁয়ে তাহাদের দলকে মানিতেছে? হয়ত তাহা গ্রামের মূঢ়তা, এমন কি দুর্ভাগ্য,—কুয়ত তাহারা বিজ্ঞতর নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে পারিত। কিন্তু সে সব নেতা যদি ঘরের কোণে বসিয়া কেবল নিজ নিজ নেতৃত্বের দাবীটুকু অনুভব করিতে থাকেন, তবে কে তাঁহাদিগকে সেই কোণ হইতে টানিয়া বাহির করিবে?' বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। যাহারা কাজ করে, মানুষকে বিশ্বাস করে, ভ্রম সত্ত্বেও নিজেরা বাহির হইয়া দশের কাজে লাগিয়া যাইবার সাহস রাখে, তাহারাই দেশনায়ক। অহম্মন্য মোড়ল বলিয়া গালি দিলে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

প্রবন্ধকারের রাগের দ্বিতীয় প্রমাণ, তাঁহার 'গান্ধী' নামটীর উপর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ-ভাব। তিনি নাগপুর কংগ্রেসের মহা-সম্মিলনকে 'মোড়লের গাঁধি' বলার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারেন নাই; এমন কি সে জন্য প্রবন্ধের ঐ অংশটীকে অসংলগ্ন করিয়া ফেলিতেও সংকোচ বোধ করেন নাই। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা-ভঙ্গ প্রয়াস কি সুবুদ্ধির কার্য্য?

লেখকের অধীরতার এইরূপ বহু নিদর্শন ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীর মধ্যে বিদ্যমান। তিনি অস্বাভাবিক জোরের সহিত বলিয়া উঠিতেছেন—"এই মিথ্যাকথাটাও যদি স্বীকার

মহাত্মা গান্ধী। বিশেষ পরিতাপের বিষয়, মহাত্মাজীর সূচিত সহযোগিতা-বর্জ্জন-মন্ত্র বরণ করিয়া লইয়া আমরা সম্পূর্ণ জীবন-গত করিতে পারিলাম না। ইহাতে মহাত্মাজীর অথবা তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যধারা বা প্রণালীর কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাহাতে আমাদেরই অক্ষমতা, সৎসাহসের অভাব, কার্য্যকারিতার ভনিতা, এবং সর্ব্বোপরি, লাভালাভ গণনা-স্পৃহা প্রকটিত হয়। সে যাহাই হোক, মহাত্মাজীর প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে দুইটীকে শ্লাঘা না করিলে, কৃতঘ্ন হইতে হয়। প্রথমটী,—হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষকে(Dictyledon) দ্বিভাগ-যুক্ত বীজের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন মুগ মুসুরি ছোলা, আম জাম কাঁঠাল, প্রভৃতি বীজের দুইটী ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং পক্ষদ্বয় স্বরূপ এই বীজে শাঁসের মধ্যে বীজের প্রাণ, বীজের অঙ্কুর, বীজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত থাকে ও সংরক্ষিত হয়; তেমনি ভারতের প্রাণ, ভারতের অঙ্কুর, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও আশা, দুই বীজ শাঁসের ন্যায়; হিন্দু এবং মুসলমান এই দুইয়ের মধ্যে নিহিত আছে। বীজের এই পক্ষদ্বয়ের একটীকেও বিনষ্ট করিলে, বীজের সমূহ প্রাণ বিনষ্ট হয়; তেমনি, হিন্দু মুসলমানের যে কোন একটীর অবনাততেই ভারতের প্রাণ-হানির সম্ভাবনা। দুইটীকেই একত্রে মিলিয়া, পাশাপাশি এক আবরণে যুক্ত হইয়া, তাহাদের দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত প্রাণ, অঙ্কুর, সম্ভাবনাটীকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। এই নীতি স্বতঃসিদ্ধ, অতি পুরাতন, ও সনাতন। এপর্য্যন্ত কিন্তু, ক্ষণিক স্থানীয় সফলতা ভিন্ন, এই মিলন সার্ব্বজনীন-ভাব ধারণ করে নাই। আজ যাহা করিয়াছে, তাহা কেবল মহাত্মা গান্ধীর প্রসাদে। যে অমোঘ শক্তি এই জীবনপ্রদ প্রাণময় অনুষ্ঠানকে সফলতা দান করিয়াছে, আমরা সেই অভূতপূর্ব্ব অজানা চিন্ময় শক্তিকে বরণ করি ও ভক্তিভরে তাহার নিকটে প্রণত হই। দ্বিতীয়টী, ধনী দরিদ্র সকলের সম্মতও স্বীকৃত পানদোষ নিবারণ। এ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তাহা অভাবনীয়; সে অসাধ্য-সাধন কেবল মহাত্মা গান্ধীরই সাধ্য। বিধাতার কৃপায়, এই অনুষ্ঠান নিত্য হোক, সত্য হোক, ধন্য হোক, এই প্রার্থনা। এই সিদ্ধির ফল যে কতদূর ব্যাপক, দেশের দরিদ্র নারায়ণের, দীন শ্রমজীবি ও ঘৃণিত নিন্দিত, সমাজ-বিতাড়িত কারামুক্ত অভাগাগণের সেবাতে যে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, সে ভিন্ন অপরে কতদূর প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারিবে, বলা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর যদি সমস্ত কার্য্য ইহাতেই পর্য্যবসিত হইত, আর কিছুতেই তিনি যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তারস্বরে বলিতাম,—"মহাত্মা গান্ধী মহারাজ কী জয়!"

* * *

সাধু সাবধান! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মানের 'আড়ি' না প্রাণের দায়?

"যানি টানা বলদের গলায় ঘণ্টা থাকে, ঘণ্টার আওয়াজ থামিয়া গেলেই বুঝা যায় যে টান থামিয়া গিয়াছে, এই জন্যই ঘণ্টা বাঁধা"—এই কথা শুনিয়া এক নৈয়ায়িক বলিয়াছিলেন, "গরুটা যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়ে?" শোনা যায় তাহাতে কলু উত্তর করিয়াছিল, "গরু ত আর ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নাই?" বাস্তবিক সহজ জিনিষটা জটিল করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি পণ্ডিতেরই আছে,—জ্ঞান-বৃদ্ধ বিজয়চন্দ্রের 'আড়ি' প্রবন্ধ তাহার এক প্রমাণ। মানব যজ্ঞে আহুত হইয়া ছাগ এতদিন আভিজাত্য গৌরবে লাফাইতে ছিল, এমন সময় এক নিদারুণ দৃশ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিল যে সে যজ্ঞের উদ্‌যাপনের অর্থ তাহার নিজের আয়ুঃশেষ। তখন সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া পালাইয়া নিজের গুহায় আশ্রয় লইল, এবং মানব-পক্ষ হইতে পুনরায় নিমন্ত্রণ, পত্র আসিয়া পৌঁছিলে-সে বলিল, "প্রাণ মান দুই-ই বজায় রাখিয়া যদি কোন দিন যাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে এ নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইব, নতুবা নহে। আপাততঃ বিদায়।" পরম পণ্ডিত বিজয়-চন্দ্র এই মারাত্মক সহযোগিতার প্রত্যাখ্যানের নাম দিয়াছেন "আড়ি", যেন কত অভিমানের ব্যাপার। অথচ প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রাণের দায় মাত্র।

এই সোজা কথাটা লেখকের মনে আসে নাই। না আসিবার প্রথম কারণ "আড়ির" প্রবর্ত্তকগণের উপর তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ। "যাঁহারা আমাদের মোড়ল সাজিয়াছেন" বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধের আরম্ভ। এ তীব্রতা কেন? যাহাকে গাঁয়ে মানে সেই মোড়ল, তা' সে নিজেই নিজেকে জাহির করুক বা অন্য কেহই তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক। লেখক ত জানেন যে গাঁয়ে তাহাদের দলকে মানিতেছে? হয়ত তাহা গ্রামের মূঢ়তা, এমন কি দুর্ভাগ্য,—হয়ত তাহারা বিজ্ঞতর নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে পারিত। কিন্তু সে সব নেতা যদি ঘরের কোণে বসিয়া কেবল নিজ নিজ নেতৃত্বের দাবীটুকু অনুভব করিতে থাকেন, তবে কে তাঁহাদিগকে সেই কোণ হইতে টানিয়া বাহির করিবে?" বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। যাহারা কাজ করে, মানুষকে বিশ্বাস করে, ভ্রম সত্ত্বেও নিজেরা বাহির হইয়া দশের কাজে লাগিয়া যাইবার সাহস রাখে, তাহারাই দেশনায়ক। অহম্মন্য মোড়ল বলিয়া গালি দিলে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

প্রবন্ধকারের রাগের দ্বিতীয় প্রমাণ, তাঁহার 'গান্ধী' নামটীর উপর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ-ভাব। তিনি নাগপুর কংগ্রেসের মহাসম্মিলনকে 'মোড়লের গাঁধি' বলার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারেন নাই; এমন কি সে জন্য প্রবন্ধের ঐ অংশটীকে অসংলগ্ন করিয়া ফেলিতেও সংকোচ বোধ করেন নাই। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা-ভঙ্গ প্রয়াস কি সুবুদ্ধির কার্য্য?

লেখকের অধীরতার এইরূপ বহু নিদর্শন ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীর মধ্যে বিদ্যমান। তিনি অস্বাভাবিক জোরের সহিত বলিয়া উঠিতেছেন—"এই মিথ্যাকথাটাও যদি স্বীকার

ভগবানের প্রীত্যর্থ আমরা অধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিব, পরস্পরের প্রীত্যর্থ আমরা পরস্পরের সেবা করিব।

ইহাই অ-সহযোগিতার মর্ম্মকথা। ইহা মতবাদ মাত্র নহে, কারণ ইহার সত্যতা ও শক্তি সেদিন মাত্র ইজিপ্টে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। ভারতের ন্যায় মহাদেশে এ নীতির কোন দিন পূর্ণ প্রবর্ত্তন হইবে কিনা সন্দেহ,—অসম্পূর্ণ প্রয়োগে নির্য্যাতনের ভয়ও যথেষ্ট আছে,—কিন্তু শেষফল সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঝড়ে গাছকে ফেলিতে না পারিলে শক্ত করিয়াই রাখিয়া যায়,—নির্য্যাতনেও আমাদের শক্তিবৃদ্ধিই করিবে। গান্ধি মহারাজই যে কেবল খাড়া থাকিবেন তাহা নহে, এযুগে ছোট বড় অনেক গান্ধীই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইবেন। পূর্ব্বে একবার বারীন্দ্র-যুগেও এইরূপ ছোট বড় অনেক বারীন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে, দুই যুগে প্রভেদ অনেক। সেটা ছিল কৌশলের যুগ, আর এটা সত্যের যুগ। তাহাতে লুকাইবার ছিল অনেক, সুতরাং ধরাপড়িবার ভয় ছিলও যথেষ্ট। এখানে সবই খোলা; সুতরাং ধরা পড়িয়া মুহ্যমান হইবার ভয় নাই। সে যুগে বোমাকে সহায় করিয়া জর্ম্মণ বিজয়ী কূটনীতিবিৎ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল,—এযুগে ভগবানকে সহায় করিয়া নিজেদের মধ্যে যাহা অসত্য প্রধানতঃ তাহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। তখনকার উদ্দেশ্য ছিল, যে কোনরূপে স্বাধীনতা লাভ, এযুগের অব্যবহিত উদ্দেশ্য ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে চরিত্র লাভ। তাহার পর স্বরাজ ত আপনা হইতেই আসিবে। রেল টেলিগ্রাফ ডাকঘর ত অবান্তর কথা। এই চরিত্ররূপ মহা কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কংগ্রেস যে সাধনমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা দেখিয়াছেন, অত্যুগ্রসাধনা চরিত্র লাভের পরিপন্থী,—তাহাতে কর্ম্মের উন্মাদনা থাকে এবং যোগ্যতা লাভের পূর্ব্বেই ফললাভ আসিয়া কর্ম্মীকে শিথিলপ্রযত্ন করিয়া দেয়। তাই, তাঁহারা দেশমাতৃকার প্রতি 'যথাসম্ভব' দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উহা কেবল তাঁহাদের নিজেদের "হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিবার" কৌশল মাত্র নহে।

বাস্তবিক মানুষকে অল্পই করিতে হয়, মানুষ অল্পই করে। ঠিক ভাবে কার্য্যারম্ভ হইলে, সমস্ত কাজটা যেন আপনা হইতেই সমাপ্ত হইয়া যায়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। ভাগ্যক্রমে, দেশের মতিগতি যেন একটু ফিরিতেছে বলিয়া বোধহয়। কল্যাণকে ত আর চিনিতে বিলম্ব হয় না,—বিলম্ব হয় ধরিয়া রাখিতে। প্রধান বিঘ্ন হয়, মোয়ার লোভে ও জুজুর ভয়ে। সেরূপ উপদ্রব যে এক আধটুকু আসিবে না, তাহা সম্ভব নহে। দেশে চাকর বাকরের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা হইলেই ধনীরা চটিয়া উঠেন। ইহাও কতকটা সেইরূপ। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দিন দুনিয়ার যিনি মালিক তাঁহার ইচ্ছায়, সত্য অমর এবং দীনহীনও জ্ঞানের অধিকারী। এ জ্ঞানের পথ কোনরূপ লোভ বা ভয় দেখাইয়া কেহ চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। একদিকে মুটে মজুর, চট্‌কল ও বেশ্যাপল্লী—অন্যদিকে চাকুরে বাবু, কলের পাখা ও কোম্পানির কাগজ। এই দুইদলের মধ্যে পড়িয়া জ্ঞান বেচারি এত দিন মারা পড়িতেছিল। সেদিন চলিয়া যাইতেছে। লোকে পুনরায় তপোমাহাত্ম্য শুনিবে ও শিখিবে, এবং বুঝিবে যে তর

বারির অপেক্ষাও বলবান অস্ত্র আছে। সত্যই, ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করা যায়। তখন আর ভারতীয় জনসাধারণকে কোনরূপ ভয় বা লোভ দেখাইয়া ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। রেল ও ডাকের বিরাট সরঞ্জামে জ্ঞান-সূর্য্যের গতিরোধ হইবে না। ইতিমধ্যেই সত্যের অভয়বাণী শ্রুত হইতেছে,—সকলেরই নিকট সে ডাক পৌঁছিয়াছে। হাকিম, উকিল, কেরাণী প্রভৃতি বহুদিনের দুর্ভাগ্য যাঁহাদের তাঁহারা সে আহ্বানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা জানিনা, আর না পারিলে ক্ষতিও নাই। কুলিমজুরের ভিতর হইতে সে ডাকের শ্রোতা আবিষ্কৃত হইবে। তাহাদের বুদ্ধি, দারিদ্র্যের পীড়নে মলিন হইলেও, কিছু কম বিকৃত। সাড়া তাহারাই প্রথমে দিবে এবং তাহাই দিতেছে। সাফল্যও কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। কুলিমজুরেরা যে সাড়া দিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। হিন্দু মুসলমানের সৌহার্দ্দ্য এবং মদের দোকানের আপেক্ষিক নিস্তব্ধতাই তাহার প্রমাণ। তাহারা নিরক্ষর হউক, কিন্তু অশিক্ষাকে শিক্ষা বলিয়া গর্ব্ব করিতে শিখে নাই; টাকা কড়ির মত তুচ্ছ জিনিষকে দেবতার আসনে বসাইয়া তাহার দ্বারে আত্মবলিও দিতে শিখে নাই। একদিকে অভিমানহীন নিরক্ষরতা ও অপরদিকে মদোদ্ধত অতিবিদ্যা। এ উভয়ের মধ্যস্থলে আছে ছাত্রসমাজ, তাহারা সবে মাত্র উদর-দর্শনের পাঠ আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের অনেকের মধ্যে সদ্‌বৃত্তি ও সহৃদয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান। ছাত্রসমাজকে ক্ষেপান হইয়াছে বলিয়া বিজয়বাবু বিশেষ বিরক্ত, কিন্তু তাঁহার অভিযোগ কি ঠিক্? অ-সহযোগিতার দুন্দুভি-ধ্বনি একই মুহূর্ত্তে সকলের কাণে পৌঁছিয়াছিল। কুলি মজুরের দল তাহার অর্থ বোধ করিতে না পারিয়াও জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক বাদকের মর্য্যাদা রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। বাবুর দল একটু হাসিয়া অভ্যস্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আর বিপদে পড়িয়াছিল, এই ছাত্রের দল। অবস্থা "নযযৌ, ন তস্থৌ" এর মত। হৃদয়ে সদ্ভাব আছে এবং জিনিষটাকেও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু ধরিবার সাহস নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষায় তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দুরারোহ মঙ্গলবর্ত্মে আরোহণ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। নিজেদের উপরও বিশ্বাস তাহাদের নাই—কি জানি শেষে বা কি বিপদ্ ঘটে, এই ভাবনাতেই তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। শেষে, শ্যাম ও কুল দুই-ই বজায় রাখিবার জন্য, জাতীয় ও বিজাতীয় উভয়বিধ বিদ্যাক্ষেত্রেই পরীক্ষার টাকা জমা দিল। এই ছাত্রদলের মধ্যে জন কতকমাত্র সত্যসত্যই গারদ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারাই সাগর ছেঁচা মাণিক, ভারত মাতার সুসন্তান, অ-সহযোগ আন্দোলনের মূর্ত্তিমান্ সার্থকতা! এই আন্দোলন না থাকিলে তাহারা ঝাঁকে মিশিয়া গতানুগতিক পথে মহলা দিতে থাকিত। যীশুখ্রীষ্টের সারল্যময় জালিক শিষ্যগণের মত তাহারা ডাক শুনিয়াই বুঝিল ও চলিয়া আসিল। ভাবিল—"তাই ত বটে? কি করিতেছি? এ শিক্ষায় কি ফল? বিদ্যা?—তাহা ত মৌলিকতাশূন্য। ধর্ম্ম?—তাহার ত নামগন্ধও নাই; থাকিলে অন্ততঃ সারল্য, সাহস ও সহৃদয়তা থাকিত। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্র হইতে নিজে পলাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব হইত না। স্বাস্থ্য?—সে ত আভিধানিক শব্দ মাত্র; তাহার অভাবেই ত

আমাদিগকে রেলে ষ্টীমারে ও সর্ব্বত্র কিলচড় সহ্য করিয়া ক্ষমাবৃত্তির চর্চ্চা করিতে হইতেছে। অর্থ?—সে ত মাড়োয়ারি ও ইউরোপীয় বণিকের ঘরে? আমাদের যা আছে তা চাকুরি; তাহা ত দুই এক ক্ষেত্রে মাত্র সোণার শিকল, নতুবা লোহার? আর তাহা দ্বারা জীবিকার্জ্জনের অর্থ বিদেশী প্রতিষ্ঠিত ভারত লুণ্ঠন যন্ত্রের খোরাক যোগান? তা'র চেয়ে কেন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ছুটিয়া যাই না? যাহা পারি, যেরূপ পারি, তাঁহার সেবায় কেন আত্মোৎসর্গ করি না? কাজ করিতে করিতেই কাজ শিক্ষা হইবে, আর সেবাধর্ম্মই আমাকে কালে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী করিয়া তুলিবে। অতএব আর চিন্তা কি? অন্তরে সাহস আছে, ঊর্দ্ধে ভগবান্।" এই বলিয়া তাহারা কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে। ভগবান্ তাহাদের সহায় হউন।

"মহাত্মারা" (এই কথাটার মধ্যে গান্ধী মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষ বিদ্যমান) ঐসব ছেলেদের যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে বিজয় বাবুর বড় রাগ। সংস্কৃতের উপর তাঁহারা কি অতিরিক্ত জোর দিয়াছেন, তাহা জানিনা; কিন্তু, আমাদের ভারতীয় ধাতুটা যে কি রকম, তাহা জানিবার আর কোন ভাল উপায় আছে কি? ইংরাজী পড়িতে হয় পড়, কিন্তু তাহাকে নিজেদের করিয়া লও; কোথায় তাহারা অন্যায় বা জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে, তাহা বুঝা উচিত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি আমরা বিদেশী মুখ নির্গলিত বাক্যমাত্রকেই উদরস্থ করিতে থাকি এবং যাহা কিছু এদেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কারের বিরোধী তাহাকেই ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে শিখি, তাহা হইলে ব্যাপারটা কি অতি অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় না? Non-co-operation কথাটার মৌলিক অর্থ যাহাই হউক না, তাহার উদ্দেশ্য নিজেকে জানা ও সবল করা। ইহার জন্যই প্রয়োজন, সংস্কৃত সাহিত্য কিছু চর্চ্চা। ইউরোপেও সংস্কৃত চর্চ্চা হইতেছে। অনেকে বলেন এখান অপেক্ষা গভীর ভাবেই হইতেছে,—কিন্তু কই, সেখানে ত কেহই শিখাধারী পণ্ডিত সাজিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই? এদিকে আমরা ত বেশ হ্যাট্ কোট পরিয়া কালা সাহেব সাজিয়া বসিয়া আছি। এইটাই বিপদ্। কেহ বলিবেন—"হ্যাট কোট যদি সত্যসত্যই ভাল হয়, তাহাকে অবলম্বন করিলে দোষ কি?" দোষ কিছুই নাই,—কিন্তু ভাল কি মন্দ, তাহার ত বিচার চাই? আমরা যে দেশীয় দিকটা না দেখিয়া, না জানিয়াই তাহাকে দণ্ডিত করি! সুতরাং "মহাত্মার" সংস্কৃতের উপর একটু বেশী জোর দিয়া অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর বলাই বাহুল্য যে, সংস্কৃতের একটু অধিক চর্চ্চা হইলেই "প্রাচীরে রোধিয়া অবাধ অসীমে" রাখা হয় না। হরবোলা হইলে বিড়াল, কুকুর, এমন কি বাঘের ডাকও ডাকা যায়,—কিন্তু তাহাদিগকে আগে শিখিতে হয়, মায়ের ডাক। এ হিসাবেও সংস্কৃতের চর্চ্চা এদেশের ছাত্রগণের পক্ষে অবশ্য করণীয়,—জাতীয় বিশেষত্বের সমস্ত তত্ত্বগুলিই তাহার মধ্যে নিহিত।

শিক্ষার কোন নূতন ব্যবস্থা না করিয়া, পুরাতন ব্যবস্থাটীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় লেখক বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন। ঘরে আগুন লাগিলে লোকে আগে বলে—"বাহিরে আইস",—তা' বাহিরে কোন ঘর থাকুক বা নাই থাকুক। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা, পুস্তকের ভার, অর্দ্ধেক আহার, পরীক্ষা-ভীতি, স্বাস্থ্য ও

সাহস হানি, এবং ক্ষীয়মাণ সহজ বুদ্ধি ও প্রচীয়মান গোলামী বুদ্ধির প্রভাবে ছেলে-গুলি প্রতিনিয়ত সর্ব্বনাশের পথেই অগ্রসর হইতেছে। অতএব, প্রথম কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া মুক্ত বাতাসে দাঁড় করান। ঘরের কথা, তাহার পরে। "মহাত্মারাও" সেই ভাবেই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং দোষের-ত বড় বিশেষ কিছু দেখিনা। ঐ গোলামী বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের বক্তব্য অতি নিদারুণ। কথাটা নাকি বিলাতী এবং তাহার জন্ম রহস্য না কি বড় নিগূঢ়। এত বড় পাণ্ডিত্যের সম্মুখে মস্তক অবনত না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু নারিকেলের দর বলিতে গিয়া, পিতামহের এ বংশ পরিচয়ে প্রয়োজন কি? ভারতীয় ছাত্রগণের চরিত্রে গোলামী-বুদ্ধি জিনিষটার কি অস্তিত্বাভাব? তা যখন বলিবার যো নাই, তখন নামটার মূলনির্ণয়ের কথা না পাড়িলেও ক্ষতি ছিল না। এখন দেখা যাউক, গোলমী বুদ্ধির চিকিৎসা সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য কি। তিনি বলেন, "সামাজিক বৈষম্যের ফলে আমাদের হাড়ে মাসে যে বুদ্ধি জড়াইয়া আছে,—তাহা দূর করিতে না পারিলে ইউরোপ বিদ্বেষ জালাইয়া আমরা মানুষ হইতে পারিব না।" শুনিয়াছি, ভারতবর্ষের কোন কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় ঐ সমস্ত জঘন্য সামাজিক ব্যবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের ভিতর হইতে গোলামী-বুদ্ধি গিয়াছে বা কমিয়াছে কি? তা যদি না গিয়া থাকে বা না কমিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে গোলামী-বুদ্ধির বীজ অন্যত্র নিহিত, এবং এই বুদ্ধির জন্য বিলাতী শিক্ষার আংশিক দায়িত্ব যখন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, তখন সে শিক্ষা সম্বন্ধে একটু সতর্ক হইলে হানি কি? আর এরূপ সতর্কতাকে ইউরোপ-বিদ্বেষ নামে অভিহিত করিবারই বা কারণ কি?

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পুরাতন অভ্যস্ত পথ ও বহু সুবিধার পথ ত্যাগকরা কোন কালেই সহজ নহে, এবং কেহই ইচ্ছা করিয়া তাহা করিতে যায় না। যাঁহারা করেন, তাঁহারা উপায়ান্তর না পাইয়াই করেন। এই নূতনের অনুসরণ করিতে গিয়া যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়, তাহা লেখকের ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিতের নিকট মার্জ্জনীয় হওয়া উচিত। ত্যাগের পথে যাহারা চলিয়াছে, তাহাদিগকে দুরভিসন্ধির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিতে হয়। সদভিসন্ধি সত্ত্বেও যাঁহারা অনভিজ্ঞতা বশতঃ ভুল করেন, তাঁহারা কি শ্রদ্ধার পাত্র নহেন? কাজ করিতে গেলেই ভুল হয়! ভ্রান্তি শূন্যতার অভিমান কর্ম্মশূন্যেরাই করিতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

বিধির বাদ।

কালীঘাটে ধৌত শত পাতকীর কলুষে মলিন
কৃশাঙ্গী সে আদিগঙ্গা কেঁচোসম পঙ্কমাঝে লীন।
তারি কিনারায়,
স্নিগ্ধবেণু বনচ্ছায়ে সুপ্ত লুপ্তপ্রায়
আছে এক গ্রাম,
পুঁটুরিয়া নাম,
অতন্দ্রিত
মশকের মৃদুগুঞ্জ নিস্বনমন্দ্রিত।
সেইখানে, নিরালায়, লাউলতামণ্ডিত কুটীরে,
পানাপচা পুকুরের তীরে,
থাকিত মহেশ,
খরক্ষৌর-বিমুণ্ডিত কেশ,
টিকিওলা।
ব্যবসা ঠাকুর পূজা। আর ভিজা চাল, কলা, ছোলা,
দক্ষিণা দু এক আনা মাঝে মাঝে।
ইহা ছাড়া পালে, পর্ব্বে, ব্রত, নেম আদি ক্রিয়া কাজে
পাওনা অশেষবিধ, সিধে, সাধা, বিদায়, ফলার
চমৎকার!
একরূপে চলিত সংসার
দস্তার টাকার মত
অবিরত
নানা দিক হতে নানা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে।
ঘরেতে ছিলেন শুধু ব্রাহ্মণী, ও একমাত্র মেয়ে
আঁধার ঘরের মণি,
আদরের খনি,
দুর্ব্বলের অবলম্ব, দরিদ্রের বুকজোড়া ধন,
যাহারে ঘেরিয়া অনুক্ষণ
ছুটিত আনন্দ উৎস, উছলিত হাসি,
যদিও ছিল না ঘরে হীরা মুক্তা মাণিক্যের রাশি,
রথ, হস্তী, অশ্ব, দাসদাসী।
যদিও দুবেলা
কন্যার বরাদ্দ ছিল পাকশালে নিত্য হাঁড়ি ঠেলা,

গিন্নিরে করিতে হ'ত কড়া মাজা থেকে ছড়াঝাঁট,
কর্ত্তারে কাটিতে হ'ত কাঠ
হাট হ'তে সোজা
বহিয়া আনিতে হ'ত তেল নুন শবজীর বোঝা
রৌদ্রতপ্ত রক্ত মুখে, ঘর্ম্মসিক্ত শ্লথ কলেবরে,
দীর্ঘঘন-নিশ্বসিত-বিক্ষুব্ধ-পঞ্জরে,
দিবা দ্বিপ্রহরে।
গৃহ ছিল সুখশান্তিময়।
প্রীতির পীযূষভরা আছিল সে তিনটি হৃদয়
আপনা-বিস্মৃত
দুঃখের জলন্ত চুল্লীমাঝে অবিকৃত।
আচম্বিতে একদিন
সুখসুপ্তিলীন,
গ্রামখানি সচকিত করি চতুর্গুণ,
রাত্রির বসন প্রান্তে জ্বালাইয়া মশাল,আগুন,
অট্টহাস্যে, হট্টগোলে,
ঢাকঢোলে,
ব্যথিত মথিত করি আকাশ, বাতাস, জলস্থল,
কোথাহতে এলছুটে বরপক্ষ দল,
অর্থলোভে তৃষার্ত্ত, পাগল,
রক্তআঁখি, শক্তিমদে চূর,
সর্পসম বক্রগতি, বিষতুণ্ড, বিষম নিষ্ঠুর,
আক্রমিল মহেশের পুরী অসহায়,
চলি গেল দণ্ডছয়ে লণ্ড ভণ্ড করি সমুদায়,
ভাণ্ডারে পশিয়া,
ছিঁড়ে, ছুড়ে ছড়াইয়া, পিষিয়া চষিয়া,
করি ছারখার,
জাগাইয়া উচ্চ হাহাকার,
শূন্য করি গোলা ও গোয়াল,
পাকশাল,
কর্ত্তার কপালে লেখা
চিন্তারেখা
নির্ম্মম পরুষ হস্তে করি পরিস্ফুট,
তিনফুট

কাপড়ের দৈর্ঘ্য হতে ছাঁটি,
খসাইয়া গৃহিণীর নাসা হতে,—গিনিসোনা খাঁটি—
নথটুকু, হাত হতে তাগা,
হানিল কন্যার ভালে জবারক্ত সিন্দুরের দাগা,
পরাইল রতন শৃঙ্খল
—ঝঙ্কৃত মুখর, সমুজ্জ্বল,
হস্তে, পদে, কণ্ঠে, ফাটতটে,
জড়ায়ে বাঁধিল লাল চটে।
বহিলয়ে গেলা শেষে
কোন দূর দেশে
কেহ নাহি জানে,
হিল্লী দিল্লী পারে কোন জেলা বর্দ্ধমানে।
হেথা শূন্য ঘরে,
দৈন্যজীর্ণ দম্পতির হৃদয়ে, উদরে,
জ্বলিল বাড়বাগ্নি শিখা লেলিহান
রাবণের চিতাসম উদ্দীপ্ত, অতৃপ্ত, অনির্ব্বাণ!
গেল কত দিন কত রাত,
দেখিতে দেখিতে গত মাসছয় সাত।
বর্দ্ধমান হ'তে আজো আসে নাই চিঠি অর্দ্ধখানা।
নাহি আছে জানা
কন্যার সংবাদ।
স্বামী স্ত্রীতে ভেবে ভেবে উন্মনা, উন্মাদ।
কাটে বেলা পিয়নের পথপানে চাহি অহরহ।
হেনকালে এল পত্রবহ
ডাক হরকরা,—
পিপাসিত চাতকের নেত্রপথে অভ্র জলভরা,—
কিন্তু কোথা জল?
এযেগো দারুণ বজ্রানল!
এযে লাল খাম!
টেলিগ্রাম!
ব্যাপারটা এই :—
মেয়ের কলেরা। ঘরে জামাতাও নেই
গেছে দূরে,
সেবা করিবার লোক মেলে নাই সাতগ্রাম ঘুরে।

অবস্থা সঙ্কট।
চিকিৎসক মেলাও দুর্ঘট।
বিনামূল্যে পরজনে কে করিবে দয়া?
ত্বরিতে পিতারে তাই সকাতরে স্মরিছে তনয়া।
শুনি বাক্যহত
মহেশের দৃষ্টি হতে ছায়াবাজি মত
মুছে গেল বিশ্ব ছবি,
নির্ব্বাপিত রবি!
পথমাঝে গড়াল সে পড়ি।
ক্ষণপরে উঠিয়া দাঁড়াল ধড়মড়ি
দেখিল প্রমাদ গণি
সেদিন বেস্পতিবার, বারবেলা পড়িবে এখনি!
তাই তাড়াতাড়ি
বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে, যতক্ষণ নাহি ছাড়ে গাড়ি
ভাবিল কাটাবে ইষ্টিশনে,
কষ্টেসৃষ্টে, বসিকাষ্ঠাসনে।
এ হেন কুক্ষণে
ধন, মান, আপ্তবন্ধু ত্যজে লোক না করি বিচার,
ক্ষণিকের স্বস্তি কোন ছার?
শুধু একবার
মালপত্র গোছাবার ফাঁকে
দেখা ভাল পথে যদি বিঘ্ন কিছু থাকে।
তাই সে বসিল ঘরে গিয়ে, কোলে নিয়ে,—
Map নয়, Bradshaw নয়,
Time table? তাও নয়।
মহেশ কাজের কাজী,
বসিল কোলেতে নিয়ে পাঁজি।
দেখিলেন সর্ব্বনাশ! সে দিন যে অমাপ্রতিপদ,
যাত্রানাস্তি কোনমতে। আবার বিপদ,
যোগিণী সম্মুখে!
তাই মনোদুখে
চক্ষুফাটি লক্ষধারে বহিতে লাগিল অশ্রুজল,
অনর্গল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
তেলা নং
কলিকাতা।

ভাবিয়া না পায় চারা,
—উত্তাল-বিপত্তি-সিন্ধু-মাঝে-আত্মহারা—
কোথা কূল, কোথায় কিনারা।
বুঝায়ে বলিল তবে নলিন গাঙ্গুলী
উপদেশ বচন মামুলী :—
"কেন ভয় পাও ?
সর্ব্বমঙ্গলার রাজ্যে, অমঙ্গল, সম্ভবে কি তাও ?
অভয়ার নাম স্মরি যাত্রা কর ঘুচিবে বালাই,
কোন চিন্তা নাই।
দুর্গানাম বিঘ্নবিনাশন।"
টিক্‌টিকিও করিল এ বাক্য সমর্থন
করি টিক্ টিক্।
মহেশ ভাবিল, "আহা! ঠিক।"
অতএব বাহিরিল দুর্গানাম উচ্চারিয়া মুখে।
হেনকালে মাথা গেল দরজায় ঠুকে।
ফিরে ঘরে ঢুকে।
মিনিট পনের খালি
আবৃত্তি করিল দুর্গা, দুর্গা, কালী, কালী,
তার পর বাহিরিয়া এল চট্‌পট্।
গৃহিনী সাজায়ে দিল দ্বারদেশে জলভরা ঘট,
আমপাতা গাদি।
সেথা বসি পড়ি গেল 'বৃষজগতুরগান' আদি
সমস্কৃত পদ্য।
ইহা পাঠে কার্য্য সিদ্ধি না কি সদ্য সদ্য।
অতঃপর উত্তরিল রাজপথ পরে ;
বেলা যায়, চলিল সত্বরে,
জপিতে জপিতে দ্রুত দুর্গা কালী নাম
অবিশ্রাম।
সহসা একি উৎপাত! পথমাঝে কে আনিল শব ?
নহে অসম্ভব
নিয়ে যাবে পথিকের ডানদিক ঘেঁসে!
চক্ষু স্থির! যায় বুঝি ফেঁসে
দুর্গা, কালী, পূর্ণ ঘট, বৃষ, গজ তুরগের গড়া
মঙ্গলের ঘড়া।

মহেশ অচিরে
দাঁড়াইল ফিরে
বামে রাখি মৃত দেহটীরে।
কৌশলে অশুভ হতে নিষ্কাসিল শুভ কোন মতে
পোস্ত যথা অহিফেন হ'তে।
পুনরায় চলি দ্রুতগতি,
অবসন্ন অতি,
উপনীত ইষ্টিশনে।
সেইক্ষণে,
বাঁশির নিস্বনে
ফুকারিয়া উঠিল এঞ্জিন
অর্ব্বাচীন।
টিকিট হল না কাটা, গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে!
মহেশ ছুটিল বেগে, ঠেলি কারে, পড়ি কারো ঘাড়ে
ধাক্কা ও হুঁচট খেয়ে
খেয়াল না করে
বাঁচে কিবা মরে,
ছুটে প্রাণ পণে,
ইহকাল পরকাল নাহি চাহে, শুধু ভাবে মনে
"একটি দরজা যদি খোলা পাই, বাঁচি।"
অবশেষে উঠিয়াছে পাদানিতে, হেনকালে হাঁচি
শুনা গেল কানে।
শেল যথা পশিল পরাণে।
কে হাঁচিল ? কে হাঁচিল ? চেয়ে দেখি সবমুখপানে,
বক্ষে, শিরে করি করাঘাত,
অকস্মাৎ
হতভাগ্য বসি প'ল ভূমে।
চকিতে লুকাল গাড়ি ক্ষিতি যেথা নভতল চুমে।
হোথা বর্দ্ধমানে,
মেয়ের পরাণ-পাখী পিঞ্জরের বাঁধন না মানে,
ঝাপটি মরিছে পাখাদুটী,
এখনি লইবে ছুটি,
উড়ে যাবে কোন অজানায়।

তার আগে একবার দেখিবারে চায়
স্নেহময় জনকেরে, মাগি লবে অন্তিম বিদায়।
হেথা কালীঘাটে,
মাটিতে লুটায়ে রাজবাটে,
বুকফাটা বেদনার অশ্রুভারে অবভুগ্ন পিতা
মনে মনে সাজাইছে আপনার চিতা,
শোকে মুহ্যমান।
দুজনার মধ্যে কত ক্রোশ ব্যবধান!
মিলনের ছিল এক পথ
বাষ্পরথ।
দূরত্ব দুস্তর পরে একমাত্র পুল।—
তাও আজি বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত, বিচূর্ণ বিলকুল
হাঁচির বোমায়!
হায়! হায়! হায়!!

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ভাত কাপড়ের শণি।

দেশের লোকের ভাত কাপড়ের অভাব বাড়িয়াছে; কার্ত্তিকের পচানে জ্বর বারমেসে ম্যালেরিয়ায় দাঁড়াইয়াছে; মানুষের খাঁটি মূলধন যে পৈতৃক প্রাণ, তাহাই বুড়া বয়স পর্য্যন্ত ধড়ে রাখা কঠিন হইয়াছে। কাহার দোষে বা কিসের ফলে এই দুঃখ, তাহাতে তর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তর্ক উঠে যে এই অবস্থাটাই সত্য কি না, তাহা হইলে গোলে পড়িতে হয়; কেন না রাজ্য শাসনের প্রচলিত নিয়মে এসকল বিষয়ের ঠিকুজি ছাপা হয় না। মাঝে মাঝে মানুষ গন্তি হয় বটে কিন্তু দুঃখের গণনা হয় না। কখনও কখনও মনে হয়, যে এই দুঃখের কথা চাপিয়া রাখাই যেন দল বিশেষের ইচ্ছা ও স্বার্থ। কেন এইরূপ মনে হয়, তাহা বলিতেছি।

দেশে উঠিল আর্ত্তনাদ, আর সেই সময়ে কয়েকজন ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত একেবারে আকবর বাদসাহের দিনের খাতা-পত্র খুলিয়া প্রমাণ করিতে বসিলেন, যে সেকালে টাকা পয়সার যে মূল্য ছিল, সে হিসাবে বিচার করিলে সে কালের অভাব ও দারিদ্র্য একালের চেয়ে বহুগুণে অধিক ছিল। অন্ন হউক অধিক হউক, দুঃখটা দুঃখই; দুঃখনিবৃত্তির উপায় না ভাবিয়া বিদেশের তত্ত্বজ্ঞেরা বসিলেন একটা জটিল সমস্যার রফা করিতে—আর আমাদের হইতে লাগিল দফা রফা।

অন্যদিকে আবার শুনিতে পাই যে আমাদের দুঃখের কথা নাকি কাল্পনিক। যাঁহারা আমাদের কল্পনা শক্তির সুখ্যাতি করেন, তাঁহারা বলেন, দেড়শত বৎসর

ধরিয়া এদেশের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িয়া চলিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের মাথার উপরে কাপড়ের ছাতা, গায়ে জামা, পায়ে জুতা ও টেঁকে টাকা; এ দৃশ্য ভারতবর্ষের কোন যুগে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। চাষায় যত টাকা দিয়া কোর্টফিস কেনে ও উকিলকে ধনী করে, সে কালের ভদ্রলোকের ঘরেও অত টাকা ছিল না। আগে জমিদারেরাও খড়ের চালায় বাস করিত, এখন পল্লীতে পল্লীতে কোঠা বাড়ী। বড় বড় জমীদারেরা, সেকালে তাহাদের পাড়া গাঁয়ের আবাসে, খালি গায়ে খড়ম পায়ে ঘুরিত, আর চিঁড়ে-দই-য়ের ফলার দিয়াই বড় মানুষি ফলাইত; এখন প্রজার ঘরে টাকা হইয়াছে বলিয়াই তাহারা বড় বড় সহরে বাস করিতেছে, ইন্দ্র ভবন গড়িতেছে, গাড়ি মোটর হাঁকাইতেছে, নন্দন বনে বেড়াইতেছে ও রাজভোগ খাইয়া প্রতিদিন ডাক্তারকে ৩২৲ টাকা করিয়া দর্শনি দিতেছে। প্রজারা যদি কল্প তরু না হইয়া থাকে, তবে তাহার ছায়ায় এত ভোগ বিলাস বাড়িতে পারিত কি? যদি নিত্য ত্রিশ দিন গোরুটী দশসের করিয়া দুধ দেয়, তবে তাহার ঘাস জলের অভাব হইয়াছে বলা চলে না; প্রজাকে পিষিয়া মারিয়া টাকা আদায় করিলে এই স্থায়ী ঠাট বজায় থাকিত না; মূলার ক্ষেত করিয়া চাষাকে উপড়াইলে এতদিন সকল ক্ষেত উজাড় হইয়া যাইত। যাহাকে দুর্ভিক্ষ বলে তাহা দেশে নাই, কারণ টাকা দিলেই বাজারে যত খুসি খাদ্য কিনিতে পারা যায়।

সর্ব্বসাধারণের যে টাকা বাড়িয়াছে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে কন্যাদায় ঘুচাইতে গেলে অধিকাংশ লোককে আগেকার চেয়ে বহুগুণে বেশী টাকা পণ দিতে হয়। এ কাজ যদিও বহু কষ্টে অনেক সম্পত্তি বেচিয়া করিতে হয়, তবুও ত বুঝিতে পারা যায়, যে মানুষের সম্পত্তি আছে ও সে সম্পত্তির মূল্য আছে। বাপের টাকার অনটন দেখিয়া দু-চারিটী মেয়ে আত্মহত্যা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত টাকা পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই বরের বাপেরা দাবি উপস্থিত করিয়া থাকে; আবার একথাও সত্য, যে কাহারও মেয়ে একেবারেই অবিবাহিতা পড়িয়া থাকে না। দেশে যে টাকা বাড়িয়াছে তাহার প্রমাণে, লোকে আরও দশটা দৃষ্টান্ত দিতে পারে।

তবে যে গোঁড়ায় বলিলাম, দেশে রোগ ভোগ বাড়িয়াছে ও অন্ন ভোগ কমিয়াছে, সেটা কি মিথ্যা কল্পনা? আমাদের সমৃদ্ধি, মহাদেশের মত বিস্তৃত হইলেও তাহার চারি পাশে কি মহাদেশের চেয়ে বহুপরিমাণে বিস্তৃত দুঃখ দারিদ্র্যের সাগর, অস্বীকৃত হইতে পারে? যাঁহারা দেশের দুঃখ কষ্ট অস্বীকার করেন না, সমৃদ্ধির কথাও ভুলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিবেন, যে উপার্জ্জন-পটু ধনী বিদেশীরা এ যুগে আমাদের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর দেশের লোকের মনে নূতন নূতন সুখ ও সুবিধা লাভের জন্য ছোঁয়াচে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কিন্তু উপার্জ্জনের বল বুদ্ধি বাড়ে নাই; তাই আকাঙ্ক্ষাটা দুরাকাঙ্ক্ষা হইয়া আমাদিগকে দুঃখে কষ্টে ডুবাইতেছে। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বা বলিতে পারেন, যে বিদেশীরা তাহাদের লাভের মাত্রা যে ভাবে চড়াইয়াছে, ও যত সম্পদ জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে দেশের লোকের দুর্দ্দশা না বাড়িয়া যায় না। প্রত্যুত্তরে বলা চলে যে, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য না চলিলে কোন দেশেরই ধন সম্পদ বাড়িতে

পারে না। কোন শ্রেণীর বণিককেই লাভের মাত্রা কমাইতে বলা যায় না। আর ব্যবসা বাণিজ্য চলিয়াছে বলিয়াই দেশের ধন দৌলত বাড়িয়াছে ও নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে; দেশের লোক এখন উপার্জ্জন পটু হইলেই সকল দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের সকল জটিল কথা এ প্রবন্ধে তোলা চলে না; এ দেশের লোক বিশেষ উপার্জ্জন পটু হইলেও, এ কালের রাজ বিধানের ফলে, বিদেশের সঙ্গে অবাধ স্বাধীন বাণিজ্য চালাইতে পারে কিনা, সে কথাও এ প্রবন্ধে ঠিক বিচার করা অসম্ভব। এ সম্পর্কে এখানে কেবল এইটুকু বলিতে পারি, যে আমরা যদি খাঁটি দুঃখের তাড়নার সময়ে অতি সূক্ষ্ম আস্‌মানি বিচার ছাড়িয়া, এই মাটির সংসারের দিকে তাকাইয়া 'আটপউরে', কাণ্ডজ্ঞান লইয়া চলি, তবে বুঝিতে পারিব, যে যাহা বিনা জোর জুলুমে যায় না,—যাহার উপর জোর জুলুম করিবার বল আমাদের নাই, তাহার সঙ্গে আড়ি করিলে কেবল বলক্ষয় হইবে, কিন্তু দুঃখ ঘুচিবে না। এখন আড়ি সাজে না, কিন্তু যে আড়াআড়ি সকল অবস্থাতেই উত্তম, তাহা সাজে।

এই আড়া আড়ি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কথা একটু বুঝাইয়া লিখিতে গেলে আঠার পর্ব্ব মহাভারত লিখিতে হয়,—গোঁড়ায় যে কাঁদুনির সুর ধরিয়া ছিলাম তাহা ভাঁজা হয় না। দুঃখের মূল, সে দিকের বিচারেও ধরা যায় বটে তবে যে মাটি সহজে খুঁড়িয়া এখনকার সঞ্চিত বলে গোটাকতক শিকড় কাটিতে পারা যায়, সেই মাটি খুঁড়িতেই বিচারের ক্ষমতা তুলিব।

কবি, স্বদেশ-প্রীতির টানে সোনার বাঙ্গালা আঁকিয়াছেন; আর সেই চিত্র বড় মনোহর; তবে যখন খাঁটি মাটির বাঙ্গলার দিকে মোটা দৃষ্টিতে তাকাই, উহার জ্বরে কাঁপা ও ছায়ায় ছাপা পল্লি বাটে যাহা দেখি, তাহাতে আর সেখানকার সোঁতা বাতাস প্রাণে কবিতার বাঁশি বাজায় না, প্রাণ সেখানে শিঙ্গা ফুঁকিতে চায়। আগাছার জঙ্গলে, পাতা পচা বদ্ধ জলা, ও বিষে কুষ্ট মশা, মানুষকে উদ্বাস্ত করিতে বসিয়াছে। কয়েক জন মেডিকেল কলেজের পাশ করা বুদ্ধিমান সুচিকিৎসকের মুখে শুনিয়াছি যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, পাড়াগাঁয়ের বেশীর ভাগ লোকে জ্বরের আক্রমণ এড়াইতে পারে না, আর জ্বরের সময়ে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য না পাইয়া ভুগিয়া ভুগিয়া মরে। অভাবের কষ্ট কেমন করিয়া হয়? কোন্ শনির দৃষ্টিতে মানুষের টাকা কড়ি উড়িয়া পুড়িয়া যায়? যাহারা দেশের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই বলিবেন, যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বাড়িয়াছে অনেক কাজেই রোগের বেলায় পথ্য চলে না। একথা সত্য, যে ফেসন্ অর্থাৎ নূতন দাঁড়া—দস্তুরের ঢং, মেলেরিয়ার মত পাড়াগাঁয়ে সংক্রামক হইতেছে, ও অনেকে লোকের কাছে মান রাখিতে গিয়া রোগের সময় প্রাণ রাখিতে পারিতেছে না; কিন্তু এই কারণই দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ নয়! ভূস্বামীকে খাজা দিতেই হইবে, উকিলকে যাহা না দিলেই নয়, বিবাহে যাহা শোষিবেই ও শ্রাদ্ধে যাহা গড়াইবেই তাহা ছাড়াও যে অনেক ঢং—এ মানুষের টাকা খসে, ও তাহার ফলে বড়ই কাহিল হইতে হয়, সে কথা স্বীকার করিয়াও অন্য কারণ খুঁজিয়া দেখিব। দুর্দ্দশা ঘুচাইবার উপায় স্বরূপে কেহ কেহ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহারই একটু সমালোচনা করিলে আমাদের উদ্দিষ্ট কারণটির সন্ধান পাওয়া যাইবে।

কেহ কেহ হয়ত জ্বর জ্বালার কথার প্রসঙ্গে, একটা সোজা উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য অধীর হইয়াছেন; তাঁহারা বলিতে চাহেন যে জলাশয় পরিষ্কার রাখিলে ও জঙ্গল কাটিয়া ফেলিলে যখন আপদ যায়, তখন অন্ততঃ ঐ প্রসঙ্গে এত তর্ক ও বিচার কেন? কথাটা এত সোজা নয়। যেখানে সার তৈ'রী করা ও জমিতে সার জমাইয়া দেওয়া অর্থ-সাধ্য ও শ্রম-সাধ্য, সেখানে যদি অনেক আগাছা জন্মিয়া মাটিতে মিশিতে পায়, তবে সার জমাইবার কাজটা সহজ হয়; যাহারা কোন বিষয়ের কার্য্য কারণ ভাল বুঝে না ও রোগটাকে কপালের ফল ভাবে, তাহারা লোক মুখে, পুঁথির কথা শুনিয়া, নিজেদের মনে এমন একটা টান জন্মাইতে পারে না, যাহাতে আগুলাভের পথটা ছাড়িয়া দিতে পারে। অন্য রকমের জঙ্গল ও বাঁশের ছায়া সম্বন্ধে অন্য কথা আছে; বাসের ঘরের জন্য, বারুয়ের বরজের জন্য ও আরও দশটা বিশেষ কাজের জন্য, যেখানে বাঁশ ছাড়া গতি নাই, যেখানে জ্বালানি কাষ্ঠ কিনিতে হইলে নিজের ঘর সংসার পুড়িয়া যায়; সেখানে গাছ পালা কাটা, অথবা সাজাইয়া গুছাইয়া অল্প করিয়া রাখা বড় সুসাধ্য নয়; বসত ভিটের কাছেই খানিকটা বন বাদাড় না থাকিলে স্ত্রীলোকদের পক্ষে লজ্জা রক্ষা করা চলে না কারণ তাহারা পুরুষদের মত 'গুরু কাজ' ও 'লঘু-ক্রিয়ার' জন্য মাঠে ও গাঙ্গের পাড়ে যাইতে পারে না। নিজে হাতে নিজেদের মলাদি লইয়া, মাঠে পোঁতার ব্যবস্থাটা, এদেশের সংস্কারে যখন চলিতেই পারে না, তখন ঘরের কোণের ছায়ার তলাতেই রোগের বীজ পুষিতে হয়। আমাদের মান মর্য্যাদার সংস্কার ও জাত রাখার সংস্কার যে ভাবে আছে, তাহাতে বিদেশের দৃষ্টান্ত কেন, মনুর কালের বিধিও চলিবে না।

বাঙ্গালা দেশের চাষারা বেশী টাকা পায়, পাট বেচিয়া; বাজারে যখন যত খুসি চাল কিনিতে পাওয়া যায়, তখন অল্প লাভের জন্য ধান না বুনিয়া চাষারা নীচু জমিতে পাটের চাষ করিবেই; পাটের মত লাভের আর একটা কিছু না পাইলে, উহা ছাড়িতে পারে না। গাঁয়ের অনেক জলায় পাট না পচাইলে পাটের রোজগার অসম্ভব। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের সংস্কারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অদৃষ্টে মরণ না থাকিলে যে পাট পচাইলেই মানুষ মরিতে বসিবে, এ কথায় প্রায় কাহারও দৃঢ় বিশ্বাস নাই। লাভের কথাটা মানুষের বড় কাছে, কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া বুঝিতে হয়।

যাঁহারা পাড়া গাঁয়ের সীমা ঘেঁষিতেও নারাজ, তাঁহাদের কেহ কেহ, হিতৈষী বক্তা সাজিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন যে, মায় জমিদার সকল শ্রেণীর বিদেশ প্রবাসীরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের গ্রামগুলিতে গিয়া বাস করুন; তাহা হইলে সকলের সুবুদ্ধিতে গ্রামগুলির উন্নতি হইতে পারিবে। অনেক লোক যদি ঐ উপদেশে সহর ছাড়ে, তবে সহরের বসত ভিটার মূল্য অনেক কমিবে, ও যাহারা সহর-বাসে নাছোড়বান্দা তাহাদের সুবিধা হইবে; কিন্তু এই উপদেশ পালনে যে বাধা আছে, তাহা বলিতেছি।

পাড়া গাঁয়ে জন্ম হইলেও যাঁহারা দাতা-কর্ণ পড়িয়াই পড়া শেষ করিতে চাহেন না, সহরে শিক্ষিত হইয়া শিক্ষিতদের সংসর্গে মানুষ হইতে চাহেন, শিক্ষালাভের পর প্রচার ব্রত লইতে চাহেন না বা পারেন না, মহাভারতের বনপর্ব্ব পড়িয়াও যাঁহারা দিবসের অষ্টমভাগে

জন্ম-ভিটায় বসিয়া শাক সিদ্ধ করিয়া তৃপ্ত নহেন, অর্থাৎ কিছু রোজগার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহেন, তাঁহারা বারমাসের মধ্যে একমাসের ছুটিতে স্বাস্থ্যের সন্ধানে শৈশবের লীলা ভূমিতে ফিরিতে পারেন না; সংখ্যায় এই শ্রেণীর লোকই দিন দিন অধিক হইতেছে। হিংসা দ্বেষ ও পচানে জ্বর না এড়াইয়া, ইঁহারা জন্ম-ভিটায় আসন পাতিলে কতটা কি হইত জানি না। কিন্তু কথা এই, যে মানুষকে যখন বাড়িতে হইবে, তখন ঠাঁই নড়ার প্রয়োজন; কাজেই গ্রামের উন্নতির অন্য উপায় দেখিতে হইবে। কোন মানুষের কপালেই যে জন্মভিটার ফোঁটা দাগিয়া রাখা চলে না, ভিটা কামড়াইয়া থাকিলেই যে মানুষের অধোগতি হয়, তাহা বুঝাইতে গেলে সমাজ-তত্ত্বের একটা অধ্যায় লিখিতে হয়। মানুষেরা যদি চিরকাল জন্ম-ভিটা ধরিয়া থাকিত, তাহা হইলে আদিমনুর আদিস্থানেই সকলে পচিয়া মরিত আর সারা পৃথিবীটা জন শূন্য হইত; যতদিন ভারতে জীবন ছিল ততদিন নিরন্তরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া বসবাস করিয়াছে; বংশের তালিকা খুলিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, কাহারও ভিটা তাঁহার আদি ভিটা নয়।

পৈত্রিক যাহা কিছু লইয়া অথবা চাষ প্রভৃতি কাজে যাহারা পল্লিবাসী, তাহাদের অধিকাংশ লোক যে স্বাস্থ্যের অনেক বিধানকে ভুয়া মতবাদ মনে করে, এবং জন্মগত ও সামাজিক সংস্কারের ফলে নিজেদের প্রাণ রক্ষার বিষয়েও অনেক কাজ কিছুতেই নিজে করিতে পারে না, সেকথা পূর্ব্বেই একটু-খানি বলিয়াছি। যদি কোন গ্রামে নিয়ম করা যায় যে অমুক জলশয়ের জল কেবল পানের জন্য রহিল, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন যে অধিকাংশ লোক গোপনে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিজেরাই নিজেদের চাতুরী ও বাহাদুরির প্রশংসা করিবে। লোক সাধারণের মধ্যে কিরূপ শিক্ষা না চালাইলে লোকেরা তাহাদের নিজের স্বার্থও ভাল করিয়া বুঝিবে না, কিরূপ প্রভাব বিস্তার না করিলে প্রাচীন সংস্কার ঘুচিবে না ও প্রয়োজনের সকল শ্রেণীর কর্ম্মকেই লোকে পবিত্র মনে করিবে, তাহার বিচার না করিলে চলিবে না। যাঁহারা পলিটিকস্ নামক অদ্ভুত পদার্থটাকে টানিয়া আনিয়া সমাজ-সংস্কারকে পিছনে ঠেলিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তর্কে আঁটিতে পারিব না।

যাহাদের বংশ বাড়িয়াছে কিন্তু জমি বাড়ে নাই, ও যাহারা পৈত্রিক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে রোজগার করিতে কুণ্ঠিত, তাহারা যে কষ্টে পড়িবে তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। ময়মনসিং, ঢাকা, চাটগাঁ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর মুসলমান চাষা, বর্ম্মায় গিয়া চাষের কাজ করে, ও অনেক টাকা লইয়া ঘরে ফেরে; চাটগাঁ অঞ্চলে যে সকল গোয়ালা ও নাপিতেরা কেবল নামেই হিন্দু কিন্তু জাতের বাঁধন বড় মানে না, তাহারাও বর্ম্মায় অনেক টাকা রোজগার করে; পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক মুসলমান, জাহাজের কাজে অনেক টাকা ও সাহস উপার্জ্জন করে, কিন্তু বলিষ্ঠ নমশূদ্রেরাও জাত বাঁচাইয়া ঘরে থাকে। আসামের চা বাগানে যদি স্বেচ্ছায় শ্রমজীবি জুটিত, তবে শ্রমজীবিরা সুখে ও স্বাধীন ভাবেই থাকিতে পারিত; তাহা ঘটিলনা বলিয়াই কুলি-আইন হইল, আর বাগানের মালিকদিগকে কুলি পিছু বহু টাকা ব্যয় করিয়া ক্রীতদাসের মত কুলি রাখিতে হইতেছে। এই কুলি আইনের ফলে যে

সকল ছলে কুলি সংগ্রহ করা হয়, ও তাহাতে যেমন ভাবে অনেক স্ত্রী পুরুষ পাপে ও কলঙ্কে পড়িয়া জাত হারাইয়া কুলি হয়, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। সাধারণ লোকেরাই যে ভিটার মায়া ছাড়িতে পারে না, তাহা নয়; যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারাও মোটা মাইনে না পাইলে বাঙ্গলা দেশের বাহিরে বেশীদূর যাইতে পারেন না, কারণ সন্তানদের বিবাহের উদ্যোগের জন্য অনেক খরচ-পত্র করিয়া দেশে ফিরিতে হয়, ও আরও দশটা বিষয়ে নিজের জাতের বাঙ্গালি না পাইলে 'প্রবাসে' থাকা চলে না। ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে একাকী গিয়া যদি এদেশের লোক ঘর বাঁধিতে না পারে ও সমাজ খুঁজিয়া না পায়, তবে গোটা ভারতবর্ষকে আপনার দেশ বলিয়া বুঝিতে শিখিবে না; বাহিরের প্রদেশ গুলি 'উড়ে মেড়োর' মুল্লুক বলিয়াই হতাদৃত হইবে। স্বাধীনতা লাভের গোড়ায় যাহা না হইলে চলে না, অলক্ষ্যে দেশের প্রতি অন্তরের টান জন্মাইতে হইলে যে ভাবে চলা উচিৎ, তাহার পক্ষে আমাদের প্রধান বাধা কি, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না।

যাহাদের ভাল করিয়া পেটের ভাত যোটে না, এমন লোক বাঙ্গলার প্রতি গ্রামেই বহু সংখ্যায় আছে; প্রতি গ্রামে হিতৈষণার কাজ খুলিয়া টাকা ঢালিতে গেলে, কুবেরকেও দেউলিয়া হইতে হইবে। মানুষ যদি মানের শাসন ও জাতের শাসন এড়াইয়া নিজের প্রয়োজনের সকল কাজ না করে, যদি উপার্জ্জনের জন্য সকল শ্রেণীর শিল্পকেই পবিত্র বলিয়া মনে করিতে না শিখে, তবে কর্ম্ম-ফলের দেবতা কদাচ প্রসন্ন হইবেন না। আমাদের এই প্রকাণ্ড দেশে যদি গোটাকতক উপযুক্ত স্থানে রোজগারের ভাল কারখানা খোলা যায় তবেই কারখানা গুলি ভাল করিয়া চালাইবার সম্ভাবনা হয়; সেই গোটাকতক স্থানেই বহু গ্রামের লোককে আসিয়া শ্রমের জন্য জড় হইতে হইবে। এই সকল নূতন স্থানে যদি মানুষকে টানিয়া আনা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই ধীরে ধীরে অনেক সংস্কারের বাঁধন খুলিয়া যাইবে, সুখ সুবিধার প্রলোভনে ও আলস্য ছাড়িয়া, উঠিয়া হাঁটিয়া মানুষেরা নূতন বল পাইবে; নূতন স্থানে নূতন সমাজ গড়িতে গড়িতেই মানুষের হাড়ে হাড়ে নূতন বুদ্ধি ও নূতন প্রবৃত্তি জন্মিবে। দেশের লোক একেবারে পঙ্গু হইয়াছে; উহারা নড়িতে চড়িতে না শিখিলে স্বরাজ আনিতে পারিবে না। আমাদের আজন্মের বাঁধন যে আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে ও দাসত্বের বুদ্ধিকে মধুর করিয়া দিয়াছে, তাহা বুঝিলে সকল উৎসাহের কাজ পণ্ড হইবে। আমাদের ভাত কাপড়ের শনি, আমাদেরই শরীরের ও সমাজের কেন্দ্রে।

দোষ, কারও নয় গো মা!
মোরা নিজের খোঁদা খানায় পড়ে মরি শ্যামা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সহযোগিতা বর্জ্জন।

১

বাজ্‌রে শিঙ্গা, বাজ্‌রে শিঙ্গা,
বাজ্‌রে আবার আজ এই রবে!
দুঃখের রজনী গিয়াছে চলিয়া,
ভারত এবার স্বাধীন হবে!

২

আছিল যতেক ভারত সন্তান
সবাই ক্ষেপিয়া উঠেছে আজ!
স'যোগিতা তারা করিবে বর্জ্জন—
করিবে না আর পরের কাজ!!

৩

School, collegeএ পড়িবে না আর
বাড়ীতে বসিয়া scholar হবে!
বিলাতে তারা যাবে না কখনো
দেশের সন্তান দেশেই রবে!!

৪

ব্যারিষ্টারী তারা করিবে না আর
ওকালতি এবার ছাড়িবে তারা!
আপন স্বপদ করিবে বর্জ্জন
Magistrate, judge আছিল যারা!!

৫

বিদেশে তাঁহারা মালের export
এইবার নাকি করিবে বন্ধ!
ব্যবহার তারা করিবে না আর
Essence, সাবান, সুগন্ধি গন্ধ!!

৬

Grand-Hotelএ যাবে না তাহারা
খাবে না আর সে সাহেবী খানা!
Congressএ এবার করেছে এসব—
তাদের দেশের নেতার মানা!!

৭

কলের গাড়িতে চড়িবে না কেহ
গন্তব্যে হাঁটিয়া যাইবে চ'লে!
ডাকঘরে কেহ ছাড়িবে না পত্র
পাঠাবে বাঁধিয়া পাখীর গলে!!

৮

পরের গোলামী করিবে না তারা
নিজেরা শাসিবে নিজের দেশ!
Hat, coat তারা ছাড়িয়া এবার
ধরিবে আপন স্বদেশী বেশ!!

৯

Cigarette তারা পায়েতে দলিয়া
"হুক্‌কা-কলিকা" করিবে সার!
"বিড়ির" আশ্রয় কেহ বা লইবে
সাধ না পূরিবে তাহাতে যার!!

১০

Port, Whiskey ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
সবাই এবার ধরিবে "তাড়ি"!
কিনিতে কেহই Denis Mounie
ছুটিবে না আর সাহেব বাড়ী!!

১১

অগাধ পাণ্ডিত্য দেখা'য়েছে গান্ধী
Non-co-operation জাহির করে!
ক্ষেপিয়া উঠেছে মন্ত্রেতে তাহার
ছেলে বুড়ো নারী প্রত্যেক ঘরে!!

১২

Councilএ যাইয়া সদস্য হইবে
করেছিল বাঙ্গালী মনেতে আশ!
বিষম খট্‌কা বাধাইল গান্ধী
Non-co-operation করিয়া পাশ!

১৩

"তোলপাড়" কিন্তু দেশের ভিতরে
চলেছে আজ্‌কে মস্ত বড়;
শেষটা কি হয় ঠিক কিছু নাই
যদি কেউ শেষে স'রে'না পড়!!

১৪

তোলপাড় কত গিয়াছে এ-হেন
নূতনত্ব ইথে কিছুই নাই!
কোথাকার ঢেউ কোথা পড়ে গিয়া
আমরা বসিয়া দেখিব তাই!!

—শ্রীসঞ্জয় উবাচ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের প্রতি কয়েকটী কথা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

প্রিয় ছাত্রবর্গ!

ইতিপূর্ব্বে তোমাদের কলেজ পরিত্যাগ সম্পর্কে আমার মনে যে আপত্তিগুলি উদিত হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। আজ আর কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলিব। তোমরা এ কথাগুলিও ভাবিয়া দেখিবে, এ আশা আমার আছে।

যে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেবলমাত্র কতকগুলি পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়া এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দিয়া আসিতেছিল, তখন দেশের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবর্গের শিক্ষাদানের কোনই ব্যবস্থা না করিয়া, যন্ত্রবৎ, কেবল কতকগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে দেশের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেছে; অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটী আসল কর্ত্তব্য—উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা—সে কর্ত্তব্য-পালনে বিশ্ববিদ্যালয় নিতান্তই উদাসীন রহিয়াছে! দেশময় তখন এই দোষ কীর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে, অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, যখন বিশ্ববিদ্যালয় বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের সর্ব্বোচ্চ এম্-এ পরীক্ষার জন্য, শিক্ষার ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কতকগুলি বিভাগ খুলিয়া দিয়া, সেই সকল বিভাগে ছাত্রদিগকে উন্নত প্রণালীতে এম্-এ শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে উদ্‌যোগী হইলেন; তখন আমরা সকলেই মনে করিতে লাগিলাম যে, এইবার দেশের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ অবলম্বন করিবেন, এবং এই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠা করিতে পারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে দেশবাসীর প্রসন্ন দৃষ্টি নিপতিত হইবে। কিন্তু হায়! এই আশাই কি সফল হইতে পারিয়াছে?

কেবল একটীমাত্র বৎসর এই শিক্ষাদান প্রণালী ব্যবস্থাপিত হইতে না হইতেই, নানা স্থান হইতে, এই শিক্ষাদান-পদ্ধতির দোষ আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল! একটা নূতন ব্যবস্থার প্রণয়ণ করিতে গেলেই; প্রথম প্রথম হয় ত ঐ ব্যবস্থার মধ্যে দুই চারিটা বিচ্যুতি বা অভাব থাকিতেও পারে; যদি সেই সকল অভাব বা ত্রুটি সংশোধনের শুভ-ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, ঐ ব্যবস্থার সমালোচনা করা যায়, তবে সেরূপ সমালোচনা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় এবং সে প্রকার আলোচনায় দেশবাসীমাত্রেরই অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু নব প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ যে প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সেই আন্দোলনকে, কোন প্রকারেই হিতেচ্ছা-প্রণোদিত আন্দোলন বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারা যায় না। স্বতঃই মনে হয়, এই প্রকার আন্দোলনের মূলে যেন ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে! বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই আন্দোলনে কেবলমাত্র সত্য ও কল্পিত দোষগুলিরই পুঙ্খানুপুঙ্খ কীর্ত্তন করা হইতেছে; কিন্তু এই নূতন শিক্ষা-প্রণালীর একটিমাত্র গুণেরও উল্লেখ করা হয় না। দোষ প্রদর্শনে শত জিহ্ব; গুণের উল্লেখে একেবারে মুদ্রিত-মুখ!! তোমরা এই নূতন পদ্ধতির অধীনে থাকিয়া, অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া সংসারে প্রবেশ

করিয়াছ; অনেকে বর্ত্তমানে এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করিতেছ। আমি তোমাদিগকেই সাক্ষীরূপে, সাদরে, আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; তোমরাই বল, পূর্ব্বের শিক্ষা-প্রণালী এবং নবীন শিক্ষা-প্রণালী—এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে 'আকাশ পাতাল' তফাৎ কি না? তোমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সকল দিকে প্রায় পূর্ণাঙ্গরূপে শিক্ষালাভ করিতেছ কি না? যে সকল শিক্ষক তোমাদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন, তাঁহারা তোমাদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন লইয়া থাকেন কি না? এই অধ্যাপকদিগের জ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালী, গভীর ও তোমাদিগের পরম হিতসাধক কি না? তোমরা এই প্রশ্নগুলির নিরপেক্ষভাবে উত্তর দেও!

এই সমালোচনা ও আন্দোলনের মধ্যে, আমরা বিস্মিত চিত্তে, লক্ষ্য করিয়াছি যে, একটা এইরূপ কথা উঠিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টী একটী "গোলামখানা" মাত্র। এই সুমিষ্ট, সুরুচিসঙ্গত, শিষ্টাচারানুগত "বিশেষণটি" দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার প্রথম অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি একবার এই "গোলাম-খানাটীর" ত্রি-সীমার মধ্যে কোন প্রকারে আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাকেই আপনার স্বাধীন মত ও চিন্তা, নিজের ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব, এইগুলিতে চিরকালের মত জলাঞ্জলি বা তিলাঞ্জলি প্রদান করিতেই হয় এবং তাঁহাকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর যিনি প্রধান পরিচালক সেই ব্যক্তি-বিশেষটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, একটা "গোলামী-খতের" লেখা-পড়া করিয়া লইতে হয়!! "গোলামখানা" বিশেষণটির যদি এই প্রকার অর্থই হয়, তবে তোমাদিগকে একটী কথা বলিব। ইহাতে তোমাদিগের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? যদি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি, লাভ-লোকসানের কথা উপস্থিত হয়, তবে সেটা ত আমাদের স্কন্ধ-দেশেই পূর্ণরূপে পড়িবার কথা!! ছাত্রদিগের পক্ষে কোন স্বাধীনতা বর্জ্জনের বা দাস-খৎ দিবার ত কোনই প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। তবে কেন তোমাদিগকে—ছাত্রবর্গকে—"গোলাম-খানা" পরিত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইতেছে? এই সুমিষ্ট বিশেষণটীর আর এক প্রকার অর্থ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা 'গোলাম' নির্ম্মাণের উপযোগিনী শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি, দেশ-ব্যাপী 'কেরাণী'র কুল সৃষ্টি করিতেছে; গভর্ণমেণ্টের বিবিধ আপিশের নিমিত্ত, বৎসরের পর বৎসর, অসংখ্য 'দাস-শ্রেণীর' সৃষ্টি হইতেছে! "গোলাম-খানার' ইহাই দ্বিতীয় অর্থ। আমি তোমাদিগকে এখানে ও সাদরে, সস্নেহে, আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—সত্যই কি তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের নিকটে এই দাসত্বোপযোগিনী শিক্ষা পাইতেছ? উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব—এগুলি কি তোমাদিগকে সত্যই * "কেরাণী-গিরি" করিবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতেছে? সংস্কৃত, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার; ন্যায়-বৈশেষিক-বেদান্ত-সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রগুলি প্রাচীণ ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে;—দাসত্বের কোন প্রকার 'বীজের' প্রকৃতই কোন অনুসন্ধান মিলিয়াছে কি? প্রকৃত কথাটা তাহা নহে! কথাটা

* আমি এই সকল প্রবন্ধে Artsএর কথাই লক্ষ্য করিয়াছি। Scienceএর দিকটা বলি নাই।

হইতেছে, মানুষের চিত্তবৃত্তি! দেশের আর্থিক অবস্থা যদি এ প্রকার শোচনীয় হইয়া থাকে যে, বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্যের পথ যদি বিদেশীয় কর্ত্তৃক এপ্রকারে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়া থাকে যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদিগের পক্ষে অন্য প্রকারে অর্থাগম করিবার উপায় যদি এপ্রকারে বিনষ্ট হইয়া গিয়া থাকে যে, —গভর্ণমেণ্টের "কেরাণী"র কার্য্য না করিলে গ্রাসাচ্ছাদন আহরণ করা কঠিন; তাহা হইলে, ইহা উচ্চশিক্ষার দোষ নহে! 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' শিক্ষিত হইয়াও এই 'কেরাণী গিরি'র হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াও, 'আমি কেরাণীর কার্য্যে যাইব না', 'আমি মনুষ্যত্ব-বর্জ্জন দিয়া দাসত্বের নিগড় গলায় বাঁধিব না'—এপ্রকার চিত্ত-বৃত্তি কি অর্জ্জন করা অসম্ভব? ফলতঃ, বিশ্ববিদ্যালয় 'গোলামী' শিক্ষা দেয় না; বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ-অঙ্গের সৎ-সাহিত্যাদির শিক্ষাই প্রদান করিয়া থাকে। মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত চিত্ত-রঞ্জন—ইহারা কি বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই বহির্গত ছাত্র নহেন? পরলোকগত মহাপুরুষ তিলক কি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-রত্ন ছিলেন না?

তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া, "জাতীয় শিক্ষা" লাভের জন্য, কলেজ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছ? কিন্তু "জাতীয় শিক্ষা" কথাটার অর্থ কি? এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিছু বলিয়াছি। আজ আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্ববারে, যে সময়ে বাঙ্গলা দেশে "স্বদেশী" আন্দোলন প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে, National Council of Education" দ্বারা, জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে যে সকল পাঠ্য গ্রন্থ ও যে প্রকার প্রণালী, 'জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি' রূপে অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া তৎকালের "সন্ধ্যা" পত্রিকার সম্পাদক পরলোক-গত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, ঐ সকল পাঠ্য গ্রন্থ এবং শিক্ষাদানের ঐ প্রণালী,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একরূপ নকল মাত্র; সুতরাং ইহাকে "জাতীয় শিক্ষা প্রণালী" বলা যায় না। তিনি এই বলিয়া সকলকে সময়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন! এবারেও, আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই যে, তোমরা কি "জাতীয় বিদ্যালয়ে" প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা বা পারসী কে, ইংরেজীর সঙ্গে একেবারে তুল্যরূপে প্রবর্ত্তিত করাইতে সমর্থ হইবে? আমি ত যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে সেরূপ প্রাধান্যের কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। "নায়কের" সম্পাদক ও, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে, এই বিষয়ে সতর্কীকৃত করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই "জাতীয় শিক্ষার" প্রতিষ্ঠাতা ও পরামর্শ দাতা, তাঁহারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য প্রভাবে পূর্ণমাত্রায় প্রভাবান্বিত; পাশ্চাত্য উচ্চ-শিক্ষায় আকণ্ঠ শিক্ষা প্রাপ্ত। ইহা যে কোন দোষের কথা, তাহা আমি বলিতেছি না। বর্ত্তমান কালে, ইংরেজী শিক্ষা ও বৈদেশিক নানাবিধ আবিষ্কার ও শিক্ষার দ্বারা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতে না পারিলে, ভারতবর্ষ অপরাপর জাতির নিকটে হীন হইয়াই থাকিবে, আমি ইহাই বিশ্বাস করি। সুতরাং, নেতৃবর্গের যে পাশ্চাত্য শিক্ষার কোন দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য, তাহা মনে করিও না। আমি সুধু এই কথা বলিতে চাই যে, পাশ্চাত্য প্রভাবে যাঁহারা

প্রভাবান্বিত, তাহাদের দ্বারা, সংস্কৃত বা বাঙ্গলা কখনই, প্রধান শিক্ষিতব্য বস্তুরূপে গৃহীত হইবে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যায় না। যদি তাহা না-ই হইল, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীকে "জাতীয়শিক্ষা" বলিতে আপত্তি কিসের? বরং আমি ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, দর্শনশাস্ত্র—প্রভৃতিকে যে প্রকার উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে, বাঙ্গলা ভাষাকে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় যে প্রকার স্থান দিতে সমর্থ হইয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোথাও, সংস্কৃত ও বাঙ্গলার এতাদৃশ সম্মান রক্ষিত হয় নাই! তোমরা সার্ আশুতোষকে পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে! কিন্তু আমরা ত মনে করি যে, সার্ আশুতোষের মত স্বজাতিনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত পুরুষ না থাকিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলার স্থান এবং বিশেষতঃ সর্ব্বোচ্চ এম্—এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের সাতটী পূর্ণাঙ্গবিভাগ আমরা আজ্ দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ! বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সংস্কৃতের এ প্রকার সম্মান না করিলে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তকণ্ঠে স্বজাতি-দ্রোহী বলিয়া অকাতরে নির্দ্দেশ করিতাম। পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এখন ও যে এত গৌরব, এ কিসের জন্য,—ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? বর্ত্তমান অবস্থার জন্য, ভারতের এ গৌরব নহে! ত্রিশ-কোটী লোক, অসংখ্য স্বাধীন নৃপতি বৃন্দ সহ, আজ যে মুষ্টিমেয় বিদেশী ইংরেজের পায়ের তলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ইহার, জন্য বিদেশে ভারতের গৌরব নহে! ভারতের গৌরব ও সম্মান—উহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য। এই সাহিত্যে যে সকল অমূল্য সম্পদ নিহিত রহিয়াছে, তাহারই জন্য। তাই, স্বদেশ-প্রাণ, সার্ আশুতোষের চেষ্টায়, সেই সংস্কৃত সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সম্মানের আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু তোমরা শুনিলে বিস্মিত হইবে যে, এই সংস্কৃতের ঈদৃশ সম্মান করার জন্যও সার্ আশুতোষকে, তাঁহার দেশবাসীর হস্তে কম লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই! কত সুশিক্ষিত দেশবাসী বলিয়াছিলেন যে, আটটী দশটী ছাত্রের জন্য সংস্কৃতে সাতটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং পঙ্গপালের মত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে!!! বাঙ্গলাকে এম্-এ পরীক্ষায় স্থান দিতেও অনেক স্বদেশবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাঁর বিরোধী হইয়াছিলেন! এ সকল কথা তোমরা কি জান? এই ভয়েই বলিতেছিলাম যে, পাশ্চাত্য প্রভা-বান্বিত নেতার পরিচালনায় "জাতীয় শিক্ষায়" "জাতীয় বিদ্যার" প্রকৃত স্থানলাভ বড়ই আশঙ্কাপ্রদ!!! তাহা হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে, তোমাদিগকে আর একটী বিষয় বলিব। গভর্ণমেণ্টকে যতদিন দেশের লোকে কর প্রদান করিবে, ততদিন দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই বাধ্য। এ অবস্থায়, আমরা শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য না লইব কেন? না লওয়াই বরং দোষের হইবে। যদি দেশে কোনদিন এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, গভর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইতেছে না; কেবল সেই অবস্থাতেই, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে সে অবস্থা আসিয়াছে কি? দূর-ভবিষ্যতেও, সে অবস্থা আসিবে বলিয়া ত কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমরা কর-দাতাও থাকিব; অথচ গভর্ণমেণ্ট আমাদের শিক্ষার জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবেন না;—এ ব্যবস্থা কিছুতেই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

আমি পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশবাসীর অর্থ সাহায্য প্রধানতঃ বিরচিত হইয়াছে এবং দেশ-বাসী কত বদান্য পুণ্যব্রত পুরুষের অর্থদ্বারা এখনও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া, আবার নূতন টাকা দ্বারা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়ার অর্থই এই যে, দেশবাসী প্রদত্ত অর্থ জলে ফেলিয়া দেওয়া! এই দরিদ্র দেশে এ প্রকারে ত অর্থ নষ্ট করা চলে না! বরং যে বিশ্ববিদ্যালয়টী পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহাকে রক্ষা করিয়া, তাহারই সংস্কার-সাধনার্থ, চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্য প্রণালী, এই উভয়েরই পরিবর্ত্তনই যদি আশুক বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে তাহারই জন্য কেন তোমরা সমবেত চেষ্টা কর না? সার্ আশুতোষ অতীব ছাত্র-বৎসল। অন্যান্য পরিচালকবর্গও তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের সকলের সমবেত চেষ্টা, ইহাঁদের দ্বারা কখনই প্রত্যাখ্যাত হইবে না। বৃথা আন্দোলনে, সময়ও প্রাণ শক্তির নিষ্ফল ব্যয় না করিয়া, দেশের এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টীকেই বরং 'সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ' করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলে যে মহোপকার সাধিত হইবে,—ইহাই প্রকৃত দেশের সেবা।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ঘণ্টাধ্বনি।

Carillons de Flanders.

[বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে জর্ম্মণরা Flanders আক্রমণ করা উপলক্ষে Dominique Bonnaud এই কবিতাটি লেখেন]

আকাশখানি নীলে নীল
ছুটির দিনে আজ;
ছড়ান এই মাঠের কেমন
শান্তিভরা সাজ!
ছুটির বার্ত্তা লয়ে সুখে
ঘণ্টা বাজা জোরে!
ঘণ্টা বাজা! ঘণ্টা বাজা!
বাজারে প্রাণভরে!
হঠাৎ একি উঠ্‌ল দেখি
এমন আর্ত্তস্বর!

চল্‌রে ছুটে ত্বরিত-গতি
বাঁচাতে নিজ ঘর!
গৃধিনী শ্যেন এসেছে ওই
বিপদ হানিবারে।
পাগল-পারা ঘণ্টা বাজা
অস্ত্র আনিবারে।
তীক্ষ্ণ-ধার অরির ছোরা
(ক্ষণিক তার জয়)
আঘাতে তারি দেশের ছেলে
ভূমিতে পড়ে রয়।

নিঠুর অরি বেঁধেছে সবে
শুধু গায়ের জোরে।
ঘণ্টা বাজা! ঘণ্টা বাজা।
বাজা বিষাদ ভরে।
ওই যে দূরে কালোর কোলে
আলোর রেখা,—একি
পলায় অরি! প্রতিশোধের
দিবস এল দেখি!
গর্ব্বভরে আকাশে তোল
জয়ধ্বনি ওরে!
স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজা,
ঘণ্টা বাজা জোরে।

শ্রীসুনীতি দেবী

পাটের কথা।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।

চাকুরীর নাগপাশ কাটাইয়া, দেশ সেবার আশায়, পৈত্রিক ভদ্রাসনে বাস করিতে গেলে গ্রামের লোকেরা সমাদরেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে, যে সময়ে যমরাজের ঘাট-দুয়ার খোলা থাকে, কার্ত্তিক মাসের সেই সময়ে, কলিকাতার কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার মমতা ছাড়িয়া পাট-পচান-কলুষিত জলের ভয় না করিয়া, পল্লীবাসে আসিবার মতলব অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সন্দেহ করিতেছিলেন, পাছে বা সংস্পর্শ দোষ (untouchability) উঠাইয়া একাকারের প্রশ্রয় দেই। হিন্দু এবং মুসলমান, কেবল দেনার উপর নির্ভর করিয়া, যাহারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহারা সাব্যস্ত করিল যে, "বাহাদুরীর" পর "মহাজন" হইবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। বিনা মতলবে, ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে যে কেহ পল্লীবাসে আসিতে পারে, বৃদ্ধের কথা দূরে থাকুক, যুবকগণও ইহা বিশ্বাস করিতে রাজি ছিল না। তাই অনেকেই "মহামহিম" সম্বোধনে আপ্যায়িত করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ "রেহানের" প্রলোভন ও দেখাইতে লাগিলেন, ইহাতে দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার সুযোগ ঘটিল। একদিন একজন বিশিষ্ট পরিবারের লোকের সহিত কথা হইতেছিল। "দেনা করিয়া পৈত্রিক ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা করা অন্যায়" এই কথা বলায়, উত্তর হইল, আমাদের অবস্থা খারাপ কিসে? কিছু দেনা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? ইংরাজ-রাজ মান বজায় রাখিতে গিয়া দেনা করিয়া এত বড় একটা যুদ্ধ চালাইতে পারিলেন, আর আমরা সামান্য দেনায় ভয়ে পূজা আর্চ্চা বন্ধ করিয়া দিয়া দেশের লোকের নিকট হেয় হইয়া থাকিব? মান বড়, না টাকা বড়? পাটের দাম পড়িয়া না গেলে, কয়েক বিঘা আমার জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই দেনা শোধ যাইত। দু বছর আগে জমি বন্দোবস্ত করিয়া কেমন লাভ করিয়াছি, সে খবর কি রাখেন?"

মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মাতব্বর গোছের কয়েক জন লোক একদিন প্রস্তাব করিলেন যে দেশ ধৌত হইয়া যাওয়ায়, এবং পাটের দাম পড়িয়া

যাওয়ায়, দুই বৎসর পূর্ব্বে যে জমির দাম বিঘা প্রতি ১০০।১৫০৲ টাকা উঠিয়াছিল, সেই সকল জমি এখন ৪০।৫০৲ টাকায় পাওয়া যাইতেছে। এই সময়ে কয়েক হাজার টাকা কর্জ্জ দিলে তাহারা গরিব প্রতিবেশীগণের জমাজমি সস্তায় কিনিতে বা "রেহানে" আবদ্ধ রাখিতে পারে। শতকরা বার্ষিক ১৫৲ বা ১৮৲ টাকা সুদে কর্জ্জ করিয়া ৩৬৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা সুদে দাদন করার মতলব বুঝা গেল। "তেজারতির মতলবে দেশে আসি নাই" বলায়, তাহারা বলিয়া উঠিল—"টাকা কর্জ্জ পাইব এই আশায় এতদিন ঘোরাঘুরি করিতেছিলাম। সমবায়ের (co-operation) মাহাত্ম্য-বর্ণন শুনিতে আসি নাই এবং গ্রামে কো-অপরাটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়ালি মারিতেও ইচ্ছুক নহি।" মুসলমান এবং নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মাতব্বরদের নিকট ডেনমার্কের লোকেরা গৃহ-পালিত পশু পক্ষীর উন্নতিতে কি প্রকার লাভবান হইতেছে, রকডেল পদ্ধতি (Rochdale systam) অনুসারে সমবায়-সমিতি-গঠন দ্বারা কি প্রকারে উৎপন্ন দ্রব্য সুবিধামত বিক্রয় করিবার এবং নিজেদের ব্যবহারের জিনিষ পত্র সুলভে খরিদ করিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে, বুঝাইবার চেষ্টা করায়, উত্তর পাওয়া গেল—"টাকা কর্জ্জ দিয়া মহাজনের হাত হইতে যদি রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে এ সকল বৃথা বক্তৃতায় লাভ কি?" জাতীয়-মহাসমিতির নির্দ্দেশানুসারে যাঁহারা পল্লী-জীবন সুব্যবস্থিত করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথা বলিতেছি। তাঁহারা যেন ঠিক করিয়া যান যে (১) কৃষকের ঋণ শোধের কি পরামর্শ দিবেন; (২) অনাচারণীয়দের সহিত কি ভাবে চলিবেন; এবং, (৩) কোন প্রকার ব্যাভিচারের কথা কানে আসিলে (বিশেষতঃ যে সমস্ত বিষয় পুলিশের সাহায্য ভিন্ন নিবারণ অসম্ভব) কি করিবেন?

কৃষকদের সহিত নানাপ্রকার আলোচনা এবং তর্ক বিতর্কের ফলে বুঝা গিয়াছে, যে পাটের মণ ১০।১২৲ টাকায় বিক্রয় হইবার আগে, তাহাদের দেনার পরিমাণ তেমন বেশী ছিল না। সাধারণতঃ, বিবাহের সময়েই কেবল দেনা হইত। হিন্দু কৃষক সহজে ৪০।৫০ টাকার বেশী কর্জ্জ পাইত না, মুসলমানেরা বেশী পরিশ্রমী বলিয়া ২০।৩০৲ টাকা বেশী চাহিলে পাইত। আমাদের যৌবনকালের একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া সেই সময়কার অবস্থা বুঝাইতেছি। আমাদের গ্রামে ডা * * নামক একটি নমঃশূদ্র যুবক বিবাহ-লগ্নের মাস আসিলেই তাহার অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করিত—"কাকা এ মাসে আমাদের কি টাকা কর্জ্জ হইবে না?" চেহারা কুৎসিত বলিয়া ইহার সম্বন্ধ আসিত না, কিন্তু সে মনে করিত যে টাকা কর্জ্জ করার ভয়ে কাকা তাহার বিবাহ দিতেছে না। পাটের দর বাড়িবার আগে সাধারণ মুসলমান কৃষক "ভালমানসের মেয়ে" বিবাহ করিবার কল্পনাও মনে স্থান দিত না। পাট বিক্রয় করিয়া টাকার স্বচ্ছলতা আরম্ভ হইলে, অনেকের "ভাল মানুসের মেয়ে" ঘরে আনিবার সখ চাপিল, সুতরাং টিনের ঘর করা এবং বাঁদি রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে দাড়াইল। 'ভালমানুসের মেয়ের" ঢেঁকির উপর পা দিতে নাই; কাজেই, দায়ে পড়িয়া দুরবস্থার সময়, স্বামীকে ধান ভানিয়া স্ত্রী প্রতিপালন করিতে হইতেছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অনেক কৃষককে তাড়াতাড়ি

বাড়ী ফিরিতে হয়, কেন না ধান পাড়াইয়া চাল করিয়া দিলে তবে ত "ভালমানসের মেয়ে" ভাত রাঁধিয়া দিবে! পাটের আবাদে টাকা ঘরে আসা দূরের কথা, চাষের খরচাও পোষাইতেছে না; অথচ "ভালমানসের মেয়ের" চাল দিতে অনেক বেচারী দেনায় ডুবিয়া ছটফট করিতেছে। পাটে ২।৪ বৎসর আশাতীত লাভ না পাইলে, এই ভাবে বংশ-মর্য্যাদা বাড়ানর সখ হইত না। কি পাপে কৃষক-কুল দেনায় ডুবিল, ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, যে সমস্ত তথ্য জানিতে পারিয়াছি, তাহার একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। ... ... মণ্ডল আজকাল গ্রামের একজন মাতব্বর লোক। বাল্যকালে, গ্রামের একজন "বড়লোকের" (?) বাড়ীতে চাকুরী আরম্ভ করে। শেষ বয়সে, মাসিক ২৲ টাকার বেশী মাহিয়ানা পায় নাই। ঠাট বজায় রাখিতে গিয়া "বড়লোক" দেনার দায়ে ক্রমে গরীব হইতে আরম্ভ করিলেন, আর ... ... মণ্ডল বুদ্ধির জোরে এবং কল-কৌশলে জমিজোতের মালিক হইয়া বসিল। ইহার পাঁচপুত্র এবং এককন্যা। পুত্রগণ ক্ষেতের কাজে লাগিল এবং বিধবা কন্যা বাপ ভাইয়ের সংসার যাহাতে সুসারে চলে, তাহার জন্য প্রাণপণে খাটিতে লাগিল। মণ্ডলের সংসার এই ভাবে কয়েক বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতেছিল। এক বৎসর পাট বেচিয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মণ্ডল ৮০০ টাকা পাইল। এত টাকা আগে কখনও তাহার হাতে আসে নাই। তাহার পর সম্বৎসর-খরচের ধান ক্ষেতে জন্মিল। আনন্দে অধীর হইয়া মণ্ডল কার্ত্তিক পূজায় ২০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া বসিল। হাল, লাঙ্গল, ঘর দুয়ার, ভাল করিল, এবং অনেক চাকুরে বাবুদের অপেক্ষা তাহার অবস্থা যে ভাল এই কথা সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার অবস্থায় কে ছোট হইয়া থাকিতে চায়? স্বজাতীয় লোকদের 'বামুন-কায়েতের' কাজ করিতে বাধা দিতে লাগিল এবং নৌকা চালাইয়া বা ঐ প্রকার কোন নীচ (?) কাজ করিয়া কেহ দু পয়সা রোজগার করিলে তাহার বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা এবং কার্ত্তিক পূজার পুরোহিত বন্ধের আন্দোলনে অন্যতম নেতা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল,ধনে জনে সে যখন বামুন-পণ্ডিত মনিব বা বাবুদের অনেকের অপেক্ষা কম নহে, তখন পাটের জমি বাড়াইয়া দশজনের, একজন হইবে না কেন? টাকা কর্জ্জ করিয়া চারি বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইল। নজর দিতে হইল ৭০০৲ টাকা এবং বার্ষিক খাজনা ঠিক হইল ৭৲ টাকা। ৩।৪ বৎসর আগে এই জমির নজর ছিল ৭০৲ এবং বার্ষিক খাজানা জোর ৩৲ টাকা। ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ করিল বার্ষিক শতকরা ৩০ টাকা সুদে, আর ২০০৲ কর্জ্জ করিল বার্ষিক শতকরা ২৪ টাকা সুদে। সুতরাং, কেবল সুদেই ২০৫৲ টাকা খরচ বাড়িল। মণ্ডল বুঝিল না জমি বাড়াইয়া যাহাদের অপেক্ষা বড় হইতে চাহিতেছিল, প্রকারান্তরে তাহাদিগকেই লাভবান করিতে চলিল। নজরের টাকা পাইল "বাবুরা", আর সুদ পাইতে চলিল বামুন-পণ্ডিতের বংশধরেরা। ১৯০৯ সালে ৭০০৲ টাকা কর্জ্জ হয়। এ কয়েক বৎসরে সুদে আসলে প্রায় ১০০০ টাকা দিয়াছে, কিন্তু এখনও মণ্ডল ১৫০০৲ টাকার দায়ীক! এককালীন এই দেনা শোধের বন্দোবস্ত করিয়া না দিতে পারিলে মণ্ডল যে আমার কাছে সমবায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনিতে

চাহিবে না, ইহা স্বাভাবিক। মণ্ডল যদিও ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, পাটের চাষে লাভ হওয়ায় সম্ভাবনা নাই, তবু বৎসর বৎসর পাট বুনিতে ছাড়িতেছে না। আশা—যদি দাম বাড়ে! মূর্খের আশাই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি বিঘায় গড়ে, বৎসর ৫/০ মনের বেশী পাট জন্মে নাই। প্রতি বিঘার বাবদ সুদ, খাজনা এবং হালিক খরচায় বৎসর বৎসর ন্যূনকল্পে ৫৪৲ টাকা পড়িয়াছে। প্রতি মণ ১২৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে পারিলে কোন মতে এই টাকা উঠিত, কিন্তু একয়েক বৎসর গড়ে ৪৲ টাকা মণের বেশী দাম পাওয়া যায় নাই, সুতরাং মণ্ডলের অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, হইাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? পাটের চাষে বেশী জমি রাখিবার পর বৎসর যে ধান পাইয়াছে তাহাতে খোরাকী খরচ কুলায় নাই। কেন না যে ধান পাইয়াছে, তাহার কতক অংশ বিক্রয় করিয়া, মহাজনের তাড়না হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছে। কেবল এই পরিবার যে এই প্রকার বিপন্ন হইয়াছে এমন নহে, বহু কৃষকের এই দশা ঘটিয়াছে। তবু কিন্তু ইহাদের চৈতন্য হইতেছে না। এক কৃষক-পত্নী, আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়া বলিয়াছিল যে, "পূর্ব্বে কেহ তাহাদের ২০৲ টাকা কর্জ্জ দিয়াও বিশ্বাস পাইত না, এখন পাটের আবাদের ফলে, তাহারা ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেনা করিতে পারিয়াছে। পাটের চাষের মত লাভের আর কিছু নাই। পাট বুনন বন্ধ করিলে কেহ ত দেনা দিবেই না, বরং যে ২০০০৲ টাকা দেনা আছে, তাহা আদায়ের জন্য মহাজনেরা বেগ দিতে আরম্ভ করিবে। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেনই, পাটের দাম বাড়িবেই। যদিই দাম না বাড়ে তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? মহাজন নালিশ করিলে প্রথমে কিস্তিবন্দী হইবে, তাহার পর নয় জমাজমি বিক্রয় করিয়া লইবে। তাহারা নিজেরা ত জমি চাষ করিতে পারিবে না। কাজেই বর্গা বন্দোবস্ত দিতে বাধ্য হইবে। বর্গায় চাষ করিলেও অর্দ্ধেক ফসল ঘরে আসিবে। দেনা করায় তাহাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, বরং দশ বৎসর পাটের কল্যাণে টীনের ঘরে বাস করিতে পারিয়াছে, মোটের উপর খাইয়া পরিয়া সুখেই কাটাইয়াছে। দর পড়িয়া যাওয়ায় এখন দেনা পাইতেছে না এই যা মুস্কিল।" "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" এই বাক্যের প্রমাণ পাইয়া আমাদের বুদ্ধির গোড়ায় জল আসিল। দেনায় ডুবিয়া চাষারা নানা ফন্দি খাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ আদালতে কিস্তিবন্দীর ফাঁদে মহাজনকে আটকাইয়া ফেলিতেছে, আবার কেহ কেহ সম্পত্তি বেনামা করিয়া আদালতের সাহায্যে "দেউলিয়া" সাজিতেছে।

ফরিদপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার জ্যাক সাহেবের পুস্তকে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে ১৯০৬-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধানের চাষে খরচ খরচা বাদে প্রতি একার জমিতে লাভ হইয়াছে গড়ে ৩৭৷৷০ টাকা, আর প্রতি একার জমিতে পাটের আবাদে আয় হইয়াছে ৭৫৲ টাকা। সুতরাং বৎসর বৎসর পাটের আবাদ বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঐ কয়েক বৎসরে ফরিদপুর জিলায় ১,০৭৪,০০০ জমিতে ধান বুনান হইতেছিল আর কেবল ১৬০,০০০ একর জমিতে পাট বুনন চলিতেছিল। বেশী লাভের আশায় যাহারা দেনা করিয়া জঙ্গল উঠাইয়া পাটের জমি বাড়াইয়াছিল, তাহারা

এখন দেনার দায়ে অস্থির আছে। কি ভাবে ফরিদপুর জিলায় পাটের চাষ বাড়িয়াছে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি—

বৎসর	একর
১৯০৬—১০	১৬০,০০০
১৯১৯	২৫৮,৪০০
১৯২০	২১৯,১০০

লোকসান হইতে আরম্ভ হওয়ায়, গত বৎসর তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৯,৩০০ একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর আরও কম হইবে। মোটা-বুঝ কৃষকেরও আছে। তাহারা আশায় ভুলিয়া আর পাটের চাষ বাড়াইবে না। প্রতি বৎসর মার্চমাসে পাটের বাজার একটু চড়া হয়, কারণ ঐ মাসের মধ্যে নূতন ফসল প্রায় সমস্তই বাজারে আসিয়া পড়ে এবং যাহাতে কৃষকেরা পাটের চাষ কম না করে, তাহার জন্য দাম চড়াইয়া, তাহাদের প্রলোভন দেখাইতে হয়। কলওয়ালাদের এই চালাকি, যাঁহারা পাটের কারবারে আছেন, তাঁহারাই জানেন। এ বৎসরও দাম চড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, তবে আশা করা যায়, কৃষকেরা সহজে আর ফাঁদে পড়িবে না।

শিক্ষার অভাবে এবং ভদ্রলোকের কথার উপর আস্থাহীন হওয়ার ফলে কৃষককুল কি প্রকারে বিপন্ন হইতেছে তাহারও দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯১৮ সালে হৈমন্তিক ধান্যের ফসল মোটের উপর ভালই ছিল। অনেক কৃষকই সম্বৎসর চলিবার উপযুক্ত ধান পাইয়াছিল, কেহ কেহ বেশীও পাইয়াছিল। গ্রাম গ্রাম ঘুরিয়া সকলকে বুঝাইয়া বলা হইল যে, কেহ যেন সহজে ধান বিক্রয় না করে —অন্ততঃ আশু ধান্যের সময় পর্য্যন্ত সংসার খরচের জন্য যে পরিমাণে দরকার তাহা যেন মজুত রাখে। আমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত মহাশয় পরিশ্রম করিয়া, এমন কি, হাটে হাটে ঢেঁড়া দিয়া, ধান বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু, গ্রাম্য-নিরক্ষর মাতব্বরগণ সাব্যস্ত করিলেন যে, ভদ্রলোকেরা সস্তায় চাউল কিনিবার মতলবে, এ সমস্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিতেছে, কেহ যেন স্বার্থপর বাবুদের এ সমস্ত কথায় না ভুলে। ফলে, অনেকেই মণকরা ১৷৷০। ১৸০ টাকা হিসাবে ধান বিক্রয় করিয়া ফেলিল। আষাঢ়মাসে যখন ৩৷৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতে লাগিল এবং কিনিয়া খাওয়া আরম্ভ হইল, তখন মহাজনগণ দাঁও বুঝিয়া ফি টাকায়, মাসিক এক আনা দেড় আনা সুদে কর্জ্জ দাদন আরম্ভ করিলেন। যাহার "সাইকাড়ি" (credit) বেশী নাই, সে আষাঢ় মাসে ১৫৲ টাকা লইয়া, কার্ত্তিক মাসে ২৫৲ টাকা দিবার কড়ারে খত লিখিয়া দিল; সর্ত্ত রহিল যে কার্ত্তিক মাসে দেনা শোধ না করিতে পারিলে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফি টাকায় ৴১০ পয়সা হিসাবে সুদ চলিবে। দেনার দায়ে খামার জমি মহাজনকে লিখিয়া দিয়া বহু কৃষক বর্গা চষিয়া খাইতেছে। অনেকের কেবলমাত্র একটি বলদ সম্বল রহিয়া গিয়াছে। অন্যের সহিত ভাগে যতটা পারে জমি চাষ করিতেছে। ফলে, ঘরে ঘরে অনাটন বাড়িয়াই যাইতেছে, অন্ন বস্ত্র সমস্যা বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাটের আবাদ বাড়িতে থাকায় পল্লী স্বাস্থ্যের কি প্রকার অবনতি হইতেছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনার দরকার। মাঘমাসে বৃষ্টি হওয়ার পর পাটের জমিতে চাষ দেওয়া আরম্ভ হয়। পাঁচ ছয় বার লাঙ্গল দিবার পর, জমি বুননের উপযুক্ত হয়। ফাল্গুন বা

চৈত্র মাসে বীজ বপন করা হয়। নীচু জমিতে চৈত্রের প্রথমেই বুনন শেষ করিতে হয়, নতুবা বর্ষার জলে চারাগুলি ডুবিয়া যাওয়ায় আশঙ্কা। চারা ছয় ইঞ্চি আন্দাজ বাড়িলেই "নাঙ্গলে" (Rake) দিতে হয়। বীজ হইতে চারা গজাইতে ৩৷৪ দিন লাগে, কিন্তু 'জাগ দিবার' উপযুক্ত গাছ প্রায় চারি মাসের কমে হয় না। আষাঢ় মাস পড়িতে পড়িতেই নীচু জমির পাট 'জাগ' দেওয়া আরম্ভ হয়, কিন্তু আশ্বিন মাসের মধ্যেই 'জাগ' শেষ হইয়া যায়। পাটের গাছ কাটিয়া বাণ্ডিল বান্ধিতে ২৷৩ দিন লাগে; তাহার পরে ১০৷১৫ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকেই 'জাগ' দেওয়া বলে। ঘোলা জলে পাট-পচান সুবিধা নহে, কাজেই বিল, বাঁওড় এবং খালখন্দ, যেখানে বর্ষার জল আইসে, সেখানেই 'জাগ' দেওয়া আরম্ভ হয়। জলে দাঁড়াইয়া গাছ হইতে আঁস ছাড়াইতে, অনেক কৃষকই জ্বরে পড়িয়া যায়। মাথার উপর ভাদুরে রদ্দুর, তাহার পর দিনের পর দিন, বুক জলে দাঁড়াইয়া পাটধোয়া, অনেকের সহ্য হয় না। পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পাট পচান জল গণ্ডুষ করিয়া পান করা ভিন্ন উপায় নাই। ফলে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অনেকেই জ্বরে পড়ে, আর কুইনাইন খায়! 'জাগ' দেওয়া পাট ধুঁইয়া আঁস ছাড়াইয়া উঠাইতে না পারিলে সমূহ ক্ষতি, তাই নিজে জ্বরে পড়িলে, চড়াদরে জন মজুর রাখিয়া পাটধোয়া এবং শুখান শেষ করিবার দরকার পড়ে। পেট ভরিয়া তিন বেলা জামাই আদরে খাইতে দিলে এবং দৈনিক ৷৷০। ৷৷৵০ আনা হিসাবে মজুরি দিলে, বতরের সময় পাটের কাজে লোক পাওয়া যায়। এদিকে পাট-পচান জলে পল্লীর পানীয় জল নষ্ট করিয়া দেয়, পাট-পচা জলের দুর্গন্ধে গ্রামে তিষ্ঠান ভার হয়। যাহারা ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঢাকা ফরিদপুর কুমিল্লা প্রভৃতি জিলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা জানেন। অনেক সময়ে নদী ছাড়িয়া বজরা খাল বা বিলে পড়িলে পচা-জলের গন্ধে নিদ্রিতাবস্থায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একবার ঢাকা জিলার তারপাশা ষ্টেশনের ৫।৬ মাইল দূরে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিবার প্রস্তাব করিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। পূজার ছুটিতে অনেকেই বাড়ীতে ছিলেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। সকলে মিলিয়া কমিটি করিয়া, ব্যামো পীড়ার ভয় দেখাইয়া, তাঁহাদের গ্রামে যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। আসল কারণ, পাটপচা-জলের গন্ধে তাঁহাদের বাড়ীতে তিষ্ঠান কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, পানীয় জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। অনেক দিন পরে, ঐ গ্রামের এক জনের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন যে, আমাকে তাঁহাদের গ্রামে যাইতে নিষেধ করায় তাহারা এত দূর অপ্রতিভ হইয়াছিলেন যে, একটা পুকুর কাটার বন্দোবস্ত না করিয়া পারেন নাই। "অনেক মামলা মোকদ্দমার পরে পুকুর কাটা হইয়া পানীয় জলের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আপনার জন্যই আমাদের পুকুর হইয়াছে" এই কথা বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে গ্রামে ধনীলোকের অভাব নাই, সেই গ্রামের পানীয় জলের যদি এমন দশা হয়, তাহা হইলে কৃষক-বহুল গণ্ড গ্রামের দশা কি, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পাট-পচা জলে মাছ বাঁচিতে পারে না, তাই পাড়াগাঁয়ে মাছের এত অভাব হইতেছে। অনেক সময় মহকুমার হাকিম

পাট পচাইয়া জলাশয় নষ্ট করিবার নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করেন। গতবৎসর বর্ষা বেশী হয় নাই, তাহার পর নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হওয়ায় অনেক কৃষককে পাটের বোঝা মাথায় করিয়া এক মাইল দূরে গিয়াও "জাগের" বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। ইহা আমার স্বচক্ষে দেখা। পাটের আমদানীতে কলিকাতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এই অজুহাতে ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭০০,০০০৲ টাকা এবং ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮০০,০০০ টাকার উপর পাটকর (Jute Cess) আদায় করিয়া, কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে (Calcutta Improvement Trust) কে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে পাট "জাগের" সুবন্দোবস্ত করিয়া কৃষক কুলের এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদের ম্যালেরিয়া এবং কলেরার গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার ভাবনা কাহারও মনে আসিতেছে না। হাকিমরা হুকুম দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ধমকাইয়া, যেখানে সেখানে পাট "জাগ" দেওয়া বারণ করিতেছেন। কৃগ্নদেহে, কৃষক বসিয়া ভাবিতেছে, পাট বুনন করিয়া, সে যেন কতই পাপ করিয়াছে! পূর্ব্বে, পাট বেচিয়া টিনের ঘর করিয়াছিল, গত দুই বৎসরে তাহা বিক্রয় করিয়াছে এবং মাড়োয়ারী মাহাজনেরা ইহাতে বেশ দু পয়সা লাভ করিয়াছে। বেহার অঞ্চলের বলদ খরিদ করিতে যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল তাহার সুদ বাড়িতেছে, অথচ গোহালের সুবন্দোবস্তের অভাবে বলদ মরিয়া গিয়াছে। পশ্চিমে-গরু যে, জল কাদায় দাঁড়াইয়া বর্ষার চারি মাস কাটাইতে পারে না, গৃহস্থের এ জ্ঞান না থাকায় গরুর মড়ক বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মহাজনের দেনা ও বাড়িতেছে। ধানের চাষ কমিয়া যাওয়ায়, গো-খাদ্য খড়ের ও অভাব হইতেছে এবং গোবংশ ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহার পর, আগে যে সমস্ত "হালট" ছিল, তাহাতে পাটের চাষ হওয়ায়, গোচারণ ভূমির অভাবে গৃহস্থের পক্ষে গরু-রাখা বিষম কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাদিয়া চলিলেই দেখা যায়, ঘাস নাই অথচ রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে গরু বাঁধা রহিয়াছে। যাঁহারা সাইকেলে বা ঘোড়ায় যাতায়াত করেন, ইহাতে তাহাদের অনেক সময়ে মুস্কিলে পড়িতে হয়, চলিতে চলিতে মনে হয়, গরু বান্ধিবার এবং পুলের রেলিং এর উপর পাট শুকাইবার এবং গ্রামের লোকদের মলমূত্র ত্যাগের সুবিধার জন্যই যেন রাস্তা করা হইয়াছে। মাঠের মধ্য দিয়া উঁচু উঁচু রাস্তা হওয়ায়, জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া পাটপচা জল বাহির হইবার বাধা জন্মাইতেছে। ফলে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ বোর্ডের মেম্বাররা রাস্তা মঞ্জুর করিয়া দেশের কল্যাণ করিলেন মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। স্বাস্থ্যই সাধারণ লোকের প্রধান সম্বল। স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া তাহাদের পক্ষে মূলধন (capital) নষ্টের সামিল মনে করিতে হইবে।

পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে যে প্রকার পাট জন্মে অন্য কোন দেশে সে প্রকার জন্মে না। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গলা দেশে পাট জন্মিতেছে। পূর্ব্বে গৃহস্থরা নিজেদের দরকার মত ধানের জমির পার্শ্বে পার্শ্বে পাটের বীজ ছড়াইয়া যাইত। এই ভাবে যে পাট উৎপন্ন হইত, তাহাতে নিজেদের দড়ি দড়ার কাজ চলিয়া যাইত এবং বিক্রয় করিয়াও কিছু পাইত। হাতে সুতা কাটিয়া, গ্রাম্য লোকেরা

চট প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের লোকেরা পাটের সুতায় মোটা কাপড় (coarse cloth) প্রস্তুত সম্ভবপর মনে করে; কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগে মোটা কাপড় এবং চট বুননের ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ বৎসর ডাণ্ডী (Dundee) নগরে চটের কল স্থাপনের বন্দোবস্ত হয়, এবং গত ৬০।৭০ বৎসর ডাণ্ডীই পাটের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙ্গলা হইতে ৯ কোটি টাকার পাট বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ব্বে কেবল সাদা পাটই (Corchorus capsularis) বাঙ্গলায় জন্মিত। তাহার পর "তোষা" পাটের (Corchorus oliotrius) চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এই জাতীয় এবং সরকারী কৃষি-বিভাগের পরীক্ষিত (K. B. jute) বীজ-উৎপন্ন পাটেরই বাজারে আদর বেশী। যাহারা গত দুই বৎসর এই দুই প্রকারের বীজ ব্যবহার করিয়াছে, তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী দাম পাওয়ায়, বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্থ হয় নাই; কিন্তু সাদা পাটের চাষে কিছুই লাভ হয় নাই। গত বৎসর, বাঙ্গলা দেশে সাড়ে ৫২ লক্ষ গাইট, অর্থাৎ ২,৬২,০০,০০০৲ লক্ষ মণ পাট জন্মিয়াছে। এখনও গত বৎসরের সমস্ত পাট বাজারে আইসে নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন পাটের যে জের ছিল, তাহার সঙ্গে গত বৎসরের উৎপন্ন ফসল যোগ করিলে, প্রায় দেড় কোটি মণ উদ্বর্ত্ত দাঁড়াইবে। গত বৎসর বাঙ্গলা দেশে ২১,৬৯,২০২ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর যাহাতে অর্দ্ধেক জমিতে পাট বুনানী হয় তাহার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

পাটের চাষে যে কৃষকের দেনা বাড়িতেছে, ইহা দেখান গেল। আরও দেখান গেল, তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় পাটের চাষ যে আর বাড়িতে দেওয়া উচিত কি না, চিন্তা করা দরকার। ইউরোপ এবং আমেরিকায় পাটের আদর যথেষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং, যাহাতে কৃষককুল রক্ষা পায় এবং পাটের ব্যবসাও চলে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এ চেষ্টা করিবে কে? সরকার বাহাদুর ত রপ্তানি পাটের উপর শুল্ক (export-duty) বসাইয়া, বার্ষিক প্রায় আড়াই কোটি টাকা বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় আয় বাড়াইবার জন্য, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই "ডিউটি" বসে। তখন ধরা হইয়াছিল—

		গাঁইট
কাটিং (অর্থাৎ যে অংশ পাকা গাঁইট বান্ধিবার সময় কাটিয়া রাখা হয়)		(গড়ে ৫/মণ) প্রতি। ॥৶০
অন্যান্য প্রকারের		,, ২।০
চট	১০৲	টন বা ২২৪০ পাঃ প্রতি
হেসিয়ান	১৬৲	,,

তাহার পর বৎসর "ডিউটি" আরও বাড়ান হইয়াছে—

কাটিং	প্রতি গাঁইটে	১।০
অন্যান্য প্রকারের	,,	৪।০
চট	প্রতি টন	২০ টাকা
হেসিয়ান	,,	৩২ ,,

ইহা বাদে, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্ট, রপ্তানির উপর প্রতি গাইটে ৵০ আনা এবং হোসিয়ানের প্রত্যেক টনে ৸০ আনা হিসাবে টেক্স আদায় করেন।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইতেছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, রপ্তানির পাটের উপর টেক্স বসায় ক্রমে ক্রমে বিদেশে রপ্তানি কমিয়া যাইতেছে। গ্রেটব্রিটেনের পরেই, আমেরিকায় বেশী পাট রপ্তানি হইত। ১৯১৬-১৭ খ্রীঃ ঐ দেশে রপ্তানি হইয়াছিল ১২৩, ৭১৪ টন; আর ১৯১৮-১৯ খ্রীঃ রপ্তানি হইয়াছে

৬১,২২৯ টন অর্থাৎ ৬২, ৪৮৫ টন রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। এই দুই দেশে পাটের (raw jute) রপ্তানি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার কলওয়ালাদের লাভের মাত্রা কল্পনাতীত বাড়িয়া গিয়াছে। যে সেয়ারের দাম ছিল ১০০ টাকা, তাহার দাম হইয়াছে ১০০৷১১০০৲ টাকা।

কাঁচা পাটের রপ্তানির হিসাব।

	টন
১৯০৯-১০—	৭৩০,৪১৮
১৯১০-১১—	৬৩৬,৬২৩
১৯১১-১২—	৮১০,১৫৫
১৯১২-১৩—	৮৭৬,২৯৪
১৯১৩-১৪—	৭৬৮,৪৫১
১৯১৪-১৫—	৫০৫,০৯৫
১৯১৫-১৬—	৬০০,১১৩
১৯১৬-১৭—	৫৩৯,৭৬৮
১৯১৭-১৮—	২৭৪,১০০
১৯১৮-১৯—	৩৯৮,১৪৬

যে দেশে সস্তায় কাঁচামাল (raw materials) পাওয়া যায় এবং সেখানে কলে কাজ করিবার লোকের অভাব নাই, মজুরও সস্তা, সেখানে কলকারখানা খুলিতে পারিলে যে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইতে পারে, ইহা সহজের বুঝা যায়। চট প্রস্তুত করিতে বেশী শিল্প জ্ঞানের দরকার নাই। কাজেই এ দেশে কল কারখানা বাড়িলে ডাণ্ডীর কলওয়ালাদের যে অন্ন মারা যাইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। হেসীয়ান এবং গানিব্যাগের রপ্তানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, এ দেশের কলওয়ালাদের লাভের মাত্রা আশাতীত বাড়িয়া চলিয়াছে। ডাণ্ডীর কলওয়ালারা পূর্ব্বে যে লোকসানের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে চটের কল বসাতে তাহা ঘটিয়াছে। তাহার পর, কাঁচামালের (raw jute)এর উপর "ডিউটি" বসায়, ডাণ্ডীর কলওয়ালাদের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা শরীর পাত করিয়া পাট জন্মাইতেছে, তাহারাও মারা যাইতে বসিয়াছে। ডাণ্ডীর ব্যবসায়ীদের ক্ষতি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি—

বৎসর	গ্রেট বৃটনের ব্যবহারের জন্য পাট আমদানী হইয়াছে তাহার মূল্য পাউণ্ড	হেসিয়ান এবং গানি-ব্যাগ প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হইয়াছে তাহার মূল্য
১৯০০	৫৬৬,০০০	২,৪৩৪,০০০
১৯০৭	৭৮৪,০০০	৪,১০৯,০০০
১৯১০	৮২৯,০০০	২,২১৫,০০০

বাঙ্গালীরা যদি কলকারখানা স্থাপন করিয়া কাঁচা মাল (raw jute) চাষ এবং হেসীয়ানে পরিণত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে "ডিউটী" (export duty) বসানতে কৃষক-কুলের ক্ষতির কারণ হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে না। কাঁচা মাল এবং কলে প্রস্তুত জিনিষের উপর সমানভাবে "ডিউটী" বসানতে লাভবান হইয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং চট কলের মালিকগণ। অথচ যাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া, এমন কি দেহপাত করিয়া, পাট জন্মাইতেছে (jute growers), সেই কৃষককুল দিন দিন ধ্বংশের পথেই যাইতেছে। ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে, হয় কাঁচা মালের উপর (raw jute) "ডিউটী" উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নয় একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য (standard price) ধরিয়া দেওয়া উচিত। কাঁচা মালের উপর "ডিউটী" উঠিয়া গেলে, আমেরিকা জাপান এবং ইউরোপের সকল প্রদেশেই বেশী মাত্রায় পাট রপ্তানি হইবে; সুতরাং এ দেশের কলওয়ালারা বেশী দাম দিয়া পাট কিনিতে বাধ্য হইবে। গভর্ণমেণ্ট মূল্য নির্দ্দেশ

করিতে পারেনও না, করিবেনও না। তাহার পর, এখন যে পরিমান জমিতে পাট চাষ হয়, তাহার অর্দ্ধেক জমিতে পাট বুনানী হইলে, কৃষকগণের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না বাংলায় যে সমস্ত পাটের কল আছে তাহার তালিকা দিতেছি।

ম্যানেজিং এজেণ্ট অথবা সেক্রেটারী	কলের নাম	তাঁতের সংখ্যা	মূলধন
এণ্ডারসন রাইট এণ্ড কোং ...	খড়দহ	১,৩৭০	৩৬,০০,০০০
এনড্রু ইউল এণ্ড কোং লিমিটেড ...	এলাবিয়ন	৩৪০	১২,০০,০০০
	বেলভিডিয়ার	৪০০	১৪,০০,০০০
	বজবজ	৭৪২	১৮,০০,০০০
	ক্যালিডনিয়ান	৩৫০	৯,০০,০০০
	ডেল্‌টা	৫৭০	১৪,০০,০০০
	লোথিয়ান	.....	১০,০০,০০০
	ন্যাসানাল	৬১১	৩৫,০০,০০০
	নিউ সেণ্ট্রেল	৫৭৯	১০,৫০,০০০
	ওরিয়েণ্ট	.....	২২,৪৬,৭৫০
ব্যারি এণ্ড কোং ...	গৌরীপুর	১,২৫৫	১২,০০,০০০
বেল ডানলপ এণ্ড কোং ...	এলেকজেণ্ড্রা	৩৯৬	৬,০০,০০০
	এলাইয়েন্স	১,০০২	১৫,০০,০০০
	ক্রেগ	.....	৩০,০০,০০০
	ওয়েভারলী	.....	১৫,০৫,১৭০
বার্ড কোম্পানী ...	অকল্যাণ্ড	৪৬০	২০,০০,০০০
	ক্লাইভ	৮৬৪	১৬,০০,০০০
	ড্যালহাউসী	৭০৪	১৫,০০,০০০
	ল্যান্সডাউন	৮৭০	১৭,০০,০০০
	লরেন্স	৭০৫	১০,০০,০০০
	নর্থব্রুক	৫৪৪	৮,০০,০০০
	ষ্ট্যানডার্ড	৬৪০	১৪,০০,০০০
	ইউনিয়ন	১,১৫১	১২,০০,০০০
বিরলা ব্রাদার্স লিমিটেড ...	বিরলা	.....	২৫,০০,০০০
বি, এন, এলিয়াস্ ...	বেনজামিন	.....	৩৪,৯৯,৯৫০
ডানক্লান ব্রাদার্স এণ্ড কোং ..	এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান	২,০০০	৪৯,২০,৭০০
এফ, ডাবলু হিলজারস্ এণ্ড কোং	কিনিসন	১,২১১	১৫,০০,০০০
	নৈহাটি	৪৩০	১০,০০,০০০
জর্জ হেণ্ডার্সন ...	বালী	৬৪১	২০,০০,০০০
	বরাহনগর	১৭৪১	২৭৫,০০০ পাঃ

ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা সেক্রেটারী	কলের নাম	তাঁতের সংখ্যা	মূলধন
জর্জ হেণ্ডার্সন	সেনচুরী	.....	৬৩,০০,০০০
গ্লিলভার্স আরবুথনাট ...	গোঁদলপাড়া	৩৬০	১০,৮০,০০০
	হুগলী	৪৫৪	৪,২০,০০০
হওসন ব্রাদার্স লিমিটেড ...	হাওড়া	১,৬৬৩	২৬,২৫,০০০
	রিলায়েন্স	১,০০০	১৬,৫০,০০০
এইচ, ভি, লো এণ্ড কোং লিমিটেড	বেহার	১০০	১৪,০০,০০০
জারডিং স্কিনার এণ্ড কোং ...	কামারহাটি	১,৭১০	২৪,০০,০০০
	কাঁকনারা	১৫২১	৩০,০০,০০০
জেমসফিনলে এণ্ড কোং ...	চাপদানী	১০৭১	১৯৭,০০০ পাঃ
কেটেল ওয়েল বুলেন এণ্ড কোং ...	ফোর্ট গ্লসটার	১,৩৫০	১৪,০০,০০০
	ফোর্ট উইলিয়ম	৮০০	১৪,০০,০০০
ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং ...	ইণ্ডিয়া	১০০৬	২১,৭৫,০০০
ম্যাকনীল এণ্ড কোং ...	গ্যানজেস্	১,২৯৪	২১,০৮,০৪০
ম্যাকলিওড এণ্ড কোং ...	এমপায়ার	৪০০	৬,০০,০০০
	কেলভিন	৬০০	৭,০০,০০০
	সুরা	১৭৪	৩,০০,০০০
স্বরূপ চাঁদ হুকুম চাঁদ ...	হুকুমচাঁদ	.....	১৯,৯৫,৫৯৫
টমাস ডাফ এণ্ড কোং ...	শ্যামনগর	১,৫৭২	৪৫০,০০০ পাঃ
	টিটাগড়	১৭১৮	৪৫০,০০০ পাঃ
	ভিক্টোরিয়া	১০৫৩	৩০০,০০০ পাঃ

এত বড় একটা কারবার নষ্ট হয়, ইহা আমরা চাহি না। বিশেষতঃ, আজকাল বহু বাঙ্গালী এবং মাড়োয়ারীগণ সাত হইতে দশগুণ মূল্য দিয়া চটকলের "সেয়ার" কিনিয়াছেন। সম্ভবতঃ শতকরা ৭০।৮০ জন অংশীদারই ইঁহারা। এই কলগুলির লভ্য কম হইয়া গেলে, বহুদেশী লোক মারা পড়িবে; এবং যাহারা কলে খাটিয়া খায়, তাহাদের ভাত মারা যাইবে। আমাদের প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত, যাহাতে এই কলগুলির তত্ত্বাবধানের ভার আমাদের হাতে আইসে। তাহার পর যাহাতে রপ্তানি মালের উপর যে শুল্ক আদায় হইবে, তাহার কতক অংশ, পাট 'জাগের' উপযুক্ত জলাশয় খননে তাহাতে ব্যয় হয় তাহা করিতে হইবে। নতুবা, কৃষককুল ধ্বংশ হইয়া যাইবে। দরকার মনে করিলে, ইংরাজ কলের সাহায্যে চাষ আবাদ করাইবেন। কিন্তু কবির ভাষায় বলিতে গেলে, দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া, বলিতে হয়—

Ill fares the land, to hastening ills a prey
Where wealth accumulates, and men decay.
Princes and lords may flourish, or may fade;
A breath can make them as breath has made!
But a bold peasantry, their country's pride,
When once destroyed, can never be supplied.

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চুপ কর।

(পূর্ব্বের লিখিত)

চুপ কর! মিছে চিল্লেমিল্লি—সোর গোল ক'রে আপনার গলা, পরের ঘুম ভেঙ্গে লাভ কি ভাই? সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল! গরীবদের সোয়াস্তিটুকু নষ্ট করে একটা অসোয়াস্তি জাগিয়ে তুলো না—অসোয়াস্তি সৃষ্টি করো না। চুপ কর, ভাই, চুপ কর।

ভাঙ্গা আসর জাঁকা'তে সময় বিশেষে সংএর কীর্ত্তন দরকার হয়। অগত্যা ছুঁচোর কীর্ত্তন মন্দ নয়। সব জানি। "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল," বুঝি। কানারা কিন্তু জ্বালাতন করে তুলেছে। আমার ভিতরে ছাই। বাহিরে দেখি কোথাও কিছু নাই। তাই বড় দুঃখে, নৈরাশ্যে বলি, চুপকর ভাই, চুপ কর!

ঘরে আগুন লেগেছে—সব পুড়ে যাচ্ছে। গরীবের জলের মালাটী, ভাঙ্গা পাথর খানি, ছেঁদা ঘড়াটী, ফুটো ঘটটী, হাঁড়ি চুলো সব ভস্মীভূত হচ্ছে। তার আর্ত্তনাদ আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। চোকখালি করে কত জল ঢাল্‌ছে। আগুন আপন মনে দাউ দাউ করে জ্বলিতেছে। তোমরা সুখ সুস্তির কোল হইতে লাফিয়ে উঠে, "জল, জল" বলিয়া চেঁচাচ্ছ। জলের সন্ধান কেউ করেছ কি? জল আন্‌তে ছুটেছ কি? চেঁচামেচি করে কিন্তু আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তুল্‌ছ। কুঁজের উপর বিষ ফোড়া হয়ে, সোর গোল করে, শুধু অসোয়াস্তি বাড়াচ্ছ। তাই বলি, চুপ কর!

দেশের কথা? সে যে বিষাদের কাহিনী, মর্ম্মের ব্যথা। সে যে শোকার্ত্তের রোদন-ধ্বনি—উৎক্রোশের হাহাকার—ঝটিকাক্ষুব্ধ অমানিশার হা হুতাশ—বিদ্যুদ্দিগ্ধ বজ্রের চীৎকার। তা' নিয়ে কি হাসি খেলা করিতে আছে? তেত্রিশ কোটী হৃদয়ের রক্তে—ছেষট্টি কোটি চক্ষের জলে তা' যে মাখা। তাতে অসংখ্য অনাহার ক্লিষ্ট, ছিন্নবাস, বিষাদ-মলিন নরনারীর আর্ত্তনাদ—প্রাণের ব্যথা সুষুপ্ত। ফেরুপালের চীৎকারে, গৃধ্রকুলের পক্ষশাটে এ বিরাট মহা-শ্মশানের বিভীষিকা বাড়াইয়া, ইহাকে ভীষণতর করাতে লাভ কি ভাই। চুপ কর, চুপ কর।

কিছুদিনের তরে নীরব হও। এই বিশাল—বিরাট শবের বক্ষে বসিয়া নিগমের নিগূঢ় নীরব সাধনায় সিদ্ধ হও। আবার মহাব্যোম আলোড়িত করিয়া, সপ্ত মহর্ষির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া "ওঁ—ওঁ" মঙ্গল-ধ্বনি উত্থিত হউক্—প্রণব হইতে জ্যোতিঃ বিস্ফারিত হউক্—দেশ জ্যোতির্ম্ময় হউক্। প্রলয়ের আঁধার কাটিয়া যাক্। সবে বল ভাই, "তমসো মা জ্যোতির্গময়"। তাই বলি, চুপ কর।

কথার পিছনে, কাজের পশ্চাতে, মহাশক্তির মহা-আবির্ভাব না হইলে, সে কথা "শন্‌শন্, সর্‌সর্, গড়্‌গড়্, হড়্‌হড়্" প্রভৃতি অনুকার ধ্বনির ন্যায় এবং সে কাজ ছায়ার আবির্ভাব তিরোভাবের ন্যায় প্রাণহীন ও অসাড় হয়। মিছে কথায় চিড়ে ভিজে না—মিছে কাজে ফয়দা হয়া হয় না। লাভে থেকে, মুখে ব্যথা জন্মায়। তাই বলি, চুপ কর, ভাই।

শক্তি কোথা হ'তে আসে? আসে অনাদ্যনন্ত প্রকৃতির আড়াল থেকে। বাতাস আসে, উন্মুক্ত আকাশ হ'তে। জানালা দরজা বন্ধ করে, অন্ধ কূপে বসে থাক, বাতাসের অভাবে দম্ বন্ধ হবে। প্রাণের ঘরের জানালা দরজা বন্ধ ক'রে, তাকে অন্ধ-কূপে পরিণত করিলে, সেই অনাদ্যনন্ত শক্তি প্রস্রবণ হইতে শক্তিও আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে যায়—প্রাণের ঘর পূতিগন্ধময় হয়।

যে দরজা দিয়ে আমাদের ভিতরে সেই শক্তি আসে, তাহার নাম চরিত্র। চরিত্র মানব প্রাণ ঘরের সিংহদ্বার। এই চরিত্র গড়িতে অনেক মাল মসলার দরকার। প্রথম চাই, নিবৃত্তি। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবকে সংযত করিয়া, তাহাদিগকে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করাই, নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তিই নীতির মূল ভিত্তি। পারিবারিক শাসন, সামাজিক শাসন, ধর্ম্ম শাসন, রাজ শাসন আবহমানকাল মানবের মধ্যে এই নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে অদম্যোৎসাহে চেষ্টা করিতেছে। পশু হইতে মানবের প্রভেদ, এই নীতিতে। মানুষকে নীতিমান্ করিতেই, শিক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষের চক্ষু ফুটাইয়া তাহার নিকট বিশ্ব প্রকৃতির ও বিশ্বাতীত প্রকৃতির নিগূঢ় মূল তত্ত্ব প্রকটিত করে। মানুষ এই মহাতত্ত্বের সন্ধান ও আস্বাদন পাইয়া তাহাকে জীবনে সুলভ করিতে আপনাকে তদনুযায়ী করিবার জন্য সর্ব্বথা যত্নবান। সাগ্রহ যত্নের নাম, সাধনা। সাধনা, চরিত্র গঠনের জন্য দ্বিতীয় মসলা। শিক্ষা দীক্ষা, সাধনার প্রথম সোপান; অদম্য স্বচেষ্টা, দ্বিতীয় সোপান।

আমাদের বাহ্য দৃষ্টি ক্রমে বিকশিত হয়। ভূয়োদর্শন সে ক্রম-বিকাশের মূল। সদ্যজাত শিশুর চেয়ে, ক্রমান্বয়ে বালক, কিশোর, যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দৃষ্টি অধিকতর অধিকতম বিকাশ-প্রাপ্ত। এই ক্রম-বিকাশিত দৃষ্টি, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হইলে, তাহাতে সন্দেহের স্থান কমিয়া যায়। বাহ্য-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের ভিতরে একটা দৃষ্টি ক্রমে বিকাশিত হইতে থাকে। তাহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলে। যে চেতনার সাহায্যে বাহিরের দৃষ্টি ফুটিয়া কার্য্যকরী হয়, তাহাই অন্তর্দৃষ্টির মূল। অন্তর্দৃষ্টিই বাহিরে ব্যক্ত হইয়া বাহ্য দৃষ্টিতে পরিণত হয়। মানবে উভয়-বিধ দৃষ্টিরই বিকাশ অত্যাধিক। অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ অনন্ত-মুখী।

বিকাশিত অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সমর্থিত হইলে, তাহাতে দ্বিধার স্থান থাকে না। তাহাই পরিণামে বিশ্বাস আখ্যা ধারণ করে। বিশ্বাস ও সাধন সাপেক্ষ সিদ্ধ-বিশ্বাস, ভগবদ্-জ্ঞানের মূল এবং চরিত্র-গঠনের তৃতীয় মসলা। বিশ্বাস-বলে মানুষ যখন ভগবানকে পায়, তখন তাহার ভিতরে এক মহতী প্রকৃতি ফুটিয়া উঠে। তখন মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা, দয়ার অবতার, পরদুঃখ-কাতর, পরহিতৈষী, আত্মত্যাগী বৈরাগী। ব্রাহ্মণ বিধবার নিকট মৎস্যের গন্ধ যেমন অসহনীয়, তাহার নিকট আত্ম-সুখ, বিলাস-বিভ্রম-স্বার্থান্ধতা প্রভৃতিও তদ্রূপ অসহনীয় ও ঘৃণনীয় হয়। এই যে মানবের দেব-প্রকৃতি, ইহা চরিত্রের শেষ উপাদান।

এই সুমহৎ চরিত্রই, শক্তির আগমন-পন্থা। অনন্ত প্রকৃতির অন্তরাল হইতে, যে ঐশী-শক্তি আমাদের সাহায্যের জন্য প্রতি নিয়ত আসিয়া,

বাতাস ও আলোর ন্যায়, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়, চরিত্র তাহার বিরাম স্থান। চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই তাহা মানবের ভিতরে প্রকাশিত হয়; মানুষের কথা ও কাজের ভিতরে প্রাণরূপে থাকিয়া বিশ্ব-মঙ্গল সাধন করে। অসত্যের বিনাশ জন্য, সত্যের রক্ষার নিমিত্ত—যুগে যুগে নহে—পলে পলে, তিলে তিলে এই ভগবতী-শক্তি মানব সমাজে সম্ভাবিত বা অবতীর্ণ হইতেছেন। একথা খেয়াল বা কল্পনা নহে। অধ্যাত্ম-জগতের একটী প্রমাণিত সত্য।

বেদান্তের ঋষিগণ, গীতার ঋষি, বুদ্ধ, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, নানক, কবীর, রামানন্দ, চৈতন্য প্রভৃতি দেব-দুর্ল্লভ-চরিত্র বিশ্বাসী ভক্ত মহাপুরুষগণ এই সত্যের সাক্ষী। তাঁহাদের কথা ও কাজের ভিতরে এক জীবনময়ী শক্তি ছিল। তাই, সে সকলের সুফল হাজার হাজার বৎসর ভোগ করিয়াও মানুষ শেষ করিতে পারিতেছে না—মানব-জাতি আপনার শেষ দিনেও শেষ করিতে পারিবে না।

সে দিনও এই বঙ্গে রামমোহন, রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ যা' বলে গেছেন, করে' গেছেন, তার তুলনা মিলিতেছে না। অন্যে পরে কা কথা? ঐ দক্ষিণাবর্ত্তের তিলক, গান্ধী, সুব্রাহ্মণ্যেরও জোড়া মিলিতেছে না। তোমরা ধর্ম্মকে, নীতিকে, বিশ্বাসকে, ভক্তি-প্রেম-বৈরাগ্যকে—সকলের সমন্বয় ক্ষেত্র—চরিত্রকে বাদ দিয়ে, "ঢাল নাই, তলোয়ার নাই—নিধিরাম সর্দ্দার" সাজিয়া, দেশটাকে, ধরিয়া টানাটানি করিয়া, মহা সোর গোল বাধিয়েছ। নৌকায় নঙ্গর করিয়া দাঁড় টানিতেছ, আর চেঁচা মেচি "ক'রে বল্‌ছ—"খুব চালাচ্ছি।" ফাঁকি দিয়ে 'কেউকেটা' হ'তে চেষ্টা করছ। কিন্তু দুনিয়া তোমা-দিগকে 'কেউ'ও ভাব্‌ছে না, 'কেটা'ও ভাব্‌ছে না। চাচ্ছ মহাপুরুষত্ব, আস্‌ছে অমনুষ্যত্ব। অচল নায়ে দাঁড় টান্‌তে টানতে গাচ্ছ সারি। কান ঝালা পালা হওয়াতে—লোকে এনে বক্‌সিষ দিচ্ছে, কল্‌সী দড়ি। তাই বলি "ভাই, ঢাকের বাদ্যি মিষ্টি কর—চুপকর, চুপকর।"

যে চরিত্রকে এক ঘরে বা "বয়কট্" করেছ, তার আশ্রয় লইতে হবে। ঐ যে ঘর পুড়ে ছাই হচ্ছে, তা নিবাতে হ'লে জল পাবে ঐ চরিত্রে—ঐ অক্ষয় সুধা-সরোবরে। দয়া, ধর্ম্ম, ত্যাগ, হিতৈষণা, বিশ্বপ্রেম জলে সরোবর পূর্ণ। জল আনিবার উদ্যম উত্তেজনার খনিও ঐ চরিত্র। নিগমের নিগূঢ় সাধনার মন্ত্র তন্ত্র সবই চরিত্রে। নরম-পন্থী, গরম-পন্থী, বিপ্লব-পন্থী, চোর ডাকাত কত কিছুর আবির্ভাব হ'তেছে। লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। একদিকে, দলাদলি, লাফালাফি, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহের আগুন জ্বলিতেছে! অপর দিকে, চোর ডাকাতের অত্যাচারে দেশ কম্পিত। কয়েকটা বোমা ফুটায়ে, রিভল্‌বার ছুটায়ে, বিপ্লবপন্থীরা সহস্রাধিক যুবকের কারা-ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। গৃহে গৃহে কান্নার রোল উঠেছিল। অশন বসনের দুর্ম্মূল্যতায়, প্লাবন দুর্ভিক্ষে দেশ কাতর। এ সময়ে, তোমরা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, সোর গোল করিতেছ। চেঁচামেচি শুন্‌বে কে? তাই বলিতেছি, চুপ কর। ঈশ্বর গুপ্ত লিখে-ছিলেন—"রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি"। আমাদেরও এখন সেই দশা। "জলে কুমীর, ডেঙ্গায় বাঘ", যাই কোথা বল? চরিত্র চাই, চরিত্রবান্ চাই। ওসব পন্থী মন্থী জঞ্জাল আবর্জ্জনা চাই না। চুপ কর ভাই, চুপ কর।

গণ-তন্ত্র চাও, ভাল কথা। বিরাট গণ-নারায়ণকে প্রেম প্রীতি দিতে, ভেদাভেদ ভুলিয়া পূজা করিতে, তার পদে আত্মবলিদান করিতে শিখেছ কি? তা না হলে, সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা গণদেব জাগিবেন না, প্রসন্ন হবেন না। গণ-তন্ত্র পাবে না। পেলেও রাখিতে পারিবে-না। * * * স্বায়ত্ত-শাসন জলের ছায়ায় পরিণত হইবে। চরিত্রের কদর বাড়াও। চরিত্রগুণে ভারত একদিন পুণ্যভূমি হয়েছিল। সুমহান্ চরিত্রের আধার ঋষিগণের পাদস্পর্শে এ কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র হয়েছিল। পূজনীয় মহান্ চরিত্রে বিভূষিত হও। জগৎ স্বেচ্ছায় গণ-বস্ত্র হইয়া সমস্ত কামাবস্তু চরণে উপহার দিবে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" প্রস্তুত হও! চরিত্রবলে বলীয়ান হইতে অপেক্ষা কর। সংযত হও। জাতীয় জীবন ও চরিত্রে জীবনলাভ কর। হিতবাদী, হিত-কাঙ্ক্ষীকে শ্রদ্ধা কর। এখন, চুপ কর, চুপ কর, ভাই।

৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মহাভারত মঞ্জরী।

দশম অধ্যায়।
দুর্দ্দশার চরম।

ঘোর অন্ধকার-রজনী, তাহাতে মহাবন। সেই বন ভেদ করিয়া পাঁচটী যুবক তাঁহাদের জননীকে লইয়া অতিদ্রুত গমন করিতেছেন। ভয় আছে, রাক্ষসের অনুচরগণ অনুসরণ করে।

ক্রমে তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। এমন সময়, সেই মহাবনে, সেই ঘোর অন্ধ-কারে, এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের নিকটে আসিল। বলিল,—"মহাত্মা বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় বলিয়াছিলেন,'বিবরে বাস করিলে অগ্নি অনিষ্ট করিতে পারে না।' ইহাদ্বারা বুঝিবেন, আমি তাঁহারই লোক, তাঁহারই প্রেরিত। আপনাদিগকে গঙ্গার পরপারে লইয়া যাইবার জন্য নৌকা লইয়া আসিয়াছি।"

তখন সকলে সেই নৌকায় উঠিলেন। দেখিলেন, তাহাতে যন্ত্র পর্য্যন্ত রহিয়াছে। (১) মাঝি অতি সাবধানে তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিল। তাঁহারা আবার মহাবন ভেদ করিয়া চলিলেন। নক্ষত্রদ্বারা দিক্ নির্ণয় করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগি-লেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, পরের দিনও অতীতপ্রায় হইল। জননীর কষ্টের সীমা নাই। তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পিপাসায় পীড়িত হইয়া "জল", "জল" করিতে লাগিলেন। তখন সকল সেই মহাবনে, এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা জল অন্বেষণে নির্গত হইলেন। জলচর সারস পাখীর কলরব শুনিয়া, সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অচিরে এক সুন্দর

(১) আদিপর্ব্ব, ১৩১—৫।

সরোবর দেখিয়া তাহাতে স্নান করিলেন, জল পান করিলেন। পরে বস্ত্র ভিজাইয়া জল লইয়া চলিলেন।

সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সকলেই গভীর নিদ্রায় অচেতন। এমন সময় এক রূপলাবণ্যময়ী রাক্ষসী আসিল। সে তাঁহার সহিত মধুর ভাবে আলাপ করিতে লাগিল। এমন সময়, এক ভীষণ-দর্শন মহাবল রাক্ষস আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তখন দ্বিতীয় ভ্রাতা তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করিলেন।

সেখানে থাকা আর নিরাপদ নয় বিবেচনায়, সকলেই আবার চলিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসীও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় ভ্রাতা তাহাকে পুনঃপুনঃ তাড়াইতে লাগিলেন—মন প্রাণ দিয়া কি না, বলিতে পারি না—তথাপি সে প্রস্থান করিল না। করিবে কিরূপে? সেও যে এক অদৃশ্য-ডোরে বাঁধা পড়িয়াছে! সে তাঁহাকেই, সেই উৎপীড়ককেই—এ জগতের সকলই বিচিত্র—বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল, তাঁহার জননীর অনুমতি চাহিতে লাগিল। শেষে তিনি মত দিলেন। সেই মহাবনে উভয়ের বিবাহ হইল। তাহার ফল, পুত্র ঘটোৎকচ।

এই রাক্ষস রাক্ষসীরা বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিত (২)। বিবিধ ফুলে ও ফুলের মালায় বেশভূষা করিত। তাহারা অনার্য্য-জাতীয় অসভ্য মনুষ্য মাত্র।

পঞ্চভ্রাতা জননীকে লইয়া বনে বনে চলিতে লাগিলেন। বনজাত ফল মূলে ও মৃগয়ালব্ধ মাংসে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। শেষে, বহুদিন পরে, বহু দুঃখ কষ্টের পরে, একচক্রা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহা-দিগকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহার গৃহের এক অংশে বাস করিতে বলিলেন। তাঁহারা তথায় ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আর গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন ও স্নেহময়ী জননীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই, মৃগচর্ম্ম ও বল্কল পরিয়াছেন। মস্তকে জটা হইয়াছে। শরীর ধূলায় ধূসরিত। তাঁহাদের পূর্ব্বের শোভা নাই, চিনিবার উপায় নাই। জ্ঞাতিগণের পাপাচরণে তাঁহারা এখন বনমানুষ হইয়াছেন! দুঃখ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। দুঃখই সুখের জনক। সংসারে যদি দুঃখ না থাকিত, কে সুখকে উৎপন্ন করিত? কেই বা উত্তেজনা দ্বারা মনুষ্যকে অগ্রসর করিত?

একদিন জননী ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গৃহে আছেন, আর সকলে ভিক্ষায় গিয়াছেন, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া জননী অস্থির হইয়া দ্রুতপদে তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রোদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণী বলিতেছেন,—"আজ আমিই প্রাণ দিব। লোকে নিজ সুখের জন্য স্ত্রী-পুত্র কামনা করে। যদি তাহাদের দ্বারা সে সুখ না হইল, তবে তাহাদের প্রয়োজন?" ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"আজ আমিই প্রাণ দিব। এই গ্রামের দুরবস্থা দেখিয়া, উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তোমাকে কত অনুরোধ করিয়াছিলাম, তুমি তোমার পৈত্রিক ভিটার মমতায় আমার

(২) বনপর্ব্ব ১১—৬৭।

কথা শুন নাই, এখন তোমার কার্য্যের ফল ভোগ কর।”

জননী ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?” ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“এখানে এক রাক্ষস বাস করে। তাহাকে প্রত্যহ একটী মনুষ্য ও বহু অন্ন-ব্যঞ্জন খেতে দিতে হয়। আজ আমাদের পালা।” জননী উত্তর করিলেন,—“আপনাদের চিন্তা নাই। আমার পাঁচ পুত্র, তাহার একটীকে পাঠাইব।” ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—“কি! নিজ জীবনের জন্য পরের জীবন বিনষ্ট করিব! তাহা কখনও হইবে না।” তখন বৃদ্ধা বলিলেন,—“আপনাদের ভয় নাই। আমার দ্বিতীয় পুত্র সেই রাক্ষসকে অনায়াসে নিহত করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবেন না।” তখন ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র, যথাসময়ে বহু অন্নাদি-সহ সেই রাক্ষসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অচিরে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষে, তিনি সেই রাক্ষসকে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পৃষ্ঠদেশে জানু স্থাপন করিয়া বসিলেন। পরে, এক হস্তে তাহার মস্তকের কেশ ও অন্য হস্তে তাহার কটিদেশের দৃঢ়াবদ্ধ বস্ত্র ধারণ করিয়া, তাহাকে ধনুকের মত বক্র করিয়া নিহত করিলেন। তখন সেই নগরী নিরাপদ হইল।

দ্বিতীয় ভ্রাতা এই দুঃসাহসিক কার্য্যে যাইবেন শুনিয়া, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জননীকে বলিলেন,—“মা, তাহাকে এইরূপ বিপদের মধ্যে পাঠান উচিত নহে। সেই-ই আমাদের আশা ভরসা।” জননী উত্তর করিলেন,—“এই পরিবার আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া উপকার করিয়াছে। এখন আমাদের প্রত্যুপকার করা একান্ত উচিত। যে ব্যক্তি কোনরূপ উপকার করে, তাহার প্রত্যুপকার অবশ্য করিবে। তাহা যে করে, সেই-ই প্রকৃত মনুষ্য। পরোপকারই সমাজ-স্থিতির মূল। কৃতঘ্ন ব্যক্তি সেই সমাজ-স্থিতির মূলে কুঠারাঘাত করে। সুরাপায়ী, চোর, এমন কি ব্রহ্মহত্যাকারীও নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। কৃতঘ্নের যশ কোথায়? স্থান কোথায়? সুখ কোথায় (৩)?”

যে রমণীরত্নের হৃদয় এত উচ্চ, এমন উদার, তাঁহার পুত্রগণের চরিত্র মহোজ্জ্বল হইবে, বিচিত্র কি? আমরা জননীগণকে নিকৃষ্ট করিয়া রাখিয়া, তাঁহাদের নিকট উৎকৃষ্ট পুত্রের প্রত্যাশা করি! কি বিড়ম্বনা! আমরা খনি খুঁড়িতে অসমর্থ, তাই চালে কুষ্মাণ্ডে মণি খুঁজি!

একাদশ অধ্যায়।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

কেবল ঊষার উদয় হইয়াছে। অরুণের আলোকে পূর্ব্ব আকাশ-প্রান্ত নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। নানা বর্ণের মেঘখণ্ড সকল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যেন সে পাড়ার পরীর মেয়েরা নীল পীত লোহিতাদি বর্ণের সাড়ীতে সাজিয়া রাজকন্যার বিবাহ দেখিতে বাহির হইয়াছে।

দ্রুপদনগর আজ অপূর্ব্বভাবে সজ্জিত হইয়াছে। উচ্চ তোরণ হইতে নানাবিধ বাদ্য গুরু গম্ভীরে মৃদু মধুর সুর মিলাইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছে। কত নরনারী উত্তম বেশ ভূষা করিয়া রাজকন্যার স্বয়ম্বর দেখিতে রাজ-

(৩) শান্তিপর্ব্ব ২৭০—১১।

পুরীর দিকে চলিয়াছে। তাহা এক সুন্দর ও সুদৃঢ় দুর্গ। গভীর পরিখা ও উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। প্রাচীর মধ্যে উচ্চ তোরণ। নরনারী তাহার মধ্য দিয়া গিয়া সপ্ততল, চতুঃশালা হর্ম্ম্যমালার মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছে। তথায় স্বয়ম্বর-সভা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা কত শিল্প-চাতুর্য্যে ও মণি-মাধুর্য্যে, পুষ্প পতাকায় ও পুষ্পমালায় মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। পুষ্প গন্ধে ও অগুরু চন্দনের সৌরভে আমোদিত হইতেছে।

কত মুনি ঋষি, কত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যথা-স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। নগরের কত লোক কত বেশভূষা করিয়া আসিতেছে, বসিতেছে। ভারতের নানা জাতির নৃপতিগণ ও গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ দ্রুপদ রাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া আসিয়াছেন। সকলেই নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতেছেন। দ্রুপদরাজ সকলের সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

কিছুকাল পরে উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ, অগ্নিবর্ণ, মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি রমণীয় বেশ ভূষায় সভায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই দ্রৌপদী ধীরে ধীরে গজেন্দ্র গমনে গমন করিয়া অগ্রজ যে স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে এখন নির্নিমেষ নয়নে দ্রৌপদীর অতুল শোভা দেখিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, এমন রূপরাশি কি মানুষে সম্ভব? সকলেই, দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃত, আত্মবিক্রীত হইলেন।

দ্রৌপদীর বর্ণ নীলোৎপল তুল্য, অতি মনোহর। বিম্বোষ্ঠ ঈষৎ হাসিতে বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। চক্ষুদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় বিশাল। কেশপাশ কুঞ্চিত, কৃষ্ণবর্ণ। শরীর নাতি দীর্ঘ, নাতি ক্ষুদ্র; না কৃশ, না স্থূল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই অতি লাবণ্যময়। যৌবন-জোয়ারে রূপ যেন উথলিয়া উঠিতেছে। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্লাবিত করিয়া ছুটিতেছে। শরীর স্বর্ণ মক্ষিকাময় রক্ত বর্ণের পট্টবস্ত্রে সুশোভিত, বিবিধ মণি মুক্তাময় স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত। হাতে বরণের স্বর্ণ থালা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—“নৃপতিগণ, যিনি এই ধনুকে গুণ দিয়া, আকাশস্থিত ঐ চক্রের ছিদ্রপথে এই এই পঞ্চশর প্রেরণ করিয়া, যন্ত্রের উপরিস্থিত লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার এই প্রিয়তমা ভগিনীর পাণি গ্রহণ করিবেন।”

তৎপরে দ্রৌপদীকে বলিলেন,—“প্রিয় ভগিনি, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, যুযুৎসু, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, বিরাট, মদ্ররাজ শল্য, কলিঙ্গ রাজ, প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজ্য ভগদত্ত, পৌণ্ড্রাধিপতি, তাম্রলিপ্ত-রাজ, বঙ্গেশ্বর, কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি বিখ্যাত পুরুষগণ তোমার নিমিত্ত এই লক্ষ্যভেদ করিতে আসিয়াছেন। যিনি এই লক্ষ্য ভেদ করিবেন, তাঁহাকেই তুমি বরণ করিবে।” (৪)

---

(৪) আদিপর্ব্ব ১৮৩।১৮৭ অধ্যায়। ইঁহাদের মধ্যে বৈশ্যাদাসী পুত্র যুযুৎসু, সূতপুত্র কর্ণ, ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা এবং অনার্য্য জাতীয় রাজাও ছিলেন। যদি ইঁহাদের জাতি দ্রৌপদী বিবাহের অন্তরায় হইত, তাহা হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীকে ঐ কথা বলিতেন না, দ্রুপদ রাজও ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন না। ইহা দ্বারা আরও দেখা যায় যে, সে সময় বঙ্গ, পৌণ্ড্র বা উত্তর বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত বা তমলুক এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসাম ভিন্ন ভিন্ন চারিটী প্রবল রাজ্য ছিল। এই পৌণ্ড্রই অতঃপর পাণ্ডু নগর ও এখন পাণ্ডুয়া হইয়াছে। তাহা মালদহ জেলার মধ্যে।

সকলেই দ্রৌপদীর প্রাপ্তি-আশা প্রাণে লইয়া বহুদূর হইতে আসিয়াছেন। এখন সেই আকাশস্থিত চক্র দেখিয়া, নৃপতিগণের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই অসামান্য লক্ষ্য দেখিয়া সকলেই নিরাশ হইলেন। কিছুকাল পরে নৃপতিগণ একে একে লক্ষ্যস্থানে গমন করিতেলাগিলেন, কিন্তু কেহই সেই বিশাল ধনুকে গুণ দিতে পারিলেন না। ক্ষত্রিয় রাজা দুর্য্যোধন, সূতপুত্র কর্ণ, ব্রাহ্মণ তনয় অশ্বত্থামা, যবনরাজ প্রভৃতি সকলেই চেষ্টা করিলেন। (৫) কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না। অনেকে আবার ধনুকে গুণ দিবার সময় ধনুকোৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। নৃপতিগণ এইরূপে লাঞ্ছিত, লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া, আপন আপন আসনে আসিয়া বসিলেন। এখন আর কেহই অগ্রসর হন না। এইরূপে বহু সময় অতীত হইল। শেষে ব্রাহ্মণ দিগের মঞ্চ হইতে এক দীর্ঘকায়, মহাবল, সুশ্যামল, পুরুষ দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি সিংহের ন্যায় পদ বিক্ষেপে, সগর্ব্বে সেই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, মনোহারিণী দ্রুপদবালার উপর একবার মনোহর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরক্ষণেই সেই সুবিশাল ধনু হস্তে তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে গুণ দিলেন, টঙ্কার করিলেন, বিদ্যুৎবেগে বাণ প্রেরণ করিলেন। নিমিষের মধ্যে লক্ষ্য ভেদ করিয়া তাহাকে ভূতলে আনয়ন করিলেন।

অমনি সহস্র সহস্র রমণী-কণ্ঠ হইতে যুগপৎ উলুধ্বনি উত্থিত হইল; অতি মধুর মাঙ্গল্য বিবাহ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আনন্দোৎফুল্লা কৃষ্ণা অগ্রসর হইলেন; বিজয়ী পুরুষকে বরণ করিলেন, বরমাল্য তাঁহার গলায় দিলেন। দুই হৃদয় এক হইল। ব্রাহ্মণগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, তাঁহাদেরই একজন এই রমণীরত্ন লাভ করিলেন।

এত মহামান্য নরপতি থাকিতে, এক বন্য ব্রাহ্মণে এই রমণীরত্ন লইয়া যাইবে, ইহা কি নৃপতি সমাজের সহ্য হয়? তখনই তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিজয়ী ব্রাহ্মণ বিচলিত না হইয়া, সিংহ-বিক্রমে সভা হইতে বহির্গত হইলেন। আর দ্রৌপদী? তখনই তিনি সেই জাতি-কুল-অপরিজ্ঞাত, অপরিচিত পুরুষের অনুসরণ করিলেন। জাতিকুল পরিচয়ের কি প্রয়োজন? তাঁহার প্রমাণ ত পূর্ব্বেই পাইয়াছেন! তিনি আজীবন যে ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন, সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, বন জঙ্গলে অকাতরে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আজ হইতেই আরম্ভ হইল। পাঠক, অগ্রসর হউন। এই রমণীরত্নের বিচিত্র জীবনালেখ্য ক্রমেই উন্মুক্ত দেখিতে পাইবেন, আর অপার আনন্দে ভাসিবেন।

এখন নিরাশ নৃপতিগণ এই বিজয়ী ব্রাহ্মণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একমাত্র তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নৃপতিগণ পরাজিত হইতে লাগিলেন; লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতে লাগিলেন; আবার সমবেত হইয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

(৫) আদিপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়। ইঁহাদের জাতি যদি বিবাহের অন্তরায় হইত, তাহা হইলে ইঁহাদিগকে লক্ষ্য-ভেদের জন্য চেষ্টা করিতে নিশ্চয়ই নিষেধ করা হইত। সে সময়কার বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৩য় অধ্যায়ে "বিবাহ" দ্রষ্টব্য।

তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"এই ব্রাহ্মণ তনয় ধর্ম্মানুসারে দ্রৌপদীকে পাইয়াছেন। আপনাদের যুদ্ধ করা নিতান্ত অন্যায়।" তখন সকলে অবনত মস্তকে প্রস্থান করিলেন।

এখন দুই ভাই দ্রৌপদীকে লইয়া সেই নগরীর বাহিরে এক কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাদের জননী ছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রাঙ্গন হইতেই বলিলেন,—"মা, মা, দেখ, ভিক্ষায় আজ কি পাইয়াছি!" জননী অমনি গৃহের মধ্যে হইতেই উত্তর করিলেন,—"যাহা পাইয়াছ, সকলে মিলিয়া ভোগ কর।" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন। তখন সকল দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন।

কিছুকাল পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিলেন। জননী তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি না দেখিয়া প্রমাদ বশতঃ বলিয়াছি, 'তোমরা সকলে মিলিয়া ভোগ কর।' এখন যাহাতে আমার কথা মিথ্যা না হয়, দ্রৌপদীর ও পাপ না হয়, তাহা তুমি কর (৬)।

পরে অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, সকল ভ্রাতাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন।

এমন সময় কৃষ্ণ বলরাম তথায় আসিলেন। আত্ম-পরিচয় দিলেন। কৃষ্ণের সহিত ইঁহাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি আমাদিগকে কিরূপে চিনিলে!" কৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি কি গোপন থাকে? পৃথিবীতে আপনারা ব্যতীত এমন বিক্রম আর কে দেখাইতে পারে?" কিছুকাল কথোপকথনের পর কৃষ্ণ বলিলেন,—"আমরা এখানে বিলম্ব করিলে সকলে আপনাদিগকে চিনিতে পারিবে।" তখন কৃষ্ণও বলরাম তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন।

(৬) আদিপর্ব্ব ১৯১—৪।৫।

পরদিন প্রভাতে দ্রুপদ রাজের পুরোহিত আসিলেন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে বলিলেন,—"দ্রৌপদী কাহার গলায় মালা দিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারায় দ্রুপদ-রাজ অত্যন্ত চিন্তিত আছেন।" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"দ্রুপদ-রাজ পণ করিয়াছিলেন, যিনিই এই লক্ষ্য ভেদ করিবেন, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আমার তৃতীয় ভ্রাতা লক্ষ্য ভেদ করিয়া কন্যা পাইয়াছে। এখন জাত, কুল, শীল বা গোত্র দিয়া তাঁহার প্রয়োজন (৭)?"

তৎপরে রাজদূত আসিয়া সকলকে রাজপুরীতে লইয়া গেল। দ্রুপদ-রাজ তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সকলের পরিচয় দিলেন। পরে বলিলেন,—"পুরোচন আমাদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। তাই ভীম তাহার শয়নকক্ষায় সর্ব্বাগ্রে অগ্নি প্রদান করে। পরে আমরা পাঁচ ভাই, মাকে লইয়া সুরঙ্গ দিয়া মহাবনে প্রবেশ করি। সেই রজনীতে এক নিষাদী পঞ্চপুত্র সহ মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া, সেই গৃহের এক পার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। পর প্রভাতে, তাহাদেরই দগ্ধদেহ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে অন্ধরাজ ভাবিয়াছিলেন, আমরাই দগ্ধ হইয়াছি। আমরা তথা হইতে পলায়ন করিয়া একচক্রা নগরীতে বাস

(৭) আদিপর্ব্ব ১৯৩—২২।২৩।২৪।

করিতাম। সেখান হইতে এখানে আসিয়া অর্জ্জুন লক্ষ্য-ভেদ করিয়াছে।”

সকল শুনিয়া দ্রুপদ-রাজের আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তখনই সে সংবাদ অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। সমুদয় অন্তঃপুর আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যুধিষ্ঠির তখন দ্রুপদরাজকে বলিলেন,—“মাতৃ-আজ্ঞা, আমরা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব।” তাহা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “আপনি এমন ধার্ম্মিক হইয়া কিরূপে এইরূপ অন্যায় কথা বলিলেন?” যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,—“মাতাই পরমগুরু। তাঁহার আজ্ঞা পালনই ধর্ম্ম। বিশেষ, পূর্ব্বে সাতজন ঋষি তাপসী জটীলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার অন্য দশ ভ্রাতায় এক মুনি-তনয়ার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন (৮)। এমন সময় বেদব্যাস আসিলেন। তিনিও যুধিষ্ঠিরের মত সমর্থন করিলেন (৯)

এখন মহাসমারোহে এক এক দিন, এক এক ভ্রাতার সহিত একই কন্যার বিবাহ হইতে লাগিল। এইরূপে পাঁচ দিনে সে বিবাহ সমাপ্ত হইল। দ্রুপদরাজ বহু ধনরত্ন ও বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী যৌতুক দিলেন। কৃষ্ণও বহু স্বর্ণ ও নানাবিধ দ্রব্যাদি উপহার পাঠাইলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া, শেষে প্রবল নরপতির আশ্রয় পাইলেন। পোত, সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, শেষে এক অতুলনীয় রত্নসহ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

(৮) আদিপর্ব্ব ১৯৬—১৪।১৫।১৬।

(৯) তিব্বৎ দেশে সকল ভ্রাতায় এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে (Tibet, the mysterious; Three years in Tibet)। নেপালে এই প্রথা প্রচলিত আছে (Modern Review, 1916)। হিমালয়ের পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে এইরূপ বিবাহ চলিতেছে (R. C. Dutt's Civilization in Ancient India, II—140)। নায়ার রমনীদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহু পতি গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। (ভারতী, ১৩২৩। পৃঃ ৫৩৯) এখনও পঞ্জাবের সেওরাজ, লাহুল, স্পিতি ও কুলু অঞ্চলে সকল ভ্রাতায় একই কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই প্রথা এখনও আছে। Mayne's Hindu Law and Usage, 7th edition, page 74, foot-note (c) and paras 62 and 63.

সঙ্গণিকা।

পারলৌকিক। বছরটা একেবারেই দুর্ব্বৎসর। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের নিজস্ব শোক তাপ আজ যেন বাঙ্গলাময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আরম্ভ যে প্রকারই হোক্, শেষের দিকে, বৎসরটা যে রকম নিদারুণভাবে আঘাতের পর আঘাত দিতেছে, বাঙ্গালী একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক মাসের মধ্যে বাঙ্গলা মাথা মাথা তিনটী রত্ন হারাইয়াছে; তাঁহাদের শোকে বঙ্গমাতা আজ আকুল। এত অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিবা তাঁহাকে এককালে তাঁহার জীর্ণ অঞ্চলের এতগুলি নিধি হারাইতে হয় নাই। দরিদ্রের ধন, তুলনা-রহিত তাঁহার এই সন্তান ত্রয়ের প্রত্যেকেই, যে কোন দেশে জন্ম ধারণ করিলে,

তাহা গুরুগৌরবে মহিমান্বিত হইত। তবে তাঁহার সন্তোষ, তাঁহার অঙ্কে এই রত্নত্রয় শোভিত হইয়াছিল। এখন বছরের যে ক'টা দিন বাকী আছে, নিত্য শঙ্কিত থাকিতে হইবে; ভালোয় ভালোয় কাটিলে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচি।

* * *

৺ রাসবিহারী ঘোষ।

জন্ম—তারকোণা, জিলা বর্দ্ধমান, ১০ই পৌষ, ১২৫২ সন (ইংরাজী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৪৫) মঙ্গলবার।

মৃত্যু—আলিপুর, কলিকাতা, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৭ সন (ইংরাজী ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২১), রবিবার, রাত্রি ১ঘটিকা।

যেমন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, গবেষণায় ও পাণ্ডিত্যে যেমন ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অর্থে, নির্ভিকতায়, তিনি তুলনা-রহিত ছিলেন,—স্বদেশ-বৎসলতা, ও জাতীয়-প্রীতিতেও তেমনি তিনি অনুপমেয়। তাঁহার ধন, জন, ঐশর্য্য, সমৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, সাধনা ও সিদ্ধি সকলই তাঁহার স্বাবলম্বনের সাক্ষী; সকলই তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ মেধা, একান্ত নিষ্ঠা এবং দুর্জ্জয় সাহসের ফল। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া, প্রতিষ্ঠাবান হইয়া, সুদীর্ঘকাল তিনি আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা, ভক্তি, অর্ঘ্য, ও পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন। আজ তাঁহার জীবন-গত অমোঘ শক্তি দেশময় পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িতেছে; খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া শতধা সে শক্তি ঘটে ঘটে উদ্দীপনার উদ্বোধন করিতেছে। সে শক্তি অপ্রতিহত হউক; চির-প্রতিষ্ঠিত হউক্!

বর্দ্ধমান জেলায় তারকোণা ছিল এক অজানা অচেনা, গণ্ডগ্রাম। এই মহাপুরুষের জন্মস্থান বলিয়া আজ সে পুণ্যতীর্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাইবার জন্য রাসবিহারী কত উপায় অবলম্বন, কত অর্থব্যয়, না করিয়াছেন। উত্তর উত্তর জীবনে পদমর্য্যাদা অর্জ্জন, নিত্য উন্নতি হইতে উন্নততর প্রতিষ্ঠা লাভ, তাঁহাকে কখন এত 'বড়' (?) করিয়া তুলিতে পারে নাই, যে তিনি তাঁহার জন্মস্থানের প্রতি মমতা হারাইয়া ফেলিবেন। আশৈশব, আমরণ সে মায়া যে অক্ষুন্ন ছিল, তাঁহার উইল-পত্র তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কেবল যে তিনি তাঁহার ত্যক্ত বিত্তের আংশিক ত্যাগী করিয়াছেন এই গ্রামটীকে, তাহা নয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর, তাঁহার দেহখানিকে তাঁহার এই প্রিয়তম জন্মস্থানে বহণ করিয়া লইয়া, সৎকৃত ও ভস্মাবশেষ সেই পুণ্যভূমিতে প্রথিত হয়। দেশ মাতৃকার প্রতি এ প্রকার দরদী কয়টী মিলে?

রাসবিহারী ৺ জগবন্ধু ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবে বাঁকুড়ায় শিক্ষালাভ করিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসে, দ্বিতীয় বিভাগে, প্রবেশিকা পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ-লাভ করিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, এফ্-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায়ও সেইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, বাঙ্গালী-সন্তান, তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'অনারের'-সহিত ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া এম-এ উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ঐ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, মহামান্য হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সূচিত

WATER DAMAGED.

ব্যবহার-শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, রাসবিহারী ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার এই বক্তৃতাগুলি অদ্যাপিও ভারতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; সেই বক্তৃতা-মূলক গ্রন্থ, ব্যবহার-শাস্ত্রের অক্ষয় কীর্ত্তি। তখনও ভারতে 'সম্পত্তি হস্তান্তর বিধি' (Transfer of Property Act) প্রচলিত হয় নাই। সেই আইন প্রণয়নে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হুইটলি ষ্টোকস্ (Dr. Whitelay Stokes) এই গ্রন্থ হইতে কি পর্য্যন্ত সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রণীত বিধি-গ্রন্থের (Anglo-Indian Codes) ভূমিকায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ব্যবহার-শাস্ত্র জিনিষটাই রুক্ষ; সে বিষয়ে বিচার-মূলক গ্রন্থে প্রাঞ্জলতা আশা করা যায় না। তাহার উপরে, বাঙ্গালীর পক্ষে বিদেশী ভাষায় এই প্রকার কর্কশ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া, তাহাতে সরসতা দান করা কত যে কষ্টকর, একটু বিবেচনা করিলেই বোঝা যায়। কিন্তু 'বন্ধক দায়' (law of mortgage) বিষয়ে রাসবিহারীর এই গ্রন্থ, উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য, জলের মত তরল, অথচ যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ-ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থ তাঁহার কেবল যে গভীর গবেষণার প্রমাণ দেয় তাহা নয়, তাঁহার সাহিত্যের—বিদেশীয় ইংরাজী সাহিত্যের—উপর অসামান্য অধিকারের নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান।

ওকালতি আরম্ভ করিয়া এ হেন ব্যক্তি যে অনতিবিলম্বেই ব্যবসায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, আশ্চর্য্যের নয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, তিনি বি-এল-এ পরীক্ষক নিযুক্ত এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে (fellow) নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, তিনি ডি-এল্ উপাধি লাভ করেন, এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, সিন্‌ডিকেটের সভ্য হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার রাসবিহারী বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যপদ লাভ করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, সার রমেশচন্দ্র বড়লাট সভার সভ্য-পদ ত্যাগ করিলে, রাসবিহারী সেই শূন্য স্থানে নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, এই পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ, এই দুই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহার-শাস্ত্র বিভাগের (faculty of law) সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি C.I.E. উপাধি লাভ করেন। ব্যবহার-শাস্ত্রে তিনি দুইটী আইন প্রণয়নের সাহায্য করিয়া অমর ও বহুলোকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। প্রথমটীর ফলে, দায়ীকের বিষয় নিলামে বিক্রয় হইলেও, একমাসের মধ্যে টাকা দিলে, সে সম্পত্তি ফেরত পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়টীর দ্বারা, দোয়ভাগ কালে, ভদ্রাসন বসতবাটী যাহাতে বংশের আয়ত্ত হইতে সহসা চলিয়া না যায়, সে বিষয়ে যথা-সম্ভব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটী ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার মহানুভবতা ও বংশ-গৌরবের প্রতি প্রীতি সপ্রমাণ হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রাসবিহারীর কৃতিত্ব অসাধারণ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি রূপে তাঁহার অভিভাষণ তাঁহার গৌরবকে চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবে। সেই বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই, তিনি ভারত-ব্যবস্থাপক-সভায়, জনসাধারণের দারুণ দুঃখ তাপ জ্ঞাপন করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া, পড়িয়া, কেহ অবিচলিত থাকিতে পারে নাই। দেওয়ানী কার্য্য-বিধি (Civil Procedure Code) আইন সংশোধিত করিতে

তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত, বর্ত্তমান আইনটী, বলিতে গেলে ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার লরেন্স জেন কিন্স ও রাসবিহারী—এই দুইজনের কীর্ত্তি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে,সরকার বাহাদুর যখন সিডিসন-সভা নিবারণ-কল্পে আইন প্রণয়ন করিবার মনস্থ করেন, তিনি তাহার প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১লা নভেম্বর, তারিখে যে বক্তৃতা করেন, কি আইন জ্ঞানে, কি স্বদেশ-প্রীতিতে, কি ভাষার ওজস্বিতায়, কি নির্ভীকতায়, তুলনা রহিত।

যে কোন কাজের প্রতিবাদ, যে কোন শুভ কর্ম্মের জন্য উপদেশ কি সাহায্য যখন প্রয়োজন হইয়াছে, রাসবিহারীর দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখন বঞ্চিত হইয়া ফিরে নাই। আমরা সিভিল রাইটস্ কমিটির অন্যতম সম্পাদক-রূপে তাঁহার নেতৃত্বে,—তিনি এই কমিটির সভাপতি ছিলেন,—কার্য্য করিয়া যে প্রকার উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়।

জাতীয়-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার তাঁহার আজীবন সাধনা, সকলের অনুকরণীয়। তিনি ইউরোপের প্রায় সকল দেশপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। একদিনের তরেও কিন্তু জাতীয় বিশেষত্ব বর্জ্জন করেন নাই। যে চোগা চাপকানে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, তাঁহার পর তৃতীয় পুরুষের আমরাও তাঁহার অন্তিম কাল পর্য্যন্ত, তাহা একদিনের জন্যও পরিহার করিতে দেখি নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও, তাঁহার এই জাতীয়তা গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা, অতীব প্রশংসনীয়।

বহুকাল ধরিয়া তিনি বাতব্যাধি রোগ-গ্রস্থ ছিলেন। তাঁহার পরিবার বলিতে, কিছুই ছিল না, বলিলেই হয়। তথাপি, তাঁহাকে কতদিন আদালতে দেখিয়াছি, ভৃত্যেরা বহন করিয়া এজলাস হইতে এজলাসে লইয়া চলিয়াছে; কাহার জন্য এত কষ্ট-স্বীকার? নিজের খাওয়া পরার উপযুক্ত অর্থের সঙ্গতি, তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তবে, এত কষ্ট সহ্য করিলেন কেন? আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ক্ষুদ্র জন্মস্থান, তাঁহার উইল-পত্র, এ গূঢ় প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিতেছে।

কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বড়ই কঠোর প্রকৃতি ছিল। আমরাও সে ব্যবহার-লাভে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু, তাহার বাহ্যিক কর্কশতার অন্তরে ছিল, সুরসাল মমতা। সে দিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত মহাশয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদে শোক-সভায় বলিয়াছিলেন,—রাসবিহারীর প্রকৃতি ছিল নারিকেলের মত। বাহিরে ছোবড়া ও কঠিন আবরণ, ভিতরে সুমিষ্ট খাদ্য ও তৃপ্তিকর পানীয়। কথাটা বড়ই ঠিক্।

হীরেন্দ্র বাবুর কথা বলিতে মনে পড়িল। রাসবিহারীর উইল-পত্রে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের যে অভাবনীয় ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছিল,—এ সৎকার্য্যের উদ্যোক্তা হীরেন্দ্রনাথ, স্বয়ং; তিনিই বুঝাইয়া পড়াইয়া, রাসবিহারীকে দিয়া, এই ব্যবস্থা করাইয়া লইয়াছেন। রাসবিহারী যে জাতীয়-শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন উদ্দীপনা ও উত্তেজনার অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা, ইহার প্রতিষ্ঠার দিন, টাউন হলের মহতী সভার সভাপতি-রূপে এবং মান্দ্রাজে এই বিষয়ে,

WATER DAMAGED.

তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া, বিশ্বাস হয়না। সে যাহা হৌক্, হীরেন্দ্র বাবু সেদিন নিজেই এ বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই এ কিম্বদন্তীর অসত্যতা সপ্রমাণ হয়। তিনি বলিয়াছেন,—রাসবিহারীর আদি উইল, তাঁহার মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়। তখন হইতে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ ছিল, তাঁহার চরম উত্তরাধিকারী। তাহার পর, নানাকারণে ৪।৫ বার উইলখানি পরিবর্ত্তিত করিতে হয়; কিন্তু, উইলের আর সকল ব্যবস্থা যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ যেমন প্রথমে ছিল, শেষ উইল পর্য্যন্ত, রাসবিহারী সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করেন নাই।

সার রাসবিহারী জীবনব্যাপী পরিশ্রমে যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। পৈত্রিক সম্পত্তি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে দান করিয়াছেন। তোড়কোণা গ্রামে পদ্মপুকুর নামক একটী পুষ্করিণী, মাতার নামে খনন করাইয়া ছিলেন; মাতৃদেবী পিতৃদেবের নামে তথায় দুইটী শিব প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় বসত বাটীর বৈঠকখানা, পুষ্করিণী ও পঞ্চাশ হাজার টাকা, শিবালয়ের উদ্দেশ্যে দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামে নিজের পিতৃদেবের স্মরণার্থে তাঁহার নামে একটী স্কুল স্থাপন করিয়া, উহার ব্যয় বহন করিয়া আসিতেছিলেন; তিনি তাঁহার সুবৃহৎ লাইব্রেরী এবং নগদ দেড় লক্ষ টাকা এই স্কুলে দান করিয়া গিয়াছেন; পূর্ব্বে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পূর্ব্বে বিজ্ঞান-চর্চ্চার্থে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা দান করেন; বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে, এদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য, আরও আড়াই লক্ষ টাকা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দান করিয়াছেন; তাহার আয় হইতে প্রতিবৎসরে তিন জন করিয়া ভ্রমণকারী ফেলো নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজন ও অনুজীবিগণকে যথোপযুক্ত দান করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ্‌কে দিয়া গিয়াছেন। এই অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য দশলক্ষ টাকার অধিক হইতে পারে; কোম্পানির কাগজ ও শেয়ারের মূল্য হ্রাস না হইলে, উহার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকার ও অধিক হইত!

আর ভাষা? জীবনে জাতীয়তা রক্ষা করিতে যিনি এত সচেষ্ট ছিলেন, জাতীয় ভাষার উপরে তাঁহার কি প্রকার সদ্ভাব ছিল, তাহার একটী নিদর্শন দিয়া সন্দর্ভ শেষ করিতেছি। এই তথ্যটির জন্যও আমরা হীরেন্দ্র বাবুর নিকটে ঋণী। যখন রাসবিহারী, হীরেন্দ্র বাবুকে ডাকাইয়া, উইল প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন, হীরেন্দ্র বাবু তাহাকে বলেন, তাহার আপিসের সাধারণ ব্যবহার অনুসারে, ইংরাজীতে উইল করিতে পাইলেই, তিনি সুবিধা-বোধ করিবেন। রাসবিহারী তাহাতে ঈষৎ বিচলিত হইয়া বলেন,—"কি 'আমার' উইল ইংরাজীতে?—কখনই নয়। বাঙ্গলাতেই আমার উইল করিতে হইবে।" উইল বাঙ্গলাতেই হইল। তাঁহার ন্যায় ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে, এ উক্তির মর্ম্ম বিষয়ে আর কিছু মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করি না।

* * *

কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

জন্ম—হুগলি জেলার অন্তর্গত বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে।

মৃত্যু—কলিকাতা স্বগৃহে, ২৬শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১০ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে আট ঘটিকা।

কায়স্থ-সমাজে সর্ব্বাধিকারী বংশ-মর্য্যাদায় সুদীর্ঘকাল শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। সেই বংশের মধ্যে আবার স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের যশমান বহুদিন প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ' হইয়াছিল। ইঁহার সকল পুত্রগণই দেশের ও দশের সেবায় প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন। এই স্বনামধন্য পুরুষের চতুর্থ পুত্র, সুরেশপ্রসাদ। রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে, শৈশবে পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া, কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। তাঁহার মাতৃদেবীর ইচ্ছানুযায়ী সুরেশপ্রসাদ এম-ভি উপাধি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং মেডিকাল কলেজের প্রতি পরীক্ষায় পারিতোষিক ও পদক অর্জ্জন করেন। তিনি চিকিৎসার ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার 'হাতযশ' চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহার প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অপার। জন-সাধারণের উন্নতি-কল্পে সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতি ও সাহচর্য্য লাভ করা যাইত। বাঙ্গালী-আর্ত্ত-সেবা-সম্প্রদায় (Bengal Ambulance Corps) প্রতিষ্ঠা, তাঁহারই চিন্তা-প্রসূত। তাহার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সিদ্ধি লাভ করিয়া বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাকে গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাহার পর, বাঙ্গালী পল্টন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছা-সৈনিক-দল সংগঠন বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগ বিশ্ব-বিশ্রুত। তিনি স্বদেশ-গৌরব বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাঁসপাতাল স্থাপনে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি ছিলেন। বহুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং এককালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার প্রতিনিধিরূপে সভ্য মনোনীত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। লর্ড চেমস্‌ফোর্ড কলিকাতায় আসিবার পর, তাহাকে C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করেন ও তাহার বৎসর দুই পরে, তাহাকে ইণ্ডিয়ান-মেডিকেল-সার্ভিসের মাননীয় লেপ্টনাণ্ট-কর্ণেল পদ প্রদান করা হয়।

আট ভাইয়ের মধ্যে পাঁচটী, একমাত্র অ-পোগণ্ড পুত্র, তিনটী কন্যা ও সহধর্ম্মিণীকে ও দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, অসময়ে, অক্লান্ত-কর্ম্মী স্বাধীন-চেতা সুরেশ প্রসাদ মাত্র চুয়ান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। উদরের প্রদাহে বিগত তিনমাস কাল তিনি ভুগিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, চিকিৎসা-শাস্ত্রে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের সকলেই এই মহার্হ প্রাণটীকে রক্ষা করিতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। সকলই ব্যর্থ হইল? মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি একখানি পত্র লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাহা পারেন নাই। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। ধীরে ধীরে জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। 'একে একে নিভিছে দেউটী'

* * *

৺ নলিনাক্ষ বসু।

কৃষ্ণনগর বলিলে যেমন মনে হয়, সরভাজা

সর-পুরিয়া, আর মনে হইত, মনোমোহন ঘোষ; চট্টগ্রাম বলিলে যেমন মনে হইত, সাধু যাত্রামোহন ও লঙ্কার ঝাল। বরিশাল বলিলে যেমন মনে হয়, মুসুরির ডাল ও ভক্ত-প্রেমিক অশ্বিনীকুমার; বর্দ্ধমান বলিলে যেমন রসনাতৃপ্তকারী সীতাভোগ, মিহিদানা মনে হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় স্বদেশ-বৎসল-নলিনাক্ষের নাম প্রবীন; তাহা ভুলিতে পারা আমাদের অসম্ভব।

বর্দ্ধমানের স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি নলিনাক্ষ বসু মহাশয় বিগত ৭ই চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে, ৭৭ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ইনি নানাভাবে অক্লান্তভাবে নিরপেক্ষতার সহিত দেশের ও দশের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রায় সাড়া পাওয়া যাইত না বলিলে হয়; যেটুকু প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সেখানে হইয়াছে তাহা কেবল নলিনাক্ষ-প্রমুখ দেশনায়কবর্গের নিঃস্বার্থ চেষ্টায়। তাই এহেন লোকের অভাবে ভাবিতে হয়, দেশের কি হইবে?

নলিনাক্ষের জীবনগত সাধনা বর্ত্তমানযুগে উদ্দীপনা আনিতে পারিবে, আমাদের বিশ্বাস। প্রথম জীবনে তিনি বাঙ্গালী-সুলভ ব্যবসা—কেরাণীগিরি—গ্রহণ করেন। তাহার অন্যোন্নতির আশৈশব অদম্য উৎসাহ তাঁহাকে এই ব্যবসা ছাড়িয়া পুলিসের সব ইনস্পেক্টার সরকারী চাকরী গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। তখন তিনি হাণ্টার সাহেবের বাঙ্গলার বিবরণ (Statistical Accounts of Bengal) সংগ্রহে সাহায্য করিতেন। স্বাধীন-চিত্ত নলিনাক্ষের পক্ষে কিন্তু দাসত্বের বন্ধন বেশীদিন সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে, তিনি স্বাধীন-ব্যবসা ওকালতীর জন্য উমুক্তা অর্জ্জন করিয়া, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লিপুরের আদালতে বাহির হইতে আরম্ভ রিলেন। বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই, তিনি বর্দ্ধমানে গিয়া বসিলেন এবং তথায় দেহরক্ষার সপ্তাহকাল পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ওকালতী করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সুনাম ও প্রতিষ্ঠা বলিয়া দিতে হয় না; তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। স্বীয় ক্ষমতা কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও অক্লান্ত শ্রমের ফলে, তিনি বর্দ্ধমানের শ্রেষ্ঠতম উকিলরূপে বহুকাল হইতে সুপরিচিত; হাকিম, মক্কেল ও সহযোগী সকলের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তির পাত্র। ইং ১৮৭০ সনে, বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তিনি ইহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। পঞ্চাদশ বর্ষকাল এই মিউনিসিপালিটি তাঁহার একচ্ছত্র অধ্যক্ষতার পরিচালিত হয়; সেই কালে ইহা বঙ্গদেশে আদর্শ ভাবে পরিচালিত মিউনিসিপালিটি বলিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, সরকার সফলতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষিত করেন। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভায় তিনি বার বার তিন বার সাধারণ-কর্ত্তৃক সদস্যরূপে মনোনীত হন। মৃত্যুকালেও সদস্য ছিলেন। নানা বিষয়ে সরকারী আমলাবর্গের সহিত তাঁহাকে নানা প্রকার আদান প্রদান ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু, তাহাতে তাহার স্বদেশ-বৎসলতা একদিনের তরেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; একদিনের তরেও তিনি তাঁহার স্বাধীনতা ও স্বাধীন-চিত্ততাকে খর্ব্ব হইতে দেন নাই। যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা প্রাপ্য, এবং সর্ব্বোপরি, জনসাধারণের যাহা লভ্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা অর্জ্জন

করিতে আজীবন অদম্য উৎসাহে সংগ্রাম করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই প্রকার লোকের তিরোধানে বঙ্গদেশ যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্থ হইল, তাহা গণনা করা সুকঠিন। বিধাতা এই ক্ষণজন্মা পুরুষের আত্মার কল্যাণ করুণ।

* * *

সহযোগিতা বর্জ্জন। এই নীতি যতদিন কেবল মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত মত বলিয়া প্রকাশ ছিল, অনেকে তাহাতে আস্থাবান হইতে পারেন নাই। এমন কি, মিশর দেশে এই নীতির প্রয়োগে জাতীয় উদ্ধারের পথ সুগম হইয়াছিল, সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করিয়াও, মিশরে ও ভারতের অবস্থা কোন প্রকারে অনুরূপ নহে, এই যুক্তির অবতারণা হইয়াছে। সহযোগিতা বর্জ্জন নীতির বিস্তার কিন্তু প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যের দ্বারে আজ উপনীত হইয়াছে। জর্ম্মান নিরুপায় হইয়া আজ এই নীতিকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। নীতিটী যুক্তিযুক্ত কি না, সে বিষয়ে যখন দেশে গভীর মতভেদ আছে, এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বাধীনতায় ও স্বাধীন-চিন্তার আমরা ব্যাঘাত জন্মাইতে চাই না। তবে, এটুকু বলা বোধ হয় দোষণীয় হইবে না যে, আমরা চাই স্বাধীনচিত্ততা। স্কুল, কলেজ, আদালত না ছাড়িয়াও কঠোর ভাবে,—প্রকৃত ভাবে,—সহযোগিতা বর্জ্জন করা সম্ভব। আর লোকলজ্জায়, মিথ্যা ভয়ে, স্কুল কলেজ আদালত ছাড়িয়াও, বহুলোকের মজ্জাগত সহযোগিতা-স্পৃহা, অঙ্গারের মলিনতার ন্যায়, "শতধৌতেন ন মুঞ্চতে"।

* * * *

নরম ও গরম দল। দেশের মধ্যে একটা মহা পরিবর্ত্তনের আভায় পাওয়া যাইতেছে। ছোট বড় দুইটি জিনিষকে সমান করিতে হইলে, হয় একটাকে বাড়িতে হয়, না হয় অপরকে ছোট হইতে হয়। কি উপায়ে এটা ঘটিতেছে তাহার বিচার করা বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। একদিকে দেখা যাইতেছে, নরমদলের অন্যতম নেতা দ্বারবঙ্গাধিপতি, মহামান্য স্বয়ং লর্ড সিংহ বাহাদুরের নজির লইয়া জারি করিলেন,—গান্ধী মহাত্মার, চরকার আয়োজনটী ব্যতীত, আর সকল অনুষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। অপরদিকে, দেখা যাইতেছে, যাঁহারা গরম দলের যজ্ঞের বিশিষ্ট হোতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্কুল কলেজ আইন আদালত বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান হইতেছেন; শাসন-সংস্কার-প্রসূত নবীন ব্যবস্থাপক-সভার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে ভাবিতেছেন,—"আবার ডাকিলে, খাইব"। যে সরিষা দিয়া ভূত তাড়াইতে হইবে, ভূত যদি তাহাতেই চাপিয়া বসে সমস্যাপূর্ণ ব্যাপারটী আরো জটিল হইয়া উঠে। লর্ড সিংহ বলিতেছেন,—ঢাকের বাদ্যি তিনি বাজাবেনই বাজাবেন, তা' তুমি শুনতে চাও, বা না চাও। আমরা নাচার!

* * * *

চিত্তরঞ্জনের যাত্রাভঙ্গ। নূতন শাসন-সংস্কারে কি পাইলাম যখন বিচার করিতে আরম্ভ করি, তখন মনে হয়, খড়ের গাদায় সূচ হারাইয়াছি। সবই তো পূর্ব্বেকার মত

WATER DAMAGED.

রহিয়াছে, তবে সংস্কার হইল কোথায়? এই যে সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপরে হুকুম জারি হইল, তিনি মৈমনসিংহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, গা' জোরি বে-আইনি এ ব্যবহার ছিল যেমন সংস্কারের পূর্ব্বে, সংস্কারের পরে আজও ঠিক তেমনই আছে। অপ্রতিহত-রূপেই দেশের উপর আমলাতন্ত্রের জোর জুলুম চলিতেছে; তাহার কি বিরাম নাই, প্রতিকার নাই?

* * * *

কালীঘাটে পুলিশের গুলি। এই সেদিন দেখা গেল অতর্কিতভাবে সহসা পুলিশ সার্জ্জনরা লোকদের উপরে দিনমানে গুলি বর্ষণ করিল। কে তা'র প্রতিবিধান করিবে? সম্প্রতি এই ঘটনার উপরে একটী তদন্ত চলিতেছে; তাহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাই না। গুজব, এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী ডেপুটী কমিশনার হেনা (Hannah) সাহেব, তদন্ত শেষ হইবার পূর্ব্বেই, এক বৎসর ছুটি পাইয়া স্বগৃহে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা সত্য কি? তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কি ভারত ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া বিধেয়? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! তুমি আমি কি করিতে পারি?

* * * *

দিল্লীর ব্যয়।—দিল্লীনগর পুনর্গঠনের জন্য

১৯১২-১৩ সালে	১৬,৭৮,০০০	টাকা
১৯১৩-১৪ সালে	৭৫,০৫,০০০	„
১৯১৪-১৫ সালে	৫৪,৫১,০০০	„
১৯১৫-১৬ সালে	৫০,০০,০০০	„
১৯১৬-১৭ সালে	৪০,০০,০০০	„
১৯১৭-১৮ সালে	৩০,০০,০০০	„
১৯১৮-১৯ সালে	৪৩,০০,০০০	„
১৯১৯-২০ সালে	৫০,০০,০০০	„
১৯২০-২১ সালে	১,২০,০০,০০০	„

খরচ হইয়াছে। আগামী বর্ষে, ১,১০,০০,০০০ টাকা খরচ করিবার আবদার! যুদ্ধের সময়ও দিল্লী নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ ছিল না। যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে, খরচ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। আগামী বৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয় ১৯ কোটি টাকা বেশী। তবু দিল্লী নির্ম্মাণের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়! ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য এমন কি একান্ত ব্যবহার্য্য চিনির উপরও শুল্ক হইয়াছে! সেই টাকা হইতে ১ কোটির বেশী টাকা দিল্লীর জন্য ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট লজ্জাবোধ করিতেছেন না। 'ডিল্লীকা লাড্ডু'!

* * * *

বঙ্গের শাসন ব্যয়। এ বৎসরের মত বাঙ্গলার বজেটের চরম নির্ঘণ্ট চুকিয়াছে। ব্যয়ের জন্য, আমলাবর্গের উনিশটী ও মন্ত্রী-বর্গের এগারটী, একুনে ত্রিশটীতে, মোট ৯,৯৭,৪৪,০০০ টাকার মঞ্জুরের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সকলের মঞ্জুরের বিপক্ষে প্রায় ২১২টী প্রতি-প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হয়। তাহার মধ্যে

গৃহীত—৩৯

প্রত্যাখ্যাত—২৭

প্রত্যাহৃত—১৪৬ (!)

প্রত্যাহারই যদি করিতেই হইল, এই প্রতি-প্রস্তাবগুলি করা হইয়াছিল, কোন বিবেচনায়? যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা

হইয়াছে, তাহাদের ফলে ন্যূনাধিক নিম্নলিখিত ব্যয় গুলির টাকা নামঞ্জুর হইয়াছে—

১৪।	সারকেল কর্ম্মচারী ...	১,০০,০০০৲
২৩।	অরণ্য বিভাগ ...	১৯,৯০০৲
২৯।	খবরের ডিরেক্টর ...	৩০,০০০৲
৩৮।	হাইকোর্টের, (পেপার বুক)	১,৩০,০০০৲
৪৪।	এডিসলাল লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার	৫০,০০০৲
৭৪।	পুলিস ...	২৩,৩২,৭০০৲
১৪৮।	মৈমনসিংহ-বিভাগ ...	৬,০০,০০০৲
১৫৩।	মেদিনীপুর-বিভাগ ...	৭,২৫,০০০৲
১৪৩।	প্রধান বিচারপতির বাসস্থান	১,০০,০০০৲
১৯৪।	পুলিস হাঁসপাতাল ...	৪,৮৬,০০০৲
২১০।	বিবাহিত পুলিস সার্জ্জেণ্ট ...	২,৮৩,০০০৲

পুলিস বিভাগে চাওয়া হইয়াছিল, মোট ১,৭৪,৭৮,০০০৲ টাকা; তাহার মধ্যে ২৩,৩২,৭০০৲ টাকা নাকচ হওয়াতে, বেশ পরিস্কার-রূপেই বোঝা যাইতেছে, দেশের লোকের এই বিভাগের উপরে একেবারেই আস্থা নাই। বিবাহিত সার্জ্জেণ্টদের জন্য বাসস্থানের প্রস্তাবটা পুলিস বিভাগের পক্ষে একটা নিতান্ত আদুরে ছেলের বায়নার মত। ১৯১৯ সালের কলিকাতা পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ, মোট সার্জ্জেণ্টের সংখ্যা ৪৩; বর্ত্তমানে মোট ৫১ হইতে পারে। লালবাজারের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের উত্তর পারে যে সুবৃহৎ প্রাসাদ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতেও ঠাকুরদের সাধ পূরে নাই। পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত চক্-মিলান ঠাট্‌খানা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, লাল বাজারের কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষ হইতেছে না। ক্লার্ক সাহেবের পুলিস অট্টালিকার বাতিক সুপরিচিত; তিনি, ১৯১৯ সনের রিপোর্টে এই প্রবৃত্তি এমন কি 'ধার করিয়া' চরিতার্থ করিবার জন্য এক ফন্দি (scheme) আঁটিয়াছেন (৫ পৃঃ)! ব্যবস্থাপক-সভার অধিকাংশের সদস্যবর্গের অভিমত বস্তু অন্য-রূপ। হাইকোর্টের 'পেপার বুক' প্রস্তুত বিভাগ সংস্কার-কল্পে ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে গুরুতর। উকিলদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মঘট করিয়া ব্যবসায় ইস্তফা দিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, দেখা যাক্। সাক্ষাৎভাবে, গান্ধী-মহাত্মার প্রচারের ফলে যাহা সম্ভব হয় নাই, বিচারক দিগের বিচারে বা 'অ-বিচারে' (?) বোধ হয় হাইকোর্টে তাহা পরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িবে। দেখা যাক্, কি হয়!

* * * *

দমন আইন সংস্কার। কঠোর আইন সমূহ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি বসিয়াছে। ডাক্তার সপ্রু, স্যর উইলিয়ম ভিনসেণ্ট, স্যর শিবস্বামী আয়ার, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, মিঃ সমর্থ, মিঃ ভুরগ্রী, ডাক্তার গৌর, স্যর দিন শা ওয়াচা এবং ডাক্তার হ্যামন্স ঐ কমিটীর সদস্য হইবেন। ডাক্তার সপ্রু হইবেন চেয়ারম্যান। এই কমিটি নিম্নলিখিত আইন গুলি সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন—

১৮০৪ সালের বেঙ্গল ষ্টেট অফেণ্ড রেগুলেন

১৮০৮ সালের মাদ্রাজ রেগুলেশন ১নং,

১৮১৮ সালের বেঙ্গল ষ্টেট প্রিজনার্স রেগুলেশন, ২নং

১৮২৭ সালের বোম্বে রেগুলেশন ২৫নং

১৮০৫ সালের ষ্টেট প্রিজনার্স এক্ট,

১৮৫৭ সালের ষ্টেট অফেণ্ডেস এক্ট,

১৮৫৭ সালের ফরফিচার এক্ট,

১৮৫৮ সালের ষ্টেট প্রিজনার্স এক্ট,

১৯০৮ সালের ইণ্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ড এক্ট,

১৯১১ সালের রাজদ্রোহ সভা বন্ধের আইন,

১৯১৫ স[illegible]রতরক্ষা আইন

১৯১৯ [illegible]র এনার্কিক্যাল এণ্ড রিভোলিউনসন নীতি ক্রাইমস এক্ট।

* * * *

প্রেস্ আইন সংশোধন। মুদ্রাযন্ত্র ঘটিত আইনগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্যও একটি কমিটি বসিয়াছে। এই কমিটিতে ডাক্তার সপ্রু, স্যর উইলিয়ম ভিনসেণ্ট, মিঃ যমুনাদাস দ্বারকাদাস, মিঃ শেষগিরি আয়ার, শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ সিংহ, মিঃ বক্সী শোভন লাল, মিঃ ঈশ্বর সারণ, মিঃ জে, এন্ মুখার্জ্জি খান বাহাদুর মীর আসাদ আলি থাকিবেন। ডাক্তার সপ্রু চেয়ারম্যান হইবেন। এই কমিটি নিম্নলিখিত আইনগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন—

১৮৬৭ সালের প্রেস এণ্ড, রেজিষ্ট্রেসন
১৯১০ সালের ইণ্ডিয়ান প্রেস এক্ট
১৯০৮ সালের নিউজ পেপার এক্ট।

* * * *

ব্রাহ্মসমাজ। নানা বাকবিতণ্ডা, রেষারেষি, মান অভিমান, আবদার বায়নার অভিনয়ের পর, কর্ত্তাদের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও, বিগত ১৯শে মার্চ্চ তারিখের স্থগিত বার্ষিক সভার অধিবেশনে সমাগত কবীন্দ্র ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্যের মতে (৪৯৬ সপক্ষে, ২৩৩ বিপক্ষে; অবশিষ্ট সভ্যগণ অভিমত জ্ঞাপন করেন নাই) মাননীয় সভ্যরূপে বরিত হইয়াছেন। সত্যের ও সাম্যের এই প্রতিষ্ঠা দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজে ঘুণ ধরিলে, ক্ষোভের লেশ থাকিবে না।

* * *

জাতীয় শিক্ষা পরি[illegible]। আসন্ন সঙ্কটাবস্থায় উপনীত হইয়া, পরিষৎ [illegible]য, বিপদভঞ্জনের অশেষ করুণায়, সকল [illegible]া অতিক্রম করিয়া, চির-প্রতিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় ভিত্তিলাভ করিয়াছে, তাহাতে আমরা যে কি প্রকার আনন্দিত হইয়াছি, বলিবার নয়। দেশে জাতীয় শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, জাতীয় উন্নতির পথ সুগম হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইহা অমোঘ অব্যর্থ ঔষধ।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার যে যোগ্যতার সহিত ভাইস চ্যান্সেলারের কাজ করিয়াছিলেন, এই কথা লর্ড রোলাণ্ডশে সেদিন কনভোকেশন বক্তৃতায় বলিয়াছেন। তাঁহার কাজ ফুরাইল এই চৈত্রে; আর, মাননীয় বিচারপতি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁহারই হাতে-গড়া। যে কেহই ভাইস চ্যানসেলার থাকুন না কেন, তাহারই নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় চালিত হইয়া আসিয়াছে। সার্ আশুতোষের পূর্ণ নেতৃত্বের ফলে, অনেক আশা করা যায়!

[সমাপ্ত]

